পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

শিশু ও কিশোর সাহিত্য সংকলন

আলোর ফুলকি

ALOR PHULKI (A collection of juvenile literature)

প্রথম প্রকাশ ২৫ মে ১৯৫৭

উপদেষ্টা পর্ষদ ॥ অখিল নিয়োগী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, হরেন ঘটক, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ
শৈল চক্রবর্তী, বিজন চৌধুরী, পার্থসারথি চৌধুরী, সুনীলকুমার সেনগুপ্ত, সন্তোষ চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী ॥ অধীর চক্রবর্তী, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন মুখোপাধ
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সম্পাদনা সহযোগী ॥ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদশিল্পী ॥ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
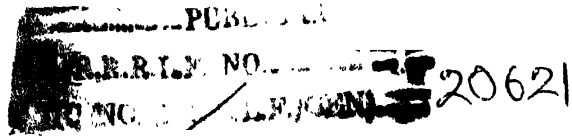
প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

মুদ্রক
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২

চিত্র

অলংকরণে

শৈল চক্রবর্তী ধীরেন বল নারায়ণ দেবনাথ নির্মাল্য নাগ চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য সুধীর মৈ
মদন সরকার সমীর সরকার সজল রায় অনিল দত্ত অমর দে শ্রীমন্ত দত্তগুপ্ত কুণাল
ন দত্ত উজ্জ্বল চক্রবর্তী রতন রিত অজিতবিক্রম দত্ত অমিতাভ চক্রবর্তী অ

ছড়া ও ছন্দ
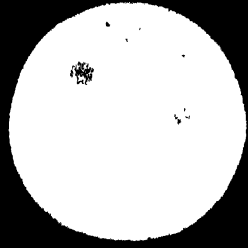
আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা
চাঁদেব কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
রাঙা সুতোর কাপড় দেব
কালো গাইয়ের দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
রাজার মেয়ে বিয়ে দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

(প্রচলিত)

আগডুম বাগডুম
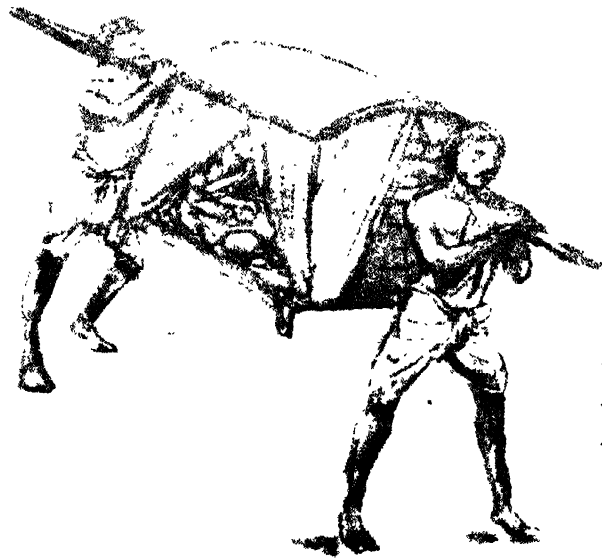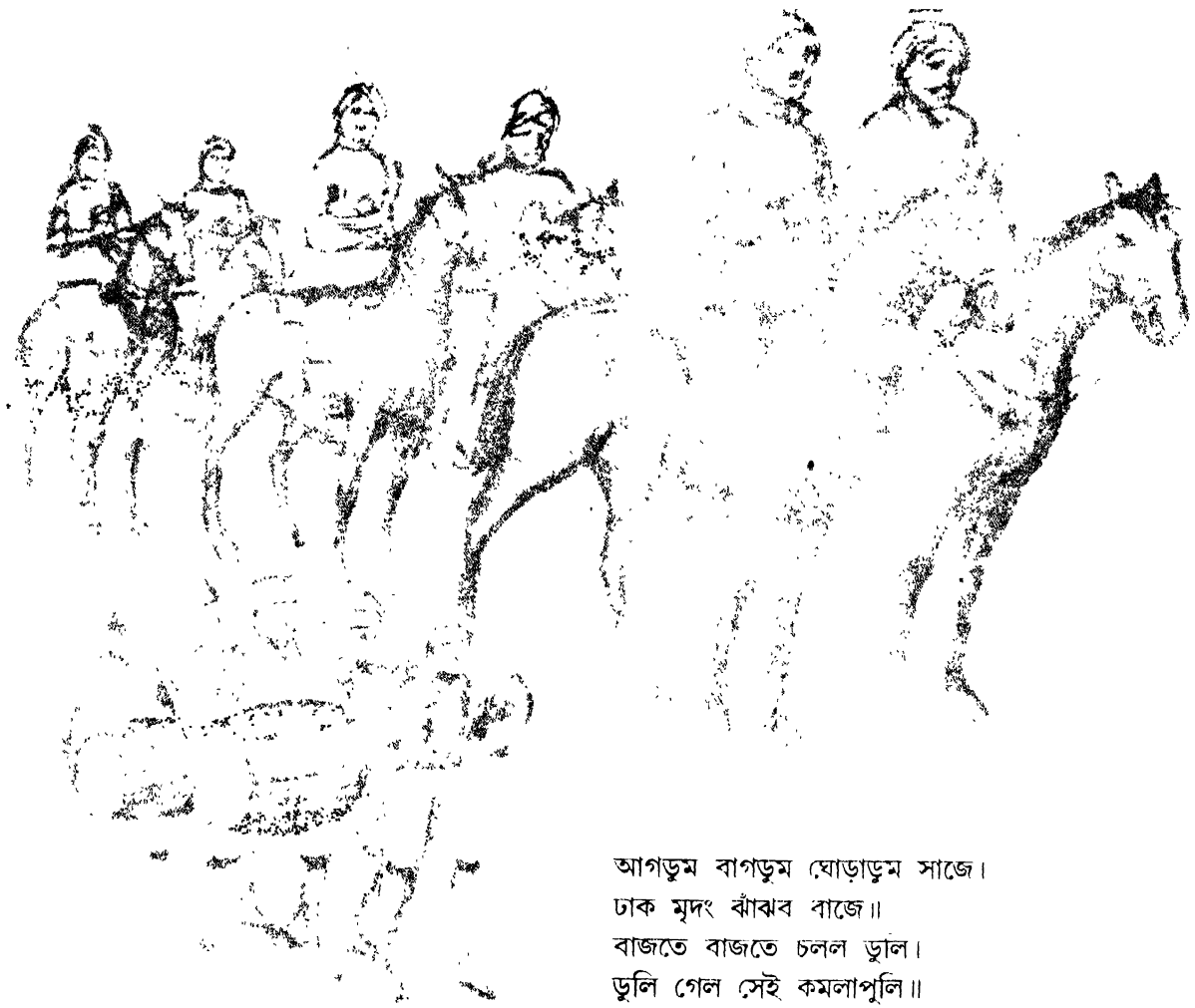
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা।
সুয্যিমামার বিয়েটা॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই॥
একটা পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥
কচি কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল্॥
আমি তো বটে নন্দঘোষ—
মাথায় কাপড় দে॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগর ফুল॥
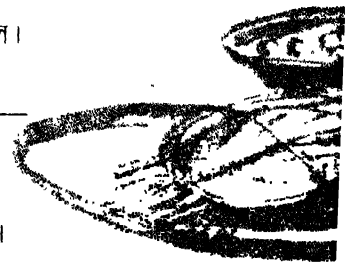
শিব সদাগর

এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর
তারি মাঝে বসে আছে শিব সদাগর।
শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, বসতে দিল পিঁড়ে,
জল পান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে।
শালিধানের চিঁড়ে নয়রে, বিন্নিধানের খই,
মোটা মোটা সবড়ি-কলা. কাগমারি দই !

(অজ্ঞাত)

দাদাভাই

দাদাভাই চালভাজা খাই
নয়না মাছের মুড়ো।
হাজার টাকার বউ এনেছি,
খাঁদা নাকের চুড়ো।
খাঁদা হোক, বোঁচা হোক,
সব সইতে পারি
ঝাপটা কাটা মুখনাড়াটা,
ওই জ্বালাতে মরি !

(অজ্ঞাত)

শীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত
আঁক করে কেটে লয় বাপ,
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস
জল নয় এ যে কাল সাপ।
ধনীর শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়,
বেনের পুঁটুলি হয়ে শুয়ে থাকে শীত সয়ে
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয়।
চিরজীবী ছেঁড়া কাঁথা সর্বক্ষণ বুকে গাঁথা
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে,
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা,
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে।
সকালে খাইতে চায় আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত,
শীতের কেমন খড়ি উড়ায় অঙ্গের খড়ি
ফাটায় সবার পদ হাত।
বাবু সব হরষিত শীতে মন বিকশিত
রাত্রিদিন আহারের খোঁজ,
বাবুজির প্রাণ চায় গরম গরম চায়
মনোমতো খাদ্য রোজ রোজ।
আমা হেন ভাগ্য পোড়া, দুঃখ লাগা আগাগোড়া
শীতে মরি দেহ নহে বশ,
ঢনঢন হাত খাঁক্তি* ভরসা মুড়ির চাক্তি
পানমাত্র খেজুরের রস।

(অংশবিশেষ)

*খাঁক্তি = শূন্য

প্রভাত

মদনমোহন তর্কালঙ্কার
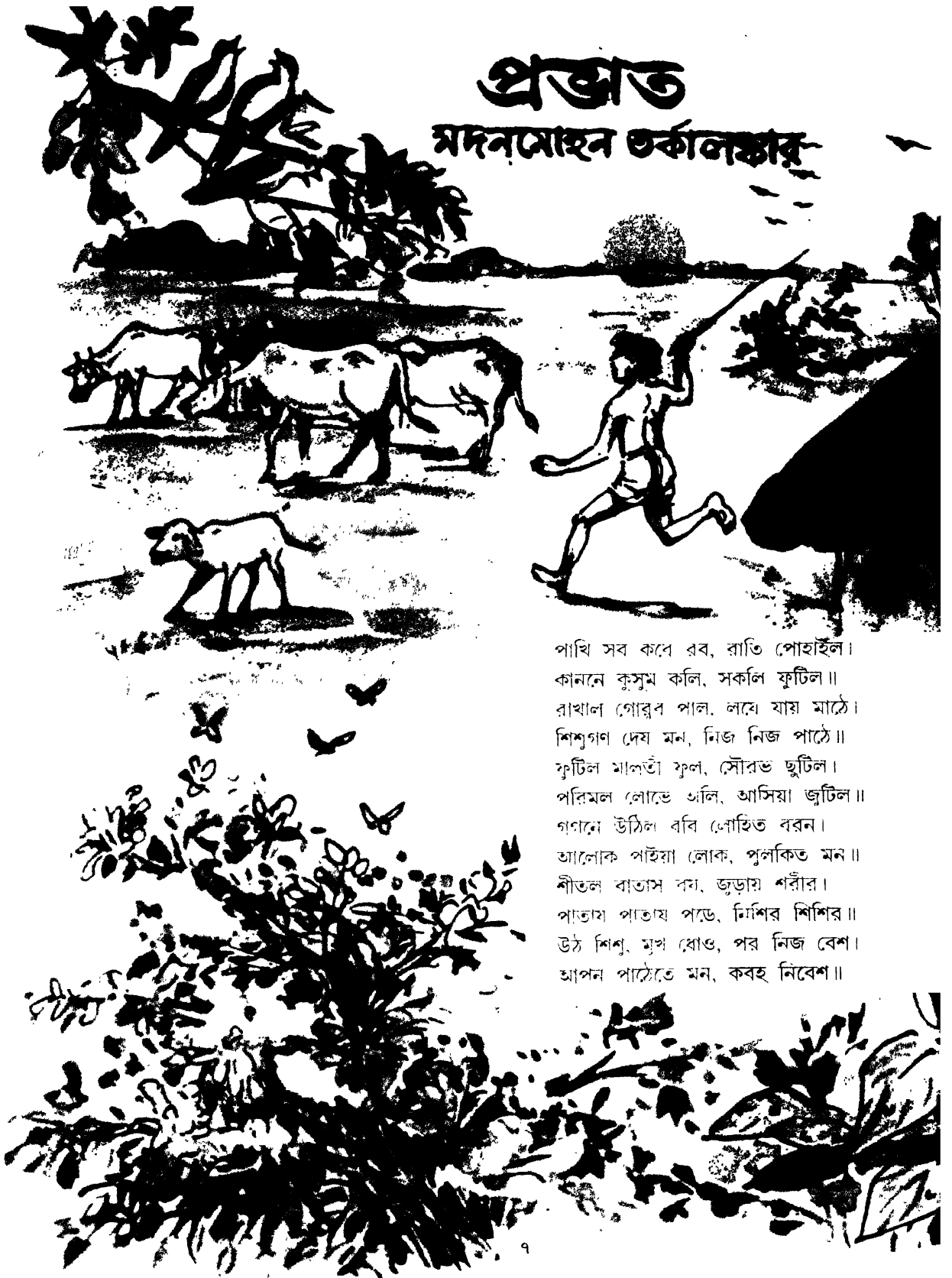
পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি, সকলি ফুটিল॥
রাখাল গোরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরন।
আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে, নিশির শিশির॥
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ॥

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
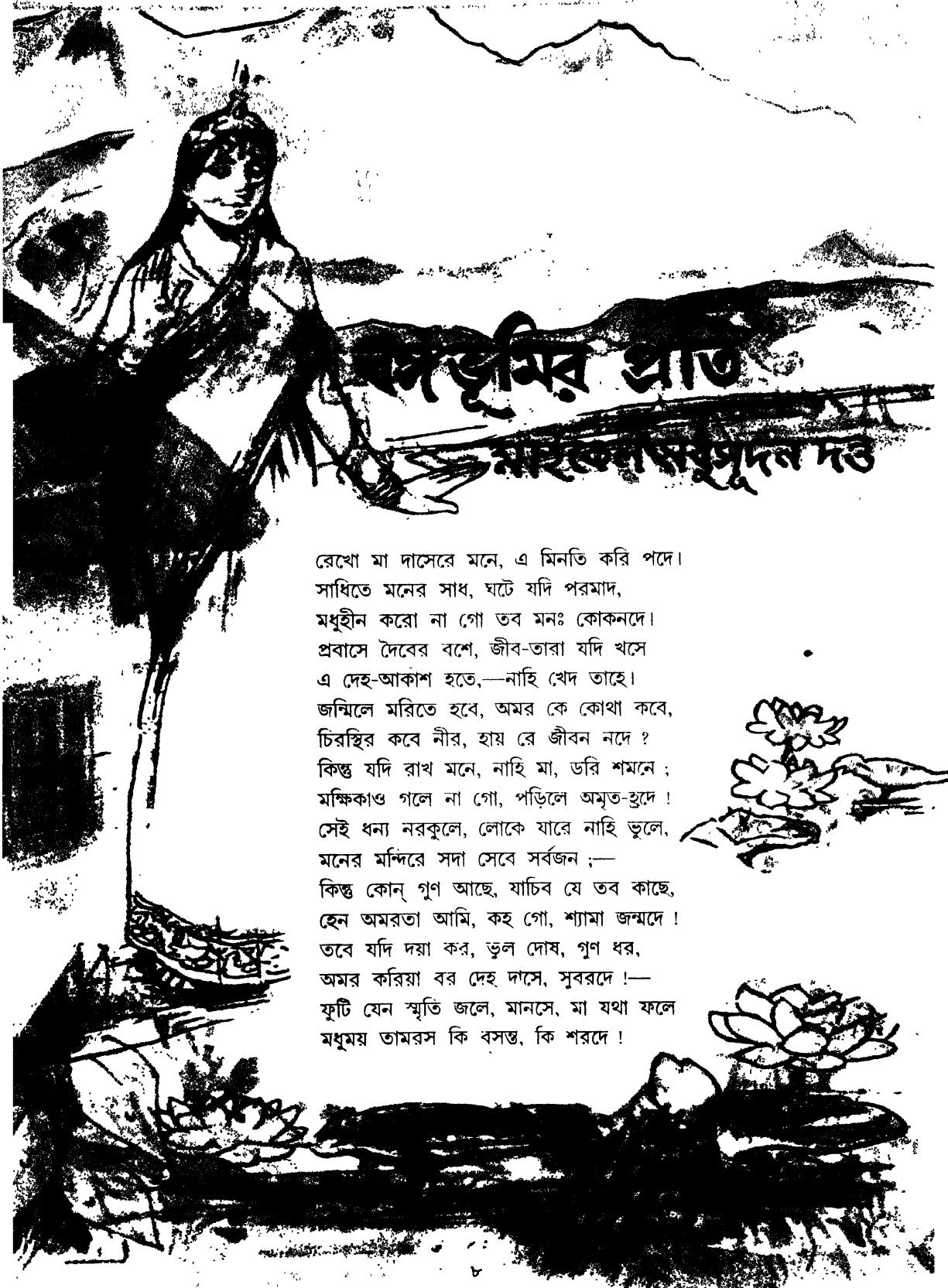
রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি জলে, মানসে, মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নবকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে, স্বর্গ-সুখ তায়।
ওই শুন ! ওই শুন ! ভেরির আওয়াজ হে, ভেরির আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে, সাজ সাজ সাজ।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, বাহুবল তাব,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, দেশের উদ্ধার।
অতএব রণভূমে চলো ত্বরা যাই হে, চলো ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, তুল্য তার নাই॥

(সংক্ষেপিত)

প্রভাত

দীনবন্ধু মিত্র

রাত পোহাল ফরসা হল
ফুটল কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা
জুটল অলিকুল॥
পূর্ব ভাগে নবীন রাগে
উঠল দিবাকর।
সোনার বরন তরুণ তপন
দেখতে মনোহর॥
ঘরের চালে পালে পালে
ডাকছে কত কাক।
পূজা বাটীতে জোড় কাঠিতে
বাজছে যেন ঢাক॥
মাথা তুলি মরালগুলি
নদীর কূলে ধায়।
চরণ দিয়ে জল কাটিয়ে
সঁাতার দিয়ে যায়॥
কত কুমারী সারি সারি
দুলছে কানে দুল।
কানন হতে কচুর পাতে
আনচে তুলে ফুল॥
পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে
কাপড় দিয়ে গায়।
গোরু চরাতে পাচন হাতে
রাখাল গেয়ে যায়॥
তাড়ি বগলে ছেলেব দলে
পাঠশালেতে যায়।
পথে যেতে কোঁচড় হতে
খাবার নিয়ে খায়॥
এই বেলা সকাল বেলা
পাঠে দিলে মন।
বৈকালেতে গৌরবেতে
রবে জাদুধন॥

(সংক্ষেপিত)

নদী ও সময়

মনোমোহন বসু

সদায় ধায় নদীর ঢেউ—
রাখিতে তায় পারে না কেউ ;
সময় যায় তাহারি প্রায়,
কাহারও মুখে চাহে না, হায় !
চলিছে দিন, চলিছে রাত ;
ধরিতে তায় কাহার হাত ?
ধরিতে [illegible] পা[illegible]
আলস্য যার শ[illegible] নাই।

ভারত সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস শাসিতে হাসিতে হাসিতে
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে
বারেক জাগিয়া করিয়া পণ।

তবে ভিন্নজাতি-শত্রুপদতলে
কেন রে পড়িয়া থাকিস সকলে ?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে কবিস মন ?

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম-যাগ, প্রতিমা অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্যসিদ্ধি হত এ মহীমণ্ডলে
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সেদিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না, হবে না,—খোল তরবার
এ-সব দৈত্য নহে তেমন।

(অংশ)

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে

নবীনচন্দ্র সেন

'দাঁড়াবে দাঁড়াবে ফিরে, দাঁড়া সৈন্যগণ !
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ, যদি ভঙ্গ দাও রণ—'
  গর্জিলা মোহনলাল—'নিকট শমন !
  আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিয়ো স্থির কারো না থাকিবে শির
  সবান্ধবে, যাবে সবে শমন-ভবন !....
  সামান্য বণিক এই শত্রুগণ নয়।
দেখিবে তাদের হায়, রাজা-রাজ্য ব্যবসায়,
  বিপণি, সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র-বিনিময়।
  নিশ্চয় জানিয়ো রণে হলে পরাজয়,
দাসত্বশৃঙ্খল-ভার ঘুচিবে না জন্মে আর
  অধীনতা-বিষে হবে জীবন সংশয়।....
  'চলো তবে ভ্রাতৃগণ, চলো পুনর্বার।
দেখিব ইংরেজ-দল শ্বেত অঙ্গে কত বল ;
  আর্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার ?
  সহেনা বিলম্ব আর, চলো ভ্রাতৃগণ !
চলো সবে রণস্থলে, দেখিব কে জিনে বলে ;
  দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য দেখাব কেমন।'

(অংশ)
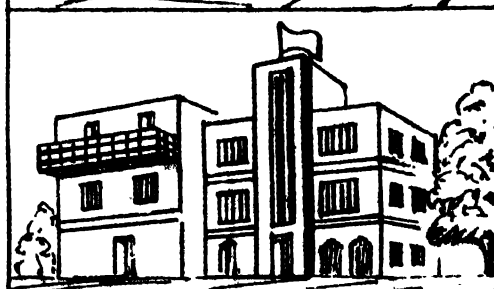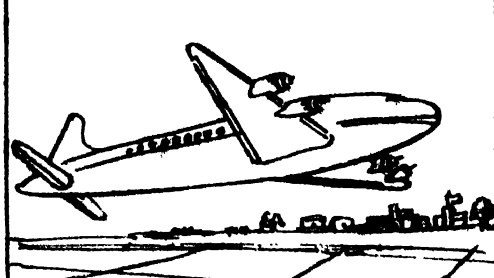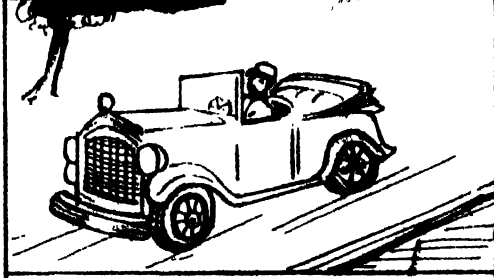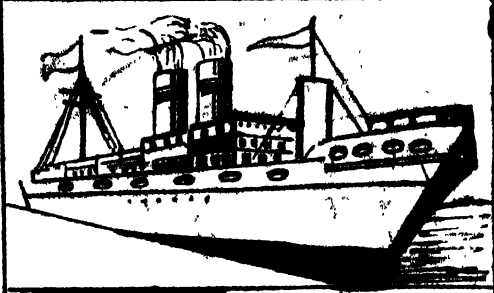
এই যে খেতে শস্য ভরা, তোমার তো নয় একটি ছড়া,
তোমার হলে তাদের ঘরে* চালান কেন হয় ?
তুমি পাওনা একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়,
তুমি কেবল চাষের মালিক,—গ্রাসের মালিক নয়।

স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে, এদেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ি, এই যে পেলেস, এই যে বাড়ি,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট, ছোটোলাট, তারাই সবে, জজ ম্যাজিস্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এদেশ তোদের নয়।
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের ব্যাঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়।
তাদের কলে তোদের কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি,
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি, ক্ষুধায় মৃত্যু হয় !
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয় !
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এদেশ তোদের নয়!

---

*পাঠান্তর : 'দেশে' (অংশবিশেষ)
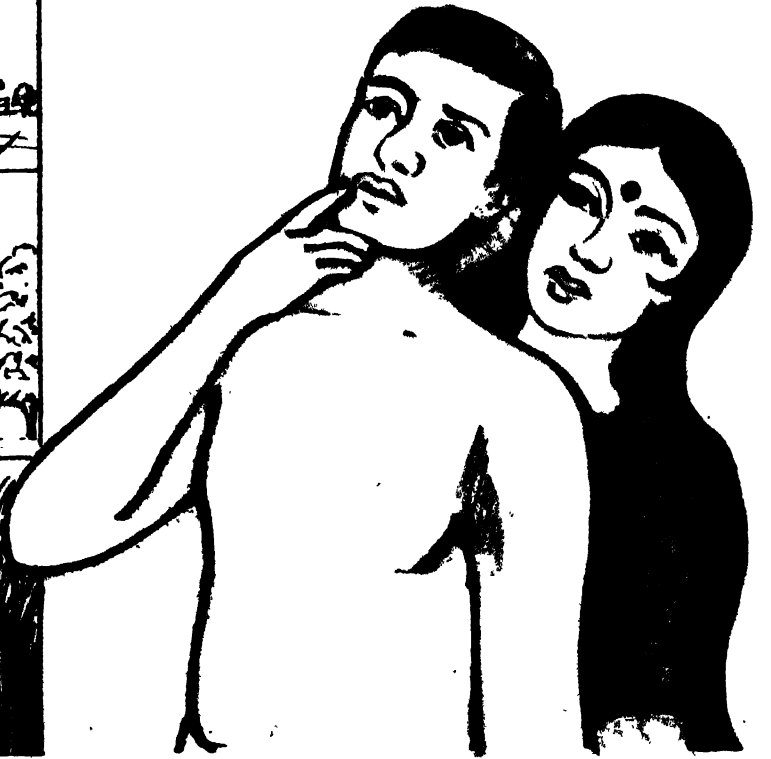
ক্ষান্তবুড়ি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহাসিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জানলায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডালনায়।

দুঃসাহসী
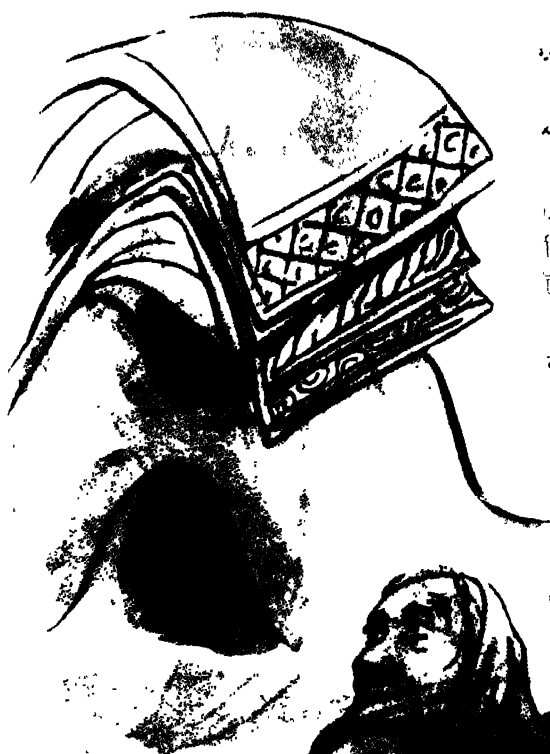
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে,
আমি যেন যাব দেশান্তরে।
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরি,
জিনিসপত্র নিয়েছি সব ভরি,
ভালো করে দেখ্‌ তো মনে করি
কী এনে মা, দেব তোমার তরে॥

চাস কি মা তুই এত এত সোনা।
সোনার দেশে করব আনাগোনা।
সোনামতী নদীতীরের কাছে
সোনার ফসল মাঠে ফলে আছে,
সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে—
না কুড়িয়ে আমি তো ফিরব না॥

পরতে কি চাস মুক্তো গেঁথে হারে।
জাহাজ বেয়ে যাব সাগরপারে।
সেখানে মা, সকাল বেলা হলে
ফুলের 'পরে মুক্তোগুলি দোলে,
টুপটুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে—
যত পারি আনব ভারে ভারে॥

দাদার জন্যে আনব মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্চা দুটি ঘোড়া।
বাবার জন্যে আনব আমি তুলি
কনকলতার চারা অনেকগুলি,—
তোর তরে মা, দেব কৌটা খুলি
সাত-রাজার-ধন মানিক একটি জোড়া॥
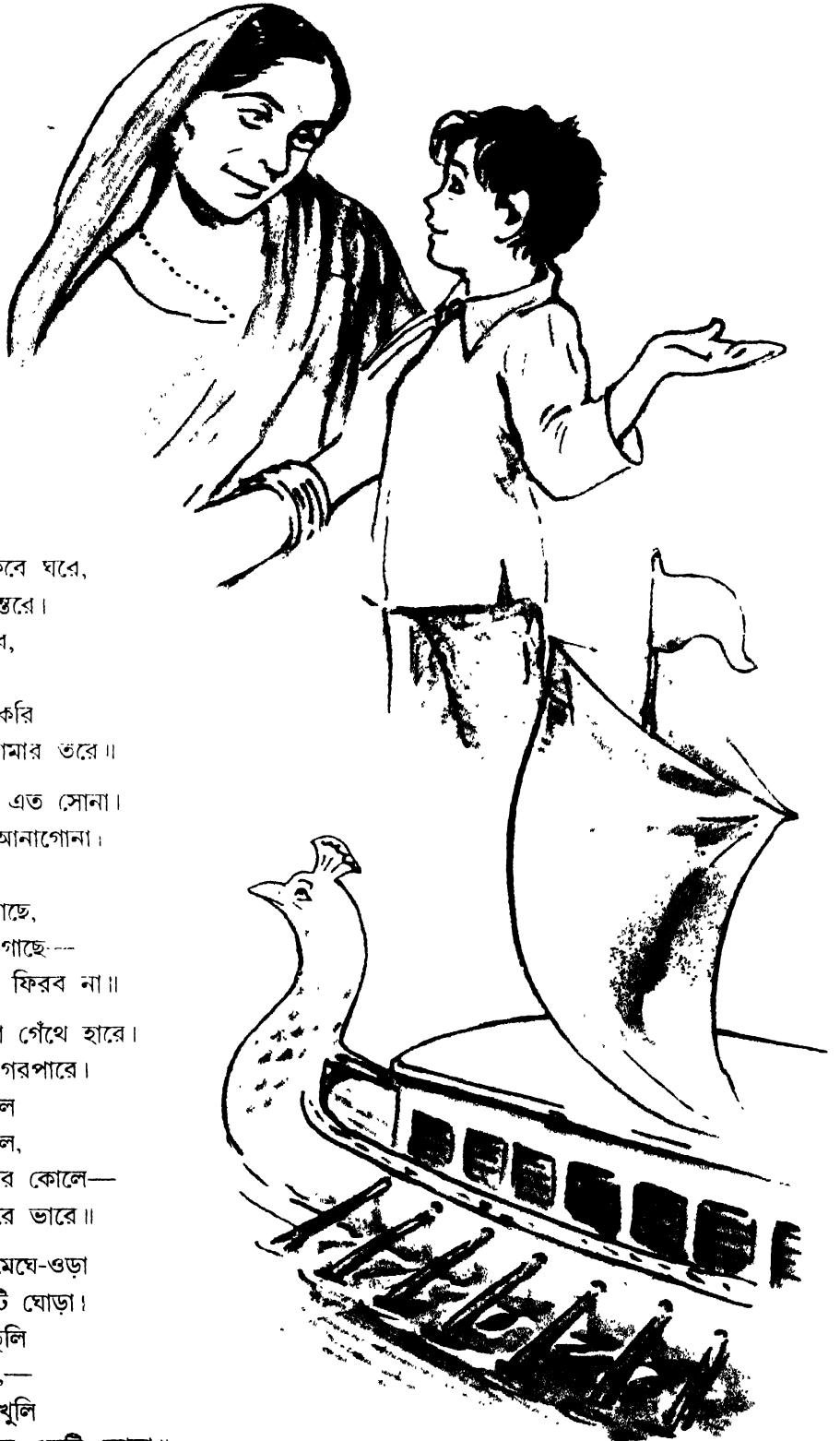
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ফুটফুটে জোছনায় ধব্‌ধবে আঙিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল।
প্রশান্ত মুখের 'পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
আলসেতে আঁখি ঢুলঢুল।
মাতা মৃদু ধীর হাতে আঘাতে শিশুর মাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান,
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কী ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধরেছে পাখি তান!
শিয়রেতে জেগে শশী যেন সে সৌন্দর্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে, "আয় চাঁদ" মা বলিছে, "আয় চাঁদ"
কী করিবে চাঁদ মনে ভাবে।
মা নাহি ধরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত-কিছু সব তার মিছে।
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামেশি—
স্বর্গে মর্তে প্রভেদ কি আছে!

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ওই ফুল ফুটে বনে, যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় ত নাই॥
পিপীলিকা, পিপীলিকা, দল-বল ছাড়ি একা
কোথা যাও, শুনি, যাও ব
শীতের সঞ্চয় চাই, খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায় পিলপিল চলি॥

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়
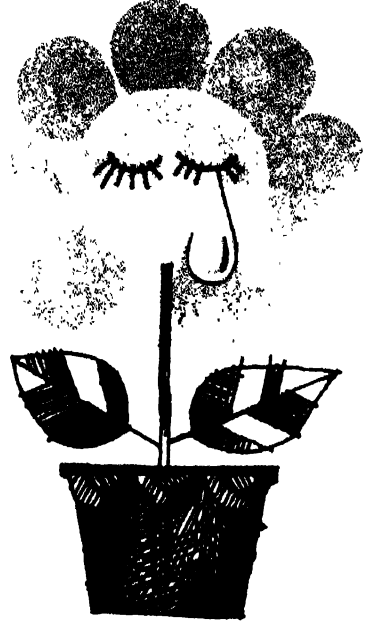
স্বপ্নে শুনি টবের নতুন ফুলচারাটি বলছে,
দেখ তো কী ভীষণ আমাব হাত-পা-মাথা টলছে !
দুরু দুরু কাঁপছে প্রাণ,
মনের সুখে, হা ভগবান,
ছিলাম আমি মাটিতে,
তোমার দাদা উপড়ে এনে বসিয়ে দিল বাটিতে।
ছোট্ট বাটি পোড়ামাটির যন্ত্রণা কি কম ?
বুক ফেটে যায় জলপিপাসায়, আটকে আসে দম !

বোলো তারে, মোর তরে যে টব এনেছে কিনে
গাছের জীবন, সে কি বাঁচে মাটির ছোঁয়া বিনে ?
যতই কর শুকনো আদর, সবকিছু তার মিথ্যে।
বুকের দুধের তৃষ্ণা কি চায় আর কিছুতে মিটতে ?
টবে যতই দাও না মাটি
পাইনে তাতে মায়ের গা-টি,
ঘটা করে যতই ঢালো ঘটির ধারাজল
সে জলে নেই বর্ষাধারার প্রাণের পরিমল।

মা আমার

কামিনী রায়

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনি জনমভূমি,—মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটো খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে ?
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক প্রাণ, যাক প্রাণ—মা আমার, মা আমার।

বর্ষারানী

মানকুমারী বসু

রাত দিন ঝম্ ঝম্ রাত দিন টুপ্ টুপ্,
কী সাজে সেজেছ রানি ! এ কী সাজ অপরূপ !

আননে বিজলিহাসি, গলায় কদম হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা, এ আবার কী বাহার !

শিখী নাচে, ভেকে গায়, মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে কত করে আয়োজন !

ডুবেছে রবির ছবি—ডুবেছে চাঁদিমা তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে তরল রজত-ধারা !

উথলিছে গঙ্গা, পদ্মা, পরানে ধরে না সুখ,
মরমে রয়েছে ছেয়ে তোমারি স্নেহের মুখ !

রাত দিন ঝম্ ঝম্ রাত দিন টুপ্ টুপ্,
দেখেছি অনেকতর দেখিনি তো এত রূপ !

(অংশ)

বিলাত-ফেরতা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আমরা বিলাতফেরতা ক'ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কী করি নাচার, স্বদেশি আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা'—আর
মুটেদের ডাকি 'কুলি'।

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিস্টার নামে রটি,
যদি 'সাহেব' না বলে 'বাবু' কেহ বলে
মনে মনে ভাবি চটি।

আমরা বিলিতি ধরনে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালোবাসি।

আমরা বিলেতফেরতা ক'টায়
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ওই
সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি
স্পিচ্ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মতো
চম্পট পরিপাটি।

(সংক্ষেপিত)
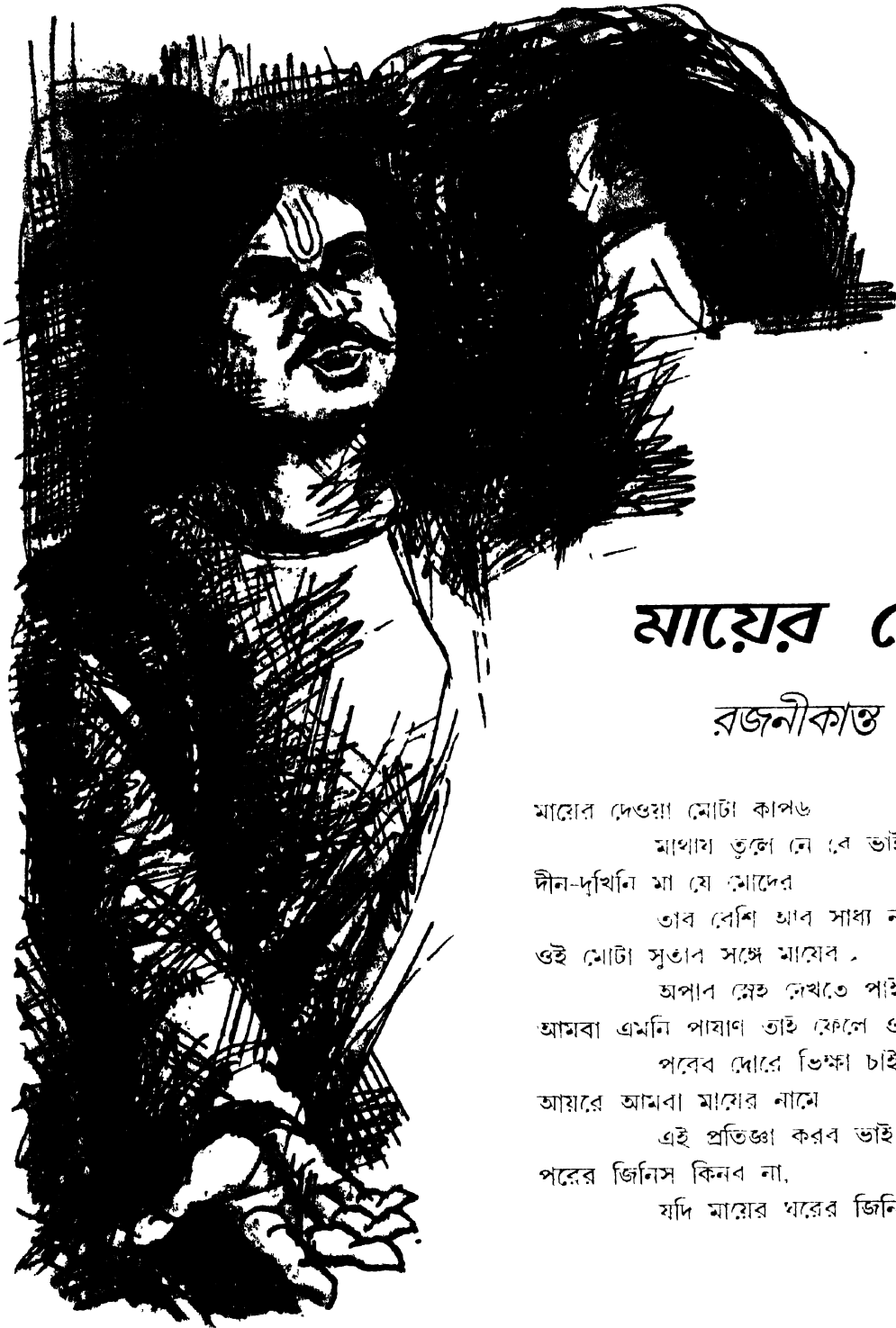
মায়ের দেওয়া

রজনীকান্ত সেন

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন-দুখিনি মা যে মোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ওই মোটা সুতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই,
পরের জিনিস কিনব না,
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

(সংক্ষেপিত)

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

মামাদের দরজায়
বাঘা থাকে এক ;
তেড়ে নাহি আসে, নাহি
করে ভেক্ ভেক্।

মামাদের পুকুরেতে
আছে বড়ো রুই ;
পশু আর মাছে মিলে
একে একে দুই।

মামাদের বাগানেতে
চরিছে হরিণ ;
দুই পশু, এক মাছ—
দু'য়ে একে তিন।

মামাদের রাঙা গোরু
কিবা রূপ তার ;
তিন পশু, এক মাছ—
তিনে একে চার।

মামাদের বানরের
কী মজার নাচ ;
চারি পশু, এক মাছ—
চারে একে পাঁচ।

মামাদের সাদা ভেড়া
উঠানেতে রয় ;
পাঁচ পশু, এক মাছ—
পাঁচে একে ছয়।

মামাদের খরগোশ
চাটে এসে হাত ;
ছয় পশু, এক মাছ—
ছয়ে একে সাত।

মামাদের পোষা মেনি
যেন বড়োলাট ;
সাত পশু, এক মাছ—
সাতে একে আট।

মামাদের রাজহাঁস
পুকুরেতে রয়,
পশু, পাখি, মাছে মিলে
আটে একে নয়।

মামাদের চাকরের
হয়েছে বয়স,
সবে তারে ভালোবাসে
নয়ে একে দশ।
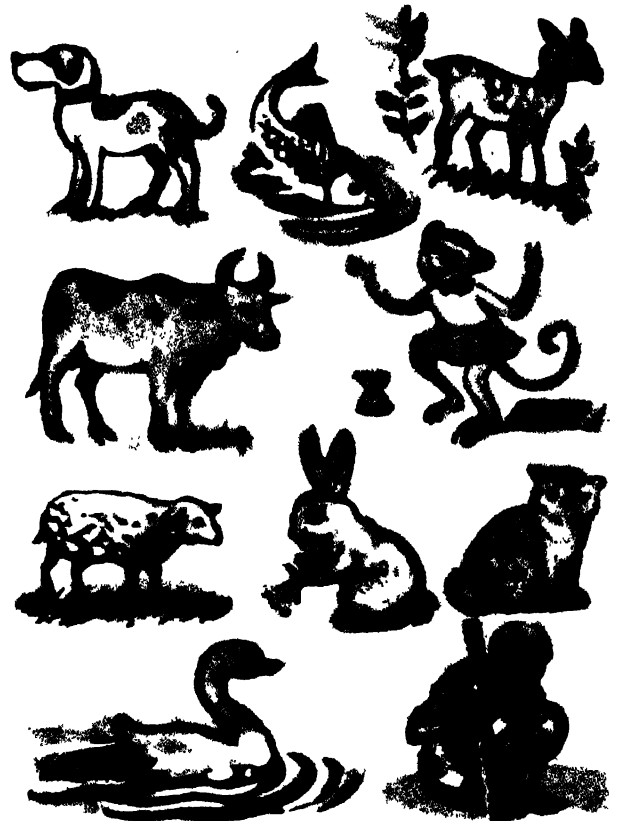
শিকল ভাঙার গান

অতুলপ্রসাদ সেন
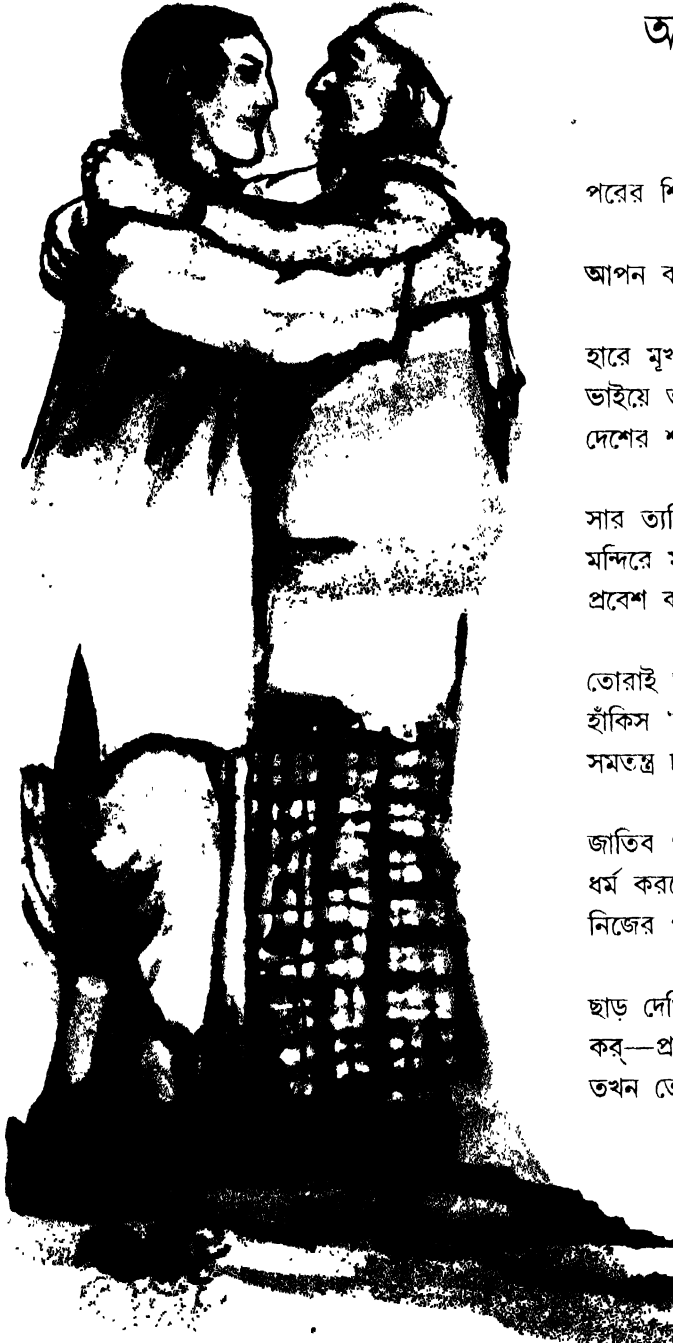
পরের শিকল ভাঙিস পরে,
　　নিজের নিগড় ভাঙ রে
আপন কারায় বদ্ধ তোরা
　　পরের কারায় বন্দি তাই।
হারে মূর্খ! হারে অন্ধ!
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব?
দেশের শক্তি করিস মন্দ
　　(তোদের) তুচ্ছ করে সবাই তাই
সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই,
মন্দিরে মসজিদে লড়াই;
প্রবেশ করে দেখ রে দুভাই
　　অন্দরে যে একজনাই! ……
তোরাই আবার সভাস্থলে
হাঁকিস 'সাম্য' উচ্চরোলে
সমতন্ত্র চাস সকলে
　　বিশ্বপ্রেমের দিস দোহাই।
জাতির গলায় জাতের ফাঁস,
ধর্ম করছে সর্বনাশ,
নিজের পায়ে পরলি পাশ,
　　দাসত্ব ঘোচে না তাই
ছাড় দেখি রে রেষারেষি,
কর্—প্রাণে প্রাণে মেশামেশি,
তখন তোদের সব বিদেশি
　　'দাস' না বলে বলবে 'ভাই'

(অংশ)
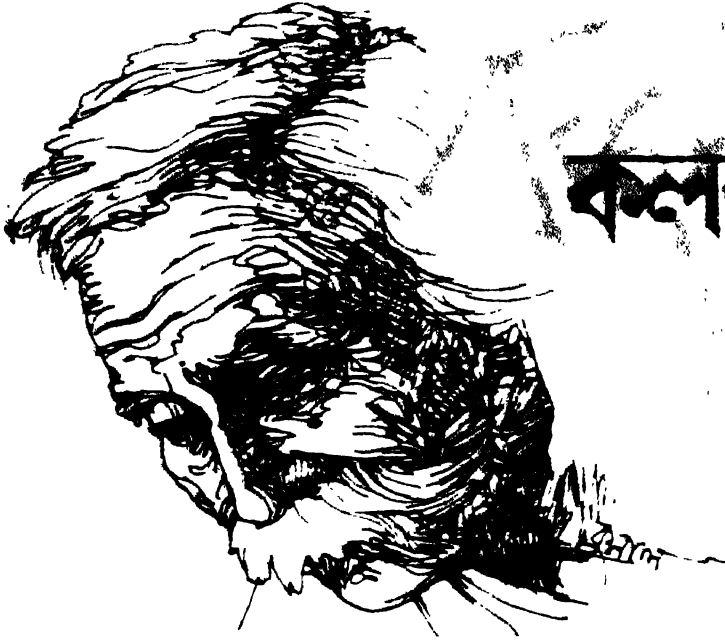
কলকাতার ভুল

দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত)

মরি হায় রে,
কলকাতা কেবল ভুলে ভরা।
সেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে
বোকায় পড়ে ধরা॥

আজকাল কলকাতাতে সব কথাতে
দেখছি ভারি ভুল,
কীবা করি ঘুরে মরি
নাই কিনারা কুল॥

ভাবলাম রাধাবাজার আছে বুঝি
শ্যামবাজারের বাঁয়ে,
দেখি শ্যাম গিয়েছে বহু দূরে
রাধার মানের দায়ে !

ভাবলাম লালদিঘিতে দেখব গিয়ে
জলটি লাল টক্‌টকে,
দেখতে গিয়ে বেকুব হয়ে
এলাম শেষে ঠকে !

নাইকো হাতি নাইকো বাগান
হাতিবাগান বলে,
বাদুড়বাগানেতে দেখি
বাদুড় নাহি ঝোলে !

নেবুতলায় গিয়ে দেখি
নেবু নাহি মিলে,
বৌবাজারের নামটা কেন
শুধু শুধু দিলে !

একটা সাঁকো নাইকো সেথায়—
জোড়াসাঁকো নাম,
সেথা দিনে-রাতে রবির উদয়
দেখে আসিলাম !

ভাবলাম সাত রাজার ধন মানিক বুঝি
মানিকতলায় থাকে,
খানিক গেলে খুঁজে ট্যাঁকে গুঁজে
পালাতাম এক ফাঁকে।

শিয়ালদহে নাইকো শিয়াল
নামটা শুধু ভুয়া
কেবল রেলের গাড়ি শ্যালের মতো
করছে হুক্কা হুয়া !

ধাঁধায় পড়ে ঘুরে ঘুরে
বেড়াই হাটে-মাঠে,
একদিন দেখতে যাব নিমের গাছটি
নিমতলার ওই ঘাটে।

(সংক্ষেপিত)

ভোলানাথের সেজ ছেলে ভজহরি ভট্ট—
বাঁশি সাধ্‌তে শিখেছিল ছিল যখন ছোট্ট।
কিন্তু—একটিমাত্র সুর ছাড়া আর বাজাতে সে জানত না—
"তাইরে নারে—তাইরে নারে—তাইরে নারে—নানত না।"

ভজহরির বাঁশি নিয়ে এমনি আওয়াজ ফুটত,
(যে) পাড়ার যত ছেলেমেয়ে ছুটে এসে জুটত!
(কেননা) এমন ধারা বাঁশি তারা বাজাতে কেউ জানত না
"তাইরে নারে—তাইরে নারে—তাইরে তারে—নানত না।"

বাঁশি ফুঁকতে ভজা এমনি চমৎকারটি পারত
(যে তার আওয়াজ শুনে চুপটি করে থাকতে কেহই নারত।
যেমনি বাঁশি শুনত, অমনি নেচে সবাই উঠত—
(এমনকী) গাধাগুলো দুপায় নেচে তার পিছনে ছুটত।

একদিন এক গয়লানি তার গাই দুইতেছিল
ভজা তখন বাঁশি নিয়ে তানটি জুড়ে দিল,
গয়লানি আর গাই—দুয়েতে উঠল নেচে শেষে,
দুধের হাঁড়ি গেল পড়ে—দুধ গেল সব ভেসে।

একদিন একটা বুড়ি, নিয়ে হাঁসের ডিমের ঝুড়ি
যাচ্ছে হাটে, অমনি ভজা বাজনা দিল জুড়ি;
বুড়ি উঠল নেচে, ডিম সব ভেঙে হল চুর,
বুড়ি উঠল রেগে—ভজা আনন্দে ভরপুর।

একদিন একটা লোক অনেক হাঁড়ি বাসন নিয়ে
যাচ্ছে একটা গাধার পিঠে বোঝাই করে দিয়ে—
(অমনি) বাঁশি হাতে নিয়ে ভজা ছেড়ে দিল তান,
বোঝা গেল কমে,—গাধা আহ্লাদে আটখান।

হোসেন মীর মোশররফ

না হয় খানিক ভুল করেছি
কেউ দিয়োনা টিট্‌কিরি
মিছরি ভেবে কাল খেয়েছি
শক্ত দানার ফিট্‌কিরি।

ছুটব আমি সরল প্রাণে পর্ণ-কুটির হতে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুটব আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে শুকতারাটি জাগবে দূরে,
কান জুড়াবে পাখির গানে সুরের মিঠে-স্রোতে ···
বুক ফুলায়ে হাল ধরিব পাল তুলিব নায়ে,
মাঝ-গঙ্গায় জাল ফেলিব উদাস আদুল গায়ে।
গাঙ্-চিলেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে
ডাকবে চাতক 'ফটিক জল' মেঘের ছায়ে ছায়ে।·····
শিল কুড়িয়ে বাঁধব 'মোয়া', লাঙল দেব ভুঁয়ে,
কড় কড় কড় ডাকবে দেয়া, আসব আমন বুয়ে।
আকাশ-ভাঙা মুষল-ধার বাঁশের ঝাড়ে কী তোলপাড় !
পাঁকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড় পড়বে নুয়ে নুয়ে।·····
কামার-শালে বসব গিয়ে রৌদ্র এলে পড়ি',
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে টানব জাঁতার দড়ি ;
ঝুলের কাছে জমবে ধোঁয়া কাঁপিয়ে 'নেয়াই' পিটব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন জুঁই—আলোর ছড়াছড়ি।

(সংক্ষেপিত)

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ নাই এ দেশে !
সকল মেকি সকল ফাঁকি
যে যার মজে আপন রসে।
দেখছি কত মস্ত (সবাই) আপন নিয়ে ব্যস্ত,
মুখখানা বড়ো মিষ্ট, অন্তর ভরা বিষে।
কথার বেলায় বৃহস্পতি, কাজে কেউ না ঘেঁষে,
বলতে গেলে এসব কথা পাগল বলে হেসে হেসে।
স্বার্থ ছাড়া কথা কয় না অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ চিনবার জো নাই বিশেষ,
যে দেশ সকল দেশের সেরা সে দেশের এমনি ধারা,
দেখে-শুনে ইচ্ছা হয় চলে যাই বিদেশে।
তবু কেবল বসে আছি খেপা-মায়ের আশে,
মুকুন্দের ভরসা আছে আসবে বেটি দেবে পিষে॥

(সংক্ষেপিত)
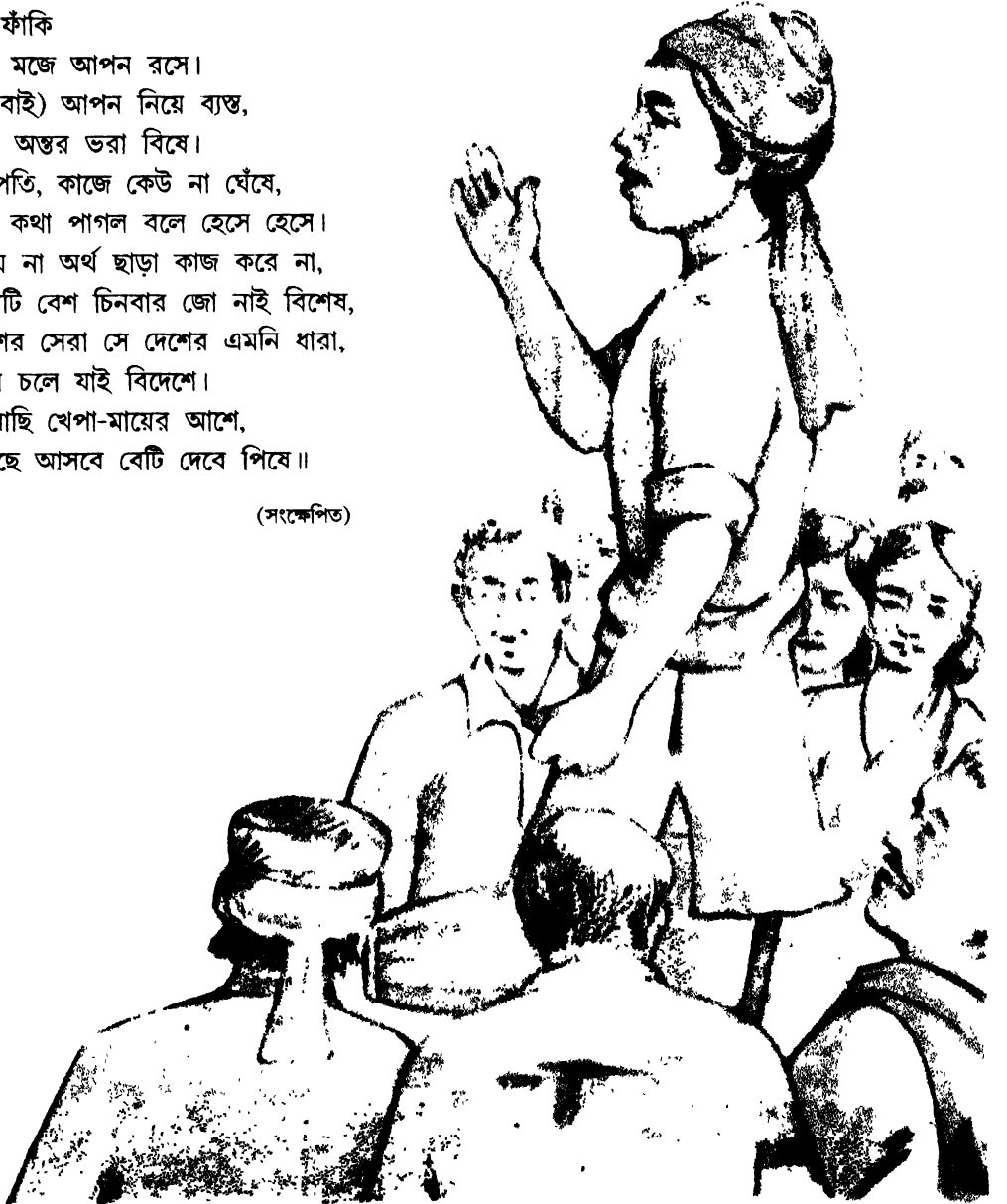
সত্যদাস

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

পণ্ডিতের পদ লভি যেদিন বসিনু বেদগ্রামে,
সেইদিন প্রাতঃকালে ছাত্র এক সত্যদাস নামে
বিদ্যা অধ্যয়ন তরে মোর কাছে দাঁড়াইল আসি !
—এতটুকু শিশু একা ! চেয়ে দেখি—দূরে আছে দাসী!

সযত্নে বসায়ে পাশে, শিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া তারে,
শুনিনু অনেক কথা সুমিষ্ট আত্মীয় ব্যবহারে ;
—পিতৃহীন, নিরুপায়, দরিদ্র সে—ওই তার ঘর ;
দাসী ভেবেছিনু যারে—মা তাহার, নহেক অপর !

মাথায় বুলায়ে হাত, প্রাণে মনে, আশীর্বাদ করি'
বিবিধ কথায় গল্পে সকল সংকোচ-শঙ্কা হরি'—
'বাড়িতে ক'জন থাক ?' শুধাইনু শিশুরে যখন,
উত্তরিল মৃদুকণ্ঠে—'বাড়িতে আমরা পাঁচজন'।

—'এই যে বলিলে আগে, ভাইবোন আর কেহ নাই—
তুমি মার এক ছেলে ! আরও তো সে তিনজন চাই !'
তেমনি মধুর কণ্ঠে কহিল সে—'মোরা পাঁচজন—
মা ও আমি, ভোলা আর রাধারানি আর নারায়ণ !'

—'বাকি তিনজন কে কে ?'—শুধাইনু পরম বিস্ময়ে ;
গণনায় ভুল ভেবে বালক রহিল চেয়ে ভয়ে !
—'রাধারানি কে আবার—অন্য কেহ বাড়িতে তো নাই ?'
সে কহিল—'আছেই তো ; রাধারানি সে মোদের গাই।'

—'ভোলা সে কাহার নাম' হাসিয়া শুধানু তার কাছে ;
—'জানেন না ? ভারি দুষ্টু—সে এক কুকুর-ভোলা আছে
—'নারায়ণ কে আবার ?'—নাম শুনি প্রণমি' চকিতে
কহিল—'ঠাকুর তিনি—মা বলেন, বাস তুলসীতে !

প্রণাম করেন নিত্য—দিনরাত ডাকেন যে তাঁরে—
পাঁচজন হল না ক' ?—কত আর বলি বারে বারে।'
'এই পাঁচজন বুঝি ?' হাসিলাম পণ্ডিতের ভানে,
অন্তরে বুঝিনু ঠিক—সত্যবার্তা শিশুতেই জানে।

(সংক্ষেপিত)

দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়-
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূব-পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ওই চর জাগছে,
বন হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পানকৌটি,
দ্যায় ডুব টুপটুপ
ঘোমটার বউটি।

ঝকঝক কলসির
বক্ বক্ শোন্ গো
ঘোমটায় ফাঁক বয়
মন উন্মন গো।

তিন-দাঁড় ছিপখান্
মন্থর যাচ্ছে
তিনজন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে ?

(সংক্ষেপিত)
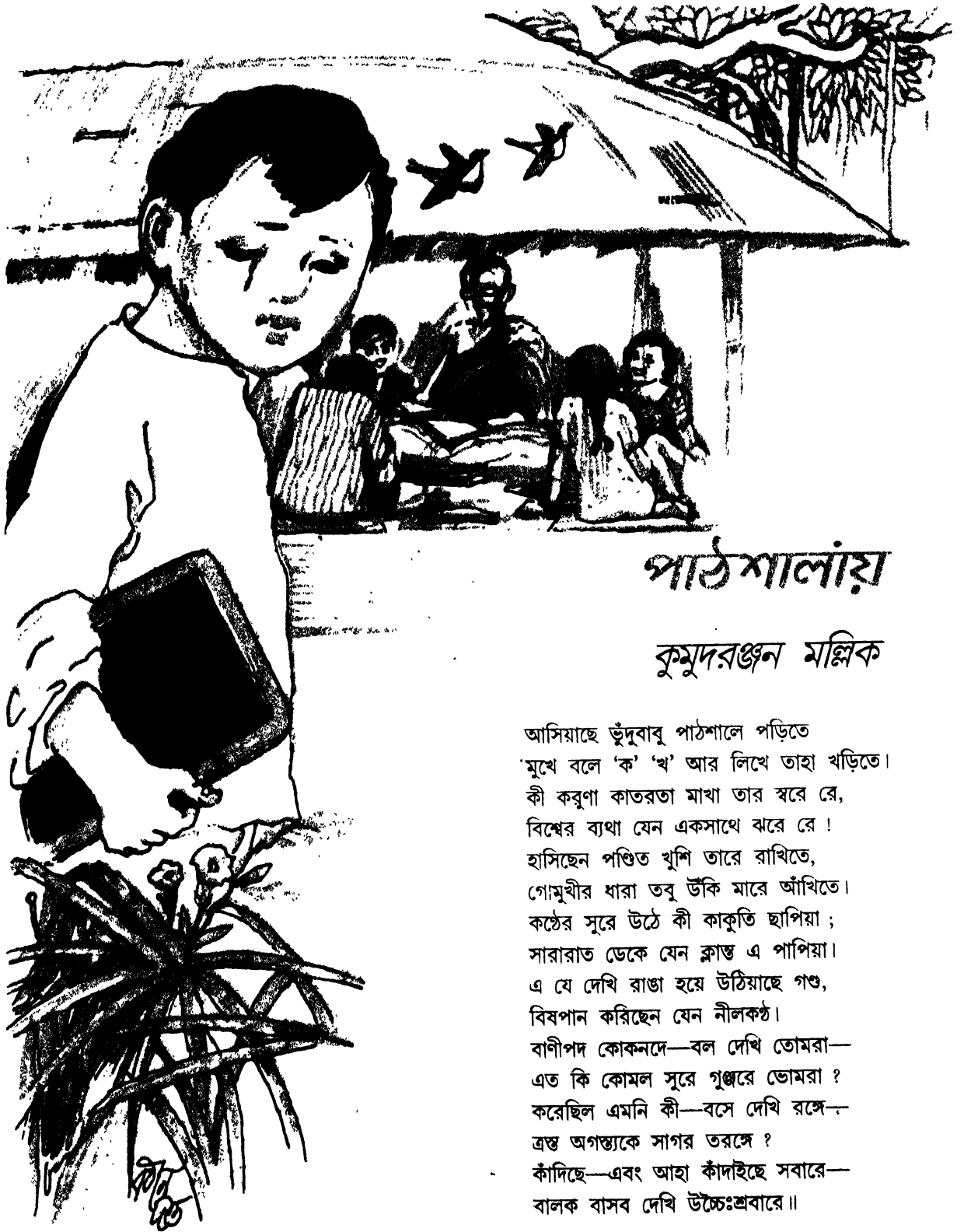
পাঠশালায়

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আসিয়াছে ভুঁদুবাবু পাঠশালে পড়িতে
মুখে বলে 'ক' 'খ' আর লিখে তাহা খড়িতে।
কী করুণা কাতরতা মাখা তার স্বরে রে,
বিশ্বের ব্যথা যেন একসাথে ঝরে রে !
হাসিছেন পণ্ডিত খুশি তারে রাখিতে,
গোমুখীর ধারা তবু উঁকি মারে আঁখিতে।
কণ্ঠের সুরে উঠে কী কাকুতি ছাপিয়া ;
সারারাত ডেকে যেন ক্লান্ত এ পাপিয়া।
এ যে দেখি রাঙা হয়ে উঠিয়াছে গণ্ড,
বিষপান করিছেন যেন নীলকণ্ঠ।
বাণীপদ কোকনদে—বল দেখি তোমরা—
এত কি কোমল সুরে গুঞ্জরে ভোমরা ?
করেছিল এমনি কী—বসে দেখি রঙ্গে—
ত্রস্ত অগস্ত্যকে সাগর তরঙ্গে ?
কাঁদিছে—এবং আহা কাঁদাইছে সবারে—
বালক বাসব দেখি উচ্চৈঃশ্রবারে॥

অমুকচন্দ্র রাজার ব্যাটা

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

অমুকচন্দ্র রাজার ব্যাটা তমুকচন্দ্রের নাতি—
দিগ্বিজয়ে চায় সে যেতে একটা পেলে হাতি।
মাহুতকে সে কইল ডেকে জলদি আনো আচ্ছা দেখে
একটা হাতি সবার চেয়ে বড়ো।
দাঁতাল হাতি কতই আছে এক-এক করে কে আর বাছে
মাহুত এনে বিশটা করে জড়ো।
অমুকচন্দ্র রাজার ব্যাটা ভাবছে—এ যে দেখছি ল্যাঠা
এই হাতিতে চড়ব কেমন করে ?
দাঁতের খোঁচা একটা দিলে বের হবে যে পেটের পিলে
তার চেয়ে যাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে।
হুকুম পেয়ে সহিস আনে আস্তাবলের রয় যেখানে
সেখান হতে সেপাইদের এক ঘোড়া।
তমুকচন্দ্রের নাতি ভাবে এ ঘোড়ায় কে চড়তে যাবে
পড়লেই দুই ঠ্যাং যে হবে খোঁড়া।
দাদুর কাছে জানায় নাতি মিললই না ঘোড়া-হাতি,
চড়ব কীসে দিগ্বিজয়ে যেতে ?
চিন্তা কী,—কয় দাদু হেসে— গাধার পিঠে চড় না এসে
এই যে আমি রয়েছি পিঠ পেতে।
অমুকচন্দ্রের ব্যাটা সোয়ার তমুকচন্দ্রের হয়ে
দিগ্বিজয়ে চলল হাতে ঢাল-তরোয়াল লয়ে।
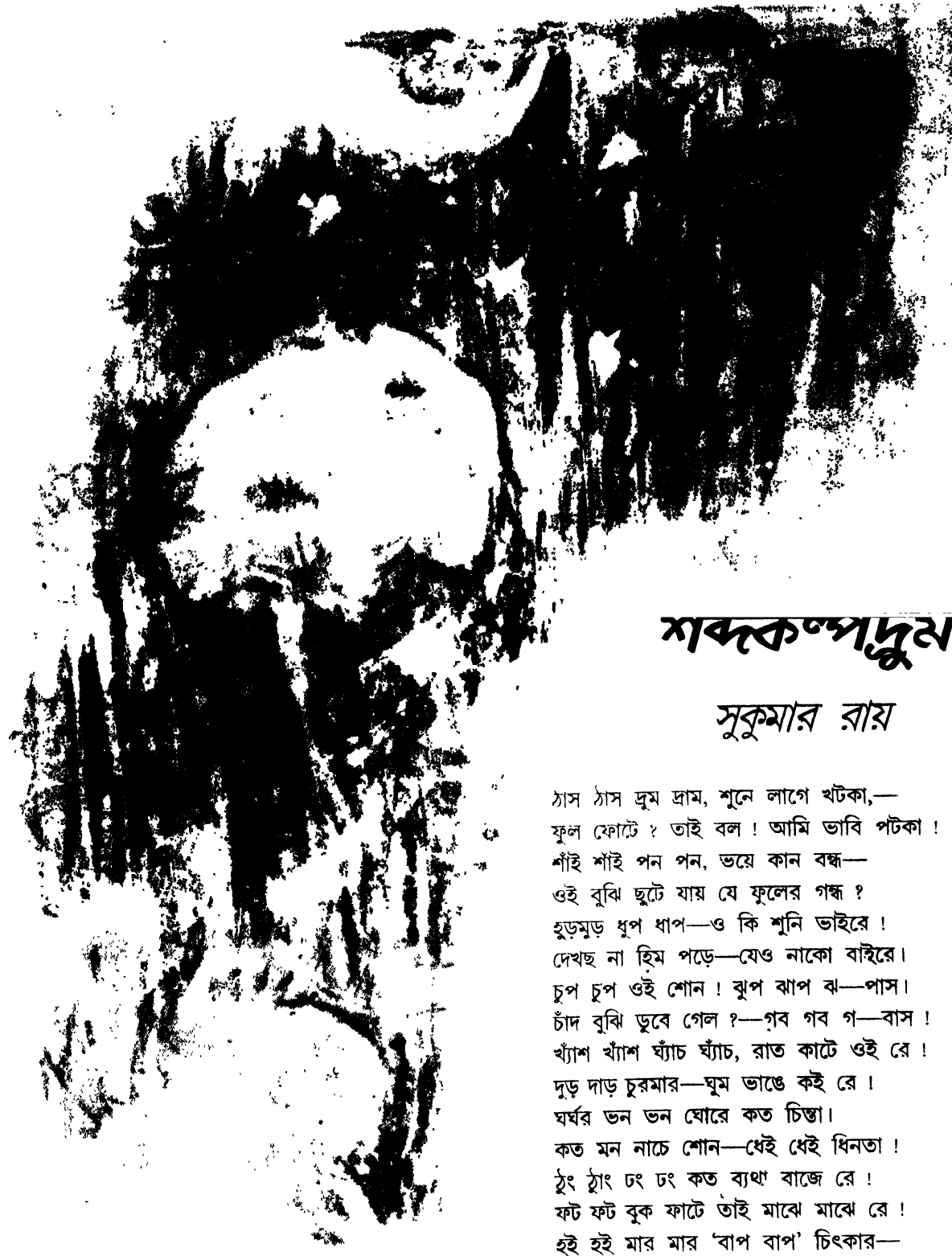
বাবুরাম সাপুড়ে

সুকুমার রায়

বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপুরে ?
আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা—
যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই, নখ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁসফাঁস, মারে নাকো ঢুঁশঢাঁশ,
নেই কোনো উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত—
সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আন তো !
তেড়ে মেরে ডান্ডা করে দিই ঠান্ডা।

শব্দকল্পদ্রুম

সুকুমার রায়

ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা,—
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পটকা !
শাঁই শাঁই পন পন, ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় যে ফুলের গন্ধ ?
হুড়মুড় ধুপ ধাপ—ও কি শুনি ভাইরে !
দেখছ না হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।
চুপ চুপ ওই শোন ! ঝুপ ঝাপ ঝ—পাস।
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ?—গ্‌ব গব গ—বাস !
খ্যাঁশ খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ, রাত কাটে ওই রে !
দুড় দাড় চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে !
ঘর্ঘর ভন ভন ঘোরে কত চিন্তা।
কত মন নাচে শোন—ধেই ধেই ধিনতা !
ঠুং ঠাং ঢং ঢং কত ব্যথা বাজে রে !
ফট ফট বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে !
হুই হুই মার মার 'বাপ বাপ' চিৎকার—
মালকোঁচা মারে বুঝি ? সরে পড় এইবার !

তরুণ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পাখিরা সব
ডাকছে ভোরে
তারই মাঝে
আমার দোরে
'তরুণ !' বলে
ডাক দিল কে ওই !

চমকে দেখি
জানলা খুলে
খোকা যাবে
ভোরের স্কুলে
বন্ধুরা তার,
বগলে সব বই।

রাতের কুঁড়ি
রাত পেরিয়ে
গোলাপ হয়ে ফুটে,

খোকা, মায়ের
কোল ছাড়িয়ে
'তরুণ' হয়ে উঠে।
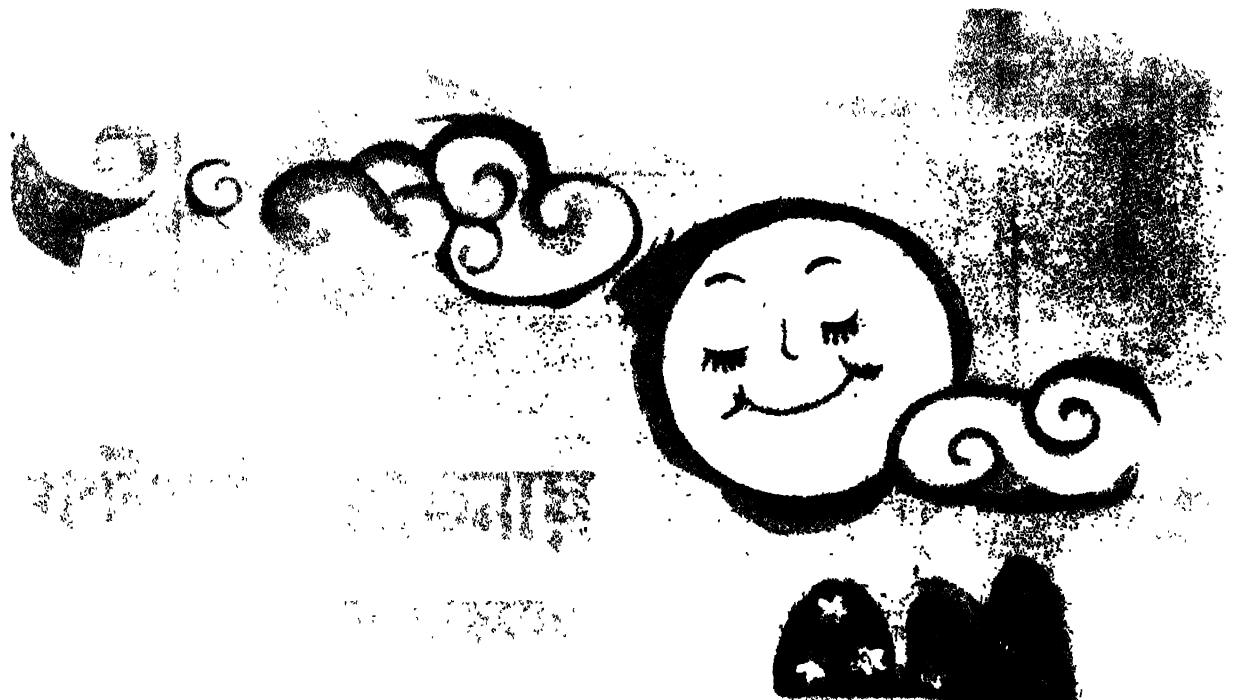
ফুটফুটে জোছনায় জেগে শুনি বিছানায়
বনে কারা গান গায় ঝিমিঝিমি ঝুমঝুম।
চাও কেন পিটিপিটি, উঠে পড় লক্ষ্মীটি।
চাঁদ চায় মিটিমিটি, বনভূমি নিঝ্‌ঝুম।
ফাল্গুনে বনে বনে, পরীরা যে ফুল বোনে।
চলে এসো ভাইবোনে, চোখ কেন ঘুমঘুম ?

কালিদাস রায়

জষ্ঠিমাসের দুপুরবেলায় সাইকেলি রিকশোতে,
চলেছিলাম বর্ধমানে রেল এস্টেশন হতে।
ঘেরাটোপের মধ্যে বসে থেকে
যাচ্ছিল চোখ ঝল্‌সে যেন সামনে চেয়ে দেখে।
দুপুরবেলায় সারা পথে নেইকো কোথাও ছায়া,
রিকশায়ালার কষ্ট দেখে হল বড়োই মায়া।
তায় শুধালাম—'হ্যাটে কেন ঢাকিস না তোর মাথা ?
দান্ডিতে তো বাঁধতে পারিস একটা ছোটো ছাতা।'

জবাব দিল একটু হেসে—'দুপুর বেলায় বাবু,
দু চার আনা ভাড়া বাড়াই, হই না তাতেই কাবু।
পেটে খেলে, পিঠে কেন, মাথায়ও সব সয়,
সুজ্যিমামা ঘামায় বটে, মামায় কি-বা ভয়॥'
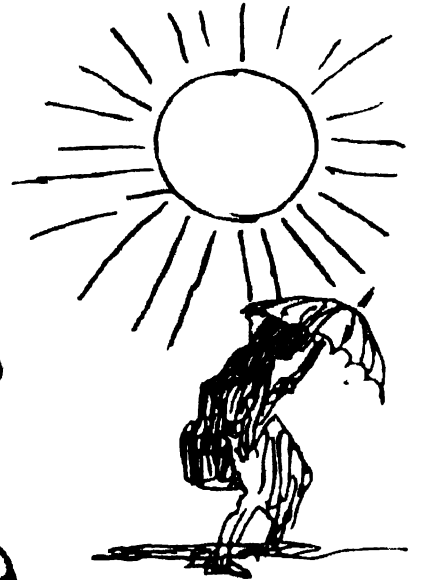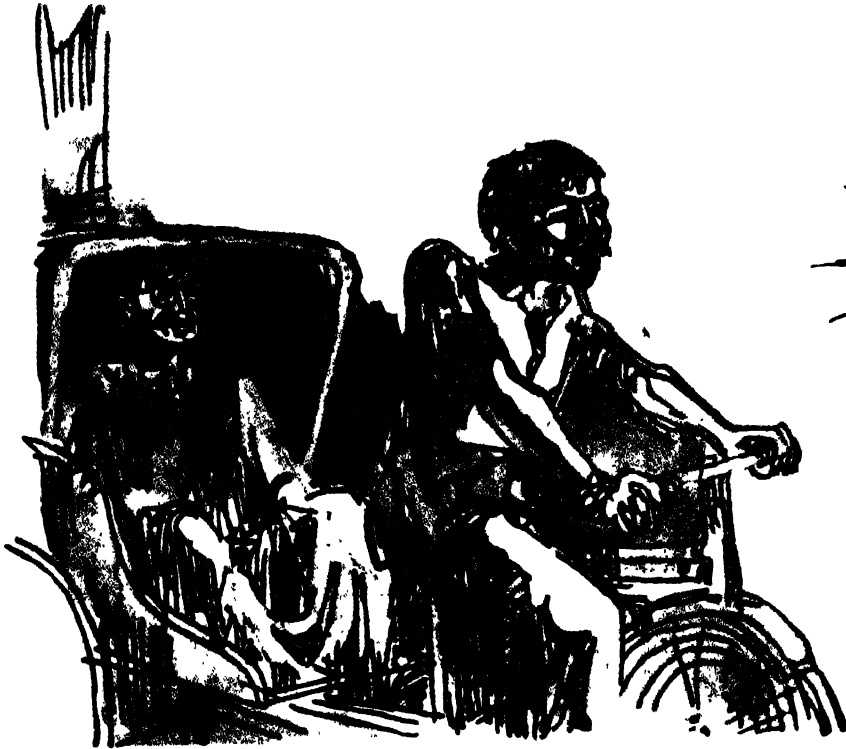
নরেন্দ্র দেব

প্রবাসী জনের প্রিয় রমণীয় রেডিয়ো
কালাদেরও কানে দিতে সংবাদ 'রেডি' ও !
তেতলার ফ্ল্যাটে খোঁজো পাবে দেখা ওখানে,
রাস্তার ধারে ধারে ছোটো-বড়ো দোকানে।
পার হয়ে চলে আসে গিরি বন নদীও,
হাটে হাঁড়ি ভাঙা ওর স্বভাবটি যদিও,
তবু ওকে ভালোবাসে দেশে দেশে বাঙালি,
রবি ঠাকুরের গান শুনতে সে কাঙালি।
এতদিন শুনিয়েছে নানা সুর সেতারে
কত কথা উপকথা নাটক সে বেতারে
যুদ্ধের হাঙ্গামা শুনি ওর খবরে
ঘুমহারা যায় কারা জীবন্ত কবরে !
রাত জেগে বসে বসে কেউ ধরি মস্কো
কেউ ধরি বার্লিন—সান ফ্রান্সিস কো !
পাশাপাশি ঘাটে পাই পৃথিবীর রেডিয়ো
ফেটে গেলে 'ভাল্‌ভ' বুঝি কী মর্মভেদী ও

কিশোর

গোলাম মোস্তাফা

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে।
সাগর-জলে পাল তুলে দে' কেউ বা হব নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মতোই বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময় এই বাঙালি নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।
কেউ বা হব সেনানায়ক গড়ব নূতন সৈন্যদল,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র ধরি, নাই বা থাকুক অন্য বল।
দেশমাতাকে পূজব গো, ব্যথীর ব্যথা বুঝব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অন্নজল।
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।
আকাশ-আলোর আমরা সুত, নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কী যে করব মোরা—নাইকো তাহার অন্ত রে !

(সংক্ষেপিত)

লিচু চোর

কাজী নজরুল ইসলাম

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কী বাস করলে তাড়া
বলি থাম, একটু দাঁড়া।
পুকুরের ওই কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না,
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড়ো কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে যেই চড়েছি
ছোটো এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোরে
পড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই,
ব্যাটা ভাই বড়ো নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুষি
একদম জোর্‌সে ঠুসি।
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়,
লাফিয়ে ডিঙ্‌নু দেয়াল
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল,
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা,
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা !
দেখে যেই আঁতকে ওঠা
কুকুরও জুড়লে ছোটা !
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড় !
'বাবা গো মাগো' বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে
ঢুকি গ্যে বোসদের ঘরে,
যেন প্রাণ আসল ধড়ে।
যাব ফের ? কান মলি ভাই !
চুরিতে আর যদি যাই
তবে মোর নামই মিছা
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা—
মালীর ওই পিটনিগুলা
কী বলিস ? ফের হপ্তা ?
তওবা—নাক-খপ্‌তা !

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে,
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ,
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়, রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—
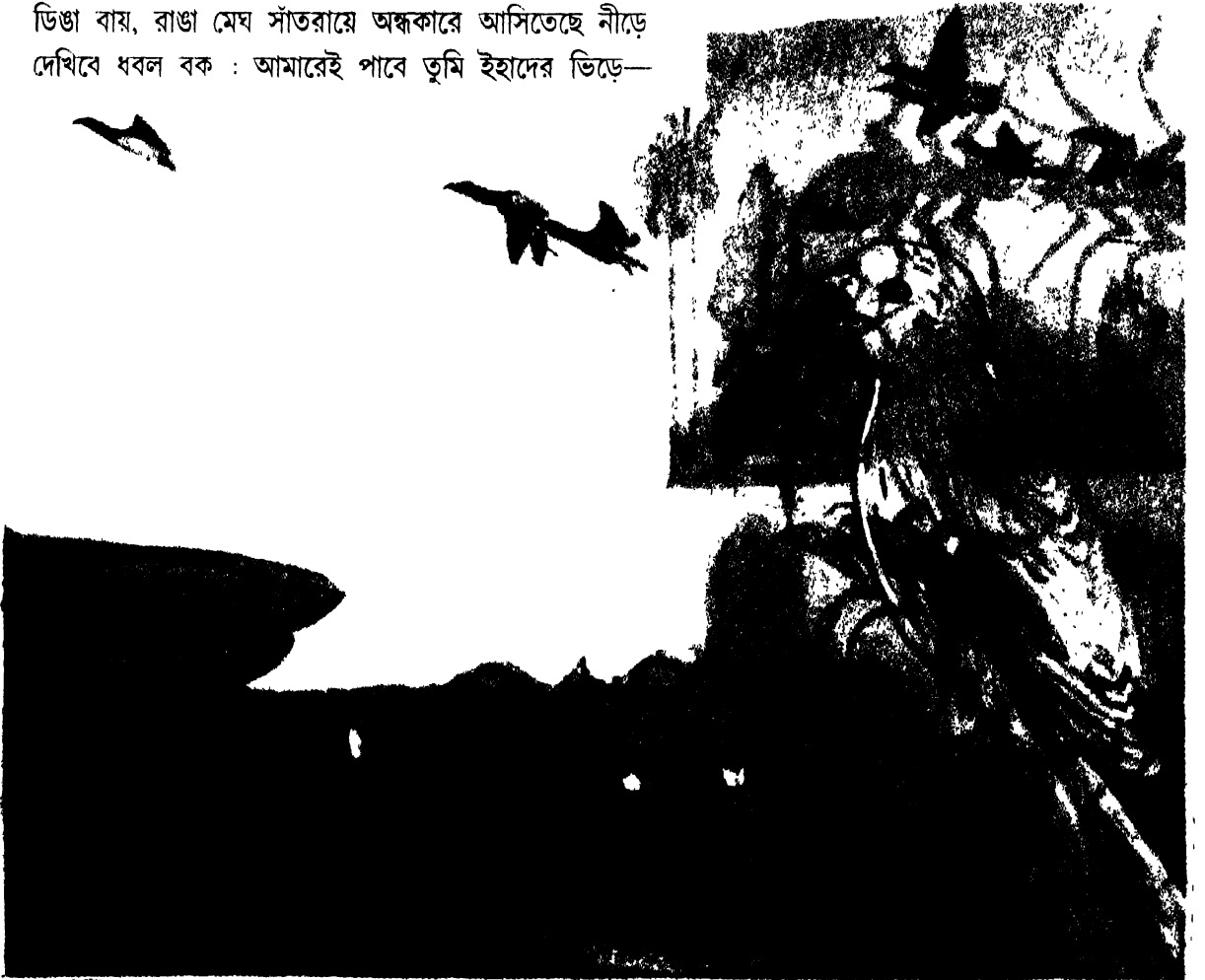
অমিয় চক্রবর্তী

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ওই ভুবন ভরে রাখুক.
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক।
ভয় করে এই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে দুঃখ নিতে।
কে জানে প্রাণ আনল কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার ভোরে কোথায় চলে নিচু
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দুর্দিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে।

পেটুক দাভের স্বপ্ন

সুনির্মল বসু

পড়তে এসে গদাইচরণ ভাবছে বসে বিকেলে
উচিত মতো ভরতে পারে পেটটা তাহার কী খেলে।
সন্দেশ কী রসগোল্লা, মুড়কি গজা কচুরি—
অথবা কী রাবড়ি পায়েস পোলাও লুচি প্রচুরই।
কতরকম আসছে মনে —কোনটা যে ছাই খাবে সে—
ভাবতে গিয়ে তন্দ্রা এল, পড়ল ঢুলে আবেশে।
স্বপ্ন এল চোখটি মুদে দেখল গদা ঘুমিয়ে— —
এসেছে সে বড়ো নতুন নতুন রকম ভূমি এ।
চারিদিকে গাছ গাছির সারি [illegible] রাস্তা,
পথের ধারে [illegible] গাছে ঝুলছে খাজা খাস্তা।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সন্দেশেতে [illegible]
[illegible] কোথা কি [illegible]

ক্ষীর-দিঘিতে পদ্ম ফোটে টকটকে লাল পানতো
পদ্মপাতা ফুলকো লুচি—-কাঁপছে অবিশ্রান্ত।
দই পায়েসের ভাবন স্রোতে ভরছে নালা বিলটা-
দেখে শুনে অবাক গদাই,—বড্ডোই খুশি দিলটা।
ভাবল আগে স্নানটা সারি তার পরেতে শেষটা
ইচ্ছামতো খাবার খেয়ে ভরতে হবে পেটটা।
ক্ষীর দিঘিতে সেই নেমেছে সারবে বলে স্নানটা
কোত্থেকে এক সেপাই এসে ধরল তার কানটা
লাফিয়ে উঠে গদাইচরণ দেখলে জেগে তাকিয়ে
মাস্টার তার কান ধরেছেন—-চক্ষু দুটি পাকিয়ে।
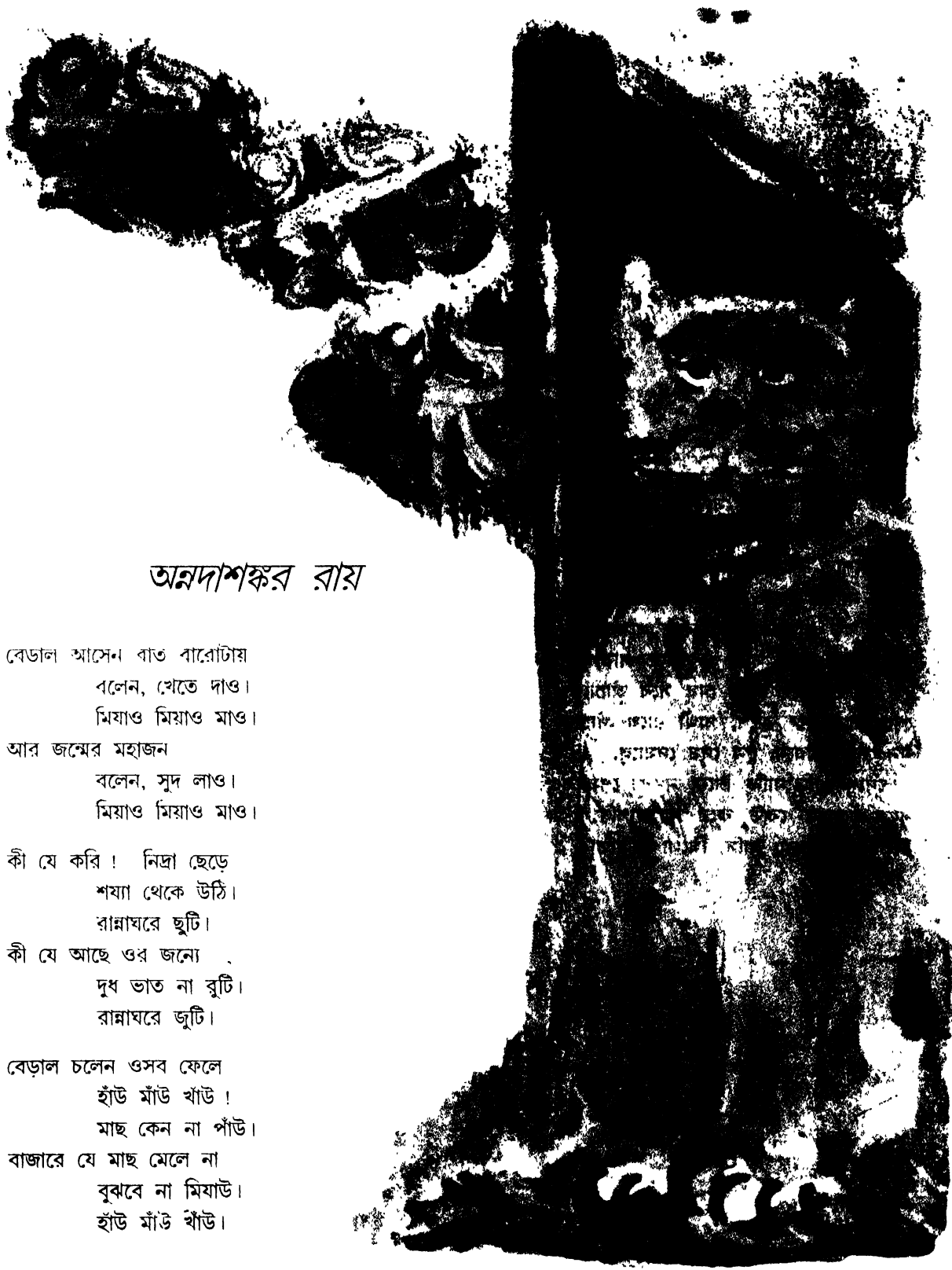
চাষির ছেলে

জসীমউদ্দীন
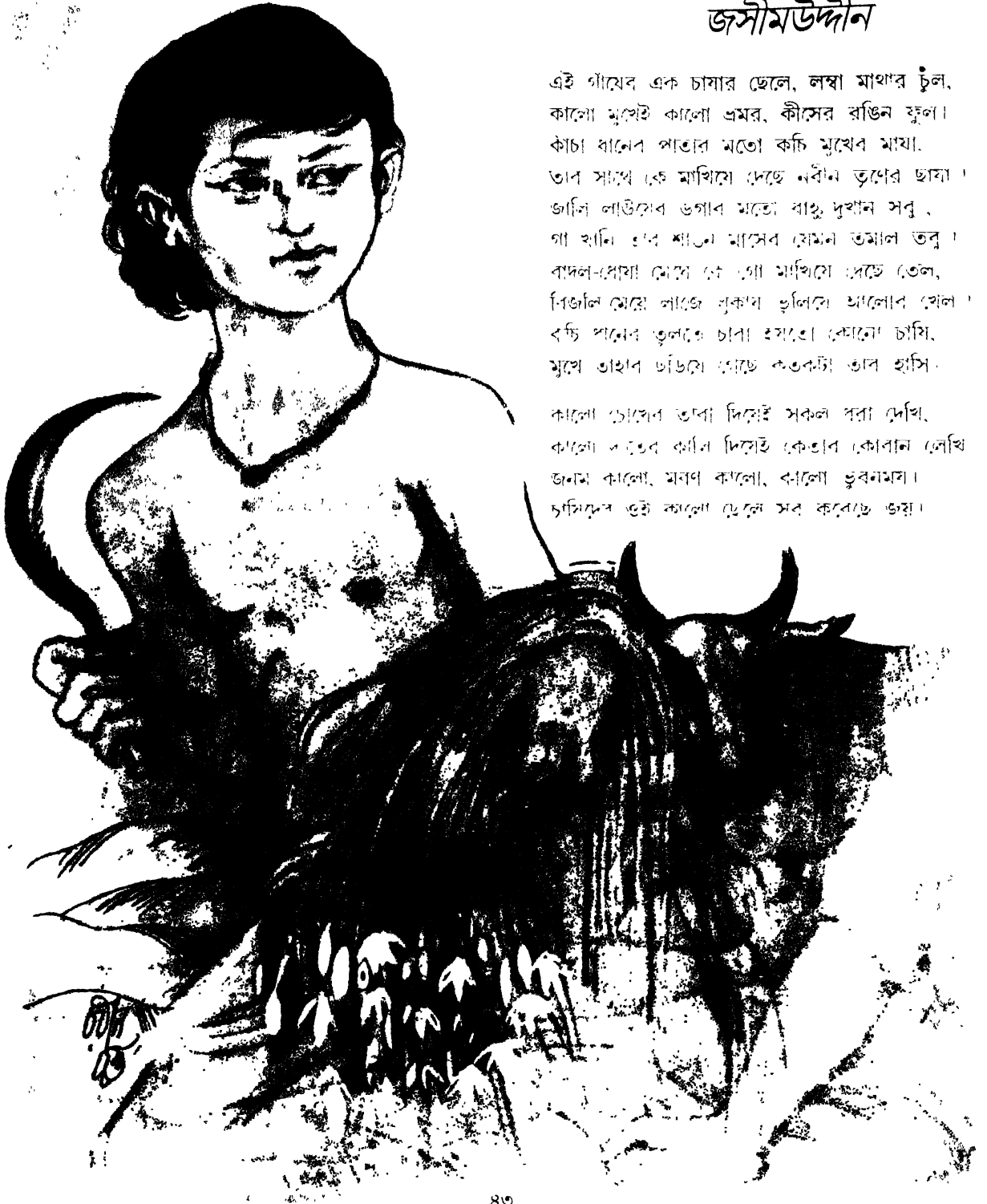
এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কীসের রঙিন ফুল।
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলি মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি,
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়।
চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

বেড়াল আসেন রাত বারোটায়
বলেন, খেতে দাও।
মিয়াও মিয়াও মাও।
আর জন্মের মহাজন
বলেন, সুদ লাও।
মিয়াও মিয়াও মাও।

কী যে করি ! নিদ্রা ছেড়ে
শয্যা থেকে উঠি।
রান্নাঘরে ছুটি।
কী যে আছে ওর জন্যে
দুধ ভাত না রুটি।
রান্নাঘরে জুটি।

বেড়াল চলেন ওসব ফেলে
হাঁউ মাঁউ খাঁউ !
মাছ কেন না পাঁউ।
বাজারে যে মাছ মেলে না
বুঝবে না মিয়াউ।
হাঁউ মাঁউ খাঁউ।

নাটোরে

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হাটো ভাই হাটোরে, যেতে হবে নাটোরে ;
খাসা করে কাটো চুল, দাড়ি গোঁফ ছাঁটোরে !
সে দেশেতে কানে নাকি পায় সবে শুনতে,
তাঁতি নাকি ডাকে নাকো ধুতি শাড়ি বুনতে।
লোক বড়ো ধড়িবাজ, কড়িকাঠ খায় না,
বড়ি দিতে ছাতে যায়, পুকুরেতে যায় না !
সে দেশেতে ভাত খেয়ে চায় সবে আঁচাতে,
গোয়ালেতে গোরু রাখে, পাখি রাখে খাঁচাতে
নুন দেয় ব্যান্ননে, চুন দেয় দেয়ালে,
সে-দেশে গাড়ি নাকি টানে নাকো শেয়ালে।
রাত্রে ঘুমোতে কেউ করে না আপত্তি,
চলো ভাই দেখে আসি, মিথ্যে না সত্যি !

বন্দে আলি মিঞা

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে,— নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহো করি,
পিতা মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।
আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচায়েছে প্রাণ।
মাঠ ভরা ধান আর জলভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আম গাছ জাম গাছ বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে—
পাখি ডাকে বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।
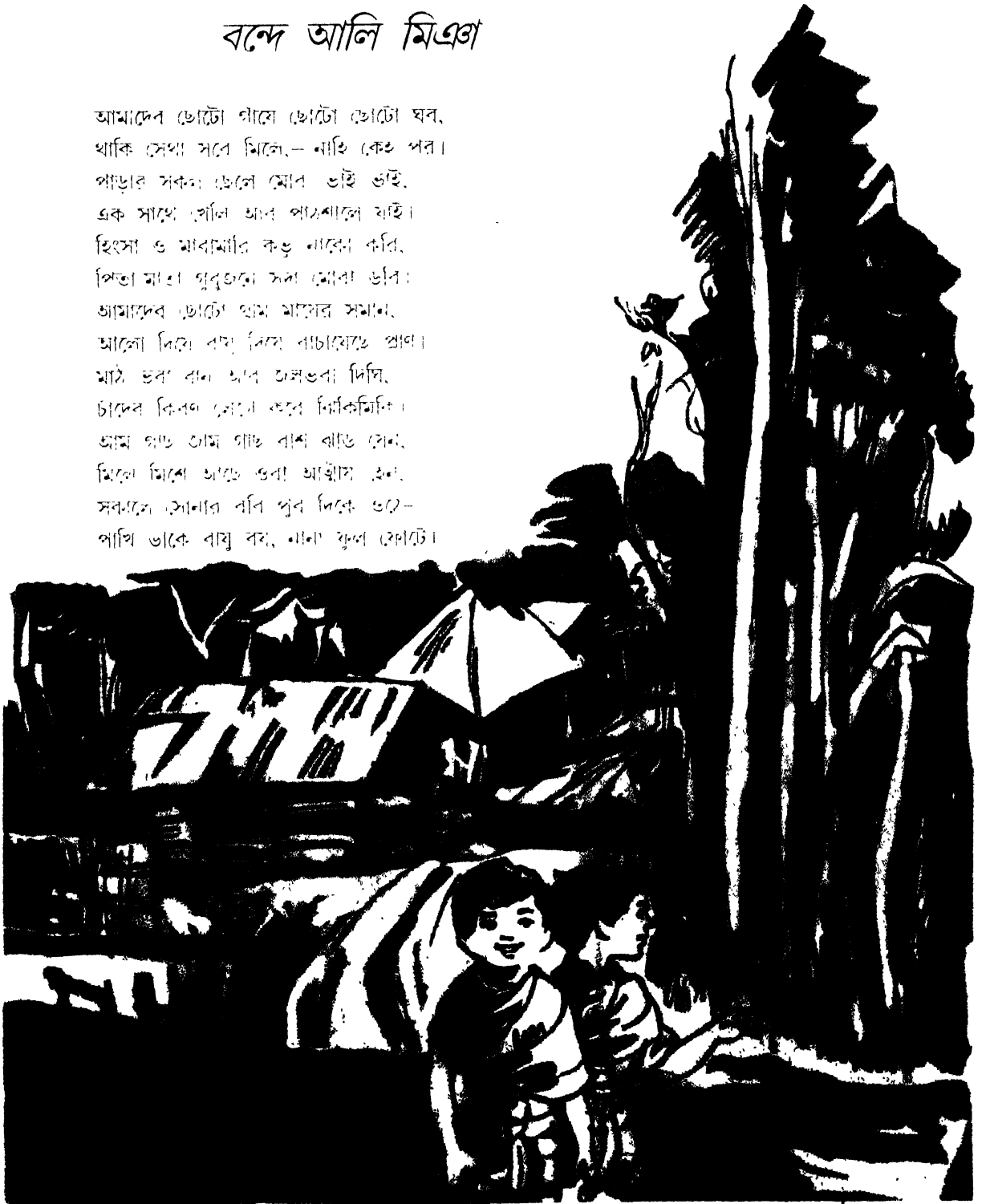
বিষ্ণু দে

চম্পা। তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুল বাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার।
বিরাট বাংলাদেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই---
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে!

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলাদেশ
কত না শাঙন রজনী পোয়াল বলো।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও।

তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষক নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকাশানে,
ভাটিয়ালি গানে, কপিলমুনির দ্বীপে ;
কলিঙ্গে আর কঙ্কনে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।

(প্রথম তিনটি স্তবক)

হুলস্থুল

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

"তেরে না দেরে না দেরে দ্রিম্ তানা দেরে না"
প্যালারাম গান গায় কাছে কেউ ভেড়ে না।
"দ্রিমিকি দ্রিমিকি দেরে"
গায় প্যালা গলা ছেড়ে
"তাধিন্ তাধিন্ তানা ধিন্ তানা তেরে না"—
প্যালাবাম গান গায় কাছে কেউ ভেড়ে না।

প্যালারাম গান গায়, কেনা করে সংগত ;
দাদ্‌রা কার্‌ফা তালে হরেক রকম গৎ—
এও যত গলা ছাড়ে
ওর চাঁটি তত বাড়ে
সম লয় বোল তালে চলে জোর কসরত—-
গান গায় প্যালাবাম, কেনা করে সংগত।

এ চায়—ও হার মানে, ও চায়—এ হেরে যায় ;
দুজনার জেদ ক্রমে পলে পলে বেড়ে যায়।
হেনমতে শেষাশেষি,
বেড়ে ওঠে রেষারেষি
সংগীত থেমে যায় শুরু হয় যুদ্ধ,
হুল্লোড় তোলপাড় সারা পাড়াসুদ্ধ !

প্যালাকে ধরিয়া কেনা মারে তিন গাঁট্টা,
প্যালাও কেনার পিঠে চাট্ মারে আটটা,
বাঁয়া ডাঁয়া তানপুরো
তছনছ গুঁড়ো গুঁড়ো ;
চেয়ারের পায়া ভাঙে ভেঙে যায় খাটটা—
পুলিশ আসিয়া পড়ে ঈয়া গালপাট্টা।

কেনা কয়, "প্যালা আর গানে কাজ নাই রে,
প্যালা কয়, "কেনা ঠিক বলেছিস ভাই রে।
হয়ে গেছে বাড়াবাড়ি,
চল যাই তাড়াতাড়ি
হোটেলেতে গিয়ে চপ কাটলেট খাই রে"—
হতাশ পুলিশম্যান চলে যায় বাইরে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ডুম ডুম ডুম ঢোল-ডগরে যেমনি পড়ে ঘা
  হাহা হাহা হা !
দত্যিদানো হিংসুটেরা পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ;
মাটির মায়ের তাগড়া জোয়ান সন্ততিদের ত্রাসে।
  হোহো হোহো হো !
মারের চোটে ডিগবাজি খায় বেনিয়া ছেড়ে গাঁ।
    সহজ প্রাণের স্বচ্ছ সরল হাওয়ায়
    দ্বন্দ্ব ঘোচে লোকের চাওয়ায় পাওয়ায়
      ছল-চাতুরী ঠকবাজি যায় ঘুচে,
    নতুন আলোয় জীবন জাগে ঘাম-রক্ত মুছে।
লক্ষ বুকের লক্ষ বাহুর চৌতালে চৌদুন,
ঢোল-ডগরের আওয়াজ শোনো ডুম ডুম ডুম ডুম !

ডুম ডুম ডুম ঢোল-ডগরে যেমনি পড়ে ঘা
  হোহো হাহা হা !
উৎপাদনে উন্নয়নে হাজার বাজার-হাট
সুসজ্জিত পণ্যে ভরা গজায় দোকান পাট।
  ডুম ডুম ডুম ডুম—
ঘুমের দেশের বাসিন্দাদের সবার ভাঙে ঘুম।
    বিকিকিনি গন্ডগোলে
    নানান দামের আওয়াজ তোলে
      রং-বেরঙের দেশ-বিদেশের মানুষ
ভোরের আলোয় শূন্যে ওড়ায় লাল টুকটুক ফানুস !

ডুম ডুম ডুম ঢোল-ডগরে যেমনি পড়ে ঘা
  গাঁয়ের পরে গাঁ—
সবুজ খেতে সোনার ফসল ফলায় চাষির হাতে,
লক্ষ্মীমায়ের শঙ্খ বাজে কো-জাগরী রাতে।
  কে জাগে ? কে জাগে ?
বর নেবে কে ? অভয় আশিস ? প্রাণের অনুরাগে
    নদীর ঘাটে সপ্তডিঙা
    বাজায় বাঁশি বাজায় শিঙা
      হংসমুখী-মকরমুখীর ভিড়ে
শিহর জাগে সাগর-জয়ের সুখের স্বপ্ন-নীড়ে।

অশোক বিজয় রাহা

এক যে [illegible] গা[illegible]
সন্ধে হলেই দু হাত তুলে জুড়ত ভূতেব নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গরগর
বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবাব যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায় বা সে ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ !
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কী যে,
ভেবে পাইনে নিজে ;
সকাল হল যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রুপালি এক ঝালর !

কুণ্ডুবাবুর গুণ্ডা বেড়াল

সুলতা সেনগুপ্ত

কুণ্ডুবাবুর গুন্ডা বেড়াল করলে কারা চুরি ?
কলকাতাতে জন্মায়নি সেই বেড়ালের জুড়ি
মুখখানি গোল চাঁদের মতো, লেজটি মেটে মেটে
জমিন্দারেব চালে-চালে বেড়ায় হেঁটে হেঁটে
পাড়ার লোকের হেঁসেলগুলো—
সব ছিল তার দখলে
গুন্ডা বেড়াল, ষণ্ডা হুলো—
ডাকত পাড়ার সকলে
ওর জন্যই নিত্যি হত পাঁচশো পুঁটি রান্না
গুন্ডাহারা-কুণ্ডুমাসির থামছে না তাই কান্না।

* * *

কুণ্ডুবাবুর অঢেল টাকা,—
কাবুল, ইরান, দিল্লি, ঢাকা—
খবর ছাপে দুপুর রাতে
কাগজগুলির প্রথম পাতে।

* * *

জবাব দিলেন দিল্লি—
ট্রেনে বা ট্রাকে, প্লেনে বা ডাকে
পৌঁছোয়নি বিল্লি।
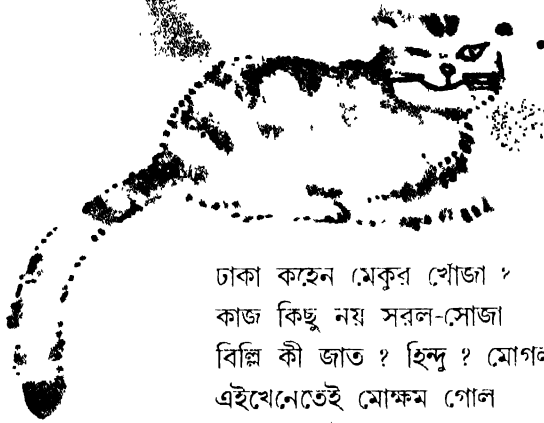
ঢাকা কহেন মেকুর খোঁজা ?
কাজ কিছু নয় সরল-সোজা
বিল্লি কী জাত ? হিন্দু ? মোগল ?
এইখেনেতেই মোক্ষম গোল
ডাকত সবাই কোন্ বা নামে,
বাস আছিল কার মোকামে ?
খাইত কী বা, দুধ না গোবু ?
অর হারেমে কযডা জোবু
এসব খবর পাইলে সিধা
বিড়াল খোঁজার হয় সুবিধা।
খবর শুধায় কাবুল, ইরান
গায় ছিল কোন্ রঙের পিরান ?
কুণ্ডুবাবুব ঘরের তথা
বেড়াল বিনা নেইকো কথা।

বিং-রিং-রিং, দেড়েল কসাই
ফোন করে কন, "কুণ্ডু মশাই,
দিন-কাল যা—তার কি করণ ?
মুই করিছি বিড়াল হরণ
জ্যান্ত দিমু পাইলে টাকা
ক্ষান্ত দিবেন পুলিশ ডাকা।
গড়ফা পুলের গাঁদাল ঝাড়ে
থোবেন টাকা পাঁচ হাজারে
বিল্লি পাবেন, খোদার কসম
পয়সা না হয় অ্যাটটাও কম।"

* *

এর পরে কী ? কুণ্ডুবাড়ি
চুলোয় আবার চাপ্‌ল হাঁড়ি
বসল ভিয়েন, নামল হাঁড়া
মিষ্টি খেলে বেবাক পাড়া
গুন্ডা বলে, "ম্যাঁও-ম্যাঁও-ম্যাঁও
নাও কোলে নাও, নাও কোলে ন্যাও।"
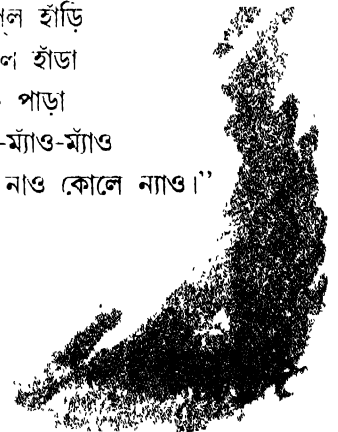
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আমরা ঘাসের ছোটো ছোটো ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
ছিঁড়ো না নরম পাতা।
শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা॥
ধরার বুকের স্নেহকণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি।
রূপকথা-নীল আকাশের বাঁশি
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

বক

হরেন ঘটক

ওরে বক এত শখ
হল কোথা থেকে।
বাবাজি সাজিস কেন
ডোবা নালা দেখে ?

ধ্যানে খাসা বসে যাস
তুলে এক ঠ্যাং
বাগে পেলে ধরে খাস
পুঁটি চেলা চ্যাং।
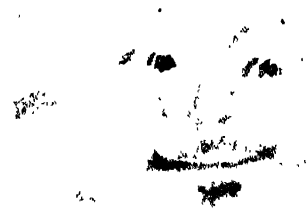
চোখ তোর খাড়া হয়
টিকি হয় টান,
কুচো মাছ কাছে গেলে
ভাঙে তোর ভান।

মুনি বটে মনে হয়
দেখে লক্ষণ
আসলে তো খপ করে
মাছ ভক্ষণ।

খুকু গেছে মামাবাড়ি

ধীরেন বল

শহর থেকে খুকু গেছে মামাবাড়ি তার,
ঘুরে ঘুরে গ্রামের অনেক করছে আবিষ্কার।
পাড়ার ছেলে-মেয়ের সাথে ফিরছে বাড়ি বাড়ি,
মেঠো পথে জংলা পথে দিচ্ছে খুকু পাড়ি।
ডালে বসে ডাকছে ঘুঘু, দোয়েল কেমন নাচে,
কোন্ বাগানে ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে গাছে !
চরছে গোরু মাঠের মাঝে, হাঁস নেমেছে জলে,
করছে খুকু ছুটোছুটি সেথায় কুতূহলে !

খানিক বাদেই পুকুর ঘাটে উঠল মহা গোল—
চেঁচায় সবে—ডুবল খুকু, ঝাঁপিয়ে পড়ে তোল !
অল্পে খুকু রক্ষা পেল, কাছেই ছিল রামা,
নইলে কী যে ঘটত ভাব—অথই জলে নামা !
মা শুধোলেন,—খুকু তুমি নওকো বোকা হেন,
না শিখতেই সাঁতার—জলে নামতে গেলে কেন ?

খুকু বলে,—অল্পই জল, সাহসভরে তাই
একটুখানি যেই নেমেছি, থই সেখানে নাই !
আমি তো মা, দেখতে পেলাম পাতিহাঁসের দল
বেড়াচ্ছে বেশ, তাদের মোটে বুক অবধি জল !

বাংলার বন্যা
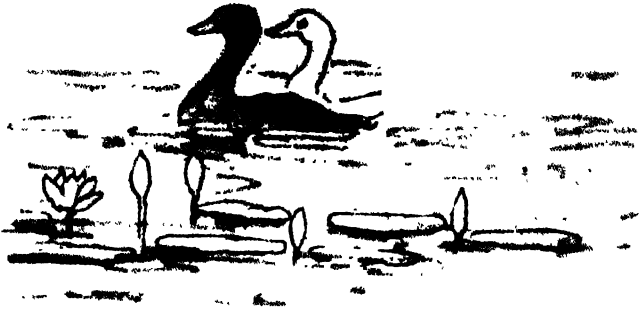
দিনেশ দাস

তোমরা কি চুপচাপ ?

দূরে ওই দেখছ না
আকাশের লাঞ্ছনা ?
ওড়ে ওই ছেঁড়া কালো উড়নি।
এলোমেলো
ঝড় এল ঝড় এল,
ঘুরপাক খায় লাখো ঘূর্ণি।
ঘর ভাঙে ঝুপঝাপ---
তোমরা কি চুপচাপ ?
ঢেউয়ের মতোই জল মোচড়ায়,
উঠে আছড়ায় পাছড়ায়
পাল নামে হাল ভাঙে
ছেঁড়ে কাছি অস্থির ;
পড়ে তির ওড়ে নীড় চৌচির
শহরের আড়ালেতে জমে ঘুম ;
তোমরা কি চুপচাপ নিঝ্‌ঝুম ?
কান্না !
পালকের মতো বুক
ধুকপুক ধুকপুক
অসহায় কাতরায় হাতড়ায়।
পিষে যায় মিশে যায়
ছোটো ছোটো কচি মুখ
ছোটো ছোটো চুনি আর পান্না---
প্রাণ বলে, আর না ! আর না !
ঘট ভাঙে পট ভাঙে দুপদাপ।
তোমরা কি চুপচাপ ? চুপচাপ ?

একে একে তারা ফোটে রাত্রে
ভরে ওঠে আকাশের পাত্র,
ওদের মতোই কতো
চকচকে লাখো ক্ষত
আঁকা হল এ মাটির গাত্রে,
জানলে কি তার কণামাত্র ?
রাতের শিশির কাঁদে চুপচাপ,
তোমরা কি চুপচাপ,
এখনও কি চুপচাপ ?
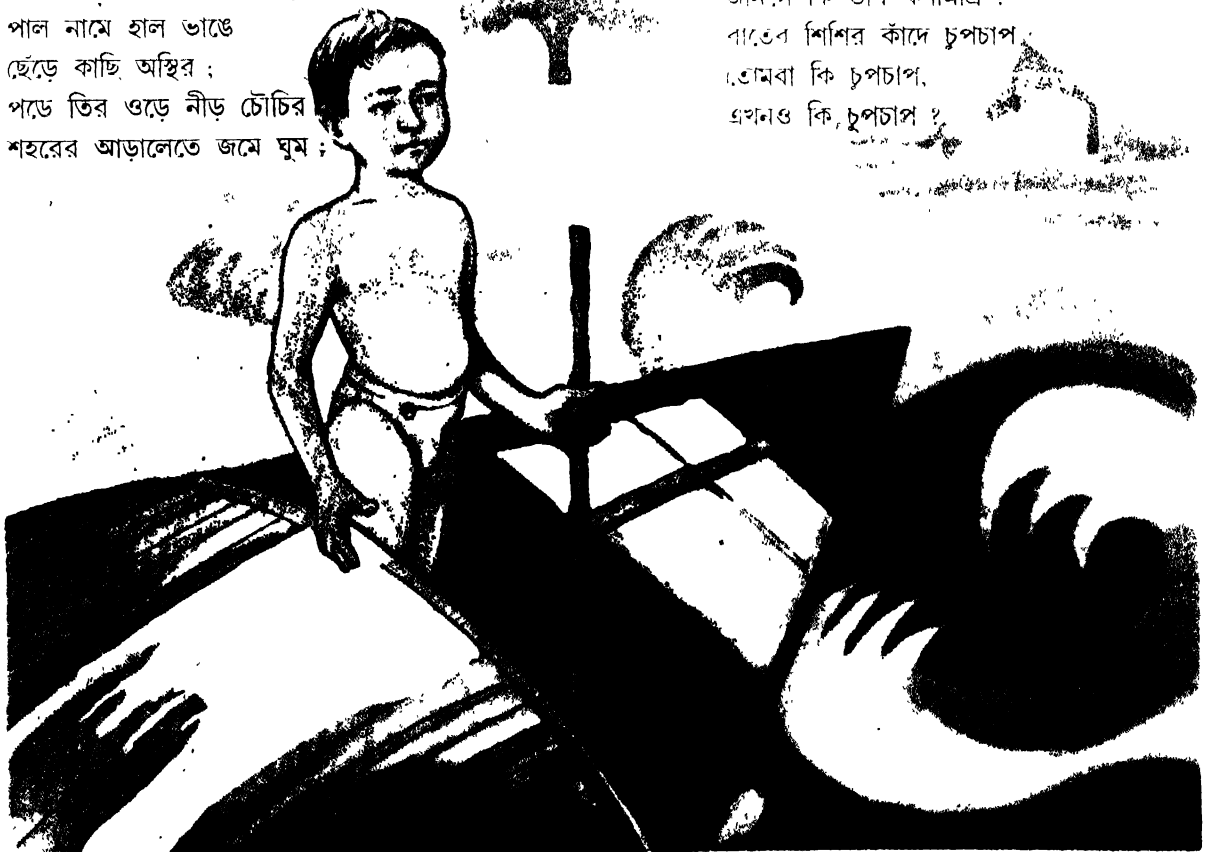
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পাগলা কুকুর পাড়ায় ঘোরে সবাই দিশেহারা,
কখন কাকে কামড়ে দেবে আতঙ্কিত পাড়া।
পঞ্চু হাবুল ভবত লোটন ভাবছে, আহা—এই বা কেমন,
কেউ পারে না কুকুর মেরে দিতে ?
এইভাবে কি কাটবে বছর কাঁপবে ত্রাসে কণ্ঠস্বর
গ্রীষ্ম এবং শীতে।
এমনি যখন ভাবছে সবাই কী করি আর কোন্ দিকে যাই
এমন সময় সবাইকেই অবাক করে দিয়ে,
ঘোষবাবুদের বাগান-মালী নিঝুম পথে বনমালী
ছুটল কোথায় ফুলের ডালা নিয়ে ?
ঝড়ের বেগে এল কুকুর তীক্ষ্ণ দাঁত, লালা প্রচুর
হায় হায় হায় উঠল কলরব,
ভূলুণ্ঠিত বনমালী ছিট্‌কে পড়ে ফুলের ডালি
মুহূর্তেই সাঙ্গ হল সব।
পাড়ার লোকে দৌড়ে এসে হাসপাতালে পাঠায় শেষে
বনমালী মরেনি একেবারে।
ভাবছে সবাই : আর কতো দিন টিকবে নেহাত দিন দুই-তিন
এসব অসুখ কখনও কি সারে ?
পাগলা কুকুব সেই যে উধাও খোঁজ পেল না কেউ কোথাও
বনমালী নীরোগ হতে থাকে ;
সবাই অবাক, রুগি শেষে হাসপাতালের বাইরে এসে
সুস্থ দেহে নিজের কাজে লাগে।
অন্যদিকে এল খবর : পাগলা কুকুর পথের উপর
মরে পড়ে আছে ;
মানুষ বাঁচে কুকুর মরে মানুষ এত বিষও ধরে !
হাবুল বিনু সবার কাছে খবরটাই জবর !

(সংক্ষিপ্ত)

রবিদাস সাহা রায়
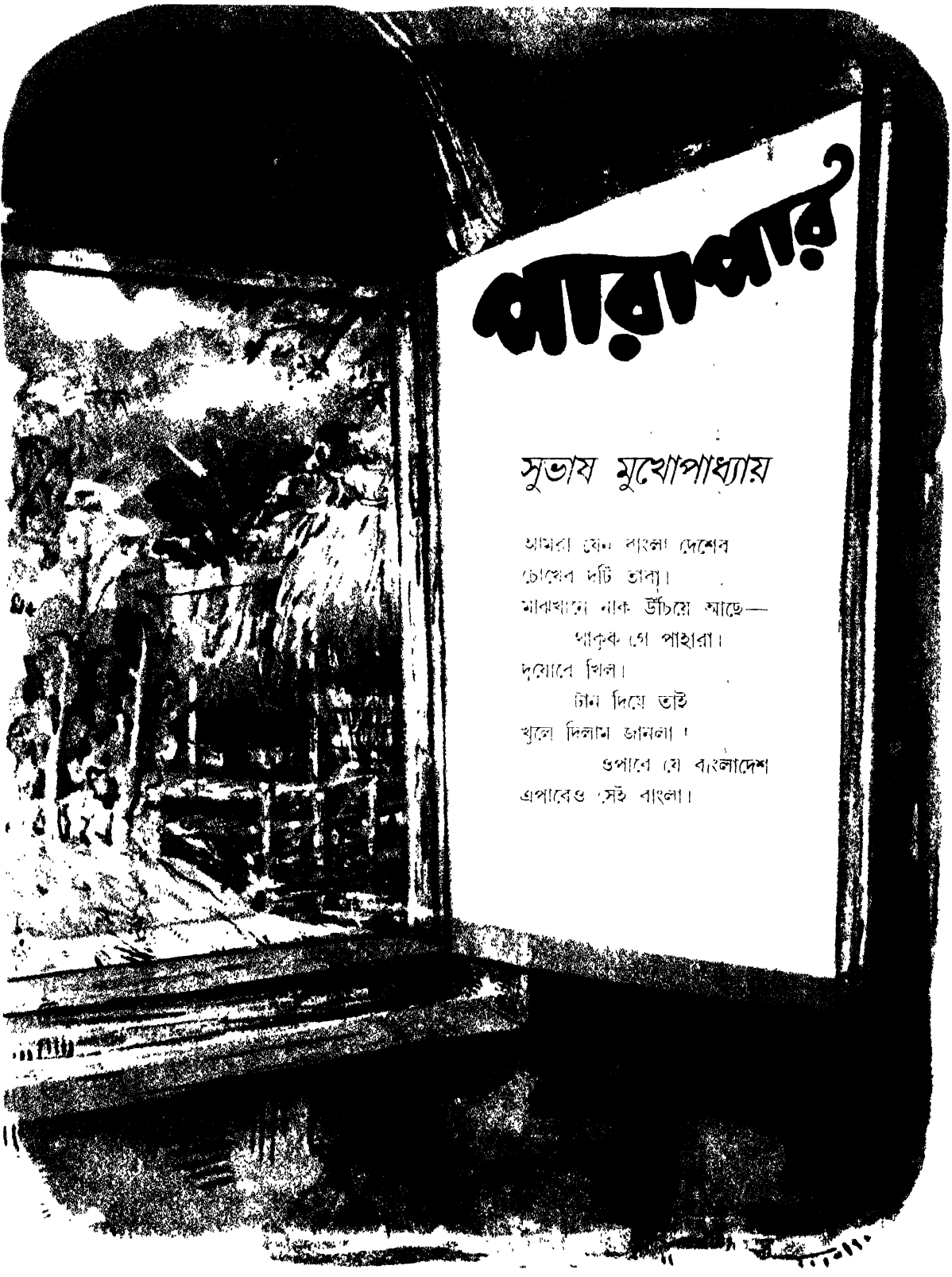
ভোজের বাড়িতে খুব লেগে গেছে হই চই,
কেউ বলে ঘি কোথায়, কেউ বলে দই কই ?
শেষ হল সব কিছু রান্নার আয়োজন,
গুছিয়ে হাতের কাছে রাখা সব প্রয়োজন।
আয় হাঁদা, আয় ভোঁদা, আয় ওরে পট্‌লা,
এমন সময়ে কেউ করে কিরে জটলা ?
ভাত ওই টগবগ ফুটছে যে হাঁড়িতে,
লোক সব বসে গেল দল বেঁধে সারিতে।
বিছিয়ে দে পাতা আর জল দে রে সত্বর,
নুন নিয়ে ঘুরে আয় ওদিকের চত্বর।
দিবি রে গরম ভাত হাঁড়ি ওই নামলে,
নিন্দার শেষ নেই মাঝপথে থামলে।
সব কিছু দেওয়া চাই একে একে পরপর,
দেখিস না হয় যেন একটুও গড়বড়।
লোক সব বসে বসে করছে রে ছটফট
ভাত বুঝি নেমে গেছে, নিয়ে আয় চটপট।
তারপর ঘি দিবি রে, গরম ভাতের 'পর,
বুঝলি তো সব কাজে হওয়া চাই তৎপর !
কী বলিস একটাও ভাত নেই হাঁড়িটায়,
গোটা কুড়ি রাক্কস আছে নাকি বাড়িটায় ?
মিছেমিছি জল শুধু হাঁড়িটায় ফুটেছে,
টগবগ করে তাই ঢাকনাটা উঠেছে।
রাঁধুনিটা ভুলে গেছে চাল দিতে হাঁড়িতে ?
হায় হায়, কাণ্ড কী হল ভোজবাড়িতে !

জিজ্ঞাসা

বাণী রায়

বৃষ্টি পড়ে পাতার আড়ে   ভিজছে বুঝি চড়ুই-ছানা,
ছাতার তলায় আসছে না তো, মায়ের বুঝি আছে মানা ?
আমরা দু'জন ভাই আর বোন ফিরছি ঘরে খেলার শেষে,
হঠাৎ কেমন বৃষ্টি এল, দিঘির বুকে ঝর্না মেশে।
ভাগ্যে মাতা দিলেন ছাতা, নইলে ভিজে লোপাট হতাম,
চড়ুই-পাখির নেই কি ছাতা ? আমরা ওকে নিয়েই যেতাম।
যেখানে ওব শালেব বনে পাতার বাসা রইল বাঁধা,
সেখানে ওর মায়ের চোখে মিলিয়ে আছে হাসি-কাঁদা।
আমাদেরই মায়ের মতন, শুধু ওদের নেইকো ছাতা ;
তাইতে কি ও ভিজবে বসে, আমরা যাব ঢেকে মাথা ?

পারাপার
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।
দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।

কুলীন কাহিনী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

টিকটিকিকে বলেন গিরগিটি :
ওই যে দেখেন, ওইটি আমার বিটি।
কুলীন একটি পাত্র যদি পাই
ঠিক করেছি, রাখব ঘর-জামাই।

গিরগিটিকে বলেন টিকটিকি :
কুলীন একটি পাত্র আছে ঠিকই।
ঘর-জামাইয়ে আপত্তি তার নাই ;
দশটি হাজার নগদ কিন্তু চাই।

টিকটিকিকে বলেন গিরগিটি :
যা বলেছেন, ন্যায্য কথা সিটি।
কিন্তু গবর্নমেন্টকে বড়ো ভয় ;
আইন করেছে একটি পয়সা নয়।

গিরগিটিকে বলেন টিকটিকি :
গবর্নমেন্টের মাথায় নেই টিকি।
কুলীনেব দাম সে-কী জানবে, মশয় ;
তাছাড়া পেটে খেলে পিঠেও সয়।...
ছেলেটি শিক্ষিত, সৎ-জাত ;
বাঁ-হাত দেবে, জানবে না ডান-হাত॥
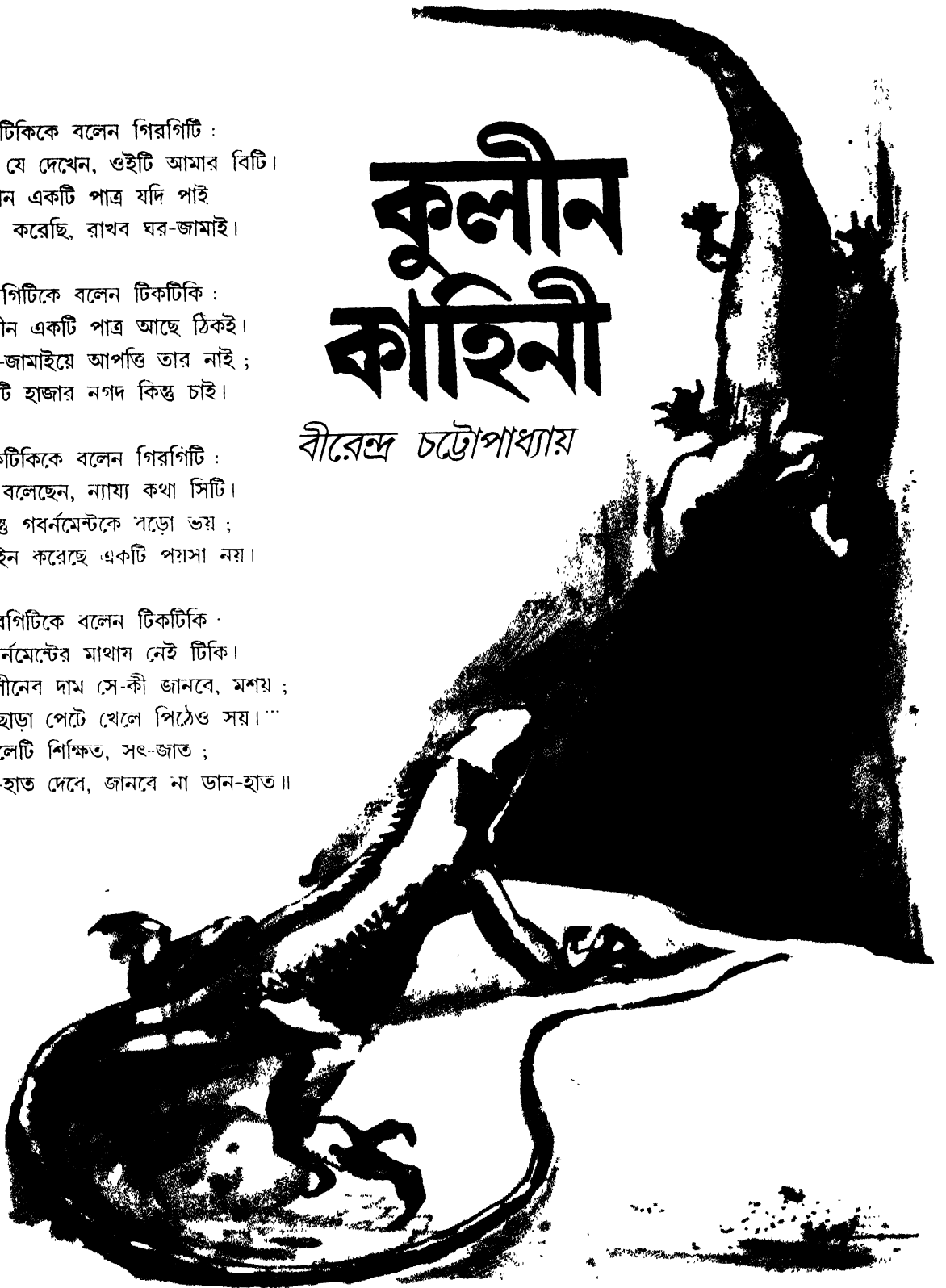
ঘুম তাড়ানো ছড়া

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

ঘুম পাড়ানির মাসি পিসি
দুষ্টু বেজায়---বুঝেছি আজ
ঘুম পাড়িয়েই রাখতে চায়
ভুলিয়ে সকল কাজ !
এরই ফলে সবাই চলে
ঢিমে তালের লয়ে—
বেজায় বড়ো কথায় দড়,
কোনো কাজেব নহে !
আমি চাই নতুন মাসি
নতুন পিসি যা[illegible]
ঘুম তাড়ানোর ঘুম ছাড়ানোর
মন্ত্রে আত্মহারা,
জেগেই যারা ঘুমিয়ে আছে
কাজকে ভয় করে
আজকে তাদের চলাতে হবে
নতুন পথে ধরে।
পাতাতে হবে আপন করে
কাজের সঙ্গে সখ্য---
ঘুম ছাড়ানো মাসি পিসি
হোক না এই লক্ষ্য !

ইস্কাবনের দেশে

সলিল চৌধুরী

শোনো ভাই, ইস্কাবনের দেশে গিয়েছিলাম
সেথায় গোলমেলে সব কাণ্ড দেখে এলাম।
সেথায় মাস দিয়ে ভাই দিনকে গোনে বছর দিয়ে মাসে,
আর বয়স যতই বাড়ে ততই বয়স কমে আসে।
সেথায় সুড়সুড়িতে কাঁদে সবাই কান্না পেলে হাসে ;
দেখে পালিয়ে চলে এলাম বলে সেলাম বাবা সেলাম।

সেথায় ইস্কুলেরা লুকিয়ে পালায় ছাত্র থাকে বসে,
আর টিকির মাথায় পণ্ডিত ঝোলেন পরম পরিতোষে
সেথায় শ্যামকে চড়ায় শূলেরে ভাই গোবর্ধনের দোষে
দেখে পালিয়ে চলে এলাম বলে সেলাম বাবা সেলাম।।

সেথায় জ্যান্ত সবাই মরে থাকে মরলে পরে বাঁচে,
আর দিন দুপুরে পথের ধারে জ্যান্ত ভূতে নাচে।
সেথায় নেতারা সব মিটিং করে দুই পা তুলে নাচে—
দেখে পালিয়ে চলে এলাম বলে সেলাম বাবা সেলাম।

সেথায় ইস্কাবনের রাজা মশাই হরতনেরি গোলাম,
আর নওলা আটা দুরি-তিরি বাজায় তারে সেলাম।
সেথায় রাজায় খেলে ঢেঁকুর তুলে প্রজায় বলে খেলাম
দেখে পালিয়ে চলে এলাম বলে সেলাম বাবা সেলাম।।

(ঈষৎ সংক্ষেপিত)
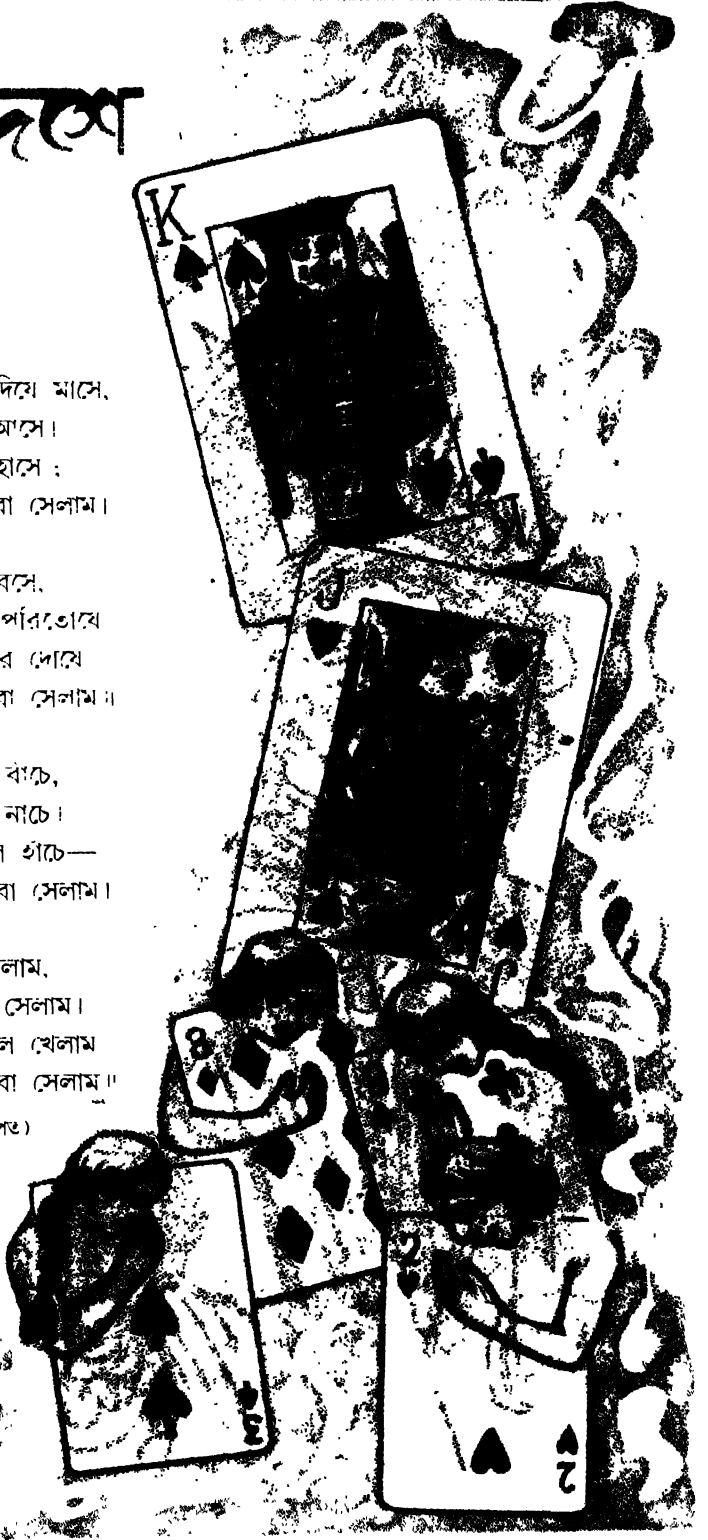
পূজা-প্যান্ডেলে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে আজ
আলোর বৃষ্টি ঝরে,
কিন্তু সরস্বতীর দিকে
দৃষ্টি যখন পড়ে,
অমনি আমার বুকের মধ্যে
ধড়াস ধড়াস করে।

ধড়াস ধড়াস করে, ও ভাই,
ধড়াস ধড়াস করে।
কারণ তাকে দেখবামাত্র
অমনি মনে পড়ে,
বার্ষিক পরীক্ষা হবে
ষোলই নভেম্বরে।

বার্ষিক পরীক্ষা হবে
ষোলই নভেম্বরে।
ফল যদি হয় খারাপ, তবে
প্রচণ্ড থাপ্পড়ে
বাপি আমার মুণ্ডু নাকি
থাকবে না আর ধড়ে।

কৃষ্ণ ধর

বিন্দুবাসিনী পিসি ডেকে ক'ন, ওরে
বল্ দেখি মাথা কেন ব'সে থেকে ঘোরে ?
সুজ্যিটা ডোবে তার ভেজে না তো গা
চাঁদ যদি হাসে তার দাঁত দেখা না !
রোদ্দুর ওঠে বল্ কোন্ মই বেয়ে
পৃথিবীতে রাত নামে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে ?
কার ধান কোটে বল্ বুদ্ধির ঢেঁকি
অভিধান ঘেঁটে বল্ সাতে-পাঁচে কী ?
কত কিলো চিন্তায় মন হয় ভারি
আটখানা করে তারে কার হাতুড়ি ?
কত টক খেলে মেটে শরীরের ঝাল
কোন্ সুতো দিয়ে বোনে চিন্তার জাল ?
বুদ্ধিটা বাঁকা হলে কে বা করে সিধে
গল্পটা গিলে খেলে মেটে কার খিদে ?
বল্‌তো চাঁদের হাট বসে কোন্ বারে
সময় গড়ায় কোন্ ঢালু পথ ধরে ?
ভেবে ভেবে ভাইপোর চুল হল খাড়া,
পিসিমা ধমকে ক'ন—এক পায়ে দাঁড়া।

এক যে ছিল

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এক যে ছিল আপনভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভালো লাগত না,
সহ্য হত না পড়াশুনার ঝামেলা
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখল না কোনও কালেই,
অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।
কেমন করে ? সে প্রশ্ন আমাকে করো না॥

বড়োমানুষির মধ্যে গরিবের মতো মানুষ,
তাই বড়ো হয়ে সে বড়োমানুষ না হয়ে
মানুষ হিসেবে হল অনেক বড়ো।
কেমন করে ? সে প্রশ্ন আমাকে করো না॥

গান-সাধার বাঁধা আইন সে মানেনি,
অথচ স্বর্গের বাগান থেকে সে চুরি করে আনল
তোমার আমার গান।
কবি সে, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল না ছোটো বয়সে,
অথচ শিল্পী বলে সে-ই পেল শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান।
কেমন করে ? সে প্রশ্ন আমাকে করো না॥

মানুষ হল না বলে যে ছিল দিদির আক্ষেপের বিষয়,
অনেক দিন, অনেক বিদ্রূপ যাকে করেছে আহত ;
সে-ই একদিন চমক লাগিয়ে করল দিগ্বিজয়।
কেউ তাকে বলল, 'বিশ্বকবি', কেউ বা 'কবিগুরু'
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারদিক করল প্রণাম।
তাই পৃথিবী আজও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলছে :
কেমন করে ? সে প্রশ্ন আমাকে করো না,
এ প্রশ্নের জবাব তোমাদের মতো আমিও খুঁজি॥
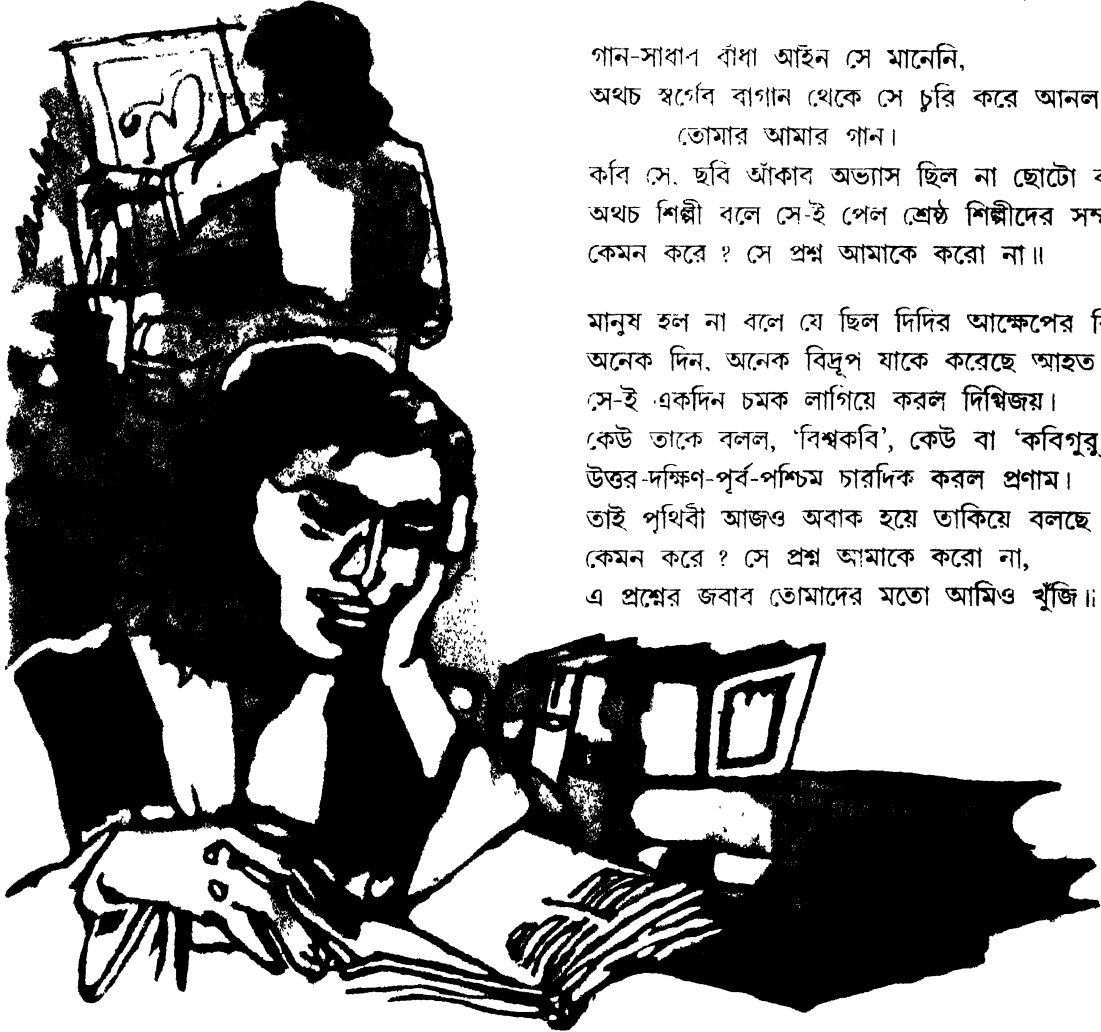
দৃষ্টি বদলে গেলে

দুর্গাদাস সরকার
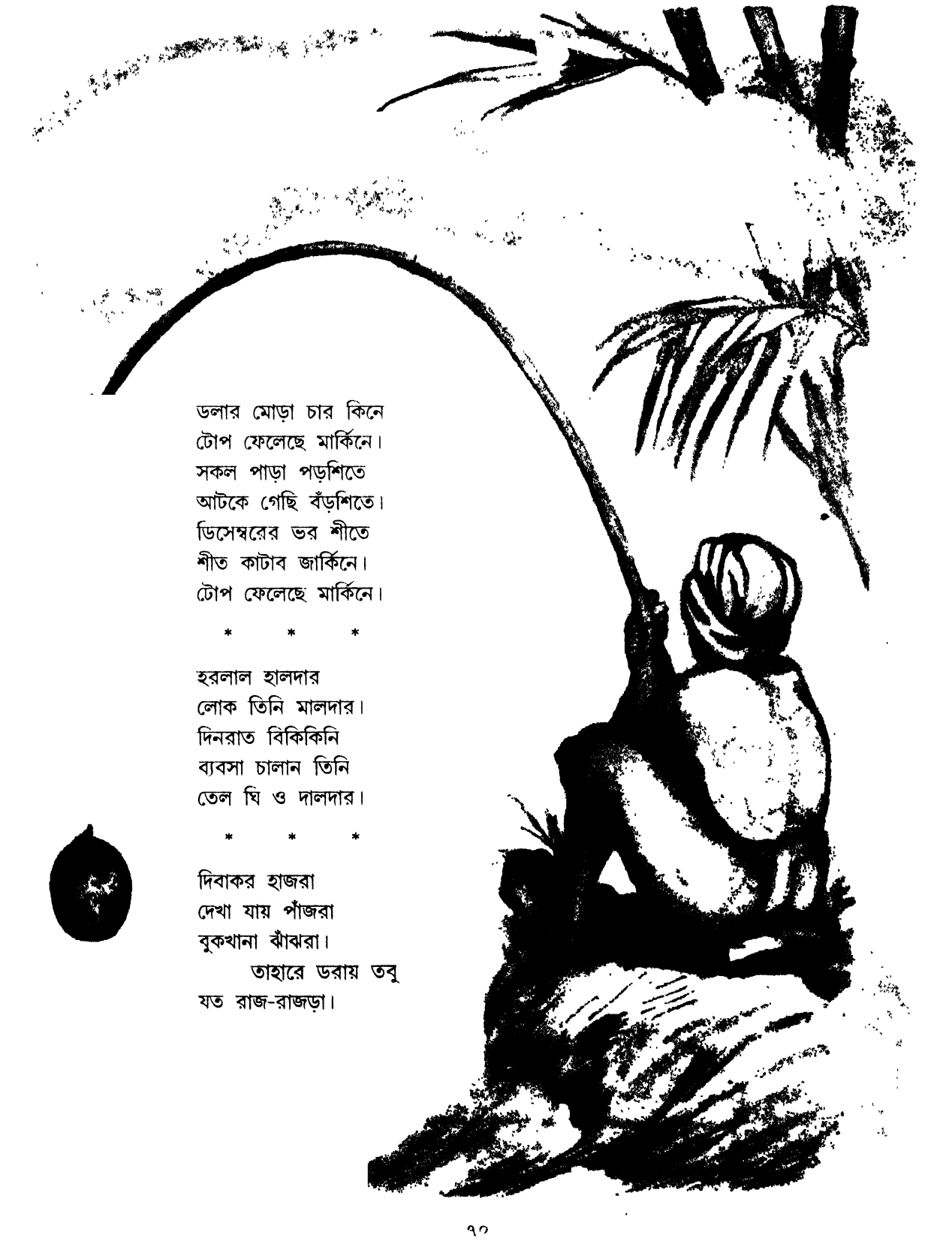
বদলায় দৃশ্য, তবু
মেঘ থেকে ঝরে দেখি
আমগাছে আম হয়
পাইনি যা তার পানি
তাহলে কী বদলাল ?
ফলবে কি মণ মণ
আসলে, চাই না সোনা
ধানগাছে ধান চাই।
ডাঙায় পুষব বলে
মিথ্যা বলছ, তাই

দৃষ্টি বদলে গেছে
বৃষ্টির অধিকারী
তেমনি যে ধান হয়
সবাই খাটছে, তবু
দৃষ্টি বদলে গেলে
দেওয়া যায় অন্ধকে
কেবল ভঙ্গি আছে
তাই কেউ একা খান
লক্ষ লক্ষ শিশু
অসহায় হয়ে কাঁদে
এখনও চলছে দেখি
…ক টেনে
…চ

বদলায় দৃষ্টি,
তবুও তো বৃষ্টি।
ধান গাছে ধান,
করি সন্ধান।
ধান গাছে সোনা
চাল হলে বোনা ?
কেউ ধান গাছে।
পুকুরের মাছে
কে করেছি সাধ ?
করি প্রতিবাদ।

তার মানে এই—
যদি সকলেই,
তাও সকলের ,
কেন হেরফের ?
মৃত্যুর আগে
চোখ অনুরাগে।
জঙ্গলি আইনে,
কেউ খেতে পাইনে।
কিশোর ক্ষুধায়
এই বসুধায়।
নিয়মের নামে
চলা অবিরামে।
দৃষ্টিটা বাড়িয়ে
রাখা ঘুম পাড়িয়ে।
যক্ষের আলয়ে
চিলি থেকে মালয়ে ?

ডলার মোড়া চার কিনে
টোপ ফেলেছে মার্কিনে।
সকল পাড়া পড়শিতে
আটকে গেছি বঁড়শিতে।
ডিসেম্বরের ভর শীতে
শীত কাটাব জার্কিনে।
টোপ ফেলেছে মার্কিনে।

* * *

হরলাল হালদার
লোক তিনি মালদার।
দিনরাত বিকিকিনি
ব্যবসা চালান তিনি
তেল ঘি ও দালদার।

* * *

দিবাকর হাজরা
দেখা যায় পাঁজরা
বুকখানা ঝাঁঝরা।
তাহারে ডরায় তবু
যত রাজ-রাজড়া।

ময়নামতী কংকাবতী

অনিল সরকার

ময়নামতী কংকাবতী
পিদিম জ্বালে কে ?
ছাতিমগাছে হুতুম ডাকে
সন্ধ্যা নেমেছে।
নদীর চরে জ্যোৎস্না লেগে
কেমন হেসেছে
জলের বুকে ঝিকি মিকি
রূপা ভেসেছে।

ময়নামতী কংকাবতী
রূপবতী বোন
মেঘের ভেলায় চাঁদ ভেসে যায়
পাগল পাগল মন।

ময়নামতী কংকাবতী
চম্পাবতী কই
যমুনাবতী সরস্বতী
পালিয়ে গেল ওই॥
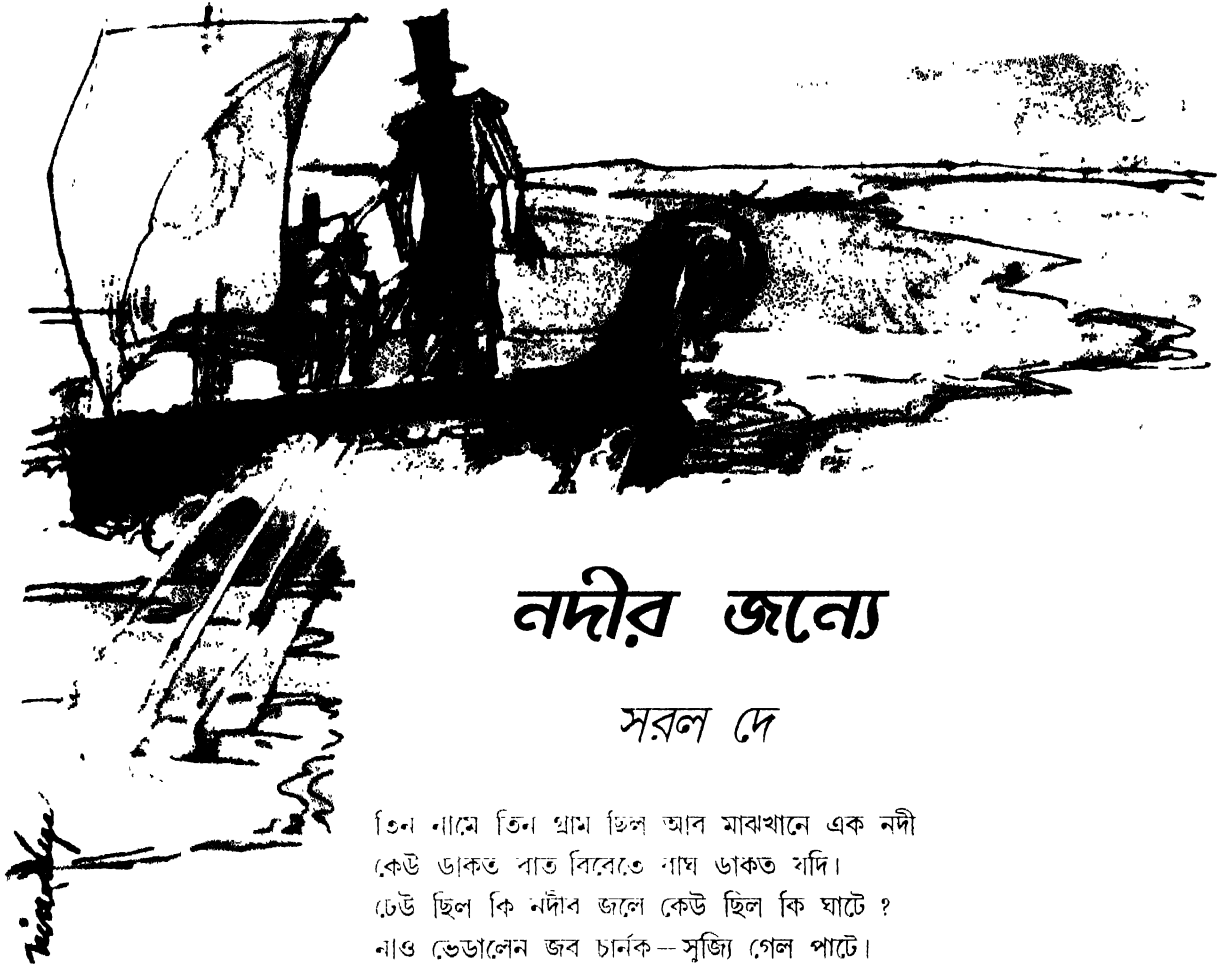
নদীর জন্যে

সরল দে

তিন নামে তিন গ্রাম ছিল আর মাঝখানে এক নদী
কেউ ডাকত রাত বিরেতে বাঘ ডাকত যদি।
ঢেউ ছিল কি নদীর জলে কেউ ছিল কি ঘাটে ?
নাও ভেড়ালেন জব চার্নক—সুজ্যি গেল পাটে।

তারপরে সেই লোহা-লক্কড় পাথর চাকা-চাকা
জমতে জমতে গাছপালা ঘাস কবেই পড়ে ঢাকা।
কেল্লা বাড়ে জেল্লা বাড়ে মানুষ বাড়ে কত
শহর বাড়ে বেড়েই চলে বাড়ছে অবিরত।

অদল-বদল পালাবদল : গেল কয়েক শতক
ভাঙল আবার গড়ল তবু আছে কতক কতক
নেই সে গ্রামের চিহ্ন কোথাও নেই সাহেবের গদি
কিন্তু আছে শহর ছুঁয়ে ঢেউ-ছলছল্ নদী।

ভাগ্যে নদী বইছিল তাই বহর এল ভেসে
জব চার্নক নাও ভেড়ালেন শহর হল শেষে।
ওই সে নদী বইছে আজও নইলে হত কী যে—
শহর কি আর রইত বেঁচে একলা নিজে নিজে॥

দিন ফুরাল

শঙ্খ ঘোষ

সুজ্যি না কি সত্যি নিজের ইচ্ছায়
ডুব দিয়েছে ? সন্ধে হল ? দুচ্ছাই
আকাশ জুড়ে এক্ষুনি এক ঈশ্বর
চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।
লক্ষ, না তা হতেও পারে একশ
কেই বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স !
আমরা কি আর দেখতে পাব ভাবছ ?
বাপ মায়েরা যাবেই তবে মুচ্ছো।
পাখির সারি যেমন ধানের গুচ্ছে
আধার ফেলে ঘরের দিকে উড়ছে
তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি
নিজের নিজের মন খারাপের গর্তে।
বলবে বাবা, এইটুকু সব বাচ্চা
দিন ফুরোলেও মাঠ ছাড়ে না ? আচ্ছা !
মা বলবে, ঠ্যাং দুটো কী কুচ্ছিৎ।
এক গঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কথায় ভেজে চিড়ে মুড়ি
খই বাতাসা
সেইটুকুনি দেখতে আসা।
জল ভেজাতে পারল কিছু ?
হাঁসের পালক, মুখটি নিচু—
রানার গায়ের গুগলি-গেঁড়ি
জল ভেজাতে পারল কিছু ?

তাই তো বলি, কথায় ভেজে
ভরন-কাঁসার বদনা-গাড়ু—
জল থই-থই থাক না গাড়ু
মিষ্টি কথায় ছিষ্টি ভেজে
বিষ্টিতে নয়, মিষ্টি কথায়
যত্রতত্র, যথাতথা॥

বারীন বসু

কোন্‌খানে যে হারিয়ে গেল ছেলেবেলার দিন,
ফুলপরি আর স্বপ্নে এসে বাজায় নাকো বীণ।
দূর থেকে সেই অনেক দূরে, মেঘ পাহাড়ের বাঁকে,
রাজার ছেলে, রাজার মেয়ে আর কি আমায় ডাকে ?
চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে কোথায় ঘরর-ঘর ?
অরুণ বরুণ কিরণমালা বাঁধল কোথায় ঘর ?
ভূত পেত্নি দত্যি দানো কোথায় গেল চলে ?
শূন্যে যে ওই গল্পে ভরা কল্পলোকের থলে।
মর্জিনা আর ডাকাত দলে করবে না ছারখার,
'কালের' সঙ্গে যুদ্ধে যে তার বেজায় রকম হার।
বুড়িয়ে গেছে সিন্ডারেলা, বেরোয় না ঘর থেকে,
গল্প দেশের সিং-দরজায় মিথ্যে মরি ডেকে।
কেউ জাগে না, কেউ ডাকে না, কেউ দেয় না কান,
আবছা সুরে বাজছে শুধু ঘুম পাড়ানি গান।
গুনগুনিয়ে বাদলা হাওয়া মাথায় দিল চুম,
বলল হেসে—এইবারে তোর চিরদিনের ঘুম।

শ্যামসুন্দর দে

দুপুর দুপুর গরম দুপুর
আগুন ভরা পুর
আকাশ জুড়ে অগ্নি দাহ
মেঘ কোথায় দূর।

ঝম ঝম্‌ ঝম্‌ বৃষ্টি
শুনতে বড়ো মিষ্টি
ও বৃষ্টি আয় না ভাই
ছোটোবেলার গানটি গাই

ঝপ ঝপ ঝপ্‌ ডিঙি বেয়ে
উজান স্রোতে যাব
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
কোন গানটি গাব।

ও বৃষ্টি আয় না ভাই
নদীনালা ভরে
সাগর ডাকে চল না যাই
নৌকো চালাই জোরে।

কী বা নাম তার

পুষ্পজিৎ রায়

[illegible]
খাঁ খাঁ রোদ
নিঝুম দুপুর
হাঁই ফাঁই
টৈ টৈ
হাঁপায় কুকুর।
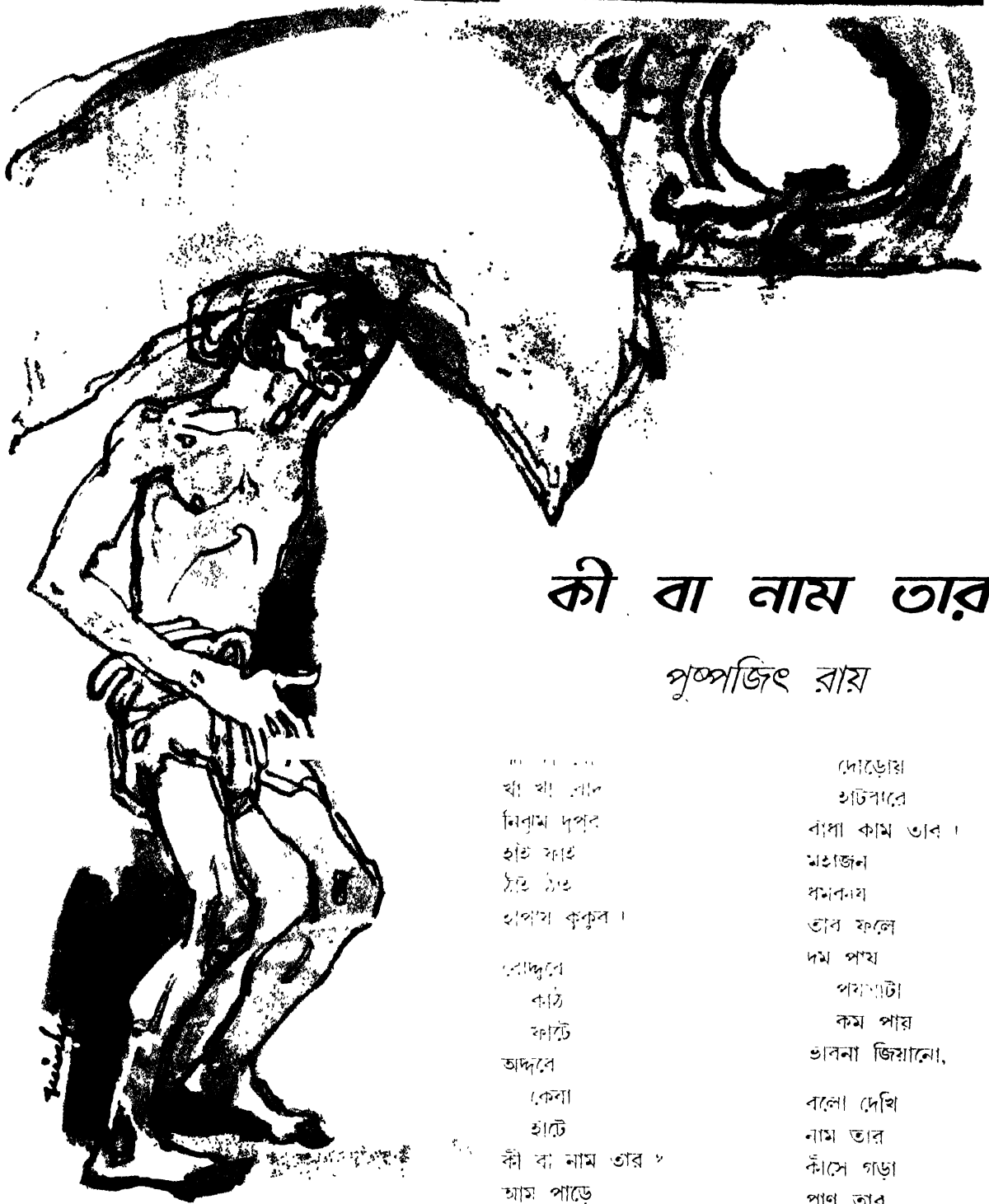
রোদ্দুরে
    কাঠ
    ফাটে
আদ্দরে
    কেলা
    হাটে
কী বা নাম তার ?
আম পাড়ে
জাম পাড়ে
মণ দুই
মোট ঘাড়ে

    দৌড়োয়
    হাটবারে
বাঁধা কাম তার।
মহাজন
ধমকায়
তার ফলে
দম পায়
    পয়সাটা
    কম পায়
ভাবনা জিয়ানো,

বলো দেখি
নাম তার
কাঁসে গড়া
প্রাণ তার
    কোথা আছে
    গ্রাম তার
ঘর কি নিকানো ?

মিছিল

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

বাপেব ঘাড়ে চেপে যাব
কাল মিছিলে মা
মা বলছে—'না'।

বাপের সাথে মাঠে যাব
কাল মিছিলে মা
মা বলছে—'না'।

ঝান্ডা ঘাড়ে নিয়ে মিছিল
একাই করে সে
ভরদুপুরে ঘরের দাওয়ায়
আওয়াজ ভাসছে।

মাগো, সে দিন বাপ বলেছে
লেনিন ছিল আমার মতো সোনা
আমায় তবে বল কেন
মিছিলে যাব না ?

ঠাকুর

ঠাকুর মানে রাঁধুনি নয়
ঠাকুর মানে রবি
রবি মানে রবীন্দ্রনাথ
আঁকল নিজের ছবি।

ঠাকুর মানে দেব্‌তা নয়
ঠাকুর লেখে ছড়া
ঠাকুরপুজোর চেয়ে বড়ো
লেখা এবং পড়া॥

রবীন্দ্রনাথ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

একটু একটু করেই তুমি আমায় গড়ো
আকাশ নদী পাহাড়চূড়ার নতুন পড়া ধরো !
আমাব ছেলেবেলা ছিল তোমার ছড়ায় গড়া
মাকে নিয়ে যেতাম বিদেশ ঢাল তলোয়ার ধরা,
স্বপ্ন লাগা ঘোড়ার খুরে উড়ত ভীষণ ধুলো
ভয়ে পালাত তেপান্তরের বাঁকের দস্যুগুলো।

এখন আমি অনেক বড়ো পেরিয়েছি পঞ্চাশ
মাও আমাব সঙ্গে নেই—একলা বারোমাস, ,
মায়ের মতোই তোমার কথা নিত্য পড়ে মনে
সুখ-শিশিরেব রবি আলোয় দুঃখ নিশির গানে
তোমাব সুরের কাছে এখনো ছুটে গিয়ে থামি
ও খানেই তো একটু আজো ছোট্ট আছি আমি।
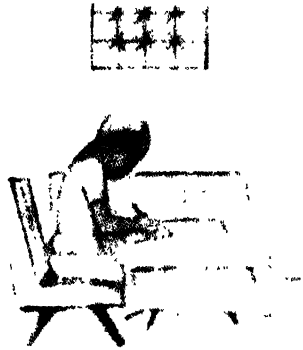
টুপুরের ছড়া

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সেই যে টুপুর, ছোট্ট টুপুর
ঘুমোত কেবল দোলনা খাটে,
এখন সকাল বিকেল-দুপুর
দুষ্টুমিতে সময় কাটে।

ধরতে গেলেই দেখাবে ভয়,
হাঁ করে মুখ করবে তাড়া,
কান্না এমন জুড়বে না হয়—
চিৎকারে তার জাগবে পাড়া।

খেলনা ? সে তো ছোড়বা চায়।
খেলবে যদি খেলুক না মা।
টুপুর বরং আলমারিটায়
ঘাঁটবে শাড়ি ফেলবে জামা।

ঠাম্মা বলেন, আহ্লাদি এ
মেয়ের জ্বালায় কোথায় পালাই,
আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
রান্নাবান্না সব করা চাই।

বাবা লুকোন চশমা ও পেন,
পিসি লুকোন খাতা ও বই,
মা সারাদিন ভাবতে থাকেন——
আমি বরং নিজেই লুকোই॥
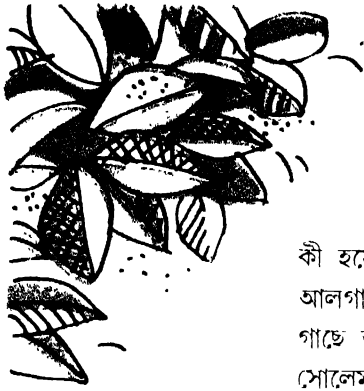
বাঁদর নাচ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

কী হয়েছে বাছা
আলগা কেন কাছা
গাছে তুলে মই টেনেছে
সোলেমানের চাচা,
কী হয়েছে বাছা
দুটো দিন সবুর করে
আবার বাঁদর নাচা।

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য

এক রাজা

এক রাজা ছিলেন তিনি ভীষণ জেদে
বললেন হাতকড়ি দিয়ে শব্দকে আন্ বেঁধে
শব্দ ভয়ংকর
মহাপ্রলয়ংকর
প্রহরী ছোটাল ঘোড়া অতি দুঃখে ও খেদে।

•

এক রানি

ঘুম থেকে জেগে সুয়োরানি উঠলেন কেঁদে
বললেন সূর্যকে ভেঙে হলুদ-কুসুম দাও রেঁধে
খাব ডিমভাজা
শুনে ভীমরাজা
হুকুম দিলেন দিনকে তাড়িয়ে রাতকে আনতে সেধে।
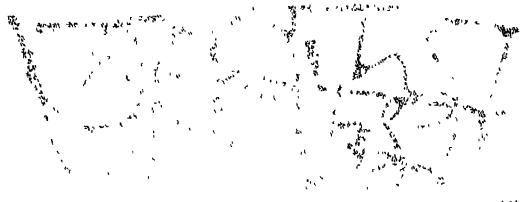
তপন চক্রবর্তী

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
রাজা মশাই নামবে কাজে
বাহা বাহা তাই তাই
আনন্দেতে নাচ ভাই।

সোনা রুপোয় মুড়িয়ে দেবে
দেশের চাকা ঘুরিয়ে দেবে
ধানের গোলা ভরিয়ে দেবে
টাকায় শরীর জড়িয়ে দেবে
বাহা বাহা তাই তাই
আনন্দের আর সীমা নাই।

ঢাক্ ডুমাডুম বাদ্যি বাজে
রাজা নেমে পড়ল কাজে
ধান তুলল কাঁড়ি কাঁড়ি
নিয়ে গেল নিজের বাড়ি
চাষির ঘরে ফাঁকা হাঁড়ি,
নাচতে গিয়ে কষ্ট ভারি
রাজা বললে হেঁকে হেঁকে
বেয়াড়া সব লোককে ডেকে
ভরুক আমার খামারটা
এর পরেই তোমারটা
চাষি বললে খাব কী
যমের বাড়ি যাব কি ?
শুনে রাজা বললে 'চোপ'
না শুনলে মারব কোপ
একটু খানি রোসো আজ
বুড়ো আঙুল চোষো আজ।

রাবেয়া না শকুন্তলা

ইরা সরকার

দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি বাংলায়
শোনো এক কথা :
পদ্মা মেঘনা গেছে, কপোতাক্ষ ভুলে আছি
ধলেশ্বরী শুধু নীরবতা—

শালিধান রূপকথা
উড়কির মুর্ড়কিও নাই,
থাক যা রয়েছে তা
কাজ নেই আর কাজিয়ায়—
রাবেয়া না শকুন্তলা
কী নাম তোমার
বাংলার শ্যামলা মেয়ে
চেনা চেহারার—

তোদের খেলার মাঠ
গড়েছে যে পলিমাটি
একই গঙ্গার,
কালনেমি লঙ্কাভাগে
বিষাদের সিন্ধু জাগে
অশ্রু ঝরে যার
সে তোদের দুঃখিনি মার।

রাজা সাজা

নির্মলেন্দু গৌতম
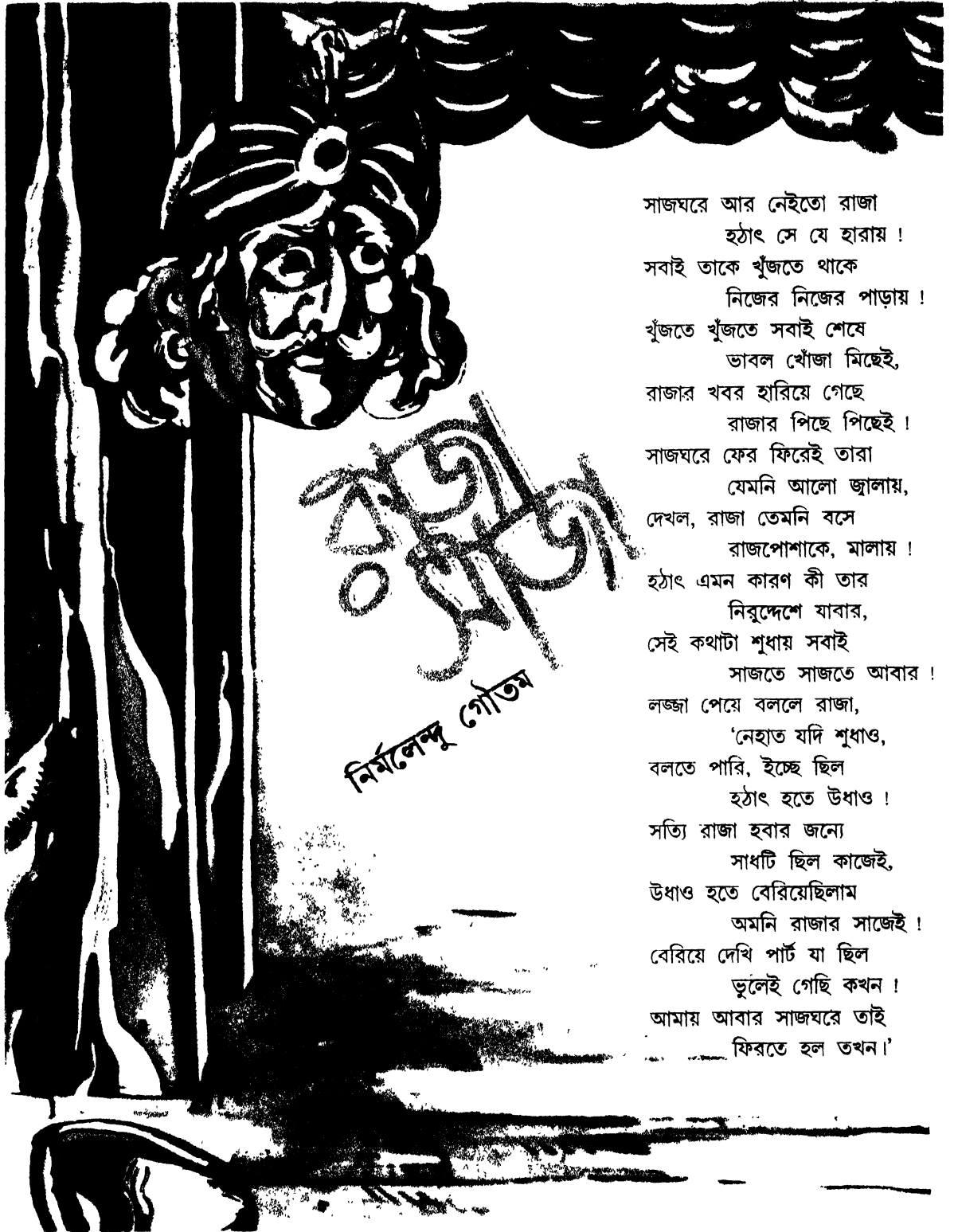
সাজঘরে আর নেইতো রাজা
হঠাৎ সে যে হারায় !
সবাই তাকে খুঁজতে থাকে
নিজের নিজের পাড়ায় !
খুঁজতে খুঁজতে সবাই শেষে
ভাবল খোঁজা মিছেই,
রাজার খবর হারিয়ে গেছে
রাজার পিছে পিছেই !
সাজঘরে ফের ফিরেই তারা
যেমনি আলো জ্বালায়,
দেখল, রাজা তেমনি বসে
রাজপোশাকে, মালায় !
হঠাৎ এমন কারণ কী তার
নিরুদ্দেশে যাবার,
সেই কথাটা শুধায় সবাই
সাজতে সাজতে আবার !
লজ্জা পেয়ে বললে রাজা,
'নেহাত যদি শুধাও,
বলতে পারি, ইচ্ছে ছিল
হঠাৎ হতে উধাও !
সত্যি রাজা হবার জন্যে
সাধটি ছিল কাজেই,
উধাও হতে বেরিয়েছিলাম
অমনি রাজার সাজেই !
বেরিয়ে দেখি পার্ট যা ছিল
ভুলেই গেছি কখন !
আমায় আবার সাজঘরে তাই
ফিরতে হল তখন।'

এক

বিদ্‌ঘুটে এক বাঁদরছানার
সাড়ে ন'-হাত নাক ছিল !
বাঁদরওলা নাকের ডগায়
বালতি বেঁধে রাখছিল !!
কারণ, সে খুব আদরের
বিদ্‌ঘুটে সেই বাঁদরের
সাড়ে ন'-হাত নাকের ডগায়
মৌমাছিদের চাক ছিল !
মধুর লোভেই বাঁদরওলার
নাকের উপর তাক ছিল !!

দুই

কেষ্টমামার হাই-জাম্পে
সত্যি দারুণ নাম ছিল !
কসবা থেকে লাফ দিয়ে সে
কম্বোডিয়ায় থামছিল !!
তাই শুনে তার পিসির মেয়ে
সাত সকালেই ভিরমি খেয়ে
দারুণ শীতে চাদর গায়ে
দরদরিয়ে ঘামছিল !
আড়াই-ভরি আফিং তখন
একটি আনা দাম ছিল !!

তিন

কাকাবাবুর মাথা-জোড়া
বিরাট বড়ো টাক ছিল !
কাকাতুয়ার মতোন বাঁকা
ইয়া লম্বা নাক ছিল !!
হায় কী ব্যাপার সর্বনেশে !
আইন-কানুন নেই কি দেশে ?
সেই টাকে এক কাকাতুয়া
বসে বসে ডাকছিল !
সবাই বলে, সেই তো কাকার
টাকার হিসেব রাখছিল !!

লালচে নীলচে করমচার ফুল

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

লালচে নীলচে করমচার ফুল।
কার বাগিচায় কোন্ বুলবুল॥
সারাদিন ধরে ঝর্ ঝর্ ঝরে।
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে॥

লালচে নীলচে করমচার ফুল।
যা উড়ে যা—এই বুলবুল॥
নীল নীল আকাশে ভাসবি রে।
ধানের শিসে নাচবি রে॥

লালচে নীলচে করমচার ফুল।
ঝুমকো লতার কানের দুল॥
শিউলি বাড়ি রং বেরং
পাহাড়ি মেয়ে সাজল সং॥

লালচে নীলচে করমচার ফুল।
ঘাসের আগায় জল টুলটুল॥

জিয়াদ আলী

টিয়াপুরের ট্যাপার বিয়ে
শেয়াল রাঁধে খানা,
বরযাত্রীর নেমন্তন্ন—
ঘুলুট থেকে ঘানা।
খরগোসে তার বাটনা বাটে
বেড়াল কোটে মাছ।
ইঁদুর ভায়া গোছায় বরের
হরেক রকম সাজ।
কাঠবেড়ালি নাস্‌তা সাজায়
বানর নাড়ায় লেজ,
মাংসে ঢালে চায়ের লিকার
সরবতে দেয় পেঁজ।

[illegible]পড়ের [illegible]
লাইন সারি সারি
হাওয়াই জাহাজ চড়ে সবাই
যাবে কনের বাড়ি।
বানর দাদা প্লেন চালাবে,
ঘন্টি বাজায় ফিঙে,
ফড়িং মামা শুনেই ছোটে
রুমাল মাথায় দিয়ে।
ট্যাপার বিয়ে মজার বিয়ে—
নাচে বকের ছানা,
বরযাত্রীর জাহাজ ওড়ে
ঘুলুট থকে ঘানা।

রূপকথা

অমল চক্রবর্তী

রাজা মশাইর ইচ্ছে ছিল হায়
কালোবাজারির লাশ ঝোলাবেন
ল্যাম্পপোস্টের গায়।
রাজা গেলেন মরে
রাজার ঝি রানি হল
পায়ে ঘুঙুর পরে।

মন্ত্রী কোটাল সেনাপতি
কুবের পাত্রমিত্র
সপারিষদ জাঁকিয়ে রানি
জলসাঘরের চিত্র।

ঘরের শান্তি বাঘে খেল
শকুনে খেল সুখ
বুকের পাথর বুকেই রইল
উপরি বাড়ল দুখ।

লোক খেপেছে যতই
ততই
রানি মারছে মানুষ
ভয় পাচ্ছে ভীষণ
ফি-সন
ফুঁয়ে উড়ছে ফানুস।
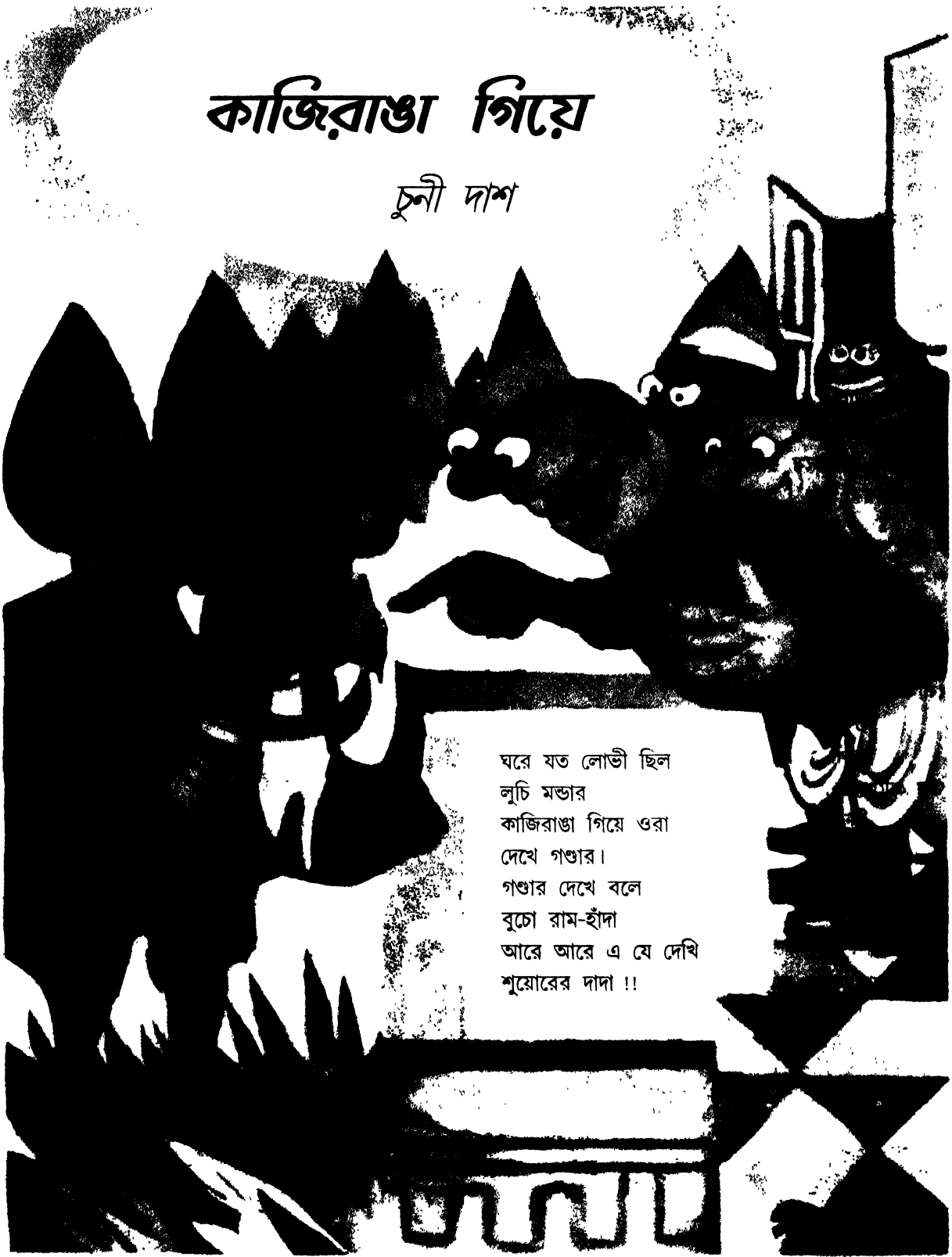
আমার কথাটি ফুরাবে না
নটে গাছটি মুড়াবে না।

গোকুলেতে লোক বাড়ছে
দলে হচ্ছে ভারি
হাতের সাথে হাত মিলছে
রানি দেখছে নাড়ি।

কাজিরাঙা গিয়ে

চুনী দাশ

ঘরে যত লোভী ছিল
লুচি মন্ডার
কাজিরাঙা গিয়ে ওরা
দেখে গণ্ডার।
গণ্ডার দেখে বলে
বুচো রাম-হাঁদা
আরে আরে এ যে দেখি
শুয়োরের দাদা !!

স্বপ্ন দেখে তবু কেন

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ দেখে ভেবেছিলাম
মেঘের মতো উড়ব
সাগর দেখে ভেবেছিলাম
স্রোতের নিচে ঘুরব—

ভেবেছিলাম ফুলের মতো
ফুটব টুপ্ করে
বৃষ্টি এলে মনের সুখে
খেলব রোজ ভোরে—

ভোরের ট্র্যামে পাড়ি দেব
কোন্ সে নিরুদ্দেশে।
কেউ জানে না কোথায় যাব
কী আছে সব শেষে।

হঠাৎ দেখি মেঘ করেছে
কালো—
ঝক্‌মকিয়ে ঠিক্‌রে এল
বিদ্যুতেরই আলো।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল
চারপাশেতেই জল—
ফুলেব পাপড়ি জলের তলায়
খেলব কোথায বল্ !

সার কথাটি এই বুঝেছি
আকাশ, মেঘ, ফুল.
সাগর, জল বা ঘুমপরিদের
রঙিন টুলটুল

মুখের ছবি লুকিয়ে আছে
আমাদের এই ঘরে—
স্বপ্ন দেখে তবু কেন
মন যে কেমন করে !

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

হাত ঘোরালে মোয়া দেবে
ঘোরাচ্ছি হাত যত
কেবলই হাত করছে ব্যথা
খিদে বাড়ছে তত।

হাত ঘোরালে মোয়া দেবে
নাচলে পায়ে মল
দাঁড়াই বটে পা নড়ে না
পায়েতে নেই বল।

লেখাপড়া করলে নাকি
চড়ব গাড়ি ঘোড়া
পাঁচ-বয়সেই নাম কিনেছি
চা-দোকানের ছোঁড়া।

হঠাৎ পেলাম নতুন জামা
খেলাম দামি মিষ্টি,
উড়ল বেলুন, রং বেরংয়ে
আটকে গেল দৃষ্টি।

নতুন জামা ছিঁড়বে জানি
কাল পাব না খাদ্য
তখন আমি নেবই জেনো
একটি রণবাদ্য।

পাড়ি

লীনা দত্তগুপ্তা

খেয়ে নাকি কেজি দুই
তেঁতুলের অম্বল
জ্বরে কাবু ও-পাড়ার
ডানপিটে ভোম্বল।

বেহুঁশ জ্বরের ঘোরে
আশেপাশে লাথি ছোঁড়ে,
ছুঁড়ে ফেলে গায়ে থেকে
কাঁথা লেপ কম্বল।

বদ্যি কহেন তারে
চেঞ্জে যাবার তরে
নিয়ে সাথে চার জোড়া
জুতো শেষ সম্বল।

ভোম্বল পাড়ি দিল—
সেই দূর চম্বল।

পাতার ভেঁপু

সুধীর গুপ্ত

শিশু বাজায় পাতার ভেঁপু ;
ফুঁয়ের চোটে চোটে
ভাবে কেবল কেমন করে
মধুর এ সুর ফোটে ?

খস্‌খসে এই তালের পাতা
একটু যে রস নাই ;
সরস সুরে কেমন করে
উঠছে বেজে তাই ?

শিশু বাজায় পাতার ভেঁপু ;
সুর যতই ওঠে
ততই খুশি ফুটতে থাকে
অবাক শিশুর ঠোঁটে।

ঠোঁটে-ঠোঁটে ভেঁপুর মুখে
শিশুর চুমা ঝরে,
সবাই জানে পাতার ভেঁপু,
বাজে অমন করে।

ন করে
যাত্রা শুরু

প্রভাতকিরণ বসু

ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, আকাশ অন্ধকার !
অভাব-ভরা সংসারে যে নেই ভরসা আর !
বাইরে যেন যুদ্ধ চলে, নিত্য মাতামাতি ;
এমন দিনে হবে কে আর ছোটো ছেলের সাথি ?
হাসি যে নেই কচিমুখে, অবাক হয়ে আছে !
এমন কাজল কালো দিনে আসবে কে তার কাছে ?

ছোটো ছেলে ছোটো মেয়ে থামিয়ে দিয়ে খেলা
ঘরের কোণে বসে যদি সোনার সকাল বেলা,
পড়ায় যদি বসে না মন, উৎসাহ নেই কাজে,
দেশের মায়ের বুকে ব্যথা গভীর হয়ে বাজে !
বলেন তিনি, 'আগামীকাল ভরসা আমার যারা,
কেমন করে থাকব, যদি দুঃখে থাকে তারা ?'

সংসারে যে গেছে সোনার কাঠির পরশ পেয়ে,
অনেক দিনের অনেক অনেক ছেলে এবং মেয়ে,
তাদের দেখে দেখে বুঝি, হয়নি পথের ভুল ;
গড়েছিলাম স্বর্গ, এবং ফুটিয়ে ছিলাম ফুল !
আজকে যারা আসবে, তারা—তেমনি পাবে সুখ ;
ঝড় উঠেছে ! উঠুক্‌গে ঝড় !—আসছে হাসিমুখ।

(সংক্ষেপিত)

সুশীলকুমার গুপ্ত

একদিন বাঘ শোনে কীর্তন রাত্রে,
অমনি আবেশে জাগে রোমাঞ্চ গাত্রে।
সেই থেকে হয়ে যায় সদাচারী সদাশয়,
ভুলেও মারে না পশু, ঘোরে শুধু বনময়।
ঘাস-পাতা-তৃণ খায়, স্নান করে ঝরনায়,
বাঘিনির সাথে জপে নাম ভোর-সন্ধ্যায়।

তিথি দেখে উপবাসে করে দেহ শুদ্ধ,
খোঁচালেও কিছুতেই হয় না সে ক্রুদ্ধ।
প্রস্তরে ঘষে ঘষে ক্ষয় করে দাঁতনখ
ধূসর বাকলে ঢাকে থাবা থেকে মস্তক।
পশুকুল-উদ্ধারে ঢালে সব প্রাণমন,
পশুরাজকবি লেখে অদ্ভুত বাঘায়ন !

শালিক পাখি, শালিক পাখি,
তুই আকাশের মালিক নাকি ?
মেলে দিয়ে রঙিন ডানা—
চষে বেড়াস আকাশখানা ;
আপন মনেই ঘুরিস শুধু,
মাথার ওপর রোদ যে ধূ-ধূ !
বকে না কেউ, কেউ মারে না,
পড়্—বলে কেউ হাঁক ছাড়ে না।

শালিক রে তোর খুব মজা—ইস !
কিচির-মিচির গান যে জুড়িস !
নিজেই যে তুই নিজের মালিক,
ওরে আমার পুঁচকে শালিক।
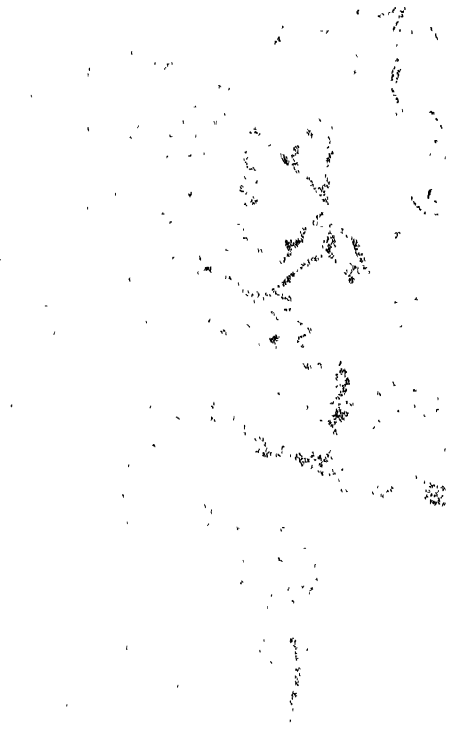
দুপুর দুপুর দুপুর—
কী দিয়েছে ? রোদ দিয়েছে
এক কলসি উপুড় !

দুপুর দুপুর দুপুর—
দুপুর সোনা দুপুর রোদে
বাজায় বুঝি নূপুর ?

দুপুর দুপুর দুপুর—
এলে জলে তক্ষুনি হাঁস
নায় যে ঝুপুর ঝুপুর ;

কেউ জানে না তখন কেন
ঘুম আসে না পুপুর॥
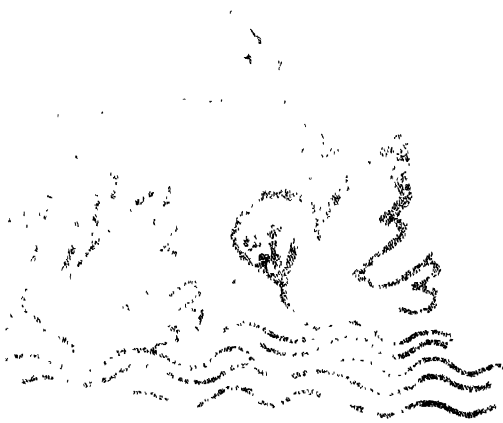
প্রীতিভূষণ চাকী

চামচিকেটার জ্বর হয়েছে
বদ্যি কোথায় পাবে ?
টুনটুনিটা চুপটি করে
শুধুই কেবল ভাবে !

গিরগিটিটা দৌড়ে এল
শেকড়বাকড় নিয়ে—
কচুপাতায় জল ছিটিয়ে
জলপটি দেয় টিয়ে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যখন
দৌড়ে এল পুষি,
জ্বর ছেড়েছে জ্বর ছেড়েছে
সবাই হল খুশি !

এই হুলো, লেজফুলো, মুখ কেন গোমড়া ?
থাম্ থাম্ বুঝেছি যে কামড়েছে ভোমরা !

ভয় কীরে ? শোন্ তবে, এদিকেতে আয়না !
মিছে মিছে কাঁদো কেন ? ব্যথা বুঝি যায়না ?

শোন্ শোন্ বলি-তোকে এ খবর পষ্ট—
আছে এক ঔষধ সেরে যাবে কষ্ট !

গোটা কয় আরশোলা দেড় কেজি বিচ্ছু—
নির্ভয়ে খেয়ে নে না হবে নাকো কিচ্ছু !

সেরে যাবে চটপট ব্যথা আর বেদনা—
চুপ করো লক্ষীটি, সোনামণি কেঁদো না !

ভাগাভাগি

অনির্বাণ দত্ত

কোন্ ফলটা মুসলিমে খায়, কোন্ ফল খায় হিন্দুতে ?
তেষ্টা পেলে তফাত খোঁজো—পানি বা জলবিন্দুতে ?
পেটের জ্বালা সমান সবার, সমান—শীতে কাতরানো,
হঠাৎ আলো নিভলে সমান—সবার আঁধার হাতড়ানো।

পাশাপাশি ঘুমোই, তবু ফারাক রাখি যখন জেগে,
ছোঁয়া বাঁচাই পাতেই শুধু, একই অন্ন ভিক্ষা মেগে !
একই পথে কারখানা যাই, ঘুরি চাকায় একই সাতে,
একই চাষে ধরি লাঙল, তবুও আল দুটি মাঠে।

আমার তোমার মধ্যিখানে একই হাওয়া, একই আলো—
তবু বিভেদ ছড়িয়ে দিতে—বলো তো কে হাত বাড়াল ?
সবার মনের অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকে একটা দানো,
খুব একটা সহজও নয়—সেই দানোটার ঘুম ভাঙানো।

তবু তো ভাই মাঝে-মধ্যে দানো জাগে, নড়ে চড়ে—
ঠিক তখনই, একই মানুষ—দুভাগ হয়ে দাঙ্গা করে।

নাটক

প্রথম দৃশ্য

গাছপালাব মাঝে কুঁড়ে ঘব—মাটিব ঘর, পাতার ছাউনি। ঘরেব একপাশে দরজা, কপাট বন্ধ; ঘরের অন্য পাশের দেয়াল বেয়ে লাউ-কুমড়ার লতা চালে উঠিয়াছে; ঘরের সামনে একটু পরিষ্কার জায়গা; আশেপাশে কতকগুলো গাঁদা ও বেলফুলের গাছ; দূরে একপাশে বেগুন-খেত, অপর পাশে কলাবাগান। দুপুর রাত. ঘরের পিছনে আড়ালে কৃষ্ণাষ্টমীর উদীয়মান চাঁদ, রঙ্গমঞ্চে তদুপযুক্ত অল্প অল্প অন্ধকার। দূর হইতে. থামিয়া থামিয়া বারকতক শেয়ালের চিৎকার ধ্বনি; ধ্বনি ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হইতে থাকিবে। শেয়ালের মুখ মাথা গলা আব দুই হাতের পাঞ্জা জন্তুর মতো, বাকি সর্বাঙ্গে মানুষের মতো কাপড়চোপড় পবা, মানুষের মতো খাড়া চলন, ওঠা বসা ও কথা. কেবল স্বর একটু বিকট রকম। শেয়াল বেগুন-খেতের দিক হইতে দৌড়িয়া ঘরের সামনে উপস্থিত. নাকে কাঁটা বিদ্ধ, কাঁটার নিচে দিয়া রক্তপাত। ব্যথায় ছটফট করিতে করিতে, কাতরাইতে কাতরাইতে বারকতক এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বন্ধ কপাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল :

শেয়াল। নাপিত ভায়া! নাপিত ভায়া! ঘরে আছ গো? (ব্যথায় ছটফটানি, উঃ আঃ হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি, পরে দরজায় ঘা দিয়া, আরও চেঁচাইয়া) ও নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া, ওঠো না গো, শিগ্‌গির দুয়ার খোলো, শিগ্‌গির খোলো—ও—ওঃ!

নাপিত। এত রাত্রে কে ডাকাডাকি করে রে—কে রে তুই?

শেয়াল। ওগো আমি শেয়াল—উ-উ-উঃ, আ-আ-আঃ, গেলুমরে, বাপরে!

নাপিত। তোর কী হয়েছে, এত রাত্রে ডাকাডাকি চেঁচামেচি ঠোকাঠুকি করছিস কেন?

শেয়াল। আমি বেগুনখেতে বেগুন খেতে গিয়েছিলুম, আমার নাকে মস্ত বড্ডো একটা কাঁটা বিঁধে গিয়েছে গো, ও-ও-ওঃ।

নাপিত। বেশ হয়েছে। ঠিক সাজা হয়েছে। কেমন, আর চুরি করবি?

শেয়াল। আর করব না আর কক্‌খনো কবব না। তুমি শিগ্‌গির বেরিয়ে এসো, শিগ্‌গির আমার কাঁটা বের করে দাও।

নাপিত। (কপাট খুলিয়া প্রদীপ হাতে বাহিরে আসিয়া, শেয়ালের নাকের কাছে প্রদীপ ধরিয়া) উঃ তাই তো! এখনও ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে যে!

শেয়াল। (প্রদীপের ভয়ে একটু পিছু হটিয়া) তোমার নরুন দিয়ে কাঁটাটা শিগ্‌গির বের করে দাও না গো—তোমার দু পায়ে পড়ি গো—শিগ্‌গির বের করে দাও গো।

নাপিত। এই অন্ধকারে তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, নরুনে যদি তোমার নাক একটু আধটু কেটে যায়, তখন যে তুমি হাঁক করে আমাকে কামড়াতে আসবে?

শেয়াল। ওগো না গো না—তোমার কিচ্ছু ভয় নেই—আর যদিই বা একটু আধটু কেটে যায়, তাতে আমার চেহারা খারাপ হবে না; আমার তো আর মানুষের মতো ন্যাড়া নাক নয়, কাটার দাগ রোঁয়ার ভিতরে দিব্যি ঢাকা থাকবে।

নাপিত ও শেয়াল : সামনা-সামনি উবু হইয়া উপবেশন। নাপিত : বাঁ হাতে শেয়ালের নাক ধরিয়া ডান হাতে নরুন ধরিয়া কাঁটা বাহির করেন। সেই সময়ে শেয়াল : উঃ আঃ প্রভৃতি বেদনাসূচক শব্দ ও মুখভঙ্গি করেন—একটু পরে কাঁটার সহিত নাকের একটু মাংস কাটিয়া মাটিতে পড়িল, তদ্দৃষ্টে শেয়াল রাগে ফুলিতে ফুলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শেয়াল। (নাপিতকে কামড়াইবার উপক্রম করিয়া) অ্যাঁ, আমার নাক কেটে দিলে। শিগ্‌গির আমার নাক ঠিক করে দাও বলছি—না হলে এখনই তোমার নাক কামড়ে নেব।

নাপিত। (ভয়ে ভয়ে) আমি তো আর ডাক্তার না, আমি কী করে তোমার নাক ঠিক করে দেব!

শেয়াল। (রাগের সহিত) নাক দিতে পারবে না, তবে নরুন দাও।

নাপিত তাড়াতাড়ি নরুন ফেলিয়া দিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া কপাট বন্ধ করিল। শেয়াল নরুন লইয়া, উল্লাসের সহিত নানারকমে ঘাড় বাঁকাইয়া, নরুনটি ঘুবাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে নাচিতে নাচিতে রাস্তায় বাহির হইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুমারশাল। কুমারশালের সমস্ত সরঞ্জাম। কতকগুলো মাটির হাঁড়ি ও অন্যান্য বাসন সুদৃশ্যরূপে এখানে ওখানে সাজানো। পিছনদিকে কুমারনি হাঁড়ি-কুড়ি গড়িতেছে বা ঠিকঠাক করিতেছে। সামনের দিকে কুমার হাত দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে।

শেয়ালের প্রবেশ

শেয়াল। (কুমারের মাটি খোঁড়া দেখিতে দেখিতে) কুমর-খুড়ো, ও কী করছ! আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছ কেন?

কুমার। আমি গরিব মানুষ, অস্ত্র কোথায় পাব বাপু?

শেয়াল। আহা! তোমার একটিও অস্ত্র নেই? অমন করে

আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আঙুল যে ব্যথা হয়ে যাবে খুড়ো;—এই নাও, আমার এই নরুনটি দিয়ে মাটি খোঁড়ো।

কুমার। না বাপু, পরের জিনিস নিতে নেই—তোমার নরুনটি যদি ভেঙে যায় তখন আমি কোথা থেকে দেব?

শেয়াল। নরুন ভাঙলে আমার কোনো দুঃখ নেই—আমি শেয়াল, আমি নরুন দিয়ে কী করব? তুমি নরুন দিয়ে মাটি খোঁড়ো।

কুমার নরুন লইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল—শেয়াল কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। একটু পরে নরুন ভাঙিয়া গেল।

শেয়াল। (রাগে গর্জিয়া) অ্যাঁ-অ্যাঁ! তুমি আমার নরুন ভেঙে দিলে! এখনই জোড়া লাগিয়ে দাও, নইলে তোমার ভালো হবে না বলছি।

কুমার। আমি তো কামার না, আমি কী করে নরুন জোড়া দিয়ে দেব?

শেয়াল। আচ্ছা, তবে আমাকে একটা ভালো হাঁড়ি দাও।

কুমারনির তৎক্ষণাৎ একটা হাঁড়ি আনিয়া ভয়ে ভয়ে শেয়ালকে প্রদান। শেয়ালের এক হাতে হাঁড়ি মাথায় ধরিয়া, অন্য হাত কোমরে দিয়া, অঙ্গভঙ্গিসহকারে নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মালীর মালঞ্চ। জাতি যূথী বেলা প্রভৃতি বিবিধ ফুলগাছ। পশ্চাৎভাগে একপাশে কতকগুলি মালীকন্যা সাজি হাতে দাঁড়াইয়া, গল্প করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে ফুল তুলিতেছে। অপরপাশে আর কতকজন মালীকন্যা বসিয়া গল্প করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে মালা গাঁথিতেছে, তাদের সামনে ডালাভরা ফুল—সামনের দিকে মালী একটা ডোবা হইতে আঁজলা করিয়া তুলিয়া তুলিয়া গাছে জল দিতেছে।

মালীকন্যাদের গান

ফুল তোলো চটপট,
কে যাবে গঞ্জের হাট,
হাটের বেলা হল নিকট
হাটে গিয়ে ফুল বেচে,
নেব চুড়ি বেছে বেছে,
লাল নীল কালো চুড়ি
খাব তাজা মুলো মুড়ি।
মালা গাঁথো চটপট,
বর করে ছটফট,
লগ্ন বয়ে যায় যে,
ঝট করে আয় না রে!

পূর্বোক্তভাবে হাঁড়ি মাথায় শেয়ালের প্রবেশ।

শেয়াল। (মালীর কাছে আসিয়া) ও কি মালীদাদা। তুমি হাতে করে গাছে জল দিচ্ছ! তোমার ফুলঝারি কোথায় গেল?

মালী। (জল দিতে দিতে) পুরোনো ঝারিটা একেবারে ভেঙেচুরে গেছে—নতুন ঝারি কিনতে পয়সা কোথা পাব ভাই!

শেয়াল। তোমার এমন সুন্দর ফুল-ভরা মালঞ্চ, তোমার আবার পয়সার ভাবনা?

মালী। (মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) কতগুলি পুষতে হচ্ছে দেখছ তো—আবার বিয়েথাওয়া দেওয়া আছে।

শেয়াল। (মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিয়া) আহা! দিব্যি মেয়েগুলি! দাদা, এ তোমার আর এক মালঞ্চ।—কিন্তু তোমার জল দেওয়ার কষ্ট দেখে আমার বড়ো দুঃখু হচ্ছে।

মালী। কী করব ভাই, যেমন করে হোক কাজ চালাতে তো হবে।

শেয়াল। দেখো দাদা, তুমি আমার এই হাঁড়িটি নাও, এইটে ভরে ভরে গাছে জল দাও।

মালী। তোমার হাঁড়িটি যদি ভেঙে যায়, তখন কী হবে?

শেয়াল। তা ভাঙলই বা, আমার হাঁড়িকুঁড়িতে দরকার কী ভাই, শেয়ালরা তো আর রান্না করে খায় না।

শেয়ালের মালীকে হাঁড়ি প্রদান। মালী হাঁড়ি ভরিয়া ভরিয়া গাছে জল দিতে লাগিল। শেয়াল জল দেওয়া দেখিতে লাগিল। বারকতক জল দিবার পর হাঁড়ি ভাঙিয়া গেল। তদ্দৃষ্টে শিয়াল রাগিয়া উঠিল। শেয়ালের রাগ দেখিয়া মালীকন্যাদের ভয়াকুল মুখ-ভাব।

শেয়াল। (রাগে লম্ফঝম্ফ দিতে দিতে) আমার হাঁড়ি ভেঙে দিলে রে! আমার হাঁড়ি ভাঙলি কেন? শিগ্‌গির হাঁড়ি দে! শিগ্‌গির হাঁড়ি তৈরি করে দে বলছি।

মালী। (ধীর ভাবে) আমি কি কুমার যে হাঁড়ি গড়ে দেব, আমি হাঁড়ি দেব কোথা থেকে?

শেয়াল। (একটু শান্ত হইয়া) হাঁড়ি দিতে পারবিনে তো একটা টোপর দে, তুই তো টোপর তৈরি করতে জানিস, তবে তাই দে।

মালী। (একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া) যাও তো মা, দৌড়ে ঘর থেকে একটা টোপর নিয়ে এসো গে তো।

মালীকন্যা টোপর আনিয়া মালীব কাছে দণ্ডায়মান।

মালী (কন্যার প্রতি) দাও, টোপবটা ওঁর হাতে দাও।

কন্যা দু-এক পা অগ্রসর হইয়া সভয়ে অবস্থিত। শেয়াল অগ্রসর হইয়া কন্যার হাত হইতে টোপর ছিনাইয়া লইল। একটু সরিয়া যাইয়া টোপর মাথায় পরিয়া রূপগর্বে বিকশিত মুখে একে একে সকলের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান, পরে গর্বিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সন্ধ্যা। বনপথ। পাল্‌কিবেহারার বুলি ও লোকজনের কথাবার্তা, গোলমাল এবং বাজনার শব্দ দূর হইতে আসিতেছে। ওই মিশ্রিত শব্দ ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হওয়া। প্রথমে মশালধারী, পর বাজনাদার, তৎপরে বাহক স্কন্ধে খোলা চতুর্দোলায় টোপর-বিহীন বব, তৎপরে আত্মীয়বন্ধু, তৎপরে আবার মশালধারী, এইরূপে সারিবদ্ধ হইয়া পরে পরে সকলের প্রবেশ—কোনো গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া টোপর মাথায় শেয়াল বরের চতুর্দোলার পার্শ্বে দর্শকদিগের দিকে মুখ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ শেয়ালের আবির্ভাবে বরযাত্রী-দল বিস্ময়াভিভূতভাবে দণ্ডায়মান ও শেয়ালকে নিরীক্ষণ।

শেয়াল। (উপহাসের ভাবে বরের প্রতি) তুমি কোন্ দেশি বর হে! তোমার মাথায় টোপর নেই কেন?

বর। (লজ্জিত ও কাঁচুমাচু ভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে) বনের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে চোরেরা আমার টোপর গয়না সব কেড়ে নিয়েছে।

শেয়াল। টোপর মাথায় না দিলে কি কখনো বিয়ে হয়, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তোমাকে বর বলে চিনবে কী করে?

বর। (অপরাধীর মতো কাতরভাবে) তাহলে—তবে আমি এখন কী করব?

শেয়াল। আমার টোপরটা মাথায় দিয়ে যাবে?

বর। আপনি দয়া করে দেন তো মাথায় দিয়ে যাই।

শেয়াল। তুমি বিয়ে করে ফিরে যাবার সময় যদি আমার টোপর আবার আমাকে দাও, তাহলে তোমাকে টোপর দিই।

বর। (উৎসাহের সহিত) আপনার টোপর নিশ্চয়ই ফিরে দেব। কোথায় আপনার দেখা পাব?

শেয়াল। এই বনের ভিতরে এইখানেই আমাকে দেখতে পাবে। (বরকে টোপর পরাইয়া দিয়া) ফিরে দিতে ভুলো না যেন, দেখো।
যেমন কথা তেমনি কাজ
নইলে পাবে বিষম লাজ।

বরের দিকে মুখ করিয়া শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে শেয়ালের প্রস্থান। বর ও ববযাত্রীদল শেয়ালেব কথা শুনিতে শুনিতে পূর্বোক্ত সারিবদ্ধরূপে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সকাল। বনপথ। পাল্‌কিবেহাবার বুলি, লোকজনের কথাবার্তা গোলমাল ও বাজনা মিশ্রিত শব্দ দূর হইতে আসিতেছে। ওই শব্দ ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হওয়া। প্রথমে বাজনাদার, পরে বাহকস্কন্ধে খোলা চতুর্দোলায় টোপর-বিহীন বর ও অবগুণ্ঠনবতী বধূ। বউয়ের পাশে চতুর্দোলাব ধার এক হাতে ধরিয়া দাসী, চতুর্দোলার পশ্চাতে আত্মীয়বন্ধু, এইরূপে সারিবদ্ধ হইয়া সকলের প্রবেশ। পরে গাছের আড়াল হইতে লাফাইয়া শেয়ালের প্রবেশ। শেয়ালের প্রবেশে সকলে থমকিয়া দাঁড়াইয়া শেয়ালকে নিরীক্ষণ।

শেয়াল। (দর্শকদের দিকে মুখ করিয়া, বরের কাছে, দোলার পাশে দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক) দাও, আমার টোপর দাও—(বরের মাথার দিকে চাহিয়া) টোপর দেখছিনে যে!

শেয়ালের কথা শুনিয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূ ভয়ে কুঁকুড়ি-শুকুড়ি ও দাসীকে ধরা।

বর। (ভয়জড়িত স্বরে) বাসরঘরে মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে আমার উপর পড়ল আর টোপর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল।

শেয়াল। (রাগিয়া) অ্যাঁ-অ্যাঁ, আমার টোপর ভেঙে ফেলেছিস! তোদের সকলকে কামড়ে দেব, তোদের হাড় গুঁড়ো করে দেব।

সকলের কাছে যাইয়া হাঁ-হাঁক করিয়া কামড়াইবার উপক্রম। ভয়ে সকলের কম্প, নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও কাতরশব্দ।

বর। (দোলা হইতে নামিয়া, শেয়ালের পায়ে পড়িয়া) আমাকে মাপ করো, তুমি কামড়িয়ো না, টোপরের যত দাম চাও তাই দেব।

শেয়াল। (ঘৃণার সহিত) আমি কী মানুষ যে টাকা চাইব। টাকা নিয়ে কী করব? টোপর না দিতে পারিস তো তোর বউ দে।

বর দোলা হইতে বউকে নামাইয়া, অতি কাতরভাবে কম্পান্বিত বউকে শেয়ালের হাতে সমর্পণ করিল। শেয়াল বউয়ের এক হাত ধরিয়া, আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে বনের ভিতর অদৃশ্য হইল—বর ও বরযাত্রীদল কাতরভাবে বউয়ের দিকে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বনপথ। গ্রীবা ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে, আপনবাদ্যে আপনি মোহিত ভাবে ঢোলক বাজাইতে বাজাইতে এক ঢুলির প্রবেশ। ঢুলির চোখে মুগ্ধ চাউনি, ঠোঁটে মুগ্ধ হাসি মাখা, তদ্রূপভাবে কিছুক্ষণ ঢোলক বাদন। বন হইতে বউয়ের হাত ধরিয়া শেয়ালের প্রবেশ ও তদবস্থায় দাঁড়াইয়া বিমুগ্ধভাবে ঢোল-বাদন-দর্শন।

শেয়াল। (ঢুলির সহিত সানুনয়ে) ভাই ঢুলি, এই ঢোলকটি আমাকে দেবে?

ঢুলি। (বাজনা বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা, আমি যদি এই ঢোলকটি তোমাকে দিই, তাহলে তুমি আমাকে কী দেবে বলো দিকি?

শেয়াল। তাহলে আমি তোমাকে এই বউটি দেব।

ঢুলি। (অবগুণ্ঠনবতী বউকে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, শেয়ালের প্রতি) আচ্ছা ভালো, এসো অদলবদল করা যাক।

ঢুলি নিজের গলা হইতে ঢোলকের দড়ি খুলিয়া শেয়ালের গলায় পরাইয়া দিল—শেয়াল বউয়ের হাত ধরিয়া বউকে ঢুলির হাতে সমর্পণ করিল—শেয়াল আনন্দে দুই হাতে ঢোলক চাপিয়া ধরিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে বনের ভিতর অদৃশ্য। ঢুলির বউয়ের মুখের ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া, দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

সকাল বেলা। বনপথ। শেয়াল এক গাছের উপর চড়িয়া দিব্য আরামে বসিয়া, মনের সাধে ঢোলক বাজাইতেছে, আর গান করিতেছে। প্রথমে কামাইতে যাইবার মতো সাজে ও পুঁটলি হাতে নাপিত প্রবেশ করিয়া শেয়ালের কাণ্ড দেখিয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর কুমার হাটে বিক্রি করিতে যাইবার ভাবে প্রবেশ করিয়া ঢোলকের বাজনা শুনিয়া উর্ধ্বদৃষ্টিতে হাঁ করিয়া অন্য একস্থানে অবস্থিত। তারপর, মালী ও মালীকন্যারা ফুল, মালা ও টোপর প্রভৃতি লইয়া বিয়ে বাড়িতে যাইবার ভাবে প্রবেশ করিয়া, শেয়ালের রঙ্গ দেখিয়া আর এক স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইল, পরস্পরে চাওয়া-চাওয়ি হাসাহাসি টেপাটেপি করিতে করিতে শেয়ালকে দেখিতে লাগিল। তারপর বর স্কুলে যাইবার সাজে বইয়ের তাড়া হাতে প্রবেশ করিয়া ভয় ও বিস্ময়ের সহিত অন্য এক স্থানে দাঁড়াইয়া শেয়ালকে দেখিতে লাগিল। তারপর ঢুলি ও ঘোমটা-খোলা বউ হাত ধরাধরি করিয়া আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে করিতে প্রবেশ করিল, পরে অন্য এক স্থানে শেয়ালের বাজনার সঙ্গে নাচিতে লাগিল।

শেয়ালের গান

গান — নাকের বদলে নরুন পেলুম—
ঢোলক — টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্
গান — নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম—
ঢোলক — টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্
গান — হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম—
ঢোলক — টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্
গান — টোপরের বদলে বউ পেলুম—
ঢোলক — টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্
গান — বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম—
ঢোলক — টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্
টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।

সদা সত্য কথা বলিবে

মন্মথ রায়
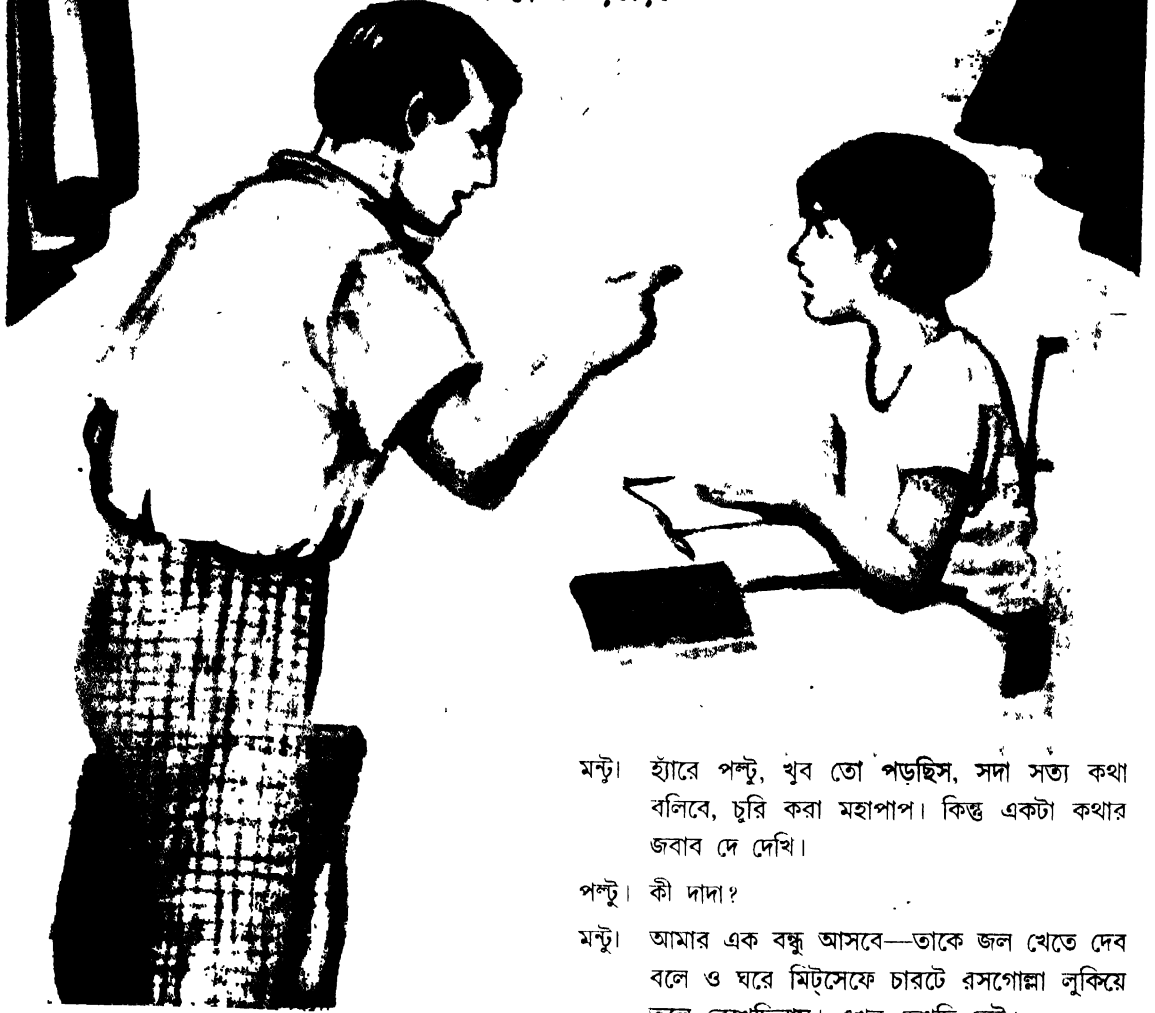
[কলিকাতা। ফ্ল্যাটবাড়ির একটি কক্ষ। বাড়ির ছোটো ছেলে দশ বৎসর বয়স্ক পল্টু পাঠরত।]

পল্টু। 'সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা মহাপাপ।'

[মুখস্থ করিতে পুনঃ পুনঃ পাঠ। সংলগ্ন কক্ষ হইতে বড়ো ভাই বিশ বৎসর বয়স্ক মন্টুর প্রবেশ।]

মন্টু। হ্যাঁরে পল্টু, খুব তো পড়ছিস, সদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করা মহাপাপ। কিন্তু একটা কথার জবাব দে দেখি।

পল্টু। কী দাদা?

মন্টু। আমার এক বন্ধু আসবে—তাকে জল খেতে দেব বলে ও ঘরে মিট্‌সেফে চারটে রসগোল্লা লুকিয়ে তুলে রেখেছিলাম। এখন দেখছি নেই।

পল্টু। সে আমি কী জানি দাদা। (সঙ্গে সঙ্গে পাঠ—) 'সদা সত্য কথা বলিবে—'

মন্টু। তুই জানবি না তো কে জানবে! বাড়িতে আর কে আছে?

পল্টু। কেন, তুমি আছ। ঝি এসেছিল, সঙ্গে তার বাচ্চা ছেলেটাও এসেছিল। (পুনরায় পাঠরত —) 'সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না'।

মন্টু। 'কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না'! বটে! ওই রসগোল্লা চারটে তুই চুরি করে খাসনি?

পল্টু। না, আমি খাইনি। (পুনরায় পাঠ —) 'না বলিয়া খাইলে চুরি করা হয়। চুরি করা মহাপাপ।'

মন্টু। তুই খাসনি বলছিস—আর তোর মুখে এখনও রস লেগে রয়েছে!

[শোনা মাত্র পল্টু চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখে হাত দিয়া দেখিয়া লইল রস লাগিয়া রহিয়াছে কি না।]

পল্টু। কই না তো!

মন্টু। নেই আমি তা জানি। কিন্তু, আছে বলতেই চম্‌কে উঠে মুখে হাত দিয়ে দেখলি কেন?

পল্টু। তুমি বললে যে। তাই দেখলাম।

মন্টু। তবেই দেখ, খেয়েছিস বলেই মনে ভয়টা ছিল। না খেলে তুই কখনও মুখে হাত দিয়ে দেখতিসনে। মনে পাপ ছিল যে। পল্টু, তুমি ধরা পড়ে গেছ। মুখে রস লেগে আছে কি না দেখাতেই তোমার চুরি ধরা পড়ে গেছে। এদিকে আয় বলছি।

পল্টু। (ভয় পাইয়া) আর কখনও খাব না।

মন্টু। না না, উঠে কাছে আয়। চুরি করে খাওয়া তোর রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে! আজ তার ওষুধ দিচ্ছি।

পল্টু। এবারটি মাপ কর দাদা।

মন্টু। অনেকবার মাপ করেছি। আজ আর নয়। ভালো চাস তো কাছে আয় বলছি।

[পল্টু ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

ও! কাঁদলে আমি ছাড়ব না। (শাসাইয়া) আয় বলছি। (পল্টু ভয়ে ভয়ে কাছে আসিলে) কান ধর্। (পল্টু কান ধরিল) এইবার নাকে খত দে। ভালো চাস তো কথা শোন্—নইলে তোর ওই পিঠ আস্ত থাকবে না।—(পল্টু ভয়ে ভয়ে নাকে খত দিল)—এইবার বল্—আর কখনও চুরি করিব না—(পল্টু বলিল) আর কখনও মিথ্যা বলিব না—(পল্টু বলিল)—আর কখনও এমন সব পাপ করিব না—(পল্টু বলিল)—বেশ, এবার ওঠ। পড় যা পড়ছিলি। আমি রেশনটা নিয়ে আসছি। আমার এক বন্ধু আসবে—এলে বসতে বলবি।

[মন্টু বাজারের ব্যাগটি লইয়া রেশন আনিতে চলিয়া গেল। পল্টু চোখের জল মুছিতে মুছিতে পুনরায় পূর্বোক্ত পাঠ পড়িতে লাগিল। বাহির হইতে একটি তরুণ যুবক আসিয়া দাঁড়াইল।]

যুবক। কী খোকা, পড়তে পড়তে কাঁদছ কেন?

পল্টু। দাদা রেশন আনতে গেছে। আপনাকে বসতে বলে গেছে। (পাঠ) সদা সত্য কথা বলিবে—কদাচ মিথ্যা বলিবে না।

যুবক। দাদা বাড়ি নেই, বাবা আছেন তো।

পল্টু। না বাবা তো এখানে নেই!

যুবক। বাবা নেই, মা আছেন তো।

পল্টু। না, মাও নেই। বাবা আর মা ভারতদর্শন-ট্রেনে তীর্থ করতে গেছেন—বিল্টুও সঙ্গে গেছে।

যুবক। তুমি গেলে না যে?

পল্টু। না না, আমার যে একজামিন!

যুবক। তা তুমি একা রয়েছ?

পল্টু। না না, দাদা তো আছে। দাদার নতুন চাকরি কিনা, ছুটি পায়নি।

যুবক। আ-হা-হা। ভারতদর্শন-ট্রেনে কত সব ভালো ভালো আর বড়ো বড়ো তীর্থ দেখা যায়। আঃ, তোমাদের যাওয়া হল না! কদ্দিন হল ওঁরা গেছেন?

পল্টু। এক মাস হয়ে গেছে।

যুবক। তোমাদের বাড়িতে মোট ক-জন লোক খোকা?

পল্টু। কেন, দুজন, আমি আর দাদা।

যুবক। সে তো এখন। যখন বাবা মা আর বিল্টু থাকে তখন সব মিলে ক-জন?

পল্টু। বা রে! ওঁরা যখন থাকেন, তখন পাঁচজন।

যুবক। ওই পাঁচজন ছাড়া তোমাদের বাড়িতে আর কেউ থাকে না বুঝি?

পল্টু। না তো!

যুবক। তোমাদের ঘর কটা?

পল্টু। এই তো, এটা আর ওটা—দুটো।

যুবক। আচ্ছা, দুটো ঘরে মাত্র পাঁচজন লোক। আমি ভাবছিলাম জন দশেক থাক।

পল্টু। পাঁচজনেরই জায়গা হয় না, দশ জন কী করে থাকবে।

[রেশন লইয়া মন্টুর প্রবেশ]

যুবক। এই যে রেশন নিয়ে এলেন বুঝি।

মন্টু। আপনি কে?

যুবক। কেন, রেশনের দোকানের আশেপাশে আমাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেননি কোনোদিন?

মন্টু। কী জানি, কী চাই বলুন তো।

যুবক। ক-জনের রেশন আনলেন?

মন্টু। তা দিয়ে আপনার দরকার কী?

যুবক। আমি পুলিশ। এই দেখুন আইডেনটিটিকার্ড। আপনার রেশনকার্ডটা দেখি, (মন্টু ইতস্তত করিলে তীব্রকণ্ঠে) ভালো চান তো দিন বলছি। (মন্টু রেশনকার্ডটি দিল।) ও বাবা! রেশনকার্ডে দেখছি দশজন। (পল্টুকে) এই, তুমি পড়ছ না কেন? তুমি তোমার পড়া পড়ো।

পল্টু। (ভয় পাইয়া জোরগলায় পড়িতে লাগিল) 'সদা সত্য কথা বলিবে। চুরি করা মহাপাপ'।

যুবক। তা এই রেশনকার্ডের দশজন লোক—সব এখানে আছেন?

মন্টু। আছেন বইকী। আজকে সকালে হাওড়ায় গেছেন মাসিমার বাড়ি। বিকেলে ফিরবেন। (পল্টু ফ্যালফ্যাল করিয়া দাদার দিকে তাকাইলে) আঃ! তুই পড় না—

পল্টু। (জোরগলায়) 'সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা বলিবে না।'

যুবক। কিন্তু আপনার এই সত্যবাদী ভাই বলছে—

মন্টু। কী বলছে? (পল্টুকে) কী বলেছিস তুই?

পল্টু। আমি সত্য কথাই বলেছি দাদা। নাকে খত দিয়েছি যে! বলেছি বাবা, মা আর বিল্টু এক মাস হল দেশ দেখতে বেরিয়েছেন। বাড়িতে রয়েছি শুধু তুমি আর আমি।

যুবক। তোমাদের এ বাড়িতে মোট লোক ক-জন খোকা?

পল্টু। বললাম তো, পাঁচজন। একটু আগে নাকে খত দিয়ে বলেছি মিথ্যে কথা কখনও বলব না।

যুবক। তুমি খোকা সত্যি কথাই বলেছ। কিন্তু তোমার দাদা মিথ্যে কথা বলছেন। এবার চলুন থানায়।

মন্টু। এবারটির মতো দয়া করে ছেড়ে দিন স্যার।

যুবক। দেখুন, এই ভুয়ো রেশনকার্ড রাখা যে কতদূর সামাজিক অপরাধ তা বোঝার বয়স আপনার কি এখনও হয়নি? এ তো দস্তুরমতো চুরি!

পল্টু। (জোরগলায় পাঠ) 'চুরি করা মহাপাপ'।

যুবক। শুনলেন তো! সত্যিই মহাপাপ। পাঁচজনভুয়ো লোক দেখিয়ে রেশন নিচ্ছেন দশজনের। এতে পাঁচজন লোককে বঞ্চিত করে তাদের ভাত মারছেন আপনি। নিশ্চয়ই এই বাড়তি রেশন চোরা বাজারে বিক্রি করেন। এত বড়ো সামাজিক অপরাধ আজ আর নেই। চলুন থানায়।

মন্টু। আমি নাকে খত দিচ্ছি স্যার, এবারটি ছেড়ে দিন।

যুবক। সে আমি কিছু বলতে পারছি না। আসুন থানায়। তারপর যা হয় দেখা যাবে। (পল্টুকে) খোকা তুমি যেমন পড়ছিলে, পড়ো। জামিনে খালাস হয়ে দাদা এখনই ফিরে আসছেন। (মন্টুকে) আসুন। কাছেই তো থানা। রেশন-ব্যাগটি হাতে নিন। (মন্টু ইতস্তত করিলে ধমক দিয়া) নিন বলছি।

(রেশন-ব্যাগ লইয়া মন্টু যুবকের সহিত চলিল।)

মন্টু। (পল্টুকে) তুই পড়তে থাক। আমার এক বন্ধু আসবে। আমার ফিরতে দেরি দেখলে তাকে থানায় পাঠিয়ে দিস। চলুন—

[যুবকের সহিত মন্টু চলিয়া গেল। কাঁদো কাঁদো স্বরে পল্টু পড়িতে লাগিল।]

পল্টু। 'সদা সত্য কথা বলিবে।' বলিলে ধরা পড়িতে হয়। (ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)।

গগনে উদিল

অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

[শেষ রাত। তখনও অন্ধকারের ঘোর কাটেনি। দূরে পাহাড় নদী আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। ভোরের পাখির ডাক শোনা গেল।]

(ভোরের পাখির গান)

আমি ভাই ভোরের পাখি
আসবে যে এক নতুন কবি তার তবে ভাই রাত্রি জাগি
শিরে যে তার বিজয় মুকুট
জয়ের মালা গলে—
হাতে তাহার বাণীর বীণা
বাজছে পরে পলে।
রাত জাগি ভাই, গান গেয়ে যাই শুধুই তারি লাগি।
আসবে কবি তাই মেদিনী নীরবে সয় ব্যথা...
হৃদয়ে তার অসীম আশা, চোখে ব্যাকুলতা।
সেই শোনাবে নতুন গীতি
সেই জাগাবে নতুন প্রীতি
তারি তরে গান গেয়ে ভাই ঈশের আশিস মাগি।

(অন্ধকারের প্রবেশ)

অন্ধকার। কে তুমি বে-আক্কেল বেরসিক ব্যক্তি! সক্কালবেলা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে আমার আরামের ঘুমটা মাটি করে দিলে। যাও—যাও, এখান থেকে সরে পড়ো—।

ভোরের পাখি। তুমি এমন মারমুখো হয়ে তেড়ে এলে কেন ভাই? কী তোমার নাম?

অন্ধকার। (ব্যঙ্গ করে) কী আমার নাম? এই বনে বাস করছ, আর আমাকে চেন না? আমার পোশাকটা দেখছ?

ভোরের পাখি। দেখছি বই কী?

অন্ধকার। কী এর রং?

ভোরের পাখি। ঘোর কালো!

অন্ধকার। ঘোর কালোকে কী বলে?

ভোরের পাখি। ঘোর কালো মানেই একেবারে অন্ধকার।

অন্ধকার। ঠিক ধরেছ। আমি অন্ধকারই বটে। অন্ধকারে এতটুকু আলো ঢুকতে পারে না। তাই আমি এই বনের মধ্যে বাসা বেঁধেছি। গান, সুর আমার কানে যেন সিসে গলিয়ে দেয়। আলো আমি আদৌ সইতে পারি না। তা তুমি এখানে এসে অন্ধকারকে নাড়া দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছ কেন?

ভোরের পাখি। ও! তুমি এখনও শোননি?

অন্ধকার। কী আবার শুনব শুনি? আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি!

ভোরের পাখি। এই বনে যে আজ নতুন কবির উদয় হবে। তার আলোতে সারা বন আলোকিত হয়ে উঠবে।

অন্ধকার। (বিষম চটে গিয়ে) কী বললে? কী বললে? নতুন কবির উদয় হবে? বনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠবে? আচ্ছা, সকাল হবার আগে তুমি এমন অলক্ষুনে কথা শোনাচ্ছ কেন? তুমি কি জান না যে, এ বনে চিরকাল অন্ধকার থাকে? এটা আমার রাজ্যি, এখানে কেউ আলো জ্বালাতে পাবে না।

ভোরের পাখি। এতকাল সেই কথা শুনেই তো ঝিমিয়ে ছিলাম। এইবার কে যেন কানে কানে বলে গেল যে, নতুন কবি আসবে, বনে আলো জ্বলবে, সবাই জাগবে।

অন্ধকার। (ঠাট্টা করে) কে যেন কানে কানে বলে গেল! বটে! কোন্ বে-আক্কেল তোমার কানে কানে বললে শুনি?

(নীল রঙের হালকা ওড়না পরে মলয়ার প্রবেশ)

মলয়া। আমি বলেছি গো, আমি। সকলের কানে কানে শুভবার্তা শোনানোই যে আমার কাজ।

অন্ধকার। বটে! শুভবার্তা! তা কী শুভবার্তাটি তুমি বয়ে নিয়ে এসেছ শুনি? তোমার পরিচয়ই বা কী?

মলয়া। আমার পরিচয়? অন্ধকারে যারা মুখ গোমড়া করে বসে থাকে, তারা আমার পরিচয় কী করে পাবে?

অন্ধকার। আহা। অত গুমরই বা কেন? এ বনে তুমি ঢুকলে কী করে? লক্ষ্মী মেয়ের মতো পরিচয়টা আগে দিয়ে ফেলো তো।

মলয়া। আমার নাম মলয়া। ফুরফুর করে আমি বয়ে চলি। দেশ দেশান্তরে আমার অবাধ গতি। এই বন এতদিন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ছিল। তাই তো আমি আমার নীল ওড়না উড়িয়ে এলাম শুভবার্তা দিতে।

অন্ধকার। কিন্তু তুমি কি জান না যে, এই বনের মালিক আমি? এখানে অন্ধকারের রাজ্যি? তোমাদের ফুরফুরে হাওয়া আর প্যানপ্যানে গান এ বনে চলবে না আমি যতদিন আছি। এই তোমাদের সোজা কথা বলে দিচ্ছি।

ভোরের পাখি। তুমি তো সোজা কথা বলে দিলে। কিন্তু আমার গলা থেকে যে আপনা আপনিই গান বেরুচ্ছে। তুমি বলছ সোজা কথা, আমি বলছি সোজা কথা। মাঝখান থেকে কথা যে দুটো হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকার। এই অন্ধকার রাজ্যে কথা শুধু একটি থাকবে, আর সেটি হচ্ছে আমার মুখের কথা—এই অন্ধকারের আদেশ, বুঝলে?

মলয়া। কিন্তু আমি যে চিঠি নিয়ে এসেছি—সে চিঠি বিলি করব কার কাছে?

অন্ধকার। (আঁতকে উঠে) চিঠি। চিঠি আবার কীসের? তুমি তো মেয়ে বাপু সুবিধের

নও। প্রথমে বললে শুভবার্তা। এখন বলছ চিঠি। প্রতি মুহূর্তে কথা পালটানোই বুঝি তোমার কাজ? আমার বাপু এককথা—অন্ধকার। চুপচাপ। নিঝঝুম। আর কিছু না।

মলয়া। কিন্তু দেশ বিদেশে, বনে বনান্তরে সবুজের লিখন বয়ে নিয়ে যাওয়াই যে আমার কাজ। আজ আমি এসেছি এই অন্ধকারের বনে চিঠি বিলি করতে। সে লিখন আমি কার হাতে দিয়ে যাব?

অন্ধকার। না বাপু! চিঠি নেবার লোক এ রাজ্যে কেউ নেই। কেউ এখানে পড়তে পারে না। চোখ বুজে ঘুমোতে সবাই জানে। দেখ বাপু মলয়া, এ বন থেকে তুমি অন্য দেশে চলে যাও। এখানে তোমার চিঠি কোনো কালেই বিলি হবে না।

মলয়া। তবে কি আমি ফিরে যাব?

(ঝলমলে লাল রঙিন পোশাক পরে উষার প্রবেশ)

উষা। না বোন, তুমি ফিরে যাবে কেন? তোমায় সাহায্য করতেই যে আমি এলাম।

অন্ধকার। (মুখ ভেংচে) ও তুমি এলে। তা তোমায় কে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছে শুনি? ঝলমলে লাল টকটকে পোশাক, বিদ্যুতের গায়ের রং, কপালে সোনালি টিপ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে কে তুমি এলে শুনি?

উষা। এতদিন এই বনে ঢোকবার আমি পথ খুঁজে পেতাম না—

অন্ধকার। আজও না হয়—নাই খুঁজে পেতে সে পথ। তোমায় পথ দেখালে কে শুনি?

উষা। আমি উষা। তাই রবির আগমনবার্তা ঠিক সময়মতো আমি পেয়ে গেছি। গগনের কিনারে কিনারে আমারই তো আবির ছড়িয়ে দেবার কথা।

অন্ধকার। ও, তুমি আবির ছড়িয়ে দেবে? আমি কিন্তু সোজা লোক নই, রাঙা উষার মেয়ে। আমি যখন রাগব,—আলকাতরা দিয়ে সব ঢেকে দেব। তখন দেখে নিয়ো তুমি। তাই বলছি আমায় চটিয়ো না।

উষা। কালোকে অন্ধকারকে দূর করে দেওয়াই তো আমার কাজ।

অন্ধকার। আরে কে রে পুঁচকে মেয়েটা! এটা আমার রাজ্যি, আর আমাকেই কিনা দূর করে তাড়িয়ে দিতে চায়। না, এই উষা মেয়েটাকে আগে তাড়াতে হল দেখছি। এরা বসতে পারলে শুতে চায়!

উষা। আমাকে তাড়াবে? আমি রাঙা করে দেব তোমার এই বন।

(উষার নাচ ও গান)

আমি রাঙা উষা জাগি পুব গগনে
শিশু রবি ওঠে তাই শুভ লগনে।
ফাগ মাখি সারা গায়
ও মলয়া সাথে আয়
আলোর পতাকা ধরি বন ভবনে।
অন্ধকারের আমি বিষম অরি
আলোর প্লাবন মাঝে বাহি যে তরী
রাঙা মেঘ ভেসে যায়
পাখি পাশে গান গায়
হাতছানি দিয়ে ডাকি নব-তপনে।

অন্ধকার। ও বাবা। এতক্ষণ অবাক হয়ে তোমার নাচ দেখছিলাম, গান শুনছিলাম। তুমি একা এসে আশ মেটেনি, আবার আর একজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকছ। আমার বনে ওসব চলবে না। বেরোও—বেরোও বলছি শিগগির।

(হঠাৎ কোকিলের প্রবেশ)

কোকিল। কুহু কুহু কুহু। আজ এমন শুভদিনে শুভক্ষণে উষাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? আমিও যে ঘুমের দেশের ঘুম ভাঙার গান শোনাতে এলাম।

অন্ধকার। বটে! ঘুম ভাঙার গান শোনাতে এলে। তোমরা কথাগুলি তো বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বল। কিন্তু এমন বেয়াড়া কেন বল দেখি?

কোকিল। একথাটা তুমি বললে কেন ভাই? বেতালা আমরা চলি না, আর বেসুরো আমরা গাই না।

অন্ধকার। তা তো চলো না, আর গাও না। কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে অন্যের বাড়িতে এমন হুট্ বলতে ছুট করে চলে এস কেন বল তো? কী তোমার নাম?

কোকিল। আমার নাম কোকিল। ভালো খবর থাকলে আমি গান গেয়ে বনভূমিকে জানিয়ে যাই।

অন্ধকার। নাই বা তুমি বনভূমিকে জানালে। এখানে দিব্যি আরামে সবাই ঘুমিয়ে আছে—সেটা বুঝি তোমার সহ্য হচ্ছে না? পরের ভালো তোমরা বুঝি দেখতে পার না?

(কোকিলের নৃত্য-গীত)

কুহু কুহু গান গেয়ে যাই নীরব নিঝুম বনের শাখে।
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাই তো আমায় সবাই ডাকে।
এ বন থেকে বনান্তরে
সুরের ধারা আপনি ঝরে
জগৎ করে কোলাকুলি—সবাই এসে কুশল মাগে
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাই তো আমায় সবাই ডাকে।
সুরের ধারায় স্নান করাব অশান্ত এই ধরা
এ দেশ হবে চিরসবুজ থাকবে নাকো জরা।
জগৎ পারাবারের তীরে
সকল মানুষ জুটবে ফিরে—
আসবে এবার নতুন কবি, আয় না বরণ করি তাকে
বিশ্ব আমার আপন জানি, তাই তো আমায় সবাই ডাকে।

(গানের শেষে ছয়টি ঋতু নাচতে নাচতে বরণডালা সাজিয়ে এসে ঢুকল। তাদের দেখে অন্ধকার খুব ভয় পেয়ে গেল।)

অন্ধকার। ওরে বাবা! তোমরা যে দলে কেবল ভারি হয়ে উঠছ! তোমার গান শুনে এই ছয়জন এসে যে হাজির হল—এরা কারা?

কোকিল। এরা হচ্ছে ছয় ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এই ছয় ঋতু আজকে নতুন কবিকে বিভিন্ন ঋতুর ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে।

অন্ধকার। (ভয় পেয়ে) বরণ বরণ তো করছ। এদিকে আমার যে মরণ হয়ে উঠল। আমি এখন কোথায় যাই—কার পরামর্শ নিই? আমার রাজ্যে এই সব বাইরের লোক কোথা থেকে এসে জুটল! কে শত্রু কে মিত্র আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

গ্রীষ্ম। কেন ভাই—আমরা সবাই তোমার মিত্র। গ্রীষ্মের কালবৈশাখী ঝড়ে যা কিছু অকল্যাণকর আমি দূর করে দেব।

বর্ষা। আমার বর্ষার ঝরঝর বরিষনে মেদিনীকে শস্যশ্যামলা করে তুলব। তোমার বনভূমি সবুজ হয়ে উঠবে।

শরৎ। শরৎকালের মধুরিমায়, শিউলি ফুলের গন্ধে, কাশফুলের দোলনে, শরতের হালকা মেঘের ভেলায় তোমায় কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যাব।

হেমন্ত। হেমন্তের ফসলের প্রাচুর্যে তোমার বনভূমিকে আমি সকল দিক দিয়ে পূর্ণ করে রাখব। অভাব তোমার এতটুকু থাকবে না।

শীত। শীতের দিনে অনুরাগে তোমায় নিবিড় করে কাছে টেনে নেব।

বসন্ত। বসন্তের পুষ্পসম্ভারে আমরা তোমায় আপনার করে নেব। গানে গানে সকল ব্যথা দেব ভুলিয়ে।

অন্ধকার। কথাব মারপ্যাঁচে তোমরা দেখছি আমায় সপ্তম স্বর্গে নিয়ে তুলছ। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি—লোক তোমবা মোটেই ভালো নও। নইলে এই শেষ বাত্তিরে এসে আমার আরামের ঘুমটা নষ্ট করে দাও।

ভোরের পাখি সত্যি বলছি ভাই অন্ধকার, তুমি আমার সঙ্গে মিতালি পাতাও।

মলয়া। আমি তোমার ছোট্ট বোন। ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়ে তোমায় আমি শান্ত করে রাখব। তাহলে বুঝতে পারবে আমরা সবাই তোমার মঙ্গল চাই।

উষা। ভোরের উষার ফাগ মাখিয়ে তোমায় রঙিন করে রাখব। তোমার মনও রঙিন হয়ে উঠবে। যাদের শত্রু মনে করছ, তারা হয়ে উঠবে তোমার আপনার জন।

কোকিল। কুহুতানে আমি তোমার মনের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেব ভুলিয়ে। তাহলে বুঝতে পারবে সারা বিশ্ব তোমার কত আপনার।

অন্ধকার। না না, তোমরা সব মায়াবীর দল। কথায় ভুলিয়ে আমায় বশ করতে চাও। তারপর সুযোগ বুঝে এই অন্ধকার পুরী থেকে আমায় দেবে তাড়িয়ে। বেরোও সব, নইলে আমি একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব—হুঁ।

ছয় ঋতু। সবাইকে তুমি তাড়াতে পার, কিন্তু আমাদের এই ছয়বোনের কথা তোমায় শুনতেই হবে। পাগল ভাইকে কী করে শান্ত করতে হয় তা আমরা জানি!

অন্ধকার। আঁ্যা! তোমরা আমায় ভাই বলে ডাকলে! আমার এই কালো চেহারা দেখে তোমরা ভয় পেলে না? সত্যি করে বলো, আমায় ঘৃণা কর না তোমরা? আমি তোমাদের ভাই। চাঁদের আলোর মতো ফুটফুটে আমার ছয়টি বোন আছে! অন্ধকারের কোটরে বসে একথা আমি কোনোদিনের তরেই ভাবতে পারিনি।

ছয় ঋতু। কেন ভাবতে পারবে না ভাই? সত্যি, আমরা তোমার ছয়টি আদরের বোন। আমাদের অন্ধকারদাদাকে নাচ দেখাতে আর গান শোনাতে এসেছি। আমাদের গান শুনলে নাচ দেখলে তোমার সব অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে। তুমিও এসে আমাদের পাশে দাঁড়াবে।

অন্ধকার। আমার ছটি বোন। কী আনন্দ! তোমরা গাও—আমি চোখ বুজে শুনি।

(ছয়টি ঋতুর গান)

ধূলির ধরায় আমরা ছ-বোন ফুটাই কুসুমরাশি
দুঃখ বেদন সব ভুলিয়ে হাসি মধুর হাসি।
বাজছে মনে প্রীতির বাঁশি
তাই তো ভায়ে দেখতে আসি—
মঙ্গলেরই আমরা মিতা, নইকো সর্বনাশী।
শান্তি-বারি ছিটাই মোরা এই ধরণীর বুকে—
দুখের দিনে কাঁদব আসি, হাসব সাথে সুখে।
রঙিন ফুলের মাল্য গাঁথি
আমরা আবার উঠব মাতি
কান্না হাসির ছয়টি মালায় সবায় ভালোবাসি,
ধূলির ধরায় আমরা ছ-বোন ফুটাই কুসুমরাশি।

(অতি আনন্দে অন্ধকারের চোখে জল এসেছিল)

অন্ধকার। সত্যি তোরা এত ভালো! আর আমি তোদের দূর করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

(নদীর প্রবেশ)

(সুন্দরী শ্যামলী মেয়ে, চোখে মায়া-অঞ্জন, হাতে ধান্যগুচ্ছ)।

নদী। দূর করে তাড়িয়ে দিলে তো চলবে না ভাই। সকলের সাথে ভাব জমিয়ে আমার আসা যাওয়া। কাছে টেনে নেব সবাইকে।

অন্ধকার। তুমি আবার কে বোন? মায়া-অঞ্জন চোখে পরেছ—নীল রঙের বেশ, হাতে ধান্যগুচ্ছ।

নদী। আমি নদী! দেশ দেশান্তরের বুকের ওপর দিয়ে আমি চলে যাই। কবি বলেছেন—যে পথ দিয়ে চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি। আমিও যে পথ দিয়ে যাই দু-পাশ শস্যশ্যামলা করে তুলি। শুধু কী তাই? এক দেশের ভাবধারা আর এক দেশে বয়ে নিয়ে গিয়ে বপন করে আসি। আজ মলয়া খবর পৌঁছে দিলে যে, কবি আসছে। তাই তো তার ভাব, তার ভাষা, তার ছন্দ, তার মিল দেশে দেশে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি। কই আমাদের তরুণ কবি? তার আসবার শুভলগ্ন কি এখনও আসেনি?

কোকিল। লগ্নের আর বেশি বাকি নেই। সেই জন্যেই তো আমি আগে থেকে এসে আগমনি গান গেয়েছি।

নদী। তোমরা গেয়েছ আগমনি, আর আমি বয়ে নিয়ে যাব কবির বাণী। সারা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে রয়েছে কবির বাণী শোনবার জন্য। গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায় চলেছে কানাকানি। সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে প্রহর গুনছে তার পদধ্বনি শোনবার জন্য। কিন্তু কবির বাণী বয়ে নিয়ে যাব আমি।

(নদীর নাচগান)

কুলুকুলু ধ্বনি মোর শুনেছ কানে?
সে শুধু পরান পায় কবির গানে।
ছন্দের জাগে দোল
মধুবাণী.....হিন্দোল
ভাব ও ভাষায় সে যে বন্যা আনে।
(শুনেছ কানে?)

ফুলপরি জেগে ওঠে সে বাণী শুনে
সুরধুনী হেরে যায় ছন্দ গুনে,
জোছনায় পায় লাজ,

তারাদল খোলে সাজ,
শিশু রবি কোন্ সুধা ধরায় আনে।

(পাহাড়ের প্রবেশ)

পাহাড়। কবির আগমনের সংবাদ পেয়ে সুধা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। ছুটে এলাম তোমাদের মাঝখানে—সে সুধার ভাগ নিতে।

অন্ধকার। তুমি কে ভাই? বিরাট তোমার চেহারা সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে। বলিষ্ঠ তোমার দেহ, দীর্ঘ তোমার বাহু। তোমায় তো এ অঞ্চলে কখনও দেখিনি।

পাহাড়। আমি পাহাড়। কবির বাণী লাভ করে আমি ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকব। যুগ যুগ তপস্যা করব সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে। কবি কি এখনও এসে পৌঁছোয়নি? শুকতারা আমায় বলে দিলে যে কবির আসবার সময় হয়ে গেছে।

নদী। শুকতারা, শুকতারা তোমায় খবর পৌঁছে দিয়েছে? তবে আর দেরি নেই। কোথায় ববণ-ডালা? কোথায় মঙ্গলশঙ্খ?

(সাগরের প্রবেশ)

সাগর। মঙ্গলশঙ্খ আমি নিয়ে এসেছি নদী, কবিকে অভ্যর্থনা করে নেব বলে।

অন্ধকার। তুমি কে ভাই? ঊর্মিমালা তোমার শিরে স্তব্ধ হয়ে আছে। তোমার দেহে অসংখ্য মণি-মাণিক্য। দুষ্প্রাপ্য শঙ্খ তোমার হাতে। প্রবাল দিয়ে তোমার কটিদেশ অলংকৃত করেছ। কে তুমি?

সাগর। আমি সাগর। পৃথিবীর লোক আমার নাম দিয়েছে রত্নাকর। কত মণি-মাণিক্য, মুক্তো প্রবাল আমার অতলতলে ধূলির মতো পড়ে আছে। তবও আমার মন ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠে বলে, ওরে সাগর, এত ধনরত্ন থাকতেও তুই নিঃস্ব, তুই সর্বহারা, কবির বাণী বুকে ধারণ করে আয়, তবেই তোর রত্নাকর নাম সার্থক হবে। তাই তো আমি পাতালপুরী ছেড়ে ছুটে এলাম তোমাদের কাছে। কোথায় গেলে কবির দেখা পাব, আমায় বলে দাও।

(সহসা মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা গেল চারিদিক স্নিগ্ধ আলোয় ভবে গেল। এক শিশুকে কোলে নিয়ে পঁচিশে বৈশাখের প্রবেশ)।

পঁচিশে বৈশাখ। কবিকে নিয়ে এলাম আমি। তোমরা সবাই দেখ, নয়ন মন চরিতার্থ কর।

অন্ধকার। কে, কে তুমি? আমি এত আলো সইতে পারছিনে। আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে—আমি পালাই—রবির উদয় হলে অন্ধকার আপনিই মিলিয়ে যায়।

(অন্ধকারের দ্রুত প্রস্থান)

সাগর। কে তুমি? তরুণ রবিকে বক্ষে ধারণ করবার গৌরব লাভ করেছ?

পঁচিশে বৈশাখ। আমি পঁচিশে বৈশাখ। এই তো আমার গর্ব যে, বিশ্বকে দান করছি সেবা রত্ন। এই কবির বাণী শুনে মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে শিখবে। মহামানবের সাগরতীরে সবাইকে আহ্বান করে মানুষ বলতে পারবে, ওরে তোরা সবাই আমার আপন, কেউ পর নোস, সুখে দুঃখে আনন্দে বেদনায়--সবাই সবাইকার ব্যথার ব্যথী। একেব চোখের জল অপরে মুছিয়ে দেবে—জেগে উঠবে এক শান্তিনিকেতন।

(সমবেত নৃত্য-গীত)

এল পঁচিশে বৈশাখ।
ডাক দিল যে প্রাণে প্রাণে সবাই বাজা শাঁখ
ভোরের পাখি থাকি থাকি বললে, খোকা ওঠ—
পুব আকাশেব রঙিন আবির সবাই এসে লোট
ওই মলয়ার ফুরফুরে বায় ফুল ফোটে লাখ লাখ,
সবাই বাজা শাঁখ
এল পঁচিশে বৈশাখ।
কোকিল ডাকে কুহুতানে ছয়টি ঋতু আয়—
সবাই মিলে করবি বরণ সময় বয়ে যায়।
শুনবি নদীর কলধ্বনি
তীরে বসে প্রহর গনি—
নতুন ভারত গড়বে এবার আনন্দ-মৌচাক।
পাহাড়, সাগর দোলনা দোলায় তাদের তোরা ডাক
সবাই বাজা শাঁখ
এল পঁচিশে বৈশাখ।

॥ যবনিকা ॥
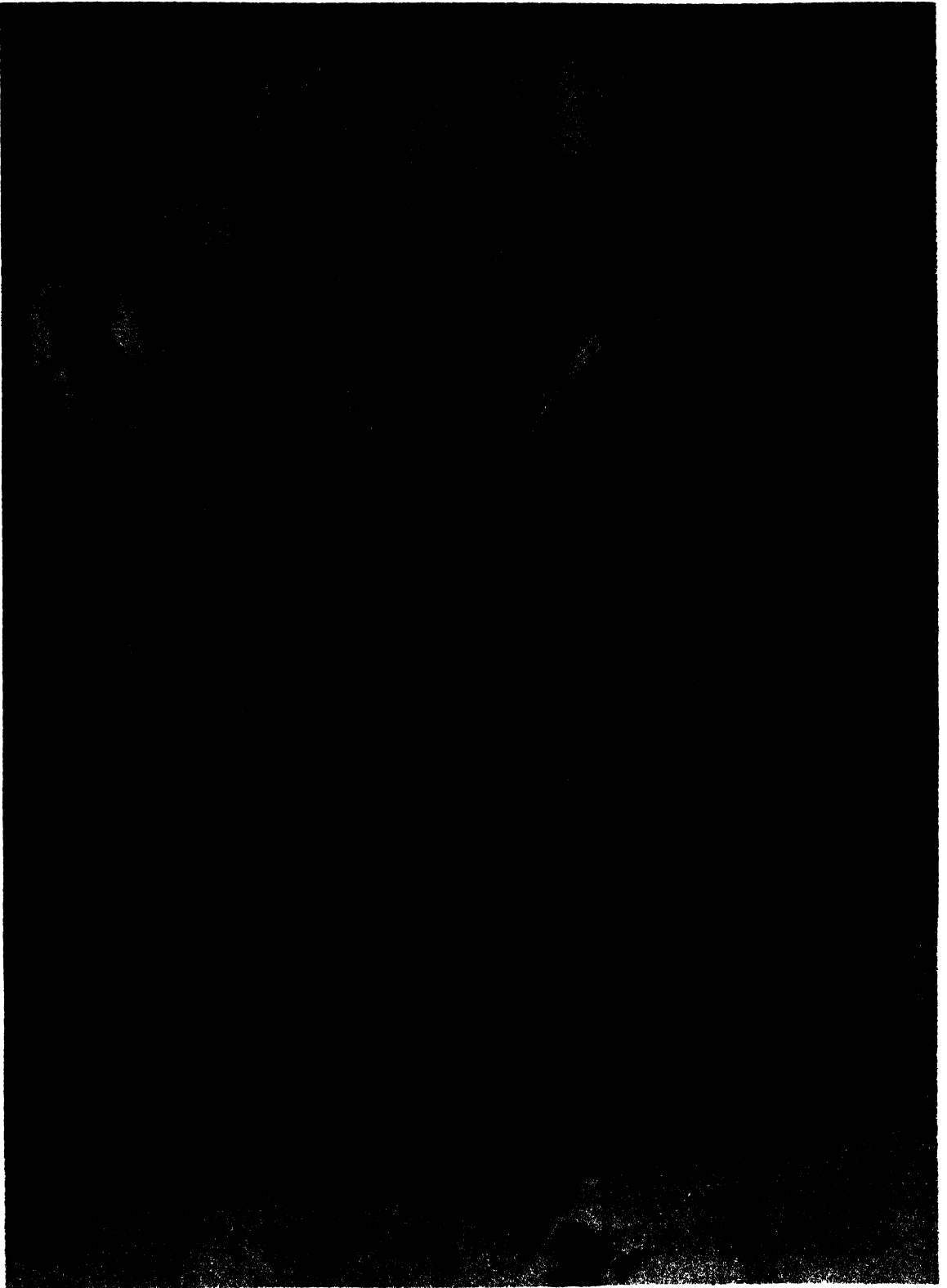
ফুলের কুঁড়ি

শিল্পী · রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝাঁসির রানি

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রস্তাবনা : নেপথ্যে যন্ত্রসংগীত। হতাশার সুর। তার মধ্যে একটি কণ্ঠস্বরে শোনা যাচ্ছে—'মেরী ঝাঁসী দুংগী নহী'। ধাপে ধাপে কণ্ঠস্বর উঠে তিনবারে শেষ হবে। কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যন্ত্রসংগীতের পরদাও চড়বে। তারপর সুর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে পরদা উঠবে।.... গোপালপুরের ছাউনি। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে একাই তাঁবুর মধ্যে পায়চারি করছেন। পটভূমিতে ঢাল, তলোয়ার ও পাঠানি পরিচ্ছদ। তাঁর চোখে-মুখে উদ্‌বেগ ও বিষাদের ছায়া।]

লক্ষ্মীবাঈ। আমার ঝাঁসি, আমার ঝাঁসি, আমার সোনার ঝাঁসি.. (মন্দারের প্রবেশ)

মন্দার। রানিসাহেবা, আপনি এখনও ঘুমোননি! সারারাত জেগে পায়চারি কচ্ছেন! রাত যে ভোর হয়ে এল।

লক্ষ্মীবাঈ। ভোর হয়ে এল! কই মন্দার, আমি যে চারদিক দেখছি অন্ধকার। ঝাঁসির দুর্গচুড়োয় যে শেষ সূর্যরশ্মি দেখেছি মন্দার, সে আর দেখা দেবে না, চিরদিনের মতো সে অস্ত গেছে। (কান্না)

মন্দার। রানিসাহেবা, আপনি যদি ধৈর্য হারান, কুমারের কী গতি হবে?

লক্ষ্মীবাঈ। দামোদর, দামোদর, আমার আনন্দ। ওর বাপ-মার কাছ থেকে ওকে আমি নিয়ে এসেছিলাম কী এজন্যে? একদিনের জন্যেও ভাবিনি ওর ভবিষ্যৎ এমন করে অন্ধকার হবে। (উত্তেজনা) ইংরেজ বিশ্বাসঘাতক! আমি কতখানি নির্ভর করেছিলাম ওদের ওপর, বন্ধুভাবে পেতে চেয়েছিলাম ওদের। কিন্তু ওরা বিশ্বাসের মূল্য দেয় না, বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখে না। ওরা বেইমান। ইংরেজ চায় না, হিন্দুস্থানে কেউ মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে। ওরা চায় সবাইকে ক্রীতদাস করে রাখতে। একটা অনুরোধও ওরা

রাখেনি আমার। শেষ পর্যন্ত জানিস মন্দার, ঝাঁসিতে গোরাহত্যার অপবাদ পর্যন্ত ওরা রটিয়ে দিলে আমার নামে। তোরা তো জানিস আমার তাতে কোনো হাত ছিল না। গোরাদের বাঁচাবার চেষ্টাই করেছিলাম আমি। কিন্তু ক্রুদ্ধ সিপাইরা তাদের রেহাই দিলে না। ইংরেজও জানে এ কথা। তবু জেনে শুনেই ওরা আমাকে হেয় করবার জন্যে এই দুর্নাম রটালে! স্বার্থের জন্য ওরা সব পারে—সব পারে। (থেমে) আনন্দকে তোরা দেখিস মন্দার। আনন্দর মুখের দিকে যখন তাকাই তখন ঝাঁসির সেই কচি কচি মুখগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাদের আর্তনাদ যেন শুনতে পাই। ইংরেজ পশুগুলো তাদের পর্যন্ত বাঁচতে দেয়নি। কচি, যুবা, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পায়নি মন্দার, কেউ রেহাই পায়নি।.... না না, ভালো করিনি মন্দার, ভালো করিনি পালিয়ে এসে ভালো করিনি। উচিত ছিল আমার শেষ রক্তবিন্দু সেখানে পাত করা। লোকে অপবাদ দেবে, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ প্রাণভয়ে পালিয়েছে।

মন্দার। ঝাঁসির রানি যে মৃত্যুকে ভয় করে না, সে কথা আজ বুন্দেলখণ্ড, তামাম হিন্দুস্থানের লোক জানে রানিসাহেবা। আপনি তো নিজের জন্য আসেননি। এসেছেন দেশের জন্যে, দশের জন্যে, এসেছেন ন্যায়ের জন্যে, সত্যের জন্যে, এসেছেন পরপদানত দেশের মুক্তির জন্যে।

লক্ষ্মীবাঈ। আমার এই প্রাণের জ্বালা কি কেউ বুঝবে মন্দার? বুঝি মা ধরিত্রীর অন্তরেও এত জ্বালা নেই। যদি থাকত তবে ভূমিকম্পে এতদিনে সমস্ত ধ্বংস হয়ে যেত, মন্দার।.. আমি যখন ভাবি, ঝাঁসির দুর্গশিরে আর সেই রক্তনিশান নেই, সেখানে ইংরেজের পতাকা আজ পতপত করে উড়ছে তখন আমার প্রাণের মধ্যে সমুদ্রের উত্তাল আলোড়ন হয়, মন্দার। মনে হয় একটা প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গিয়ে সেই পতাকা ধুলোয় লুটিয়ে দিই।... কিন্তু আজ আমি শক্তিহীন, দুর্বল, অসহায়। কোথায় আমার সেই নলদার, কড়কবিজলি, ভবানীশংকর, অর্জুন, সমুদ্রসংহার কামান, যাদের ঘন গর্জনে শত্রুর হৃৎকম্প উপস্থিত হত। কোথায় সেই বীরাঙ্গনা রাজনর্তকী মোতিবাঈ যে কামান দাগতে দাগতে হাসিমুখে ঝাঁসির জন্যে প্রাণ দিল! কোথায় আমার সেই প্রবীণ গোলন্দাজ গালাম ঘৌস খাঁ যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ঝাঁসির ঋণ শোধ করল। জগতে কেউ কি কোনোদিন শুনেছে, ডান হাত গেলে বাঁ হাত দিয়ে কামান চালায়! সেই বীরশ্রেষ্ঠ খুদাবক্সও নেই। অঙ্গন ছেড়ে যে নারীর দল রণাঙ্গন বেছে নিয়েছিল, তুই ছাড়া আজ তাদেরও কেউ নেই আমার পাশে। একে একে সবাইকে হারিয়েছি আমি। নেই আফগান, নেই পাঠান, নেই বুন্দেলি বীর সেনার দল। কোথায় সে সমস্ত ফকির ও সন্ন্যাসী যারা এসে দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। ঝাঁসির জন্যে, আমার ঝাঁসির জন্যে প্রাণ দিয়েছে তারা। শুধু বেঁচে আছি আমি। কেন আছি? কী হবে বেঁচে থেকে? যদি সাথি গেল, দেশ গেল সবই গেল, তবে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে বেঁচে থেকে আমার কী লাভ, বলতে পারিস মন্দার?

মন্দার। যতদিন জীবন ততদিন আশা। আশায় বুক বেঁধে আপনাকে কাজ করে যেতে হবে, রানিসাহেবা। আপনি ঝাঁসি হারিয়েছেন, কিন্তু জয় করেছেন গোটা হিন্দুস্থানের হৃদয়। তামাম হিন্দুস্থানের লোক আজ রানি লক্ষ্মীবাঈর মুখের দিকে চেয়ে।

লক্ষ্মীবাঈ। তাই ভেবেই তো আমি ইংরেজের কাছে মাথা নোয়ায়নি। জানতাম ইংরেজের অস্ত্রবল বেশি, তাদের সৈন্যরা সুশিক্ষিত, আধুনিক যুদ্ধে তারা পারদর্শী, কিন্তু সে-হিসেব আমি করিনি। আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের সিপাইদের দেশপ্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে, ইংরেজের ঔদ্ধত্যকে তারা চূর্ণ করবে। নানাসাহেব, রাও সাহেব, তাঁতিয়া তোপি গোড়ায় আমাকে বুঝতে পারেননি। তাঁরা দেখেছিলেন পেশোয়াশাহি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন! বিলাসব্যসনে মত্ত যে পেশোয়ারা নিজেদের

পতনকে ডেকে এনেছিলেন সেই পেশোয়াশাহি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে দেশের লোক যে উৎসাহী হবে না, প্রাণ দিতে এগিয়ে আসবে না, তা আমি জানতাম। আর জানতাম বলেই তাঁদের সামনে তুলে ধরেছিলাম দেশপ্রেমের আদর্শ, সারা হিন্দুস্থানকে ইংরেজ-কবল থেকে মুক্ত করার কর্মসূচি। ইংরেজরা আমার এই অভিপ্রায় হয়তো বুঝতে পেরেছিল। তাই ঝাঁসির ওপর তাদের এত রাগ। নানাসাহেব, রাওসাহেব, তাঁতিয়া তোপি বিলম্বে হলেও আমাকে সমর্থন করেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়। বিদেশির প্রসাদ পেয়ে তাঁরা দেশদ্রোহী হলেন। আমাদের দিকে এলেন বানপুরের রাজা, জগদীশপুরের কুমার সিংহ, বান্দার নবাব। সারা দেশে আগুন জ্বলল, বিদ্রোহী সিপাইদের শানিত তরবারি বিদ্যুতের মতো ঝলমলিয়ে উঠল; কিন্তু মন্দার, সেই দাবানল যে আজ ক্রমশ নিভে আসছে দেখছি। এত প্রাণ, এত ত্যাগ, এত মহত্ত্ব দিয়েও আমরা ইংরেজকে পরাস্ত করতে পারলাম না!

মন্দার এখনও বান্দার নবাব আছেন, তাঁতিয়া তোপি আছেন, রাওসাহেব আছেন। সবার ওপরে আছেন আপনি. . আপনি নিরাশ হলে সমস্তই ব্যর্থ হবে। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের আবার সংহত করুন। তাদের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা আনুন।

লক্ষ্মীবাঈ। ভেজা বারুদে আগুন দিলেও তা জ্বলবে না, মন্দার। ঝাঁসি ত্যাগ করে এলাম আবার তাকে ফিরে পাব বলে। তাঁতিয়া তোপি যদি বেতোয়ার যুদ্ধে না হারতেন, তবে হয়তো ঝাঁসি আমাকে ছাড়তে হত না। ঝাঁসি ছেড়ে এলাম কালপিতে। আমাদের না জানিয়ে তাঁতিয়া তোপি চলে গেলেন অন্যত্র। রাওসাহেব সৈন্য চালনার পূর্ণ দায়িত্ব দিতে ভরসা পেলেন না আমার ওপর। কালপিতেও যুদ্ধে হারলাম আমরা। পালিয়ে এসেছি এই গোপালপুরে। ইংরেজ সেনাপতি হিউরোজ আজ বিজয়গর্বে গর্বিত। আমাকে বন্দি করতে চায় সে। ধরা পড়ে হয় বিদেশির হাতে লাঞ্ছনা, নয়তো আজীবন অজ্ঞাতবাস। এই তো আমার পরিণতি?

মন্দার। (চমকে উঠে) দোরে পায়ের শব্দ!

লক্ষ্মীবাঈ। কে?

চর। (নেপথে) আমি রাওসাহেবের চর।

লক্ষ্মীবাঈ। ভেতরে এসো। (চরের প্রবেশ) কী খবর?

চর। তাঁতিয়া তোপি ও বান্দার নবাব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

লক্ষ্মীবাঈ। আসতে বলো।

চর। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

লক্ষ্মীবাঈ। যা মন্দার। আনন্দ হয় তো এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে। তার খাওয়ার ব্যবস্থা কর গে।

মন্দার। কাল থেকে অনাহারে আছেন। আপনাকেও কিছু মুখে দিতে হবে রানিসাহেবা।

না, মনঃস্থির না করা পর্যন্ত আমি জলগ্রহণও করব না। তুই যা! (মন্দারের প্রবেশ)

তাঁতিয়া তোপি ও নবাব। (একসঙ্গে) জয় হোক রানিসাহেবা।

লক্ষ্মীবাঈ। জয় হোক, হিন্দুস্থানের। আসুন নবাব সাহেব, আসুন তাঁতিয়া তোপি। আসন পরিগ্রহ করুন। (দু-জনের প্রবেশ ও উপবেশন)

নবাব। মেজর রস সেদিন চারদিক থেকে আপনাকে যেভাবে ঘিরে ফেলেছিলেন আর তা থেকে আপনি যেভাবে বেরিয়ে এলেন—ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। অদ্ভুত আপনার রণকৌশল!

লক্ষ্মীবাঈ। . আমাব তাতে কোনো কৃতিত্বই ছিল না, নবাব সাহেব। আড়াইশ' আফগান নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আমাকে সেদিন উদ্ধার না করলে বেরিয়ে আসার সাধ্য আমার ছিল না।

ত শুনলাম, আপনার সেই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে বিস্ময়ে ব্রিটিশ গোলন্দাজরা গোলাবর্ষণ করতে ভুলে গিয়েছিল। উন্মুক্ত কৃপাণ নিয়ে সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলেছিলেন আপনি। নীল চন্দেরির পাগড়ি কখন যে পড়ে গিয়েছিল খেয়াল ছিল না আপনার। শিরে লৌহশিরস্ত্রাণ ঝল্‌মল্ করছিল উজ্জ্বল সূর্যকিরণে। গলায় মুক্তোর মালা দুলছিল অবিরাম। বারবার অসীম উৎসাহে ভারতীয় ফৌজদের বরাভয় দিচ্ছিলেন, "হর হর মহাদেব।"

লক্ষ্মীবাঈ। তবু তো পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই ফিরতে হল তোপি সাহেব।

তাঁতিয়া। সেজন্য আমিই দায়ী, রানিসাহেবা। ভেবেছিলাম, আপনি রইলেন, রাওসাহেব রইলেন, নবাব সাহেব রইলেন, সম্মুখ-সংগ্রামে আপনারাই যথেষ্ট। এগিয়ে গিয়ে পৃষ্ঠদেশ থেকে হিউরোজের বাহিনীকে আক্রমণ করব বলে আপনাদের না জানিয়েই আমি আমার সৈন্যদল নিয়ে কালপি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি তা করা আমার ভুল হয়েছিল। এজন্য আমি অনুতপ্ত।

নবাব। রাওসাহেবও কম ভুল করেননি। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, হঠাৎ তখন তিনি রানিসাহেবাকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে নিজ হাতে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাতেই তো আমাদের সমস্ত সৈন্যের মনোবল ভেঙে গেল।

লক্ষ্মীবাঈ। রাওসাহেব যে এখনও পেশোয়াশাহির স্বপ্ন দেখছেন! সৈন্যদের সঙ্গে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে, আমি মিশতাম, রাওসাহেব তা পছন্দ করতেন না। ভাবলেন আমি বুঝি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি তাতে কিছু মনে করিনি। জানতাম, কারও তখ্‌তই থাকবে না যদি কালপির যুদ্ধে আমরা পরাজিত হই। সিপাইদের, গ্রামবাসীদের আমি সে-কথাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু রাওসাহেব বুঝলেন বিপরীত। এ সংকীর্ণতা, এই স্বার্থপরতাই আমাদের পরাজয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে। সিপাইরা সংগ্রাম করছে কারও সিংহাসন রক্ষার জন্যে নয়, তারা প্রাণ দিচ্ছে স্বাধীনতার জন্যে, এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত সকলে তা উপলব্ধি করতে পারেননি। নিজ নিজ স্বার্থকেই তাঁরা বড়ো করে দেখছেন।

(নেপথ্যে গান)

"কভি মরনা হ্যায়, ভাই আজ মরুঙ্গা।
বাঈকে লিয়ে জান আবাদ করুঙ্গা।
শম্‌সির সে কাট্‌কে মার তেলেঙ্গা।
জঁহামে আপ্‌না নাম রখুঙ্গা।"

(আবেগভরে) কে! কে এই গান গায়! তোপি সাহেব, ওকে নিয়ে আসুন, ভেতরে নিয়ে আসুন ওকে।

তাঁতিয়া। যাচ্ছি, রানিসাহেবা। (প্রস্থান)

লক্ষ্মীবাঈ। কে আবার আমার ধমনীতে ধমনীতে হিম শোণিতকে উষ্ণ করে তুলল! কে আবার আমার নিরুদ্যম প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করল। আমি যেন বুন্দেলখণ্ডের, তামাম হিন্দুস্থানের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

(চারণ ও তাঁতিয়ার প্রবেশ)

লক্ষ্মীবাঈ। কে! কে তুমি?

চারণ। আমি চারণ, মা। তোমার নাম শুনেছি, রানিসাহেবা। আজ দেখে দু-চোখ আমার ধন্য হল। জিতা রহো।

লক্ষ্মীবাঈ। কোথায় পেলে তুমি এই গান?

চারণ। এ গান আজ মা ঘরে ঘরে, লোকের মুখে মুখে। এ গান খুঁজে পেতে হয় না। তোমার নাম, তোমার যশ, তোমার কীর্তি আজ বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশে দেশে। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে আজ তোমারই কথা।

লক্ষ্মীবাঈ। বলো বলো চারণ, তারা কী বলছে। (সখেদে) পরাজিতা পলাতকা ঝাঁসির রানি...

চারণ। না মা, ঝাঁসির কি পরাজয় আছে! তারা জানে তুমি সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি। তোমার মুক্ত কৃপাণ আবার ঝলমল করে উঠবে। তোমার লয় নেই, ক্ষয় নেই; তুমি অবধ্য, অজেয়। তারা কী বলে শুনবে মা? তারা বলে, আবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে তুমি আত্মগোপন করে আছ।

লক্ষ্মীবাঈ। কী করে শক্তি সঞ্চয় করব, চারণ! কাদের নিয়ে সংগ্রাম করব?

চারণ। মা দেশের লোক যে তোমায় চায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরছি। ইংরেজরা দেশ জয় করেছে, কিন্তু মানুষের মন তো জয় করতে পারেনি। ওরা যখন রসদের জন্যে আসে তখন গ্রামের লোক কী বলে জান? তারা বলে,—টাটকা দুধ এখানে কোথায় মিলবে? তরিতরকারি এখানে পাওয়াই যায় না। হাঁস, মুরগি, পাঁঠা এখানে কোনোদিনই ছিল না। ঘি, মধু বা লেবুর নামই শোনেনি তারা কোনোদিন। ঘোড়ার ঘাস? সে তো আগুনে

পুড়ে গেছে।—শত্রুরা কিচ্ছু পাচ্ছে না মা, সেখানে কিচ্ছু পাচ্ছে না।

লক্ষ্মীবাঈ। বলো বলো চারণ, আরও বলো।

চারণ। লোককে যাতে ফাঁসি না দিতে পারে তার জন্যে সমস্ত গাছ কেটে ফেলেছে গাঁয়ের লোক।

লক্ষ্মীবাঈ। (আবেগে) হিন্দুস্থান হামারা, চারণ, হিন্দুস্থান হামারা! চারণ, চারণ, আমি যেন মৃত প্রাণে জীবন ফিরে পেলাম। ইংরেজ দেখুক, হিন্দুস্থানকে জয় করা এত সহজ নয়।... কিন্তু আমি কী করি? পথ... পথ, পথ একটা খুঁজে বার করতেই হবে। কোন্‌দিকে পথ? কোন্ পথে গেলে আমি আবার ঝাঁসিকে ফিরে পাব? ছত্রভঙ্গ সৈন্য, সেনানীরা নিরুদ্যম, নেতারা বিচলিত—কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে আমাদের সামনের দিকে। শতবর্ষ পরে যে স্বাধীনতার ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়েছে হিন্দুস্থানের লোক—রাহু এসে তাকে আবার গ্রাস করবে, আবার অন্ধকার করে দেবে চারদিক, তা তো হতে পারে না। (পায়চারি করতে থাকেন) পথ?... পথ?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, পথ পেয়েছি, পথ পেয়েছি। গোয়ালিয়র দখল করতে হবে। গোয়ালিয়র।

তাঁতিয়া। গোয়ালিয়র।

লক্ষ্মীবাঈ। হ্যাঁ, তোপিসাহেব, গোয়ালিয়র। আমি খবর পেয়েছি, সেখানকার ফৌজের একটা বড়ো অংশের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। প্রয়োজন হলে তারা ইংরেজের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করবে। গোয়ালিয়র জয় করে তাদেরকে আমাদের দিকে টানতে হবে। অসন্তুষ্ট সৈন্যদের দমনের জন্যে সিন্ধিয়া ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ইংরেজের সাহায্য এসে পৌঁছনোর আগেই আমাদের সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

নবাব। কিন্তু গোয়ালিয়র দখল করা কি ঠিক হবে রানিসাহেবা? নিজেদের মধ্যে বিরোধ?

তাঁতিয়া। আমি বুঝতে পেরেছি। রানিসাহেবা ঠিকই বলেছেন। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

লক্ষ্মীবাঈ। মহারাষ্ট্রে ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে হবে। গোয়ালিয়র থেকে সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, বাহন, অর্থ, রসদ সংগ্রহ করে আমরা চলে যাব দক্ষিণ পথে। বর্ষা সমাগত। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ খরস্রোতা পার্বত্য নদীগুলো ব্রিটিশ ফৌজকে বাধা দেবে। সেই অবসরে আমরা মহারাষ্ট্রের দুর্গম পর্বত ও অরণ্যে এক দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব।

চারণ। জয় হোক ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈর।

লক্ষ্মীবাঈ। যান নবাবসাহেব, আপনার সৈন্যদলকে এই নতুন সংবাদ দিন। তারা উৎসাহিত হবে। তোপিসাহেব, আপনি রাওসাহেবকে গিয়ে বুঝিয়ে বলুন! এ না করলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। ছাউনি তুলে আজই আমাদের রওনা হতে হবে। সামান্য বিলম্বে আমাদের সর্বনাশ হতে পারে।

চারণ। রানিসাহেবা, আমি বিস্মিত হচ্ছি আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে! বাইশ বছরের কোনো রমণীর এমন বিচক্ষণতা এর আগে দেখিনি বা শুনিনি।

লক্ষ্মীবাঈ। আর বিলম্ব নয়। গোয়ালিয়র যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হোন আপনারা। আবার জ্বলে উঠুন সকলে একসঙ্গে। বিদেশিরা দেখুক, হিন্দুস্থানের আগুন আজও নেভেনি। আর জানুক, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ আজও বেঁচে আছে। (রানি বাদে সকলের প্রস্থান)

লক্ষ্মীবাঈ। মন্দার।

মন্দার। (নেপথ্যে) যাই রানিসাহেবা।

(মন্দারের প্রবেশ)

লক্ষ্মীবাঈ। মন্দার, আমাকে একবার ভালো করে রণসাজে সাজিয়ে দে তো।

(মন্দার, বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে)

লক্ষ্মীবাঈ। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো করে। তেলংগরা দেখুক, ঝাঁসির রানির বুদ্ধিও তার হাতের তলোয়ারেরই মতো খেলে। দে দে, শিগ্‌গির সাজিয়ে দে আমায়, শিগ্‌গির সাজিয়ে দে। (রানি ঘুরে পেছন দিকে মুখ করে দাঁড়ান। মন্দার তাঁকে সাজাতে থাকে। নেপথ্যে বিগ্‌ল বাজে। ধীরে ধীরে পরদা নেমে আসে।)

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

প্রথম দৃশ্য—পুতু-বুড়ির ঘরের ভিতর

[রঙ্গমঞ্চ বা স্টেজের ওপরটা নীল আলোর আবছা অন্ধকারে ঢাকা—পেছনে একটা খোলা জানালা দিয়ে সন্ধ্যার চাঁদ দেখা যাচ্ছে—পুতু-বুড়ির ঘরের চারধারে রকমারি সাজের পুতুলরা সব কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে (একটুও নড়তে পাবে না যারা পুতুল সেজেছে)—পেছনে বাজবে একটা করুণ সুরের বাজনা।]

(পুতু-বুড়ি একবোঝা শুকনো কাঠ মাথায় নিয়ে প্রবেশ করলে, কাঠ নামিয়ে ছুটে গিয়ে পুতুলদের সবার গালে চুমো খেলে, আদর করলে, কিন্তু তারা কিছুই কেউ বললে না, কইলে না।)

পুতু-বুড়ি। এমন সোনার দেশ! গাছে গাছে যার দোয়েল কোয়েল শ্যামা ডাকে—অথই দিঘির কালো জলে রুই কাতলা খেলে বেড়ায়—মাঠে মাঠে সোনার বরন ধানের শিস হাওয়ায় দোলে সে দেশে 'মানুষ' নেইকো! ভালো মজা করেছ জাদুকর! যাদের দিয়ে এ দেশের ঘরবাড়ি, হাটবাজার সাজিয়ে রেখেছ, তাদের দেখলে 'মানুষ' বলেই মনে হয়। চোখ, মুখ, নাক, কান, জামা, কাপড়—সবই তাদের মানুষের মতো; কিন্তু নেই তো তাদের মানুষের প্রাণ, রক্তে তাদের নেই তো উত্তাপ, মুখে তাদের নেই তো জোরালো ভাষা। পরের দুঃখে তারা মানুষের মতো কাঁদতে পারে না। যারা তাদের আঘাত করে, তাদের পালটা আঘাত দেবার শক্তি—তাও নেই। (দীর্ঘশ্বাস) কিন্তু ওরা হাঁটে, চলে—সে তো পরের হাতের দড়ির টানে; আমি যদি নাচাই তবেই নাচে। এদের নিয়ে একলাটি যে আর পারি না আমি এ সোনার দেশে বেঁচে থাকতে। (হতাশ হয়ে বসে পড়ল) মনে হয় যে দিকে দু-চোখ যায় যাই চলে—কিন্তু তাই বা যাই কেমন করে? আমি চলে গেলে ওদের কে দেখবে? রং ময়লা হয়ে যাবে, পোকায় কাটবে ওদের দেহ! সেও যে সইতে পারি না—জাদুকর যে বলে দিয়েছে ওদের আমি মা! জাদুকর বলেছে এরাই একদিন মানুষ ছিল, আবার মানুষ হবে—কিন্তু সে কবে? কবে? (আকুল হয়ে) জাদুকর! কোথায় তুমি, এদের মানুষ করে দিয়ে যাও। বলে দাও কবে এরা মানুষ হবে। (মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পুতু-বুড়ি মূর্ছা গেল।)

[সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্টেজ অন্ধকার হয়ে গেল, অন্ধকারে জাদুকর স্টেজের মাঝখানে পুতু-বুড়ির পেছনে দাঁড়াবে, তারপর চারধারে জোরালো আলো উঠবে জ্বলে।]

জাদুকর। কাঁদিস কেন পুতু-বুড়ি
কেঁদে কী আর হবে?
এরা সবাই মানুষ হবে কবে?
সে কথা কেউ বলতে নারে—
বিশ্ব-বিপুল ভবে।
মানুষ হওয়ার তরে
এরা যদি চেষ্টা নাহি করে
সাধ্য কি মোর ওদের মানুষ করি,
তাই তো ওদের দুঃখে আমি নিজেই
কেঁদে মরি।

শুধু কি তাই!
এদের মানুষ গড়ার তরে
কতরকম বেশে।
এদের দেশেই জন্মেছিলাম
যুগে যুগে এসে।

বিলিয়ে গেছি ধর্মকথা,
সাহিত্য আর কাব্য, ছবি।
পরের হাতের পুতুল ওরা,
ওদের কাছে ব্যর্থ সবি।

[এরপরই জাদুকর আস্তে আস্তে চলে যাবে, আলো আগের মতোই আবছা অন্ধকার হয়ে উঠবে, তারপর পুতু-বুড়ির মূর্ছা ভাঙবে, সহসা উঠবে কেঁদে।]

পুতু-বুড়ি। জাদুকর! তুমি কি এসেছিলে এই পুতুলের দেশে? আমি যেন দেখলুম, তুমি এলে একাধারে কবি, শিল্পী, কারিগর, ঋষি আর কর্মীর মিলিত মূর্তি ধরে—এলে যদি আবার গেলে কেন? (ছুটে গিয়ে জানালার বাইরে তাকাল) কাকেই বা জিগ্যেস করি? জাদুকর কি সত্যি এসেছিল এ দেশে? এ প্রশ্নের জবাব দেবার মতো একটি প্রাণীও যে খুঁজে পাই না কোথাও? কী করি— কোথায় যাই? (ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য—বন

[নানারকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে—পুতু-বুড়ি কাঠ কুড়ুচ্ছে—এমন সময় 'হুক্কা-হুয়া' ডাক। রতা-শেয়াল খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর 'ক্যা হুয়া হুক্যা হুয়া' করে ডাকতে ডাকতে চারপায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল দূরে]

পুতু-বুড়ি। (অবাক হয়ে) এ আবার কোন্ সৃষ্টিছাড়া জীব! চেহারাটা দেখছি শেয়ালের মতো—খুব মজা। ভাবি আনন্দ! তবু এতদিনে একটা জ্যান্ত প্রাণীর দেখা পেলুম এদেশে! ওটা বোধ হয় অন্য কোনো দেশ থেকে

ছিটকে এসে পড়েছে এ দেশে। আহা! হাজার হলেও শেয়াল তো! মানুষ হলেও না হয় দুটো কথা কয়ে সুখ পেতুম! তবে শুনেছি জন্তুদের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে ধূর্ত।

রতা-শেয়াল। হুক্কা হুয়া! আমি কথা বলতে পারি কিন্তু!

পুতু-বুড়ি। (স্বগত) তাইতো এ যে আরও আশ্চর্যি ব্যাপার! শেয়াল কথা বলে? বেচারা দেখছি খোঁড়াচ্ছে, কে বুঝি ওর ঠ্যাঙ্‌ ভেঙে দিয়েছে? যখন ও কথা বলছে, দেখিই না ওর সঙ্গে কথা বলে? (রতা-শেয়ালের কাছে এগিয়ে) তুমি কোন্‌ দেশের শেয়াল? এ দেশের শেয়ালরা তো কথা বলতে পারে না।

রতা-শেয়াল। হাসালে যা হোক! এদেশ তো পুতুলের দেশ, কী করে শেয়ালে কথা বলবে বল? আমি আসছি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পারের আজব রাজ্য থেকে। যে দেশের মানুষরা মারামারি কাটাকাটি হিংসা করতে করতে সব বাঘ ভাল্লুক হায়েনা, সিংহ আর শেয়াল হয়ে গেছে, সেই দেশ থেকে।

পুতু-বুড়ি। তাই নাকি! তেমন দেশও আছে? বিধাতার সবই অপূর্ব খেলা; কোনো দেশের 'মানুষ' কাজকর্ম, সাধনা না করে হয়ে পড়ে 'পুতুল'—আর কোনো দেশের মানুষ মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা করতে করতে হয়ে পড়ে জানোয়ার। আচ্ছা, তোমার নাম কী? আর কেনই বা তুমি হঠাৎ এ দেশে এলে?

রতা-শেয়াল। আমার পরিচয়? 'রেনার্ড দি ফক্স'-এর নাম শুনেছ তো? আমি তারই ভায়রাভাই। নাম আমার মস্ত—সে তুমি উচ্চারণ করতে পারবে না। আমাকে তুমি 'রতা' বলেই ডেকো—এ দেশে এসেছি কেন জানো, শুনলুম এ দেশে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায় সবাই, তাই ভাবলুম কাঁঠাল এ দেশে খুব ফলে, খাবারদাবার অফুরন্ত মেলে। দেশে খেতে পাই না পেট ভরে—আমায় তুমি খেতে দেবে? (বলেই রতা একেবারে পুতু-বুড়ির পা জড়িয়ে ধরল—যাবার সময় দাঁত খিঁচিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে একটা দুষ্টু মতলবের হাসি হেসে গেল।)

তৃতীয় দৃশ্য—পুতু-বুড়ির ঘর

[ঘরের চারধারে পুতুলরা সব দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট-কাঠ হয়ে—'রতা-শেয়াল' একটা বাটিতে কী যেন নিয়ে খাচ্ছে। পুতু-বুড়ি একটি পুতুলের হাত ধরে নাচাচ্ছে আর গাইছে।]

(নাচের সঙ্গে গান)

আবার তোরা 'মানুষ' হয়ে
জীবন নাচের ছন্দ লয়ে
নৃত্যে ধরা জাগিয়ে তোল্‌
জাগিয়ে তোল্‌ দে দোল্‌ দোল্‌

তোদের নাচে উঠুক ফুটি
দুঃখ-সুখের কমল দুটি
আনন্দেরই কলরোল
জাগিয়ে তোল দে দোল্‌ দোল্‌

পরের হাতের 'পুতুল' হয়ে
থাকবি কি সব অন্ধ হয়ে
তোদের জ্ঞানের চক্ষু খোল
নৃত্যে ধরা জাগিয়ে তোল্‌ দে দোল্‌ দোল্‌।

[নাচ থামল—পুতু-বুড়ি পুতুলটিকে নিয়ে গিয়ে অন্য সব পুতুলের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সব পুতুলের গালে একটি করে চুমু খেল।]

পুতু-বুড়ি। কেমন লাগল নাচ?

রতা-শেয়াল। বিচ্ছিরি! বিচ্ছিরি! একটুও ভালো না—দেখনি তো আমাদের দেশের শ্যালিদের নাচ! নাচের কথা এখন থাক্‌—দেখ পুতু-মাসি! আমি তো নাচ দেখতে আসিনি এ দেশে—যে জন্যে এসেছি—সেই কাঁঠাল খাওয়াও, তোমার হাতের রান্না খেলাম বটে, তবে বেশ তৃপ্তি হল না, পেট ভরল না; নিরামিষ্যি কিনা, মাংস-টাংস না হলেও কাঁঠাল তো চাই!

পুতু-বুড়ি। তাইতো। নিরামিষ্যি খেতে বেচারার ভারি কষ্ট হল, খিদে মিটল না। আচ্ছা বাছা, রাগ করিস না, আমি এক্ষুনি বনে গিয়ে কাঁঠাল নিয়ে আসছি (পুতু-বুড়ি কাঁঠাল আনতে চলে গেল)।

[রতা-শেয়াল উঠে গিয়ে যারা পুতুল সেজেছে তাদের কারও কান, কারও নাক টানতে লাগল—তাদের গলার হার, হাতের চুড়ি, সব খুলে নিয়ে পকেটে পুরতে লাগল।]

রতা-শেয়াল। পুতু-বুড়ির ভারি আশা এই পুতুলরা মানুষ হয়ে উঠবে। হাঃ হাঃ হাঃ মানুষ হয়ে উঠে ওরাই আমাকে শ্যালতাড়া করে তাড়াবে এদেশ থেকে—এটা যেন আমি আর বুঝি না। পুতুলের আবার আদর কত—গায়ে সোনার গহনা, রেশমি কাপড়! 'মানুষ' হয়ে ওঠার আগে ও সমস্ত কেড়ে নেওয়াটাই ঠিক। ওরা যাতে শক্ত সমর্থ না হতে পারে—ওদের শেয়াল-নাচের লোভ দেখিয়ে এমন নাচ নাচাব যে, সবাইকার হাত পা খোঁড়া করে বেটাদের পঙ্গু অসহায় করে ঘর থেকে টেনে নিয়ে ফেলে দেব বিপথে কুপথে। তারপর আর আমায় পায় কে? 'পুতু-বুড়ি' ও আমার কে? কেউ নয়। নাঃ আর দেরি করা ঠিক হবে না। বুড়ি ফেরার আগে আমার কাজ গুছিয়ে নিই।

[তারপর যারা 'পুতুল' সেজেছে রতা-শেয়াল তাদের একে একে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বাইরে ফেলে আসতে লাগল, তারপর শেষ পুতুলটিকে বিদেয় করে দিয়ে—ঘরে ঢুকল মেলাই গয়না কাপড় নিয়ে—মুখে চোখে খুব আনন্দ।]

রতা-শেয়াল। ওরা হবে 'মানুষ'? ওদের সর্বস্ব কেড়ে নিলুম, কেউ একটি টুঁ শব্দ করলে না, ওরা হবে মানুষ! যাক, এখন সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এতদূর আসাটা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। মিষ্টি কথায় বুড়িকে ভুলিয়ে কাজ হাসিল করেছি। বুড়ি টের পেলেই বা আমার কী করবে? এদেশে মানুষ থাকত যদি তাহলে ভয়ের কথা হত। এবার নিজের জাতভাইদের ডেকে এনে এইখানে 'শেয়াল-রাজ্য' গড়ে তুলব। আর এ দেশের পুতুলগুলোর নাকে দড়ি দিয়ে নাচাব। বুড়ি আসবার আগেই পালানো যাক্। (রতা-শেয়াল গয়না-কাপড় সব পুঁটলি বেঁধে নিয়ে সরে পড়ল।)

[সঙ্গে সঙ্গে স্টেজের পিছনে একটা করুণ সুরের বাজনা বাজতে থাকবে। পুতু-বুড়ি এক ঝুড়িতে ফল আর কাঁঠাল নিয়ে ঢুকল।]

পুতু-বুড়ি। (ঝুড়ি নামিয়ে) ওমা! ঘর যে খালি! আমার নয়নের মণিরা সব কোথায় গেল? কে তাদের পথ ভুলিয়ে নিয়ে গেল রে? কই 'রতা' কই! তবে কি এ তারই কাণ্ড! তাকে আমি ঘরে এনে এত আদর-যত্ন করলুম, এত খাওয়ালুম, আর শেষটায় কিনা সে এই কাণ্ড করলে!—জাদুকর! জাদুকর! দেখে যাও তোমার হাতে গড়া পুতুলরা আমার দিকে ফিরে না তাকিয়ে চলে গেল। ওরে আমার শ্যামল স্নেহে মানুষ-করা বুকের মানিকরা ঘরে ফিরে আয়। ফিরে আয় তোদের ঘরে—একবার ফিরে তাকা তোদের ঘরের দিকে—পরের কথায় নেচে কোথায় চলেছিস। একবার বুঝে দেখ তোরা! (মূর্ছা)।

[নতুন মানুষরা জাদুকরকে ঘিরে নাচতে নাচতে গান গেয়ে ঢুকল—নতুন মানুষদের সবার হাতেই সাজিতে ফুল। সমস্ত রঙ্গমঞ্চ জোরালো সবুজ আলোয় আলো হয়ে উঠল।]

(নতুন মানুষদের গান)
কাঁদিস না মা, কাঁদিস না মা
মোছ চোখের জল
চেয়ে দেখ্ আমরা হাজির
নতুন মানুষ দল
থেকে তোর স্নেহের ছায়ায়,
ভুলল যার পরের মায়ায়,
আবার তাদের ঘরে ডেকে
লাভটা কী মা বল?
(কাঁদিস না মা কাঁদিস না মা)।

আমরা নতুন যুগের মানুষ
গড়ব নতুন দেশ
তোমায় মাগো পরিয়ে দেব
আবার রানির বেশ
জাদুকর দেবে মোদের হাতুড়ি, কলম, তুলি
তীক্ষ্ণ অসি, মধুর বীণা, পুঁথি আর নূপুরগুলি
সেগুলি লাগিয়ে কাজে
এ জীবন করব সফল
(কাঁদিস না মা কাঁদিস না মা)।

একজন নতুন মানুষ। জাদুকর! বুড়ো মানুষ তুমি, কতকাল বইবে তুমি আর তোমার ওই ঝুলি-ঝোলা আর মালের বোঝা—ওগুলো আমাদের দাও, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি ওগুলোকে কাজে লাগাব।

জাদুকর। বেশ তো! এতদিন বয়ে বেড়িয়েছি নতুন যুগ সৃষ্টির মালমশলাগুলো, দেবার লোক পাইনি—আজ পেলাম আমার কল্পনার সৃষ্টি, ভবিষ্যতের জাদুকর দলের দেখা—তোমাদের হাতেই দিয়ে যাই আমার সব কিছু (নতুন মানুষ দলের সাতটি ছেলেমেয়ের হাতে এক-একটি জিনিস—তলোয়ার, কলম, তুলি, পুথিপত্তরের ঝুলি, বীণা আর নূপুর দিলে)।

জাদুকর। যুগযুগান্তরের জননী জেগে ওঠো—তোমার ওই জড় অপদার্থ ছেলেদের শোক ভোলাবার জন্যে দেখ আজ পুতুলের দেশে এসেছে নতুন যুগের মানুষরা, এরা আমার কাছ থেকে বিলাস, সাজগোজ, মণিরত্ন চায় না, এরা চায় আমার হাতুড়ি, কলম, তুলি, ধারালো অসি, সুমধুর বীণা, পুথি আর নূপুরগুলি! এদের মানুষ হওয়ার চেষ্টা প্রত্যেকের মনে—এরা জানে কোথায় কীসে মানুষ হওয়ার মন্ত্র লুকিয়ে আছে—এদের তুমি তোমার শ্যামল স্নেহে পুষ্ট করে সুস্থ সবল করে গড়ে তোল।

পুতু-বুড়ি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আয়, আয় তোরা বুকে আয়। পুতুলের মা আজ মানুষের মা হয়ে ধন্য হোক।

[নতুন মানুষের দলের সবাই ছুটে গিয়ে সাজি থেকে ফুলের মালা, ফুলের গয়না, ফুলের মুকুট নিয়ে পুতু-বুড়িকে সাজিয়ে দিয়ে—সবাই হাঁটু গেড়ে প্রণাম করবে, সেই ফাঁকে জাদুকর সরে পড়বে।]

(প্রণাম সেরে উঠে সবাই দেখে 'জাদুকর' নেই)

নতুন মানুষের দল। কই! জাদুকর কই! কোথায় গেল জাদুকর?

[পুতু-বুড়ির ঘরের জানালা দিয়ে দেখা গেল—আকাশে সূর্য উঠেছে দিক আলো করে।]

পুতু-বুড়ি। কাঁদছ কেন তোমরা? আকাশের রবি পুতুলদের অন্ধকার দেশে 'মানুষ' গড়বার জন্যই জাদুকর হয়ে জন্মেছিল—আজ সে ছুটি নিয়ে চলে গেছে আলোর দেশে—চলো আমরা আকাশের রবিকে প্রণাম জানিয়ে অন্ধ অসহায় পুতুলগুলোকে আলোর গান শুনিয়ে 'মানুষ' করে তুলি।

(সকলের গান)

আয় আয় আয়রে তোরা
সাহস আছে যার।

[সকলে সারি বেঁধে ওই গান গাইতে গাইতে স্টেজে বার কতক ঘুরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাবে।]

।। যবনিকা ।।

পঁচিশে বৈশাখ

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ছেলেমেয়ের দল বাড়ির ছাদে খেলছে, কেউ এক্কা-দোক্কা, কেউ স্কিপিং, কেউ লাট্টু, কয়েকজন 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' গানটার সঙ্গে গোল হয়ে নাচছে। নাচ গান শেষ হতে একজন হঠাৎ বলে উঠল :

ঝুমা। বল দেখি আজ ছুটি কেন ?

(সবাই খেলা থামিয়ে দাঁড়াল।)

তনিমা। আজ রবি ঠাকুরের জন্মদিন।

তাপসী। জন্মদিনে কেন ছুটি দেয় রে ?

স্বপ্না। কী বোকা দেখ ! ছুটি দেয় খেলার জন্য, মজার জন্য, বেড়োনোর জন্য। তাও জানিস না ?

তনিমা। আমার জন্মদিন পরশু। বাবা আমার জন্য নতুন জামা, পুতুল, মালা এনেছে। পরশু তাহলে ছুটি দেবে ?

আরতি। আহা! দেবে না আরও কিছু ! তোর জন্মদিনে কেন ছুটি দেবে ? ছুটি দেয় বড়ো লোকদের জন্মদিনে।

তনিমা। তবে আমার দাদুর জন্মদিনে ছুটি দেবে ?

আরতি। তোর দাদু কি বড়োলোক ?

তনিমা। বড়ো না ? দাদু যে বাবার চেয়েও বড়ো ! বাবা দাদুকে নম করে, জান ? দাদু বাবাকে 'খোকা' ডাকে !

তাপসী। বিনুদের তো কত বড়ো বাড়ি ; দুখানা গাড়ি ; আরও কত কী আছে। তবে বিনুদের বাবার জন্মদিনে আপিস, পাঠশালায় ছুটি দেবে ?

স্বপ্না। হুঁ-উ-উ !

তোতাম। তোমার মাথা ! ছুটি দেবে না কলা দেবে ! টাকা বেশি থাকলে যে বড়োলোক তাকে বড়োলোক বলে না। বিদ্যাসাগর তো গরিব ছিলেন, তবে তাঁকে বড়োলোক বলে কেন ?

তনিমা। বিদ্যাসাগর আমার দাদুর চেয়েও বড়ো ছিল ; তাই তাঁকে বড়োলোক বলে।

রিনা। যাঁরা বুড়ো তাঁদের বড়োলোক বলে।

তোতাম। তোর মুন্ডু বলে ! বয়সে বড়ো হলে বুঝি কেউ বড়োলোক হয় ? যাঁরা খুব ভালো লোক, তারাই হল আসল বড়োলোক, বুঝলি ? আমার মাস্টারমশাই বলেছেন।

রিনা। আমার দাদু খু-উ-ব ভালো ! বাবা খু-উ-ব ভালো ; দাদা খু-উ-ব ভালো !

স্বপ্না। হ্যাঁ। তোর সব্বাই খু-উ-ব ভালো ! আমার বাবা বুঝি ভালো না ? আমার বাবার মতো ভালো বাবা কোথাও নেই ?

তোতাম। নিজের নিজের কাছে সকলেরই বাবা ভালো। কিন্তু সে ভালোকে ভালো বলে না। মাস্টার-মশাই বলেছেন, যাঁরা সব মানুষকে ভালোবাসেন, সব মানুষের জন্য নতুন নতুন ভালো জিনিস গড়ে দিয়ে যান, তাঁরাই হলেন ভালো মানুষ বড়োলোক। ভালো কথায় ভালোমানুষদের কী বলে জানিস ? মহাপুরুষ বলে। আর মহাপুরুষদের জন্মদিনেই শুধু ছুটি দেয়, বুঝলে ?

আরতি। রবি ঠাকুর তাহলে মহাপুরুষ ?

তোতাম। ওরে বাবা ! মহাপুরুষ না ? মহাপুরুষদের ওপরে আরও মহাপুরুষ !

কণিকা। মহাপুরুষদের জন্মদিনে 'পাট' করতে হয়, না গো ?

ঝুমা। হ্যাঁরে ! আমার দাদা আজ 'পাট' করবে। দেখিসনি, আমাদের সদর ঘরে কবে থেকে দাদারা সব নাচ করছে, গান করছে, তবলা বাজাচ্ছে, পাট করছে। দাদাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যা পাট করে না, কী হাসি পায় !

তোতাম। ওরা থিয়েটার করবে। থিয়েটারের আগে ওই সব করাকে বলে রিহার্সাল। আমার দাদাও রিহার্সাল করছে।

রিনা। আমার দাদাও পাট করছে। দাদা রাজপুত্তুর হবে।

তনিমা। সত্যি রাজপুত্তুর হবে ? পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে ?

রিনা। হুঁ, স-অ-ব আছে।

আরতি। তুই দেখেছিস ?

রিনা। দেখিনি, কিন্তু আছে ঠিক। দাদা বলেছে।

কণিকা। তোর দাদাকে বলে ঘোড়াটা আমাকে একবার দিবি, আমি একবার চড়ব !

রিনা। কোথায় যাবি ?

কণিকা। স্বগ্যে যাব। বাবার কাছে। মা বলেছে; বাবা স্বগ্যে আছে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে স্বগ্যে যায়।

রিনা। স্বগ্য কোথায় ?

কণিকা। আকাশের ওপর।

আরতি। স্বগ্যে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না, জান ? তুই স্বগ্যে গিয়ে ফিরে আসবি কী করে ? তোর মা কাঁদবে না ?

কণিকা। ঠিক ফিরে আসব আমি। মা বলছে, স্বগ্য থেকে বাবা ঠিক ফিরে আসবে।

আরতি। ধেৎ ! স্বগ্য থেকে আবার ফেরে নাকি ?

কণিকা। ফেরে না ? বেহুলা স্বগ্যে গিয়ে সব্বাইকে নিয়ে ফেরেনি ? তোমার মা তোমাকে গল্প বলেনি বুঝি ?

ঝুমা। কিন্তু ও তো গল্প, সত্যি না তো ?

কণিকা। গল্প বুঝি সত্যি না ? তুমি কিচ্ছু জান না। গল্প-ই সত্যি !

রিনা। দূর ! গল্প তো গল্প ! গল্প কি সত্যি হয় ?

কণিকা। হয় না ? ভগবানের গল্প সত্যি না ?

তাপসী। কণিকা ঠিকই বলেছে মশাই, গল্প তো সত্যি হয়। রবি ঠাকুর তো গল্প লিখতেন। সে-সব যদি সত্যি না হবে তবে তিনি কী করে মহাপুরুষ হলেন ?

রিনা। বেশ বাবা, স্বগ্য না হয় সত্যি হল ! কিন্তু একা একা অত দূর যেতে সন্ধে হয়ে গেলে, তখন কী হবে ?

কণিকা। কী আর হবে ? আকাশে তো অন্ধকার নেই, তারার আলোয় ঠিক বাবার কাছে চলে যাব। দিবি রে পক্ষীরাজটা আমাকে একবার ?

রিনা। আচ্ছা, বলবখন দাদাকে ; দেখি যদি দেয় !

(একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে এসে ঢুকল, ওর হাতে একখানা ভালো বড়ো রবি ঠাকুরের ফটো। ওকে দেখে বাচ্চারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল—)

সকলে। কীরে পাপি, তোর হাতে ওটা কার ছবি রে ?

পাপিয়া। এই দেখ ! বল দেখি কে ?

সকলে । রবি ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।

পাপিয়া । চুপ, চুপ ! আস্তে। দাদা শুনতে পেলে কেটে ফেলবে। আজ ২৫শে বৈশাখ না ? আজ কবির জন্মদিন। দাদারা আজ সন্ধেবেলায় থিয়েটার করবে। সেই সময় এই ছবিটা সাজাবে বলে এনে রেখেছে। দাদা কোথায় গেছে, বোধহয় রিহার্সাল করছে। সেই ফাঁকে ছবিটা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আয়, আমরা সুন্দর করে সাজাই।

স্বপ্না । কী হবে সাজিয়ে ?

পাপিয়া । কী বোকা ; ঠাকুর পুজো করে না ? রবীন্দ্রনাথ তো ঠাকুর। আমরা তাই ঠাকুর পুজো করব।

কণিকা । রবীন্দ্রনাথ ভগবান, তাই তাঁকে ঠাকুর বলে, নারে ?

তোতাম । ঠাকুর দেবতা না হলেও পুজো করে। আমার মা রোজ সকালে দাদামশায়ের ছবিতে ফুল দেয়, প্রণাম করে। তার মানে পুজো করে। ভগবানের মতো মানুষকেও পুজো করতে হয়।

ঝুমা । হাঁ, গুরুজনদের পুজো করতে হয়। বই-এ লেখা আছে।

তোতাম । গুরুজন আর মহাপুরুষদের পুজো করতে হয়।

তনিমা । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ঠিক ঠাকুরের মতো দেখতে ?

ঝুমা। দূর ! ঠিক আমার দাদামশায়ের মতো দেখতে।

তাপসী । তোর দাদামশায় বুঝি ওই রকম দেখতে ? ছাই ! কচু ! তোর দাদামশায় তো বিটকেল, খিটখিটে ! তোকে ডাকতে গেলেই খালি বলবে—যাও, ঝুমা এখন পড়ছে, এখন যাও, বাড়ি গিয়ে পড়তে বসগে।

তনিমা । রবি ঠাকুর কখ্খনো বকতেন না, পড়তে বসতে বলতেন না। রবি ঠাকুর খু-উ-ব ভালো।

স্বপ্না । ঠিক বলেছিস। রবি ঠাকুর কখ্খনো রাগ করতেন না। দেখছিস, মুখে কেমন মিষ্টি হাসি। ঠিক ভগবানের মতো।

কণিকা । ভগবানের দাড়ি আছে, না গো ?

তাপসী । দূর। ভগবানের কখনও দাড়ি হয় ? বিষ্ণু ঠাকুরের ছবি দেখিসনি ? কৃষ্ণের কি দাড়ি আছে ? শিবঠাকুর তো বুড়ো, তবু তার দাড়ি নেই। ঠাকুর দেবতার দাড়ি থাকে না।

রিনা । ঠিক বলেছিস। ভগবানের দাড়ি থাকে না। শুধু মুনি ঋষি মহাপুরুষদের দাড়ি থাকে।

আরতি । আর ইসকুলে থাকে। সব মহাপুরুষ মাস্টার হয়, না গো তোতামদা।

তোতাম । দূর। তা কখনও হয় ? সব মাস্টার মহাপুরুষ হয় না। তবে মহাপুরুষদের সবাই মাস্টার হন। তাঁদের বলে, গুরু। রবি ঠাকুরকে তাই সবাই গুরুদেব বলে।

রিনা । রবি ঠাকুর যে ইসকুলের স্যার, তার নাম শান্তিনিকেতন, আমার 'কিশলয়' বই-এ লেখা আছে।

তনিমা । সেই ইসকুলে কাউক্যে পড়তে হয় না। শুধু গান করা, নাচ করা, রাজপুত্তুরের গল্প আর এক্কাদোক্কা খেলতে হয়—জান ? আমি জানি, বলেছে আমাকে একজন।

কণিকা । রবি ঠাকুর যখন ছোটো ছিলেন, কী করতেন জান ? একটা কাঠের ঘোড়া ছিল, সেটাকে রোজ ড্যাং করে বলি দিতেন। আর একটা মন্ত্র বানিয়েছিলেন। ছোড়দি আমাকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়েছে। শুনবে ?

সিংহি মামা কাটুম, আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট, ঢুলুকুট ঢ্যাম কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট,
খট খট খটাস পট পট পটাস।

রিনা । একদিন রবীন্দ্রনাথ না একটা অ্যাত্ত বড়ো বাটিতে দুধ, কলা, আমসত্ত্ব, সন্দেশ স-ব নিয়ে মেখে খেতে বসেছে। একটুও মাটিতে পড়েনি। পিঁপড়েগুলো হ্যাংলার মতো ঘুরঘুর করছে। ঠিক মা যখন জামাইবাবুকে খেতে দেয় তখন বিনুটা যেমন জামাইবাবুর চারপাশে ঘুরঘুর করে, তেমনি।

(যারা শুনছিল, হেসে উঠল)

রবীন্দ্রনাথ তাই দেখে একটা ছড়া বানিয়ে ফেললেন। বলছি—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখায়ে দিয়া তাতে

হাপুস হুপুস শব্দ—চারিদিক নিস্তব্ধ—
পিপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

কণিকা। রবি ঠাকুর পিঁপড়ের কথা শুনতে পেতেন ?

তনিমা। শুধু পিঁপড়ে নাকি ? রবি ঠাকুর সবার কথা বুঝতে পারতেন। গাছ, পাখি, ঘাস, পেজাপতি, ফড়িং, উইচিংড়ে, ব্যাঙ, ময়ূর, নদী, পাহাড়, বাতাস, এমনকী তারারা চুপ করে যে কথা কয়, রবীন্দ্রনাথ তাও শুনতে পেতেন। না তোতামদা ?

তোতাম। বলেছ ঠিক, তবে পাহাড়, নদী, বাতাস, তারা এ সব কী আর কথা কয়, যে এদের কথা শুনবে ? কিন্তু গাছ, পশু, পাখি, ফড়িং, এরা কথা কয় ; এদের কথা রবি ঠাকুর শুনতেন বটে।

আরতি। রবি ঠাকুর পরি দেখেছে ?

তোতাম। হুঁ-উ-উ। অনেক পরি দেখেছেন। ভূতও দেখেছেন। রবি ঠাকুরের বাড়ি কোথায় বল তো ?—কলকাতার চিৎপুরে জোড়াসাঁকোয়। মস্ত বড়ো বাড়ি, সামনে একটা পুকুর। পুকুরের দু-পাড়ে একটা বাদাম আর একটা বট গাছ। একটা বেহ্মদত্যি বাড়িটার ছাদে এক পা, বাদাম গাছের মাথায় এক পা রেখে এক একদিন দাঁড়িয়ে থাকত।

কয়েকজন। তারপব ?

তোতাম। বেহ্মদত্যির তিন হাত লম্বা জিভটা পুকুরের ওপর লকলক করে ঝুলে থাকত।

কয়েকজন। তারপব ?

তোতাম। চোখ দুটো বুকের দু-দিকে ড্যাব ড্যাব করত—দুটো টর্চলাইটের মতো আলো ঠিকরে পড়ত।

কয়েকজন। ও—মা—গো।

(ছোটোরা ভয় পেয়ে এ ওকে জড়িয়ে ধরেছে। পাপিয়া ছবিটা সাজাচ্ছিল। কেউ কেউ ওকে সাহায্য করছে।)

তাপসী। যত মিথ্যে কথা ! তোতাম খালি বানিয়ে বলে।

তোতাম। তুই জানিস, মিথ্যে না সত্যি ? পড়েছিস বই ? বলে তোকে এই সব কথা তোর কাকামণি ?

তাপসী। নাই বলুক। আমার বাবা আমাকে স-ব বলে, জান তুমি আবদুল মাঝির গল্প ?

তোতাম। খু-উ-ব জানি। আবদুল মাঝির ছুঁচোলো দাড়ি ছিল, কোঁচড়ে করে মুড়ি খেত। আর পদ্মানদী থেকে রবি ঠাকুরকে কচ্ছপের ডিম এনে দিত।

তাপসী। আর কুমিরের গল্প বলত। রঘু ডাকাত, বিশু ডাকাতের গল্প বলত শ্যাম।

তোতাম। চাকরদের সর্দার ব্রজেশ্বর রামায়ণ পড়ে শোনাত।

তাপসী। ব্রজেশ্বর খুব হ্যাংলা ছিল, রবি ঠাকুরের দুধ আর মুড়ি লুচি চুরি করে খেত।

(ওরা যখন দুজনে কথা বলছে, তখন রিনা স্বপ্নাকে ফিসফিস করে বললে—তোতাম কত জানে দেখছিস ? স্বপ্না বলল—জানবে না ? ও তো ছেলে ! ঝুমা শুনে মুখ বেঁকিয়ে বলল—মেয়েরা বুঝি জানে না ? আমার দিদি কত জানে, জানো ? বাবা বলেছে, দিদি দাদার চেয়ে অনেক বেশি জানে। দাদাটা সব বছর ফেল করে, আর দিদি স-ব বছর পাস করে। আমিও পাস করি। কিন্তু দাদাটা দু-বার ফেল করল। বাবা বলেছে, দিদি ডাক্তার হবে। দিদিকে ডেকে আনব ? যাই....। বলে ছুটে বেরিয়ে গেল।)

পাপিয়া। নে, নে, তোদের খালি বকর বকর, তোতামটার ভারি পণ্ডিত পণ্ডিত ভাব। নে, এখন কাজ কর। যা, কুমকুমদের বাগান থেকে ফুল নিয়ে আয় দেখি।

তোতাম। উরি বাবা ! ওদের বাগানে বাঘা আছে, গেলেই ধরবে ক্যাঁক করে।

স্বপ্না। আমি যাব ? আমাদের টবে অনেক বেল কুঁড়ি ফুটেছে। নিয়ে আসব ?

কণিকা। ফুল তুল না মেজদি। বড়োদি তাহলে আর রক্ষে রাখবে না। সন্ধেবেলায় যখন বড়োদি খোঁপায় গুঁজবে বলে ফুল তুলতে যাবে তখন না পেলে যা রেগে যাবে না ! দেখনি তো সেদিন।

স্বপ্না। কবে ?

কণিকা। এই তো সেদিন। মা লক্ষ্মীপুজোর জন্য ফুল তুলে নিয়েছিল। ওদিকে বড়োদি গা ধুয়ে, লিপিস্টিক মেখে ছাদে গেছে ফুল তুলতে। ফুল না পেয়ে দিদি যা করল না। মাকে কী বকুনি—কেন তুমি ফুল তুলেছ ? তোমার ফুল ? বাব্বা !

স্বপ্না। দিদিটা অসভ্য ! ও রাগলে আমার বয়ে গেল। ফুল আমি তুলবই। বলব, আমি তুলেছি নাকি ? চার পাঁচটা ছিঁড়ে রেখে আসব। বলব,

চড়ুইপাখি সব ফুল কেটে দিয়েছে। তুই যদি বলে দিস, তাহলে আমিও সে-ই কথা বলে দেব, বুঝলি ?

কণিকা। আহা ! কী আবার বলবি তুই ?

স্বপ্না। জানি না ভেবেছিস ? দিদির লিপিস্টিকটা ব্যাগ থেকে চুরি করেছে কে ?

কণিকা। বারে, আমি নাকি ?

স্বপ্না। তুমি না ? তোমার বাক্সে নেই সেটা ? দেখিনি ভেবেছ ? ডলপুতুলের ঠোঁটে রং মাখাসনি ? যাব, নিয়ে আসব ?

কণিকা। (কাঁদ কাঁদ গলায়) তুই ফুল তুলে আন্ মেজদি, আমি কখ্খনো বলব না।

স্বপ্না। মনে থাকে যেন। (বেরিয়ে গেল।)

পাপিয়া। ধূপ লাগবে যে !

রিনা। আমার কাছে দশটা পয়সা আছে। কিনে আনব ?

পাপিয়া। যা। (রিনা চলে গেল)

তোরা ছবিটার তলায় চুপ করে বস !

(সবাই বসল, তোতাম ছাড়া)

এখন আমরা ২৫শে বৈশাখ করব।

তোতাম। সভাপতি চাই তো একজন ? সভাপতি না হলে তো রবীন্দ্র-জয়ন্তী হয় না।

পাপিয়া। ওসব আমাদের চাই না।

(স্বপ্না ফুল নিয়ে ঢুকল)

স্বপ্না। দেখ কত ফুল এনেছি। একটা মালাও এনেছি। বিলুদারা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করবে বলে অনেক মালা কিনে দিদির কাছে রেখে দিয়েছে। সন্ধেবেলা নিয়ে যাবে। দিদি গা ধুতে গেছে। সেই ফাঁকে একটা মালা নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

কণিকা। বিলুদা রাগ করবে না, মেজদি ?

স্বপ্না। করুকগে, বয়ে গেল। বিলুদা আমাদের কে ? দিদির সঙ্গে ভাব, দিদিকে বকুক গে।

পাপিয়া। মালাটা দে।

(মালাটা নিয়ে ফটোয় পরাচ্ছে। রিনা ধূপ আর দেশলাই নিয়ে এল)

রিনা। এই নাও, পাপিদি ; মার কাছ থেকে দেশলাইও এনেছি।

(পাপিয়া আর তোতাম ধূপ জ্বালাল)

তাপসী। সব তো ঠিক হল। কিন্তু সভাপতি যে চাই-ই ! পুরুত না হলে কি পুজো হয় ?

তোতাম। আমার তো পইতে হয়েছে। আমি সভাপতি হব ?

রিনা। দূর। ওইটুকু মানুষ কখনও সভাপতি হয় ? সভাপতিদের দাড়ি থাকে, গোঁফ থাকে, চুল পাকা হয়, কাঁধে চাদর থাকে।

আরতি। ধেৎ ! তুই জানিস না। আমাদের ইসকুলে সভাপতি সেদিন পেরাইজ দিল ; তার একটুও দাড়ি-গোঁফ নেই—শুধু একটা টাক আছে। যাদের টাক থাকে, তারা হয় সভাপতি।

তোতাম। আর যাদের টাকা থাকে, তারাও সভাপতি হন।

(ঝুমা ফিরে এল, ওর দিদির হাত ধরে। যেন ও টেনে আনছে। গম্ভীর অথচ হাসিমুখ ছিমছাম একটি তরুণী, আটপৌরে পোশাক।)

ঝুমা। এসো না, দেখো না, আমরা কেমন ২৫শে বৈশাখ করছি, দেখবে এসো।

দিদি। এ কী, কী করেছিস তোরা ! আরে, তোরা যে সত্যিকারের রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেছিস, দেখছি। ছবি, ফুল, মালা, ধূপ—এত সব কোথায় পেলি তোরা ?

তোতাম। সব আমরা নিজেরা করেছি, দিদি—তুমি আমাদের সভাপতি হবে ?

কয়েকজন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদি সভাপতি হবে।

কণিকা। এমা ! মেয়ে বুঝি সভাপতি হয় ?

ঝুমা। আহা ! কেন হবে না ? মেয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়, আর সভাপতি হবে না ?

তোতাম। ঠিক কথা। দিদিই সভাপতি হবে।

তাপসী। আমি সভাপতির চেয়ার নিয়ে আসব ?

দিদি। না, না চেয়ার কী হবে ? সব সভাপতির চেয়ার লাগে না। আমি মেঝেতেই বসছি।

(অন্য মেয়েদের মধ্যে বসল)

পাপিয়া। কেমন হয়েছে, দিদি ?

দিদি। খু-উ-ব ভালো হয়েছে। সুন্দর হয়েছে। এত সব তো তোমরাই করেছ। সভাপতিও তোমাদেরই কেউ হবে, কেমন ?

পাপিয়া। কে হবে, দিদি ? ছোটোরা কি সভাপতি হয় ?

দিদি। কেন হবে না ? ছোটোদের কাজে ছোটোরাই সব হবে। বল, কে সভাপতি হবে ? যে হবে, তাকে কিন্তু বক্তৃতা করতে হবে। কে পারবে ?

তোতাম। আমি।

দিদি। বেশ, তুমিই তাহলে সভাপতি ; স্বপ্না, তুমি বল, আমি এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হওয়ার জন্য শ্রীতোতাম মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করছি।

(স্বপ্না বলল)

পাপি, তুমি বল—আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।

(পাপিয়া বলল)

তোতাম, তুমি আমার পাশে বসো। (বসল) এখন জিজ্ঞাসা কর,—কারা গান, আবৃত্তি বা রবি ঠাকুরের জীবনের কথা শোনাবে।

তোতাম। সভাপতিকে মালা দেবে না ?

কণিকা। এঃ ওইটুকু সভাপতি, তার আবার মালা !

তোতাম। আমি সভাপতি হব না। তুমি আর কাউকে কর।

দিদি। তা কেন ? তুমিই যে সভাপতি হয়েছ ! আমাদের তো মালা নেই, তাই মনে মনে তোমাকে মালা পরালাম, কেমন ?

তোতাম। আচ্ছা। এখন কী করব ? ও হ্যাঁ ? তোম্— আপনাদের মধ্যে কে কে গান, আবৃত্তি, এইসব করবেন, আসুন।

(কেউ উঠছে না)

কেউ আসছে না, দিদি !

দিদি। ভয় কী এসো না তোমরা ; রবীন্দ্র-জয়ন্তী করলে গান গাইতে হয়, আবৃত্তি করতে হয়, রবি ঠাকুরের কথা বলতে হয়। শুধু ছবি সাজালে তো হয় না। আচ্ছা, প্রথমে আমি একটা গান দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছি, কেমন ?

(দিদি একটি রবীন্দ্রসংগীত গাইল)

তোতাম। কে আবৃত্তি করবে ? পাপিয়া করবি ? এই যা ! ভুল হয়ে গেল। কুমারী বলতে হবে, না দিদি ?....এবার আপনাদের আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে,—মাপ করবেন—শোনাচ্ছেন কুমারী পাপিয়া......

(পাপিয়ার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে)

এই ! তোরা কী রে ? বোস ?

পাপিযা। ধেৎ ? আমরা তো ঘোষ !

তোতাম। আবৃত্তি করছেন কুমারী পাপিয়া ঘোষ।

(পাপিয়া রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা আবৃত্তি করল)

ঝুমা। এবার আমি বলছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বীরপুরুষ'।

'মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।

(আটকে গেল, ঢোক গিলল, 'তুমি যাচ্ছ পাল্কিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে', এটুকু বলে আবার আটকে গেল, 'আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে,' বলে আর পারল না।)

দিদি। ঠিক আছে, ওতেই হবে। বসো তুমি। বাড়ি গিয়ে সবটা মুখস্থ করে নেবে, কেমন ?

(ঝুমা মাথা নাড়ল)

এখন সভাপতি মশাই ভাষণ দিন।

তোতাম। (করুণভাবে) দিদি, আপনি আমার হয়ে বলে দেবেন ?

দিদি তা কেন ? যা পার বল না একটু ? ভয় কী ? ওঠো, দাঁড়াও। বল।

দিদি এই যেমন রবীন্দ্রনাথ কত সালে, কোথায় জন্মেছিলেন, তাঁর বাবা মায়ের নাম, ছেলেবেলায় তিনি কী করতেন, এইসব বল না।

তোতাম। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহের নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁহারা আট ভাই, রবীন্দ্রনাথ সর্বকনিষ্ঠ।

ঠিক বলছি ?

দিদি। একদম ঠিক বলছ। খুব ভালো হচ্ছে, শুধু বইয়ের ভাষায় না বলে মুখের কথায় বলে যাও।

তোতাম মুখের কথায় ভাষণ দেয় ?

দিদি। কেন দেবে না। তাতেই তো ভালো হয়।

তোতাম আচ্ছা।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে ভরতি হন। কিন্তু ইসকুলের ধরাবাঁধা পড়া তাঁর ভালো লাগত না। তাই তিনি ইসকুলে যেতে চাইতেন না। সে জন্য পাঁচ-ছজন শিক্ষক তাঁকে বাড়িতেই পড়াতেন। তিনি....তাঁকে.... মানে রবীন্দ্রনাথ...আর পারছি না।

আচ্ছা বসো।

(তোতাম বসল)

কে বলতে পার, রবি ঠাকুর কী ছিলেন ?

কয়েকজন। কবি, কবি কবি।

দিদি। আর কী ছিলেন ?

তাপসী। মুনি, ঋষি।

দিদি। আর ?

পাপিয়া। গায়ক, সুরকার, অভিনেতা।

দিদি। বেশ ! তাছাড়াও তিনি ছিলেন—শিক্ষক। তাঁর ইসকুল শান্তিনিকেতনে, নিজে তিনি তোমাদের মতো ছোটোদের পড়াতেন। তিনি শিল্পীও ছিলেন—ছবি আঁকতেন।

তোতাম। ছবিও আঁকতেন ?

দিদি। হাঁ, ভালো ছবি আঁকতেন। তাছাড়া তিনি দেশের কাজও করতেন। নতুন রকম গ্রাম গড়েছিলেন—নাম শুনেছ—শ্রীনিকেতন ? এমন একটি গ্রাম যেখানে কোনো অভাব থাকবে না। গ্রামের মানুষ নিজেদের দরকারি সব জিনিস নিজেরাই হাতে গড়ে নেবে—বাইরে থেকে কিচ্ছু আনবে না। এমন মানুষ পৃথিবীতে আর কখনও আর কোথাও আসেনি।

(বাইরে থেকে বয়স্কদের গলায় একটা গোলমাল শোনা গেল ! একজন চেঁচিয়ে বলল—মা, এখান থেকে রবি ঠাকুরের ফটো কে সরিয়েছে ? মায়ের উত্তর শোনা গেল না। নেপথ্য থেকে আরও তীব্র গলায় শোনা গেল—কী ? পাপি নিয়েছে ? পাপি কোথায় ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা ওকে ! কান ছিঁড়ে ফেলব না।)

পাপিয়া। কী হবে ? দাদা এসে গেছে ! (কেঁদে ফেলে) কী হবে ? দাদা যে বড্ড মারে দিদি !

(বাইরে থেকে আর একজনের কড়া গলা শোনা গেল—আরে, শ্যামলীর ঘরে মালাগুলো রেখেছিলাম, তা দেখছি, সবচে বড়োখানাই হাওয়া হয়ে গেছে ? একটি তরুণীর গলা শোনা গেল—নির্ঘাৎ স্বপ্না নিয়েছে, বিলুদা !)

কণিকা। মেজদি ; বিলুদা ! কী হবে মেজদি ?

(বাইরে থেকে আবার চিৎকার ভেসে এল—কী ? ছাদে স্বপ্নারা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করছে ? করাচ্ছি ! চল্ তো বিলে, সব কটার হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে আসি !)

স্বপ্না। কী হবে দিদি ? বিলুদা যে ভীষণ চুল টানে !

(তোতাম এক ফাঁকে কেটে পড়ছিল। দেখতে পেয়ে দিদি ধরে ফেলল।)

দিদি। ও কী তোতাম, পালাচ্ছ কেন ? ভয় কী ? আমি তো আছি। ভয় কোরো না তোমরা। আসতে দাও ওদেব, আমাকে দেখলে কিছু বলবে না।

তোতাম। হাঁরে ; দিদি থাকলে বিলুদারা ঘোড়ার ডিম করবে। দিদিকে ওরা ভয় করে। দেখিসনি, দিদি যখন কলেজ যায়—বিলুদারা একটা কথাও কয় না ; সব ভিজে বেড়ালের মতো রকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে !

দিদি। থাক্, তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না। চল, দাদারা সব আসবার আগেই আমরা ওদের ফটো, মালা, সব ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

পাপিয়া ফটো তুলে নিল। একজন নিল মালা ও ধূপ ! সবাই দিদিকে ঘিরে বেরিয়ে গেল। নেপথ্যে রবীন্দ্রসংগীতে আবহ : "চির নূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ"।

নিবন্ধ
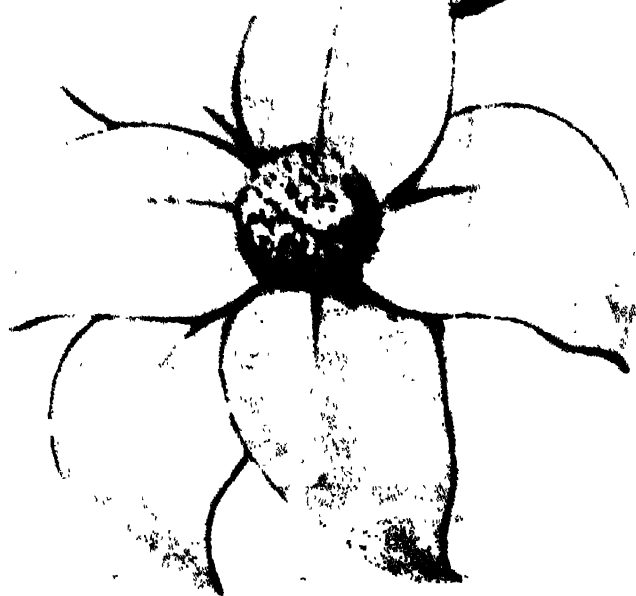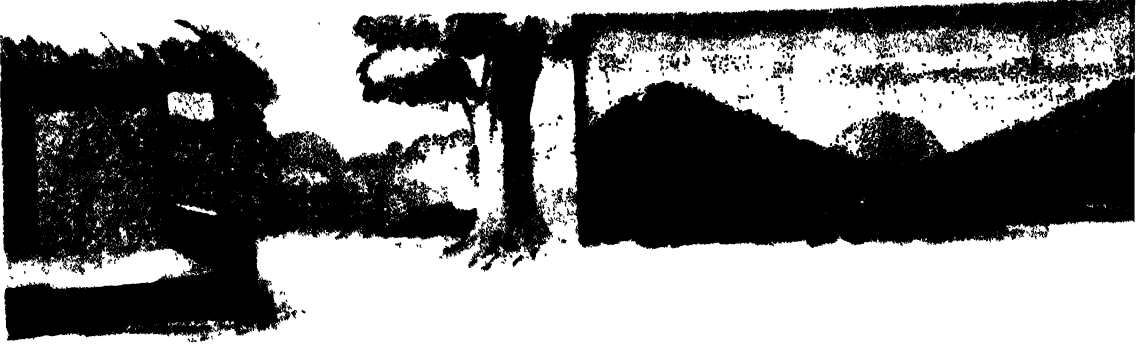
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
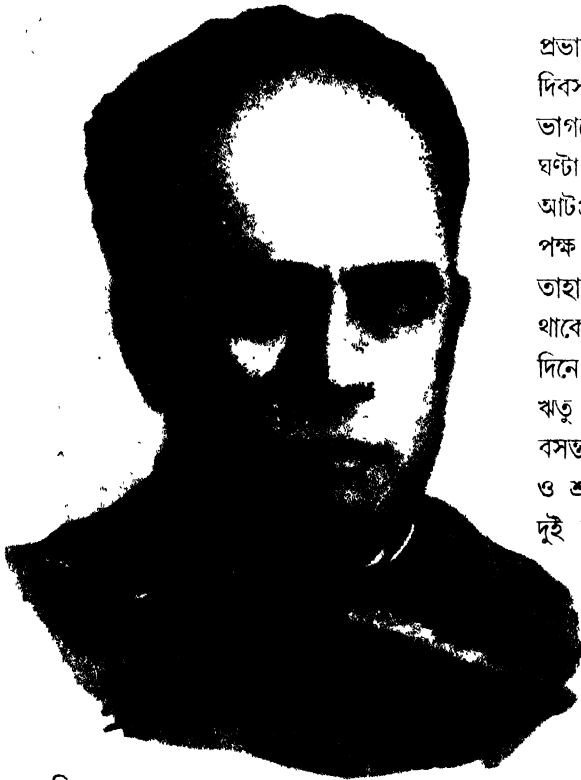
প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানে। যখন সূর্যের উদয় হয়, আমরা শয্যা হইতে উঠি, ঐ সময়কে প্রভাত বলে। যখন সূর্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে আরম্ভ হয়, ঐ সময়কে সন্ধ্যা বলে। প্রভাত অবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবাভাগ বলে। আর সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে রাত্রি বলে। দিবাভাগে প্রায় সকল জীব জাগরিত থাকে ও আপন আপন কর্ম করে। রাত্রিকালে আরাম করে ও নিদ্রা যায়। দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ণ, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন বলে।

দিবা ও রাত্রি এ দুয়ে এক দিবস হয়, অর্থাৎ এক প্রভাত হইতে আর এক প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে ষাটি ভাগ করিলে, ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা বা ঘণ্টা ; তিন ঘণ্টাতে অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর ; আটপ্রহরে এক দিবস ; পনর দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ ; শুক্ল ও কৃষ্ণ। যে পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাকে শুক্লপক্ষ বলে। আর যে পক্ষে চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। দুই পক্ষে অর্থাৎ ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু ; সমুদয়ে ছয় ঋতু ; সেই ছয় ঋতু এই ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু ; আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষা ঋতু ; ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস শরৎ ঋতু ; কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস

হেমন্ত ঋতু ; পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত ঋতু ; ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ছয় ঋতুতে অর্থাৎ বার মাসে এক বৎসর হয়।

সচরাচর সকলে বলে ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস ঊনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই ন্যূনাধিক্য বশত বৎসরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে। পূর্ব কালের লোকেরা তিন শত ষাটি দিনে বৎসরের গণনা করিতেন। সে অনুসারে, অদ্যাপি সামান্য লোকে তিন শত ষাটি দিনে বৎসর বলে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি বলে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে নূতন বৎসরের আরম্ভ হয়, চিরকালই বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপ এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া বৎসরের গণনা আরম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপে যে বৎসরের গণনা করা যায় তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত ; সংবৎ, শকাব্দাঃ ও সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক্ প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন ; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ। বিক্রমাদিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। শালিবাহনের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। মুসলমানেরা মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশে বিষয়কর্মে, সকল শাক অপেক্ষা সাল অধিক প্রচলিত। এই শাকের ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে চতুর্দশ শতাব্দী চলিতেছে। এইরূপ ইংরাজ, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা, যীশু খ্রীষ্টের জন্ম অবধি এক শাকের গণনা করেন ; উহাকে খ্রীষ্টীয় শাক বলে। খ্রীষ্টীয় শাকের ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত

আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্যটনপূর্বক এখন মথুরা সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্বক আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, কার্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্মাধর্ম সমুদায় মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কলকল ধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিলেক। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোনো স্থানে কেবল নবীন দূর্বাদল পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর-তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্যাপ্ত আনন্দলাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক বিবেচনা না করিয়া যতদূর দৃষ্ট হইল, ততদূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পর্যটন করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জন নিস্তব্ধ বনখণ্ডে এক অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক শান্ত স্বভাব অবলোকনে আমি তাঁহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বাক্য স্ফূরণ না হইতে হইতেই, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, "আমি তোমার মানস জানিয়াছি, আমার নাম বিদ্যা, তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমি তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি। চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃষ্ট মনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয় পার্শ্ববর্তী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেবি! ঐ স্থানের নাম কি এবং এখানে কি কি অপূর্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?" তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন, "এ বিদ্যারণ্য। এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর

বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন। কিন্তু ইহার ফল ভোগ করা অতিশয় আয়াসসাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোনো বৃক্ষের উচ্চতা দর্শন মাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতকদূর বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফল ভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি, চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা সমুদায় সুমধুর-রস-স্ফীত ফলভারে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধু-ধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমার-মতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্য-তরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃত রূপা কি অপূর্ব আশ্চর্য রমণীয় লতা তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে ঐ যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধী প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক জাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি, আর বামদিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।''

এইরূপ শারীরস্থান রসায়ন চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্বচনীয় পরম রমণীয় তরুসমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম, ''দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখলাভ করিলাম। ভূ-মণ্ডলে এমত নির্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।''

এই কথা শ্রবণমাত্র বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, ''তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এস্থানে ধর্ম-শীল সাধু ব্যক্তিদিগেরাই যোগ্য বটে এবং পূর্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী তত্ত্ব-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য সকলেই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে, পাপরূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট-স্থান হইয়া উঠিয়াছে।''

বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, ''এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান, ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।'' এই কথা শুনিয়া আমি পরম পুলকিত চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরকাঙ্ক্ষিত ফল প্রত্যাশায় মহোৎসাহ সহকারে দ্রুতবেগে পদ বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্বত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রত সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহু পরিশ্রমী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা যাত্রীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া পর্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলাম স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছুদূর গমন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সম্প্রতি এই স্থানেই অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয় মহীয়সী শক্তিদ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন, ''এ পর্বতের পার্শ্বদেশে কোনো স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান, সাবধান।'' আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে যত আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল! তথাকার সুশীতল মারুতহিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ- সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুকাল ইতস্তত ভ্রমণান্তর দূর হইতে এক অপূর্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম।

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া অভূত-পূর্ব অতি নির্মল আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুন্দর-মারুত-সেবিত যমুনাকূলেই রহিয়াছি।

(সংক্ষেপিত)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে ?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল কেহ একা নামিও না,—অর্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে ঐ বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব ; নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু ! ঈস্ ! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র ; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি, তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ননির্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই—সুষুপ্ত সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু ! বায়ু তো আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যই বল—নহিলে আমরা কেহ নই, চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে ? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনী! বৃষ্টিকুল প্রসূতি ! আয় মা দিঙ্‌মণ্ডলব্যাপিনীঃ সৌরতেজঃসংহারিণী! এসো গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি ! এসো ভগিনি সুচারুহাসিনি চঞ্চলে ! বৃষ্টিকুলমুখ আলো কর ! আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্মভেদী বজ্র তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মতো বাজনা কে ? তুমিও ভূতলে পড়িবে ? পড়, কিন্তু কেবল গর্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ ; পোড়াও ত ঐ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনে বৌ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া. পলাইতেছে। মর্, পাপিষ্ঠা ! দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উঁকি মারি—দম্পতির গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বৌ জলের কলসী লইয়া যাইবে, সেই পথ পিছল করিয়া রাখি। মল্লিকার মধু ধুইয়া দিয়া, ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রানি চাকরানি কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র ! তোমরা সবাই বল—আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বতকন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন্ দেশ নির্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে কূলপ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ত তরঙ্গিণী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বাহিব—কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র ! আমাদের মতো ক্ষুদ্র কে ? আমাদের মত বলবান্ কে ?
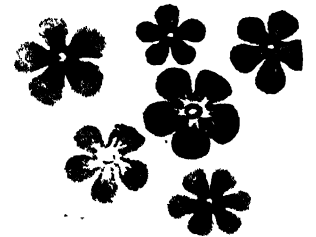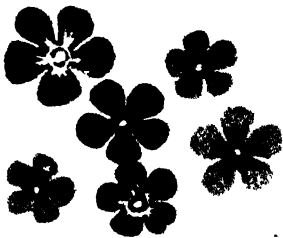
স্বনামা পুরুষ : রামতনু লাহিড়ী

শিবনাথ শাস্ত্রী

তোমরা এখন দেশে চারিদিকেই ইংরাজি স্কুল দেখিতেছ। হাজার হাজার ছেলে সেখানে গিয়া প্রতিদিন পড়িয়া আসিতেছে, কিন্তু ৮০ বৎসর পূর্বে এরূপ ছিল না। দেশে একটিও ভাল ইংরাজি স্কুল ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতাতে ফিরিঙ্গি সাহেবরা দুই-একজন, দুই-একটি স্কুল করিয়া ছেলেদিগকে একটু ইংরাজি পড়িতে ও বলিতে শিখাইতেন, আর কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর নামক শহরে কয়েকজন খ্রিষ্টান মিশনারি সাহেব ছিলেন, তাঁহারা দুই-একটি স্কুল করিয়া একটু ইংরাজি শিখাইতেন এই মাত্র। তখনকার গভর্নমেন্ট এ দেশের লোককে ইংরাজি শিখান আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহারা সংস্কৃত, আরবি ও পারসি প্রভৃতি শিখাইবার চেষ্টা করিতেন এবং সেজন্য সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের লোক ইংরাজি শিখিবার জন্য পাগল ছিল।

সে সময় ডেভিড হেয়ার নামে একজন স্কটল্যান্ডদেশীয় লোক কলিকাতাতে ঘড়ির ব্যাবসা করিতেন। এই ঘড়িওয়ালা হেয়ার সাহেবের হৃদয় খুব উদার ছিল। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত মিলিয়া এই পরামর্শ করিলেন যে এ দেশের লোকদিগকে ইংরাজি শিখাইতে হইবে। প্রধানত হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে ১৮১৮ কি ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে স্কুল সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। উহার উদ্দেশ্য কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজি স্কুল স্থাপন করা। তখন হেয়ার সাহেবের নাম দেশে এমনি প্রচার হইল যে হেয়ার সাহেব পালকিতে করিয়া বাহির হইলেই গরিব ছেলেরা “সাহেব আমাদের পড়ার সুবিধা করিয়া দিন”, “সাহেব আমাদের পড়ার সুবিধা করিয়া দিন”, বলিয়া পালকির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিত। ১৮২৬ কি ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি ১৩/১৪

বৎসরের ব্রাহ্মণের ছেলে হেয়ার সাহেবের পালকি ধরিয়া ছুটিত। সাহেব বালকটির আগ্রহ দেখিয়া মনে করিলেন, দেখা যাক ইহার আগ্রহটা কত ? এই ভাবিয়া তাহার কথা শুনিয়াও শুনিতেন না কিন্তু ঐ বালকটি ছাড়িত না। পালকির সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিত, এইরূপ প্রায় একমাস কাল পালকির সঙ্গে ছোটার পর, সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার লেখাপড়ার প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, এস তোমাকে আমরা স্কুলে বিনা বেতনে ভরতি করি।" এই বলিয়া স্কুল সোসাইটির স্কুলে তাহাকে ভরতি করিলেন। এই স্কুলের নাম হেয়ার স্কুল হইয়াছে।

এই বালকটির নাম রামতনু লাহিড়ী। এমন মানুষ আমাদের দেশে কম জন্মিয়াছেন। নদিয়া জেলার প্রধান শহর গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। এই শহরে নদিয়ার রাজারা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা চিরদিন গুণী লোকদের আদর করিয়া থাকেন, এজন্য কৃষ্ণনগর এককালে অনেক গুণীলোকের বাসভূমি হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের নাম বাংলাদেশে সর্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিল। বারেন্দ্রশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ পরিবার কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন, তাঁহাদের পদবি লাহিড়ী। লাহিড়ীবংশের অনেকে কৃষ্ণনগরে রাজবাড়িতে কর্ম করিতেন। এই বিখ্যাত বংশে অনুমান ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে রামতনু জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্যরূপ লেখাপড়া করিয়া ইনি ইংরাজি শিখিবার জন্য কলিকাতায় স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট আসিয়া বাস করেন। শুনিয়াছি রামতনুবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতামাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। দেশ হইতে পিতার পত্র আসিলে তিনি অগ্রে সেই পত্র ভক্তিভরে মস্তকে রাখিতেন, তৎপরে খুলিয়া পাঠ করিতেন। আর তিনি নাকি আপনার মাতাকে দেবতার আসনে বসাইয়া, তাম্রকুণ্ডে তাঁহার পদদ্বয় স্থাপিত করিয়া, পুষ্প ও চন্দন দিয়া পূজা করিতেন। শুনা যায়, তাহার মা ইহাতে এত ভয় পাইতেন যে কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রকে বলিতেন, "কর কি ? আমার যে গা কাঁপে, নারায়ণের তাম্রকুণ্ডে আমার পা রেখ না।" পুত্র বলিতেন, "মা, তুমিই আমার নারায়ণ"। এমন বংশে যাঁহার জন্ম, গুরুর প্রতি ও সাধুজনের প্রতি তাঁহার কত ভক্তি হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। গুরু ও সাধুজনের প্রতি বাল্যকাল হইতেই রামতনু লাহিড়ীর অতিশয় ভক্তি দেখা দিয়াছিল।

যখন রামতনুর বয়স সতেরো বৎসর তখন তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে তখনকার হিন্দু কলেজে আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভরতি হইলেন। ডিরোজিও নামে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব তখন সেই শ্রেণীতে পড়াইতেন। ইঁহার মত ছাত্রবৎসল উপযুক্ত শিক্ষক এ দেশে আর দেখা যায় নাই। ডিরোজিও সাহেব 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে জ্ঞান ও নীতি বিষয়ে অনেক আলোচনা হইত। ছেলেরা উৎসাহের সহিত যোগ দিত। রামতনুবাবুও এই ডিরোজিও সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় স্কুল হইতে বাহির হইয়া শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম হিন্দু স্কুলে, তৎপরে বর্ধমান, উত্তরপাড়া, রসাপাগলা, বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অনেক দেশের স্কুলে তিনি শিক্ষকতা কার্য করিয়াছিলেন। যখন তিনি বর্ধমান স্কুলের হেডমাস্টার, তখন স্কুলের একখানি ম্যাপ হারাইয়া যায়। রামতনুবাবুর সন্দেহ হইয়াছিল, স্কুলের ভৃত্য ম্যাপখানি চুরি করিয়াছে। কিন্তু রামতনু বাবু ভৃত্যকে কিছু বলেন নাই। অবশেষে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল এক আলমারির পাশে ম্যাপখানি পড়িয়া আছে। তখন অকারণে ভৃত্যের উপর সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া রামতনুবাবুর মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি নির্দোষ, তবু আমি অকারণে তোমাকে সন্দেহ করিয়াছি, আমাকে মাপ কর। ভৃত্য অবাক। রামতনুবাবু এমনি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন বালকদিগের নীতি ও চরিত্রের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

বৃদ্ধাবস্থাতে তিনি পেনসন লইয়া নানাস্থানে বাস করিতেন। সে অবস্থাতে আমরা অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার যে সাধুতা দেখিয়াছি তাহা আর বর্ণনা করিবার নহে। ইঁহার কাছে বসিলে নানা সৎ বিষয়ের কথা শুনিতে শুনিতে মন উন্নত হইত। ইঁহার বিষয়ে একজন বাঙালি কবি বলিয়াছেন—

যার সঙ্গে একদিন করিলে যাপন
সাতদিন থাকে ভাল পাপাসক্ত মন।

একথা সত্য। আমরা অনেকে ইহার সাক্ষ্য দিতে পারি। ইনি ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

যুগপ্রবর্তক রামমোহন

বিপিনচন্দ্র পাল

রাজা রামমোহন হইতেই বাংলার নবযুগের সূচনা। ...রাজাই প্রথমে বাংলার সনাতন স্বাধীনতা প্রবৃত্তি ও মানবতাকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন। ....রাজা বাংলাদেশে ইংরাজি শিক্ষার একজন আদি প্রতিষ্ঠাতা। ....ইতিপূর্বে বেদাদি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সংস্কৃতেই আবদ্ধ ছিল। সুতরাং অতিশয় পণ্ডিত লোক ব্যতীত আর কেহ—কি ব্রাহ্মণ কি অন্য জাতি—এই শাস্ত্রের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু মুক্তি তো কেবল পণ্ডিতের সাধ্য নহে, জীব মাত্রের সাধ্য। ...সকল শাস্ত্র যাহাতে সকল লোকে পড়িতে ও বুঝিতে পারে, তাহার জন্য রাজা এ সকলের বাংলা অনুবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে বাংলায় হিন্দু সাধারণের স্বাধীন চিন্তা জাগাইয়া তাহারা যাহাতে বুঝিয়া শুনিয়া বিচার পূর্বক শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করিয়া ধর্ম সাধনে সমর্থ হয়, তিনি তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

ইহা কেবল ধর্ম সংস্কার নহে। উপনিষদাদির বাংলা অনুবাদ প্রচার করিয়া রাজা বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু সমাজে এক অভিনব চিন্তার খাত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আবার নূতন করিয়া ভগীরথের মতন বাঙালির মুক্তির কামনায় এক অভিনব গঙ্গা ডাকিয়া আনিলেন।

...রাজা মানুষ বলিয়াই মানুষের যে একটা অধিকার আছে, ধর্ম সাধনের বা সমাজ শাসনের অজুহাতে কিছুতে যে এই অধিকারকে নষ্ট করিতে পারা যায় না, এই মহা সত্য নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যের প্রেরণাতে রাজা সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। হিন্দু স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ প্রচার

করেন তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাতে গিয়া পার্লামেন্টের ভারত শাসন সম্বন্ধীয় কমিটির নিকট তিনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহার ভিতরেও তাঁর এই মানবতার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভারতের প্রত্যেক কৃষক যাহাতে তাহার নিজের চাষের জমির উপরে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পার্লামেন্টকে অনুরোধ করেন।

...ভারতবর্ষের লোকেরা চিরদিন বা সুদূর অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিদেশির শাসনাধীনে বাস করিবে, এ চিন্তা রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে তিনি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প কলাকুশলাদি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে না পারিলে বর্তমান সময়ে কোনও জাতি দুনিয়ার মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। এই জন্য ইংরাজ শাসনের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তিনি স্বীকার করিতেন। এই জন্য ইংরাজ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ভারতের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকুক, ইহাতে রাজার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এত বড়ো একটা প্রাচীন জাতি এরূপ একটা সর্বজনীন ও উদার সভ্যতা ও সাধনার অধিকারী হইয়া জগতের বিশাল কর্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এমন দুর্ঘটনা রাজার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহনকে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও প্রবর্তক রূপে প্রত্যক্ষ করি।.... স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যার প্রাণে বলবতী সে সংগ্রাম বিমুখ হইতে পারে না; মানুষের উপর মানুষ অযথা আধিপত্য করুক, রাজা ইহা সহিতে পারিতেন না।... রাজার এই মানবতা তাহার রক্তের মধ্যে ছিল। সকল বাঙালির রক্তের মধ্যেই ইহা আছে। রাজা দেখিলেন, ভারতবর্ষ আপনার বৈচিত্র্যে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বের মতন। এই ভারতে যাহা নাই জগতেও তাহা নাই বলিলেই চলে। এখানে বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহুবিধ সামাজিক রীতিনীতি, বহু আচার পদ্ধতি, বহু সাধনা এবং সভ্যতা আসিয়া মিলিয়াছে। এই ভারতে যদি এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যকে যথাযোগ্যভাবে বজায় রাখিতে হইবে।... সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিরোধ আছে তাহা দূর না হইলে ভারতে আধুনিক আদর্শের একটা নূতন জাতির পত্তন কিছুতেই হইতে পারে না। রাজা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং

ভারতের জাতীয়তার মূল অন্তরায় দূর করিবার উদ্দেশ্যেই, মনে হয়, তিনি তাহার 'ব্রাহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা ব্রাহ্মধর্ম নামে কোনও নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ব্রাহ্ম সমাজ নামে কোনও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই। ...রাজা রামমোহন রায় আচার অনুষ্ঠান সমন্বিত বিরাট যে হিন্দুধর্ম তাহার একজন পালক ও সংস্কারক ছিলেন, কোনও নূতন ধর্ম তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ....ভারতের জনসমুদ্রের ধর্ম ও আচারগত ভেদ ও বিরোধের অন্তরায়কে ক্রমে দূর করিয়া, এ সকল ভেদের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষে একটা বিরাট জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠা করিবার আশাতেই মনে হয়, রাজা রামমোহন তাঁহার ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

এইরূপে রাজা ভারতের নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। ...এই জন্যই তাঁহাকে বাংলার এই নবযুগের যুগপ্রবর্তক বলিয়া অভিবাদন করি।

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

মৃত্তিকার নীচে অনেকদিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তারপর বর্ষার প্রারম্ভে দুই এক দিন বৃষ্টি হইল। আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, ''আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে।'' আস্তে আস্তে বীজের ঢাক্‌নাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ ? মনে হয়, শিশুটি যেন ছোটো মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নতুন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহার নাম মূল। আর এক অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তাহাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেই ''মূল'' আর ''কাণ্ড'' এই দুই ভাগ দেখিবে।

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোটো ছোটো শিশুদের দাঁত নাই ; তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল

ভারত : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

স্বামী বিবেকানন্দ

আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশহাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ি-ঘর-দুয়ার
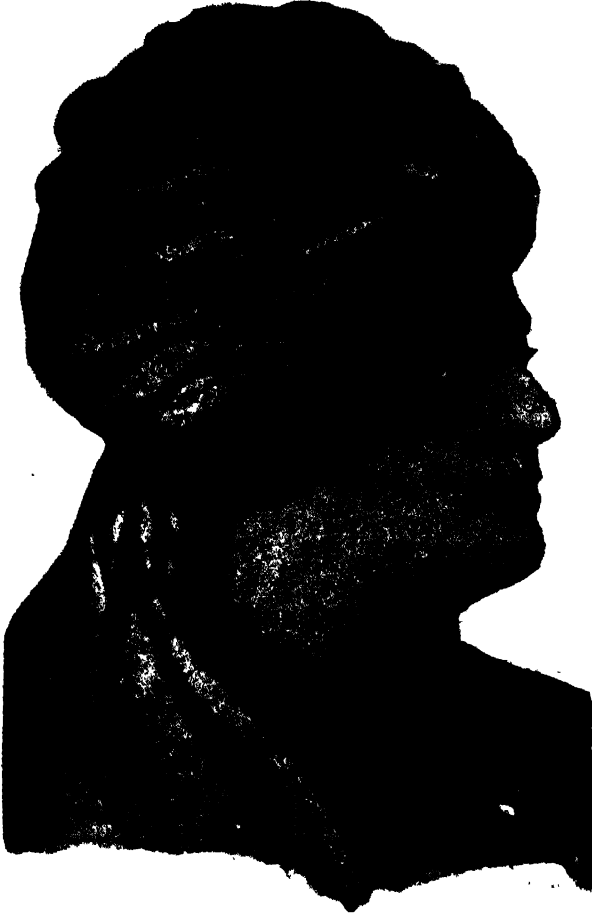
মিউজিয়ম,. তোমাদের আচার-ব্যবহার চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা— ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূতকাল—লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ-লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি করছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্ত-মাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালোবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কাঙালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ওই তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্‌বোধন-ধ্বনি— "ওয়াহ গুরু কি ফতে"।

রাত্রিকালে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে কখনও কখনও দেখা যায় যেন একটি নক্ষত্র সহসা স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইল। এই ঘটনার নাম উল্কাপাত। অনেকের ধারণা আছে যে, নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে স্বস্থান পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয়। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে।

আকাশে যে সব নক্ষত্রগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদয় দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও অতিশয় প্রকাণ্ড পদার্থ। সূর্য আয়তনে প্রায় বারো লক্ষ পৃথিবীর সমান। আকাশে এক একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য। কোনো কোনোটি সূর্য অপেক্ষাও আয়তনে বৃহৎ। এই সূর্য সদৃশ বা সূর্যাপেক্ষা বৃহৎ পদার্থ এত দূরে সন্নিবেশিত রহিয়াছে যে, আমাদের সমক্ষে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়। পৃথিবীতে নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাণ্ড পদার্থের পতন সম্ভবপর নহে। ভূতলে নক্ষত্র পতন দূরের কথা, পৃথিবী নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রজ্জ্বলিত পদার্থের নিকটবর্তী হইলে তৎক্ষণাৎ বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে। সুতরাং উল্কাপাত নক্ষত্রের পতন নহে।

উল্কাপিণ্ড নক্ষত্র নহে বটে, কিন্তু উহারাও নক্ষত্রের ন্যায় আকাশ-বিহারী পদার্থ। উহাদের আয়তনের সহিত নক্ষত্রের আয়তনের কোনো তুলনা হয় না। অনেক স্থানে উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতলে পতিত হইয়া থাকে। এইরূপ অনেক উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডে লৌহের ভাগ বেশি। কোনোটিতে শতকরা ৯০/৯৫ ভাগ কেবল লৌহ থাকে। লৌহ ভিন্ন অন্যান্য পদার্থও উল্কাপিণ্ডে দেখা যায়।

অনেকে আপনাদের সম্মুখে উল্কাপিণ্ড পতিত হইতে দেখিয়াছেন। সহসা অন্তরিক্ষ হইতে একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর নিকটবর্তী স্থানে পতিত হইলে স্বভাবতই লোকের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। বিলাতের প্রধান চিত্রশালায় তিন শতের অধিক উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত রহিয়াছে। তৎসমুদয়ের

মধ্যে প্রায় দুইশত উল্কা কেহ না কেন ভূপতিত হইতে দেখিয়াছেন।

উল্কাপতন সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে নানা কথা লিপিবদ্ধ আছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫৪ অব্দে রোমের নিকটবর্তী একটি পর্বতে উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৬১৬ অব্দের ১৪ জানুয়ারি চীনদেশের কোনো স্থানে একটি উল্কাপিণ্ডের পতনে দশজন লোকের মৃত্যু হয়। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান দেশের পশ্চিম-দিগন্তবর্তী আলসাস্ নামক প্রদেশে তিন মণ ওজনের একখণ্ড প্রস্তর নভোমণ্ডল হইতে ভূপতিত হয়। ইহার কিয়দংশ অদ্যাপি তত্রস্থ উপাসনা-মন্দিরে রক্ষিত আছে। ইতালির অন্তর্গত পাদুয়া নামক স্থানে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে সহস্রাধিক প্রস্তর খণ্ডের বর্ষণ হয়। কথিত আছে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির একখণ্ড উল্কাপিণ্ডের লৌহে একখানি তরবারি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ওই উল্কাপিণ্ড ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে জলন্ধরের নিকট পতিত হইয়াছিল। কোনো কোনো স্থানে স্বর্গচ্যুত প্রস্তরের উপাসনা প্রচলিত ছিল। এইরূপ স্বর্গভ্রষ্ট, দেবনিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের উপাখ্যান অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়।

উল্কাপাত সময়ে কখনও কখনও গভীর বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। পতনশীল উল্কার জ্যোতিতে নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। দিবাভাগে সূর্যালোকেও এইরূপ জ্যোতির্ময় উল্কাপিণ্ডের পতন লক্ষিত হইয়াছে। কখনও বোধ হয়, যেন একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিময় পিণ্ড আকাশপথে প্রবল বেগে চলিয়া গেল। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ আগস্ট এইরূপ একটি অগ্নিপিণ্ড ইউরোপের উপর দিয়া শেট্‌ল্যান্ড দ্বীপ হইতে রোম পর্যন্ত গিয়াছিল। পতন সময় উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছিল, এবং প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৫ ক্রোশ বেগে চলিয়াছিল। জ্যোতিতে উহা পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা দীপ্তিমান হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নহে। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর আর একটি অগ্নিপিণ্ড আয়ারল্যান্ডের উপর দিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে চলিয়া যায়। আকাশমণ্ডলে উহার অবস্থিতি ভূপৃষ্ঠ হইতে দশ ক্রোশ ঊর্ধ্বে ছিল।

এই আকাশ-বিহারী পদার্থ কোথা হইতে আসে, কেনই বা ভূপতিত হয়, জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। রাত্রিতে আকাশ নির্মল থাকিলে প্রায়ই দুই চারিটি উল্কার পতন জানা যায়। স্থিরভাবে সমুদয় গগনমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিয়া জানা গিয়াছে, প্রত্যহ প্রতি ঘন্টায় পাঁচ-সাতটি উল্কা পতিত হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আরও অধিক সংখ্যক দেখা যায়। আমেরিকাবাসী জনৈক জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতিদিন অন্যূন পঁচাত্তর লক্ষ উল্কা আকাশ-মণ্ডল হইতে ভূপতিত হয়। সংখ্যায় এত অধিক হইলেও, উহাদের অধিকাংশ নিরতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থ। ওই পঁচাত্তর লক্ষ উল্কার সমষ্টি গুরুত্বে দুই-তিন হাজার মণের অধিক হইবে না। অধিকাংশই বায়ুস্তরে প্রবেশ করিয়া ভূপৃষ্ঠে উপনীত হইবার পূর্বেই দগ্ধীভূত ও বাষ্পীভূত হয়। অনেকে প্রবল বেগে বায়ুমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংঘর্ষে বিচূর্ণিত হইয়া যায় এবং ধূলির ন্যায় বায়ুমধ্যে বহুকাল ভাসমান থাকিয়া কালে ভূতলগত হয়। সাইবেরিয়ার জনহীন প্রদেশে, তুষারক্ষেত্রে এবং গভীর সমুদ্রগর্ভে এইরূপ ধূলির মতো উল্কাকণিকা পাওয়া গিয়াছে। যে সকল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সেগুলিই বায়ুর স্তর ভেদ করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে।

এইরূপ উল্কাপাত ব্যতীত সময়ে সময়ে উল্কাবৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। ১২৯২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে আমাদের দেশে এইরূপ ঘটনায় লোকে নানারূপ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু, উল্কাপাত বা উল্কাবর্ষণে কোনোরূপ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই।

বুধ, শুক্র পৃথিবী প্রভৃতি বৃহদায়তন জ্যোতিষ্ক যেরূপ আকাশে নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণশীল রহিয়াছে, সেইরূপ সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র পদার্থও নভোমণ্ডলে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ জলজীব যেমন সমুদ্রের জলমধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ উল্কাপিণ্ড নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ পদার্থের সমীপস্থ হইলেই এই সকল জড় পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি গ্রহগণ যেরূপ সৃষ্টির আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিয়া নির্দিষ্টপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ এই সকল উল্কা সূর্যের আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পৃথিবী আকাশের যে পথে ভ্রমণ করে, কোনো কোনো উল্কাদল সেই পথ ভেদ করিয়া সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। পৃথিবী এবং উল্কাদল উভয়েই যখন সূর্য প্রদক্ষিণ সময়ে পথের সেই সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়, তখনই উল্কাবৃষ্টিরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শিম্পাঞ্জি ভায়ার চিঠি

সুবিনয় রায়চৌধুরী

"আমার তত কিছু শখ নেই লিখবার; নেহাত মানুষের পিড়াপিড়ির খাতিরে দু-কলম লিখছি। আর মানুষের কথা লিখবই বা কত? তাদের কাজকর্ম, কাণ্ড-কারখানা, কায়দা-কানুন, ক্রিয়াকাণ্ড, কীর্তি-কলাপ, কল-কব্জা, রকম-সকম, মন্তর-যন্তর, চাল-চালাকি, ভান-ভণ্ডামি, এ সব এত দেখেছি, জেনেছি, শুনেছি, শিখেছি, ঘেঁটেছি, করেছি যে সে সব কথা লিখতে বসলে আমি বুড়ো হয়ে গেলেও শেষ হবে না—ছাপাই বা হবে কবে? তাই অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলুম, মানুষ কী রকমের জীব আর কী ধরনের কাজকর্ম করে, শুধু সে বিষয়েই অল্প কিছু বলব। মানুষ পাঠক-পাঠিকা হয়তো লেখা পড়ে চটবেন; কিন্তু যা তা তো বলতেই হবে; চটুন আর যাই করুন। জাতভায়েরা এ সব পড়ে কিছু শিখবে, সাবধানও হবে;—হাসবেও কিছু কিছু।"

"মানুষ অনেক রকমের;—গোলাপি, হলদে, মেটে, কালচে, মিস্-কালো, তা ছাড়া পাঁচমিশালি নানা রঙের লোকও ঢের আছে। শুনেছি নাকি, ইংরাজিতে গোলাপি সাহেবদের বলা হয় 'সাদা' লোক;—কিন্তু, সেটা সত্যি নয়,—সার্কাসের সং ছাড়া আর সাদা লোক নাই। কিন্তু ফর্সা বলা চলতে পারে। পুবের দেশের লোকেদের বলা হয় 'কালো'; কিন্তু সেখানে হলদে ও মেটে লোক বিস্তর আছে,—সাহেবদের মতো ফরসা লোকও আছে, কাজেই এটাও তত সত্যি নয়। যাক্‌গে—যা ইচ্ছা বলুক!"

"আমরা সবাই হলুম শিম্পাঞ্জি কিন্তু মানুষদের 'জি'র হিসাবে শেষ নাই।—মাস্টারজি, মুখারজি, ইসমাইলজি, স্বামীজি, চাটারজি, বানারজি, রামজি, ভটচারজি, নারানজি, ইয়াকজি, শেঠজি—আরও কত কিছু! নামের রকমারি দেখ। মানুষের পাল্লায় পড়ে আমাদেরও নতুন নামকরণ হচ্ছে;—কেউ 'চার্লি', কেউ, 'বিলি' কেউ 'জিমি'—এই রকমের।"

"মানুষের খেয়াল কী কিছু বোঝবার জো আছে? শুনলাম সেদিন বিকেলে একজন মানুষ এখানে এসেছিল—সে নাকি 'বড়োলোক'। আমি তো 'বড়ো' লোক কিছু দেখতে পেলাম না। বেঁটে, ছোট্ট, রোগা, লিকলিকে—সে আবার বড়ো লোক হল কেমন করে? শুনলাম তার নাকি অনেক জিনিস-পত্তর আর 'টাকা' বলে এক রকম সাদা চকচকে চাক্তির মতো জিনিস অনেক আছে—তাই তাকে 'বড়োলোক' বলা হয়। বা রে বা! সে মোটেই বড়ো নয়, তবু জোর করে তাকে 'বড়ো'

বলবে? আর, আমার ঘরে রোজ যে ঝাড়ু দেয়, সে নাকি ছোটো লোক। চার হাতের চেয়েও বেশি লম্বা, দিব্য মোটা সোটা ষণ্ডা লোকটি—সে হল 'ছোটোলোক'। মোটে 'ছোটো' লোক নয়।''

''বড়ো লোকদের সঙ্গে নাকি এক রকমের সাহেব থাকে। সেদিন যে বড়োলোক এসেছিল, তার সঙ্গে তো একজনও সাহেব দেখলাম না। শেষে শুনলাম তারা অন্যরকমের 'সাহেব'—বড়ো লোকেরা যা বলে, যা করে তার সঙ্গে সঙ্গে এই মো-সাহেবেরা মুন্ডু নেড়ে যেতে থাকে। কথা যদি সত্য না হয়, কাজ যদি ভুল হয়—তবু মুন্ডু নাড়বে? কী মুখ্যু এরা!''

''মানুষদের মধ্যে অনেক দুষ্টু মানুষ আছে। তারা লুকিয়ে, মেরে; অন্যদের জিনিস নিয়ে পালায়; কেউ কেউ ঝগড়া করে, মারামারি করে, আবার কেউ কেউ মিছিমিছি মারামারি করে। এদের কাউকে বলে চোর, কাউকে বলে ডাকাত, কাউকে বলে গুন্ডা, আরও কত কী! এদের ধরবার জন্যে—'পুলিশ' বলে একরকম মানুষ আছে। ধরে নিয়ে 'হাকিম' বলে একরকম মানুষের কাছে হাজির করা হয়। সেখানে 'উকিল' বলে একরকম মানুষেরা চেঁচিয়ে হাত নেড়ে বকাবকি করে;—কেউ বলে, 'ও লোকটা কিচ্ছু করেনি,' কেউ বলে, 'আলবত করেছে।' শেষটায় 'হাকিম' হয় তাকে শাস্তি দেয়, নয়তো ছেড়ে দেয়। শাস্তি হলে 'জেল' বলে একরকম ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়; আবার কিছুদিন বাদে ছেড়ে দেওয়া হয়।''

''এ তো তবু ভালো, সেদিন একজন খবর-কাগজওয়ালা একজন হাকিমের কথা নাকি লিখেছিল যে, সে 'হাকিম' নাকি একজন মানুষকে বড্ড বেশিদিনের জন্য 'জেল' দিয়েছে। আমি দেখলুম, তার ঘরের সুমুখের বারান্দায় সারি-সারি খাঁচার ভেতর সাতটা পাখি, চারটে বিলিতি ইঁদুর, ছটা খরগোস আর বারোটা গিনিপিগ বন্ধ রয়েছে। তারা কিছু দুষ্টুমি করেনি, পুলিশে ধরেনি তাদের, 'উকিলরা' কিছু বলেনি, 'হাকিম'ও জেল দেয়নি; তবু কেন তাদের আটকে রাখা হয়েছে? আবার তাদের নাকি আর ছাড়াই হবে না! বুঝে দেখ একবার আস্পর্ধার ব্যাপারখানা।''

'যুদ্ধ' বলে এক রকমের মারামারি মানুষেরা তৈরি করেছে। তোমায় আমায় মারামারি হয়, লড়াই হয় জানি;—এদের কিন্তু তা নয়। একেবারে এক দঙ্গল এসে আর এক দঙ্গলকে মারবে। শুধু তাই নয়; এর জন্য আবার নানা রকম যন্তরও তৈরি হয়েছে। কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, এ সব তো আছেই। আজকাল আবার বোমা বলে এক রকম জিনিস বেরিয়েছে, সেগুলো মাটিতে পড়ে ফেটে যায়, আর অনেক মানুষ মরে যায়। তুমি যদি যুদ্ধ করতে না চাও, তবু তোমাকে ছাড়বে না। বোমা ফেটে যদি তুমি মরে যাও তো গেলে—আপদ গেল। আবার, বোমা ফেটে এক রকম ঝাঁঝালো হাওয়া বের হয়;—সেটা শুঁখেছ কি মরেছ! তা থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ একরকম 'ভূতের মুখোশ' বের করেছে। তবু কি রক্ষা আছে? কাঁদুনে হাওয়া, চুলকানি হাওয়া, ফোস্কা পড়া হাওয়া, দমবন্ধ হাওয়া—কত কী বেরিয়েছে! এদের ইচ্ছে, যখন মারতে হবে তখন ভালো করেই মারো—শুধু কানমলা, খামচা, চিমটি, ঘুঁসি, কাতুকুতু, ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া, এ সব নয়;—এক্কেবারে মেরে ফেলতে হবে;—যাকে বলে ''অক্কা''। যুদ্ধ আবার শুধু ডাঙায় নয়;—জলে, আকাশে, জলের তলায়—সব জায়গায় যুদ্ধ চলবে। একেই বলে 'যুদ্ধ'। কেন যে যুদ্ধ করে, তা জানি না। আজকাল নাকি সব দেশেই যুদ্ধটা চালাবার চেষ্টা চলেছে। আমরা বাপু ও সবের মধ্যে নেই। অবিশ্যি, আমরাও কুস্তি, বক্সিং লড়ি—কিন্তু, 'অক্কা' পর্যন্ত কখনও গড়ায় না।'

''মানুষেরা দোলনায় জিমনাস্টিক দেখিয়ে বাহাদুরি নেয়। আমাদের খোকারা যে সব তামাসা দোলনায় চড়ে দেখায়, মানুষেরা দেখাক দেখি সে সব খেলা?—আবার চাল মারে!''

'মান্‌ষামি' আমরা অনেক করে দেখেছি,—কিচ্ছু শক্ত নয়। চশমা আমি অনেকদিন থেকেই চোখে দিয়েছি;—তাতে আর কী বাহাদুরি? কোট, পেন্টুলুন, টুপি, সবই পরেছি;—কিছুই শক্ত নয়। শুধু জুতো পরাটা একটু যা মুশকিল।''

''মানুষেরা সিগারেট খায়,—আমিও খেয়ে দেখেছি; বিচ্ছিরি খেতে। মুখে দিয়ে চিবুতেই বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয় আর তেতো লাগে খেতে। শেষে শুনলাম, ডগায় আগুন ধরিয়ে গোড়ার দিকে মুখ দিয়ে টান দিতে হয়। সে রকমও করে দেখেছি, চালটা মন্দ নয়। 'প-ফুস' করে ধোঁয়া ছেড়ে, উপর দিকে তাকাতে হয়।'

''ডাক্তারি আমি ঢের করে দেখেছি, কিছু শক্ত নয়। একটা যন্তর কানে লাগিয়ে, বুকের ধুক-ধুক শুনলেই তো

ডাক্তারি হয়ে গেল। তারপর অবশ্যি কাগজ-কলম নিয়ে কতগুলো হিজিবিজি লিখলেই হয়। এ আবার কি একটা শক্ত কথা নাকি? কোনো কোনো ডাক্তার আবার ছুরি নিয়ে কাটাকাটিও করে। আমাকে ছুরি দিলে আমিও কাটাকুটি করতে পারি; কিন্তু, দরকার কী বাপু?'

"গান বলে একরকম চেঁচামেচি আছে, তা-ও করে দেখেছি। মানুষের সঙ্গে ঠিক মেলেনি; তবে, গান কিচ্ছু ভালো না। বাঁশিও বাজিয়েছি;—তাতে আর বাহাদুরি কী? মুখ দিয়ে ফুঁ দিলেই হল। পিয়ানো বলে একরকম বাজাবার যন্তর আছে—তা-ও বাজিয়ে দেখেছি। টুংটাং নানা রকমের আওয়াজ বেরোয়। তাতে যে কী লাভ, কিচ্ছু বোঝবার জো নেই। হ্যাঁ ঢাক বলে যে যন্তর আছে, সেটা বাজাবার মতো জিনিস বটে। মনের সাধে পিটিয়ে যাও,—কী মিষ্টি আওয়াজ!"

"চেয়ারে বসে, টেবিলে, কাঁটা চামচ নিয়ে ঢের খানা খেয়েছি,—এমন আর কী ব্যাপার? খানা তৈরির সময় ময়দা ঠেসে দেখেছি—এমন কিছু মুশকিলের ব্যাপার নয়। গোড়ায় অবিশ্যি একটু অসুবিধে ঠেকে, —থলে থেকে ময়দার গুঁড়ো ঢালবার সময় 'ভুষ' করে গায়ে উঠে এসে পড়ে। তা হোক্‌গে;—তার পর জল দিয়ে মাখতে কী মজা। নিজে রান্না করে দেখিনি; তবে রান্না জিনিস বেশি খেলে ব্যামো হয় শুনেছি। আরে আমাদের জাতের কে কবে রান্না জিনিস খেয়েছে? মানুষের ডাক্তারেরা আজকাল বলে 'কাঁচা জিনিস খাও, ব্যামো হবে না।' আমরা যে কোন্ আদ্যিকাল থেকে কাঁচা জিনিস খেয়ে আসছি, তার খবর কেউ রাখে কি? আমরা তো আর মানুষের মতো হাঁদা নই।"

"মানুষের কলকব্জা অনেক ঘেঁটেছি; টাইপরাইটার, টেলিফোন, ক্যামেরা—আরও কত কিছু। টেলিফোন বড়ো মজার জিনিস, কানে দিলেই মানুষের গলা শোনা যায়। ক্যামেরা দিয়ে সকলের ছবি ওঠানো যায়; কুড়ুৎ করে একটা কল টিপলেই হয়। সে আবার শক্ত নাকি? —আমিও পারি কুড়ুৎ করে কল টিপতে। আমার একটা ছবি ওঠানো হয়েছিল একদিন। দেখলাম রংটা কালো উঠেছে, আর আমার চেহারার চেয়ে অনেক ছোটো হয়েছে। একদিন আয়নায় আমার চেহারা দেখেছিলাম, ছবির চেয়ে ঢের ভালো।"

"মানুষেরা যে সব বই তৈরি করে, সেগুলো খুব ভালো। তার মধ্যে যে সব ছবি থাকে, দেখবার মতো জিনিস। কোথা থেকে যে জোগাড় করে, কে জানে? আমি অনেক বই দেখেছি, কিন্তু তার সবটা বুঝতে পারিনি। শুধু ছবিগুলো বুঝেছি।"

"আমি সাইকেল চড়েছি, ট্রাইসাইকেল চড়েছি, গাধা টানা গাড়ি হাঁকিয়েছি। মোটর চালাবার চাকা ধরে অনেকবার বসেছি—ইচ্ছা করলেই চালাতে পারতাম। —শুধু থামানোটা একটু হাঙ্গামা বলেই চালাইনি। যদি কেউ মোটরের সামনে এসে পড়ে অমনি 'ভঁ-অঁ-অ-প্' করে জোরে রবর টিপে দিলেই সরে যাবে; যদি না সরে তো চাপা পড়ে যাবে।"

"জাহাজে চড়েছি, রেলে চড়েছি, মানুষের আর গাধার পিঠে চড়েছি, মানুষের কাঁধে চড়েছি, কোলে চড়েছি। আমার কাকা আকাশে-ওড়া কলে চড়েছে। শুনেছি নাকি, মাঝে-মাঝে ওই কল ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ে চুরমার হয়ে যায়;—ভেতরে যারা থাকে, তারাও চ্যাপটা হয়ে মরে যায়। পাখিদের দেখাদেখি ওড়বার শখ হয়েছে, কিন্তু উড়তে জানলে তো? পাখি আকাশে উড়তে উড়তে ঝুপ করে পড়ে মরেছে, কোনোদিন এ কথা শুনেছ কি? ছোঃ।"

"এক এক সময় অনেক মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়ে কী জানি করে। চেঁচামেচি হয়; হাততালি হয়, ঝগড়াঝাঁটি হয়;—আবার মারামারিও হয়। কেন যে হয় জানি না। একে নাকি সভা বলে। আসলে বোধ হয় 'সব ভাঙ্গ'—তাকেই মুখ্যু লোকেরা 'স—ভা—' বলে।"

"ঢের লিখেছি—আর লিখে কাজ নেই। মানুষ যে কী জীব, তা বোধহয় এতক্ষণে কিছু বুঝতে পেরেছ।"

সন্ধ্যার পর আকাশের দিকে তাকালে সত্যিই অবাক লাগে। সারাদিন ধরে যে সূর্যের আলোয় সমস্ত দিক ঝলমল করছিল সন্ধ্যার দিকে সেই সূর্যই জৌলুস হারিয়ে লাল হতে হতে এক সময় পশ্চিম দিকে টুপ্ করে ডুবে গেল। যে আকাশটাকে সারাদিন নীল একটা চাঁদোয়ার মতো আমাদের মাথার ওপর বিছানো রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল সে আকাশ হঠাৎ তার নীল রং হারিয়ে ঘন কালো হয়ে উঠল, আমরা বলি অন্ধকার নেমে এল। কিন্তু একটু পরেই দেখা যাবে সেই কালো আকাশের গায়ে ক্রমে-ক্রমে ফুটে উঠছে একটি দুটি করে তারা—যেন আকাশের গায়ে কেউ একটি করে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আবহাওয়া যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে দেখতে-দেখতে সমস্ত আকাশ ঝকমক করবে ওই তারায় তারায়। শুধু ওরই মধ্যে আরও একটা বেশ বড়ো জ্যোতিষ্ক এসে দেখা দেবে,—আমাদের চাঁদ। তবে তার চেহারা সব সময় এক রকম নয়। কখনও সে পুরোপুরি গোল, কখনও মনে হবে তার খানিকটা অংশ কেউ কেটে নিয়েছে। তারপর ছোটো হতে হতে একদিন আর দেখাই পাওয়া যাবে না। আমরা বলব অমাবস্যা এসেছে। কিন্তু পরদিনই দেখা যাবে আবার সে এসে জুটেছে একফালি কুমড়োর মতো। তারপর রোজই একটু একটু করে বাড়বে এবং আবার একদিন হয়ে যাবে পুরোপুরি গোল। আমরা বলব পূর্ণিমা এসে গেছে। এই রকম বারে বারে ঘটবে। তারারাও সব রাতে বা রাতের বিভিন্ন সময়ে এক জায়গায় থাকবে না—সরে সরে এদিক ওদিক চলে যাবে। এরই মধ্যে, ভালো করে লক্ষ করলে, দেখা যাবে কতকগুলো আলো কেমন ঝিক্‌মিক্ করছে, কতকগুলো আলো স্থির। অর্থাৎ এরা সবাই এক রকম নয়, তাই এক জাতেরও না। তাই আপাতত আমরা ওদেরকে যদি শুধু জ্যোতিষ্ক পদার্থ বলেই উল্লেখ করি তা হলেই বোধহয় ঠিক বলা হবে।

যুগ যুগ ধরে পণ্ডিতেরা এই সব জ্যোতিষ্ক পদার্থের রহস্য বার করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে আসছেন, আর তারই ফলে একটা পৃথক অথচ বিরাট বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়ে উঠেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা 'অ্যাস্ট্রনমি'। এখানে বললে বোধহয় অবান্তর হবে না যে এই জ্যোতির্বিজ্ঞান আর জ্যোতিষশাস্ত্র কিন্তু এক নয়। ইংরেজিতেও প্রথমটিকে বলা অ্যাস্ট্রনমি, দ্বিতীয়টিকে অ্যাস্ট্রলজি! অ্যাস্ট্রনমিকেই পণ্ডিতেরা সঠিক বিজ্ঞান বলে মনে করেন।

আকাশ আর মহাকাশ বলতেও একটু প্রভেদ নিশ্চয়ই করা উচিত—যদিও অনেক সময়েই আমরা ও দুটি শব্দ সম-অর্থে ব্যবহার করি। আমাদের পৃথিবীর ঠিক পিঠের ওপরেই আছে একটা বাতাসের স্তর, যাকে বলা হয় বায়ুমণ্ডল। ডাঙা অথবা সমুদ্রের পিঠ থেকে দশ মাইল উঁচু পর্যন্তই এই বায়ুমণ্ডলের শতকরা নব্বুই ভাগ রয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই অংশটাকে বলেন ট্রপোস্ফিয়ার। এর ওপরের আরও আন্দাজ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত জায়গায়ও বাতাসের স্তর আছে, তবে সেটা খুবই

হালকা বাতাস। এই অংশটাকে বিজ্ঞানীরা বলেন, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এর পরের সাড়ে পাঁচশো মাইল, অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে ছশো মাইল পর্যন্ত যে স্তর তাকে বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার। এই অংশটায় বাতাস বা অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই সামান্য—এক রকম না থাকারই মতো। এই পর্যন্তই আমরা আকাশ বলতে পারি। এই সীমা পার হয়ে গেলে আর একবিন্দুও বাতাস থাকবে না, থাকবে না বাতাসে ভাসা ধুলো যার ওপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রঙের খেলা দেখায়। নিঃসীম অন্ধকারের রাজত্ব এখান থেকেই শুরু—তাই এখানকার ওপরের আকাশকে আর আকাশ না বলে মহাকাশ বলাই উচিত। মহাশূন্য বললেও ভুল হবে না।

আকাশ নিয়ে শুরু করেছিলাম, তার কথাই আগে বলি। দেখলে মনে হবে একটা নীল চাঁদোয়ার মতো এই আকাশ গোটা পৃথিবীটাকেই ঘিরে রেখেছে। সেকালের লোকেরা যখন এ সব বিষয়ে সঠিক কিছুই জানত না তখন তারা মনে করত ওটা বুঝি পৃথিবীর ছাদ, আর জ্যোতিষ্ক পদার্থগুলি বুঝি ওর গায়ে বসানো আছে। সূর্য, আসলে তিনি একজন দেবতা, ওই ছাদের এক কোণে পূর্বদিক দিয়ে মাথা তুলে সারাদিন আকাশপথে ছুটে বেড়োন সাত ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে, তারপর সন্ধেবেলা তার যাত্রা শেষ হয়,. আকাশের পশ্চিমদিকে আর এক কোণ দিয়ে তিনি নেমে যান। তারপর সারা রাত তাঁর বিশ্রাম। সূর্য বিশ্রাম করতে গেলে একে একে অন্য দেবতারা এসে আকাশে দেখা দেন। তাঁদের মধ্যে চন্দ্রদেবই সবচেয়ে বড়ো। আর সব তারারা তার কাছে কিছুই না—যদিও তাঁরাও এক-একটি দেবতা। আর সংখ্যায় তাঁরা ক'জন? উৎসাহীরা গুনে দেখেছেন এক একং রাতে প্রায় তিন হাজার তারা আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। যদি ধরা যায় পৃথিবীটা গোল তা হলে উলটো দিকেও আনুমানিক তিন হাজার তারা থাকবে। অর্থাৎ মোট দাঁড়াল ছ'হাজার, ব্যস!

কিন্তু এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন যে আকাশে এত তারা আছে যা গোনা তো দূরের কথা সংখ্যা দিয়েও প্রকাশ করা কঠিন। একটা শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে দেখলে অন্তত কয়েকশো কোটি তারা নজরে পড়বে। কিন্তু মনে হয় ওদের সংখ্যা তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি। আকাশের ওপরের দিকটাকে আমরা মহাকাশ বলেছি। ওটা যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে আজও তারও হদিস মেলেনি। আকাশের ওই নীল রং সত্যিকারের রং নয়। সূর্যের আলো বাতাসের অণুর ভিতর দিয়ে আসবার সময় বা ভাসমান ধূলিকণায় বিচ্ছুরিত হয়ে ওই রকম নীল দেখায়। কিন্তু আরও ওপরে যাকে আমরা একটু আগে মহাকাশ বলেছি,—সেখানে সবই নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা। কাজেই আকাশের ওই নীল রংটা যেন আমাদের চোখের ধাঁধা।

আজ আমরা সকলেই জানি, সূর্য মোটেই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না, বরঞ্চ একরকম স্থির হয়েই আছে। পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহরাই তাদের উপগ্রহ সমেত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এও জানি যে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে গ্যালিলিয়ো নামে এক ইটালিয়ান বিজ্ঞানী নিজের আবিষ্কৃত দূরবিন দিয়ে দেখে সঠিক প্রমাণ দিয়ে এ সত্য প্রচার করেন। অবশ্য এ জন্য তাঁকে গিরজার পাদরিদের রোষানলে পড়তে হয় এবং কম লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয় না। কিন্তু গ্যালিলিয়োর প্রায় হাজার খানেক বছর আগে আমাদের দেশের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্টই যে এ কথা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন সে কথা ওদের দেশের লোকেরা তো নয়ই, এদেশেরও অনেকে হয়তো জানে না।

আবার, আর একটা ভুলও সাধারণ মানুষের কেউ-কেউ করে থাকেন। তাঁরা ভাবেন আকাশের ওই সমস্ত জ্যোতিষ্ক পদার্থগুলি যেন সূর্যকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু গোটা মহাকাশে সূর্যও একটা ছোটো বিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়। আর ওর দূরত্বও পৃথিবী থেকে এমন কিছু নয়। আলোর গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ২,২৯,৪৬০ কিলোমিটার। ওই বেগে সূর্য থেকে বেরিয়ে সে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে লাগে মাত্র ৮ মিনিট। মহাকাশে এমন অনেক জ্যোতিষ্ক পদার্থ দেখা গেছে যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে কোটি কোটি বছরও লেগে যায়। এ পর্যন্ত মহাকাশের সবচেয়ে দূরবর্তী যে জিনিসটি মানুষের চোখে পড়েছে সেটি একটি নীহারিকা—জ্বলন্ত গ্যাসের অতিকায় একটি পিণ্ড। সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে লাগে প্রায় ৫০০,০০,০০,০০০ বছর। কিন্তু ওখানেই যে মহাকাশের শেষ নয় সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সন্দেহমাত্র নেই। ওর পেছনে কতদূর পর্যন্ত তা ছড়িয়ে আছে আজও তার সন্ধান মেলেনি, অনুমান করাও যায়নি। কাজেই এক কথায় আমরা শুধু বলতে পারি ব্রহ্মাণ্ড কী প্রকাণ্ড!

এইবার আমরা স্বর্গের সন্ধানে যাব। স্বর্গের বর্ণনায় পৃথিবীর সব মানুষ পঞ্চমুখ। গল্পে কাব্যে কাহিনীতে স্বর্গের কত কথা কত বর্ণনা! প্রাচীনেরা কী অপরূপ ভঙ্গিতে স্বর্গের মহিমা কীর্তন করেছেন! তাঁদের মনের কল্পনা যেন ডানা মেলে উড়েছে আকাশে—আবিষ্কার করতে চেয়েছে মানুষের সর্বোচ্চ সুখের স্থান। সর্বশ্রেষ্ঠ পরিতৃপ্তি, আনন্দ ও শান্তির রাজ্য।

স্বর্গ কী? স্বর্গ কীসের মতো? স্বর্গ কোথায়? এই প্রশ্ন হাজার হাজার বছর ধরে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের কণ্ঠে। জিজ্ঞাসু মানুষ উত্তরও পেয়েছে—অনেক রকম উত্তর।

স্বর্গ সম্বন্ধে মানুষের কল্পনা তিন রকম। প্রথম হচ্ছে, স্বর্গ দেবতার বাসস্থান। দ্বিতীয় হচ্ছে, স্বর্গ হচ্ছে সেই বিচিত্র দেশ যেখানে মৃত লোকের আত্মাই যেতে পারে। তৃতীয় হচ্ছে, স্বর্গ সেই পরম সুখের স্থান যেখানে শুধু পুণ্যবানেরা গিয়ে বসবাস করতে পারে।

কিন্তু পুরাযুগে অনেক মানুষের ধারণা ছিল যে স্বর্গ পৃথিবীরই কোনো জায়গায় অবস্থিত। তাই সেই অনন্ত সুখের দেশের সন্ধানে ছুটেছে মানুষ, এমন অনেক কাহিনী আছে।

আইসল্যান্ডের এক কাহিনীতে আছে, এক রাজপুত্র তার একটি মাত্র বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযান করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুহীন দেশের সন্ধান করা। অনেক খুঁজতে খুঁজতে তারা হাজির হল কনস্টান্টিনোপলে। সেখানে তারা সম্রাটকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি জানেন কোথায় আছে স্বর্গরাজ্য?' সম্রাট বললেন, 'হ্যাঁ, স্বর্গ পৃথিবীর কোনো স্থানে আছে শুনেছি। তবে সেটা এখান থেকে অনেক দূর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি হতে পারে, কিংবা আরও কিছুটা পূর্বদিকে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে চলল রাজপুত্র। বহু পথ অতিক্রম করে সে আর তার সঙ্গী এসে পড়ল গভীর অরণ্যে। সেই অরণ্যের ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশাখায় এমন অন্ধকার যে দিবাভাগেও আকাশে তারা দেখা যায়! সেখান থেকে এক সংকীর্ণ পথে বেরিয়ে তারা এসে পড়ল এক পাথরের সেতুর কাছে। সেই সেতু পার হওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার—কেননা সেখানে পাহারা দিচ্ছে এক ভয়ংকর ড্রাগন। বন্ধু ভয় পেয়ে বলল, 'চলো ফিরে যাই।' কিন্তু রাজপুত্র স্বর্গের সন্ধান না করে ফিরতে রাজি নয়। সাহসে বুক ফুলিয়ে রাজপুত্র এগিয়ে চলল তরবারি উঁচিয়ে।

সেইভাবে চলতে চলতে তারা সোজা ঢুকে গেল বিরাট হাঁ-করা-মুখ সেই ড্রাগনের পেটের মধ্যে। কিন্তু কী আশ্চর্য! পরমুহূর্তেই তারা দেখল, অন্ধকার কেটে গেছে এবং তারা যেখানে এসে পড়েছে সে স্থানটি মনোরম এবং

তার নামই স্বর্গ। তারপর সেখানে প্রাণ ভরে নানা সুখ ভোগ করে অবশেষে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্নে এলেন দেবদূত। তিনি বললেন, 'দেশে ফিরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব আমি, আর আমিই আবার তোমাদের নিয়ে আসব এখানে। ঠিক দশটি বছর পরে।'

কথিত আছে রাজপুত্র ও তার বন্ধু যথাকালে ফিরে এসেছিল তাদের দেশে।

স্বর্গের বর্ণনা মানুষের কাছে লোভনীয়। পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বজাতির মানুষই কল্পনা করেছে স্বর্গ এক পরম সুন্দব দেশ—স্বর্গ এক পরম সুখের স্থান। হিন্দু কল্পনা করল, স্বর্গ এক রাজ্য। সেখানকার রাজা ইন্দ্র। ইন্দ্রের আছে নন্দনকানন। এই কাননপ্রদেশ সুন্দর নদনদী বিধৌত, প্রভাময় পুষ্পপরিপূর্ণ। পাঁচটি দিব্যবৃক্ষের মধ্যে আছে পারিজাত! এই অলৌকিক বৃক্ষের কুসুম সারা বৎসর অম্লান থাকে, আর এর দিব্যসৌরভে অপার্থিব আনন্দ ক্ষরিত হয়। যত রকমের ভোগ্যবস্তু থাকতে পারে সবই আছে স্বর্গের নন্দন কাননে। সেখানে আছে দিব্যকান্তি অপ্সরাদের সেবা। দেবযানে যথাইচ্ছা ভ্রমণ ইত্যাদি সর্বসুখের পুঞ্জীভূত ব্যবস্থা। মানুষ বিশ্বাস করেছে স্বর্গ উপরে, ঊর্ধ্বলোকে। আকাশে হাত তুলে মানুষ দেখায় স্বর্গের ঠিকানা। স্বর্গ কি আকাশে? না আকাশের পরপারে?

গ্রিকরা বললেন, এ যে মেঘলোক ভেদ করে স্তরে স্তরে ঊর্ধ্বে উঠেছে অলিম্পাস পর্বত। ওই ওইখানেই ঈশ্বর জিউসের প্রাসাদ। ওইখানেই থাকেন দেবতারা। ওখানকার বাতাস শান্ত—প্রবেশপথে আছে মেঘের তোরণ। ওখানে গেলেই কানে আসবে জিউসদেব অমৃত-মধুর সংগীত। তারা দিব্যগন্ধী সুধাপান করেন সে সুধা মাঠে ফোটা দিব্যফুলের মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

কিন্তু সকলে কি যেতে পারে ওখানে? না। মৃত্যুর পর শুধু পুণ্যবানেরাই যেতে পারে ওই স্বর্গে। ওখানে চন্দ্র আছে, সূর্য আছে, কিন্তু ঝড়ের সাধ্য নেই ওখানকার চন্দ্র বা সূর্যকে মেঘে ঢেকে দেয়। কোনো বিবাদ কলহ বা যুদ্ধ ম্লান করতে পারে না ওখানকার গানমুখর জীবনকে, যেমন অফুরন্ত আনন্দ তেমনি অফুরান ফুলের রাজত্ব সেথা।

স্বর্গে যাবার অনেক পথ, মানুষ বিশ্বাস করেছে, বাতাসে চড়ে যাওয়া যায় সেথায়। ধোঁয়ার ওপর চড়ে স্বর্গের উর্ধ্বলোকে ওঠাও অসম্ভব নয়। দিগন্তজোড়া—ওই যে রামধনু, যা স্বর্গ ও মর্তের সেতু হয়ে রয়েছে তার ওপর দিয়েও হয়তো যাওয়া যায়।

চীন দেশের এক রাজার গল্প আছে। সে নাকি নানা লোকের মুখে স্বর্গের ব্যাখ্যা শুনে শুনে সংকল্প করল তাকে যেতেই হবে স্বর্গে। যাত্রা শুরু হল—তারপর বহুদূর ভ্রমণের পর একস্থানে সে এসে দেখল সম্মুখে এক বিরাট মসৃণ স্তম্ভ। এই স্তম্ভ বেয়ে উঠতে হবে তাকে, তবেই তার ঈপ্সিত স্বর্গের দর্শন পাবে সে। কিন্তু সেই পিছল স্তম্ভ বেয়ে ওঠা অতি দুঃসাধ্য। তাই সে ধরল অন্য পথ। এ পথও এক দুর্গম পথ। এক দুরারোহ পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা পথ। উৎসাহী রাজা কিছুদূর উঠেই ক্লান্তিতে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু ঠিক তখনই কতকগুলি পরি এসে তাকে এক রমণীয় উদ্যানে নিয়ে যায়। সেখানে আছে এক অপার্থিব বৃক্ষ এবং আছে এক অমৃতের ফোয়ারা। সেই ফোয়ারা থেকে বয়ে চলেছে চারটি নদী পৃথিবীর চার প্রান্তের দিকে।

স্বর্গে যাবার আছে অনেক পথ, তবে সবই কষ্টের পথ। সবই দুর্গম পথ। কিন্তু দুর্গম পথের শেষেই তো মিলবে পুরস্কার।

জাপানে প্রাচীন কাহিনীতে আছে—এক চির যৌবনের দ্বীপের কথা। সে দ্বীপে আছে দিগন্তরালের পারে ছায়া ঢাকা আশ্চর্য এক অচিন দেশ। কোনো কোনো ভাগ্যবান নাকি দেখেছে দূরে বহুদূরে সমুদ্রতরঙ্গ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি গাছ। কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগান্ত ধরে। দাঁড়িয়ে আছে ফুনান পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে। ফুনান—সেই অজরা অমরার পর্বত। স্বর্গদ্বীপের নিশানা। ওখানে কারও জরা নেই, কারও মৃত্যু নেই। ওখানে অনন্ত বসন্ত, মধু বাতাস, অম্লান কুসুম। মেঘমুক্ত আকাশ। বাতাসে যে সংগীত সে বিহগ কলকাকলির, সে সংগীতে ঝড়ে পড়ে আনন্দ আর প্রেম। সেখানে অপার্থিব পাদপের শাখায় যে শিশিরবিন্দু দোলে তার মধ্যে নিত্যকালের আনন্দ। ব্যথা বেদনা শোক দুঃখ সেখানে অপরিচিত। সেখানকার দেবকুলের লোকেরা সারাদিন পূর্ণ থাকে হাসিতে গানেতে সংগীতে। সেখানে কেউ বৃদ্ধ হয় না। যৌবন সেথায় চিরস্থায়ী। সময় সেখানে স্তব্ধ গতিহীন।

কী সুন্দর কল্পনা!

ইহুদি ধর্মে যে ইডেন উদ্যানের কথা আছে, অনেকের বিশ্বাস ছিল সেই ইডেন পৃথিবীর কোনো না কোনো জায়গায় আছে। একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলেছেন—

"আমি স্বর্গের কথা ঠিক বলতে পারব না। কেননা আমি সেখানে যাইনি। যাবার যোগ্যও নই আমি। কিন্তু আমি বলছি সেই জ্ঞানীদের কথা যাঁরা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে যে, ইডেন উদ্যান পৃথিবীর কোনো সর্বোচ্চ স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে স্থান এত উচ্চে যে সেখান থেকে চাঁদে হাত দেওয়া যায়। এই স্বর্গ চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই প্রাচীরে এত ঘন শ্যাওলা যে মনে হয় সবুজ পাথরে তৈরি। এই প্রাচীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে—এবং প্রবেশের মাত্র আছে একটি পথ। অপরদিক জ্বলন্ত অগ্নিবেষ্টিত। কোনো জীব সেথায় প্রবেশ করতে সাহস করবে না। এই স্বর্গের ঠিক মধ্যস্থলে একটি বিরাট কূপ আছে, সেখান থেকে চারটি নদী চারিদিকে ছুটে গেছে—গঙ্গানদী, নীলনদী, টাইগ্রিস আর চতুর্থ হল ইউফ্রেটিস।"

একটি পুরাকাহিনী বলে, মহাবীর আলেকজান্ডার বিশ্বাস করতেন যে আকাশলোকে স্বর্গ নেই। পৃথিবীতেই কোনো স্থানে স্বর্গ আছে। প্রাচ্যদেশে তিনি যে সামরিক অভিযান করেছিলেন তার কারণ হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—তিনি পার্থিব স্বর্গ আবিষ্কার করবেন। শুধু আবিষ্কার নয়, স্বর্গকে তিনি বাহুবলে জয় করবেন এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করবেন যাই হোক, এই অভিযানের সময় নিকটবর্তী এক স্থানে তাঁর সৈন্যেরা অরণ্যমধ্যে এক পক্ককেশ বৃদ্ধকে দেখে অনুমান করে যে, সে স্বর্গের সন্ধান জানে। কিন্তু সে কিছুতেই যখন প্রকাশ করল না তখন তারা ওকে বন্দি করল। বৃদ্ধ তখন অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, "যাও, তোমাদের রাজা আলেকজান্ডারকে বল যে বৃথা তার স্বর্গলাভের চেষ্টা। সে কোনোদিনই স্বর্গে প্রবেশ করার অধিকার পাবে না। স্বর্গের পথ বিনয়ের পথ। যার মধ্যে বিনয় আছে, সেই একমাত্র স্বর্গে প্রবেশ করবে। নাও, এই প্রস্তরখণ্ডটা তাকে দিয়ো। আর এই কথা বল, তুমি নিজেকে যে দিগ্বিজয়ী মনে করে গর্ব কর তোমার উপযুক্ত শিক্ষা এই প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেই আছে।"

এই বলে সেই বৃদ্ধ একটি ভারি পাথরের টুকরো সৈন্যদের হাতে দিল। সৈন্যরা বুঝতে পারেনি ওই পাথরের রহস্য। হয়তো আলেকজান্ডার বুঝেছিলেন, সেই বৃদ্ধ সাধুর রহস্যময় কথার প্রকৃত মর্ম কী। ওই কথার অর্থ হচ্ছে যে, পাথরটি এমনি খুব শক্ত, ভারি, সুন্দর এবং মূল্যবান, কিন্তু ওটি গুঁড়িয়ে যখন ধুলো হয়ে যাবে যে ধুলোর মতো হাওয়ায় উড়ে যাবে। আলেকজান্ডার যতক্ষণ জীবিত ততক্ষণ তিনি দিগ্বিজয়ী শ্রেষ্ঠ সম্রাট, কিন্তু মৃত্যুর পর থাকবে না তার লেশমাত্র শক্তি।

এইভাবেই নাকি আলেকজান্ডারের স্বর্গ আবিষ্কারের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি আর স্বর্গের সন্ধানে যাত্রা করেননি।

প্রত্যেক জাতিরই স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা আছে। এবার আমরা মিশরীয়দের স্বর্গ দেখে আসি।

ওই দেখ অজস্র ফলভারে স্বর্গীয় ডুমুরগাছগুলি অবনত হয়ে পড়েছে। ওই গাছের শাখায় শাখায় মধুকণ্ঠ বিহগকুলের কলকাকলি, আহা, পাখিগুলি কী সুন্দর! গাঢ় নীলবর্ণ ওদের দেহ। কোনো মিশরীয়দের সাধ্য নেই এই অপূর্ব স্বর্গের আকর্ষণ তুচ্ছ করে। এখানে মৃত্যু নেই। ওই যে সুবর্ণ পানপাত্র হাতে নিয়ে আসছেন এক দেবী। ওই পাত্রে আছে জীবনবারি, যা পান করলে আর কোনোদিন কারও মৃত্যু হবে না।

এইবার আর একটি স্বর্গের কথা বলছি। নস্যাম্যানদের স্বর্গ। ইউরোপের প্রাচীন নস্যাম্যানদের ধারণা ছিল, স্বর্গ শুধু বীরপুরুষদের জন্য। ভাইকিং যোদ্ধারা মৃত্যুর পর বালহাল্লার অপূর্ব প্রাসাদে প্রবেশ করছে। এই প্রাসাদের ছাদ তৈরি সোনার ঢাল দিয়ে আর দেয়াল তৈরি চকচকে ধারালো বর্শা দিয়ে। প্রাসাদে প্রশস্ত দালান। সেখানে আছে বিরাট খাবার টেবিল। সেই টেবিলের চারিদিকে বসেছে বীরশ্রেষ্ঠগণ, তাদের গায়ে বর্ম, হাতে যুদ্ধাস্ত্র। গৌরাঙ্গী বল্‌কিরি সুন্দরীরা খাবার টেবিলে সুস্বাদু শূকরমাংস পরিবেশণ করছে। চতুর্দিক খাদ্যের সৌরভে আমোদিত। বিপুল উল্লাসে চলছে প্রচুর পান ভোজন।

খাওয়া শেষ হলেই বীরগণ যুদ্ধে প্রমত্ত হয়ে ওঠে। সে এক নৃশংস যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কত নিহত হয়, কত আহত হয়। কিন্তু আশ্চর্য! সত্যই কেউ মরে না। আহতদের ক্ষত থাকে না। মজা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত বেঁচে ওঠে এবং আহতরাও সুস্থ হযে যায়। তারপর, আবার চলে পান ভোজনের উদ্দাম উৎসব। এইভাবে দুটিই চলতে থাকে অনন্তকাল ধরে।

এইবার প্রাচীন চীনাদের স্বর্গের একটু আভাস দেওয়া যাক।

অভ্রভেদী খুনলুন পর্বতের দুরারোহ চূড়ায় দেদীপ্যমান স্বর্গলোক। সেখানে স্বর্গপ্রাসাদে দেবগণের বাস। মণিরত্নে পরিপূর্ণ এক হ্রদ, তার তীরে এই প্রাসাদ হ্রদের পাশেই আছে ফলপূর্ণ পীচ গাছের বাগিচা। ওই পীচ ফলের স্বাদ অমৃতের মতো। ওই পীচ ফল ভোজন করলে মানুষ অমর হয়ে যায়।

দেবীর বাহন ময়ূরের মতো একটি পাখি ফ্যাঙ্‌ বা ফেনিক্স। পৃথিবীতে কেউ এই পাখি দেখতে পায় না। আমাদের সরস্বতীর সঙ্গে যেমন হংস থাকে, ফেনিক্সও তেমনি দেবীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দেবীর পুত্র-কন্যাগণও এই স্বর্গে থাকেন। প্রতি তিন হাজার বৎসর অন্তর দিব্য পীচ ফল ও অন্যান্য স্বর্গীয় খাদ্য আহার করার জন্য দেবতারা এই স্বর্গে নিমন্ত্রিত হন। ওই মনোরম স্বর্গপ্রদেশ শান্তিপূর্ণ কিন্তু মাঝে-মাঝে কড় কড় ভয়ংকর শব্দে আকাশ ভেদ করে ছুটে আসে বজ্র। ছুটে যায় ঝঞ্ঝাবাত। নিক্ষিপ্ত হয় অগ্নিবর্ষণ।

কেন? তাকিয়ে দেখ। ওই যে বজ্রবিদ্যুতের লক্ লক্ শিখা, ওই তো দেবতাদের হাতের তরবারি, প্রজ্বলন্ত তরবারি। দেবতাগণ কি পরস্পর রণোন্মত্ত হয়ে উঠলেন? না, তাঁরা কুপিত হয়েছেন হয়তো বা নীচের মানুষের কৃত কোনো দুষ্কার্যের জন্য। তাই নেমে আসছে তাঁদের অভিশাপ অগ্নিরোষের বজ্র।

বাইবেলে আছে ব্যাবেলর টাওয়ারের কথা। মানুষের স্বর্গে যাবার একটি চেষ্টা ও তার ব্যর্থ কাহিনী। কাহিনীটি এই, পৃথিবীর যত লোক তখন বাস করে সিনার ভূমিতে। সারা পৃথিবীতে সব মানুষ তখন এক ভাষাতে কথা বলে। তাদের আকাঙ্ক্ষা হল স্বর্গে যাবার।

তারা স্থির করল সিনারে একটি নগর নির্মাণ করবে আর পাকা ইট দিয়ে গেঁথে গেঁথে একটি উঁচু মিনার তৈরি করবে। এই মিনারটি হবে এত উঁচু যে তার ওপর চড়ে স্বর্গে আরোহণ করা যাবে। কাজ আরম্ভ হল, মিনার গাঁথা চলছে—এমন সময় ঈশ্বর জানতে পারলেন ওদের অভিপ্রায়। তিনি চান না মানুষ স্বর্গে আসুক। তিনি এক বিচিত্র উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি ওদের একটি ভাষাকে ভেঙে বহু ভাষা করে দিলেন। তার ফলে কেউ কারও কথা বুঝতে পারল না। বিভ্রাট সৃষ্টি হল এবং তার ফলে টাওয়ার তৈরির কাজও বন্ধ হল। মানুষের ভাগ্যে স্বর্গে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল।

স্বর্গ চিরসুখের স্থান, তাই স্বর্গে প্রবেশ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কত তপস্যা দরকার কত সাধনা দরকার।

তাই বা কেন? পরের যুগে মানুষ আবিষ্কার করল আরও সহজ পথ, কেউ কেউ বললে, পবিত্র ওই নদীর জলে ডুব দাও, তাহলেই স্বর্গে যেতে পারবে। পবিত্র একটি পীচফল আহার করলেই তো হয়ে গেল! কোনো শুভদিনে উপবাস কর বা কোনো বিধিনিষেধ মেনে চল, তাহলেই হবে। এমনই অনেক ছোটোখাটো কাজের মধ্যেই তো রয়েছে স্বর্গে যাবার অধিকার। কিছু নয়, শুধু মনটি পবিত্র কর আর খুব ভালো একটি সৎকাজ কর, তাহলেই যেতে পারবে স্বর্গে।

হিন্দুদের ধারণাও প্রায় এই রকম। হিন্দু বলে, শুধু পুণ্যবানরাই স্বর্গে প্রবেশ করার অধিকারী।
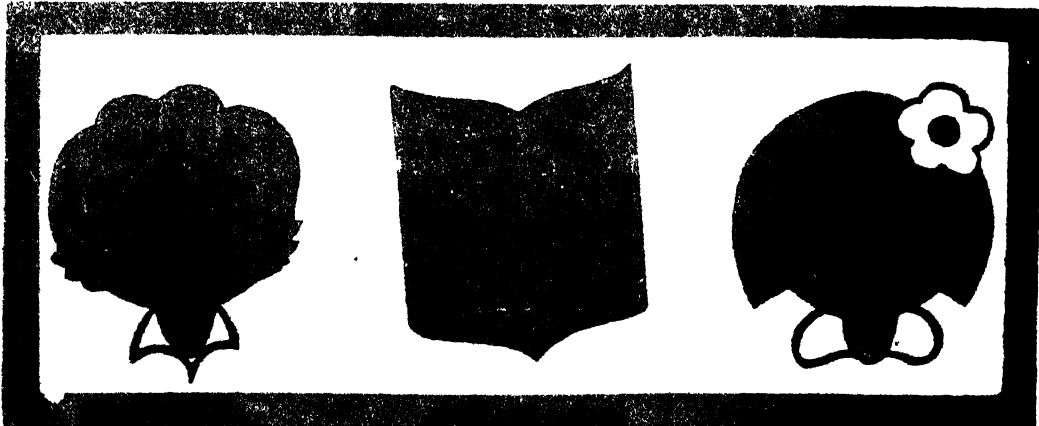
পাখের কলম

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

মহাকবি মাইকেলের জীবনকাহিনী নিয়ে তৈরি একখানি ছায়াচিত্র দেখছি, হঠাৎ পাশের একজন দর্শক বলে উঠলেন, মাইকেল অত বড়ো একটা শৌখিন লোক, তিনি ছিলেন অমন দুর্দান্ত সাহেব, তিনি কিনা হাঁসের পেন-এ লিখছেন.....কেন, একটা ফাউন্টেন পেন জোটেনি তাঁর? দর্শকটির বয়স কম, বাল্য থেকেই তিনি ফাউন্টেন পেনের ব্যবহার দেখছেন ঘরে-বাইরে সব জায়গায়, তাই তাঁর ধারণা হয়েছে, বুঝি ওই কলম চিরদিনই ছিল, যেমন আজও আছে। বলা দরকার যে, তা নয়। ফাউন্টেন পেনের বয়স ওই দর্শকটির বয়সেরই সমান হবে বড়ো জোর—তার আগে ছিল নিবের কলম, যার বয়স হবে হয়তো ষাট-সত্তর বছর। আরও আগে হাঁসের পেন বা পাখের কলমই ছিল লেখার একমাত্র উপায়। শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপেও তাই ছিল। ইংরেজি ভাষায় কলমের বদলে 'কুইল' কথাটা এখনও কেউ কেউ ব্যবহার করেন—এই কুইল আর কিছুই নয়, হাঁসের পালক। এতেই শেক্সপিয়ার, মিল্টন, গ্যেটে, ভলতেয়ার, শেলি, বাইরন, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত লেখকরা তাঁদের চিরস্মরণীয় বইগুলি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও অল্পবয়সে এতেই লিখেছেন। আমরা ছোটোবেলায় এতেই হাতের লেখা তৈরি করেছি।

কিন্তু হাঁসের পেন বা পাখের কলমই জগতের প্রাচীনতম কলম নয়, তা মনে রেখ। এখন থেকে অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে মানুষ সভ্য হয়েছে এবং তখনই তারা মনের কথা হাতের লেখায় প্রকাশ করতে শুরু করেছে এ তো জানই। সেই গোড়ার দিকের লেখা কী রকম ছিল জান? কাঁচা মাটির চৌকো বানিয়ে তাতে কাঠি বা শিক দিয়ে অক্ষর খোদাই করা হত, তারপর সেগুলো পুড়িয়ে পাকা করে নেওয়া হত। ক্যালডিয়া-ব্যাবিলন প্রভৃতি স্থান থেকে পৃথিবীর যে প্রাচীনতম লেখার নমুনা পাওয়া গেছে সবই এই। এর পর মিশরে প্যাপিরাস গাছ থেকে তৈরি আরম্ভ হয় এক রকম পাতলা তবক....লোহার

কাঁটা দিয়ে তার গায়ে কেটে কেটে অক্ষর আঁকা হত। তারপর তার ওপর ভুষো কালি মাখিয়ে তবকগুলো জলে ধুয়ে নেওয়া হত—তাতে কালিগুলো ওই কাটা অক্ষরের খাঁজে খাঁজে বসে যেত, আর তবকের বাকি অংশগুলো যেত পরিষ্কার হয়ে। এই হল লেখার ইতিহাসে দ্বিতীয় ধাপ। লক্ষ করে দেখ, মিশরীয়দের ওই প্যাপিরাস কথা থেকেই ইংরেজি 'পেপার' বা কাগজ কথাটা এসেছে।

ক্যালডিয়া ব্যাবিলনের লেখা ছিল এখনকার শর্টহ্যান্ডের মতো কতকগুলো চিহ্নের সমষ্টি—সেই চিহ্নগুলো ব্যবহার হত এক-একটি শব্দের পরিবর্তে। মিশরীয়রা আরম্ভ করেন ছবি লেখা। এক-একটা ছবির আকারে তাঁরা ব্যক্ত করতেন এক-একটা বস্তু বা ভাবকে। তারপর ফিনিসিয়ানরা আবিষ্কার করেন বর্ণমালা বা অক্ষর এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মত এই যে তাঁদের কাছ থেকেই নাকি সভ্যজগৎ অক্ষরের ব্যবহার শিক্ষা করেছে। তাঁরা ছিলেন বিখ্যাত বণিক জাতি—বাণিজ্যের জন্যে নৌকা ভাসিয়ে দেশে দেশে যেতেন। কাজেই অসম্ভব নয় সেটা। মোটকথা এ সবাই জানে যে চীনে-জাপানে আজও তুলির সাহায্যে ছবি-লেখা চলে, যা অনেকটা মিশরীয় লেখার মতো, আর ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অক্ষরের সাহায্যে লেখা শুরু হয়েছে, যার প্রমাণ মহেঞ্জোদাড়োর লিপিগুলো। এই বর্ণমালা আজও পড়া যায়নি তাই এ লিপির জাতি-পরিচয়ও এখনও বের হয়নি। যেদিন হবে, সেদিন এটাও প্রমাণ হতে পারে হয়তো যে ভারতবর্ষই জগৎকে লেখা শিখিয়েছে।

কিন্তু সে যাই হোক, লেখার কথা থেকে কলমের কথায় আসি। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ভূর্জপত্রে লেখা হত—তখন লেখাকে বলা হত চিত্র করা। কাজেই এদেশেও হয়তো আগে ছবি লেখারই চলন ছিল এবং তুলির সাহায্যেই সে কাজ চলত। হয়তো তারপর অক্ষর এসেছে এবং লেখা ও লেখনী দুই-ই বদলেছে। আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্র যা পাওয়া গেছে, সবই তালপাতে লেখা। জল খাইয়ে খাইয়ে পাকানো তালপাতে লোহার কাঁটা দিয়ে কেটে কেটে অক্ষর দাগিয়ে। সেই খাঁজে খাঁজে কালি জমিয়ে। মিশরিদের প্যাপিরাসের মতো করেই তৈরি হত এই সব পুঁথি। ইউরোপেও চামড়া পিটিয়ে তৈরি করা পাতলা পাতলা পার্চমেন্টে ঠিক এইভাবেই লেখা হত কাঁটা দিয়ে, তারপর তাতে কালি খাইয়ে দেওয়া হত। এরপর কাগজ আবিষ্কার হল। সেটা হল চীনাদেশে এবং সেখান থেকে সারা জগতেই ছড়িয়ে পড়ল তা। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে ছেঁড়া কাপড় ও তুলোয় কাগজ তৈরি হত—তার নাম ছিল তুলোট। চীনাদের মতো যারা ছবি লেখায় অভ্যস্ত তারা তুলিতে এবং আমাদের মতো যারা অক্ষর সাজিয়ে লেখে তারা কলমে লেখা আবিষ্কার করল এই সময় থেকেই। শর, কঞ্চি, কাঠি, অনেক কিছু দিয়েই প্রথম আমলের কলম তৈরি হয়েছে—তারপর এসেছে হাঁসের, ময়ূরের ও শঙ্খচিলের পালক ব্যবহার। এ কত কালের কথা কে জানে! তবে কাগজ, কলম, দোয়াত এ তিনটি কথাই যে আরবদের দেওয়া, এটা নজর করো। গ্রিকদের 'ক্যালামস' কথাটি আরবরা নিয়েছিলেন কলম রূপে, তাই চলে এসেছে ভারতবর্ষে।

পাখের কলম বা হাঁসের পেনের সঙ্গে তোমাদের আজ হয়তো কোনো পরিচয়ই নেই—এমনকী নিবের কলমেও লেখো হয়তো তোমরা অল্প দু-চারজনই। কিন্তু আমাদের ছোটোবেলায় পাখের কলমই ছিল একমাত্র সম্বল, তাই দিয়েই গোটা গোটা করে আমরা লিখতাম হলদে রঙের মোটা কাগজে। শঙ্খচিলের গেরুয়া পালক বা ময়ূরের ঝিলমিলে পালক নিশ্চয় বেশি সুন্দর, তবু মা সরস্বতীর বাহন হাঁস—সেই হাঁসের পেন। তাই সে কলম ছিল আমাদের কাছে বেশি পবিত্র। লেখা শেষ করে কলমটা তাই রোজই মাথায় ছুঁইয়ে, রেখে দিতাম দপ্তরে বেঁধে ওপর-ক্লাসে ওঠার আগে নিবের কলমে লেখার অনুমতিই ছিল না আমাদের—তাতে নাকি হাতের লেখা মাটি হয়! রং-বেরঙের স্টিল পেনগুলো দেখে তখন কী লোভই না হত! মনে হত, কেন তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে উঠছি না এবং এই কলমে লেখার সুযোগ পাচ্ছি না? নিজের অজান্তেই বড়ো হতে হতে কখন অনেক বড়ো হয়ে গেছি এবং স্টিল পেনের যুগ শেষ হয়ে, এসে গেছে ফাউন্টেন পেনের যুগ। আজ হঠাৎ মনে পড়ছে সেই হাঁসের পেন বা পাখের কলমের কথা, আর সেই কষ কালির কথা, যা দিয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যা ওঁদের আমল থেকে আমাদের আমল পর্যন্ত একটানা চলিত ছিল, যার সঙ্গে জড়িত ছিল মানুষের অনেক কালের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি। সত্যিই সুন্দর ছিল জিনিসটা, তাই না?

আজ আমি তোমাদের কাছে আমাদের ছোটোবেলার দু-একটি গল্প বলব। সব গল্প নয়, কেবলমাত্র শিশুসাহিত্য পাঠের আনন্দের সঙ্গে যে সব গল্পের কিছু সম্পর্ক আছে সে রকম দু-একটি স্মৃতিকথা। বাল্যকাল বড়ো আনন্দের কাল, স্বর্গীয় সুখভোগের কাল। আজ শত চেষ্টা করলেও সেই কালে আর ফিরে যাবার উপায় নেই। ওই কালের জন্য সকাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলা যায় কিন্তু হারানো দিন পুনরুদ্ধারের আর আশা নেই। তবে যে অনাবিল আনন্দের মধ্যে আমরা তখন সতত বাস করতুম তার কিছু আভাস তোমাদের দেওয়া যায় বাল্যের এই স্মৃতি-চারণার মধ্য দিয়ে। তোমাদের সঙ্গে শৈশবের আনন্দের অনুভব ভাগ করে পুনরায় ভোগ করতে চাই। বাল্যে ফিরে যাওয়ার এ ভিন্ন তো আর পথ দেখিনে।

সাহিত্যপাঠের আনন্দ যে কত গভীর ও প্রাণ-মাতানো হতে পারে ছোটোবেলার কথা স্মরণ করলে তার একটা আন্দাজ পেতে পারি। আজ বড়ো হয়ে কত রকমের কত বই পড়ছি, সাময়িক পত্রপত্রিকায় নানা ধরনের লেখার সঙ্গে নিত্য পরিচয় হচ্ছে। তার মধ্যে উপন্যাস গল্প নাটক কবিতা প্রবন্ধ রম্যরচনা ভ্রমণকাহিনী ইতিহাস অর্থনীতি কত কী আছে। কিন্তু বাল্যের পাঠসুখের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি, ছোটোবেলায় যে কোনো ধরনের একটা লেখা পড়ে যে ঐকান্তিক আনন্দ পেতাম আজ তার সিকির-সিকি আনন্দও পাইনে কোনো কিছু পড়ে। অপরের কথা বলতে পারব না, আমার নিজের অভিজ্ঞতাটাই এ ক্ষেত্রে আমার সাক্ষ্যস্বরূপ। তার থেকে কখনও কখনও এমন পর্যন্ত আমার মনে হয়, বাল্যে নানান ধরনের শিশুসাহিত্যের বই পড়ে আমি যে নিবিড়-গভীর সুখ পেয়েছি, সেই সুখের অনুভূতি আবার ফিরে পাওয়ার জন্য আমি আমার সর্বস্ব পণ করতে রাজি আছি। আমার পরিণত জীবনের সব কিছু প্রাপ্তি ও সিদ্ধির বিনিময়েও যদি আমার বাল্যের পাঠসুখের কণামাত্র পুনরুদ্ধার করতে পারতুম তো তাতেও আমি পেছপা হতুম না। কিন্তু হায় যতই আক্ষেপ করি না কেন, সেই সুখের দিন আর ফিরে আসবে না।

ইংলন্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড একবার একটা ঘোড়ার জন্য তাঁর গোটা রাজ্য বন্ধক রাখতে

চেয়েছিলেন। আমাদের তো রাজ্য নিয়ে কারবার নয়, ঘোড়াও আমাদের প্রয়োজনের তালিকার মধ্যে পড়ে না। আমরা সাহিত্য-প্রেমী, সাহিত্য-সেবী—কল্পনা আর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমাদের কাজ। সেই দিক থেকে বিচার করলে বই পড়ার আনন্দের চেয়ে বড়ো পাওনা আমাদের আর কিছু হতে পারে না। পাঠসুখ অর্থাৎ বই পড়তে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের পাঠ্যবস্তুর মধ্যে বুঁদ হয়ে ডুবে যাওয়া—এ একটা পরম আশীর্বাদের মতো। এ যার আছে তার আছে, যার নেই তার নেই। এ যে কত বড়ো জিনিস, এ জিনিস যার ভাগে পড়ে সেই কেবল তার অনন্যতার ধারণা করতে পারে, অন্যের পক্ষে তেমন ধারণা করা কঠিন।

আমাদের সময়ে এই কটি শিশুমাসিকের প্রচলন ছিল—খোকাখুকু, শিশুসাথী. মৌচাক ইত্যাদি। আজ থেকে ৫৭/৫৮ বছর আগেকার কথা বলছি। আজকের মতো সে সময়ে তো এত শিশুসাহিত্য বা শিশু-মাসিকের ছড়াছড়ি ছিল না, আমাদের অল্প নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হত। আমরা থাকতুম কলকাতা থেকে অনেক দূরে—পূর্ববঙ্গের এক ছোটো মফস্বল শহরে। সেখানে ভালো শিশুসাহিত্যের বই বা পত্রপত্রিকা অনেক সময় চাইলেও পাওয়া যেত না। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কপাল ছিল তুলনায় কিছুটা ভালো। আমাদের স্কুলে শিশুসাহিত্যের একটা ভালো লাইব্রেরি ছিল, ওই লাইব্রেরি থেকে বাড়িতে বই এনে পড়ার যেমন সুযোগ ছিল তেমনই প্রতি বছর স্কুলে প্রাইজ পাওয়া আমার বরাদ্দ ছিল। স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যে সব বই প্রাইজ হিসাবে পেতাম সেগুলির উপর তখন-তখুনি হুমড়ি খেয়ে পড়া ছিল স্বভাব। যাকে বলে গোগ্রাসে গেলা, তেমনভাবে বইগুলির পাঠ্যবস্তু গিলে দুদিনে সেগুলিকে ছিবড়ে করে ফেলতুম। অতি-মনোযোগ আর ক্রমাগত পঠনের ফলে নতুন বইয়ের আকর্ষণ দেখতে না দেখতে পুরোনো হয়ে যেত। আনকোরা নয়া কোনো বই হাতে এলে আমাদের নাওয়া-খাওয়ার হিসাব থাকত না। আহার-নিদ্রা ভুলে যাওয়ার জো হত। এমনই ছিল আমাদের বই পড়ার তন্ময়তা।

আমার তখন বয়স দশ-এগারো, বাবা আমাকে 'খোকাখুকু' শিশুপত্রিকাটির গ্রাহক করে দিয়েছিলেন। ডাকযোগে কাগজ আসত। সম্পাদক ছিলেন প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পরে নিশিকান্ত সেন। কলকাতা নারকেলডাঙা মেন রোড থেকে প্রকাশিত হত। আমার এখনও মনে আছে, প্রতি মাসের গোড়ায় পত্রিকাটির নতুন কপি পাবার আশায় বাড়ির দোরগোড়ায় কখনও রাস্তায় এগিয়ে থেকে হা-পিত্যেশে দাঁড়িয়ে থাকতুম কখন ডাকবিলির কর্মী তাঁর ডাকের বোঝা নিয়ে আমাদের রাস্তার মোড়ে উদয় হন তার প্রতীক্ষায়। তাঁর মুখ দেখামাত্র দৌড়ে ছুটে যেতুম তাঁর কাছে নতুন কাগজ এল কিনা তার সন্ধানে। প্রত্যাশিত দিনে কাগজ না এলে মন ভয়ানক মুসড়ে পড়ত, সারা দিনেও সেই হতাশার পীড়ন কাটত না। আর কাগজ এলে সে কী আনন্দ, সে কী উৎসাহের রোমাঞ্চ! পত্রিকাখানা তন্ন তন্ন করে পড়ে, এই মোড়ক থেকে ওই মোড়ক পর্যন্ত বার বার করে পড়েও পড়ার খাঁই মিটত না। পড়তে পড়তে সব লেখা মুখস্থ হয়ে যেত. এমনই ছিল পড়ার আকর্ষণ।

পড়তে পড়তে লেখবারও সাধ গেল। ওই কচি বয়সেই লিখতে আরম্ভ করলুম। ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর প্রসিদ্ধ ছোটোগল্প 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল'এর ভাবানুকরণে 'পরীর দেশ' নামে একটি গল্প তৈরি করে পাঠিয়ে দিলুম 'খোকাখুকু'র পৃষ্ঠায় ছাপাবার আশায়, যা থাকে কপালে। ও মা, দু-মাস বাদে যখন রচনাটি ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে বেরোল, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলুম না। আনন্দে আত্মহারা হবার মতো অবস্থা। এরপর পর পর কয়েকটি কবিতা লিখে পাঠালাম—সেগুলিও ছাপা হয়ে বেরোল। একবার একটা প্রাইজও জুটল। আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত সেই থেকে। কম করেও পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে গেছে তারপর।

বই পড়ার কোনো বাছ-বিচার ছিল না। রূপকথা, উপকথা, বিদেশি গল্পের অনুবাদ, মৌলিক ছড়া, কবিতা, গল্প আর বড়ো গল্পের বই, নানা দেশ-বিদেশের ইতিকথা, জীবনী, বিজ্ঞানকথা, রহস্যরোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, ভ্রমণের বৃত্তান্ত—কিছুই আমাদের পাঠ্যবস্তুর বহির্ভূত ছিল না। যা হাতের কাছে পেতুম তাতেই মশগুল হয়ে যেতুম। ভালো-মন্দের হিসেব-নিকেশ ছিল না। এ সব বিচার এসেছে পরে, যখন বড়ো হয়েছি তখন। কিন্তু ভালো-মন্দ বাছাইয়ের ক্ষমতা যদি একটা লাভ হয়, তবে সেই লাভের পিঠে হারিয়েওছি বড়ো কম নয়। বই-পড়ার আনন্দের মূল্যে যাকে বলে বিচার-পরায়ণতা বা বিবেচনাশক্তি, সেটা ক্রয় করতে হয়েছে। খুব জিতেছি বলে মনে হয় না।
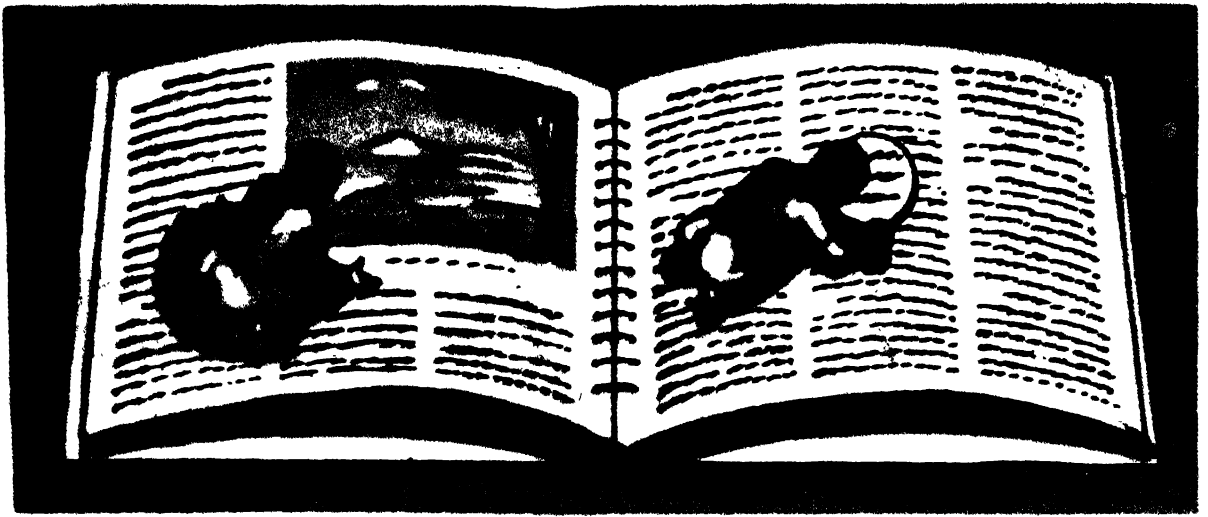
কী ধরনের বই আমাদের হাতে এসে পড়ত আর আমরা সেগুলিও গোগ্রাসে গিলতুম, তার একটা তালিকা তুলে ধরছি। (ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ স্মৃতির সাহায্যে রচিত তালিকা—এর থেকে অনেক ভালো বইয়ের নাম বাদ পড়া অসম্ভব নয়।) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনী, খাজাঞ্চী খাতা, নালক, বুড়ো আংলা; উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, টুনটুনির গল্প ; দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, চারু ও হারু; কুলদারঞ্জন রায়ের পুরাণের গল্প, কথাসরিৎসাগর, বেতালের গল্প; সত্যচরণ চক্রবর্তীর ঠাকুরদাদার ঝোলা, দাদামশায়ের থলে, দগোবার্ট; সীতা দেবী-শান্তা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা, হুক্কা হুয়া; সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল ও হযবরল; হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যখের ধন ও আবার যখের ধন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ময়নামতীর মায়াকানন ও লালকুঠি; রবিনসন ক্রুশো, গালিভার্স ট্র্যাভেলস, আজব দেশে অমলা; হ্যানস অ্যান্ডারসনের গল্প প্রভৃতি বিদেশি শিশুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলির বাংলা অনুবাদ, পণ্ডিত নয়ানচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ভক্তশিশু, সুনির্মল বসুর ফুলঝুরি; শিবরতন মিত্রের সাঁঝের ভোগ ; মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের জাপানী ফানুস ; নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত পার্বণী সংকলন ইত্যাদি ইত্যাদি। এইস্থলে উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের রচনাবলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরও পরে সাধিত হয়। একটা সময়ে কথা ও কাহিনী কাব্যগ্রন্থটি আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়।

পুরোনো সাহিত্য পাঠের স্মৃতিচিত্র তোমাদের সামনে তুলে ধরলুম এ কারণে যে, এ থেকে তোমরা বুঝতে পারবে আমরা ছোটোবেলায় কোন্ ভাবের জগতে বিভোর হয়ে বাস করতুম। মনের মতো শিশুপাঠ্য গল্প-কবিতার বই পেলে আমাদের সময় কোথা দিয়ে কেটে যেত তার হিসেব থাকত না; বই পড়ার সেই যে অপূর্ব রোমাঞ্চ-শিহরন, তার কণামাত্র অনুভূতিও কি আজ বেঁচে আছে? আমি পূর্বেই বলেছি ওই হারানো দিনগুলির অমূল্য স্বাদ ফিরে পাওয়ার জন্য আমি যে-কোনো মূল্য দিতে রাজি আছি। কিন্তু হায়, যে জিনিস একবার হাত-ছাড়া হয়ে চলে যায় তা কী আর কখনও ফিরে আসে?

আমি জানি, অতীতদিনের স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে আমি যে অবস্থার বর্ণনা করলুম, তোমরা এখন সে অবস্থার মধ্যে আছ। মনোমতো শিশুসাহিত্যের বই পড়ে তোমাদের দিনগুলি অনির্বচনীয় আনন্দে কাটছে। কী অমূল্য অনুভূতি তোমাদের সঞ্চয়ে নিত্যদিন জমা হচ্ছে তার হিসেব হয়তো তোমরা নিজেরাই রাখ না। বয়স না বাড়লে এই চেতনা আসে না, আমি যেমন পশ্চাৎচিন্তার সাহায্যে এখন এটা বুঝতে পারছি। কিন্তু যতদিন তোমরা শিশু আছ ততদিন তোমাদের ওইসব সাত-পাঁচ ভেবে লাভ নেই। যে-স্বর্গসুখের মধ্যে তোমরা এখন বিরাজ করছ, সেই সুখ সময় থাকতে চুটিয়ে ভোগ করে নাও যে যতটা পার। শিশুসাহিত্য পাঠের বিমল আনন্দের স্বর্গ থেকে একদিন না একদিন ভ্রষ্ট হতেই হবে। সেই দিনটি যত বিলম্বিত করতে পারা যায় ততই ভালো।

পাহাড়ি

শিল্পী : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবন ঠাকুরের "আলোর ফুলকি" পড়েছ কি? সেই লাল ঝুঁটিওলা ক্যাঁকর কোঁ? আমি সে আলোর ফুলকির কথা বলছি না। আমি বলছি এক আগুনের ফুলকির কথা—যে ফুলকিতে দাবানলের সৃষ্টি হয়—গোটা জঙ্গলকে জঙ্গল পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আর কী হয়?

আর যা হয় তা হল আরও ভয়ংকর। সে আগুনের ফুলকি হচ্ছে মানুষের চিন্তা আর ভাবনা—যা কিনা কাঁপিয়ে দেয় সারা দুনিয়া। পৃথিবীর হয়তো এক কোনায় জ্বলল কারুর চিন্তার এই আগুনের ফুলকি, সেই ফুলকি দেখতে দেখতে দাবানলের আকারে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। এমনি করেই ছড়িয়ে পড়েছে মার্কস্-এঙ্গেলস-এর কমিউনিস্ট চিন্তাধারা সারা পৃথিবীতে। তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন ছোট্ট একখানা বই—কমিউনিস্ট ইস্তাহার। সে কি আজকের কথা? ১৮৪৮ সালে তাঁদের ওই ঘোষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। আর তাতে কেঁপে উঠেছিল তখনকার সারা ইউরোপ। একে একে ইউরোপের বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের ভিত উঠল নড়ে। নানা দেশে ঘটল বিপ্লব। তারপর সেই চিন্তাধারা গিয়ে ধাক্কা দিল রাশিয়ায়।

এশিয়া-ইউরোপ জুড়ে ছিল রাশিয়ার সম্রাট জারের রাজত্ব। আর সে রাজত্বে কল-কারখানায় যাঁরা কাজ করতেন, খেতে-খামারে যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাতেন, ঘরে ঘরে কুটিরশিল্পে যাঁরা দেশের বড়ো বড়ো জমিদার, জোতদার, সম্রাট-পরিবারের ঘরবাড়ি সাজিয়ে দিতেন—তাঁদের জীবন যে কী দুঃখ-কষ্টে কাটত তার কাহিনি বড়ো হয়ে ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে।

এমনি যখন অবস্থা রুশ দেশের, তখন আমাদের দেশের মতো অনেক ঋষি, মহর্ষি রুশ দেশের মেহনতি [illegible] রেখে এই জীবনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে শিখতে বলেন। আবার কেউ কেউ আমাদের দেশের বিপ্লবীদের মতো বোমা-পিস্তল দিয়ে গোপনে অত্যাচারী সম্রাট ও তাঁর কর্মচারীদের হত্যার চেষ্টা করতেন। এমনিভাবে জার-এর (রুশ সম্রাটের উপাধি ছিল জার) ওপর বোমা মারতে গিয়ে উলিয়ানভ পরিবারের এক ভাই ধরা পড়ে ফাঁসিতে প্রাণ দেন।

দাদা এমনভাবে ফাঁসিতে প্রাণ দেওয়ায় ভাই ইলিচ-এব মন বড়ো ব্যাকুল হয়ে উঠল। ইনিই হলেন মহাবিপ্লবী লেনিন—।

ইনি দাদার পথ ভুল বলে নিজে রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকদের মার্ক্স-এঙ্গেলসের পথে সংগঠিত করতে লাগলেন। রাজনীতির দল গড়তে হলে চাই সংবাদপত্র। সংবাদপত্র আবার রাশিয়া থেকে তো ছাপাতে পারবেন না। লেনিন তখন জার-এর পুলিশের কাছে ধরা না দিয়ে বিদেশ থেকে সেই বিপ্লবী কাগজ প্রকাশ করতে লাগলেন।

সে কাগজের নাম কী ছিল জানো—ইস্ক্রা—। রুশভাষায় ইস্ক্রা কথাটির অর্থ হল "আগুনের ফুলকি"। আর ওই আগুনের ফুলকি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল "দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন"-এর রুশ বিপ্লব। তারপর সেই আগুনের ফুলকি দাবালন জ্বালাল সারা ইউরোপে, চীনে, কিউবায়—। আর বাকি দেশগুলিতেও লোকেরা রক্তের লেখায় লিখতে লাগলেন বিপ্লবের ইতিহাস।

ইস্ক্রা থেকে যে দাবানল রাশিয়াতে সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রমিক-কৃষকদের রাষ্ট্র গঠিত হয়। সেখানে জারের আমলের মতো গরিবদের শোষণ করবার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল—কেননা ওই মেহনতি জনতাই তো সে দেশটার শাসনকর্তা হয়েছিলেন কিনা! অমনি হয়েছে আরও সব সমাজতন্ত্রী দেশে।

তবে আমাদের দেশে এখনও মেহনতি মানুষের রাজত্ব সৃষ্টি হয়নি। ভারতবর্ষের গরিব মানুষ যথাসাধ্য লেনিনের ইস্ক্রা আদর্শকে রূপ দিতে চেষ্টা করছেন। তোমাদের সামনেও এই আদর্শ রয়েছে।

পিঁপড়েদের রাজ্যে

অমরনাথ রায়

মানুষের রাজ্যে যেমন বৈচিত্র্যের অভাব নেই, পিঁপড়েদের রাজ্যেও সে রকম বহু বৈচিত্র্য আছে। প্রায় পাঁচ হাজারের ওপর বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ে আছে এই পৃথিবীতে। এদের সবার পরিচয় ও বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিচয় দিতে গেলে বিরাট এক বই হয়ে যাবে। কাজেই পিঁপড়েদের গুটিকয়েক বিচিত্র কাহিনি তোমাদের শোনাব।

শখ কার না থাকে? এই ধরো না, তোমাদের মধ্যে কারুর আছে পায়রা পোষার শখ, কারুর বা কুকুর পোষার, কারুর আবার ওসব শখে মন ভরে না। সে চায় গোরু পুষতে। শখও মিটবে—দুধও খাওয়া হবে। তাই না?

আমাদের মতো অনেক পিঁপড়েও গোরু পোষে। নাল্‌সো এবং ডেঁয়ো পিঁপড়েদেরই গোরু পোষার শখ বেশি। শুনলে অবাক হতে হয় বটে। কিন্তু কথাটা সত্যি! তবে আমাদের গোরু আর ওদের গোরু এক নয়। আমাদের গোরু মস্ত বড়ো। আর ওদের গোরু খুব ছোটো এক রকমের পোকা, মেটে রঙের।

সেই পোকারা এতো ছোটো যে পরপর দশটি সাজালে তবে এক ইঞ্চি লম্বা হয়। ওদের ডানা গজায় না। পাগুলোও লম্বা লম্বা হয় না। ছোটো ছোটো পা নিয়ে ওরা তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে না। গাছের রস খেয়েই ওরা বেঁচে থাকে। ওরা বাঁচে বটে, তবে যে গাছের রস খায় সে গাছ প্রায়ই মরে যায়।

এরাই হল পিঁপড়েদের গোরু। এদের পেছনে নলের মতো দুটি অংশ দেখা যায়। ও দুটো মধুর নল। আমাদের গোরুর বাঁটে যেমন আপনা থেকেই দুধ জন্মে, ওদের গোরুর পেছনে ওই নল দুটোতেও তেমনি আপনা-আপনি মধু জন্মে। দুধ খাবার ইচ্ছে হলে আমরা গাই দুয়ে থাকি। পিঁপড়েরাও তাদের গোরু দুয়ে থাকে। কীভাবে, তা বলি।

পিঁপড়েদের মুখের সামনে লম্বা শুঁয়ো আছে। ওই শুঁয়ো দিয়ে তারা তাদের গোরুর লেজের কাছে সুড়সুড়ি দেয়; সুড়সুড়ি লাগলেই ওই পোকাদের শরীর থেকে নল বেয়ে বিন্দু বিন্দু মধু বেরুতে থাকে। ওই হল পিঁপড়েদের গাই দোয়া।

দুধ বেশি পেতে হলে গোরুর যত্ন করতে হয়। আমরা তাই ভালো গোয়াল-ঘর তৈরি করে গোরুকে রাখি। ঘাস, বিচালি, খোল খেতে দিই, তবেই তো গোরু দুধ দেয়।

পিঁপড়েরাও তাদের গোরুর যত্ন করে। তারা জাল বুনে তাদের গোরুর জন্য খোঁয়াড় তৈরি করে। সেই খোঁয়াড়ে গোরুকে আটকে রাখে। লক্ষ রাখে, গোরু যেন পালিয়ে না যায়। শুধু কি তাই? ওরা গোরুর অর্থাৎ এ পোকাদের ডিমের যত্নও নেয়। ডিম যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে তাদের খেতে দেয়। কারণ ওরাই তো বড়ো হয়ে আবার মধু দেবে।

এ হল পিঁপড়ের গোরু পোষার কথা। এবারে বলি ওদের যুদ্ধের কথা। লোভের জন্যই যুদ্ধ হয়।

পাশাপাশি দুটি রাজ্য। এ রাজ্যের রাজা দেখলেন ও রাজ্যের প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। অমনি তাঁর লোভ হল। পাশের বাজ্য আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ বেধে গেল।

পিঁপড়েদের যুদ্ধেব কারণও তাই—লোভ। একদল পিঁপড়ে আর একদল পিঁপড়ের খাবার কেড়ে নিতে চায়। বাধল ভীষণ যুদ্ধ। হাজার হাজার পিঁপড়ে লড়াই শুরু করে দিল। তবে মানুষের মতো ওদের তো অস্ত্রশস্ত্র নেই, তাই পা আর মুখ দিয়েই ওরা যুদ্ধ করে। পায়ে পা বাধিয়ে দেয়। কামড়াকামড়ি করে। মানুষের যুদ্ধে তবু সন্ধি হয়। ওদের যুদ্ধে কিন্তু সন্ধির বালাই নেই। একদল সম্পূর্ণ হেরে না গেলে ওদের যুদ্ধ থামে না। মানুষের যুদ্ধে কত সৈন্য মারা যায়। আমরা মরা সৈন্যদের হয় পুড়িয়ে ফেলি, নয়তো গোর দিই। পিঁপড়েরা কিন্তু তা করে না। ওরা মরা সৈন্যদের ধরে গর্তে টেনে আনে। তারপর মহানন্দে সবাই মিলে দেহটাকে ভাগ করে খেয়ে ফেলে।

আহত সৈন্যদের দেখলে আমাদের দয়া-মায়া হয়। আমরা তাদের সহজে মারি না। সেবা করি—বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করি। ওদের ঠিক উলটো। যুদ্ধে আহত পিঁপড়েদেরও ওরা ছেড়ে কথা বলে না। খেয়ে ফেলে। ভারি নিষ্ঠুর ওরা।

নাল্‌সো পিঁপড়েদের তোমরা অনেকেই হয়তো দেখে থাকবে। আম, জাম, পাকুড়, পেয়ারা প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছে এদের সাক্ষাৎ মেলে। গাছের পাতা মুড়ে এরা গোলাকার বাসা তৈরি করে। একত্রে মিলেমিশে থাকে অনেকে। বড়োই উগ্র স্বভাব ওদের, কামড়ানিতে বড়ো জ্বালা। তাই ওদের, দেখলে আমরা সাবধান হই। ধারে-কাছে ঘেঁষতে সাহস পাই না।

শত্রুর দেখা পেলে আর রক্ষে নেই। তাকে কামড়ে ধরবে। টেনে ছিঁড়ে ফেললেও কামড় ছাড়বে না। মরি তো সেও ভালো—তবুও ছাড়ব না—যেন এই ভাব।

রূপকথা
উপকথা

ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক স্থূলকায় পালিত কুকুরের সহিত, এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর, ব্যাঘ্র কুকুরকে কহিল, ভাল ভাই! জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া, এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে; প্রতিদিন কিরূপ আহার কর, এবং, কিরূপেই বা প্রতিদিনের আহার পাও। আমি, অহোরাত্র, আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও, উদর পুরিয়া, আহার করিতে পাই না; কোনও কোনও দিন, উপবাসীও থাকিতে হয়। এইরূপ আহারের কষ্টে, এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

কুকুর কহিল, আমি যা করি, তুমি যদি তাই করিতে পার, আমার মতো আহার পাও। ব্যাঘ্র কহিল, সত্য না কি; আচ্ছা, ভাই! তোমার কী করিতে হয়," বল। কুকুর কহিল, আর কিছুই নয়; রাত্রিতে, প্রভুর বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই মাত্র। ব্যাঘ্র কহিল, আমিও করিতে সম্মত আছি। আমি, আহারের চেষ্টায়, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে, অতিশয় কষ্ট পাই। আর ক্লেশ সহ্য হয় না! যদি, রৌদ্র ও বৃষ্টির সময়, গৃহের মধ্যে থাকিতে পাই, এবং ক্ষুধার সময় পেট ভরিয়া খাইতে পাই, তাহা হইলে, বাঁচিয়া যাই। ব্যাঘ্রের দুঃখের কথা শুনিয়া, কুকুর কহিল, তবে আমার সঙ্গে আইস। আমি, প্রভুকে বলিয়া, তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

ব্যাঘ্র কুকুরের সঙ্গে চলিল। খানিক গিয়া, ব্যাঘ্র কুকুরের ঘাড়ে একটা দাগ দেখিতে পাইল, এবং কিসের দাগ জানিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইয়া কুকুরকে জিজ্ঞাসিল, ভাই! তোমার ঘাড়ে ও কিসের দাগ? কুকুর কহিল, ও কিছুই নয়। ব্যাঘ্র কহিল, না ভাই! বল বল, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। কুকুর কহিল, আমি বলিতেছি, ও কিছুই নয়, বোধ হয়, গলবন্ধের দাগ। বাঘ কহিল, গলবন্ধ কেন? কুকুর কহিল, ওই গলবন্ধের শিকলি দিয়া, দিনের বেলায় আমাকে বাঁধিয়া রাখে। বাঘ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, এবং কহিল, শিকলিতে বাঁধিয়া রাখে! তবে তুমি, যখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার না! কুকুর কহিল, তা কেন, দিনের বেলায় বাঁধা থাকি বটে; কিন্তু, রাত্রিতে যখন ছাড়িয়া দেয়, তখন আমি, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি। তদ্ভিন্ন, প্রভুর ভৃত্যেরা কত আদর ও যত্ন করে, ভাল আহার দেয়, স্নান করাইয়া দেয়। প্রভুও কখনও কখনও আদর করিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দেন। দেখ দেখি, কেমন সুখে থাকি। বাঘ কহিল, ভাই হে! তোমার সুখ তোমারই থাকুক, আমার অমন সুখে কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হইয়া, রাজভোগে থাকা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া, আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। এই বলিয়া বাঘ চলিয়া গেল।

কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক কৃষক কৃষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে, ঐ সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রদিগকে কহিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে সন্ধান করিলে পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা, গুপ্তধনের লোভে, সেই সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল। এইরূপে, যারপরনাই পরিশ্রম করিয়া, তাহারা গুপ্তধন কিছুই পাইল না বটে; কিন্তু, ঐ সকল ভূমির অতিশয় খনন করাতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল যে, গুপ্তধন না পাইয়াও, তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইল।
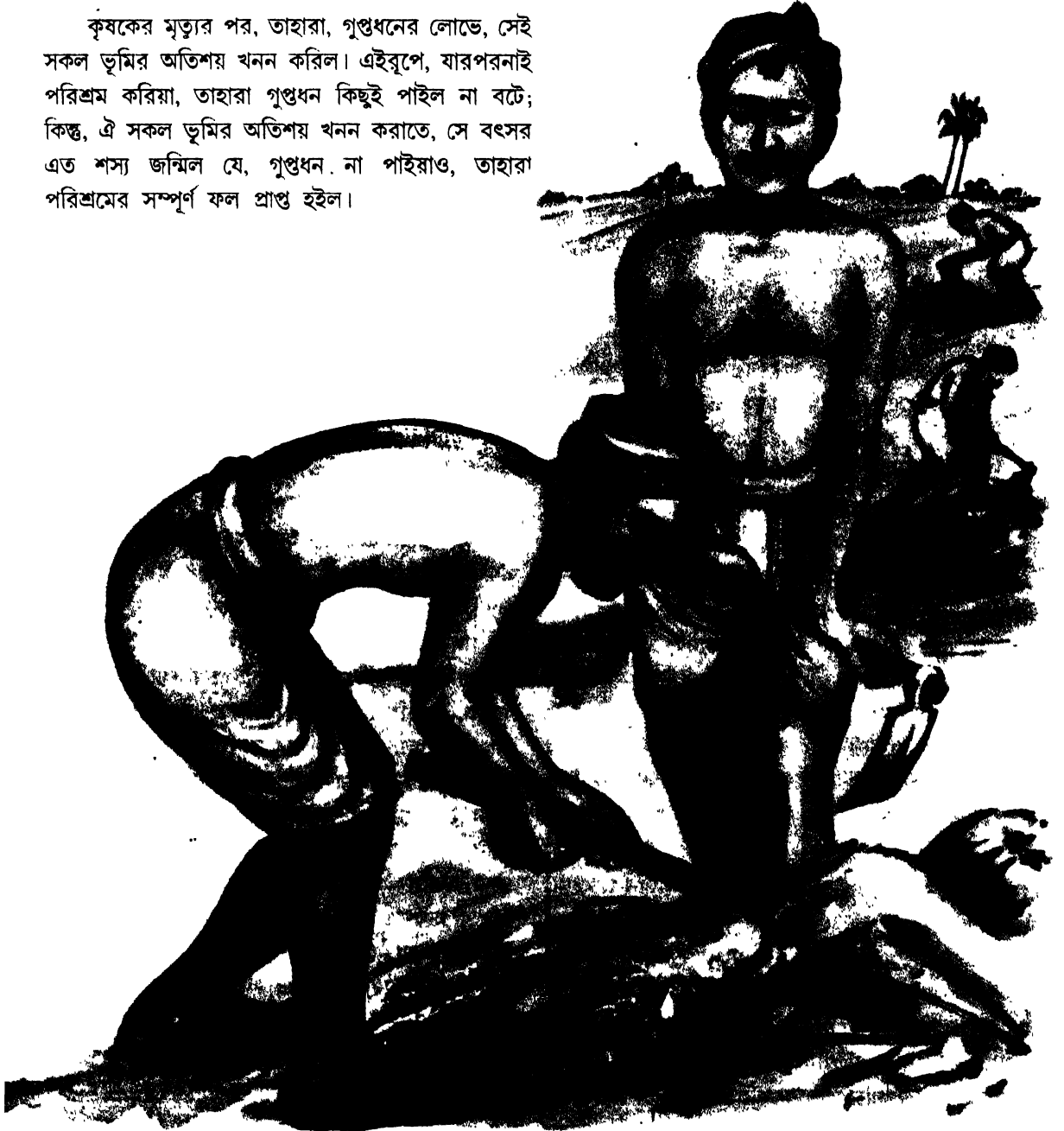
জ্যান্ত ভূত

লাল বিহারী দে

অনেক কাল আগে এক নাপিত ছিল আর তার বউ ছিল। কিন্তু তাদের ঘরে সুখ-শান্তি ছিল না। বউ দিন-রাত ঘ্যান-ঘ্যান করত, "ওই দেখ, আজও আমার পেট ভরল না !" রাতে বউ-এর বকাবকির জ্বালায় নাপিত ঘুমোতে পারত না। বউ কেবলি বলত, "খাওয়াতে পারবে না তো আমাকে বিয়ে করার শখ হয়েছিল কেন ! যাদের চালচুলো নেই, তাদের আবার বিয়ে করা কেন ! বাপের বাড়িতে দু-বেলা পেট ভরে খেতাম। এখানে এসেছি উপোস করতে। বিধবারা উপোস করে, তুমি বেঁচে থাকতেই কি আমি বিধবা হয়েছি ?"

শুধু কথা বলেই থামত না বউ ; মাঝে মাঝে ঝাঁটা তুলে দু-ঘা লাগিয়েও দিত। একদিন ওই রকম খ্যাংরা-বাড়ি খেয়ে, লজ্জায় অপমানে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে, নাপিত তার ক্ষুরের থলিটি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল কিছু টাকা-কড়ি না জমিয়ে আর কখনও বউ-এর মুখ দেখবে না।

সারাদিন গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে, সন্ধ্যাবেলায় নাপিত একটা বনের ধারে পৌঁছোল। সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে সে বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে, অনেকক্ষণ ধরে মনের দুঃখ নিয়ে খুব বিলাপ করতে লাগল। এখন হয়েছে কী, ওই যে গাছে নাপিত ঠেস দিয়ে বসেছিল, সেই গাছে এক ভূত থাকত। গাছের গোড়ায় একটা জ্যান্ত মানুষকে বসে থাকতে দেখে ভূতের যে তার ঘাড় মটকাবার ইচ্ছে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে নেমে, এই লম্বা তালগাছের মতো ভূতটা দু-হাত বাড়িয়ে, এত বড়ো হাঁ করে, নাপিতের সামনে এসে দাঁড়াল। নাপিতের তো চক্ষু স্থির !

ভূত বলল, "ওঁরে নাঁপিত, এঁবার তোঁর ঘাঁড় মঁটকাব, তোঁকে রঁক্ষা কঁরবে কেঁটা বঁল !"

তাকে দেখেই তো নাপিতের গায়ের রক্ত হিম, চুল-দাড়ি খাড়া ! তবু তার মাথা গুলিয়ে গেল না। কে না জানে যে নাপিতদের মতো বুদ্ধি কারও হয় না।

নাপিত বলল, "কী বললি রে পিরেত? আমার ঘাড় মটকাবি নাকি? দাঁড়া, আজ রাতেই তোর মতো কত পিরেত ধরে আমি ঝুলিতে পুরেছি, তোকে একবার দেখাই। তুই এসেছিস ভালোই হয়েছে, আমার আরেকটা পিরেত দরকার ছিল!"

এই না বলে নাপিত করেছে কী, থলির ভিতর থেকে একটা ছোটো আয়না বের করেছে। সব নাপিতের সঙ্গে থলির মধ্যে একটা কাঠের বাক্স থাকে; তার মধ্যে ক্ষুর, নরুন, ক্ষুরে ধার দেবার জন্য পাথর ইত্যাদি থাকে। তার সঙ্গে একটা করে আয়নাও থাকে। কারণ— খদ্দেররা দেখতে চায় দাড়ি কেমন কামানো হল। নাপিত তার সেই আয়নাটা বের করে, ভূতের মুখের সামনে ধরে বলল, "এই দেখ্ একটা ভূত! এটাকে ধরে আমি থলিতে ভরেছি। আরও অনেকগুলো আছে। ওরে পিরেত, এবার তোকেও ধরে থলিতে বাঁধব, তুই ওদের সঙ্গী হবি।"

আয়নায় নিজের মুখ দেখে ভূতের পিলে চমকে গেল! সে ভাবল তবে তো নাপিত সত্যি কথাই বলেছে। ভূত ধরাই ওর কাজ! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভূত বলল, "ওঁ মশাই, ওঁ নাঁপিত-মঁশাই! আঁপনি যাঁ বঁলেন আমি তাঁই কঁরব, কিঁন্তু দোঁহাই আঁমাকে থঁলিতে ভঁরবেন না। আঁপনি যাঁ চান আঁমি তাঁই দেঁব।"

নাপিত বলল, "তোকে দিয়ে বিশ্বাস কী? কে না জানে ভূতেরা বেজায় মিথ্যেবাদী হয়। মুখে বলবি এক রকম, তারপর কাজের বেলায় অন্যরকম।"

ভূত বলল, "নাঁ, নাঁ, নাঁ, মশাই! আঁমার ওঁপর কিঁরপা কঁরুন! বঁলুন কিঁ চাঁন, যঁদি নাঁ এঁনে দিঁই তঁখন থঁলিতে বাঁধবেন।"

তখন নাপিত বলল, "বেশ, তাহলে এক্ষুনি আমাকে এক হাজার সোনার মোহর এনে দে। আর কাল রাতের মধ্যে আমার বাড়িতে মস্ত এক গোলা তৈরি করে, ধান দিয়ে ভরে রাখিস। আগে আমার মোহরগুলো আন্ তো দেখি, নইলে থলিতে ভরব।"

ভূত বলল, "নাঁ বাঁবা, নাঁ, এঁক্ষুনি আঁনছি।" এই বলে কোথায় যেন গিয়ে, একটুক্ষণ বাদেই এক ছালা মোহর এনে নাপিতের সামনে ফেলল। নাপিত ছালা খুলে দেখে তাতে এক হাজার সোনার মোহর! সে তো মহা খুশি!

ভূতকে তখন সে বলল, "দেখিস, কাল রাতের মধ্যে গোলাটা তুলে, ধান ভরতে যেন ভুল না হয়। এখন যেতে পারিস।" ভূত অমনি চোঁ-চাঁ দৌড় দিল।

ভোরবেলায় ছালার ভারে নুয়ে পড়ে, নাপিত এসে নিজের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এদিকে বউ তো সারাদিন কেঁদে কেঁদে সারা, কেন সে তার অমন ভালোমানুষ স্বামীকে রাগের মাথায় খ্যাংরা-বাড়ি মেরে বসল? সে ছুটে এসে দরজা খুলে নাপিতের পায়ে পড়ল।

তারপর স্বামী যখন ছালার মুখ খুলে মাটিতে এক পাহাড় মোহর ঢালল বউ-এর চোখ কপালে উঠে গেল।

পরের রাতে ভূতটা থলি-বাঁধা হবার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নাপিতের বাড়িতে মস্ত একটা গোলা তৈরি করে সারা রাত পিঠে করে ধান বয়ে এনে, গোলা বোঝাই করতে লাগল। ভূতের খুড়ো তাই দেখে জিজ্ঞাসা করল, "ওঁটা কিঁ হঁচ্ছে? ভূঁতের পোঁ হঁয়ে মুঁটের মঁতো ধাঁন বঁয়ে মঁরছিস কেঁন?"

তারপর ভূতের কাছে সব কথা শুনে, খুড়ো বলল, "তুঁইও যেঁমন গাঁধা। ওঁ বঁলল থঁলিতে ভঁরবে আঁর তুঁইও অঁমনি বিঁশ্বাস কঁরলি! তাঁই কঁখনো পাঁরে নাঁকি! তোঁকে বোঁকা পেঁয়ে চাঁলাকি কঁরেছে।"

ভূত বলল, "খুঁড়ো তুঁমি নাঁপিতের ক্ষঁমতাকে সঁন্দেহ কঁরছ? বেঁশ, তঁবে চঁল আঁমার সঁঙ্গে।"

এই বলে নাপিতের বাড়ি গিয়ে দুজনে জানালা দিয়ে উঁকি মারল।

নাপিত কিন্তু দমকা হাওয়া আর সোঁদা গন্ধ থেকে ঠিক বুঝেছিল জানালার কাছে ভূত এসেছে। অমনি জানালার সামনে সেই আয়নাটা তুলে ধরে নাপিত বলল, "কিরে পিরেত! আরেকটাকে এনেছিস বুঝি? দাঁড়া! সেটাকেও থলিতে ভরি।"

ভূতের খুড়ো যেই না আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে অমনি তার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়েছে! সে কেঁদে নাপিতকে বলল, "ওঁ বাঁবা! মাঁপ করুন আঁর সঁন্দ কঁরব না! আঁরেকটা গোঁলা কঁরে সেঁটাতে ধাঁনের বঁদলে চাঁল ভঁরে দিচ্ছি, আমাকে ছাড়ান দিন।"

এইভাবে দুটো রাত পোয়াতে না পোয়াতে, নাপিত বড়োলোক হয়ে গেল। তারপর স্ত্রী ছেলে-পুলে নিয়ে বাকি জীবনটা সে সুখেই কাটাল।

আমার গল্পটি ফুরোল,
নটে গাছটি মুড়োল।

ব্যাঙের আধুলি

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কঙ্কাবতী চক্ষু মুছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। এখন লোকালয়ে যাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু লোকালয় কোন্‌দিকে, তাহা তো তিনি জানেন না। তাই তিনি ভাবিলেন, যেদিকে হয় যাই। একটা না একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হইব। বন-জঙ্গল, গিরি-গুহা অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কঙ্কাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কত দুর চলিয়া গেলেন। কিন্তু গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য উদয় হইলেন, দিন বাড়িতে লাগিল, তবুও জনমানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। 'কী করি, কোন্ দিকে যাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি',—কঙ্কাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে একটি ব্যাঙ দেখিতে পাইলেন। ব্যাঙের অপূর্ব মূর্তি। সেই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কঙ্কাবতী বিস্মিত হইলেন। ব্যাঙের মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেন্টুলেন। ব্যাঙ সাহেবের পোশাক পরিয়াছেন। ব্যাঙকে আর চেনা যায় না। রংটি কেবল ব্যাঙের মতো আছে, সাবান মাখিয়াও রংটি সাহেবের মতো হয় নাই। আর, পায়ে জুতা নাই। জুতা তখনো

কেনা হয় নাই, ইহার পর কিনিয়া পরিবেন। আপাতত সাহেবের সাজ পরিয়া, দুই পকেটে দুই হাত রাখিয়া, সদর্পে চলিয়া যাইতেছেন।

এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কঙ্কাবতীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। কঙ্কাবতী মনে করিলেন,—ইহাকে আমি পথ জিজ্ঞাসা করি।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাঙ মহাশয়! গ্রাম কোন্ দিকে ? কোন্ দিক দিয়া যাইলে লোকালয়ে গিয়া পৌঁছিব।

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—হিট্ মিট্ ফ্যাট !

কঙ্কাবতী বলিলেন—ব্যাঙ মহাশয়! আপনি কী বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভালো করিয়া বলুন।

ব্যাঙ বলিলেন,—হিশ্ ফিশ্ ড্যাম।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—ব্যাঙ মহাশয়, আমি দেখিতেছি আপনি ইংরেজি কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজি পড়ি নাই, আপনি কী বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া যদি বাংলা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।

ব্যাঙ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে কেহ কোথাও নাই। কারণ, লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাংলা কথা কহিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে 'নেটিব' মনে করিবে। যখন দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, তখন বাংলা কথা বলিতে সাহস হইল।

কঙ্কাবতীর দিকে কোপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে ব্যাঙ বলিলেন,—কোথাকার ছুঁড়িরে তুই ? আ গেল যা ! দেখিতেছিস, আমি সাহেব ! তবু বলে, ব্যাঙ মশাই, ব্যাঙ মশাই ! কেন ? সাহেব বলিতে তোর কী হয় ?

কঙ্কাবতী বলিলেন,—ব্যাঙ সাহেব, আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন্ দিক দিয়া, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।

এই কথা শুনিয়া ব্যাঙ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—মোলো যা ! এ হতভাগা ছুঁড়ির রকম দেখ ! মানা করিলেও শুনে না। কথা গ্রাহ্য হয় না। কেবল বলিবে, ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ ! কেন ? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় নাকি ? আমার নাম মিস্টার গমিশ।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—মহাশয় আমার অপরাধ হইয়াছে। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে মিস্টার গমিশ, আমি লোকালয়ে যাইব কোন্ দিক দিয়া, তাহা বলিয়া দিন।

কঙ্কাবতী তাঁহাকে সাহেব বলিলেন, কঙ্কাবতী তাঁহাকে মিস্টার গমিশ বলিয়া ডাকিলেন, সেজন্য ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ পড়িয়া গেল।

কঙ্কাবতীর প্রতি হৃষ্ট হইয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি সাহেব হইয়াছি কেন, তাহা জান ?

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—আজ্ঞে না, আমি তাহা জানি না। মহাশয় ! গ্রামে কোন্ দিক দিয়া যাইতে হয় ? গ্রাম এখান হইতে কত দূর ?

ব্যাঙ বলিলেন,—দেখো কঙ্কাবতী ! তোমার নাম কঙ্কাবতী বলিলে বুঝি ? দেখো কঙ্কাবতী, একদিন আমি এই বনের ভিতর বসিয়াছিলাম। এক হাতি সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিলাম, আমার মান-মর্যাদা রাখিয়া, আমাকে ভয় করিয়া, হাতি অবশ্যই পাশ দিয়া যাইবে। একবার আস্পর্ধার কথা শোন, দুষ্টু হাতি পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল। তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেইজন্য এই সাহেবের পোশাক পরিয়াছি। কেমন ? আমাকে ঠিক সাহেবের মতো দেখাইতেছে তো ? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে ভয় করিবে, যখন রেল-গাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়িতে অন্য লোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। সকলে উঁকি মরিয়া দেখিবে আর ফিরিয়া যাইবে, আর বলিবে,—ও গাড়িতে সাহেব রহিয়াছে, কেমন কঙ্কাবতী, এ পরামর্শ ভালো নয় ?

কঙ্কাবতী বলিলেন,—উত্তম পরামর্শ, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পথ বলিয়া দিন ! আর যদি না দেন তো বলুন, আমি চলিয়া যাই।

কানে হাত দিয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কী বলিলে ?

কঙ্কাবতী বলিলেন,—কোন্ পথ দিয়া গ্রামে যাইব ? গ্রাম এখান হইতে কত দূরে ? কতক্ষণে সেখানে গিয়া পৌঁছাইব ?

ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ত্রৈরাশিক জান ?

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—অল্প অল্প জানি।

ব্যাঙ বলিলেন,—তবে শ্লেট-পেন্সিল নাও।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—মহাশয়, এ সময়ে আমার সহিত বিদ্রূপ করিবেন না, দুঃখে এখন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—আমি বিদ্রূপ করি নাই, অঙ্ক না কষিয়া কী করিয়া বলি, তুমি কতক্ষণে গ্রামে গিয়া পৌঁছিবে? যাহা হউক, তোমার কাছে শ্লেট-পেন্সিল না থাকে তো মুখে মুখে করিলেই হইবে। তবে একবার লাফাও দেখি। এক লাফে কতদূর যাইতে পার দেখি ! এইগুলি সব ত্রৈরাশিকের রাশি। এইগুলি পাইলে হিসাব করিয়া বলিব, তুমি কতক্ষণে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে, কারণ সকলকার লাফ তো আর সমান নয়।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—মহাশয়, আপনাদিগের মতো আমরা লাফাইয়া পথ চলি না, আমি লাফাইতে জানি না। আপনি আমাকে পথ বলিয়া দিন।

ব্যাঙ বলিলেন,—তবে এই অঙ্কটা কষিয়া আমাকে উত্তর বল। মনে কর যে আমার একটি আধুলি আছে। আমি সেটি একজনকে ধার দিলাম। কিস্তিবন্দি করিয়া সে ধার শোধ দিবে। তাহার সহিত এইরূপ নিয়ম হইল যে, প্রতিদিন হিসাব হইবে ; যাহা কিছু বাকি থাকিবে, তাহার অর্ধেক দিয়া যাইবে। কঙ্কাবতী, বল কয় দিনে সে আমার আধুলিটি পরিশোধ করিবে ?

কঙ্কাবতী বলিলেন,—এটি সহজ আঁক, ছয় দিনে সমুদয় শোধ হইয়া যাইবে।

ব্যাঙ বলিলেন,—আমিও তাই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া এখন আমার মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আচ্ছা, কী করিয়া ছয় দিনে শোধ হইবে ? তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল।

কঙ্কাবতী কহিলেন,—আধুলির অর্ধেক চারি আনা, প্রথম দিন সে চারি আনা দিবে। বাকি রহিল,—চারি আনা। চারি আনার অর্ধেক দুই আনা, দ্বিতীয় দিনে সে দুই আনা দিবে। বাকি রহিল,—দুই আনা। দুই আনার অর্ধেক এক আনা, তৃতীয় দিনে সে এক আনা দিবে, বাকি রহিল,—এক আনা। এক আনার অর্ধেক দুই পয়সা, চতুর্থ দিনে সে দুই পয়সা দিবে। বাকি রহিল,—দুই পয়সা। দুই পয়সার অর্ধেক এক পয়সা, পঞ্চম দিনে সে এক পয়সা দিবে। বাকি রহিল, এক পয়সা। ষষ্ঠ দিনে সেই পয়সাটি দিয়া দিলেই সব শেষ হইয়া যাইবে।

ব্যাঙ বলিলেন,—তাহা কী করিয়া হইবে ? ষষ্ঠ দিনে সে পুরাপুরি এক পয়সা দিবে কেন ? যাহা বাকি থাকিবে, তাহার সে অর্ধেক দিবে তো ? এক পয়সায় হয় পাঁচ গণ্ডা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। ষষ্ঠ দিনে সে আমাকে দশ কড়া দিবে। তার পরদিন সে আমাকে পাঁচ কড়া দিবে। তার পর দিন আড়াই কড়া, তার পর দিন স'-কড়া, তার পর দিন তার অর্ধেক,—পর দিন তার অর্ধেক, পর দিন তার অর্ধেক—

অতি চমৎকার সুমিষ্ট কান্না-সুরে ব্যাঙ এইবার গলা ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন,—ওগো, মাগো, এ যে আর কখনও শোধ হবে না গো ! আমার আধুলিটি যে আর কখনও পুরোপুরি হবে না গো ! ওগো আমি কোথায় যাব! জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্বস্ব গেল গো! ওগো আমার যে ওই আধুলিটি বই পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো! ওগো তা লইয়া মানুষে যে কত ঠাট্টা করে গো! 'ব্যাঙের আধুলি—ব্যাঙের আধুলি', বলিয়া মানুষে যে হিংসায় ফাটিয়া মরে গো ! ওগো মাগো, আমার কী হল গো !

ব্যাঙ সুর করিয়া, বিনিয়ে বিনিয়ে এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

অবশেষে ব্যাঙ আধ-কান্না-সুরে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বলিলেন,—ওগো ! তুমি ওই দিক দিয়া যাও গো, তাহা হইলে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে গো। ওগো, আমার যে আধুলিটি এইবার জন্মের মতো গেল গো ! ওগো, আমার কী হল গো ! ওগো, মাগো !

(সংক্ষেপিত)

টুনটুনি আর রাজার কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকুতে দিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চক্‌চকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিলে, আর ভাবলে, ঈস্ ! আমি কত বড়োলোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সেই ধন আছে ! তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—

রাজার ঘরে যে ধন আছে,
টুনির ঘরে সে ধন আছে।

রাজা তার সভায় বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিগ্‌গেস করলেন, 'হ্যাঁরে ! পাখিটা কী বলছে রে ?'

সকলে হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ, পাখি বলছে, আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে। শুনে রাজা খিল্‌খিল্ করে হেসে বললেন, 'দেখ তো ওর বাসায় কী আছে।'

তারা দেখে এসে বলল, 'মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা।'

তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কী করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

রাজা বড়ো ধনে কাতর

টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর।

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা তো বড়ো ঠ্যাটা রে ! যা, ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরিয়ে পেয়ে টুনির বড়ো আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

রাজা ভারি ভয় পেল

টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।

রাজা জিগ্‌গেস করলেন, 'আবার কী বলছে রে ?'

সভার লোকেরা বললে, 'বলছে যে মহারাজ নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন !'

শুনে তো রাজামশাই রেগে একেবারে অস্থির ! বললেন, 'কী এত বড়ো কথা ! আন্ তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই।'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনল। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানিদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে।'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানিরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

একজন বললেন, 'কী সুন্দর পাখি ! আমার হাতে দাও তো একবার দেখি।' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার আর একজন দেখতে চাইলেন। তার হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফস্‌কে গিয়ে উড়ে পালাল।

কী সর্বনাশ ! এখন উপায় কী হবে ? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে না।

এমনি যখন তারা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ-থপ করে যাচ্ছে। সাত রানি তাকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ-চুপ ! কেউ যেন জানতে না পারে। এইটাকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন।'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভারি খুশি হলেন।

তারপর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবার পাখি বাছাকে জব্দ করেছি।'

অমনি টুনি বলছে—

বড়ো মজা, বড়ো মজা,

রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা।

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন। তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আর কত কী করেন। তারপর রেগে বললেন, 'সাত রানির নাক কেটে ফেল।' অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রানির নাক কেটে ফেললে। তা দেখে টুনটুনি বললে—

এক টুনিতে টুনটুনালো

সাত রানির নাক কাটালো !

তখন রাজা বললেন, 'আন বেটাকে ধরে। এবারে গিলে খাব ! দেখি কেমন করে পালায় !

টুনটুনিকে ধরে আনলে।

রাজা বললেন, 'আন জল !'

জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক্ করে গিলে ফেললেন।

সবাই বললে, 'এবার পাখি জব্দ !'

বলতে বলতেই রাজামশাই ভোক্ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, 'গেল গেল ! ধর, ধর ! অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে আবার বেচারাকে ধরে আনলে।

তারপর আবার জল নিয়ে এল আর সিপাই এসে তরোয়াল নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দু-টুকরো করে ফেলবে।
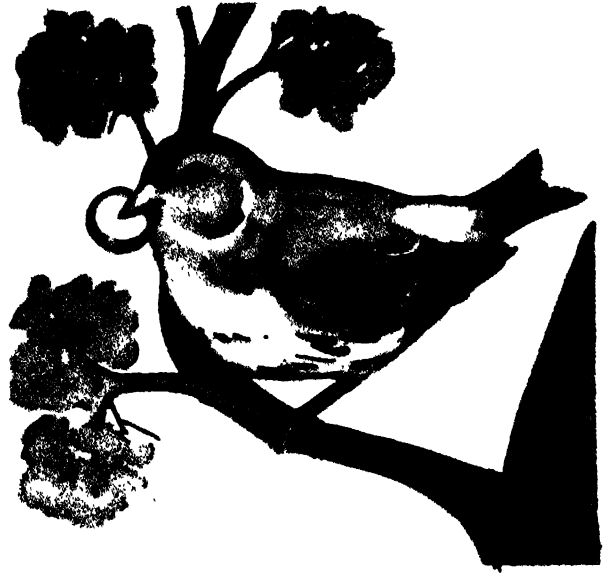
এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতর গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগল।

খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক !' অমনি টুনটুনিকে সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরেরও সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বললে, 'সিপাই, সিপাই ! মারো মারো ! পালাল !' সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তরোয়াল দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তরোয়াল টুনির গায় না পড়ে রাজামশাইয়ের নাকে গিয়ে পড়ল।

রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে-সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

নাক-কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে !

বলেই সে উড়ে সে-দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

ঘ্যাঁঘাসুর

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক যে ছিল রাজা, তাঁহার ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে; একটি দিনের জন্যেও ভালো থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ—মেয়ে ভালো হওয়া তো দূরে থাকুক, দিন দিনই রোগা হইতেছে। এত ধন-জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই, কীসে মেয়েটি ভালো হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়; ইহার মধ্যে একদিন এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তিনি রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভালো হইবে।"

একটি লেবু! সে কোন্ লেবুটি; কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথা জানাইয়া দিলেন যে, 'যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে ভালো হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে, আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন মুশকিলের কথা এই যে, সে রাজ্যে লেবু মিলে না, কেবলমাত্র এক চাষার বাড়িতে একটি লেবু গাছ আছে; চাষা অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট হইতে গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর তাহাতে লেবু হইয়াছে। লেবু তো নয়, যেন রসগোল্লা! এক একটা বড়ো কত! যেন এক একটা বেল! তেমন লেবু তোমরা দেখও নাই,

খাও-ও নাই। আমিও দেখিতে পাই নাই ; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষার তিন ছেলে ; যদু, গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম শুনিয়া চাষা যদুকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল, "শিগ্গির এগুলি রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।"

যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে একহাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঝুড়িতে কী ও ? যদু বলিল, "ব্যাঙ !" সেই লোকটি বলিল, "আচ্ছা, তাই হোক।"

রাজার দারোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যার-পর-নাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা মহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন ; আর অমনি চারিটি ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল, সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজাব মেয়েকে ভালো করা আর রাজার জামাই হওয়া যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাঠি খাইয়া প্রাণে প্রাণে যে বাড়ি ফিরল, তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এরপর চাষা আর এক ঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই একহাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠের ঝুড়িতে কী আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল, "ঝিঙের বিচি"। এক হাত লম্বা মানুষটি বলিল, "আচ্ছা, তাই হোক।"

রাজবাড়ির দারোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই। তাহারা বলিল, "তোরই মতন একটা লোক সেদিন এসে রাজামশায়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে গেছে। তুই আবার একটা কী করে বসবি, কে জানে।" অনেক পিড়াপিড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিতে পাইল ; কিন্তু ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতেই পার। সাজাটাও তাহার তেমনই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে। কাজেই তাহাকে আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ি পাঠাইতে কেহ বলিল না। কিন্তু সে যাইবার জন্য একবারে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষা তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ মানিক কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই এক হাত লম্বা মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল। এক হাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাসা করিল, "ঝুড়িতে কী ও ?" মানিক বলিল, "ঝুড়িতে লেবু আছে ; তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।" এক হাত লম্বা মানুষটি বলিল, "আচ্ছা, তাই হোক।"

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যার-পর-নাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাত জোড়ের পর দারোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, "দেখিস, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বিচি-টিচি না হয়। তা হলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।"

যাহা হউক, মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজা মহাশয় তো খুবই খুশি ! তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, "কেমন হয়, আমাকে খবর দিস।" খবরের আশায় রাজা মহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত ! সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে !

ইহাতে রাজা মহাশয় যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন ; কিন্তু তাহাব পরেই ভাবিতে লাগিলেন—"তাই তো করিয়াছি কী! এখন যে চাষার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হয়।" এই ভাবিয়া রাজা মহাশয় স্থির করিলেন যে, চাষার ছেলেকে যেমন করিয়াই হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে যে, 'এরপরই বুঝি মেয়ে বিয়ে দিবে।' এমন সময় রাজা মহাশয় তাহাকে বলিলেন, "বাপু, তুমি কাজটা তো বেশ করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিয়ে করা সহজ কথা নয়। আগে, আর একটা কাজ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে, কী হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমনি চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া না দিতে পারিলে তোমার কোনো আশাই নাই।"

মানিক "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় লইল। তারপর বাড়ি আসিয়া সকল কথাই বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে নেহাত বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং তাহারা মনে করিল যে,, 'মান্‌কে

যখন রাজার মেয়েকে ভালো করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা করিলেই সে তয়ের করিতে পারে।'

যদু একখানা কুড়াল লইয়া তখনই নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেইখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া ধিল। ইচ্ছা—সেই দিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে ; পরিশ্রমেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই এক হাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। "কী হে যদুনাথ, কী হচ্ছে ?" "গামলা"। "আচ্ছা তাই হোক"।

'তাই হোক' বলিয়া এক হাত লম্বা মানুষটি চলিয়া গেল ; যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে, তার সমস্তই বৃথা হয়। সে সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মতো গোল হইয়া আসে; নৌকার মতন সে কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছুই তৈয়ার করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেশ। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তিন-চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি ফিরিল। এমন ভালো গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল আর সেই এক হাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উঁচু দরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

সবশেষে মানিক নৌকা গড়িতে গেল ; আর তাহাকেও সেই এক হাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল : "কী হচ্ছে ?" মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল, "জলে যেমন চলে ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গড়ে দিতে পারলে, রাজা মশাই বলেছেন মেয়ে বিয়ে দেবেন।" এই কথা শুনিয়া এক হাত লম্বা মানুষটি বলিল, "আচ্ছা, তাই হোক।"

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। এক হাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে এখন আর কাঠ নাই, অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়। সেখানে সে নিজেই নামে। রাজা রাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি-তাকিয়ায় তাহার ভিতরটা সাজানো। বাহিরটা দেখিতে যে কী সুন্দর, তাহা কী বলিব, যে জিনিস দিয়া তাহা সাজানো হইয়াছে, তাহা সেই এক হাত লম্বা মানুষের দেশে হয়, আমি তাহার নাম জানি না।

রাজা মহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপগুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা মহাশয়ও খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন, এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপা রাখিয়া মুখে মানিককে বলিলেন, "এতেও হচ্ছে না; আর একটা কাজ করে দিতে হবে। ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের একগোছা পালক হলে আমার মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি এনে দিলে, নিশ্চয় আমার মেয়ে বিয়ে করতে পাবে।" মানিক "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখি, খানিকটা জানোয়ার, বিদঘুটে চেহারা, খিট্‌খিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে, অচেনা শহরে, সোনার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখিতে পাইলে রসগোল্লাটির মত টপ্‌ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঁঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকের পথ জিজ্ঞাসা করে; আর ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারও বাড়িতে আশ্রয় লয়। আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, "বাপু, তুমি ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে চলেছ শুন্‌ছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিন্দুকের চাবিটি হারিয়ে ফেলেছি; ঘ্যাঁঘা তার কোনো সন্ধান বলতে পারে, কি না, জিজ্ঞেস কোরো তো।" মানিক বলিল, "আচ্ছা, মশাই, আমি জেনে আস্‌ব।" আর একদিন আর এক বড়োলোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে; সেই বড়ো-লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তাহার বেয়ারামটা যে কী, কোনো ডাক্তার, কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়োলোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, "আমার মেয়ের অসুখ কীসে সারবে এই কথাটা যদি ঘ্যাঁঘার কাছ থেকে জেনে আসতে পার, তবে বড়ো উপকার হয়।" মানিক বলিল, "অবিশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসব।"

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঁঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা নদীতে নৌকা নাই, খেয়া নাই, এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহারই কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, "বাপু, আমার দুঃখু কবে দূর হবে, ঘ্যাঁঘার কাছে জিজ্ঞেস ক'রো তো। আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে করে দিনরাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই কাজ করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।" মানিক বলিল, "তোমার কিছু ভয় নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করব।"

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঁঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঁঘা তখন বাড়ি ছিল না। ঘেঁঘি ছিল। ঘেঁঘি তাহাকে দেখিয়া বলিল, "পালা বাছা, শিগ্‌গির পালা। ঘ্যাঁঘা তোকে দেখতে পেলেই গিলবে।" মানিক বলিল, "আমি যে ঘ্যাঁঘার লেজের একটি পালক চাই। সেইটি না নিয়ে আমি কেমন করে যাব? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে, সেই চাবিটা কোথায় আছে? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার করে দিলে, সে বাড়ি যাবে কেমন করে?"

ঘেঁঘি বলিল, "প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই, আর তাকে একশ' খবর বলে দাও। তুই কে রে বাপু?" মানিক বলিল, "আমি মানিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না; একগাছি পালক আমার চা-ই চাই।"

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘির দয়া হইল। সে বলিল, "আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।" মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল। সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘি তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জল দিয়া, সোনার থালায় করিয়া খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটি বড়োই খিট্‌খিটে; সব তাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ! মানুষ দে, খাই।"

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল। ঘেঁঘিরও বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, এ তাহারই গন্ধ, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়াই পালাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঁঘা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। সেই লেজের আগায় কী চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাচ্‌ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "ঘেঁঘি, আমার লেজ ধরে কে টানলে! হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ!" ঘেঁঘি বলিল, "তোমার ভুল। অত

বুড়ো পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর, মানুষ তো একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কাদের বাড়ি লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—ঘেঁঘির কথা শেষ হইতে না হইতেই ঘ্যাঁঘা বলিল, হাঁ। সেই লোহার সিন্দুকের চাবি! আমি জানি! সেটাকে তাদের খোকা গদির ফুটোর ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে।" ঘেঁঘি বলিল, "আবার কাদের মেয়ের কী অসুখ—।" অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল "কোলা ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ত। ওইখানে থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।" আবার ঘেঁঘি বলিল, "যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে—"। ঘ্যাঁঘা বলিল, "সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না? তাহলেই তো সে বাড়ি যেতে পারে। যাকেই নামিয়ে দেবে, সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে।"

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঁঘিও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল!

এরপর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা! বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা কিছু হল?" মানিক বলিল, "সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।" বুড়ো মনিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া, মানিক বলিল, "এর পর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তাহলেই তোমার ছুটি।" এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে; আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে আর দুবার কাঁধে করে পার করি।" মানিক বলিল, "তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে উঠে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।"

চারিদিন চলিয়া মানিক, যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে?" মানিক বলিল, "হাঁ।" এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোলা ব্যাঙের গর্ত খুঁড়িয়া সেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে দুই বৎসর যাবৎ মড়ার মতন পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশি হইল, তাহা কী বলিব! মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাকা-কড়ি দিল। এই সমস্ত টাকা-কড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজা মহাশয়কে ঘ্যাঁঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিককে যার-পর-নাই প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্যায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরি করা উচিত নয়। রাজা মহাশয় আর কী করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

এরপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজা মহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন যে, "ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমিও সেইখানে যাব।"

এই ভাবিয়া রাজা মহাশয় ঘ্যাঁঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কারণ, অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজা মহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গালি দিতে লাগিলেন, তারপর হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কান দিবার অবসরই পায় নাই। এতক্ষণে সে ডাঙায় উঠিয়া উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির পানে ছুটিয়াছে। তাড়াতাড়িতে রাজা মহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই।

সুতরাং রাজা মহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ পার করিতেছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি কখনও ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যাও, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিয়ো। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া একথা বলিয়ো না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

ভোঁদড় বাহাদুর

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ নবমী পুজোয় পাড়ার মল্লিকবাবুদের বাড়িতে ভয়ানক ধুম। বোমা, দুদমা, ঢাক, ঢোল, সানাই আর তিন দল ইংরেজি বাজনার বেজায় আওয়াজে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না।

রাত একটা কি. দেড়টার পর বেশ একটু তন্দ্রা আসছিল। এমন সময় আমার কানের কাছে কে বললে, "কী ভায়া, আমায় চিনতে পার?"

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি, আমাদের চৌতলার ছাতের বুড়ো ভোঁদড় খুব জমকালো মখমলের সাজ-গোজ পরে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকছে।

অনেক দিন পরে তাকে দেখে বড়ো খুশি হলুম। একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে জিগ্‌গেস করলুম, "ভোঁদড় দাদা, এত রাত্তিরে সাজগোজ করে কোথায় চলেছ? মল্লিকবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল বুঝি?"

বুড়ো সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে বললে, "ভায়া, তুমি তো বেশ জানো, তোমার ঠাকুরদাদার আমল থেকে আমরা তোমাদের চৌতলার ছাতের একটা ভাঙা পিল্‌পের ভিতর ঘরদোর বানিয়ে এতকাল নিরাপদে বাস করে আসছি। কিন্তু আজ সেখানে যা ব্যাপার হয়েছে, তাতে ছেলেপিলে নিয়ে ওখানে আর থাকতে সাহস হয় না। তাই অসময়ে তোমার ঘুম ভাঙাতে হল।"

আমি বললুম, "ব্যাপারখানা কী? শিগগির খুলে বল শুনি।"

বুড়ো বলতে লাগল, "রাত বারোটায় আহারাদি করে আমার তাল-বেতাল সিদ্ধ লাঠি ঘাড়ে বাড়ির আলসের চারিদিকে আজও বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড কালো বেড়ালের মতো জানোয়ার তোমাদের আঁতুরঘর থেকে একটি কচি ছেলে চুরি করে পালাচ্ছে। এই দেখে আমি লাঠি ঘুরিয়ে হার-রে-রে-রে করে হাঁকডাক ছেড়ে ছুটে গিয়ে যেমন তার পিঠে সজোরে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়েছি, অমনি সে খোকাকে টপ্ করে আলসেতে ফেলে দিয়ে টিকটিকির রূপ ধরে সড়সড় করে ছাতে উঠে গেল। তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তার মায়ের কাছে শুইয়ে রেখে এক লাফ মেরে ছাতে গিয়ে দেখি আমার ছেলে নিচুয়া চিৎকার করে বলছে, "বাবা, অন্ধকারে তুমি এই জানোয়ারকে চিনতে পারনি? ও আমাদের চিরকালের শত্রু। সেই চুটু পালু বনের দু-মুখো রাক্ষস, এখন বেড়ালের রূপ ধরে শহরে উৎপাত করতে এসেছে।" নিচুয়ার কথা শুনে রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি আমার লাঠির কানে-কানে বললুম, "লাঠিভায়া, দুষ্টু রাক্ষসকে একবার তোমার তাল-বেতালি কারদানিটা বেশ ভলো করে দেখিয়ে চট্ করে আমার হাতে ফিরে এসো।" লাঠি অমনি আমার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে দু-চারটে ডিগবাজি খেয়ে তাল ঠুকে রাক্ষসের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিচুয়াকে এক ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে যেমনি রাক্ষসের চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল, অমনি তার মাথা দিয়ে লাল-নীল-সবুজ রঙের আগুন দপদপিয়ে জ্বলে উঠল। এই রকমে রাক্ষসের চারিদিকে একটা আগুনের বেড়াজাল সৃষ্টি করে তার পালাবার পথ একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সে রাক্ষসকে নাস্তানাবুদ করে তুললে। আর খানিকটা সময় পেলে রাক্ষসকে পুড়িয়ে ছাই করে আকাশে উড়িয়ে দিত, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে হল কী দৈবাৎ লাঠির গায়ে একগাছা ঘুড়িব সুতো জড়িয়ে গেল। বেচারা ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছাতের মাঝে উলটে পড়ে চিৎকার করতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়ানো সুতো খুলে দিচ্ছি, সেই সুযোগে রাক্ষস নিচুয়াকে বগলদাবা করে এক লাফ মেরে তোমাদের তেঁতুলগাছের উপর পড়ল—তারপর সেখান থেকে বিরাট রকম চিৎকার করে হাসতে হাসতে আরেক লাফে গঙ্গা পার হয়ে কোন্‌দিকে যে চলে গেল—আমি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, তাকে আর ধরতে পারলুম না।"

ভোঁদড়দাদার কথা শুনে আমি বললুম, "কী সর্বনাশ! এতবড়ো কলকাতা শহরের ভিতর রাক্ষসের উপদ্রব? এ রকম কথা আগে তো কখনো শোনা যায়নি। এখুনি টেলিফোনে পুলিসের বড়ো সাহেবকে একটা খবর দিলে হয় না?"

বুড়ো ঘাড় নেড়ে বললে "না, পুলিসে-ফুলিসে খবর দেবার দরকার নেই। তারা সামান্য একটা চোর ধরতে পারে না, রাক্ষসকে ধরবে কী করে? আমার সেনাপতিকে খবর পাঠিয়েছি, সে এক্ষুনি আমার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছাতে হাজির হবে। আজ রাত্তিরেই রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব স্থির করেছি।"

আমি বললুম, "আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো—তোমার দলবল সব হাজির হলে আমাকে একটা খবর দিয়ো।"

ভোঁদড়দা আমার কথায় খুব খুশি হয়ে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করে চলে যচ্ছিল, কিন্তু কী মনে করে আবার চেয়ারে বসে বলল, "ভায়া, বড়ো একটা ভুল হয়ে গেছে, তোমার পরম বন্ধু বুদ্ধিমন্ত খরগোশকে খবর পাঠাতে ভুলে গেছি—এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল দাও দেখি, তাকে একখানা চিঠি লিখে দিই।"

আমার লেখার বাক্স থেকে কাগজ আর ফাউন্টেনপেন বার করে তার হাতে দিলুম।

বুড়ো খস খস করে একখানা চিঠি লিখে তার তাল-বেতাল-সিদ্ধ লাঠির হাতে দিয়ে বলল, "চিঠিখানা শিগগির বুদ্ধিমন্তের বাড়ি নিয়ে যাও, তার সঙ্গে দেখা করে বলবে, পত্রপাঠ তার দলবল নিয়ে এক্ষুনি যেন ছাতে হাজির হয়। আর ফেরবার পথে বেড়ালদের পাড়ায় একটা খবর দিয়ে এস!" লাঠি চিঠি নিয়ে তেতলার জানালা দিয়ে লাফ মেরে একতলায় পড়ে লাফাতে লাফাতে ফটক পার হয়ে কোন্‌দিকে চলে গেল।

আমি লাঠির কাণ্ডকারখানা দেখে আশ্চর্য হয়ে জিগ্‌গেস করলুম, "ভোঁদড়দা, এরকমের লাঠি কোথা থেকে জোগাড় করলে?"

বুড়ো চৌকি ছেড়ে উঠে বলল, "ভায়া, লাঠির বিবরণ এখন আরম্ভ করলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

লড়াই থেকে ফিরে এসে তোমায় লাঠির ইতিহাস একদিন ধীরেসুস্থে শুনিয়ে যাব।''

এই বলে বুড়ো চৌতলার ছাতে চলে গেল। সে রাত্রিতে আমার আর ঘুম হল না, হাতে মুখে একটু জল দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চৌকিতে বসে দুলতে লাগলুম।

এমন সময় পাড়ার মল্লিকবাবুদের বাড়ির পাঁচতলার উপরের সেই পাগলা ঘড়িটা তার এক চোখ লাল করে, কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে, হাত-পা ছুড়ে ঢং-ঢং-টঙা-ঢং করে বিশ পঁচিশটা বাজিয়ে দিয়ে ভালো মানুষটির মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে আমার সামনের বড়ো আয়নার ভিতর থেকে মোটা-সোটা হ্যাট-কোট-পরা একটা কুকুর একটা লাল কাঠের ঘোড়ায় চড়ে, টগবগ করে বেরিয়ে আমার সামনে এসে রাশ টেনে তার ঘোড়া থামাল। তারপর মিলিটারি কায়দায় মস্ত এক সেলাম করে বললে, ''আমার নাম বকমল, আমি ভোঁদড় মহারাজের প্রধান সেনাপতি। মহারাজের সৈন্যসামন্ত হাজির। তিনি আপনাকে খবর দিতে বললেন।''

এই বলে বকমল-সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে আবার আয়নার ভিতর দিয়ে কোথায় চলে গেল।

আমি অন্ধকারে সিঁড়ি ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে চৌতলার ছাতে গিয়ে দেখলুম, হাজার হাজার ভোঁদড়, বড়ো-বড়ো কেঁদো বেড়াল, নানা রকমের খরগোশ আর কাঠবেড়ালিতে আমাদের ছাত একেবারে ভরে গেছে। সকলেরই সিপাইদের মতো সাজ, লাল রঙের ইজের কোর্তা পরা, মাথায় নানা রকম রঙের পাগড়ি, কেউ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে, কারও হাতে তির-ধনুক, আবার কেউ বা লাঠি-সোটা নিয়ে কাতারে কাতারে চুপ করে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি বকমল-সাহেব তার ঘোড়ায় চড়ে ছাতময় ছুটোছুটি করে তার সৈনিকদের তদারক করে বেড়াচ্ছে।

ভোঁদড়দাদা আমায় দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললে, ''ওই দেখ, তোমার ছোটো বেলাকার টাট্টু ঘোড়াকে আনিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছি। তুমি তো হাঁটতে পারবে না, ওর পিঠে চড়ে গেলে তোমার কোনো কষ্ট হবে না।''

এতকাল জানতুম, আমার সেই ছেলেবেলাকার টাট্টু ঘোড়া কোন্ কালে মরে ভূত হয়ে গেছে, কিন্তু আজ তাকে হঠাৎ ছাতের মাঝখানে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলুতে লাগলুম। এক মাথা পাকা চুল নিয়ে বুড়ো বয়সে ওর পিঠে চড়তে কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে সেকালের কথা ভাবতে লাগলুম।

ভোঁদড়দা আমার মনের ভাব বুঝে আমার কাছে এসে বলল, ''কী ভায়া, বুড়ো বয়েসে খোলা ঘোড়ায় চড়তে লজ্জা হচ্ছে? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।''

এই বলে বুড়ো তার মখমলের কোটের পকেট থেকে একটা চমৎকার সোনার জিব বার করলে, তারপর তার ভিতর থেকে ডুমুরের মতো কী একটা ফল নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে, ''এই নাও একটা বিজলে-বউল, বেশ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেল, তারপর দেখা যাবে কী হয়।''

বিজলে-বউল যেমনি মুখে দেওয়া, আর অমনি দেখতে দেখতে আমি পাঁচ বছরের ছেলে হয়ে পড়লুম।

ভোঁদড়দাদা পকেট থেকে একটা আয়না বার করে আমার সামনে ধরলে। তাতে দেখলুম, আমার সমস্ত পাকা চুল কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। মাথার টাকটা যে কোথায় পালিয়েছে তার ঠিক নেই। আমার কামিজটা মেয়েদের ঘাঘরার মতো আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে, আর তার আস্তিন- দুটো পাখির ডানার মতো আমার কাঁধের দুদিকে হাওয়ায় উড়ছে। পায়ের তালতলার চটি জোড়া এত বড়ো হয়ে গেছে যে, তাতে করে অনায়াসে গঙ্গা পার হতে পারি। আমি এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে হতবুদ্ধি হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ভোঁদড়দাদা আমার হাত ধরে বললে ''আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলে কী হবে? এখন চলো আমার বাড়িতে, তোমার কাপড় বদলে আনিগে। আমার কাপড় তোমার গায়ে এখন ঠিক হবে।''

ভোঁদড়দাদার সঙ্গে ভাঙা পিল্পের ভিতর দিয়ে অনেকখানি নেমে গিয়ে তার বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এ রকম আগে কখনো দেখিনি। ঘোর নীল রঙের চকচকে চীনামাটির সাত-মহলা বাড়ি—চারিদিকে মস্ত

বাগান, তাতে নানা রকম রঙিন কাগজের গাছে কত রকমের সোলার ফুল যে ফুটেছে তার ঠিকানা নেই। খিড়কির পুকুরে এক পাল চীনেমাটির রাজহাঁস সাঁতার কেটে খেলে বেড়াচ্ছিল। আর রাজবাড়ির ফটকে খাড়া পাহারা দিচ্ছিল—টিনের বন্দুক ঘাড়ে করে রং করা কাঠের সেপাইরা। আমাদের দেখে একজন সেপাই ছুটে বাড়ির সদর দরজা খুলে দিয়ে সেলাম করে সরে দাঁড়াল।

ভোঁদড়দাদা আমায় একটা আয়না-মোড়া ঘরে নিয়ে গিয়ে আলমারি থেকে ভালো ভালো পোশাক বার করে আমায় সাজিয়ে দিলে। কোমরে একটা চকচকে তলোয়ার গুঁজে দিয়ে বললে, "এইবার চল, গিন্নির কাছে বিদায় নিয়ে আসিগে।"

একটা খুব সাজানো ঘরে গিয়ে দেখলুম ভোঁদড় গিন্নি সোনার পালঙ্কে উবুড় হয়ে পড়ে কাঁদছেন আর তার দুই মেয়ে উমনো আর ঝুমনো তার শিয়রে বসে পাখা করছে।

আমি ভোঁদড় গিন্নির কাছে গিয়ে বললুম "বৌঠাকরুন, তোমার কোনো ভয় নেই। চেয়ে দেখ, আমরা সেজেগুজে রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি—নিশ্চয় রাক্ষস ধরা পড়বে, এখন তুমি হাসিমুখে আমাদের বিদায় দিলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা করতে পারি।"

ভোঁদড়গিন্নি আমার কথায় মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে বসে বললেন, "একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে, কতকাল পরে আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছ, একটু কিছু মুখে না-দিয়ে গেলে লোকে কি বলবে? মহারাজ, তুমিও একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও।"

ভোঁদড়দাদা গিন্নির কাছে বসে বললে, "এখন তো খাওয়া-দাওয়া করবার সময় নয়, তা ছাড়া তুমি বোধহয় জানো না যে আমি রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করেছি রাক্ষসকে বধ না করে জলস্পর্শ করব না।"

গিন্নি তখন তার সোনার বাটা থেকে কতকগুলো তবকমোড়া পান বার করে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, "তবে এখন এস, কিন্তু নিচুয়া ফিরে এলে একদিন ধুমধাম করে এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে মনে থাকে যেন।"

আমরা পান চিবুতে-চিবুতে রাজবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে প্রকাণ্ড এক অজগর সাপের খোলসকে প্রণাম করে দুখানা আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়ালুম—রাজ পুরোহিত ইঁদুর মহাশয় সবুজ চেলির জোড় পরে, সোনার থালায় ধান দূর্বা নিয়ে খুব ঘটা করে আমাদের আশীর্বাদ করে, হাত জোড় করে আমাদের সামনে তার ল্যাজ নাড়তে লাগলেন। চাপকান-চোগা পরা দেওয়ানজি নেংটি বাহাদুর ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাদের হাতে গোটা দুই করে আকব্বরি বাদাম গুঁজে দিয়ে ফিসফিস করে বলে দিলেন, "পুরোহিত মহাশয়ের প্রণামী।" আমরা সেই পচা বাদাম নিয়ে পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই কোথা থেকে বেঁজি-আচার্যি ছুটে এসে এক জোড়া মরা ব্যাঙ আমাদের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে, "মরা ব্যাঙ যাত্রাকালে বড়োই শুভ লক্ষণ, অতএব মহারাজরা একটি বার এইদিকে দৃষ্টিপাত করুন, পথে কোনো অমঙ্গল হবে না।" আচার্য পেলেন রামচন্দ্রের আমলের এক টুকরো পনির।

ছাতে এসে এইবার ঘোড়ায় উঠলুম। ভোঁদড়দাদা কিংখাবের সাজ পরানো এক শাদা রামছাগলে চড়ে রাজছত্র মাথায় দিয়ে, ঝমঝম করে আমার পাশে এসে ভোঁ-ভোঁ করে ভেঁপু বাজিয়ে দিলে।

সেনাপতি সাহেব তার ঘোড়া ছুটিয়ে ছাতের মাঝখানে গিয়ে একটা মস্ত পাঁচরঙা নিশেন নেড়ে চিৎকার করে হুকুম দিলে, "মার্চ।" অমনি চারদিক থেকে কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল। মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি করলে, আগে আগে কাঠবেড়ালির দল ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চলল, তারপর খরগোশের দল তির-ধনুক নিয়ে চলল, তার পিছনে লাঠি-সোটা নিয়ে এক দল কুনো বেড়াল মার্চ করে চলে গেল। সব শেষে আমরা। ভোঁদড় সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাজনার তালে তালে "আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে—ঢাল মৃদং ঝাঁঝর বাজে" এই জাতীয় সংগীতটি গাইতে গাইতে কত রাস্তা, ঘাট, মাঠ পার হয়ে এসে একেবারে সেই কমলাপুলির ইস্টিশানে এসে পড়লুম।

স্টেশনমাস্টার টিয়ে সাহেব, গার্ড টুনটুনি সাহেব আর টিকিট-বাবুইরা সকলেই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমরা কাউকে কিছু না বলে কুইক মার্চ করে প্ল্যাটফরমে এসে ঢোকামাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল।

(অসমাপ্ত)

এক রাজার দুই রানি, দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানির বড়ো আদর, বড়ো যত্ন। সুওরানি সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুওরানি মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুক-ভরা সাত-রাজার-ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানি রাজার প্রাণ।

আর দুওরানি—বড়োরানি, তাঁর বড়ো অনাদর, বড়ো অযত্ন, রাজা বিষনয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা। এক দাসী দিয়েছেন—বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানির ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান। সুওরানি—ছোটোরানি, তাঁরই ঘরে রাজা বারো মাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও।

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস গেল। ছ-খানা জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন। মন্ত্রী এসে খবর দিলেন, মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন, কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন। ছোটোরানি—সুওরানি রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন, সাত সখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটোরানিকে বললেন, রানি, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কী আনব?

রানি ননির হাতে হীরের চুড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন—হীরের রং বড়ো সাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আট গাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন, আচ্ছা রানি, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানি রাঙা পা নাচিয়ে নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে বললেন, এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরন নিরেট সোনার দশ গাছা মল পাই তো পরি। রাজা বললেন, সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানি গলায় গজমতি হার দেখিয়ে বললেন, দেখ রাজা, এ মুক্তো বড়ো ছোটো, শুনেছি কোন্ দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারই এক জোড়া হার এনো। রাজা বললেন, সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব, আর কী আনব রানি?

তখন আদরিণী সুওরানি সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললেন, মাগো শাড়ি নয় তো বোঝা! আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি। রাজা বললেন, আহা, আহা, তাই তো রানি, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননির দেহে ব্যথা বেজেছে। রানি, হাসিমুখে বিদায় দাও, আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি আনি গে।

ছোটোরানি হাসিমুখে রাজাকে বিদায় করলেন। রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়বেন, মনে পড়ল দুখিনি বড়োরানিকে। দুওরানি, বড়োরানি, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন। ভাঙাঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন, বড়োরানি, আমি বিদেশ যাব। ছোটোরানির জন্যে হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্যে কী আনব? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে। রানি বললেন, মহারাজ ভালোয় ভালোয় তুমি ঘরে এলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পরে সাতমহল বাড়িতে হাজার হাজার আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানি হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুক-সারির পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেবার সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায় সোনার শাড়িতে কী কাজ? মহারাজ, আমি কার সোহাগে হীরের বালা হাতে পরব? মোতির মালা গলায় দেব? মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব? মহারাজ, সেদিন কী আর আছে! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরে দেবে না! আমার সে সাতশো দাসী সাত মহল বাড়ি তো ফিরে দেবে না! বনের পাখি এনে দেবে, কিন্তু মহারাজ, সোনার খাঁচা তো দেবে না! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে? মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ, তার সাধ মেটাও গে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন, না রানি, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে, বলো তোমার কী সাধ?

রানি বললেন, কোন্ লাজে গহনার কথা মুখে আনব? মহারাজ, আমার জন্যে পোড়ারমুখ একটা বাঁদর এনো।

রাজা বললেন, আচ্ছা রানি, বিদায় দাও।

তখন বড়োরানি—দুওরানি ছেঁড়া কাঁথায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধেবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীলজল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল। ভাঙাঘরে দুওরানি নীল সাগরের পারে চেয়ে ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে রইলেন। আর আদরিণী সুওরানি সাতমহল অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে

সোনার পাখির গান শুনতে শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনি বড়োরানিকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটোরানির সেই হাসিহাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন, এখন রানি কী করছেন? বোধ হয় চুল বাঁধছেন। এবার রানি কী করছেন? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানি সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানি মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। সোনার সুতো, ফুলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল, বসে বসে সারা রাত কেটে গেল, রানির চোখে ঘুম এল না।

সুওরানি, ছোটোরানি রাজার আদরিণী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়োরানি রাজার জন্যে পাগল, তার কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমনি করে জাহাজে দেশ-বিদেশে রাজার বারো মাস কেটে গেল। তেরো মাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের শান মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুওরানির চুড়ি গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রং ফুটে পড়ছে। রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাক্‌রার দোকানে নিরেট সোনার দশ গাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিন্‌কি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝংকার, মন্দিরার রিনিরিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকালবেলায় ফেলে দেন। দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে। রাজা এক জাহাজ রুপো দিয়ে সুওরানির গলায় দিতে সেই মুক্তোর এক ছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে, ছ-মাস পরে রাজা একদেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্তমণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারারাত ছাদে বসে আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ-মাস যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আজ সুওরানির শখের শাড়ি কিনলেন। তারপর আর ছ'মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছোটোরানির মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে ফিরে এল। তখন রাজার মনে পড়ল বড়োরানি বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, মন্ত্রীবর, বড়ো ভুল হয়েছে। বড়োরানির বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাঁদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে ছোটোরানির সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটোরানি সাত মহল বাড়ির সাততলার উপরে সোনাব আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা, সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে সোনার চেযাড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজল-লতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন, সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানি ছোটোরানির সেবা করছে, রাজা সেখানে এলেন। স্ফটিকের সিংহাসনে রানির পাশে বসে বললেন, এই নাও রানি, মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট, সেখান থেকে হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি,

সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে। সেই দেশের রানি মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানি, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানি, এক দেশের মেয়ে এক-খি রেশমে সাত-খি সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছটি মাসে একখানি শাড়ি বোনেন, একদিন পরে পুজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানি, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখ। পৃথিবী খুঁজে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখ।

রানি তখন দু-হাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন। মানিকের চুড়ি রানির হাতে ঢিলে হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানি তখন দু-পায়ে দশগাছা মল পরলেন, রাঙা পায়ে সোনার মল আলগা হল, দু-পা যেতে দশ গাছা মল শানের উপর খসে পড়ল। রানি মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন, মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানির গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানি ব্যথা পেলেন। সাত-পুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পড়লেন। নীল রেশমের নীল শাড়ি হতে বহরে কম পড়ল। রানির চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটোরানি আট হাজার মানিকের আট গাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশ গাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে বললেন, ছাই গহনা! ছাই এ শাড়ি! কোন্ গাঁয়ের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে! মহারাজ কোন্ দেশের ধুলোবালিতে এ মল গড়ালে। ছি ছি, কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! কোন্ রাজকন্যার পরা শাড়ি! দেখলে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা-শাড়ি পরা-গহনায় আমার কাজ নেই।

রানি অভিমানে গোঁসাঘরে খিল দিলেন। আর রাজা মলিন মুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন।

মন্ত্রী রাজসিংহাসনের এক পাশে, রাজ্যের মাঠ-ঘাট দোকানপাট সন্ধান করে, জাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে কানা-কড়ি দিয়ে একটি বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন!

রাজা এসে বললেন, মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম! মাপ দিয়ে ছোটোরানির গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে শাড়ি, সে গহনা, রানির গায়ে হল না।

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—বড়ো ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়া-রাজ্যের এ মায়া-গহনা মায়া-শাড়ি পরতে পায় না। মহারাজ, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখো, যাকে বউ করবে তাকে পরতে দিয়ো।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন। হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন, মন্ত্রী বানরটা বলে কী? ছেলেই হল না, বউ আনব কেমন করে? মন্ত্রী, তুমি স্যাকরার দোকানে ছোটোরানির নতুন গহনা গড়তে দাও গে, তাঁতির তাঁতে রানির শাড়ি বুনতে দেও গে। এ গহনা, এ শাড়ি, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখো। যদি বউ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব।

রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটোরানির নতুন গহনা গড়াতে গেলেন, আর রাজা সেই বাঁদর কোলে বড়োরানির কাছে গেলেন।

দুঃখিনি বড়োরানি, জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মহরাজ, বোসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বোসো। আমার আর কী আছে তোমায় বসতে দেব? হায় মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে, আমি এমনি অভাগিনি তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

রানির কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙাঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়োরানির কোলে বাঁদরছানা দিয়ে বললেন, মহারানি, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা ঘর, ছোটোরানির সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষ গুণ ভালো। তোমার এ ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টি কথা আছে, সেখানে তা তো নেই। রানি, সাত জাহাজ সোনা দিয়ে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি দিয়েছি, ছোটোরানি পায়ে ঠেলেছে। আর কানাকড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এনেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। রানি, আর আমি তোমায় দুঃখ দেব না। এখন

বিদায় দাও, আমি আবার আসব রানি। কিন্তু দেখ, ছোটোরানি যেন জানতে না পারে ! তোমার কাছে এসেছি শুনলে আর রক্ষে রাখবে না ! হয় তোমায়, নয়তো আমায়, বিষ খাওয়াবে।

রাজা বড়োরানিকে প্রবোধ দিয়ে গেলেন। আর বড়োরানি সেই ভাঙা ঘরে দুধকলা দিয়ে সেই বাঁদরের ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটোরানির সাত মহলে সাতশো দাসীর মাঝে দিন যায় ; আর বড়োরানির ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল। বড়োরানির যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল, মোটা চালের ভাত, মোটা সুতোর শাড়ি আর ঘুচল না। বড়োরানি সেই ভাঙা ঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের সাথি বনের বানরকে নিয়ে, ছোটোরানির সাত মহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়োরানিকে যখন দেখে তখনি রানির চোখে জল, একটি দিন হাসতে দেখে না।

একদিন বানর বললে, হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন ? তোর কীসের দুঃখ ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা ? ওখানে তোর কে আছে ?

রানি বললেন, ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে। আমার সাত মহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে, সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা ওই সাত মহল বাড়িতে রাজার ছোটোরানি আমার এক সতিন আছে। সেই রাক্ষসী আমার রাজাকে জাদু করে আমার সাত মহলা বাড়ি, সাতশো দাসী, সাত সিন্দুক গহনা কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে সোনার মন্দিরে সুখে আছে ; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙালিনি করেছে। ওরে বাছা, আমার কীসের দুঃখ ? আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বউ হলুম। সাতশো দাসী পেলুম, সাত মহল বাড়ি পেলুম, মনের মতো রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনারচাঁদ রাজপুত্র ? হায়, কত জন্ম কত পাপ করেছি, কত লোকের সাধে বাদ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এ জন্মে সোনার সংসার সতিনকে দিয়ে, রানির গরবে, স্বামীর সোহাগে রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙালিনি হয়েছি ! বাছারে, বড়ো পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা, বুকে সয়ে বেঁচে আছি !

দুঃখের কথা বলতে বলতে রানির চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানির কোলে উঠে বসে চোখের জল মুছে দিয়ে রানিকে বললে, মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাব, তোর সাত মহল বাড়ি দেব, সাতখানা মালঞ্চ দেব, সাতশো দাসী ফিরে দেব, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানি করে কোলে নিতে সোনার চাঁদ ছেলে দেব, তবে, আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি যদি তা করতে পারিস, তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল, তেমনি হবে।

বানরের কথায় রানির চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানি কেঁদে কেঁদে হেসে বললেন, ওরে বাছা, দেবতাব মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কী তপস্যা করে, কোন্ দেবতার বরে বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানি করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি ? বাছা থাক, আমার রাজা সুখে থাক ; আমার যে দুঃখ সেই দুঃখই থাক, তোর এ অসাধ্যসাধনে কাজ নেই। রাত হল, তুই ঘুম যা!

বানর বললে, না মা, আমার কথা না শুনলে ঘুম যাব না।

রানি বললেন, ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল। পূর্ব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্য জুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি, ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি, শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে বুকের কাছে, ঘুম যা।

বানর রানির বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানি ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটোরানির সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, রাজার পাশে রাত কাটল ; আর বড়োরানির জলে ঝড়ে, ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরা-খানায় নবৎ বাজল, রাজা-রানির ঘুম ভাঙল। রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজলে মুখ ধুয়ে, রাজবেশ

অঙ্গে পরে রাজ-দরবারে নেবে গেলেন। আর ছোটোরানি সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়োরানি কী করলেন? ভাঙা ঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানি উঠে বসলেন। এদিকে দেখলেন ওদিক দেখলেন, এপাশ দেখলেন, ওপাশ দেখলেন, বানর নেই! রানি এঘর খুঁজলেন ওঘর খুঁজলেন, ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন, বানর নেই। বড়োরানি কাঁদতে লাগলেন। বানর কোথা গেল?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানিকে একলা রেখে রাত না পোহাতে রাজ-দরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারিদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাই-সান্ত্রি, আশপাশে লোকের ভিড়। রানির বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে, সিপাই-সান্ত্রির হাত এড়িয়ে, রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে, মহারাজ, বড়ো সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন, ওরে বানর বলিস কী? একথা কি সত্য? বড়োরানি দুওরানি তার ছেলে হবে? দেখিস একথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুওরানিকেও কাটব।

বানর বলল, মহারাজ, সে ভাবনা আমার। এখন আমায় খুশি করো, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন। বানর নাচতে নাচতে ভাঙা ঘরে যেখানে দুওরানি পড়ে পড়ে কাঁদছেন, সেখানে গেল।

দুওরানির চোখের জল, গায়ের ধুলো মুছিয়ে বানর বললে, এই দেখ মার তোর জন্যে কী এনেছি! তুই রাজার রানি, গলায় দিতে হার পাসনে, কাঠের মালা কিনে পরিস, এই মুক্তোর মালা পর।

রানি বানরের হাতে গজমোতি হার দেখে বললেন, এই হার তুই কোথা পেলি? এ যে রাজার গলার গজমোতি হার। যখন রানি ছিলুম রাজার জন্যে গেঁথেছিলুম। তুই এ হার কোথা পেলি? বল বানর, রাজা কী এ হার ফেলে দিয়েছেন? রাজপথে কী কুড়িয়ে পেলি?

বানর বললে, না মা কুড়িয়ে পাইনি। তোর হাতে গাঁথা রাজার গলার গজমোতি হার কুড়িয়ে কি পাওয়া যায়?

রানি বললেন, তবে কী রাজার ঘরে চুরি করলি? বানর বললে ছি ছি মা, চুরি কি করতে আছে? আজ রাজাকে সুখবর দিয়েছি, তাই রাজা হার দিয়ে খুশি করেছেন।

রানি বললেন, ওরে বাছা, তুই যে দুঃখীর সন্তান, বনের বানর! ভাঙা ঘরে দুঃখিনির কোলে শুয়ে, রাজাকে দিতে কী সুখের সন্ধান পেলি যে রাত না পোহাতে রাজবাড়িতে ছুটে গেলি?

বানর বললে, মা আমি স্বপ্ন দেখেছি আমার যেন ভাই হয়েছে, তোর কোলে খোকা হয়েছে; সেই খোকা যেন রাজসিংহাসনে রাজা হয়েছে। তাই ছুটে রাজাকে খবর দিলুম, রাজা মহাশয়, মায়ের খোকা হবে। তাইতে রাজা খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলেন।

রানি বললেন, ওরে রাজা আজ শুনলেন ছেলে হবে, কাল শুনবেন মিছে কথা। আজ রাজা গলায় দিতে হার দিলেন, কাল যে মাথা নিতে হুকুম দেবেন! হায় হায় কী করলি? এক মুঠো খেতে পাই, এক পাশে পড়ে থাকি, তবু বছর গেলে রাজার দেখা পাই, তুই আমার তাও ঘোচালি? ওরে তুই কী সর্বনাশ করলি? মিছে খবর কেন রটালি? এ জঞ্জাল কেন ঘটালি?

বানর বললে, মা তোর ভয় কী? ভাবিস কেন? এ দশ মাস চুপ করে থাক, সবাই জানুক, বড়োরানির ছেলে হবে। তারপর রাজা যখন ছেলে দেখতে চাইবেন, তখন তোর কোলে সোনারচাঁদ ছেলে দেব, তুই রাজাকে দেখাস। এখন চল। বেলা হল, খিদে পেয়েছে। রানি বললেন, চল বাছা চল। বাটি পুরে জল রেখেছি, গাছের ফল এনেছি, খাবি চল। রানি ভাঙা পিঁড়েয় বানরকে খাওয়াতে বসলেন।

আর রাজা ছোটোরানির ঘরে গেলেন। ছোটোরানি কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে সোনার পালঙ্কে বসে বসে ভাবছেন, এমন সময় রাজা এসে খবর দিলেন, আরে শুনছ ছোটোরানি, বড়রানির ছেলে হবে! বড়ো ভাবনা ছিল রাজসিংহাসন কাকে দেব, এতদিনে ভাবনা ঘুচল। যদি ছেলে হয় তাকে রাজা করব, আর যদি মেয়ে হয়, তবে তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দেব। রানি, বড়ো ভাবনা ছিল, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

রানি বললেন, পারিনে বাপু, আপনার জ্বালায় বাঁচিনে, পরের ভাবনা! রাজা বললেন, সে কী রানি?

এমন সুখের দিনে এমন কথা বলতে হয়? রাজপুত্র কোলে পাব, রাজসিংহাসনে রাজা করব, একথা শুনে মুখ ভার করে? রানি, রাজবাড়িতে সবার মুখে হাসি, তুমি কেন অকল্যাণ কর?

রানি বললেন, আর পারিনে! কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে রাজসিংহাসনে বাসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে। নিজের জ্বালায় মরি, পরের ছেলে মোল বাঁচল তার খবর রাখিনে। বাবারে, সকালবেলা বকে বকে ঘুম হল না, মাথা ধরল, যাই নেয়ে আসি।

রাগভরে ছোটোরানি আট গাছা চুড়ি, দশ গাছা মল ঝমঝমিয়ে এক দিকে চলে গেলেন।

রাজার বড়ো রাগ হল, রাজকুমারকে ছোটোরানি মর বললে! রাজা মুখ আঁধার করে বার-মহলে চলে এলেন। রাজা-রানিতে ঝগড়া হল। রাজা আর ছোটোরানির মুখ দেখলেন না, বড়োরানির ঘরেও গেলেন না, ছোটোরানি শুনে যদি বিষ খাওয়ায়, বড়ো রানিকে প্রাণে মারে! রাজা বার-মহলে একলা রইলেন।

এক মাস গেল, দু-মাস গেল, দু-মাস গিয়ে তিন মাস গেল, রাজা-রানির ভাব হল না। ঝগড়ায় ঝগড়ায় চার মাস কাটল। পাঁচ মাসে দুওরানির পোষা বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন, কী হে বানর, খবর কী?

বানর বললে, মহারাজ, মায়ের বড়ো দুঃখ। মোটা চালের ভাত মুখে রোচে না, মা আমার না খেয়ে কাহিল হলেন।

রাজা বললেন, একথা তো আমি জানিনে। মন্ত্রীবর, যাও এখুনি সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, সোনার থালে সোনার বাটিতে বড়োরানিকে পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমি যা খাই বড়োরানিও তাই খাবেন। যাও মন্ত্রী, বানরকে হাজার মোহর দিয়ে বিদায় করো।

মন্ত্রী বানরকে বিদায় করে রান্না-ঘরে গেলেন। আর রানির বানর মোহরের তোড়া নিয়ে রানির কাছে এল। রানি বললেন, আজ আবার কোথা ছিলি? এতখানি বেলা হল নাইতে পেলুম না, রাঁধব কখন, খাব কখন?

বানর বললে, মা আর তোকে রাঁধতে হবে না, রাজবাড়ি থেকে সোনার থালায় সোনার বাটিতে সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আসবে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়

রানি নাইতে গেলেন। বানর এক মুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোলো খান মোহরে ষোলো জন ঘরামি নিলে, ষোলো গাড়ি খড় নিলে, ষোলোশো বাঁশ নিলে। সেই ষোলোশো বাঁশ দিয়ে, ষোলো গাড়ি খড় দিয়ে ষোলোজন ঘরামি খাটিয়ে চক্ষের নিমেষে দুওরানির বানর ভাঙা ঘর নতুন করলে। শোবার ঘরে নতুন কাঁথা পাতলে, খাবার ঘরে নতুন পিঁড়ি পাতলে, রাজবাড়ির ষোলো বামুনে রানির ভাত নিয়ে এল; ষোলো মোহর বিদায় পেলে।

দুওরানি নেয়ে এলেন। এসে দেখলেন, ঘর নতুন! ঘরে চাল নতুন! চালের খড় নতুন! মেঝেয় নতুন কাঁথা! আলনায় নতুন শাড়ি! রানি অবাক হলেন। বানরকে বললেন, বাছা, ভাঙা ঘর দেখে ঘাটে গেলুম, এসে দেখি নতুন ঘর! কেমন করে হল? বানর বলল,—মা, রাজামশায় মোহর দিয়েছেন। সেই মোহরে ভাঙা ঘর নতুন করেছি, ছেঁড়া কাঁথা নতুন করেছি, নতুন পিঁড়ে পেতেছি, তুই সোনার থালে গরম ভাত, সোনার বাটিতে তপ্ত দুধ খাবি চল।

রানি খেতে বসলেন। কতদিন পরে সোনার থালায় ভাত খেলেন, সোনার ঘটিতে মুখ ধুলেন, সোনার বাটায় পান খেলেন, তবু মনে সুখ পেলেন না। রানি রাজভোগ খান আর ভাবেন, আজ রাজা সোনার থালে ভাত পাঠলেন, কাল হয়তো মশানে নিয়ে মাথা কাটবেন।

এমনি করে ভয়ে-ভয়ে এক মাস, দু-মাস, তিন মাস গেল। বড়োরানির নতুন ঘর পুরোনো হল, ঘরের চাল ফুটো হল, চালের খড় উড়ে গেল। বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন, কী বানর, কী মনে করে?

বানর বললে, মহারাজ, ভয়ে কব, না নির্ভয়ে কব?

রাজা বললেন, নির্ভয়ে কও।

বানর বললে, মহারাজ ভাঙা ঘরে মা আমার বড়ো দুঃখ পান। ঘরের দুয়োর ফাটা, চালে খড় নেই! শীতের হিম ঘরে আসে। মা আমার গায়ে দিতে নেপ পান না, আগুন জ্বালাতে কাঠ পান না, সারা রাত শীতে কাঁপেন। রাজা বললেন, তাইতো—তাইতো! একথা বলতে হয়।

বানর তোর মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আয়, আমি মহল সাজাতে বলি।

বানর বললে, মহারাজ, মাকে আনতে ভয় হয়, ছোটোরানি বিষ খাওয়াবে।

রাজা বললেন, সে ভয় নেই। নতুন মহলে রানিকে রাখব, মহল ঘিরে গড় কাটাব, গড়ের দুয়ারে পাহারা বসাব, ছোটোরানি আসতে পাবে না। সে মহলে বড়োরানি থাকবেন, বড়োরানির বোবাকালা দাই থাকবে, আর বড়োরানির পোষা ছেলে তুই থাকবি।

বানর বললে, মহারাজ, যাই তবে মাকে আনি।

রাজা বললেন, যাও মন্ত্রী, মহল সাজাও গে।

মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ লোক লাগিয়ে একদিনে বড়োরানির নতুন মহল সাজালেন। দুওরানি ভাঙাঘর ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে সোনার শাড়ি পরে নতুন মহলে এলেন। সোনার পালঙ্কে বসলেন, সোনার থালে ভাত খেলেন, দীনদুঃখীকে দান দিলেন, রাজ্যে জয় জয় হল, রাগে ছোটোরানির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। ডাকিনি-ব্রাহ্মণী, ছোটোরানির 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু। ছোটোরানি বলে পাঠালেন, মনের কথাকে আসতে বলো, কথা আছে।

রানি ডেকেছেন, ডাকিনি-বুড়ি তাড়াতাড়ি চলে এল। রানি বললেন, এসো ভাই মনের কথা, কেমন আছ? কাছে বোসো। ডাকিনি-ব্রাহ্মণী ছোটোরানির পাশে বসে বললে, কেন ভাই ডেকেছ কেন? মুখখানি ভার-ভার, চোখের কোণে জল, হয়েছে কী?

রানি বললেন, হয়েছে আমার মাথা আর মুন্ডু! সতিন আমার ঘরে ঢুকেছে, সে সোনার শাড়ি পরেছে, নতুন মহল পেয়েছে, রাজার প্রেয়সী রানি হয়েছে। ভিখারিনি দুওরানি এতদিনে সুওরানির রানি হয়ে রাজমহল জুড়ে বসেছে। বামুন সই, দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল, আমায় বিষ দে খেয়ে মরি, সতিনের এ আদর প্রাণে সয় না!

ব্রাহ্মণী বললে, ছি-ছি! সই, ও কথা কি মুখে আনে? কোন্ দুঃখে বিষ খাবে? দুওরানি আজ রানি হয়েছে, কাল ভিখারিনি হবে, তুমি যেমন সুওরানি তেমনি থাকবে।

সুওরানি বললেন, না ভাই, বাঁচতে আর সাধ নেই। আজ বাদে কাল দুওরানির ছেলে হবে, সে ছেলে রাজা হবে! লোকে বলবে, আহা, দুওরানি রত্নগর্ভা, রাজার মা হল! আর দেখ না, পোড়ামুখী সুওরানি মহারাজার সুওরানি হল, তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেল না! ছি-ছি! অমন অভাগির মুখ দেখে না, নাম করলে সারাদিন উপোস যায়! ভাই এ গঞ্জনা প্রাণে সবে না। তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতিনকে খাওয়াই।

ব্রাহ্মণী বললে, চুপ, করো রানি, কে কোন্‌দিকে শুনতে পাবে। ভাবনা কী? চুপি চুপি বিষ এনে দেব, দুওরানিকে খেতে দিয়ো। এখন বিদায় দাও, বিষের সন্ধানে যাই।

রানি বললেন, যাও ভাই। কিন্তু দেখো, বিষ যেন আসল হয়, খেতে না খেতে বড়োরানি ঘুবে পড়বে।

ডাকিনি বললে, ভয় নেই গো, ভয় নেই! আজ বাদে কাল বড়োরানিকে বিষ খাওয়াব, জন্মের মতো মা হবার সাধ ঘোচাব, তুমি নির্ভয়ে থাকো।

ডাকিনি বিষের সন্ধানে গেল! বনে বনে খুঁজে খুঁজে ভর সন্ধ্যাবেলা ঝোপেব আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল।

ছোটোরানি সেই বিষ মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়ালেন। একখানা থালা সাজিয়ে ডাকিনি ব্রাহ্মণীকে বললেন, ভাই এক কাজ কর, এই বিষের নাড়ু বড়োরানিকে বেচে আয়।

ব্রাহ্মণী থালা হাতে বড়োরানির নতুন মহলে গেল। বড়োরানি বললেন, আয় লো আয়, এতদিন কোথায় ছিলি? দুওরানি বলে কি ভুলে থাকতে হয়? ডাকিনি বললে, সে কী গো! তোমাদের খাই তোমাদের পরি তোমাদের কি ভুলতে পারি? এই দেখ, তোমার জন্য যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই এনেছি। রানি দেখলেন, বুড়ি ব্রাহ্মণী বড়ো যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে। খুশি হয়ে তার দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন, ব্রাহ্মণী হাসতে হাসতে চলে গেল।

রানি ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল। মতিচুর মেঠাই খেলেন, বুক যেন জ্বলে গেল। বানরকে ডেকে বললেন, ব্রাহ্মণী আমায় কী খাওয়ালে! গা কেমন করছে, বুঝি আর বাঁচব না!

বানর বললে, চল্ মা, খাটে শুবি, অসুখ সারবে।

রানি উঠে দাঁড়ালেন, সাপের বিষ মাথায় উঠল। রানি চোখে আঁধার দেখলেন, মাথা টলে গেল, সোনার প্রতিমা শানের উপর ঘুরে পড়লেন। বানর রানির মাথা কোলে নিয়ে, হাত ধরে নাড়ি দেখলে, চোখের পাতা খুলে দেখলে, রানি অজ্ঞান, অসাড়।

বানর সোনার প্রতিমা বড়োরানিকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের সন্ধানে বনে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কী লতাপাতা, কোন্ গাছের কী শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়োরানিকে খাওয়াতে লাগল।

রাজবাড়িতে খবর গেল, বড়োরানি বিষ খেয়েছেন। রাজা উঠতে-পড়তে রানির মহলে এলেন। রাজমন্ত্রী ছুটতে ছুটতে সঙ্গে এলেন। রাজবৈদ্য মন্তর আওড়াতে আওড়াতে তারপর এলেন। তারপর রাজার লোক-লশকর দাসী-বাঁদি যে যেখানে ছিল হাজির হল।

বানর বললে, মহারাজ, এত লোক কেন এনেছ? আমি মাকে ওষুধ দিয়েছি, মা আমার ভালো আছেন, একটু ঘুমোতে দাও। এত লোককে যেতে বলো।

রাজা বিষের নাড়ু পরখ করিয়ে রাজবৈদ্যকে বিদায় করলেন। রাজ্যের ভার দিয়ে রাজমন্ত্রীকে বিদায় করলেন। বড়োরানির মহলে নিজে রইলেন।

তিন দিন তিন রাত বড়োরানি অজ্ঞান। চার দিনে জ্ঞান হল, বড়োরানি চোখ মেলে চাইলেন। বানর রাজাকে এসে খবর দিলে, মহারাজ, বড়োরানি সেরে উঠেছেন, তোমার একটি রাজচক্রবর্তী ছেলে হয়েছে।

রাজা বানরকে হীরের হার খুলে দিয়ে বললেন, চলো বানর, বড়োরানিকে আর বড়োরানির ছেলেকে দেখে আসি।

বানর বললে, মহারাজ, গণনা করেছি ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে। ছেলের বিয়ে হলে মুখ দেখো, এখন বড়োরানিকে দেখে এসো। ছোটোরানি কী দুর্দশা করেছে!

রাজা দেখলেন, বিষের জ্বালায় বড়োরানির সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে, রানি পাতাখানার মতো পড়ে আছেন, রানিকে আর চেনা যায় না!

রাজা রাজবাড়িতে এসে ছোটোরানিকে প্রহরীখানায় বন্ধ করলেন, আর ডাকিনি-বুড়িকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে উল্টো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন। তারপর হুকুম দিলেন, মন্ত্রীবর, আজ বড়ো শুভদিন, এতদিন পরে রাজচক্রবর্তী ছেলে পেয়েছি। তুমি পথে পথে আলো জ্বালাও, ঘরে ঘরে বাজি পোড়াও, দীন-দুঃখী ডেকে, রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও, রাজ্যে যেন একটি ভিখারি না থাকে!

মন্ত্রী রাজার আজ্ঞায় নগরের পথে পথে আলো দিলেন, ঘরে ঘরে বাজি পোড়ালেন, দীন-দুঃখীকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেন, রাজ্যে জয়-জয়কার হল।

এমনি করে নিত্য নতুন আমোদ, দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল।

রাজা বানরকে ডেকে বললেন, দশ বৎসর তো পূর্ণ হল এখন ছেলে দেখাও! বানর বললে, মহারাজ, আগে ছেলের বউ ঠিক করো, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখো। এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে।

রাজা বানরের কথায় দেশবিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে পাটলী দেশের রাজার ভাট সোনার কৌটায় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল। কন্যার অঙ্গের বরন কাঁচা সোনা, জোড়া ভুরু—বাঁকা-ধনু, দুটি চোখ টানাটানা, দুটি ঠোঁট হাসি-হাসি, এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায়ে পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল। বানরকে ডেকে বললেন, ছেলের বউ ঠিক করেছি; কাল শুভদিনে শুভলগ্নে বিয়ে দিতে যাব। বানর বললে, মহারাজ, কাল সন্ধ্যাবেলা, বেহারা দিয়ে বরের পালকি মায়ের দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়ো, বরকে নিয়ে বিয়ে দিতে যাব।

রাজা বললেন, দেখো বাপু, দশ বৎসর তোমার কথা শুনেছি, কাল ছেলে না দেখালে অনর্থ করব।

বানর বললে, মহারাজ, সে ভাবনা নেই। তুমি বেহাই-বাড়ি চলে যাও; আমরা কাল বর নিয়ে যাব।

রাজা পাছে রানির ছেলেকে দেখে ফেলেন, পাছে চক্ষু অন্ধ হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেহাই-বাড়ি চলে গেলেন। আর বানর নতুন মহলে বড়োরানির কাছে গেল।
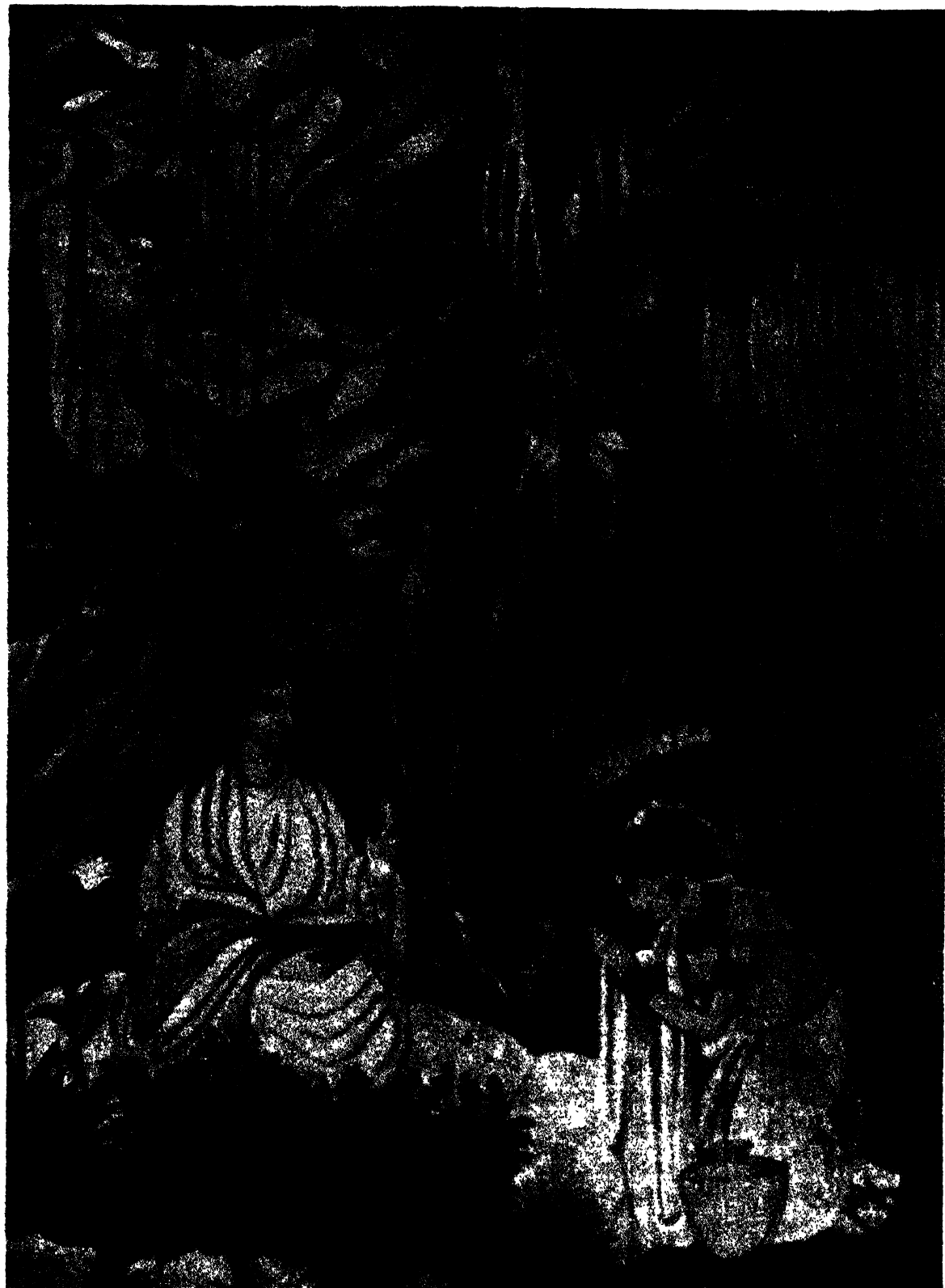
বুদ্ধ ও সুজাতা

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়োরানি ছেলের বিয়ে শুনে অবধি পড়ে পড়ে কাঁদছেন আর ভাবছেন, ছেলে কোথা পাব। এবার রাজাকে কী ছলে ভোলাব।

বানর এসে বললে, মা গো মা ওঠ। চেলির জোড় আন, মাথার টোপর আন, ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি। রানি বললেন, বাছারে, প্রাণে কি তোর ভয় নেই ? কোন্ সাহসে ক্ষীরের পুতুলের বর সাজিয়ে বিয়ে দিতে যাবি ? রাজাকে কী ছলে ভোলাবি ? বাছা কাজ নেই, ছল করে রাজার প্রেয়সী হলুম, সেই পাপে সতিন বিষ খাওয়ালে, ভাগ্যে-ভাগ্যে বেঁচে উঠেছি, আবার কোন্ সাহসে রাজার সঙ্গে ছল করব? বাছা ক্ষান্ত দে, কেন আর পাপের বোঝা বাড়াস? তুই রাজাকে ডেকে আন, আমি সব কথা বলি। বানর বললে, রাজাকে পাব কোথা? দু-দিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বড়ো অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীব কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস যেঠেব বাছা কোলে পাবি।

রানি বানরের ভরসায় বুক বেঁধে মনের মতো ক্ষীরের ছেলে গড়লেন। তাকে চেলির জোড় পরালেন, সোনার টোপর পরালেম, জরির জুতো পায়ে দিলেন। বানর চুপিচুপি ক্ষীরের বর পালকিতে তুলে রঙিন ঢাকা নামিয়ে দিলে, বরের কেবল দুখানি ছোটো পা, দু-পাটি জরির জুতো দেখা যেতে লাগল।

ষোলোজন কাহার বরের পালকি কাঁধে তুললে। বানর মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাদর বেঁধে, নিশেন উড়িয়ে, ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে গেল। রানি আঁধার পুরে একলা বসে বিপদভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাক ঢোল নিয়ে ঢাকি ঢুলি, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রী—সারা রাত বাঁশি বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিগনগরে এসে পড়ল।

দিগনগরে দিঘির ধারে ভোর হল। মশাল পুড়ে পুড়ে নিভে গেল, ঘোড়া ছুটে ছুটে বেদম হল, কাহার পালকি বয়ে হয়রান হল, ঢাক পিটে পিটে ঢাকির হাতে খিল ধরল।

বানর দিঘির ধারে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলে। দিঘির ধারে ষষ্ঠীতলায় বরের পালকি নামিয়ে কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে, মন্ত্রীমশাই, রাজার হুকুম বরকে যেন কেউ না দেখে, আজকের দিনে বর দেখলে বড়ো অমঙ্গল।

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন দিঘির জলে নেয়ে, রেঁধে-বেড়ে খেয়ে তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল না। গাঁয়ের বউ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুনের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারা হাঁকিয়ে দিলে।

সেদিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকরুনের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকরুন খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি করে বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুনের মুখে জলবিন্দু পড়ল না. ঠাকরুন কাঠামোর ভিতর ছটফট করতে লাগল। বানর তখন মনে মনে ফন্দি এঁটে পালকির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুন ভাবলেন, আঃ আপদ গেল। কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, পালকিব ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুন আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে মনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগনগবে যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি সারারাত দিগনগরে ষষ্ঠীর দাস ষেঠের বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুনের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগনগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন, ঠাকরুন, দিনে-দুপুরে ডেকেছেন কেন? ঠাকরুন বললেন, বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুনের কথায় মাসিপিসি মায়া করলেন, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে

খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, দিগনগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসিপিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন, জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়ালকুকুর, দিঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানির বানর। আর জেগে রইল ষষ্ঠীর দাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুন তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠ-বেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদবেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল!

ষষ্ঠীঠাকরুন ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে ক্ষীরের দুটি কান মাসিপিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসিপিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগনগরে দিঘির ঘাটে বর-যাত্রীর ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুন তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বনের গাছ থেকে বানর লাফিয়ে পড়ে বললে, ঠাকরুন, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশবিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুন ভয় পেয়ে বললেন, আঃ মর! এ মুখপোড়া বলে কী! সর সর আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে! বানর বললে, তা হবে না, আগে ছেলে দাও, তবে ছেড়ে দেব। নয় তো কাঠামো সুদ্ধ আজ তোমায় দিঘির জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুন লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, বাছা চুপ কর, কে কোন্ দিকে শুনতে পাবে! তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি, ফিরে পাব কোথা? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুওরানি তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে, কই ঠাকরুন, বটতলায় তো ছেলেরা নেই! আমায় দিব্যচক্ষু দাও, তবে তো ষষ্ঠীর দাস ষেঠের বাছাদের দেখতে পাব!

ষষ্ঠীঠাকরুন বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে, ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে, ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলেস্থলে, পথে-ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেই দিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে ছেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুমঝুম করছে, কেউ বা পায়ের নূপুর বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা-রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টকবক হাঁকাচ্ছে, একদল দিঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল তলায় ফুল কুড়চ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে, চারিদিকে খেলাধুলো, মারামারি, হাসিকান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য! সেখানে কেবল ছুটো-ছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল, তার ধারে সব বন, তেপান্তর মাঠ, তারপরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়ে পাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খইয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তিগাছটি, তাতে জন্তিফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড়দেশের সোনার ময়ূর পথেঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীল ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলাফুলির দেশে পুঁটুরানির বিয়ে দিতে যাচ্ছে।

বানর কমলাফুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচমেচ করে, আর সে দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে। সে এক নতুন দেশ, সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিকচিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি

গুনতে গুনতে মাছ ধরতে এসেছে, কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে, জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে—এমন সময় টাপুর-টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল, অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্ পাড়ায় কোন্ ঘরের কোণে ফিরে গেলে। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিকচিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে, এক কন্যে রাঁধলেন বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তার সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটে দু-পাশে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা দিয়ে যে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়োরে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা। বানর দেখলে, ছেলেটি বড়ো সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে। অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন্ দেশে উঠে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন্ দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানিকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুলগাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল, দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল।

বানর দেখলে, কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুন, কোথায় কে' বটতলায় দিঘির ধারে ছেলে কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে। তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পালকি চড়িয়ে আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যাবেলা দিগনগর ছেড়ে গেল।

এদিকে পাটলি দেশে বেহাইবাড়ি বসে বসে রাজা ভাবছেন, বানর এখনও এল না? আমার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব।

বিয়ের কনেটি ভাবছে, না জানি বর দেখতে কেমন? কনের মা-বাপ ভাবছে, আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে! রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব। এমন সময় গুরু গুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ পোঁ বাঁশি বাজিয়ে, টকবক ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝকমক আলো জ্বালিয়ে বানর বর নিয়ে এল।

রাজা ছেলের হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে দিলেন, পাড়া-পড়শি বরকে বরণ করলে, দাসদাসী শাঁখ বাজালে, উলু দিলে, বরকনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরদিন বউ ছেলে নিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে, বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। পাটলি দেশের রাজার বাড়ি এক রাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

এদিকে রাজার দেশে বড়োরানি দু-দিন দু-রাত কেঁদে কেঁদে ভেবে ভেবে ভোরবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন, ষষ্ঠীঠাকরুন বলছেন, রানি ওঠ, চেয়ে দেখ তোর কোলের বাছা ঘরে এল।

রানি ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে, ওঠো গো রানি, ওঠো, পাটের শাড়ি পরো, বউ-বেটা বরণ করো গে! রানি পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বউ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষীরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্য ভেবে ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বউকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আট গাছি চুড়ি, দশশো ভরি সোনার সেই দশ গাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগাল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটোরানি বুক ফেটে মরে গেল।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার নাম হবুচন্দ্র। আর, তাঁর যে মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম গবুচন্দ্র।

রাজা ছিলেন বুদ্ধির জালা, আর মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধির তালগাছ।

দুজনে কেউ কাউকে ছাড়া থাকেন না।

রাজা-মন্ত্রীর বুদ্ধিতে, রাজ্যে অবিচার হইবার জো নাই। রাজা হো হো করিয়া হাসেন, মন্ত্রী খো খো করিয়া কাশেন; দিনের বেলায় ঘুমান, রাত্রি হইলে যত বুদ্ধি আঁটেন। "হো! হো!" "হা! হা!"—দুজনের বুদ্ধি দেখিয়া দুজনে বাহা বাহা করেন।

রাজা-মন্ত্রীর বুদ্ধির চোটে রাজ্য অস্থির হইয়া উঠিল। রাজা রাজ্যের চারিদিকে দেয়াল তুলিয়া দিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। নাকে কানে তুলার ছিপি দিয়া মন্ত্রী সভায় বসিতে লাগিলেন। কী—জানি!—এমন বুদ্ধি, তার একটুকুও যদি বাহির হইয়া যায়।

একদিন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে রাজবাড়ির পাশ দিয়া এক শূকর যায়। রাজা দেখিয়া বলিলেন, "মন্ত্রী, ও কী যায়?" মন্ত্রী অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, সর্বনাশ! মাহুত বেটারা তো সব চোর! ওটা রাজবাড়ির হাতি, না খাইতে পাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া ছোটো হইয়া গিয়াছে।"

অমনি রাজা সব বেটা মাহুতকে আনিয়া কয়েদ করিলেন। আবার কতদিন পরে শূকরটা সেইখান দিয়া যায়। রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী! হাতিটা তো এখনও বড়ো হইল না!" মন্ত্রী আবার দেখিয়া টেখিয়া বলিলেন, —"মহারাজ! রাজ্য তো ছারেখারে গেল! এতদিনে ওর শুঁড় গজাইল না, ওটা নিশ্চয় রাজবাড়ির ইঁদুর, রোজ রাজভাণ্ডার লুটিয়া খাইয়া খাইয়া ইঁদুর মোটা হইয়া গিয়াছে।"

সর্বনাশ! রাজভাণ্ডার কি ছারেখারে যাইবে?

যত সিপাইর ডাক পড়িল। তখনই সব বেটা সিপাইর গর্দান! এত বুদ্ধি খরচ করিয়া, যা হোক, রাজভাণ্ডার রক্ষা পাইল। ভারি পরিশ্রম হইয়া গিয়াছে। রাজা মন্ত্রী হাওয়া-কুঠরিতে বসিয়া হাওয়া খাইতেছেন।

এমন সময়, অনেক দূর হইতে কয়েকজন বিদেশি লোক আসিয়াছে, তাহারা রাজবাড়ির পুকুরপাড়ে দেখিল, পরিষ্কার ঠাঁই। দেখিয়া সেইখানে তাহারা পাকসাক করিয়া খাইবে ঠিক করিল। একজন কাঠ কুড়াইতে লাগিল, একজন উনুন খুঁড়িতে বসিল, আর সকলে আর সব আয়োজন করিতে লাগিল।

হাওয়া-কুঠরি হইতে দেখিতে পাইয়া রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী! পুকুরপাড়ে ও কী? অত লোক কেন দেখ তো।" মন্ত্রী এ জানালা ও দরজা, ও জানালা সে দরজা দিয়া ঝুঁকি দিয়া গলা বাড়াইয়া কাৎ হইয়া বে—শ করিয়া দেখিয়া টেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"মহারাজ! ভয়ানক সর্বনাশ! রাজ্য গেল! কোথা থেকে কতকগুলি লোক আসিয়া পুকুর তো চুরি করিয়া নিল!—ওই দেখুন সিঁদ কাটিতেছে!"

রাজাও দেখেন—তাই তো!

লোকেরা উনুন খুঁড়িতেছিল কিনা? রাজা মন্ত্রী ভাবিলেন সিঁদ কাটিয়া পুকুর চুরি করিতেছে!

অমনি—"ধর! ধর"—

রাজদুয়ারে ডঙ্কায় কাঠি পড়িল। ঢাল তরোয়াল নিয়া যত সিপাই ছুটিল। লোকগুলোকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ধরিয়া আনিল।

তখনই শূলে!

রাজ্য গিয়াছিল আর কী!

আজ পুকুর চুরি, কাল রাজ্য চুরি করিত!

বুদ্ধি ছিল বলিয়া রক্ষা!

এত বুদ্ধি খরচ করিয়া, রাজা, মন্ত্রী, তাড়াতাড়ি ঘুমাইতে গেলেন।

(২)

এক সন্ন্যাসী আর তার শিষ্য, নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে আসিল সেই রাজ্যে।

দুপুর রৌদ্র। পুকুরপাড়ে সুন্দর বটগাছ; দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"শিষ্য, এসো এখানে একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করি।" শিষ্য ভারি খুশি, বিশ্রাম তো হইবেই, আবার টিশ্রামও! সন্ন্যাসী খুঁজিয়া টুজিয়া দেখেন, সঙ্গে শুধু দুটি পয়সা, শিষ্যকে কিছু খাওয়াইতে হইবে, নিজেও স্নান করিয়া কিছু জল টল খাইবেন। পয়সা দুটি শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন,—"বাছা, তোমার জন্য এক পয়সার মুড়ি আর আমার জন্য এক পয়সার মিশ্রি নিয়ে এসো।"

শিষ্যের খুব রাগ হইল। শিষ্য মনে মনে বলিতে লাগিল,—"ভাবিলাম ভালো করিয়া বিশ্রাম টিশ্রাম হইবে। তা শেষে এই?—এতে আমার কী হইবে? দু-দুদিন পর, শুধু কিনা এক পয়সার টিশ্রাম!"

কী করিবে, বিড় বিড় করিতে করিতে শিষ্য গেল। সন্ন্যাসী, স্নান ধ্যান করিয়া বাঘছালখানা গাছতলে পাতিয়া বসিলেন। কতক্ষণ পর, এক মস্ত ভাঁড় হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে শিষ্য ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত।—

"—ঠাকুর, ঠাকুর, আমরা কি স্বর্গে এলাম?"

"সে কী!" —সন্ন্যাসী অবাক। বলিলেন,—"সে কী বাছা শিষ্য; ও তোমার ভাঁড়ে কী?"

আর শিষ্য! শিষ্য আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল, —"আর কী! মুড়ি মিশ্রি কে খায়? এখানে এক পয়সায় পাঁচ সের মুড়ি, রসগোল্লাও এক পয়সায় পাঁচ সের। পেট পুরিয়া রসগোল্লা খাইলাম। আপনি বলিলেন মিশ্রি, তাই আপনার জন্য এক পয়সাব মিশ্রি আনিয়াছি—পাঁচ সের! এখানে মুড়ি মিশ্রি ক্ষীর ছানা সন্দেশ রসগোল্লা সব সমান। ঠাকুর, নিশ্চয়ই স্বর্গ! ঠাকুর, আজ এতদিনে আমরা স্বর্গে আসিয়াছি!"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"শিষ্য, বাছা, ও ভাঁড় ওইখানেই বাখ। শীঘ্র চল, শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পালাও। মুড়ি মিশ্রির সমান দর। এ নিশ্চয় কোনো মূর্খের দেশ; এ দেশে আর এক মুহূর্তও থাকিতে নাই!"

বলিয়া, সন্ন্যাসী তখনই উঠিয়া পড়িলেন।

আর শিষ্য? শিষ্য তলপির কাছে বসিয়া পড়িয়া ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—"ঠাকুর গো! ক্ষীর ছানা সন্দেশে প্রাণটা যে আমার জুড়াইবে গো! এমন স্বর্গ ছাড়িয়া আবার কোথায় যাইব গো!"

সন্ন্যাসী কত বুঝাইতে লাগিলেন। পেটুক শিষ্য কিছুতেই বুঝিল না। শিষ্য, স্বর্গের মাটি ধরিয়া শুইয়া পড়িল। একবার স্বর্গ পাইয়াছে, সে কি আর স্বর্গ ছাড়ে?

কী করিবেন সন্ন্যাসী? বলিলেন, "বাছা, আমার কথা শুনিলে না, ভালো করিলেন না। এ দেশে থাকিলে একদিন বিপদে পড়িবেই। যা হউক, তখন আমায় স্মরণ করিও!"

বলিয়া, সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। শিষ্য, তলপি লইয়া,—হাসি ধরে না। পরম আহ্লাদে শহরের বাজারের মধ্যে গেল। গিয়া এক ময়রার দোকানের পাশেই ঘর লইল। দোকানদারদের দু-একটা কাজ করিয়া দেয় পয়সা পায়, আর দিন রাত্রি পেট পুরিয়া—মনের সাধে—কেবলই ছানা মাখন ক্ষীর সন্দেশ রসগোল্লা বরফি খাইতে লাগিল।

(৩)

দিন যায়।

একদিন, হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রীর রাজ্যে, চুরি করিতে গিয়া সিঁদ কাটিতে কাটিতে, এক চোর, দেয়াল চাপা পড়িয়া মারা গেল।

অমন সুবিচারের রাজ্য, চোর মারা গিয়াছে, রাজ্যে হই হই পড়িল।

তখনই খবর রাজার কাছে।

রাজা বলিলেন,—"কী?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"কী?"

—"চোর মারা গেল!"

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! রাজ্যের ভয়ানক অলক্ষ্ণ। কোতোয়াল বেটা নিশ্চয় কুম্ভকর্ণ।—বেটা নিশ্চয় কেবল ঘুমায়।"

রাজা ডাকিলেন।—"কোতোয়াল!"

কোতোয়ালের প্রাণ উড়িয়া গেল।

রাজা হুকুম দিলেন, "এখনই বেটার গর্দান, কি, শূল! বাজ্যে চোর মারা গেল, বেটা ঘুমাইতেছিল?"

কোতোয়াল হাঁটু গাড়িয়া জোড়হাতে বলিল "মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই; আমি গিয়াই দেখি, চোর মরিয়া রহিয়াছে।"

"মন্ত্রী!—"

লাফাইয়া উঠিয়া মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, ঠিক! কোতোয়ালের দোষ নাই তা আমি আগেই জানি। চোর নিশ্চয় মরিয়াই ছিল। নহিলে, ধরা না পড়িতে—বিচার না হইতে, শূল না হইতে, চোর মারা গেল!"

রাজা দেখিলেন,—বটেই তো; কোতোয়ালের দোষ নাই। রাজা বলিলেন,—"তবে, চোর, মরিল কেন?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।"

কোতোয়াল জোড়হাত করিয়া বলিল,—"মহারাজ, চুরি করিতে—সিঁদ কাটিতে গিয়া চোর দেয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়াছে!"

"দেয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়াছে! সর্বনাশ!"

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আগেই বলিয়াছি নিশ্চয় কোনো কারণ আছে! নিশ্চয় দেয়াল চাপা পড়িয়াই মারা গিয়াছে; নইলে চোর মারা যাইবে কেন? হয় ধরা পড়িত নয় পলাইত।"

"তাই তো"—রাজা বলিলেন,—"কার ঘরে দেয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা গেল?

হাঁফ ছাড়িয়া কোতোয়াল বলিল, —"অমুক গৃহস্থের।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"বটে !"

রাজা অমনি হুকুম দিলেন,—"আন সেই বেটা গৃহস্থকে।"

কোতোয়াল ছুটিল।

রাজা তৎক্ষণাৎ গিয়া সভা করিয়া বসিলেন। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ নাকের কানের ছিপি ভালো করিয়া আঁটিয়া সভা জাঁকাইয়া বসিলেন।

শহর গ্রাম তোলপাড় করিয়া কোতোয়াল গৃহস্থকে বাঁধিয়া নিয়া আসিল।

গৃহস্থকে সভায় আনিতে তর্জন করিয়া উঠিয়া রাজা বলিলেন,—"কী! তুই বেটা গৃহস্থ, তোর ঘরের দেয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা যায়। তোর কী শাস্তি?"

পড়িতে পড়িতে মন্ত্রী উঠিয়া বলিলেন,—"গর্দান। মহারাজ! গর্দান! এই রকমে দেশের সব চোর মারা গেলে দেশের কী থাকিবে? কারা চুরি করিবে? কেহই ভয়ে চুরি করিতে যাইবে না, তখন কী লইয়া বিচার আচার হইবে? সভা হইবে? মহারাজ বিচার গেল, সভা গেল, রাজ্য যাইবে, সব যাইবে।"

"ঠিক!"—রাজা হুকুম দিলেন,—"এখুনি গৃহস্থের গর্দান লও।"

গৃহস্থ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"দোহাই মহারাজ! আমার কোনো দোষ নাই, আমি মালিকে দিয়া দেয়াল তোলাইয়াছিলাম, দেয়াল পড়িয়া যে চোর মারা যাইবে, মহারাজ, আমি তা জানিতাম না। হায়! হায়! আমার সব গেল!"

রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী?"

মন্ত্রী ততক্ষণে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িয়াছেন। "মহারাজ!—উপায়? রাজ্য আর নাই। এই রকমে সব গৃহস্থ গেলে তো রাজ্য থাকিলই না। ও গৃহস্থ, তাই তো চোর যে মরিবে ও তার কী জানিত? সেই বেটা মালিই তো সব কাজের গোড়া। মালি বেটা যদি ভালো করিয়া দেয়াল তুলিত তো চোর নিশ্চয়ই মরিত না।"

"তাই তো চোর তো মরিতই না। রাজ্যও যে গেল! এখন উপায়?"—রাজা বলিলেন,—"কোতোয়াল! সেই বেটা মালিকে যেখানে পাও সেখান হইতে ধরিয়া আনো।"

মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ, নিশ্চয়! কোতোয়াল কোনো রকমে সেই বেটাকে একবার ধরিয়া আনিতে পরিলেই, আমি দেখিতাম!"

রাজা বলিলেন—"কোতোয়াল!"

কোতোয়াল তখনই ছুটিল।

রাজা-মন্ত্রী রাজ্য হারাইয়া অনুপায় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মালি এক বাড়ি কাজ করিতেছিল। একজন লোক মাটি ছানিয়া তৈয়ারি করিয়া দেয়, মালি সেই মাটি দিয়া দেয়াল গাঁথিয়া তোলে। এমন সময় কোতোয়াল গিয়া মালিকে পাকড়াও করিল,—"বেটা মালি! কেমন দেয়াল তুলিস? বড়ো যে চোর মারিতেছিস। আর রাজার রাজ্য নিয়াছিস—চল এইবার।"

মালি ভ্যাবাচ্যাকা! ততক্ষণে কোতোয়াল তাহাকেই টানিয়া নিয়া একেবারে রাজসভায়।

মালিকে দেখিয়াই রাজা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, —"বেটা! তোরই জন্যে তো রাজ্য হারাইয়াছিলাম, গৃহস্থের সর্বনাশ হইল, চোর মারা গেল! তুই বেটা যেমন দেওয়াল গাঁথিয়াছিলি, এখনই গর্দান যা!"

মন্ত্রী নাকের কানের ছিপি ভালো করিয়া আঁটিয়া, গরম চোখে দাঁত কড়মড় করিয়া, মাথা ঝাঁকি দিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া আসনের উপর ঠিক হইয়া বসিলেন।—"কেমন! যেমন বেটা মালির দোষে সর্বনাশ হইয়াছিল, এখন তেমনি গেল তো বেটা গর্দান!"

মালি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই মহারাজ! আমি এ সব কিছুই জানি না। গৃহস্থের দেয়াল আমি খুব ভালো করিয়া তুলিয়া দিয়াছিলাম; চোর তো চোর, চোরের বাপ ঠাকুরদা আসিয়া সিঁদ কাটিলেও দেয়াল ভাঙিত না। মহারাজ আমার কোনো দোষ নাই; যদি দেয়াল ভাঙিয়া থাকে তো মহারাজ মাটি ছানিবার দোষে ভাঙিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"বটে—মন্ত্রী?"

মন্ত্রী ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"ঠিক মহারাজ! তাই তো, বটেই তো! ও দোষী নয়। যে বেটা মাটি

ছানিয়াছিল, নিশ্চয় সেই বেটার এই কাজ। ঠিক! মালির যদি দোষ থাকিত তো এতদিন তো দেয়াল পড়ে নাই; দেয়াল বরাবর খাড়া ছিল। মালি দেয়াল তুলিয়াছে। মাটির ও জানে কী? যে বেটা মাটি ছানিয়াছে সেই বেটার দোষেই যত গোলযোগ।''

রাজা বলিলেন,—''বটে! কে মাটি ছানিয়াছিল?''

মালি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—''আমার মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাই।''

মন্ত্রী বলিলেন,—''কী মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাই!—নিশ্চয়! সোদর নয়, মাসতুতো নয়, বৈমাত্রও নয়, মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাই; ঠিক! নইলে কি কখনও এমন করিতে পারে? এই জন্যই ও বেটা মালির সর্বনাশ করিবার এত ফন্দি আঁটিয়াছে!''

রাজা হুকুম দিলেন,—''সেই বেটার গর্দান এখনই লও।''

বলিতে-না-বলিতে কোতোয়াল ছুটিল।

গিয়া, যেখানে মালির মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাই মাটি ছানিতেছিল, সেখান হইতে তাহাকে ক্যাঁক্ করিয়া ধরিয়া একেবারে শূন্যে শূন্যে রাজসভায় আনিয়া হাজির।

সে বেচারি তো চেঁচাইয়া অস্থির। বলিল, ''দোহাই মহারাজ! আমি কিছু জানি না।''

রাজা আগুন হইয়া বলিলেন, ''বেটা, তুই কিছু জানিস না! তুই বেটা মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাই, তুই কিছু জানি না বললেই কি শুনি? তোরই ছানা মাটির দোষে দেয়াল ভাঙিয়া পড়িয়া চোর মারা গেল; —তুই কিছু জানিস না! বেটা, এখনই গর্দান যা!''

আছাড় খাইয়া পড়িয়া পিসতুতো ভাই বলিল,— ''মহারাজ! যেমন করিয়া মাটি ছানিতে হয় আমি তেমনই করিয়া ছানিয়াছিলাম; কোথাও ভুল হয় নাই। দোহাই মহারাজ কলসির যদি কোথাও ফুটা থাকিয়া থাকে, তা দিয়া জল চুয়াইয়া পড়িয়া রাত্রে মাটি যদি নরম হইয়া গিয়া থাকে, তো মহারাজ, আমি তার কিছু জানি না; মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।''

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মন্ত্রী?''

মন্ত্রী উঠিয়া বলিলেন,—''মহারাজ, ঠিক তো। আপন মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাই; তা বটেই তো, মালির ও খুব কাছাকাছি আপনজন। ও মাটি খারাপ ছানিতে পারে না। ও বেচারি মাটি ঠিক ছানিয়া রাখিয়াই গিয়াছিল; ওই কলসির ফুটা দিয়া জল পড়িয়া রাত্রে সব মাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে বেটা এই রকম ফুটা কলসি তৈয়ার করিয়া বেচে, তাকে এখনই শূলে দেওয়া উচিত।''

রাজা হুকুম দিলেন,—''কোতোয়াল! যে বেটা কলসি তৈয়ার করিয়াছিল, তাকে এখনই আনো!''

শহরের শেষ সীমানায় কুমারের বাড়ি। কুমার হাঁড়ি গড়িতেছিল; কোতোয়াল তাহাকে সেখান হইতে ধরিয়া এক টানে নিয়া রাজসভায় তুলিল।

কুমারের মাথাটি, তখন যেন্ ঠিক তার চাকটির মতো ঘুরিয়া গেল! কুমার ভাবিল—''ও বাবা! এ কোথায় আসিলাম!''

রাজা গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন,—''হতভাগা বেটা কুমার, আমার রাজ্যে থাক, আর ফুটা কলসি তৈয়ার কর! সে কলসির জল চুয়াইয়াই তো ছানা মাটি নরম হইয়া গেল, আর চোর মারা পড়িল। বেটা, এখনই শূলে যা!''

মাথা ঘুরিয়া কুমার রাজার সিংহাসনের তলায় পড়িয়া গেল,—''দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই, কোন্ কলসি কবে গড়িয়াছি আমার তা মনে নাই। মহারাজ, আমার কলসির গড়ন এ রাজ্যের সেরা; তবে পোনে পুড়িতে কাঠের দোষে কোন্ কলসির কী হইয়াছে, আমি তা জানি না মহারাজ।''

রাজা ফিরিলেন—''মন্ত্রী?''—

মন্ত্রী বলিলেন,—''মহারাজ, তাই তো! ওর গড়ন কখনই খারাপ হইতে পারে না। তাই তো, এ রাজ্যে কে না ওকে জানে? কবে পোনে কখন কী হইয়াছে! ঠিক, পোন দিন রাত জ্বলে, অত দেখিতে গেলে তবে ওর কাজই চলে না। ও হাঁড়ি কলসি গড়িবে কখন? ওই ঠিক,—পোনে পুড়িবার সময় অনেক কলসি কাঠের খোঁচা লাগিয়া ফুটা হয়, চাপা পড়িয়া ফাটেও, ভাঙেও, নষ্টও হয় বটেই; ওর বরং তাতে ক্ষতিই। এ সমস্ত কাঠের দোষ। কাঠ কে যে দিয়াছিল মহারাজ, তাই দেখুন।''

''কে দিয়াছিল?''

কুমার বলিল,—"এক কাঠ-কুড়ানি বুড়ি!"

"আনো সেই বুড়িকে!"

ও-ই মাঠের পাশ দিয়া কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া কাঠ-কুড়ানি বুড়ি যাইতেছিল; কোতোয়াল তাহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া নিয়া, রাজসভায়।

বুড়ির তো চোখ উলটিয়া দাঁতে মুখে খিল! রাজা গর্জিয়া বলিলেন,—"রাক্ষসী বুড়ি! বুড়ি হইয়াছিস আর মানুষ খাইবার ডাইন্ হইয়াছিস? কেমন কাঠ দিয়াছিলি যে, তাই দিয়া পোড়াইতে গিয়া কুমারের কলসি ফুটা হইল, চোর মারা গেল?"

ভয়ে থতমত বুড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"মহারাজ! এক কাঠুরের কাঠ আমি বেচি বাবা, আমি কিছুই জানি না বাবা! দোহাই মহারাজ, পায়ে পড়ি।"

হাউ মাউ করিয়া বুড়ি কাঁদিতে লাগিল।

রাজা চাহিলেন,—"মন্ত্রী?"—

মন্ত্রী বলিলেন,—"তাই তো, মহারাজ;—ও খুনখুনে বুড়ো হাবা মানুষ, ও তো কাঠ কাটিতে পারেই না। ঠিক! সেই বেটা কাঠুরেই যত সর্বনাশের মূল। মহারাজ!—মহারাজ!—এইবার ঠিক ধরিয়াছি—কাঠ কাটা ভয়ানক পরিশ্রম কিনা, ভয়ানক ক্ষুধা হয়। বেটা সারাদিন কাঠ কাটিয়া আসিয়াও খাইতে পায় না, আর বাড়ির পাশে চোরেরা মজা করিয়া খায়, বেটার তো সিঁদ-কাঠিও নাই, খন্তাও নাই যে, সিঁদ কাটিবে; কুড়াল দিয়া সিঁদও কাটিতে পারে না। কী করিবে, দুষ্ট বেটা কাঠুরে যত চোরের উপর আক্রোশে জ্বলিয়া মরে, আর সেই জন্যই বেটা দেশের যত চোর মারে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেন,—"এই দণ্ডে বেটাকে শূলে চড়াও।"

কোতোয়াল ছুটিল।

বনের ধারে এক ঢেঙা কাঠুরে প্রকাণ্ড এক কুড়াল দিয়া কাঠ কাটিতেছিল। কোতোয়াল বাঘের মতন গিয়া তাহাকে ধরিয়া নিয়া আসিল। ঢেঙা কাঠুরে কুড়ালের ভারে পড়িয়া যায়, তাতে কাঠ কাটিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রাজসভায় আসিয়া একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

মন্ত্রী তো একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন।

রাজা একটায় পঁচিশটা হইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন, "বেটা, আমার রাজ্যে কাঠ কাটো, আর যারা সিঁদ কাটে তাদের সর্বনাশ করো! —দাও বেটাকে শূলে!"

মন্ত্রী উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দাঁড়ান! হাঁরে কোতোয়াল! তুই যখন ধরিলি, ও বেটা তখন কী করিতেছিল?"

"কাঠ কাটিতেছিল।"

"সর্বনাশ!! মহারাজ!! যা ভাবিয়াছি তাই!" মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! দেখিলেন? —বেটার চালাকি দেখুন! চোর বেচারি যে মরিবে, তা ও আগেই জানিত, তাকে পোড়াইতে কাঠ লাগিবে, তাও জানিত, বেটা সব জানিত; সেই জন্যে ঠিক সময়ে গিয়া কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে!"

—"বেটা, সব জানতিস, তবে এতক্ষণ বলিস নাই কেন? বেটাকে এক্ষুনি শূলে দাও!"

—"শূলে দাও! শূলে দাও!"

—"শূ—লে দা—ও।"

চারিদিক হইতে সিপাই সান্ত্রি খাড়া হইয়া উঠিল। কাঠুরে বেচারা আর কিছুই বলিতে পাইল না। শুধু শুকনো কলার পাতাটির মতো কাঁপিতে লাগিল।

রাজা সভা ভাঙিয়া দিয়া চলিলেন। জল্লাদ আসিল। কাঠুরেকে শূলে দিতে লইয়া গেল।

(৪)

মশানে শূল হয়। এত বড়ো অপরাধীর শূল হইবে, রাজা, মন্ত্রী গিয়া জাঁকাইয়া শূল দেখিতে বসিয়াছেন।

কাঠুরেকে শূলে দেওয়া হইয়াছে।

শূল বিঁধে না! কাঠুরে পাতলা, ঢেঙা। চড়ুই পাখির মাংসও গায়ে নাই। যেটুকু ছিল, একে খাইতে পায় না তাতে কাঠকাটার পরিশ্রমে তাও গিয়াছে। শূল বিঁধিতেছে না।

"তাই তো!"—রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী?"

মন্ত্রী বলিলেন, "তাই তো! মহারাজ, এ বেটার গায়ে এক তোলা মাংস নাই, তা বেটার বিঁধিবে কী?"

রাজা বলিলেন, "তা, এখন কী করা যায়?"

"কী করা যায়! বটে?"—মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! রাজাজ্ঞা একবার যা হইয়াছে, তা রাখিতেই হইবে। শূলের হুকুম যখন হইয়াছে, তখন আর কথা ফিরে না। একজনকে শূলে দিতে হইবেই। নইলে কি রাজ্য থাকে? রাজ্য যে রসাতলে যাইবে। এ ঢেঙা শুক্‌না বেটা ভয়ানক দুষ্ট; বেটার গায়ে শূল যখন একবার বিঁধিল না, তখন আর বিঁধিবেই না। আচ্ছা এ তো সহজ কথা, রাজ্য খুঁজিয়া খুব মোটা সোটা একজন লোক ধরিয়া আনিয়া শূলে দিলেই হইল। দেখি, কেমন শূল বিঁধে না! মহারাজ, শূল পোতা হইয়াছে। শূলে বেটা বিঁধিবে না!—হাকিম নড়ে, কিন্তু মহারাজ, হুকুম নড়ে না!"

"তাই তো!"

তখনই কোতোয়াল আর জল্লাদের উপর হুকুম হইল, "রাজ্যে সব চাইতে মোটা মানুষ যাকে পাইবে, তাকে এই দণ্ডে নিয়া আসিয়া শূলে চড়াও।"

রাজা-মন্ত্রী ভয়ানক রাগিয়া বসিয়া রহিলেন।

হুকুম মাটিতে পড়িতেও পাইল না। জল্লাদ আর কোতোয়াল ছুটিল।

(৫)

সেই যে পেটুক শিষ্য? শিষ্য ঘি, চিনি, মাখন, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা খাইতেছে, খাইতেছে, খাইতেছে। দিন যায়, খাইতে খাইতে খাইতে শিষ্যের ভুঁড়ির উপর ভুঁড়ি বাড়িয়াছে। থুঁতনিতে থাক্ পড়িয়াছে, সোনার কান্তি শরীর হইয়াছে, শরীরে চর্বি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। যখন চলে যেন হাতিটি; বসে, যেন পাহাড়টি। বিশ গজ কাপড়ে কুলায় না। মুখে হাসি ধরে না; শিষ্য, মহা মনের সুখে আছে। খায় আর শিষ্য বলে, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! মিছা এ স্বর্গ ছাড়িয়া পথে পথে ঘুরিতে গেলে! তোমার সঙ্গে থাকিলে মুড়ি খাইয়া খাইয়া এতদিনে আমার প্রাণটাই যাইত! এখন কেমন হইয়াছি একবার যদি আসিয়া দেখিতে, তবে বলিতে, বা!"

বলিয়া শিষ্য বিকাল বেলা—তখনই ভোজনে বসিয়া গেল।

ঘর-জোড়া একখানা থালায় আধমণখানেক মিঠাই, ক্ষীর, ছানা এই সব। সপাসপ্, গপাগপ্ উজাড় করিতেছে আর বলিতেছে—"ঠাকুর! একবার যদি দেখিতে, কী মজায় খাইতেছি!"

এমন সময় সারা শহর খুঁজিয়া লোক পাওয়া গেল না,—জল্লাদ আর কোতোয়াল, খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে।

কোতোয়াল বলিল "ওরে জল্লাদ! বাপ্ রে বাপ্! দেখিতেছিস? ওটা মানুষ না হাতি রে? এমন লোকটা এখানে আছে, আর আমরা সারা শহর খুঁজিয়া মরিতেছি?"

জল্লাদ বলিল, "ওরে ব্বাবা! তাই তো! বাহবা! ঠিক হইয়াছে! এতক্ষণে আমরা বাঁচিলাম! কী লোকটা রে—"

কথা নাই বার্তা নাই, জল্লাদ আর কোতোয়াল দুজনে গিয়া শিষ্য মহাশয়কে একেবারে খপ্ করিয়া ধরিয়া ঠেলিয়া ধাক্কাইয়া নিয়া চলিল!—শিষ্য বলেন,—"কে হে? আমার খাওয়াটাই নষ্ট করিলে! তোমরা কারা? কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

—"অ্যাঁ! তাই তো।

কোতোয়াল আর জল্লাদ বলিল,—"চল ঠাকুরদাদার বাড়ি।"

(৬)

সেই মশানে শিষ্য মহাশয়কে নিয়া গিয়া তো তারা হাজির। আর অমনিই লোকজন সব আসিয়া পড়িল। "হই হই হই হই!" করিয়া লোকজন সন্ন্যাসীর শিষ্যকে শূলে তুলিতেছে।

রাজা মহা খুশি। মন্ত্রী আরও খুশি,—"এইবার কেমন লোক পাওয়া গিয়াছে! শূলের বাবা বিঁধিবে!"

লোকজনরা রব তুলিতেছে—"হেঁইও—হেঁইও—হেঁইও!"

খাইয়া খাইয়া শিষ্য কিনা ভয়ানক মোটা হইয়াছে, ভারি হইয়াছে চৌদ্দ মণ। লোকেরা উঠাইতে কি পারে?

রাজা মন্ত্রী চেঁচাইয়া বলিতেছেন—"উঠাও! উঠাও!" যত লোকজন হাঁপাইয়া পড়িতেছে "কী ভয়ানক ভারি!" "হেঁইও—হেঁইও—হেঁইও!"

আর শিষ্যের—পরিত্রাহি চিৎকার; কপালে শিরা উঠিয়া গিয়াছে, ভুঁড়ি অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, ধড়ফড়

করিয়া গুরুকে ডাকিতেছে—"হে গুরুঠাকুর, দোহাই গুরুঠাকুর আর তোমার কথা ঠেলিব না। আর রসগোল্লা খাইব না! দোহাই বাবা! মুড়ি খাইব! তোমার সঙ্গে যাইব! যতদিন বাঁচি কেবলই মুড়ি খাইব, হে বাবা! রক্ষা কর!—বাবা, রক্ষা কর!"

শিষ্যকে তখন প্রায় শূলের কাছে আনিয়া তুলিয়াছে; শিষ্যের প্রাণের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। শিষ্য "হায় হায়" করিয়া গুরুকে ডাকিতেছে।

ঠিক তখন, দূর হইতে "ও কে?—ও কে?"

অনেক দূর হইতে, এমন সময়, এক সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিতেছেন,—"মহারাজ! মহারাজ! রাখুন! রাখুন! শূল বন্ধ করিতে হুকুম দিন। ও লোকটা ঘোর পাপী, অমন পাপীকে ও শূলে দিবেন না। ও শূলে আমি যাইব।" বলিতে বলিতে, সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিয়া শূল ধরিলেন।

সকলে অবাক! সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মহারাজ! এ শূলে আমি যাইব। আশ্চর্য হইবেন না। মাহেন্দ্র-ক্ষণে এ শূল পোঁতা হইয়াছে। যে এই শূলে যাইবে, তাব সশরীরে অক্ষয় স্বর্গ। মহারাজ, সব লোক সরাইয়া দিন, ও পাপীটাকে দূর করিয়া দিন, ও কি শূলে যাইবার যোগ্য? কত বৎসরের জপ তপস্যায় আমি যা পাই নাই, এই শূলে গিয়া আজ তা পাইব। অনেক দূর হইতে এই শূলের কথা শুনিয়া আসিলাম। মহারাজ, আপনাব লোককে এখনই হুকুম করুন, আমাকে শূলে উঠাইয়া দিক। শূলে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব। মহারাজ এমন দিন কি আর হয়?"

রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"তাই তো মহারাজ!—সশরীরে অক্ষয় স্বর্গ!! এমন ক্ষণে, শূল পোঁতা হইয়াছে! বটে! তাই তো, নিশ্চয় তো, নহিলে কোন্ দেশ হইতে সন্ন্যাসী কী করিয়া জানিল এই শূলের কথা? মহারাজ, এত পরিশ্রমে মাহেন্দ্র-ক্ষণে শূল পোঁতাইলাম আমরা, আর ওই সন্ন্যাসী যাইবে স্বর্গে? মহারাজ, এত মূর্খ আমি নই। এমন সুখে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হয় তো, নিশ্চয় আমিই যাইব। মহারাজ, এই মুহূর্তে আমাকে শূলে যাইতে অনুমতি দিন।"

—"অ্যাঁ! এ তো ঠিক।"—রাজা বলিলেন—"মন্ত্রী! দেখ, তা যদি বলিলে, তো, আমার হুকুমে আমার রাজ্যে শূল পোঁতা হইয়াছে; আর সশরীরে স্বর্গে যাইবার অদৃষ্ট আমার মতো রাজা ছাড়া আর কারও হইতেই পারে না। আমি থাকিতে তুমি তো আগে স্বর্গে যাইতেই পার না!—শূলে আমি যাইব।"

শুনিয়া মন্ত্রী হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "হায়, হায়! স্বর্গে যাইতে যাইতে অল্পের জন্য আমি স্বর্গ হারাইলাম।"

মন্ত্রী হায় হায় করিতে লাগিলেন।

তখনই হুকুম হইয়া গেল, রাজা শূলে উঠিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবেন। এমন দিন কি কারও কখনও হয়?—রাজাজ্ঞায় তখনই মৃদঙ্গ খরতাল লোকজন সব আসিয়া পড়িল, আনন্দে সকলে হরিধ্বনি আর রাজার নামের জয়গান করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"এমন চেঁচাইয়া গান করবি, যেন স্বর্গে যাইতে যাইতে সারাপথ আমি হরিধ্বনি আর জয়গান শুনিতে শুনিতে যাইতে পারি।"

সকলে খুব চেঁচাইয়া হরিধ্বনি আর রাজার নামের জয়গানে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল। মহা খুশি হইয়া রাজা শূলে উঠিলেন।

মন্ত্রী মনের দুঃখে বুক ফাটাইতে লাগিলেন।

খুব জোরে জোরে সকলে মৃদঙ্গ খরতাল বাজাইয়া যতদূর গলা উঠে প্রাণপণে চেঁচাইয়া হরিধ্বনি আর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ওদিকে রাজা শূলে বসিয়া তিন পাক খাইয়া ঘুরিয়া, বিকট চিৎকার—বিকট বিষম মূর্তি ধরিয়া, সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

তা দেখিয়া মন্ত্রী, লোকজন, সকলে—"বাবা রে! বাবা"—বলিয়া সভয়ে যে যেদিকে পারিল সটান দৌড়!—

মন্ত্রীর একে দৌড়াইবার নাই অভ্যাস,—তাতে ভয়ের দৌড়,—মশানের চারিদিকে গর্ত, খানা, ডোবা, পুরানো সব কূপ ছিল,—অন্ধ এক কূপের মধ্যে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া, মন্ত্রীর নিচের দিকে মাথা আর উপরের দিকে পা! একেবারে কূপের তলের দিকে! চমৎকার!—কূপের তলে যাইতে যাইতে—মন্ত্রী ভাবিলেন,—তাই তো! বাঃ! নিশ্চয় পাতালে চলিয়াছি! হা হা, রাজা আমাকে স্বর্গে যাইতে দিলেন না বটে, তা আমি কি যে-সে লোক? কোন্ জায়গায় না যাইতে পারি? রাজা-হীন রাজ্যে কে থাকে? পাতালে গিয়া অমনি আমি সেখানকার মন্ত্রী হইব। স্বর্গে রাজা এখন একা একা বুঝিবেন মজাটা! পাতালের লোক বুদ্ধিমান কিনা—তাই, হে! হে!! হে!!! আমার জন্য আগেই পথ তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছে। আমার মতো মন্ত্রী কি যে সে পায়?"

ততক্ষণে গবুচন্দ্র মন্ত্রী মহাশয় একেবারে কূপের কাদার তলে!

* * *

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"শিষ্য! কেমন, আগেই তো বলিয়াছিলাম, এখানে থাকিলে আজ হোক, কাল হোক বিপদে পড়িবেই। এখন দেখিলে তো?"

শিষ্য হাঁপ ছাড়িয়া উঠিয়া সন্ন্যাসীর দুটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"ও গো ঠাকুর বাবা! আপনি মাপ না করিলে কে মাপ করিবে ঠাকুর বাবা? আর এদেশে থাকিব না; ঠাকুর! এখনই এ দেশ ছাড়িয়া চলুন।"

ছেলেদের বেতালপঞ্চবিংশতি ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

কুলদারঞ্জন রায়

বেতাল বলিল—"মহারাজ! ধর্মপুরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম গোবিন্দ। তাঁহার দুই পুত্র—ভোজনবিলাসী আর শয্যাবিলাসী। ভাতে কিংবা ব্যঞ্জনে কোনো দোষ থাকিলে অন্য লোকের পক্ষে তাহা বুঝিতে পারা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও ভোজনবিলাসী সেই অন্ন ও ব্যঞ্জন কিছুতেই আহার করিতে পারিত না। আর, বিছানায় নিতান্ত সামান্য কোনো ত্রুটি থাকিলেও, শয্যাবিলাসী সে বিছানায় কিছুতেই শুইতে পারিত না। বাস্তবিক, গোবিন্দের দুই পুত্রের এই এক এক বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ক্রমে তাহাদিগের এই ক্ষমতার কথা সেই দেশের রাজার কানে গেল। তিনি অতিশয় আশ্চর্য হইয়া তাহাদিগের ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য দুইজনকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

দুইজনে রাজবাড়িতে উপস্থিত হইলে রাজা প্রথমে ভোজনবিলাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাচককে ডাকিয়া নানা রকমের সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন। খাদ্য প্রস্তুত হইলে, রাজার আদেশে ভোজনবিলাসী রান্নাঘরে গিয়া আহারে বসিল। কিন্তু আসনে বসিবামাত্র উঠিয়া রাজার নিকটে ফিরিয়া গেল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন! তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছ তো।' সে বলিল—'মহরাজ! আহার কী করিয়া করিব? যে চালের ভাত রান্না হইয়াছে সে বোধ করি কোনো শ্মশানের নিকটস্থ খেতের ধানের চাল—তাই ভাতে মড়ার গন্ধ!' এ-কথা শুনিয়া রাজা লোকটাকে পাগল ভাবিয়া হাসিলেন। যাহা হউক, তাহাকে কিছু না বলিয়া একজন চাকরকে সেই চালের সন্ধান লইতে বলিলেন। চাকর কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল—'মহারাজ! অমুক গ্রামে শ্মশানের নিকটে এক ধানখেত আছে; সেই খেতের ধানে এই চাল প্রস্তুত হইয়াছিল।' ইহা শুনিয়া রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ভোজনবিলাসীব অসাধারণ ক্ষমতার অনেক প্রশংসা করিলেন।

ইহার পর, একটি সুসজ্জিত ঘরে রাজার উপযুক্ত বিছানা প্রস্তুত করাইয়া তিনি শয্যাবিলাসীকে শুইতে বলিলেন। কিন্তু সে কিছুক্ষণ শুইয়াই রাজার নিকটে আসিয়া বলিল—'মহারাজ! বিছানার সপ্তম গদির তলায় একগাছি চুল পড়িয়া আছে; তাহাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা যারপরনাই আশ্চর্য হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন—সত্য সত্যই সপ্তম গদির নীচে একগাছি চুল রহিয়াছে। তখন রাজা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুই ভাইকে অনেক পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এই দুইজনের মধ্যে বেশি প্রশংসা পাইবার যোগ্য কে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমার মতে শয্যাবিলাসী।"

যোজন জুড়ে গভীর বন। সেই বনে বড়ো বড়ো শালগাছ, উঁচু-উঁচু দেবদারু গাছ, কত রং-বেরঙের ফুলের গাছ, কত ভালো ভালো ফলের গাছ তার ঠিকানা নেই। এই এত বড়ো বনের মালিক হল পশুরাজ সিংহ। পশুরাজেব যেমন বিক্রম, তেমনই দম্ভ। দম্ভ হবে না কেন, যত সব জন্তু-জানোযার, মায় বড়ো বড়ো বাঘ ভাল্লুক

থেকে আরম্ভ করে, বাঁদর কাঠবেড়োলি পর্যন্ত সবাই পশুরাজের অধীন, সকলেই তার তাঁবেদার। কেবল একা বেঁকে দাঁড়িয়েছিল গজরাজ। কিন্তু তিন তিন বার যুদ্ধ করে, তিন তিনবারই পশুরাজ সিংহ তাকে এমন হারিয়ে দিয়েছেন যে তার আর বশ্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই। হুকুম হয়েছে, গজরাজকে আজ দরবারে হাজির হতে হবে, আর দস্তুরমতো কুর্নিশ দিতে হবে। তাই আজ বিরাট আয়োজন করে দরবার বসেছে।

খরগোশ পশুরাজের বরকন্দাজ। ছাগলের পিঠে নাগাড়া বেঁধে সে জঙ্গলময় ঢ্যাঁঢরা দিয়ে এসেছে যে দরবারের দিন সকল জানোয়ারই যেন হাজির থাকে। ছোটো বড়ো কেউ না বাদ যায়। যে হাজির হবে না, তার গর্দান যাবে।

পশুরাজের হুকুম অমান্য করে কার সাধ্যি! সব্বাই এসেছে। হরিণ, কাঠবেড়োলি, বাঁদর কেউ গরহাজির নেই। উঁচু উঁচু তিনটে শালগাছের নিচে দরবার বসেছে। সিংহাসনের উপর পশুরাজ কেশর ফুলিয়ে বসে আছেন। অঙ্গে তাঁর রাজপোশাক, মাথায় সোনার মুকুট, হাতে রাজদণ্ড। পাশে বসেছেন মহারানি সিং, তাঁর রানির বেশ। বাঘ হল ছত্রধারী। ইয়া বড়ো এক ছাতা ধরে সিংহাসনের পিছনটিতে সে গোঁফ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল্লুক হল শান্তিরক্ষক। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি বেঁধে হাতে এক মোটা লাঠি নিয়ে সে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দরবারের শান্তিরক্ষা করছে। নেকড়ে হল সেনাপতি। লাল কুর্তির উপর খাপসুদ্ধ তরোয়াল ঝুলিয়ে সে পশুরাজের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দরবার একেবারে জম্‌জম্ গম্‌গম্ করছে।

সব চুপচাপ। হঠাৎ বাঁদরগুলো গাছের উপর কিচিরমিচির করে উঠল, আর এ-ডাল হতে ও-ডালে লাফাতে শুরু করল। আর সেই সঙ্গে বরকন্দাজ খরগোশ লাল নিশান ঘাড়ে করে তিরের মতো ছুটে এসে খবর দিলে যে গজরাজ আসছে।

অমনি সেনাপতির হুকুমে জানোয়ারগুলো কাতারবন্দি হয়ে দু-পাশে দাঁড়িয়ে গেল। ওই যে গজরাজ তার বিশাল দেহখানি নিয়ে হেলতে দুলতে আসছে। তাকে সঙ্গে করে আনছে পশুরাজের দূত ডোরাকাটা জেব্রা। গজরাজ কোনোদিকে দৃকপাত না করে সোজা গট গট করে গিয়ে পশুরাজের সামনে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর শুঁড় নেড়ে তিনবার কুর্নিশ করলে, আর শেষটায় দূতের ইঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে বশ্যতা স্বীকার করলে।

সঙ্গে সঙ্গে অমনি পশুরাজের ইঙ্গিতে সেনাপতি নেকড়ে এগিয়ে এসে গজরাজের গলায় কুন্দফুলের মালা পরিয়ে দিলে আর পশুরাজ স্বয়ং তার মাথায় রাজদণ্ডটি ছুঁইয়ে দিয়ে মহা সম্ভ্রমে তাকে মন্ত্রীপদে বরণ করলেন। অমনি পিছন থেকে ছত্রধারী বাঘ এক বিরাট হুংকার ছাড়লে। আর সেই সঙ্গে ভাল্লুক, জেব্রা, নেকড়ে প্রভৃতি ওমরাহগণও সভা কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি তুললে। জয়ধ্বনির পালা শেষ হলে পর গাছের ডালে বাঁদরের পাল কিচিরমিচির আর গাছের তলায় শেয়ালের দল হুক্কা হুয়া করে করে কনসার্ট শুরু করে দিলে।

কথা ছিল শেয়ালদের সর্দার রতা শেয়াল তার দলবলের সঙ্গে আজ তামাসা দেখাবে। দলের আর সবাই এসেছে, রতা শেয়াল নিজেই কেবল অনুপস্থিত।

"রতা আসেনি! রতা আসেনি!"

ভুরু কুঁচকিয়ে চোখ পাকিয়ে হুংকার দিয়ে পশুরাজ বললেন, "কী এতবড়ো স্পর্ধা! আমার হুকুম অমান্য!" হুকুম হল, "যাও এখনই যেখানে পাও তাকে বেঁধে নিয়ে এসো।"

রতা শেয়ালের মাসতুতো ভাই—খেঁকি শেয়াল। খেঁকি হল পশুরাজের তোষাখানার দেওয়ান্। খেঁকি হাতজোড় করে বললে, "হুজুর, রতার পেটের অসুখ করেছে। তাই বোধহয় আসতে পারে নি।"

সেনাপতি নেকড়ে লম্বা এক সেলাম ঠুকে বললে, "পেটের অসুখ-টসুখ সব মিথ্যে কথা জনাব! রতা শেয়াল আসলে ভেতরে ভেতরে এমন সব কাণ্ড করে বসেছে যে হুজুরের সামনে হাজির হতে তার সাহসে কুলোচ্ছে না।"

পশুরাজ হুংকার ছাড়লেন। বললেন, "কী কী কাণ্ড করেছে সে?"

"ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড হুজুর! শুনুন তবে।" এই বলে নেকড়ে বলতে আরম্ভ করলে :

"গজরাজের সঙ্গে হুজুরের যখন লড়াই বাধে, আমিও তখন সঙ্গে গেছলাম। বাড়িতে আমার গিন্নি কচিকাঁচাগুলি নিয়ে একা ছিলেন। গিন্নি একদিন সন্ধ্যাবেলা নদীর ওপারে বেড়াতে বেরিয়েছেন এমন সময় পাজি করেছে কী, চুপি-চুপি কচিকাঁচাগুলিকে এ রকম বিশ্রীভাবে

আঁচড়ে কামড়ে রেখে গেছে যে কী আর বলব! কোনোটার কান কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে, কোনোটার পা চিবিয়ে থেঁতো করে রেখেছে, আর একটার চোখদুটো এমন আঁচড়ে দিয়েছে যে, সেটা তো জন্মের মতো অন্ধ হয়ে গেছে। এ অত্যাচারের বিচার করুন হুজুর! আমাকে তো সরকারি কাজে বাইরে বাইরেই থাকতে হয়।''

নেকড়ের কথা শেষ হতে না হতেই বরকন্দাজের ছোটো ভাই লাফ দিয়ে ছুটে এসে হাতজোড় করে বললে, ''মহারাজ, এক নালিশ আমারও আছে। আমি একদিন ঝোপের ধারে চুপটি করে বসে গাধাদাদার গান শুনছিলুম, এমন সময় রতা শেয়াল কোত্থেকে এসে বললে, 'ও কি ছাই গান শুনছিস! আমি ওস্তাদ, আমি খুব ভালো গান জানি। তুই শিখবি তো বল এক্ষুনি তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি!'' আমি বললুম, 'তা বেশ তো, কই দাও না শিখিয়ে।' তখন আমায় পায়ের উপর পা রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে বললে। আমি তার কথামতো যেই বসেছি, অমনি সে করলে কী, ঘ্যাঁচ করে আমার গলাটা ধরে জোরে জোরে নাড়া দিতে আরম্ভ করলে। ভাগ্যিস গাধাদাদা কাছেই ছিল, গান থামিয়ে সে পিছনের জোড়া পা দিয়ে খুব জোরে এক লাথি কষালে রতার পেটে। সে তখন আমায় ছেড়ে দিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করতে করতে ছুটে পালাল। গাধাদাদা না থাকলে সেদিন তো রতার হাতে আমার প্রাণটি গেছলই।''

খরগোশের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই কালো একটা হন্যে কুকুর এগিয়ে এসে বললে, ''ধর্মাবতার, বিচার করতে আজ্ঞা হয়। ক্রমাগত জ্বরে ভুগে ভুগে আমার খুব অরুচি হয়েছিল। একদিন অনেক কষ্টে বড়ো একখানা মচমচে ভাজা মাছ জোগাড় করে ঝোপের কাছটিতে বসে মুখে তুলতে গেছি, এমন সময় রতা শেয়াল কোথায় ছিল, এক লাফ মেরে আমার মুখ থেকে মাছখানা কেড়ে নিয়েই দে-দৌড়। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া,—এ কী অন্যায় বলুন তো হুজুর?''

নেকড়ে গর্জন করে বললে, ''খোদাবন্দ! এইসব অত্যাচারের বিচার করতে আজ্ঞা হোক!''

পশুরাজ চক্ষু রক্তবর্ণ করে খুব জোরে কেশর নাড়ালেন। হুংকার ছেড়ে বললেন, ''রতা শেয়ালের গর্দান চাই, এক্ষুনি! কে যাবে?''

খেঁকি দেখল, সর্বনাশ! সে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল, ''অবিচার করবেন না হুজুর! আমি আমার দাদার কথা বেশ ভালো করেই জানি। সে বৎসরাবধি মাংস-টাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। শিকার করতে তো সে এখন বেরোয়-ই না। হন্যে যা বললে সব মিথ্যে কথা! ওকে জিজ্ঞাসা করুন তো জনাব, মাছভাজাখানা ও পেয়েছিল কোথায়? আমি তাল ঠুকে বলতে পারি ও চুরি করে এনেছিল! হন্যের মতো ছোটো নজর কি আর কারও আছে জনাব?''

হন্যে কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মুরগি-বউ তার ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এল। এসে চোখ মুছতে মুছতে বললে, ''ধর্মাবতার আমার সাতটি ছেলেমেয়ের ভেতর এখন এই দুটিতে কেবল ঠেকেছে। বাকি পাঁচটি গেছে রতা শেয়ালের পেটে। আমি নিরীহ গরিব, এক কোণে কচিকাঁচা নিয়ে পড়ে থাকি, কারও কোনো কথায় নেই। রতা কিন্তু দিন নেই রাত নেই, আমার আনাচে-কানাচে ওৎ পেতে বসে থাকে আর ফাঁক পেলেই ঘাড় মটকায়।''

মুরগি-বউ আর বলতে পারলে না, হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল। পশুরাজ বিকট গর্জন করে উঠলেন— ''কী এত সব অত্যাচার! আমারই প্রজা হয়ে, আমারই রাজ্যে! রতা শেয়ালকে দস্তুরমতো সাজা দিতে হবে। ভাল্লুকজি, নিজেই যাও তুমি। গিয়ে রতাটাকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো। বলবে, আমার হুকুম! না আসে, গর্দান যাবে!''

ভাল্লুকজি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে খুব জোরে মাথা নাড়লে। বললে, ''হুজুরের কেবল হুকুমের অপেক্ষা! রতাকে পাকড়াও করে আনব সে আর বেশি কথা কী। একবার তার দেখা পেলে হয়। টুঁটি ধরব আর হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে আসব! এই আমি চললুম।''

এই বলে ভাল্লুকজি পাগড়িটা একটু ঠিক করে নিয়ে আর মোটা লাঠিখানা বেশ বাগিয়ে ধরে থপথপ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল। খেঁকিশেয়াল তখন কেবল একবারটি আড়চোখে চাইলে আর ফিক করে একটু হাসল।

ভাল্লুকজি কাজটা যত সোজা মনে করেছিল আসলে কিন্তু তত সোজা নয়। প্রথম তো সে রতার বাড়ি খুঁজেই

পায় না। যেখানে বাড়ি ছিল, ভাল্লুকজি গিয়ে দেখল সেখানে কোত্থেকে এক সজারু এসে আড্ডা করেছে। ব্যাপারটা এই যে রতা বেগতিক দেখে ঝোপ-জঙ্গল ছেড়ে একেবারে বনের শেষ সীমানায় গিয়ে কেল্লার মতো এক বাড়ি ফেঁদে বসেছে। খুব কাছেই গ্রাম। খাবার-দাবার অতি সহজেই মেলে।

অনেক ঘোরাঘুরি, খোঁজাখুঁজির পর রতার বাড়ি পাওয়া গেল, আর অমনি ভাল্লুক হাঁকডাক শুরু করে দিলে—"ওহে ও রতা, শুনছ আমার কথা? মহারাজের হুকুম এখনই তোমায় দরবারে যেতে হবে। শিগ্গির বেরোও বাড়ি থেকে।"

দরজার ফাঁক দিয়ে রতা সব দেখলে। তারপর পেটে হাত বুলোতে বুলোতে দরজা খুলে দিলে। ভাল্লুক অগ্নিমূর্তি হয়ে খুব জোরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে, "কী রকম বে-আক্কেলে লোক হে তুমি? এত ডাকছি সাড়া নেই। চল এক্ষুনি দরবারে। কী সব কাণ্ড করে বসেছ, সেখানে গিয়ে তার জবাবদিহি করবে।"

রতা পেটে হাত বুলোতে বুলোতে মুখখানি শুকনো করে বললে, "মধু খেয়ে ক-দিন থেকে বড়ো পেটের অসুখে ভুগছি। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, শুনতে পাইনি। তা ও-সব তুমি কী বলছ ভাল্লুকদাদা?"

মধুর নাম শুনেই ভাল্লুকজির কড়া মেজাজ চট্ করে নরম হয়ে গেল। আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "কী বললে? কী খেয়ে খেয়ে?"

রতা মুচকি হেসে বললে, "মধু হে দাদা, মধু। এ অঞ্চলটায় আর কিছু না হোক টাটকা-টাটকা মধু খুব বেশি পাওয়া যায়।"

"অ্যাঁ, তাই নাকি? তা আমায় একটু খাওয়াতে পার না ভায়া?"

"একটু দাদা! যত তুমি খেতে পার। খুব বড়ো-বড়ো চাক! চাক-ভরা তাজা মধু যত খেতে পার!"

"অ্যাঁ, বল কী হে! তা যদি পার ভায়া, আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। অনেক কাল মধু-টধু খাইনি! দরবারের চাকরি বজায় রাখতেই জান গেল, বল কেন!"

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রতা তখনই ভাল্লুকজিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভাল্লুক কী খুশি! যেতে যেতে সে রতাকে বলছে, "তুমি ভায়া এমন খাসা লোক, আর তোমার নামে কিনা সবাই যা-তা রটায়!"

"যা-তা রটায়! কী রটায় বল তো ভাল্লুকজি?"

"আরে সে সব কথায় কান দাও কেন! আমি গিয়ে এবার সব ঠিক করে দিচ্ছি দেখ না!"

ভাল্লুককে নিয়ে রতা এক বড়ো আমগাছের তলায় হাজির করলে। হাত-পাঁচ-ছয় উঁচুতে একটা ফুকর দেখিয়ে বললে, "ভাল্লুকদা ওই ফুকরের ভেতর যে মৌচাক আছে, তাতে এত মধু যে, তুমি এক মাস ধরে খেয়েও ফুরোতে পারবে না। কিন্তু সাবধান, লোভে পড়ে বেশি খেয়ে ফেল না যেন। আমার মতো শেষটায় পেটের অসুখে ভুগতে না হয়।"

ভাল্লুকের আর তর সইল না। সে পাগড়িটা আর লাঠিখানা সেখানে ফেলে রেখে খট্-খট্ করে তিন লাফে গাছের উপর হাজির। তারপর ফুকরের ভেতর মুখটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঘ্যাক্ করে মারলে এক কামড়। কামড় দিয়েই পরিত্রাহি চিৎকার।

এখন হয়েছে কী, ফুকরটার ভেতরে যত রাজ্যের ভিমরুল এসে প্রকাণ্ড এক বাসা বেঁধেছে। ভিমরুলের চাকে কামড়, সোজা কথা নয়! যেই কামড় দেওয়া, আর যাবে কোথায়! ভাল্লুকজির যা অবস্থা হল তা আর বলবার নয়। লাখ-লাখ ভিমরুল ভাল্লুকজিকে ছেঁকে ধরল। ভাল্লুকজি চিৎকার করতে করতে পালাতে পথ পায় না! কিন্তু পালিয়েই বা যাবে কোথা! ভাল্লুক ছোটে, ভিমরুলের পালও পোঁ-পোঁ শব্দে ছোটে। ভাল্লুকজির সর্বাঙ্গ—হাত, পা, মুখ, নাক ভিমরুলে ছেয়ে ফেলল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে পড়বি তো পড়, একেবারে এক কুয়োর মধ্যে। ভাগ্যে কুয়োয় জল ছিল না; নইলে ভাল্লুকজিকে সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেতে হত।

কুয়োর মধ্যে জল ছিল না, কিন্তু কাঁটা, খোঁচা পাথরে বোঝাই হয়ে ছিল। হুড়মুড় করে নিচে পড়েই ভাল্লুকজি একদম অজ্ঞান। সমস্ত রাত বেহুঁশ। সকালবেলা যখন জ্ঞান হল, তার মনে হতে লাগল যে সে মরেই গেছে। সর্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা। পাথরের ধাক্কায় তার নাকের ডগাটা ছিঁড়ে উড়ে গেছে। মুখময় রক্তের দাগ। নিজের দুরবস্থা দেখে ভাল্লুকজি তো ভেউ-ভেউ করে খুব খানিকটা কাঁদলে। ধেড়ে মিনসে কতক্ষণই বা কাঁদে, আর কেঁদে কী-ই বা হবে! প্রাণটা যখন আছে, কোনো উপায়ে

পরিত্রাণ পাওয়া চাই তো! কী উপায়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? কুয়োর ভেতরটাতে দিনের আলোও ঢোকে না। ভয়ানক অন্ধকার। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করে সে দেখলে, কুয়োর গায়ে নিচু থেকে উপর পর্যন্ত গর্ত-গর্ত আছে। ভাল্লুকজি উঠে দাঁড়াল আর নিচের গর্তে পা, উপরের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অতি কষ্টে উপরে উঠতে লাগল। খানিকটা উঠেই তার পা অবশ হয়ে আসতে লাগল। ভাগ্যে সেখানে একটা গাছ গজিয়ে উঠেছিল! সেইটে সে আঁকড়ে ধরে ফেললে, আর আঁচড়ে কামড়ে বহু কষ্টে উঠল। উপরে উঠেই আবার সে খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। জ্ঞান হতে দেখলে, রতা শেয়াল তার মাথার কাছে ভালোমানুষের মতো বসে আছে। ভাল্লুক চোখ চাইতেই রতা তাকে বললে, "ভাল্লুকদা, তুমি তো আচ্ছা লোক হে! এখানে এসে তুমি মজা করে শুয়ে রয়েছ, আর আমি তোমায় খুঁজে হল্লাক! বলি, মধুটা কী রকম খেলে? আমার এলাকার মতো এমন মধু খাওয়ার মজা আর কোথাও কিন্তু পাবে না। এ কী, একেবারে বেজায় খেয়েছ যে! পেট ফুলে একেবারে জয়ঢাক হয়ে গেছে দেখছি!—বলি, পেটে একবার হাত বুলিয়ে দেব নাকি? বল তো তেলে-জলে মালিশ করে দিই, পেট ফাঁপা সেরে যাবে।"

রতা পেজোমি করে সত্যি-সত্যিই তার পেটে হাত বুলোতে গেল।

ভাল্লুক ঘ্যাঁক্ করে উঠল—"পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার! তুই যে এত বড়ো বদমাইস তা কি আমি জানতুম! আমি বড়ো জখম হয়েছি, নইলে এক ন্যাচড়ায় এখনই তোর মুখ ভেঙে দিতুম!"

ভাল্লুকজি অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল, আর আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে ফিরে চলল। যেতে যেতে শেয়ালকে বলছে "দ্যাখ রতা, আমি দরবারে গিয়েই যদি তোর মুন্ডুপাতের ব্যবস্থা না করি তো আমার নাম ভাল্লুকজিই নয়!"

এই কথায় রতা তার মুখের কাছে গিয়ে সামনের একটা পা তুলে বক দেখালে, তারপর ফস্ করে ঘুরে ভাল্লুকজির মুখে খুব জোরে ল্যাজের এক ঝট্কা মেরে "ক্যাঁ—ক্যাঁ বাত, ক্যাঁ—ক্যাঁ বাত" বলতে বলতে দে-দৌড়।

আধমরা অবস্থায় দরবারে গিয়ে পশুরাজের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েই ভাল্লুকজির সে কী কান্না! ভাল্লুকজির দুর্দশার কথা শুনে পশুরাজ রাগে ফুলে উঠে এমন জোরে হুংকার ছাড়লেন যে সবাই একেবারে ভয়ে কম্পমান।

রাগারাগির পালা শেষ হলে পর তখনই আবার পরামর্শ-সভা বসল। রতাকে যেমন করে হোক পাকড়াও করে আনা চাই। কে যাবে এবার? পশুরাজ বললেন, "প্রধান সর্দার বাঘমশাই নিজেই এবার যাক।"

কিন্তু মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন, রতা শেয়াল যে-রকম ফিচেল, তাতে কোনো জোরালো জানোয়ারকে পাঠানোর চেয়ে একজন ধারালো-বুদ্ধিওয়ালা জানোয়ারকে পাঠানোই ঠিক। শেষে স্থির হল যে, বাঘের মাসি বেড়াল এ কাজের উপযুক্ত, তাকেই পাঠানো হোক।

বাঘের মাসি এতক্ষণ এককোণে চোখ বুজে বসে ঘড়-ঘড় করে নাক ডাকাচ্ছিল। পশুরাজের হুকুম তাকে শোনাতে সে দাঁড়িয়ে উঠে চার পা ছড়িয়ে শরীরটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে হাই তুলে আলিস্যি ভেঙে নিলে, আর বললে, "ভাল্লুকজি নিজেরই শরীরটা নিয়ে নড়তে পারে না! ওর কি কাজ রতা শেয়ালের মতো পাজিকে ধরে আনা? আমি গিয়ে রতাকে এবার এ রকম শায়েস্তা করে দেব যে, সে আপনা হতেই দরবারে আসতে পথ পাবে না!"

বাঘের মাসি এই বলে গোঁফে চাড়া দিয়ে ল্যাজ দুলোতে দুলোতে বেরিয়ে পড়ল। রতার ভাই খেঁকি ছিল পাশে দাঁড়িয়ে। এবারেও সে আড়চোখে একবার চাইলে, আর ফিক্ করে একটু হাসলে।

বেড়াল-মাসি হন্‌হনিয়ে চলল রতার বাড়ির দিকে। তার বাড়ি তো আর এখানে নয়! খানিক দূর গিয়ে সে একেবারে বড়ো জঙ্গলের পথ ধরলে। যেতে যেতে ভাবছে—ভাল্লুকজির কাছে বাড়ির সন্ধানটা তো পেলাম, কিন্তু কী ফন্দিতে যে ওকে জব্দ করলে, তা তো জানা হল না ভালো করে। তা থাক, আমি তো আর ওর মতো হাঁদা নই!

তারপর বলছে আপনমনে, তাই তো কিছু না খেয়েই চলে এলুম। খিদে পেয়ে গেল যে বড্ড। পথ তো আর কমখানি নয়। যেতে হবে ওই সাঁকো পেরিয়ে উঁচু টিলাটার কাছে। এখানে কি আর খাবার আছে কিছু? এটা তো শুধু পাখ-পাখালির বন।

সে চলেছে তো চলেইছে। এক জায়গায় দেখলে, এক ঝাঁক শালিক পাখি খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেড়ালমাসির পেটে খিদে। সে অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল লাফ দিয়ে। কিন্তু ধরতে পারল না একটাকেও। কোঁ কোঁ করে ঝাঁকসুদ্ধ শালিক উড়ে পালাল। সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "ধুৎ!"

সাঁকোটা পেরিয়ে বেড়ালমাসি এসে পড়ল রতার বাড়ির কাছে, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে সুড়ুৎ করে উঠে পড়ল ঝাঁকড়া একটা পাকুড় গাছে। উঁচু একটা ডালে বসে বসে আপনমনে বলছে,—আমি যাব চুপি-চুপি। চুপি-চুপি গিয়ে "ম্যাঁও" করে লাফিয়ে পড়ব রতার ঘাড়ে আর খুব কষে তার কান মুলে দেব, তারপর তার দু-গালে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে থাবড়া মেরে তার লেজটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলব হিড়-হিড় করে। পশুরাজের পরোয়ানা আমার কাছে,—জারিজুরি চলবে না তো তার!

বেড়ালমাসি এই রকম সব ভাবতে ভাবতে খুব ভালো করে দেখছে চারিদিক। আরে ওগুলো কী, ওই বাবলাগাছের তলায়—ঘেঁটু বনের ধারে লাফালাফি, ছুটোছুটি করছে?—একটা তো বাচ্চা শেয়াল। আর ছোটো-ছোটোগুলো? ও! কাঠবেড়ালি! আর ওই বড়ো সাদাটা? আরে, ও যে দেখছি একটা ধেড়ে সাদা ইঁদুর! ইঁদুরে, শেয়ালে, কাঠবেড়ালিতে মিলে খেলা করছে! মজা তো মন্দ নয়। রতা শেয়াল আছে বেশ!

সাদা ইঁদুর নজরে পড়তেই বেড়ালমাসির খিদেটা চন্‌চনিয়ে উঠল আর তার পাগুলো অমনি যেন আপনা হতেই লাফিয়ে পড়ল গাছ থেকে, তারপর তিন লাফে গিয়ে বাবলাগাছের তলায় হাজির। বেড়ালটাকে দেখেই কাঠবেড়ালিগুলো কিড়িক্-কিড়িক্ করতে করতে দে-ছুট। আর সাদা ইঁদুরটা কোন্ দিক দিয়ে যে হাওয়া হয়ে গেল, তা বুঝতেই পারলে না বেড়ালমাসি। সে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ দোলাতেই লাগল।

তারপর রেগে-মেগে বললে বাচ্চা শেয়ালটাকে "কে রে তুই, রতার ছেলে বুঝি? চল শিগগির আমাকে নিয়ে রতার কাছে।"

বাচ্চা শেয়াল বললে,—"আমার বয়ে গেছে তোমায় নিয়ে যেতে! তুমি আমার বন্ধুদের ভয় দেখালে কেন?"

"ভয় দেখানো? তারা যে পালিয়ে গেল! নইলে সব কটাকেই এক থাবাতে শেষ করে দিতাম!"

বাচ্চা শেয়াল এ কথার জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল, তারপর অমনি পন্-পন্ করে ছুটে গিয়ে গর্তে ঢুকল। বেড়ালমাসিও তার পিছু-পিছু গিয়ে গর্তের গোড়ায় হাজির।

বাচ্চা ছুটে গিয়েই বেড়ালমাসির খবর দিল রতাকে। রতা তখন তার বাড়ির পেছন দিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে আর একটা পথ তৈরি করা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। খবর পেয়েই সে ছুটে এল দরজার কাছে। তার পিছু-পিছু বাচ্চাটা আর তার বন্ধু সেই সাদা ধেড়ে ইঁদুরটা। এখন আর তার ভয় কীসের! বরং দেখবে কী মজাটাই হয়।

রতা গর্তের দরজায় এসে দেখে, বেড়ালমাসি দাঁড়িয়ে! সে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল, বললে, "আরে, মাসি যে! এস, এস! কী মনে করে হঠাৎ?"

মাসির তখন মাথা গেছে ঘুরে সাদা ইঁদুরটার নধর চেহারা দেখে। সে যে অত-শত মতলব করে এসেছিল রতার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে আর তার কান মলে দিয়ে থাবড়া মারবে গালে, সে সব কথা সে ভুলেই গেল একদম। সেই খালি ইঁদুরটাকে দেখছে কট্‌মট্ করে, আর লেজ দোলাচ্ছে।

রতা বললে মুচকি হেসে, "ও আমার পোষা ইঁদুর, ওর দিকে নজর দিয়ো না মাসি! তোমার ইচ্ছে হয়েছে খেতে, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। আমার এখানে অভাব কীসের মাসি! সাধে কি আর একলা পড়ে আছি এই জঙ্গলে?"

বেড়ালমাসি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে উপুড় হয়ে বসে তার লেজটিকে একবার এদিক একবার ওদিক করতে করতে আড়চোখে ইঁদুরটার দিকে চাইতে চাইতে বললে, "তা বটে, তা বটে!—তা, রতা, ওসব কথা থাক। তুমি আমার সঙ্গে দরবারে চল। পশুরাজের হুকুম—এখনই চল, এই দণ্ডে!"

রতাও বসেছে মুখোমুখি হয়ে; বলছে, "ভাল্লুকজিও কাল এখানে এসেছিল। সে কিন্তু টাটকা-টাটকা মধু খেয়ে কাবু হয়ে পড়ল। সে ভালো করে বলতেই পারল না পশুরাজের ঠিক-ঠিক হুকুমটা কী। তা বেশ তো, দরবারে

যাব সে তো ভাগ্যের কথা! তা তুমি এলে অত দূর থেকে, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? আগে খাওয়া-দাওয়া সারো, একটু জিরিয়ে নাও!''

খাওয়া-দাওয়ার নাম শুনে বেড়ালমাসির জিবে জল এসে গেল। বললে, ''তা যা বলেছ, খিদে পেয়েছে আমার খুবই। কী খাওয়াবে বল? ও মধু-ফধু আমার খাবার জিনিস নয়! কিন্তু জ্যান্ত খাবার-দাবার খাওয়াতে যদি পার তো দেখ। অনেকদিন পেটে যায়নি জ্যান্ত খাবার। খাবার-দাবার জোগাড় করবার কী জো আছে ছাই!''

রতা বললে, ''খেতে পাও না ভালো খাবার? তোমার জ্যান্ত খাবার মানে তো ইঁদুর? তা চলো আমার সঙ্গে। দেখি কত খেতে পার!''

আর কথাটি নেই বেড়ালমাসির মুখে। সে সুড়-সুড় করে চলল রতার পেছু-পেছু। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রতা বলছে যেতে যেতে, ''ওই যে আমার বাড়ি দেখছ? ওখানে ঢুকলেই যত ইঁদুর চাও পাবে। আমি তোমায় ঠিক জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে চলে আসব। তুমি চুপটি করে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকবে, তারপর পেট পুরে যত খেতে পার।''

খামারবাড়ির কাছে এসে শেয়াল একটু দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ''ওই যে ঘোরালো গর্তের মতো, ওইখানটা দিয়ে ঢুকে পড় গিয়ে। আর দেখতে হবে না কিছু! লাফালাফি করতে করতে যত রাজ্যের ইঁদুর ছোটো-বড়ো, ধেড়ে, নেংটি, সাদা, পাটকিলে, টুকটুকে, তুলতুলে, নধর, মোটা-সোটা—!''

রতা এমন করে বললে এই কথা যে বেড়ালমাসির আর তর সইল না। দু-লাফে গিয়ে হাজির হল সেই গর্তের কাছে আর গুঁড়ি মেরে ঢুকিয়ে দিলে নিজের মাথাটা। আর যায় কোথায়! একেবারে ঘ্যাচ্!

হয়েছে কী, এটা গর্ত বটে, কিন্তু গর্তের মুখেই পাতা আছে ইয়া জবর ইঁদুর মারবার এক জাঁতিকল। বেড়ালমাসির মুখের আধখানা আর সামনের একটা পা আটকে গেল জাঁতিকলটার খাঁজকাটা মুখে, আর অমনি পরিত্রাহি চিৎকার—''ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও!''

ছুটে এল সেই শব্দ শুনে লাঠি হাতে একটা ছেলে। দেখে, ইঁদুর তো নয়! এ যে একটা বেড়াল! লাঠি দিয়ে সে পিটতে লেগে গেল অমনি। ছেলেটার পেটাপেটিতে আর বেড়ালমাসিব ধস্তাধস্তিতে জাঁতিকল আলগা হয়ে গেল আর বেড়ালমাসির মুখ আর হাত খুলে এল। সে তখন তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে দে-ছুট! কিন্তু ছুটতে কি পারে! তার একটা হাত গেছে মুচকে জখম হয়ে, আর একদিককার গাল গেছে উড়ে। রক্ত পড়ছে ঝুঁঝিয়ে। কোনোরকম করে প্রাণের দায়ে ছুট মেরে খামারবাড়ির দেউড়ি পেরোল। তারপর খানিক দূরে গিয়ে কাত হয়ে পড়ল। নড়তেই পারে না আর।

রতা পাজি এতক্ষণ দেখছিল এইসব কাণ্ড, আর হেসে কুটিপাটি খাচ্ছিল। সে এবার ঝোপের ধারে এসে মুখটি কাঁদো-কাঁদো করে বললে, ''বলি ও বেড়ালমাসি, হল কী তোমার? খেতে গেলে ইঁদুর, আর ঢুকতে না ঢুকতেই লাগিয়ে দিলে ক্যাও-ম্যাও। ব্যাপার কী বল তো?''

বেড়ালমাসির তখন ভারি যন্ত্রণা। রতার কথায় সে রেগে ফুলে উঠলে, বললে, ''ওরে পাজি শয়তান, তুই যে এত সব কারসাজি করে রেখেছিস, তা কি ভেবেছি আগে? আমি যে নড়তে পারছি না, নইলে দেখিয়ে দিতাম এক্ষুনি তোর কারসাজির মজা। থাম না, আমি দরবারে ফিরে যাই আগে, তারপর দেখিয়ে দেব তুই কত বড়ো রতা শেয়াল! তোর গুষ্টিসুদ্ধ শেয়ালের মুণ্ডপাত না করি তো আমার নাম বেড়ালমাসিই নয়!''

রতা খক্-খক্ করে হেসে উঠল, আর ''ক্যা-বাত ক্যা-বাত'' বলতে বলতে ছুটে পালাল সেখান থেকে।

মাকড়সার কীর্তি

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সদ্য তখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ, জন্তু জানোয়ার, সাপ, মাছ, কুমির হাঙর সৃষ্টি করে ভগবান তাদের ছেড়ে দিয়েছেন মর্তলোকে—মানুষ গ্রাম-নগর-পথ-ঘাট-বাড়ি-ঘর তৈরি করে থাকবে; জন্তু-জানোয়াররা থাকবে বনে—মাছ আর কুমির, হাঙর এরা থাকবে জলে।

গ্রাম-নগর বল, রাজ্য বল—তৈরি হতে-হতেই তো শান্তি বা শৃঙ্খলা হয় না, কে করবে শাসন-শোষণ, কে করবে দাস্য—তা নিয়ে তর্ক আর ঝগড়া—মারামারি চলে বিস্তর। সেকালে-একালে কোনো ব্যতিক্রম নেই এতে! মানুষদের কথা আজ বলছি না—বলছি জন্তু-জানোয়ারদের কথা।

বনে জানোয়ার-মহলে অনেক সভা-সমিতি করে, চেঁচামেচি মারামারি করে স্থির হয়েছে—সিংহের গায়ে সবচেয়ে জোর—সে হবে জন্তু-জানোয়ারদের রাজা—শেয়াল মন্ত্রী, বাঘ সেনাপতি, হাতি কোতোয়াল—এমনি আর কী! খুদে প্রাণী মাকড়সা.....এদিক ওদিক ফরফরিয়ে বেড়াচ্ছিল....জাল পাতা.....মুখের ফুঁয়ে তৈরি করে—কোনো কিছু মাল-মশলা চায় না—সম্পূর্ণ নিখরচায়। মাকড়সা ভেবেছিল, তাকে একটা কোনো গদি দেওয়া হবে—তার কিছু না! রাগে গরগর করতে করতে বাতাসে সুতো মেলে দিয়ে সেই সুতো বেয়ে সে এল ছুটে ভগবানের কাছে। ভগবান তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রামের আয়োজন করছেন, মাকড়সা এসে চ্যাঁচানি শুরু করলে—ঠাকুর, বলি ও বিধাতা ঠাকুর....

চ্যাঁচানির বিরাম নেই। এতে মানুষের ঘুম হয় না, তা ভগবানের! তিনি এলেন সদরে—বললেন—কে? কী চাই?

মাকড়সা বললে—আমি মাকড়সা, আপনার কাছে বিচার চাইতে এসেছি, ঠাকুর।

—কীসের বিচার?—ভগবান বললেন।

মাকড়সা বললে,—কী অরাজকতা ঠাকুর তা আর আপনাকে কী বলব! গোদা-গোদা জানোয়ারেরা শুধু চেহারা দেখিয়ে গদিগুলো বিলকুল দখল করে বসেছে....আমার চেহারাখানা না হয় ক্ষুদ্র, কিন্তু বুদ্ধি? তা, আমাকে একটা গদি দিলে না!

ভগবান বললেন, বটে। অ....

মাকড়সা বললে—শুধু গায়ের জোরে....মানে, গুণ্ডামি আর আস্ফালনে সৃষ্টি রক্ষা পাবে, ভাবেন?—আপনি মাথা খাটিয়ে এতখানি যে সৃষ্টি করলেন, সে সৃষ্টি রক্ষা করতে বুদ্ধির দরকার। এ কথা মানবেন নিশ্চয়? আপনিই বলেছেন, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

ভগবান বললেন—নিশ্চয় এ কথা মানব।

মাকড়সা বললে—তা হলে আপনি বিচার করে দিন ঠাকুর—আমার বরাতে গদি কেন মিলবে না! বুদ্ধির পরখ নেওয়া হোক—সিঙ্গির বুদ্ধি বেশি, না আমার?

ভগবান বললেন—বেশ, তুমি যদি বুদ্ধির পরিচয় দিতে পার, তাহলে নিশ্চয় আমি সুবিচার করব।

মাকড়সা বললে—বলুন, কী করলে আপনি আমার বুদ্ধির পরিচয় পাবেন?

ভগবান একটু ভাবলেন। ভেবে তিনি বললেন—তোমাকে তিনটি কাজ করতে হবে। যদি পার, বুঝব, তোমার শক্তি-সামর্থ্য হাতি, বাঘ, সিঙ্গি, গণ্ডারদের চেয়ে কম নয়।

মাকড়সা বললে—কী তিনটি কাজ চান, বলুন?

ভগবান বললেন—প্রথম কাজ তুমি এক কলসি জ্যান্ত মৌমাছি এনে দেবে, দ্বিতীয় কাজ, প্রকাণ্ড একটি জ্যান্ত ময়াল সাপ এনে দেবে, আর তৃতীয় দফায় জ্যান্ত একটি কেঁদো-বাঘ এনে দিতে হবে। যদি পার—তোমাকে আমি সেরা গদি দেব।

খুশি মনে মাকড়সা এল পৃথিবীতে ফিরে....এসেই ফন্দি আর মতলব ভাঁজা!

মতলব এল মাথায়....মাকড়সা একটা মাটির কলসি জোগাড় করল—করে সে কলসি নিয়ে এল বনে। প্রকাণ্ড মহুয়া গাছে মৌমাছির দল তৈরি করেছিল ইয়া-বড়ো মৌচাক, সেই মৌচাকের ধারে এসে মৌচাকের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বকতে লাগল—ওতে মৌমাছিরা আছে যত, তারা পারবে মধু দিয়ে এ কলসি ভরিয়ে তুলতে.... হয়তো পারবে....নয়তো না....হয়তো হাঁ....নয়তো না।

মাকড়সার কথা শুনে আর রকম দেখে মৌমাছিদের কেমন মজা লাগল। তারা বললে—বিড়বিড় করে কী বকছ মাকড়সা?

মাকড়সা বললে—ভগবানের কাছে পৃথিবীর খবর জানাতে গিয়েছিলুম—আমার ওপর তিনি কাজের ভার দিয়েছেন ! তা তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় মহা-তর্ক। তিনি বলেন—এ কলসি মধু দিয়ে ভরিয়ে তুলবে— কোনো মৌমাছির সে সাধ্য নেই.....আমি বলেছি, আছে ঠাকুর আলবত আছে। তাই মানে, যেখানে যত চাক আছে, ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে দেখছি আমি—এ মৌচাকটা দেখছি সবচেয়ে পেল্লায়—তা তোমরা কী বল ?

মৌমাছিরা আস্ফালন করে বললে—তোমার কলসির মধ্যে আধবেলা যদি আমরা কাজ করি, তাহলেই মধুতে ও কলসি ভরতি করে দিতে পারি।

—বটে ! এই তো চাই মৌমাছি ভাইয়েরা। এসো তবে আমার কলসির মধ্যে......মধুতে কলসি ভরে

তোলো—ভগবানকে আমি দেখিয়ে বলতে পারব—দেখুন ঠাকুর, এদের কেরামতি।

কলসির মুখ খুলে ধরল মাকড়সা—আর চাক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখ লাখ মৌমাছি বেরিয়ে কলসির মধ্যে ঢুকল। যেমন ঢোকা—কলসির মুখে সরা এঁটে মাকড়সা এল কলসি নিয়ে ভগবানের কাছে। এসে বললে—এই দেখুন ঠাকুর!

দেখে ভগবান বললেন—হ্যাঁ! এনেছ বটে! বেশ, বেশ—এখন দুয়ের কাজ....ময়াল-সাপ।

—এখনই নিয়ে আসব ঠাকুর....বলে মাকড়সা ফিরল পৃথিবীতে।

ফিরে ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছে বন-জঙ্গলে, গিরি-পর্বতে, ময়াল-সাপের সন্ধানে। সে-দিন আর সে-রাত তার ঘুরে ঘুরেই কাটল....কত সাপ দেখল....গোখরো, কেউটে, কালনাগিনী, লাউডগা, হেলে, জলঢোঁড়া...ময়ালও দেখল, তবে সেগুলো ছোটো ছোটো! পরের দিন সকালে...হ্যাঁ মনের মতো মস্ত এক ময়াল পড়ল নজরে, একটা গোটা পাহাড় প্রায় ঘিরে ফেলেছে....পাক দিয়ে জড়িয়ে! ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখল, ...দেখে, প্রকাণ্ড একটা লগি খুঁজে সে এসে দাঁড়াল ময়ালের সামনে। দাঁড়িয়ে পা তুলে তুলে কত রকমের ভঙ্গি....যেন নাচছে! ময়াল দেখল, দেখে ময়াল বললে, সক্কাল বেলায় কী হল রে তোর মাকড়...ঠ্যাং তুলে তুলে নাচছিস যে!

মাকড়সা বললে—নাচিনি—মাপ কষছি।

—কীসের মাপ?

মাকড়সা বললে—দুনিয়া ঘুরে কত কী দেখে বেড়াচ্ছি ময়ালদাদা....ওখানে ইয়া লম্বা একটা বাঁশের লগি পড়ে আছে....তোমাকে দেখে ভাবছি, কোন্‌টা বেশি লম্বা? ওই বাঁশের লগিটা? না, তুমি?

ময়াল বললে—খেপেছিস! লগি হবে আমার চেয়ে লম্বা? ধেৎ!

মাকড়সা বললে,—দ্যাখোনি বলে এ কথা বললে দাদা! যদি দেখতে, তাহলে আমার মতো তোমারও ধোঁকা লাগত!

ময়ালের খেয়াল....ময়াল বললে—ধোঁকায় থাকবার দরকার? চ, দেখি গিয়ে—তোর ধোঁকা ঘুচবে।

ময়ালকে নিয়ে মাকড়সা এল সেই লগির কাছে। ময়াল বললে—কী? কী মনে হচ্ছে?

মাকড়সা বললে,—ঠিক বুঝতে পারছি না দাদা। এক কাজ করি।

—কী কাজ?

মাকড়সা বললে,—লম্বালম্বি হয়ে লগিটা জড়িয়ে যদি শুতে পার, তাহলে আর সন্দেহ থাকে না।

—বেশ,—বলে লগিটা ঘিরে ময়াল শুল লম্বা হয়ে। মাকড়সা তখন করলে কী, খুব মোটা লতা দিয়ে ময়ালকে বাঁধতে লাগল লগির গায়ে। ময়াল বললে,—কী হচ্ছে?

মাকড়সা বললে,—তুমি দেখতে পাচ্ছ না—কিন্তু আমি দেখছি মাঝে-মাঝে তোমার গা কুঁচকে দুমড়ে আছে—তাই লগির সঙ্গে বেঁধে লম্বাটা মেপে ঠিক করছি।

—ওঃ। ময়াল বললে,—তা দ্যাখ্, ভালো করেই দ্যাখ্।

লগির সঙ্গে বাঁধা শেষ হলে ময়াল-বাঁধা লগি নিয়ে মাকড়সা চলল ভগবানের কাছে—ডাকল, ঠাকুর....

ভগবান বললেন—এই যে মাকড়সা! কী খবর?

—এনেছি ঠাকুর, জ্যান্ত ময়াল....

ভগবান দেখেন, সত্যই তো....তিনি বললেন—ভালো, দুবারের পরীক্ষায় পাশ! এখন তিনের কাজ। মাকড়সা বললে—জ্যান্ত কেঁদো বাঘ....ঠিক এনে দেব ঠাকুর।

পৃথিবীতে ফিরে মনে নানা রকমের মতলব....একটা মতলব লাগসই লাগল। মাকড়সা তখন একটা ছুঁচে সুতো পরিয়ে বনে চলল—একেবারে অজগর বনে। হালুম-হালুম ডাক শুনল—যেমন শোনা—মাকড়সা অমনি চুপ করে বসে চোখ বুজে চোখের উপর সুতো পরানো ছুঁচটা বুলোতে লাগল। বাঘ এল....জ্যান্ত কেঁদো বাঘ। বাঘ দেখে, মাকড়সা বসে চোখে কী যেন ঘষছে। ভাবল চোখে কী পড়ল বুঝি ওর! বাঘ এল কাছে, বললে,—করছিস কী, অ্যাঁ!

মাকড়সা তখন ছুঁচ-সুতো রেখে বলে উঠল—বাঘমামা! এহে হে, করলে কী বল তো? কত কী দেখছি....আর তুমি ডেকে সব মাটি করে দিলে!

বাঘ যেন আকাশ থেকে পড়ল! বাঘ বললে, তার মানে?

মাকড়সা বললে,—মানে, এই ছুঁচ আর সুতো! খালি চোখে কতটুকুন আমাদের নজর চলে! এই ছুঁচ-সুতোর এমন গুণ....চোখে দিয়ে দুনিয়ার যেখানে যা আছে....সব দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়—দুনিয়ার বাইরেও নজর চলবে। শিকারের জন্য ভাবতে হবে না। কাছাকাছি কতটুকু আস্তানা—তাতে কী পাবে? দূরে নজর লাগবে—শিকারের সন্ধানে।

শুনে বাঘের মন মেতে উঠল। দু-দিন সে উপোসি আছে—শিকার মেলেনি। শিকাররা এখন বেশ চালাক হয়ে উঠেছে—খালি লুকিয়ে থাকে—পালিয়ে বেড়ায়।

বাঘ বললে—আমাকে দেখাতে পার?

—নিশ্চয়। তবে একটু ব্যথা পাবে চোখে....ছুঁচ ফুটোনোর ব্যথা। সে আর কিবা এমন....শিকারের তুলনায়।

বাঘ বললে—ব্যথা! ছুঁচ! কুছ পরোয়া নেই।

মাকড়সা বললে—তাহলে স্থির হয়ে বসো....নড়াচড়া নয়—মুখে টুঁ শব্দটি নয়।

বাঘ বললে—বেশ।

বাঘ বসল স্থির হয়ে। মাকড়সা বললে—চোখ বুজতে হবে—চোখ আমি সেলাই করে দেব....খোলা আর খালি চোখে দেখা যাবে না।

বাঘ চোখ বুজল। মাকড়সা ছুঁচ চালিয়ে বাঘের দু-চোখ দিলে প্যাট প্যাট করে সেলাই করে। যাতনা বেশ—বাঘ টুঁ শব্দ করছে না—চুপ করে আছে। নজর একবার চললে হয়, তখন এক লাফে দুনিয়ার যেখানে যত শিকার—হুঁ!

বাঘের চোখে পড়ল মোক্ষম সেলাই—তারপর তার ল্যাজ ধরে মাকড়সা বললে—এবারে তোমাকে নিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় বসিয়ে দেব—বসামাত্র ওই বন্ধ চোখে নজর যা চলবে—দেখ তখন....

বাঘ বললে—বেশ কথা!

ল্যাজ ধরে বাঘকে টানতে টানতে মাকড়সা গিয়ে হাজির ভগবানের কাছে।

ভগবান দেখলেন; দেখে বললেন—হ্যাঁ মাকড়সা—তোমার ক্ষমতা আছে। আমার বিচারে দোষ পাবে না। আজ থেকে তোমার বুদ্ধির তারিফ করবে সকলে—জন্তু-জানোয়াররা যে যতই ধূর্তই হোক—তোমার জালে পড়লে কাকেও বেরোতে হবে না। আর তোমার শিকার—তুমি যেখানে খুশি জাল পেতে বসবে, সেইখানেই তারা এসে ধরা দেবে। তা ছাড়া মানুষরা তোমার জাল দেখে তোমার ক্ষমতার কথা বইয়ে লিখে লিখে প্রচার করবে। ছোটো হলেও—টিকটিকি-গিরগিটির মতো তোমাকে কেউ তুচ্ছ করবে না—তোমার জাল হবে দুর্ভেদ্য।

সেই থেকে মাকড়সার এমন দাপট! মাকড়সা দেখলে বড়ো বড়ো বীর বাহাদুররাও ভয় পান—তুমি-আমি তো তুচ্ছ জীব।

ভুতো আর ঘোঁতো দুই ভাই। তাদের মা-বাবা ছিল না। কাকার কাছে মানুষ হয়েছিল তারা। গ্রামের গুরুমশায় যা জানতেন, সব যখন তারা শিখে নিল, তখন ভুতো বলল ঘোতোকে, "আমরা বড়ো হয়েছি, এবার নিজেরা রোজগার করে খাওয়া উচিত। চল্, কাকাকে বলে কাজ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি।"

এমনি পরামর্শ করে দুই ভাই বেরোল পথে। দুটো থলিতে ভরে কিছু খাবার, দু-বোতল জল, খান-দুই কাপড় নিয়ে সঙ্গে। সারাদিন হেঁটে হেঁটে, সন্ধ্যাবেলা ভুতো আর

ঘোঁতো পথের ধারের একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠল। সেখানে রাত কাটিয়ে, পরদিন আবার রওনা হল তারা। এমনি ভাবেই দুই ভাই চলেছে।

তিনদিনের দিন, সকালবেলা একটা বনের ধারে এল। সেখানে রাস্তাটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। রাস্তার এক দিক চলে গেছে উত্তরমুখো, অন্য দিক গেছে দক্ষিণমুখো। ভুতো বলল, "এই উত্তরমুখো রাস্তাটায় গেলে হবে।" ঘোঁতো বলল, "না দাদা, দক্ষিণমুখো রাস্তা ভালো।"

"তুই দক্ষিণ দিকে যেতে চাস যা। আমি উত্তর দিকে যাই। কী বলিস?"

তখন সেখানে বসে, খাবার খেয়ে নিল তারা। জল বের করে দ্যাখে বোতল প্রায় শেষ। যা ছিল সেইটুকু খেল। ঘোঁতো বলল, "দাদা, ঝমঝম শব্দ শুনতে পাচ্ছ?"

"হুঁ পাচ্ছি। ওই যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওখানে ঝরনা আছে বোধ হয়। চল্ ওখান থেকে বোতলে জল ভরে নিই। পথে দরকার হবে।"

বনের মধ্যে গিয়ে দুজনে দেখল, পাহাড়ের গায়ে একটা পাথরের দু-পাশে দুটো ফাটল। সেই দুটো ফাটলের ভেতর থেকে, দু-দিকে দুটো ঝরনা বেরিয়ে ঝমঝম শব্দে নিচে পড়ছে। ভুতো ডানদিকের ঝরনা থেকে জল ভরে নিল। ঘোঁতো নিল বাঁ দিকের ঝরনার জল। তারপরে দুজনে বিদায় নিল দুজনের কাছ থেকে। ঠিক করল, আবার এক বছর পরে, সেই তেমাথা রাস্তায় এসে তারা মিলবে।

উত্তর পথে ভুতো চলেছে, খানিকটা গিয়ে তেষ্টা পেয়েছে তার। বিকেল হয় দেখে, সে রাস্তার পাশে একটা গাছের তলায় বসল; থলি থেকে খাবার বের করে খেল, আর ঢকঢক করে খেল খানিকটা ঝরনার জল। বসবার সময় বেশি নেই। তাই সে উঠে দাঁড়াল যাবে বলে। কিন্তু দাঁড়াতেই তার শরীর কেমন করতে লাগ, মনে হল যেন চারিদিকের মাটি ঘাস নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবছে—এ কী রকম? হঠাৎ তার মাথাটা ঠক্ করে ঠুকে গেল গাছের ডালে। হায় সর্বনাশ! দেখতে দেখতে বেড়ে বেড়ে সে যে মস্ত লম্বা হয়ে গেছে! ঝরনার জলে কি জাদু ছিল? এদিকে, রাত হবার আগে তাকে কোনো গ্রামে পৌঁছতেই হবে। সে কাপড়খানা যেমন পারে গুছিয়ে পরে নিল, গায়ে জড়াল আর একখানা কাপড়। জামা অনেক আগেই ফালা ফালা হয়ে ফেটে গেছে।

গ্রাম বেশি দূরে ছিল না। লোকরা কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ রাস্তা দিয়ে দৈত্যের মতন প্রকাণ্ড একজন কাকে আসতে দেখে, তারা 'মা রে, বাবা রে' বলে ছুট দিল। যে যার ঘরে গিয়ে এঁটে দিল দরজা। ভুতো আর কী করে? এক মাঠের মাঝে রাত কাটাল।

সকালবেলা হাট বসেছে যখন, ভুতো সেখানে গেল খাবার কিনতে। লোকদের ডেকে বলল, "আমি মানুষ। আমি তোমাদের কিছু বলব না। বড্ড খিদে পেয়েছে, আমাকে খাবার দাও।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে? সবাই দোকানপাট ফেলে দে চম্পট। ভুতো দোকান থেকে খাবার নিয়ে পেট ভরে খেল। মস্ত বড়ো একটা ছালায় পোঁটলা বেঁধে চাল, ডাল, মুড়ি, মুড়কি নিল; জলের জন্য নিল মস্ত বড়ো একটা ঘড়া, আর নিল কাপড়ের জন্য খুব বড়ো বহরের বিছানার চাদর। তার নিজের থলি তো অনেক ছোটো হয়ে গেছে, সেটাকে গুঁজে নিল ট্যাঁকে। সব জিনিসের দাম রেখে দিল দোকানে দোকানে। তারপর রওনা হল আবার।

যেখানে যায়, সেখানেই একই ব্যাপার ঘটে। খাওয়া-দাওয়ার মুশকিল নেই, কিন্তু কাজ কোথাও পায় না। কেউ তার কাছেই ঘেঁষে না। মনের দুঃখে সে কিছুদিন একটা বনের ভিতরে রইল। শেষকালে ঠিক করল, যেখানে সবাই তার মতো বড়ো, সেই দেশ খুঁজে বের করবে; দৈত্যদের দেশে যাবে।

উত্তরের পাহাড় পার হয়ে চলল ভুতো। অনেকদিন পরে, অনেক কষ্টে পৌঁছোল দৈত্যদের দেশে। দৈত্যরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের ভাষা ভুতো জানে না। কিন্তু তারা হাত নেড়ে, নানা রকম ইশারা করে, তাদের যা বলবার বুঝিয়ে দিল তাকে। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, "এখানে কেন এসেছ?"

ভুতো বলল, "আমি কাজ করতে চাই। কিছু কাজ দিতে পার?"

একজন দৈত্য বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ পারি। আমাদের বাড়িতে একটি খোকা আছে, তার মা নেই। তাকে দেখাশুনা করতে হবে। পারবে?"

"পারব।"

দৈত্যদের ঘরে ঢুকতে ভুতোর কোনো অসুবিধা হল না। মস্ত উঁচু মাটির ঘর, পাতার ছাউনি। সেই ঘরে, মাটিতে ঘাসের মাদুর পেতে শোয়ানো আছে দৈত্যদের খোকা, যেন একটা হাতির বাচ্চা। এই গোদা গোদা হাত-পা, ফোলা ফোলা গাল, কুতকুতে চোখ। খোকাকে কোলে নেওয়া একটু মুশকিল বটে। তবু ভুতোর ভালো লাগল। মজার মিষ্টি খোকা।

দৈত্যরা পাহাড়ের কোলে থাকে। জন্তু শিকার করে খায়। গাছের ফল আর ঝরনার জল খায়। জন্তুর চামড়া-শুকোনো কাপড় পরে। কাঠ চেঁছে, পাথর কুঁদে, বড়ো বড়ো বাসন বানায়, মাটির হাঁড়ি গড়তে জানে না। বাঁশের চোঙায় ঘটি হাঁড়ির কাজ সারে। সে বাঁশও যেন বাঁশদের দৈত্য,—প্রকাণ্ড মোটা আর লম্বা।

ভুতো অল্পদিনেই সেখানকার ভাষা শিখে নিল। পাথরের মস্ত কুণ্ড-ভরা ঝরনার জল থাকে। সেই জল নিজের ঘড়ায় ভরে এনে, খোকাকে ভুতো স্নান করায়। কাঠের গামলায় দুধ এনে, কাঠের হাতা দিয়ে তাকে খাওয়ায়। থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়ায় আর গুনগুন করে গান গায়। গানের সুরে খোকার চোখ বুজে আসে।

এ তো যে-সে খোকা নয়। এ যখন ওঁয়া ওঁয়া করে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে থাকে, তখন ঘর-দুয়ার যেন কাঁপতে থাকে। কিন্তু খোকা কাঁদে খুব কম। অন্য অন্য বাড়ির মেয়েরা বলে, "মানুষরা যেমন ছেলে পালতে জানে, আমরা তেমন জানি না।"

রাত্রে খোকা ঘুমুলে ভুতো গিয়ে বসে ঘরের দাওয়ায়। আকাশের দিকে নজর রাখে। চাঁদ দেখে সে দিন-মাস ঠিক করে। মাটির দাওয়ায় খড়ি-পাথর দিয়ে দাগ কেটে তারিখ লিখে রাখে। খোকার বাড়ির দৈত্যরা জিজ্ঞাসা করে, "ও কী করছ?"

ভুতো জবাব দেয়, "হিসাব লিখছি।"

"সে কী রকম?"

দৈত্যরা কিছু কিছু গুনতে জানে, কিন্তু অঙ্ক কষতে জানে না। লিখতে পড়তে তো জানেই না। তাই ভুতো বলল, "তোমরা দু-একজন আমার কাছে লেখাপড়া একটু শেখো, তবেই বুঝতে পারবে কী রকম।"

তখন ভুতোর নতুন কাজ আরম্ভ হল। দু-একজন তখনই তার ছাত্র হয়ে পড়ল। মাস দুই পরে অন্য দৈত্যরা দেখল, এই ছাত্ররা মুখে কথা না বলেও, মাটিতে নানারকম আঁচড় কেটে, কথা বলতে পারে। এই দেখে তারা দলে দলে এল লেখাপড়া শিখতে ভুতোর কাছে। সন্ধ্যাবেলা খোকা ঘুমুলে, ভুতো এদের নিয়ে পাঠশালা বসাত।

এখন, দৈত্যদের যে সর্দার, তার একটি ছেলে ছিল বোবা, কিন্তু কানে শোনে। সর্দার ভুতোকে ধরে বসল, তার বোবা ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। এরপর থেকে সন্ধ্যায় পাঠশালায় সর্দারের ছেলেও আসত, শিখত।

আর একটা কাজও শেখাল তাদের ভুতো। মাটি দিয়ে হাঁড়ি ঘটি গড়তে, আর সেগুলো আগুনে পোড়াতে। খুব সুবিধা হল দৈত্যদের।

ক্রমে খোকা বড়ো হয়, হামা দিতে শেখে; তার দাঁত ওঠে। একদিন হিসাব করে ভুতো দেখল, এগারো মাস কেটে গেছে। এবার দেশে ফিরবার পালা। খোকা তাকে একমুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না, তাই ভুতো ঠিক করল, দুপুরবেলা খোকা ঘুমুলে, বেরিয়ে যাবে।

পরদিন দৈত্যদের কাছে বিদায় নেবার সময়, সর্দার নিজে এসে তার হাতে একটা ছোটো বাঁশের কৌটো দিল। কৌটো-ভরা ছিল লালপাথর, পদ্মরাগ মণি; আর ছিল মৃগনাভি। তারপর পাহাড়ের পথে পা বাড়াল ভুতো!

এদিকে ঘোঁতোর কী হল? ঘোঁতো খানিক দূর গিয়েই, জল তেষ্টা পেতে বোতল থেকে জল খেল। অমনই দেখে, সে কাপড়-চোপড়ের মধ্যে ডুবে গেছে। প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল সে, কিছুই বুঝতে পারল না। অতি কষ্টে কাপড়ের ভাঁজের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বুঝল সে আর আগের ঘোঁতো নেই, —হয়ে গেছে দেড় বিঘত খানিক লম্বা পুতুলের মতো একজন মানুষ। কী যে করবে ভেবে কূলকিনারা পেল না। ধুতি থেকে এক ফালি ছিঁড়ে নিয়ে পরল, এক ফালি গায়ে জড়াল। তার তুলনায় থলিটা হয়ে গেছে প্রকাণ্ড বড়ো, সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে, একটা গাছের শিকড়ের নিচে লুকিয়ে রাখল। তারপর গুটি গুটি চলল দক্ষিণের রাস্তা ধরে। চলেছে তো চলেইছে। ওই টুকু টুকু পা ফেলে ফেলে কত দূর আর যাবে?

প্রথম গ্রামটায় পৌঁছোল যখন ঘোঁতো, তখন অনেক রাত। একটা ঘরের নর্দমা নিয়ে সে ভিতরে ঢুকল। সেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে ছিল। মেঝের এক কোণে পিঁড়ির উপর ছিল তাদের পুতুলঘর। সেখানে কাঠের পুতুল মাটির পুতুল এরাও বিছানায় শুয়ে ছিল। তাদেরই বিছানার এক পাশে শুয়ে ঘোঁতো ঘুমিয়ে পড়ল!

সকালে উঠে, বাড়ির বড়ো খুকি আগে গেল পুতুলদের জাগাতে। গিয়ে তো সে মহা চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছে,—"ও মা! দেখবে এস, একটা জ্যান্ত পুতুল!"

সবাই ছুটে এল, আশ্চর্য হয়ে "বলিস কী রে?" —বলতে বলতে।

"এই দেখ না, কেমন। নড়ছে-চড়ছে। কে রেখে গেল কী জানি? বোধহয় কাল যে বিদেশি বাবুটি এসেছিলেন তিনি রেখে গেছেন।"

ঘোঁতোর ঘুম তখনও ভালো করে ভাঙেনি। বড়ো খুকি তাকে হাতে নিয়ে পেট টিপে দেখল, হাত-পা নেড়ে দেখল,—কলে চলছে কিনা। ততক্ষণে ঘোঁতো একেবারে জেগে গেছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ লাগে যে। অমন কোরো না। আমি তোমাদের মতো মানুষ। ছোট্ট হয়ে গেছি।"

বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। তার মুখে সব ঘটনা শুনে বাড়ির লোকেরা বলল, "আহা, বেচারা! — থাক তুমি, আমাদের কাছে থাক।"

"আমাকে কাজ দাও, আমি কাজ চাই।"

"তুমি এতটুকু মানুষ, কী কাজ করতে পারবে?"

"লেখাপড়া জানি। হিসাব রাখতে পারব।"

তখন ঠিক হল ঘোঁতো ঘরের মধ্যে ঝাড়-পোঁছ করবে, যতটা পারে হিসাবপত্র রাখবে, ফাই-ফরমাশ খাটবে। বাইরে তাকে যেতে দেওয়া হবে না। কাক বা চিল নিয়ে যায় যদি?

সেই লোকদের একটা খাবারের দোকান ছিল। তারা দুপুরবেলা ঘোঁতোকে দোকানে বসিয়ে, বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে, খেতে আসত। ঘোঁতো দোকান পাহারা দিত।

গ্রামে একদল ডানপিটে ছেলে থাকত, তারা দুপুরবেলা পড়াশোনা না করে, দস্যিপনা করে বেড়াত! এক দুপুরে যখন ঘোঁতো দোকানে বসেছিল, সেই ডানপিটের দল দোকানের জানলা ভেঙে দোকানে ঢুকে গেল। তারা খাবার-দাবার মুঠো মুঠো নিয়ে মুখে পুরছে দেখে ঘোঁতো চেঁচিয়ে উঠল, "এইয়ো খবরদার।"

"কে কথা বলে রে" বলে তারা চারিদিকে চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না। তখন, "ভূত রে, ভূত!" বলে সবাই হুড়মুড়িয়ে জানলা গলিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে চম্পট দিল।

বেশ আছে ঘোঁতো। কেবল একলা মোটে বাইরে বেরোতে পারে না, এই মুশকিল। ঘরের ভিতর বন্ধ থাকতে হয়। বাড়িওয়ালার পোযা বেড়ালটাকে যেন বাঘের মতো মনে হত তার। তাই দেখে বাড়িওয়ালা বিদায় করলেন বেড়ালকে। তবু মাঝে-মাঝে অন্য বেড়াল দু-একটা ঢুকতে আসত রান্নাঘরে। ঘোঁতো তখন হাঁড়ির পিছনে লুকিয়ে পড়ত। তার বুক দুরু-দুরু কাঁপতে থাকত। বাইরে কুকুর ডাকলে মনে হত যেন বাঘ ডাকছে।

দিন কারও বসে থাকে না। ঘোঁতোরও ক্রমে এগারো মাস কেটে গেল এই বাড়িতে। তারপর সে রওনা হল সেই তেমাথায় যেতে, সেখানে তার দাদা উত্তরদিকে চলে গিয়েছিল। বাড়ির লোকেরা পরামর্শ দিল, "কাপড় দিয়ে গা মাথা ঢেকে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে যেয়ো।"

গুটিগুটি চলেছে ঘোঁতো, পা মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে। কখন একটা চিলের নজর পড়ল তার ওপর! চিলটা নেমে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তাকে। ভাগ্যে গায়ের কাপড়ে ধরেছিল, তাই ঘোঁতোর গায়ে নখ লাগেনি। চিল চলেছে উড়ে উড়ে। ঘোঁতো চলেছে ঝুলে ঝুলে, আর ভাবছে,—'যেমনি বসবে চিল, অমনি আমাকে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। এই বেলা খসে যাই।' কিন্তু মাটিতে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে, এ ভয়ও আছে। একটা মস্ত গাছের কাছে এসে চিলটা বসতে গেল। ঘোঁতো আর কিছু না ভেবে, ঝুপ্ করে গলিয়ে পড়ল কাপড়ের ভিতর থেকে। আর, থুপ্ করে কী একটা নরম জিনিসের উপর।

সেই নরম জিনিসটা ছিল ভুতোর গা। গাছের তলায় ভুতো অপেক্ষা করছিল ঘোঁতোর জন্য। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল! গায়ে একটা কী পড়তে সে মুঠো করে ধরে নিয়ে জিনিসটাকে চোখের সামনে এনে ধরল। মনে হল আরশোলার মতো ছোটো একটা কী যেন। তাই তো,— মানুষ যে! ভুতো জিজ্ঞাসা করল "তুই কে রে?"

তার বিরাট চেহারা দেখে আর গলার স্বর শুনে ঘোঁতোর পিলে চমকে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিল "আমি ঘোঁতো।"

"তুই ঘোঁতো।" বলে ভুতো চোখ কুঁচকে ভালো করে দেখল। তারপর হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। বলল, "এমন দশা কী করে হল তোর?"

"ঝরনার জল খেয়ে।"

তখন সব কথাই পরিষ্কার হয়ে গেল। ভুতো বলল, "ঝরনার জল খেয়ে আমি হয়েছি দৈত্যর মতো বড়ো, আর তুই হয়েছিস, অ্যাত্তোটুকু ছোটো।"

ঘোঁতো বলল, "দাদা, তোমার জলটা আমি খেলে কি বড়ো হয়ে যাব? আমার জলটা তুমি খেলে কি ছোটো হয়ে যাবে?"

"কই তোর জল কই?", ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল ভুতো।

"পথের ধারে একটা গাছের শিকড়ের নিচে রেখেছি। আমাকে নিয়ে চল, তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।"

তখন ভুতো ঘোঁতোকে হাতে নিল, ঘোঁতো পথ দেখিয়ে চলল। গাছের নিচে পৌঁছে ঘোঁতো থলি বের করল। ভুতো ট্যাঁক থেকে তার থলি বের করল।"

ভুতো একবার বলল, "যদি জল খেয়ে তোর মতো আরশোলা হয়ে যাই তবে আরও খারাপ। না হয় বড়োই রইলাম।"

ঘোঁতো বলল, "আগে তোমার জলটা আমি খেয়ে দেখি। তোমার মতো বড়ো হয়ে যাই তো দুঃখ নেই। কিন্তু এই রকম ছোটো থেকে, বেঁচে লাভ কী?"

বলে সে ভুতোর জল নিয়ে খেল। খেতেই বড়ো হয়ে মানুষের মতো শরীর হল তার। ভুতো তখন ঘোঁতোর জলটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল, আর, ছোটো হতে হতে, হয়ে গেল আগের মতো মানুষ। তখন দুজনের ফুর্তি দেখে কে।

সুকুমার রায়

এক ছিল রাজা

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্র-মিত্র আমিব-ওমরাহ্ সিপাই-সান্ত্রি গিজ-গিজ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডানদিকে উঁচু থামের ওপর বসে ঘাড় নিচু করে চারিদিকে তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কঃ"।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ—এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ একসঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ করে রইল। মন্ত্রী একতাড়া কাগজ নিয়ে কী যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই করে রাজার মাথার ওপর পড়ে গেল। রাজামশায়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাকো।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজামশায় বললেন, "মাথা কেটে ফেল।"

সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে! সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। রাজামশায় খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই মাথা কই?"

জল্লাদ বেচারা হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?"

রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কী রে! যে ওইরকম বিটকেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।"

শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিঃশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে সেখান থেকে উড়ে পালাল!

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন যে, ওই কাকটাই ও রকম আওয়াজ করেছিল! তখন রাজামশায় বললেন, "ডাকো পণ্ডিত-সভায় যত পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির। তখন রাজামশায় পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ করে এমন গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ?"

কাকে আওয়াজ করল তার আবার কারণ কী? পণ্ডিতেরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরামতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু করে জবাব দিল, "আজ্ঞে, বোধহয় তার খিদে পেয়েছিল।"

রাজামশায় বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি-মুড়কি বিক্রি হয়? মন্ত্রী ওকে বিদেয় করে দাও—"

সকলে মহা তম্বি করে বললে, "হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক, ওকে বিদেয় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স-পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনি রূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কী?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধির লোকও এই রকম আবোল-তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এ রকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজামশায় দস্তুরমতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকে চুলকে কারও কারও মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল। রাজামশায়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর পণ্ডিতদের 'মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা, বলে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা শুঁটকোমতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চিৎকার করে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা-মন্ত্রী পাত্র-মিত্র উজির-নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হল, কী হল?" তখন অনেক জলের ছিটে, পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল "মহারাজ, সেটা কি দাঁড়কাক ছিল?" সকলে বলল "হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বল দেখি?" লোকটা আবার বললে "মহারাজ, সে কি ওই মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসেছিল—আর মাথা নিচু করেছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ' করে শব্দ করেছিল?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ—ঠিক ওইরকম

হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায় হায় সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন?'.

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তোমরা তখন খবর দাওনি কেন?"

লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সে কথা বলতে তারা সাহস পেল না, সবাই বললে, "হ্যাঁ, ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কী খবর দেবে, এ কথা কেউ বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত করে বললে, "দ্রিঘাংচু!" সে আবার কী! সবাই ভাবল লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দিঘাঞ্চু কী হে?" লোকটা বলল "দিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, "ও!"

তখন রাজামশায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কী রকম হে?"

লোকটা বললে, "আজ্ঞে, আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডা-দিকের থামের উপরে বসে মাথা নিচু করে দক্ষিণদিকে মুখ করে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' বলে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয়নি বলে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে, করতে কী?"

লোকটা বললে, "মহারাজ সে কথা বললে যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে বলে ফেল।"

সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল, "মহারাজ আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি, দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র তাকে যদি বলতে পারতাম তাহলে কী যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?"

রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বল তো।"

লোকটা বললে, "সর্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি, আপনি দু-দিন উপোস করে তিনদিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হলেই সর্বনাশ।"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়া কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজামশায় দুদিন উপোস করে তিনদিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইট পাটকেল চিৎ পটাং
মুশকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজামশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন; আর চেয়ে দেখতেন কোনোরকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।

প্রমথনাথ বিশী

এক ডোবায় অনেক ব্যাঙ বাস করত। পাশের এক ডোবা থেকে এক প্রবীণ ব্যাঙ সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, ভাই সকল, এবার আমাদের সর্বনাশ হতে চলল, আর কাউকে বেঁচে থাকতে হবে না।

সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে শুধাল, কী হয়েছে খুলে বল।

তখন আগন্তুক ব্যাঙটি বলল, বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি শীঘ্রই সূর্যঠাকুরের বিয়ে। তারপর ব্যাখ্যা করে বলে, একা সূর্যঠাকুরের প্রতাপেই আমরা অস্থির, গ্রীষ্মকালে বিল খাল ডোবা শুকিয়ে যায়, কোনোরকমে প্রাণরক্ষা করি। এরপর সূর্যঠাকুরের ছেলেমেয়ে হলে তাদের সকলের প্রতাপে পৃথিবীতে কোথাও আর এতটুকু জল থাকবে না, তখন আমাদের মৃত্যু ছাড়া গতি থাকবে না।

তার কথা শুনে ডোবার ব্যাঙদের মুখ শুকিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারও কথা বলবার শক্তি থাকল না।

তারপর প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সকলে একসঙ্গে হায় হায় শব্দে কেঁদে উঠল : এবার আমরা সবংশে মারা গেলাম; কেউ আর আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

একজন পরামর্শ দিলে, চল, আমরা পালাই।

অন্যরা বলল, পালাবে কোথায়? সর্বত্র সূর্যঠাকুরের প্রতাপ।

তখন তারা আরও উচ্চ স্বরে কাঁদতে শুরু করল।

এমন সময় এক শৃগাল জলপান করবার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং ব্যাঙদের ক্রন্দন শুনে কারণ জিজ্ঞাসা করল।

তখন সেই প্রবীণ ব্যাঙটি কান্নার কারণ বুঝিয়ে বলল।

সমস্ত শুনে শৃগাল মনে মনে ভাবল, যে-ডোবায় এতগুলি নির্বোধের বাস সেখাল জল পান করা উচিত নয়। জল স্পর্শ না করেই সে তখন প্রস্থান করল।

বীরপুরুষ

শিল্পী : নন্দলাল বসু

তোতা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস ইত্যাদি। সদাগর তাই ফুরসত পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দু-দণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন, ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে

ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। জোগাড়-যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষে গোষ্ঠী-কুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কী সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কী সওগাত চায়। তোতা বললে,—হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো কিছু অন্যায়ও নয়।

সদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সব সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতাপাখি দেখে। তখখুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বদ্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পার?

কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনই বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আফসোস করলেন—নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্য। স্থির করলেন এ মূর্খামি দু-বার করবেন না।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ওঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কী হয়, বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম'—আসুন আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি—তোতা চেঁচাল।

সদাগর হেঁ-হেঁ করে গেলেন। মনে মনে বললেন, খেয়েছে।

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে—হুজুর, সওগাত?

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতেও পারেন না চাপতেও পারেন না।

কী আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এ রকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায় হায়, কী বেকুফ কী বে-আক্কেল আমি! একই ভুল দু-বার করলুম!' পাগলের মতো মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন অর আফসোস ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কী লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ফুরুৎ করে তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে শুধালেন,—মানে?

তোতা এবার প্যাঁচার মতো গম্ভীর কণ্ঠে বলল,—হিন্দুস্তানে যে তোতা আমার বদ্‌নসিবের খবর পেয়ে মরে যায়, সে কিন্তু আসলে মরেনি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠাল, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাব।

ব্যাঙ আর হাতির গল্প

চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য

এক যে ছিল ব্যাঙ, আর সেই ব্যাঙেব এক যে ছিল বউ—ব্যাঙানি। ব্যাঙ আর ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি দুজনে বনের মধ্যে ডুমুর গাছতলায় কচু আর কলমির ঝোপের ছায়ায় দিব্বি সুন্দর ঘর করে থাকত। ব্যাঙ সারাদিন আরামে ঘুমোত। ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি ঘর-দোর সব সামলাত। একদিন সকালবেলা ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি যাচ্ছিল ঘট মাথায় নিয়ে ডোবা থেকে জল আনতে। যেতে যেতে যেই অশ্বত্থতলা পার হয়েছে,—তখন ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি দেখে,—পথ জুড়ে হেই উঁচু মস্ত পাহাড় যেন—কী আবার—মস্ত এক হাতি! ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানির কিন্তু ভয়-ডর কিছু নেই। ব্যাঙ তার বউকে বলে, ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি, আমি হলাম গিয়ে এই বনের রাজা, আর তুমি আমার রানি।...তাই ব্যাঙানি জানে সে রানি, রানির আবার ভয়-ডর কী? ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি রানি সবসময় গরবে ডগোমগো, তাই হাতিকে পথ জুড়ে আসতে দেখে ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানির ভীষণ রাগ হল—কেন হাতি তার পথ জুড়ে আসবে?

তখন ব্যাঙানি রাগে গরগর করতে করতে বললে—প্রথমে বললে ব্যাঙন-ভাষাতে,—

গণেশ দাদা পেটটি নাদা
খড় খেয়েছে গাদা গাদা—

কিন্তু হাতি ব্যাঙানির ব্যাঙন কথা কিছুই শুনতে পেল না। আসলে ব্যাঙানি এতো ছোট্ট যে হাতি তাকে দেখতেই পায়নি। তখন ব্যাঙানির আরও ভীষণ রাগ হল, তখন ব্যাঙানি ইংরেজিতে খুব চেঁচিয়ে বললে—

কুলো কানি মুলো দাঁতি
পথ ছেড়ে যা সরে,
আমি ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি রানি
চোখে দেখিস নে মোরে?

তখন হাতি একটু একটু শুনতে পেল। কিন্তু হাতি ইংরেজি বুঝতেই পারে না। তবু কিন্তু হাতি ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানিকে একটু একটু দেখতে পেল—সেই পাহাড়ের মতো উঁচু মাথা থেকে সেই নিচের পথে ছোট্ট-খাট্টো

ব্যাঙানি জলের ঘট মাথায় দাঁড়িয়ে আছে—হাতি একটু একটু দেখতে পেল। তখন হাতি সংসকিতো ভাষায় বললে—

কিম্ কিম্ কিম্?

হাতির কিম্ কিম্ শুনে ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি আরও ভীষণ রেগে আবার ইংরেজি ভাষায় বললে খুব চেঁচিয়ে—

কুলো কানি মুলো দাঁতি
পথ ছেড়ে যা সরে!
আমি ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি রানি
চোখে দেখিস নে মোরে?

তখন হাতি কিন্তু ইংরেজি একটুও বুঝতে পারলে না। হাতি শুধু সংসকিতো জানে কিনা। তবু ছোট্ট-খাট্টো ব্যাঙানিকে দেখে হাতির মজা লাগল, হাসি পেল। বললে হাতি:—

থাক থাক থাক থ্যাবড়া-নাকি
ধম্মে রেখেছে তোবে
মাড়িয়ে যদি দিতাম ভুলে
চেপটে যেতিস মরে!

কী কী কী বললি?—বলে ব্যাঙানি ভীষণ রেগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল:

কী আস্পর্ধা, এত বড়ো কথা—এত সাহস! দাঁড়া তবে—

এই না বলে ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি তার ব্যাঙ-বরকে চেঁচিয়ে ডেকে বললে—

শোনো শোনো এসো শিগগির
রাজা আমার বর
তোমার রানিকে ঠাট্টা করে
জংলিটার নেই ডর।

ব্যাঙানির চিৎকার শুনে ব্যাঙানির বর ব্যাঙ এক লাফে ঘুম থেকে উঠে হাঁক দিয়ে বললে—কী হয়েছে? রানি, কী হয়েছে? ব্যাঙানি অমনি জবাব দিলে—

তোমার রানি সুন্দরী আমি
আমায় ঠাট্টা করে
থ্যাবড়া-নাকি বলে আমায়
এত সাহস ধরে।

এই না শুনে ব্যাঙ ভীষণ চটে গেল। চটে গিয়ে রাগে ফুলতে লাগল। যত তার রাগ হয় তত সে ফোলে—ফুলতে, ফুলতে, ফুলতে—ব্যাঙ যেন একটা ছোট্ট-খাট্টো বেলুন হয়ে উঠল—সরু সরু হাত-পা আর পেটটি যেন ফুটবল—এই ফাটে তো সেই ফাটে। লাফাতে, লাফাতে ব্যাঙ এসে হাজির ব্যাঙানির পাশে। হাতির ঠিক সামনে এসে হাতির দিকে গোল-গোল ড্যাবা-ড্যাবা চোখ পাকিয়ে দেখতে লাগল আর বিড় বিড় করে হিন্দিতে কী সব বলতে লাগল—বলতে লাগল আর আরও ফুলতে লাগল। এই না দেখে হাতির ভীষণ হাসি পেল—হাতির হাসিও পেল আর একটু একটু ভয়ও হল—এই বুঝি ব্যাঙ এবার বেলুনের মতো ফটাস করে ফেটে যাবে—তখন হাতি ভীষণ জোরে হেসে ফেললে—

হোং, হোং, হোং, হোং,—
হাঁহ্ হাঁহ্ হাঁহ্—হোঁং হোঁং হোঁং!

আর হাতির সেই ভীষণ জোরে হাসি শুনে না, ব্যাঙ আর ব্যাঙ-বউ ব্যাঙানি অ্যায়সান ভয় পেল যে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে না, একসঙ্গে এক দুই তিন লাফে—কচু আর কলমির ঝোপ ডিঙিয়ে ঝুপ করে একেবারে এক ডুবে ডোবার জলের তলায় শালুক-খাগড়ার শেকড়ের মধ্যে গিয়ে লুকোল।

এই না দেখে হাতি তখন আরও জোরে হাসতে হাসতে চলে গেল—হোং হোং হোং—হাঁহ্ হাঁহ্ হাঁহ্—হোং হোং হোং হোং।
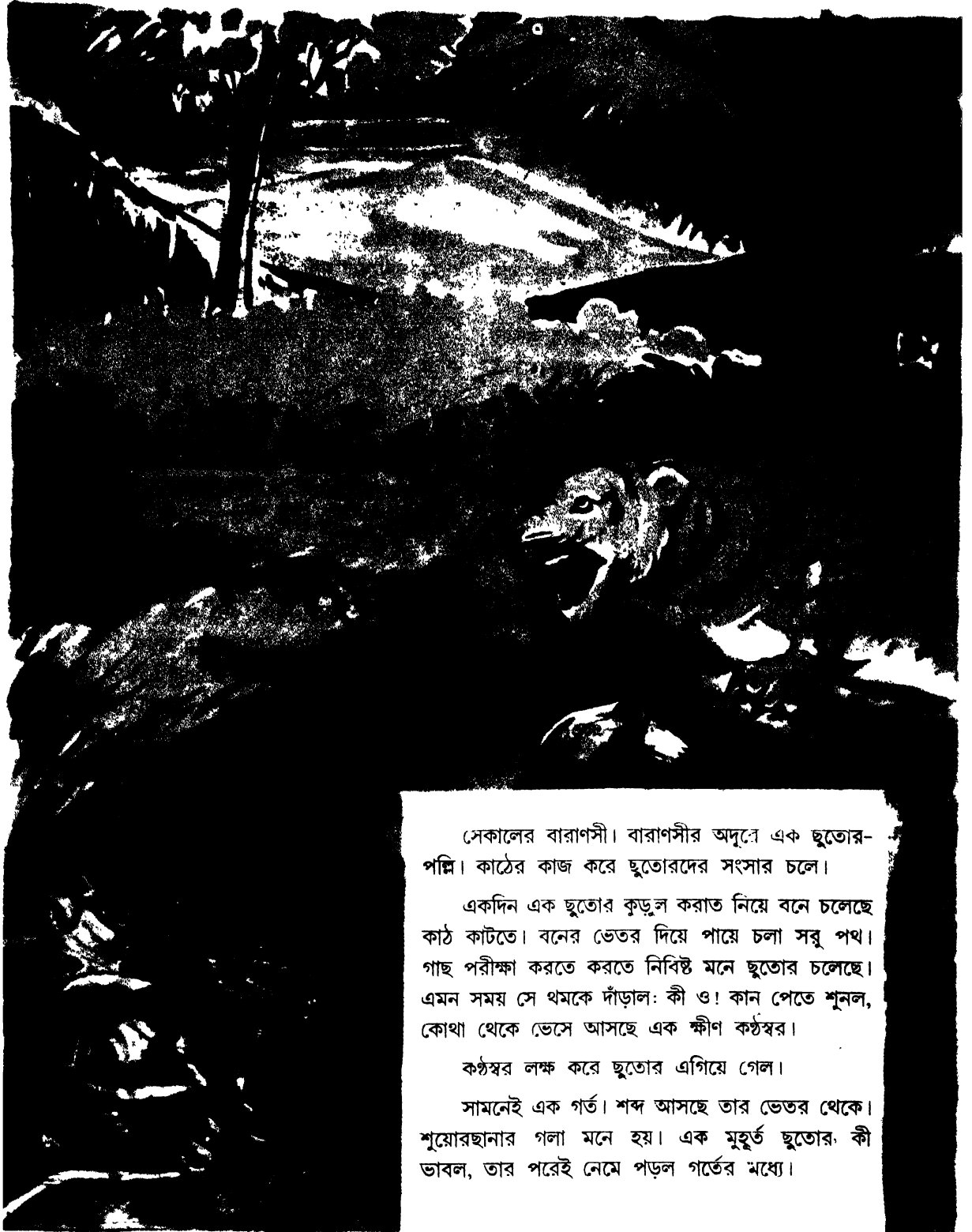
সেকালের বারাণসী। বারাণসীর অদূরে এক ছুতোর-পল্লি। কাঠের কাজ করে ছুতোরদের সংসার চলে।

একদিন এক ছুতোর কুড়ুল করাত নিয়ে বনে চলেছে কাঠ কাটতে। বনের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা সরু পথ। গাছ পরীক্ষা করতে করতে নিবিষ্ট মনে ছুতোর চলেছে। এমন সময় সে থমকে দাঁড়াল: কী ও! কান পেতে শুনল, কোথা থেকে ভেসে আসছে এক ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

কণ্ঠস্বর লক্ষ করে ছুতোর এগিয়ে গেল।

সামনেই এক গর্ত। শব্দ আসছে তার ভেতর থেকে। শুয়োরছানার গলা মনে হয়। এক মুহূর্ত ছুতোর কী ভাবল, তার পরেই নেমে পড়ল গর্তের মধ্যে।

সত্যিই তাই। এক শুয়োরছানা পড়ে আছে সেখানে। বড়ো অসহায়। না খেতে পেয়ে ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাপ-মাকে হারিয়ে ক-দিন ওখানে পড়ে আছে, কে জানে!

ছুতোর পরম যত্নে ছানাটিকে বুকে তুলে নিলে। তারপর তাড়াতাড়ি খানকয়েক কাঠ জোগাড় করে ফিরল বাড়ির দিকে।

ছুতোর নিঃসন্তান! শুয়োর-ছানাটাই যেন তার সন্তান, তার ধ্যান-জ্ঞান—সব। ছুতোর তাকে লালনপালন করে নিজের ছেলের মতো। আদর করে তার নাম রেখেছে 'অনাথ'!

অনাথ বড়ো হয়। যত দিন যায়, ততই তার আকার বাড়তে থাকে। দেশের মানুষ—যে তাকে দেখে—সে-ই অবাক হয়। সবাই বলাবলি করে, আর কত বড়ো হবে হে শুয়োরটা!

ছুতোরও অবাক হয়, আর ততই অঢেল স্নেহ দিয়ে অনাথকে সে আড়াল করতে চায় লোকের লোলুপ কুদৃষ্টি থেকে।

শেষপর্যন্ত অনাথ এক মহাকায় বরাহ হয়ে দাঁড়াল। যেমন প্রকাণ্ড তার শরীর, তেমনই ভয়ংকর দুটি বাঁকানো দাঁত—দেখলে বুক কাঁপে। গায়ের জোরও তার তেমনই। অন্য শুয়োর বা কুকুর বেড়াল তো দূরের কথা, মোষের মতো বড়ো বড়ো জানোয়ারও ভয়ে তার কাছে ঘেঁষে না।

কিন্তু চেহারা ও রকম হলে কী হয়, অনাথের স্বভাব ভারি মিষ্টি। যেমন সে ধীর-শান্ত, তেমনি বুদ্ধিমান। কারও অনিষ্ট সে ভুলেও করে না। কোনো কথা একবার বললেই বুঝে নেয়।

ছুতোরের পেছনে সে ঘোরে ছায়ার মতো, কাজে কর্মে তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করে। সবাই জানে—যেখানে ছুতোর সেখানেই অনাথ।

ছুতোর যখন কাঠের কাজ করে, অনাথ মুখ দিয়ে তার যন্ত্রপাতি—বাইস, বাটালি, কুড়ুল, হাতুড়ি, মুগুর ইত্যাদি এগিয়ে দেয়। ছুতোর যখন সুতো দিয়ে কাঠের মাপ নেয়, অনাথ তখন সুতোর আর একটা দিক মুখ দিয়ে টেনে ধরে।

অনাথ এক দণ্ড চোখের আড়াল হলে ছুতোর জগৎ অন্ধকার দেখে। গাঁয়ের বদ লোকদের কানাঘুষো তার কানে এসেছে। অনাথের নাদুস-নুদুস দেহের নরম মাংসের ওপর তাদের বড়ো লোভ। সুযোগের অপেক্ষায় তারা ওৎ পেতে আছে। তাই অনাথের জন্যে দুশ্চিন্তায় ছুতোরের রাতের ঘুম নষ্ট হবার মতো।

শেষে একদিন সে মনস্থির করল, "নাঃ! অনাথকে বনে ছেড়ে দেব। মানুষের সংসারে অনাথ বাঁচবে না।"

বনের প্রান্তে এসে ছুতোরের চোখের জল আর বাধা মানে না। অনাথের গলা জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, "বাপ, আর কেউ না জানুক, তুই তো জানিস, আমার কতখানি তুই জুড়ে ছিলি। আজ তোরই মঙ্গলের জন্যে মানুষের মধ্যে তোকে রাখতে পারলাম না। আজ থেকে তোর ভার তোকেই নিতে হবে।"

গহন অরণ্যের ভিতর দিয়ে অনাথ চলেছে। ভয়-ডর কাকে বলে সে জানে না। তবু অপরিচিত দেশ, অজানা বনভূমি। তাই এগোয় সতর্ক পদক্ষেপে—চারিদিকে সন্ধানি দৃষ্টি ফেলে। নিরাপদে বাস করার মতো জায়গা সে খুঁজছে, কিন্তু মনের মতো তেমন স্থান নজরে পড়ে না।

দূরে দেখা যায় বিরাট এক পর্বতশ্রেণি—আকাশের গায়ে কালো ঢেউ তুলে দিগন্তে মিশে গেছে।

অনাথ একসময় সেখানে এক পর্বতের নিচে এসে পৌঁছোল। পাহাড়ে ঘেরা এক পর্বত-উপত্যকা, ফুলে-ফলে ভরা। পাশেই এক প্রকাণ্ড গুহা, বাস করা ও আত্মরক্ষার মতো উপযুক্ত জায়গা বটে। খাবারেরও কোনো অভাব নেই। ফলমূল-কন্দের ছড়াছড়ি। প্রকৃতি যেন ছবির মতো করে সব কিছু সাজিয়ে রেখেছে। জায়গাটা অনাথের বড়ো ভালো লাগল। কিন্তু বড়ো নির্জন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গ জীবনের ছক আঁকছে, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ কানে যেতেই চকিতে সে ফিরে দাঁড়াল।

অবাক কাণ্ড! কোথা থেকে শ'য়ে শ'য়ে শুয়োরের পাল আসছে। বনের ভেতর থেকে, পাহাড়-পর্বতের আড়াল থেকে জোয়ান-বুড়ো কাচ্চাবাচ্চা দলে দলে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

অনাথ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তাদের দিকে।

শেষে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সে অভ্যর্থনা জানাল, "এস ভাই, এস। ভাবছিলাম একলা থাকব কী করে। তোমাদের দেখে বড়ো আনন্দ হচ্ছে। মিলেমিশে সবাই একসঙ্গে থাকা যাবে। তা, তোমরা থাক কোথায় ?"

দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে দলের এক বুড়ো শুয়োর বললে, "ওই ওখানে। কিন্তু তুমি কে ?"

অনাথ নিজের পরিচয় দিলে। তারপর আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতে সে বললে, "কিন্তু ভাই, এ জায়গাটা দেখছি ভারি সুন্দর, আমার বড়ো পছন্দ হয়েছে। সবাই মিলে এখানেই যদি থাকি তো ক্ষতি কী?"

বুড়ো শুয়োরটা বললে, "জায়গাটা সুন্দর বটে, কিন্তু বাস করা চলে না। জায়গাটা ভারি বিপজ্জনক।"

"বিপদ?" অবাক হয়ে অনাথ জিজ্ঞেস করলে, "কীসের বিপদ?"

"বাঘের!" বুড়ো শুয়োর বিমর্ষ কণ্ঠে বললে, "সাংঘাতিক বাঘের অত্যাচার এখানে। বাঘ সকালবেলায় এসে যাকে পায়, তাকেই নিয়ে যায়। আমাদের কত কাচ্চাবাচ্চা যে তার পেটে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কী করে বাঁচব, জানিনে। পালিয়েও নিস্তার নেই। দুর্দান্ত জানোয়ার সেখানেও গিয়ে হাজির হয়। তাই কেঁদেই আমাদের দিন কাটে।"

বলতে বলতে বুড়ো শুয়োরের গলা ধরে এল। দলের আর সকলেরও চোখ ছলছল করে এল। ওদের দুঃখে অনাথের বুকও ব্যথায় টনটন করে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞেস করে, "বাঘ কোন্ কোন্ দিন আসে?"

"রোজই আসে!"

"বাঘ কটা?"

প্রশ্ন শুনে শুয়োরের পাল শিউরে উঠল, "কটা মানে? একটার দাপটেই আমাদের এই অবস্থা! কটা হলে শুয়োর-বংশে বাতি দেবার কেউ কি আর এতদিন থাকত, মনে কর?"

অনাথ বোকার মতো হাঁ করে ওদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বললে, "ভাই, ঠিক বুঝতে পারছি না। বাঘ বলছ একটা, আর তোমরা দেখছি এতজন—অথচ তার ভয়ে তোমরা এত অস্থির! কেন বল তো? তোমরা সকলে মিলে কি একটা বাঘের সঙ্গে পেরে ওঠ না?"

শুয়োরের দল হতভম্ব। অনাথের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তারা শেষে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, "অ্যাঁ! পাগল নাকি? কী বকছ আবোল-তাবোল?"

দলের ভেতর থেকে একজন টিপ্পনী কাটলে, "আরে ধ্যেৎ! ওর কথায় কান দাও কেন? সারা জীবন যে মানুষের মধ্যে কাটাল, সে কী করে জানবে, বাঘ কাকে বলে!"

টিপ্পনী শুনে অনাথ যেন কেমন হয়ে যায়। চোখ দুটো জ্বলে ওঠে একবার, তারপর সামলে নিয়ে ধীর সংযত কণ্ঠে সে বললে, "ভাই, তোমরা আমাকে যা খুশি ভাবতে পার, আমার কিছু বলার নেই। এর পর হয়তো এখান থেকে চলে যাওয়াই আমার উচিত ছিল। কিন্তু তোমরা আমার স্বজাতি, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী—বিষম বিপদের মধ্যে আছ। এতদিন তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, জানতামও না কিছু, কিন্তু আজ সব জেনেশুনে তোমাদের ফেলে চলে যেতে মন চাইছে না। ভাই, আমার কথাটা তোমরা আবার একটু ভেবে দেখ। আমরা এত জন, শক্তিমান জোয়ানের সংখ্যাও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট, তবু কেন একটামাত্র বাঘের সঙ্গে আমরা পারব না? একজনের পক্ষে যা হয়তো পারা অসম্ভব, একশো জন একসঙ্গে দাঁড়ালে আর মাথা খাটিয়ে চললে তা কি পারা যায় না? আমার স্থির বিশ্বাস, নিজেদের মধ্যে বুদ্ধি আর একতা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই বাঘকে বুখতে পারব, বাঘ হেরে যাবে।"

অনাথের কথার আন্তরিকতা ও দৃঢ়তায় শুয়োরদের মধ্যে অনেকেরই এবার কেমন যেন ভাবান্তর দেখা দেয়: কথাটা নতুন হলেও ভাববার মতো। সবাই চুপ হয়ে গেছে। ফিসফাস আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে। শেষে হঠাৎ একজন বলে উঠল, "কিন্তু—যদি বাঘ না হারে?"

দৃপ্তকণ্ঠে অনাথ বললে, "তাতেই বা এমনকী ক্ষতিবৃদ্ধি হবে আমাদের? এমনিতেই মরছি তার হাতে এবং মরবও সবাই, হাজার কান্নাকাটি করলেও সে ছেড়ে দেবে না,—তখন সে যদি না-ই হারে তো, নতুন করে আমাদের কী আর এমন লোকসান হবে? কিন্তু আমার ধারণা, সে নিশ্চিত ভয় পাবে, হারবেও। কারণ এমন ঘটনা সে জীবনে কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবেনি।"

দলের মাঝে এবার আলোড়ন শুরু হয়। বিশেষত জোয়ান শুয়োরদের মনে অনাথের কথাটা বেশ দাগ কেটে গেছে।

তারা বললে, "সত্যিই তো, কথাটা তো মিথ্যে নয়! নতুন ভায়া ঠিক কথাই বলছে। এমনিতেও বাঘের হাতে আমাদের মরতে হবে, তার চেয়ে সবাই মিলে লড়াই করে মরা অনেক ভালো। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?"

কিন্তু বৃদ্ধ প্রবীণদের মধ্যে দোমনা ভাব। জীবনে তারা কত রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। তাদের একজন মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, "ধেৎ ধেৎ! গোঁয়ার-গোবিন্দের কথায় বোকারাই নাচে। বাঘের কাছে কোনো গোঁয়ারতুমিই খাটে না। কে কবে শুনেছে, শুয়োরের পাল লড়াই করেছে বাঘের সঙ্গে? ছোঃ!"

এর ফলে, দলে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। একদিকে জোয়ানের দল্, অন্যদিকে বুড়োরা! দলের মধ্যে চলল হইচই চেঁচামেচি। অনেকে আবার দোদুল্যমান, মনস্থির করতে পারছে না। অনাথ প্রাণপণে বোঝায় সবাইকে।

সে বললে, "বন্ধুগণ, একটু শোনো—নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করলে আমাদেরই ক্ষতি, বাঘের তাতে আরও সুবিধে হবে। প্রবীণ বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতা আমাদের খুব দবকার, সন্দেহ নেই! কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে তাদের আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি—আজ যে কাজ আমি করতে বলছি, এত কাল তা কখনও ঘটেনি বলেই কি সেটা খারাপ হবে? না-ঘটার ফলে আমাদের ভালো কিছু হয়েছে কী? এতদিন তো বাঘকে বাধা দেওয়া হয়নি, আমরা নীরবে মরেছি, তবুও কি সে আমাদের কিছুমাত্র দয়া করেছে? এভাবে চুপ করে থাকলে আমরা একজনও কি বাঁচব? তাই বৃদ্ধদের কাছে আমার আবেদন—হয় তারা আমাদের সঠিক কোনো বাঁচার পন্থা বলে দিন, নয়তো আসুন সবাই একসঙ্গে মিলে এক মন হয়ে নিষ্ঠুর শয়তানটাকে বাধা দেই। আমি বলছি, তাতে ফল ভালো ছাড়া খারাপ হবে না।"

শেষপর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্ক, আলোচনার পর অনাথের যুক্তি ও আবেদনে বুড়োদের মন নরম হল। তার কথায় বুড়োরা সায় দিলে। সবাই একমত হয়ে অনাথকে দলপতি নির্বাচন করল।

সভা যখন ভাঙল, পশ্চিম আকাশ আঁধার করে বনের বুকে তখন সাঁঝের ছায়া নামছে। স্থির হল, সন্ধ্যার পরে আবার সবাই সেখানে এসে মিলিত হবে।

অস্পষ্ট জোছনায় বনের বুকে আবছা অন্ধকার। গুহার সামনে শুয়োরদের সভা বসেছে। সবাই উপস্থিত। অনাথ তাদের শেখাচ্ছে—যুদ্ধ করতে হলে কীভাবে ব্যূহ রচনা করতে হয়, ব্যূহ না করলে কোনো জয়লাভ অসম্ভব, কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় আর আক্রমণই বা করতে হয় কীভাবে! বিপুল উৎসাহে দলের মধ্যে চলেছে মহড়া আর আলোচনা, আলোচনা আর মহড়া।

শেষকালে অনাথ বললে, "আমরা তাহলে বুঝতে পারছি, আমরা যে ধরনের যুদ্ধ করব, তাতে তিন রকমের ব্যূহ সুবিধাজনক: পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ। আমরা পদ্মব্যূহ তৈরি করে শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া করব। রাত শেষ হতে আর দেরি নেই এবার ভালো একটা জায়গা আমাদের বেছে নিতে হবে।"

অনেক খোঁজাখুঁজির পর পছন্দমতো একটা জায়গা পাওয়া গেল। সেখান থেকে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ দুই-ই ঠিকমতো চলতে পারে। অনাথ সেখানে তৈরি করল পদ্মব্যূহ—ঠিক যেন পাপড়ি-মেলা এক পদ্ম।

শুয়োরদের মধ্যে যখন এই রকম কর্মচাঞ্চল্য চলেছে, তখন বাঘ কিন্তু পাহাড়ের ওপারে নিজের গুহায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিভোর। তাব নাকেব ডাকে গুহা গম্‌গম্ করছে।

ভোব হলে সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। খিদেয় যে বকম পেট জ্বলছে, তাতে এক-আধটা শুয়োরে আজ আর চলবে না। খিদের তাড়নায় বাঘের মেজাজ গবম হয়ে উঠল।

দ্রুতপদে সে রওনা হল শুয়োরদের আস্তানার দিকে।

দূব থেকে বাঘকে আসতে দেখে শুয়োরের দলে সাড়া পড়ে যায়। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল, বাচ্চারা তো ভয়ে মায়েব বুকে মুখ লুকোল। আর ভিতুর দল চেঁচাতে লাগল, "সর্দার, সর্দার, বাঘ আসছে—বাঘ!"

অনাথ ব্যূহের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আবার সবাইকে অভয় দিয়ে বললে, "শোনো, কয়েকটা সংকেত তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। সময় সময় আমি এইসব সংকেত করব, আর তোমরাও তখখুনি সেই সংকেতমতো কাজ করবে। ভুল কোরো না যেন।"

সংকেত-কয়টি অনাথ সবাইকে বুঝিয়ে দেয়।

বাঘ ততক্ষণে সামনের পর্বতের নিচে এসে গেছে। অবাক হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে : ব্যাপার কী! শুয়োরের পাল দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে! তাকে দেখে পালানো দূরে থাক, একটু নড়ছে না পর্যন্ত!

ভালো করে নজর করতে সে আরও অবাক হয় : ব্যূহ? শুয়োরের পাল ব্যূহ তৈরি করেছে?

বাঘ একটু হকচকিয়ে গেল: ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে!

অন্য দিন হলে এতক্ষণে সে লাফিয়ে পড়ত শুয়োরদের মধ্যে, কিন্তু আজ একটু সাবধানে চলা দরকার।

ওদের দিকে সে তাকাল কটমট করে।

অনাথ সংকেত করল।

সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের দলও খুদে খুদে চোখ পাকিয়ে কটমট করে তাকাল বাঘের দিকে।—যদিও বুক তাদের ভয়ে দুরু দুরু করছে: এই বুঝি বাঘ রেগে দিলে লাফ।

কিন্তু বাঘ আরও ঘাবড়ে যায়: তাই তো! হল কী? চিরকাল যারা টুঁ শব্দ না করে পড়ে পড়ে মরল, আজ তাদের হল কী?

তবু, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে সে মস্ত এক হাই তুললে।

অনাথের সংকেত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরেরাও সশব্দে হাই ছাড়লে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে।

কী! শুয়োরে ভেংচি কাটছে!—বাঘ তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

কিন্তু এগোতে তার সাহস হয় না। তাই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে গোঁ গোঁ করে মারল এক লাফ।

তৎক্ষণাৎ শুয়োরের পালেও সাড়া পড়ে গেল। সবাই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে লাফিয়ে উঠল। বাঘের হাবভাব দেখে ওদের সাহস বেড়ে গেছে।

রাগে দিশেহারা হয়ে বাঘ এবার গর্জন করে উঠল। ভয়ংকর গর্জনে বনভূমি যেন কাঁপতে থাকে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে তার প্রতিধ্বনি।

সে গর্জনে শুয়োর তো দূরের কথা, বড়ো বড়ো জানোয়ার পর্যন্ত আতঙ্কে কুঁকড়ে যায়, ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে পথ পায় না।

কিন্তু আজ পালানো দূরে থাক, শুয়োরের দলও সঙ্গে সঙ্গে হুংকার ছাড়ল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। তাদের হাজার কণ্ঠের মিলিত হুংকারে বাঘের গর্জনও ডুবে গেল।

বাঘের বুক কেঁপে ওঠে। কোথায় উবে গেল তার শক্তি সাহস পরাক্রম। ভয়ে তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে: যা অবস্থা তাতে ওদের পক্ষে দল বেঁধে তাকে আক্রমণ করাও বিচিত্র নয়!

সুতরাং—

এক পা দু-পা করে পিছু হটে পেছনে ফিরেই বাঘ অদৃশ্য হল পাহাড়ের আড়ালে।

সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের দল আনন্দে যেন ফেটে পড়ল। তারা ভাবতেই পারেনি, এত সহজে বাঘ পালাবে। তাদের মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে অরণ্য-পর্বত মুখরিত হয়ে উঠল।

দলের আনন্দে অনাথেরও চোখ-মুখ উদ্ভাসিত। সবাই আজ সাহস ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর—এ কী কম কথা!

বাঘ যেদিকে গেছে, সেদিকে চোখ রেখে হাসিমুখে অনাথ বললে, "ভাই, আনন্দে আত্মহারা হয়ো না। মনে রেখ, শত্রু এখনও অক্ষত দেহে বেঁচে আছে। আমাদের অসতর্ক দেখলেই সে আক্রমণ করবে। খুব সাবধান—ব্যূহ যেন না ভাঙে।"

গুটিসুটি মেরে বাঘ তখন বাসার দিকে ফিরে চলেছে—চলেছে সন্ন্যাসীর কাছে পরামর্শ নিতে। যে গুহায় সে থাকে, তার কাছেই এক সন্ন্যাসী বাস করে। কিন্তু আসলে সে সন্ন্যাসীই নয়—সন্ন্যাসীর মুখোশপরা এক ভণ্ড শঠ। বাঘ দৈনিক যে শুয়োর মেরে আনে, তার একটা মোটা অংশ সে পায়। বাঘের সে পরামর্শদাতা। সে-ই বাঘকে বুঝিয়েছে, কচি বাচ্চা আর বড়ো বড়ো মোটা শুয়োরের মাংসই সবচেয়ে সুস্বাদু। বাঘ তাই রোজ বেছে বেছে শিশু আর জোয়ান শুয়োরদের হত্যা করে।

সেদিন সন্ন্যাসী সকালবেলায় বাঘের পথ চেয়ে বসে আছে, এমন সময় শুকনো মুখে বাঘ ফিরে এল। সন্ন্যাসীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। খানিকক্ষণ হাঁ করে বাঘের দিকে চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞেস করলে, "কী হে, ব্যাপার কী? খালি মুখে ফিরে এলে যে?"

বাঘ নির্বাক। মুখ নিচু করে বসে রইল। সন্ন্যাসী আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আরে কথা বলছ না কেন? হয়েছে কী? তোমার শুকনো মুখ আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, খুব ভয় পেয়ে গেছ। খুলে বল, কী হয়েছে। বনে তোমার চেয়েও শক্তিমান কেউ এসেছে নাকি?"

মুখ কাঁচুমাচু করে বাঘ তখন খুলে বললে সব কথা। বললে, "ঠাকুর, যে শুয়োরের পাল আমায় দেখলেই ভয়ে আধমরা হত, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে দিশে পেত না, আজ কিন্তু তাদের মধ্যে কী এক ব্যাপার ঘটে গেছে।

আজ আমাকে দেখে পালানো দূরে থাক্‌, ব্যূহ রচনা করে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সে চেহারা দেখে আমার আর এগোনোর সাহস হল না।''

সন্ন্যাসী যেন আকাশ থেকে পড়ল। জানোয়ারটা বলে কী? শুয়োরের পাল ব্যূহ তৈরি করেছে! আর তাই দেখে হতভাগা বাঘ হয়েও কিনা পালিয়ে এল! অবস্থাটা কল্পনা করে হঠাৎ সে হেসে ফেললে। বললে, ''তোমায় কী যে বলব, ভেবে পাচ্ছি নে। সত্যিই আমায় অবাক করেছ! শুয়োরের ভয়ে বাঘ পালিয়ে এল, এমন উদ্ভট কাণ্ড কোনো কালে কেউ শুনেছে? ছিঃ ছিঃ ভাবতেও ঘেন্না করে।''

বাঘেরও এবার বড়ো লজ্জা হয়। সত্যিই তো! হঠাৎ এভাবে পালিয়ে আসাটা তার পক্ষে খুবই খারাপ হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে সন্ন্যাসী আবার বললে, ''আচ্ছা, পালিয়ে আসার আগে একবারও কি তোমার মনে হয়নি যে—তুমি বাঘ, বনের রাজা, তোমার ভয়ে বড়ো বড়ো জন্তু-জানোয়ার পালায়, শুয়োর তো কোন্ ছার? একবারও কি ভেবেছ, আজকের এই লজ্জাকর ঘটনা শুনলে বনের আর সব পশুরা কী ভাববে? আর কি তারা তোমায় গ্রাহ্য করবে?''

বাঘ আর সহ্য করতে পারে না। সামনের দুই থাবা জোড় করে সে বললে, ''ঠাকুর, ক্ষমা দিন, আর বলবেন না। সত্যিই, হঠাৎ একটা ঘেন্নার ব্যাপার ঘটে গেছে। শুয়োরদের লম্ফঝম্প দেখে আমার মাথাটা তখন কেমন যেন বিগড়ে গিয়েছিল। এখন বলুন, কী করতে হবে। আমায় ভয় দেখানোর মজাটা সুদে-আসলে ওদের টের পাইয়ে দেব।''

বাঘের কথা শুনে সন্ন্যাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। একগাল হেসে বললে, ''বেশ বেশ, এই তো বাঘের মতো কথা! গতস্য শোচনা নাস্তি—যা হবার হয়ে গেছে। এখন যা বলি, মন দিয়ে শোনো। এখুনি ফিরে যাও। গিয়েই প্রথমে দেখবে, ওদের সর্দার কে। নিশ্চয়ই নতুন কোনো শুয়োর এসেছে। তারই পরামর্শমতো ওদের এত লম্ফঝম্প। গর্জন করে প্রথমে তারই ঘাড়ে তুমি লাফিয়ে পড়বে। তাহলে সে তো মরবেই, আর সেই সঙ্গে শুয়োরের পালও ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারে, ছুটে পালানোর পথ পাবে না। যাও। ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই।''

নতুন উৎসাহ নিয়ে বাঘ তখনই রওনা হয়।

দূর থেকে বাঘকে আসতে দেখে শুয়োরের দল চেঁচিয়ে ওঠে, ''সর্দার, দেখ দেখ, বাঘটা আবার ফিরে আসছে।''

অনাথ জানত, বাঘ ফিরে আসবেই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরবে, ভাবেনি। সে বুঝল, বাঘের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার আর দেরি নেই। সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে, নিজেও সে মনে মনে তৈরি হল। পালকপিতার কথা তার মনে পড়ছে বারবার।

ইতিমধ্যে বাঘ এসে দাঁড়িয়েছে সামনের পর্বতের নিচে। একটু লক্ষ করতেই সে দেখল, বিরাট এক দাঁতালো শুয়োর উঁচু একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে অন্যদের কী যেন সব বলছে।

ওটাই তাহলে পালের গোদা—যত নষ্টের মূল?

এমনিতেই বাঘ অপমানের জ্বালায় জ্বলছে, তার ওপর সর্দারকে দেখে বিষম রাগে সে গর্জন করে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে প্রচণ্ড লাফ দিল অনাথকে লক্ষ করে।

অনাথ ইচ্ছা করেই বাঁকা গর্তটার কিনারায় দাঁড়িয়েছিল। বাঘকে লাফ দিতে দেখে সে চোখের পলকে ঘাড় নিচু করে সামনের গোল গর্তটার মধ্যে ঢুকে গেল। আর বাঘ নিজের বেগ সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বাঁকা গর্তের মধ্যে। অনেক ভেবে-চিন্তে অনাথ গর্তটা তৈরি করিয়েছিল। বাঘ তার মধ্যে এমনভাবে আটকে গেল যে, নড়াচড়াও বন্ধ।

বিদ্যুদ্বেগে অনাথ গোল গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ংকর হুংকার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের ওপর বাঘের উরুতে দাঁত বসিয়ে তার তলপেট সে ফেঁড়ে ফেললে, তারপর দাঁত দিয়ে মাথার খুলি ভেঙে ফেলে তাকে গর্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, ''এই নাও তোমরা, যমের বাহনকে পাঠিয়ে দাও যমের কাছে।''

সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় আক্রোশে শুয়োরের পাল ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর।

তারপর সে কী বাঁধভাঙা আনন্দ-হুল্লোড়! পাশে বসে অনাথ বিশ্রাম করছে, তারও আনন্দের সীমা নেই। এমন সময় কয়েকটি বুড়ো শুয়োর এগিয়ে এল, সর্দারের ওপর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাদেরও অন্তর উদ্বেলিত, বললে, ''সর্দার, সবাই আনন্দ করছে বটে, কিন্তু প্রধান

বিপদ এখনও কাটেনি। বাঘ মরলেও আসল শত্রু এখনও বেঁচে আছে। ইচ্ছে করলে সে ওরকম দশটা বাঘ এনে হাজির করতে পারে। আনন্দের আতিশয্যে সে কথা ওরা ভুলে গেছে।''

অনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ''সে কী! আসল শত্রু তাহলে বাঘ নয়? কে সে?''

বুড়োরা বললে ''সে এক ভণ্ড তপস্বী। মূর্তিমান শয়তান—সে-ই হল বাঘের গুরু ও মন্ত্রণাদাতা। বাঘের গুহার কাছেই সে থাকে।''

''বটে! এ কথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'' বলতে বলতে অনাথ উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়ল, ''বন্ধুগণ আনন্দ করার সময় এখনও আসেনি। তোমরা কি ভুলে গেলে, প্রধান শত্রু এখনও বেঁচে আছে? সে বেঁচে থাকতে আমাদের বিশ্রাম নেই। সেই ভণ্ড তপস্বীর সঙ্গে এবার আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে। এক্ষুনি যেতে হবে, সে যেন পালিয়ে না যায়।''

নিজের কুঁড়েয় বসে তপস্বী ভাবছে। মনে নানা দুশ্চিন্তাঃ বাঘের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কোনো ঝঞ্ঝাট বাধল না তো?''

শেষপর্যন্ত তপস্বী উঠে দাঁড়াল। চুপচাপ বসে থাকা কাজের কথা নয়। এত বেলা হল, ব্যাপারটা একবার দেখা দরকার। এক-পা দু-পা করে সে এগোল শুয়োরদের আস্তানার দিকে।

কিন্তু কিছুদূর যেতেই সে চমকে উঠল—অ্যাঁ! কী ব্যাপার! শয়ে শয়ে শুয়োর আসছে। ছুটে আসছে তাকে লক্ষ করে! সর্বনাশ! ভয়ংকর সব দাঁতালো শুয়োর!

আতঙ্কে তপস্বীর প্রাণ উড়ে গেল। পেছন ফিরেই সে দৌড়ল কুঁড়ের দিকে। তারপর চোখের নিমেষে তলপিতলপা গুটিয়ে আবার দিল ছুট।....

আগে সন্ন্যাসী, পেছনে শুয়োর। সন্ন্যাসী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে, আর পেছনে হুংকার দিয়ে তেড়ে আসছে শুয়োরের দল। ব্যবধান ক্রমেই কমে আসে।

সন্ন্যাসী দৌড়োয় আর পেছনে তাকায়। আর নিস্তার নেই! কাছেই ছিল এক যজ্ঞডুমুরের গাছ। তলপিতলপা ফেলে মরি-বাঁচি করে সন্ন্যাসী তরতর করে তার আগডালে উঠে গেল।

শুয়োরের দল এসে দাঁড়াল গাছতলায়। এখন কী করা?

অনাথ বললে, ''কোনো চিন্তা নেই। গাছে উঠেও শয়তান নিস্তার পাবে না। যা বলি, সেইমতো কাজ কর।''

দলকে সে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে বললে, ''শোন, মেয়েরা জল এনে গাছের গোড়ায় ঢালবে। ছোকরার দল গাছের গোড়ার সেই ভিজে মাটি খুঁড়বে আর দাঁতালো জোয়ানেরা গাছের শিকড় কাটবে! বাদ-বাকি সবাই গাছের চারিদিকে ঘিরে থাকবে, শয়তানটা যেন গাছ থেকে নেমে পালাতে না পারে।''

সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হল।

শুয়োরির দল গাছের গোড়ায় জল দিতেই মাটি নরম হয়ে গেল। অমনি মহা উৎসাহে কাজে লাগল ছোকরার দল। গোড়া খুঁড়ে ফেলতেই শিকড় বেরিয়ে পড়ল।

গাছের ওপরে সন্ন্যাসীর চোখ তখন আতঙ্কে কপালে উঠে গেছে।

এবার এগিয়ে এল দাঁতালো জোয়ানেরা। তাদের দাঁতের এক-একটা ঘায়ে গাছ থরথর করে কেঁপে ওঠে, আর এক-একটা শিকড় কাটা যায়। গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে সন্ন্যাসী তখন ঠক-ঠক করে কাঁপছে, আর আকুল হয়ে ডাকছে ভগবানকে।

একে একে সব শিকড় কাটা হয়ে যায়। কিন্তু মূল শিকড়টা বেশ মোটা, কেউ আর কাটতে পারে না।

অনাথ এতক্ষণ সকলের কাজের তদারক করছিল। এবার সে এগিয়ে এল। তারপর লোকে যেমন কুড়ুলের কোপ মারে গাছের গোড়ায়, তেমনিভাবে ছুটে গিয়ে সে দাঁতের ঘা মারল শিকড়ের উপর। ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গে শিকড় দু খান।

মড়মড় শব্দে গাছ ভেঙে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল সন্ন্যাসী। চোখের পলকে শুয়োরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

তারপর!

পরম স্বস্তি। অনাথের নেতৃত্বে এবার থেকে তাদের নিশ্চিন্ত সুখের জীবন।

রাজপুত্তুরের গল্প

সোমেন চন্দ

রাজপুত্তুরের নাম ইন্দ্রনাথ। বড়ো একটা দেশ একেবারে কম আয়াসে জয় করে নিলে! অত অত সৈন্য নেই, তেমন হাতি নেই, ঘোড়া নেই, তেমন কামান বন্দুক নেই তবু জয় করে নিলে। তারপর তার খুশি দেখে কে? এমন হলে কে না খুশি হয়? রাজ্য পেয়েই তো ইন্দ্রনাথ রাজা হল। এবার শাসনের পালা। অত বড়ো দেশ সে কেমন করে শাসন করবে? কিন্তু ইন্দ্রনাথ ঘাবড়াল না।

খুব বুদ্ধিমান কিনা! শাসন-কাজে আগে যে সব বড়ো বড়ো কর্মচারী ছিল তারা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই জন্য তাদের একেবারে পথে বসানো হল না। ছেলে বা অন্য কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে সেই সব পদে নিযুক্ত করা হল। কাজেই তারা অধীন থেকেও খুশিই হয়ে গেল। আর যারা বিদ্রোহ করেছিল, সংখ্যায় তারা অল্প, তাদের কেউ করলে আত্মহত্যা, কেউ পালিয়ে গেল দেশ থেকে। কিন্তু কী ক্ষমা! তাদের খালি তক্তপোযে তাদের আত্মীয়স্বজনদেরই বসানো হল, লোকচক্ষে নিজে বেদখল না করে—আসলে কিন্তু রাজ্যশাসন করবে নিজেই, অথচ জনসাধারণ ভাবল, কী ভালো আমাদের নূতন রাজা! দেখ, ওদের কোনো শাস্তি পর্যন্ত দিলে না!.

রাজকুমার ইন্দ্রনাথের বুদ্ধি আছে। এইভাবে রাজ্য জয়ের ব্যাপারে যে সব বিশৃঙ্খলা জেগে উঠেছিল, সে সব সহজেই থামানো গেল। ইন্দ্রনাথের নিজের দেশ যেখানে ছিল—এই নূতন রাজ্যের কাছেই, নইলে আর অত সহজে জয় করা যাবে কেন, সেই দেশের রীতিনীতি আইন-কানুন, শাসনের অবস্থা সব ভালো করে' জেনেই সে এসেছিল—নিজের যে দেশ, সেখানে লোক ভয়ানক গরিব, সেখানে যেমনি পাঁচজন লোক খেতে পায় তো পঞ্চাশ জন না খেয়ে থাকে, সেখান থেকে লোক আনিয়ে ইন্দ্রনাথ তাদেরর ভালো ভালো চাকরি—যে সব চাকরিতে দায়িত্ব আর সিন্দুক খোলার চাবি,—দিলে। এতে এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল; লোকগুলো তো নিজের দেশের আর হাতের; ভুলেও কখনও বিদ্রোহ করবে না, বরং এদের জোরে পরের রাজ্যে নিজের পক্ষটা শক্তিশালী হল। এদিকে ছোটো ছোটো আর মাঝারি গোছের সমস্ত চাকরি, যেগুলিতে নেই দায়িত্ব আর চাবি, সেগুলো দেওয়া হল এই দেশের লোকদের—রীতিমতো মাইনে আর বুড়ো হলে চাকরি ছাড়বার সময় অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে পাওয়া যায়, যা আগে ছিল না। এই পেয়ে সকলে খুশি।

এইভাবে চলছে তো চলছেই, অনেকগুলো বছর গেল কেটে। ইন্দ্রনাথ শাসনের সুবিধার জন্য সারা দেশটা কতকগুলো ভাগে ভাগ করে নিলে—এখানকার লোক বুঝলে, এই,—আর মনে করল, তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন লোক। আসলে একই দেশে বাস করল, কারণ মহারাজ ইন্দ্রনাথই যে রয়েছে সকলের উপরে, মূল ক্ষমতার অধিকারী সে-ই। কিন্তু দু-একজন যারা চিন্তাশীল তারা ভাবল, এ সব বাইরের চটক, দোকানদারের গ্রাহক-আকর্ষণ করবার মতো একটা উপায়। তারা প্রতিবাদ জানাল। ইন্দ্রনাথ মনে মনে ঘাবড়ে গেল, এতকাল নিশ্চিন্তে রাজত্ব করে, পরেরটা দিয়ে নিজের দেশের আর ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বাড়িয়ে, অথচ বুদ্ধি খাটিয়ে এদেশের অত অত অনুভূতি-ছাড়া লোকদের খুশি রেখে, বা খুশি না রেখেও প্রতিবাদ করবার মুখ কৌশলে ভেঙে অমন আরামের সন্ধান পেয়ে এতকাল ভাবতেও পারেনি যে তার ভেতরের কৌশলও অনেকে ধরে ফেলেছে, সে মনে মনে ভয়ানক ঘাবড়িয়ে গেল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করল না। রাজ্য পাবার পর এতকাল সে এ দেশেরই লোক দিয়ে অনেক সৈন্য তৈরি করেছে, ভাবতে পারা যায় না সে কত সৈন্য! আর তৈরি করিয়েছে কত দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র, জোগাড় করেছে কত ঘোড়া, হাতি,—নিযুক্ত করেছে এ দেশেরই লোক দিয়ে কতগুলি চর। তাই সে প্রথমে কিছু গ্রাহ্যই করলে না, কিন্তু কানের কাছে সব সময় একটা জিনিস বাজলে তার তো প্রতিকার করতে হয়। তাই ইন্দ্রনাথ ডেকে পাঠাল তাদের, ওই কটি লোককে যদিও অনায়াসে পারত, তবু কামান দিয়ে দিলে না উড়িয়ে, নিজের আত্মসম্মান একটু নষ্ট করা হল এই মনে করেও সে তাদের ডেকে পাঠাল। তারা এল রাজপ্রাসাদে।

ইন্দ্রনাথ খুব আদর আপ্যায়ন করে জিজ্ঞেস করলে, কী তাদের দাবি।

তারা সব বললে।

তারা এমনি অনেক দরবার-বৈঠক করলে কিন্তু আসল কথাটি পেল না, ইন্দ্রনাথ আগের উপায়ে শুধু দেরি করতে লাগল, অথচ কোনোক্রমে রাজকীয় ভদ্রতার এতটুকু ব্যাঘাত হল না। দেশের বেশিরভাগ লোকই গরিব আর অজ্ঞ। ঈস্, কী পুণ্য ছিল আগের জন্মে, দেশের রাজার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গিয়ে দেখা করছে, রাজা তাদের আদর করছেন, কী ভাগ্যি, কী আশ্চর্য। তার ওপর আর তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করা হচ্ছে, সর্দারি! আমরা বেশ আছি, খুব ভালো আছি, তোমরা বাপু সর্দারি করতে গেলে কেন? ঈস্, কী আশ্চর্য! রাজা নিজে ডেকে কথা বলছেন—তারা এই ভাবল, অর্থাৎ বেশিরভাগ লোকই এই ভাবল। কাজেই তারা, যারা প্রতিবাদ করে, আর

তেমন জোর পাবে কোথায়? তবু ছাড়ল না। ইন্দ্রনাথ অনেক চিন্তা করলে, শেষে বুদ্ধি খাটিয়ে—খুব বুদ্ধিমান কিনা—একটা উপায় স্থির করলে। সে সিন্দুকের চাবি হাতে রেখে বড়ো বড়ো চাকরিগুলোও এই দেশের লোকদের দিতে আরম্ভ করলে; মস্ত মাইনে, রাজার মতো মাইনে, যা কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। লোকের আশ্চর্যের আর সীমা নেই। বললে, অমুক চাকুরে আমার অমুক আত্মীয়, আর কী আনন্দ হল। সকলেই যে বলতে পারল বা পারে, এমন নয়, তবু স্বপ্ন ভেবেও, লোকের সঙ্গে গল্প করেও খুশি হল। অথচ নিজেদের খাবার একবেলা জোটে তো আর একবেলা জোটে না, ভারি অসুখ হয় তো চিকিৎসা হয় না, ঘর ভেঙে পড়ে তো এক খণ্ড বাঁশও জোটে না, জল জোটে তো ময়লা। আর যাদের কথা বলে তারা হাসে, জমায় আড্ডা, করে গর্ব, দেখে স্বপ্ন, খুশি করে অন্যকে, তারা কিন্তু এক-একটি বাদশা, এক-একটি আমির, তাদের না খেয়ে থাকার দিন থেকে কেড়ে নেওয়া কড়ি দিয়ে এক-একটি রাজা।

এর পরে কয়েক বছর চলে গেল। ইন্দ্রনাথ এর মধ্যে মোটা মাইনের—যা কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—মোটা মাইনের আরও অনেক চাকুরে সৃষ্টি করলে। শিক্ষা যাদের প্রচুর এবং অনুভূতি যাদের ভোঁতা, তাদের রাখল হাতে, তাদের তৈরি করলে দেশ শাসনের অস্ত্র। এদের কল্যাণে কেউ আর প্রতিবাদ করবে না, কারণ তারা যে এই দেশেরই মানুষ। আগের দিনে দরকার ছিল অস্ত্রের, এখন কেবল বুদ্ধির, ইন্দ্রনাথ খুব হাসল। কিন্তু যারা প্রতিবাদ করে তারা তো পায় না আমোদ, তাদের নাকি বুক জ্বলে, চোখ নাকি জ্বলে। তারা বোঝাতে লাগল, তোমার আমার না-খাওয়ার কড়ি নিয়ে ওরা এক-একজন বাদশা, তোমার আমার গায়ে ঘাম ঝরিয়ে ওরা শোয় সোনার পালঙ্কে। তারা দেখিয়ে দিলে, এই যে রেশমের কারখানা, কাপড়ের তাঁত, এই যে দু-লাখ টাকা আয়ের চৌধুরী,—আমরা এদেরই চালক, আমরা এদের চালাই, আমরাই এদের জন্য স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করে দিই, এরা সোনার থালে খায় আমাদেরই জন্যে, এদের জীবন আমরাই, এরাই তো দেবতা,—এই দেবতার গদি আমরাই তৈরি করেছি। তারা বুঝিয়ে দিলে, ইন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলবার ছিল না, কিন্তু তার যে নীতি তাতে পাঁচজন দেবতা পঁচানব্বই জন উপবাসী, অথচ এই উপবাসীরাই আবার উপবাস করে তাদের দেবতা বানায়, তার এই নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ধনীদের সঙ্গে তাই তো সে এক শ্রেণির চাকুরেদের মাইনে দিচ্ছে ভয়ানক বেশি, পঁচানব্বই জন উপবাস করছে—তখন বোঝাতে পারলে হয়, কারণ দেশ ভরে তো অশিক্ষার বধিরতা!

তারা বললে, আমরা জানি, লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। আমরা জানি, যারা বিদ্বান তারা অশেষ গুণী, সকলে তাদের ভালোবাসার চোখে দেখে, আমরা জানি, অধ্যয়নের মতো উৎকৃষ্ট আনন্দ আর সাধনা আর নেই। শিক্ষার দেখা না পেয়েও শিক্ষার উপর আমাদের ভয়ানক শ্রদ্ধা, সম্মান, তবু আমরা লেখাপড়া শিখতে পাইনে কেন? তারা জানাল, অত খরচ করে বাইরের চটকের কী দরকার? বিদেশি কারিগর এনে বড়ো মহল করার? আমরা যে খেতে পাইনে! এইভাবে তারা সকলকে জানাতে লাগল, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। ওদিকে ইন্দ্রনাথ প্রমাদ গুনল এবার মনে মনে। কিন্তু কয়েকদিন তেমনি চিন্তা করে একটা উপায় বার করলে। খুব বুদ্ধিমান কিনা! ইন্দ্রনাথ, যারা প্রতিবাদ করছিল, তাদের অনেক জনকে মন্‌সব্‌দারি সুবেদারি সাধল। তাতে দু-একজন কেউ এল বটে, যারা বাকি রইল তাদের অগত্যা শাস্তি,—দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু এতে কি আর আসল কথাটি চাপা পড়ে?

গোদাহাতির দল সেদিন কলরব করতে করতে ফিরে গেল। তাদের সভায় ওদিন যে দারুণ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তাতে কতকগুলো হাতি আনন্দে উদ্দীপনায় এমন তাথৈ নাচ শুরু করে দিল যে আশেপাশে যে কটা মোটাসোটা গাছ ছিল, সেগুলো মড়মড় শব্দ করে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়ল।

পরদিন বিকেল বিকেল কলকাতার পথে বেরিয়ে পড়ার আগে সকালবেলা গোদাহাতিদের একটা জরুরি আলোচনাসভা বসে গেল। পথঘাট তো কেউ চেনে না,

কোন্ পথে যাওয়া হবে কীভাবে যাওয়া হবে ইত্যাদি নানা জল্পনা কল্পনা করে ঠিক হল, কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে যাওয়া হবে। রাত্তিরবেলা সবসময় হাঁটতে হবে—নয়তো দিনের বেলা মানুষগুলো একসঙ্গে এত হাতি দেখে গণ্ডগোল করে ফেলবে। আর মানুষগুলোর বাচ্চাদের এড়িয়ে চলতে হবে সবচেয়ে বেশি, ওরাই পাকায় যত গোলমাল। আমরা যাব শিলিগুড়ি হয়ে, মানুষের বাসগাড়ি বরাবর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সোজা কলকাতায়। সবাই এমন প্রস্তাবে সায় দেয়। একজন নতুন প্রস্তাব করে, কলকাতা গিয়ে কী কী দেখা হবে, তার একটা লিস্টি আগেভাগে তৈরি করে নিলে ভালো হয়। সবাই কান দুলিয়ে এই মতের সমর্থন জানায়। চটপট একটা লিস্টি তৈরি হয়ে যায়। প্রথমে চিড়িয়াখানার হাতি-ভায়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর পারলে ওদের বন্দিজীবন থেকে উদ্ধার। সেখান থেকে কলাবাগানে গিয়ে কলা-টলা খেয়ে হাতিবাগানের বেশ নিরিবিলি জায়গায় বিশ্রাম। বিশ্রাম-টিশ্রাম সেরে রাতের বেলায় কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দর্শন।

এক হাতি এর সঙ্গে যোগ করলে, ভাই, উত্তর বাংলাতে তো নারকেল পাওয়া যায় না তেমন, শুনেছি নারকেলডাঙায় নারকেল বড়োই সুস্বাদু। সেখানে গিয়ে কিছু নারকেল খেয়ে আশ মেটালে হয়। সবাই একযোগে 'তা-বেশ' 'তা-বেশ' বলে সায় দেয়।

আর এক হাতি বললে, মেছোবাজারে ঢুঁ মারলে হয় না! কোনো দিন মাছ খাইনি। এই সুযোগটা হাতছাড়া করা কি ঠিক হবে?

হাতিরা একদিক থেকে বোষ্টম। মাছের কথা শুনে সবাই হই হই করে ওই হাতিকে এই মারে তো সেই মারে। ব্যাটা, ম্লেচ্ছ, হাতি-কুলের কুলাঙ্গার। জানিস না আমরা নিরিমিষ!

গোদাহাতির নেতা তখন সবাইকে ধমক দিয়ে ঠান্ডা করে। কী হচ্ছে এসব? সবাই চোপ্!

নেতার ধমক খেয়ে সবাই চুপ করে যায়। তারপর অন্যান্য আলোচনা সেরে যে যার আস্তানায় ফিরে আসে।

পাহাড়ে জঙ্গলে আস্তে আস্তে রোদ মরে গিয়ে বিকেল নামে। পাখিরা কিচির-মিচির করতে করতে বাসায় ফেরে। সেই সময় গোদাহাতিরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে শাঁখের আওয়াজের মতো ডাক দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ে। ওদের ডাকে মনে হয়, পাহাড়ে-জঙ্গলে যেন পুজো হচ্ছে।

ছানাপোনা হাতিরা ছোটো ছোটো লেজ নাড়িয়ে তাদের বাপি-মামণিদের গা ঘেঁসে ঘেঁসে চলে। চলতে চলতে মাঝে মাঝে আনন্দে দু-একটা লাফ দিয়ে ফেলে। মামণিরা ধম্‌কে ওঠেন। এই ছানাপোনারা, হচ্ছে কী? এক্ষুনি হোঁচট খেয়ে পড়বে!

ক্রমে ক্রমে বিকেল শেষ, সন্ধে হয়, আকাশে হলদে থালার মতো চাঁদ উঠে। হাতির দল পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে মাঠে নামে। দূরে দেখা যায় মানুষের বাসগাড়ির রাস্তা। কয়েকজন হাতি আনন্দে চিৎকার দিয়ে বলে, ওই তো সেই পথ। কয়েকজন বিজ্ঞ হাতি শুঁড় দিয়ে ওদের গা ঠেলে বলে, চুপ! কোনো কথা না।

হাঁটতে হাঁটতে রাত শেষ হয়। চাঁদটা একসময় কেমন নীল নীল সাদা আলো ঝরিয়ে পথঘাট সব ঝলমল করে রেখেছিল। এখন সেটাও ঢলে পড়েছে আকাশের একদিকে। হাতির দল দেখতে পায় দূরে একটা নদী। তার পাশে বেশ ঘন বন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেই বনের মধ্যে আশ্রয় নেয়। সেখানে পাতা চিবিয়ে খিদে মেটায়। নিরিবিলি নদীর ধার দেখে জল খেয়ে তেষ্টা মেটায়। তারপর জঙ্গলের মধ্যে ঘন হয়ে শুয়ে পড়ে। দূর থেকে ওদের দেখে মনে হয় একটা কালো পাহাড়ের টিলা।

সারাদিন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে সন্ধেবেলা ওরা আবার হাঁটতে শুরু করে। আবার সেই চাঁদ ওঠে। মুঠোমুঠো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে। পথঘাট মাঠ সব সেই আলোতে চক্‌চক্ করে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটা বিরাট নদী পায়। নদীর ওপর লম্বা একটা সেতু। একজন গোদাহাতি বলে, এই সেই বিখ্যাত সেতুটা। আর ওই দ্যাখ নিচ দিয়ে জল যাচ্ছে—ওটা মা গঙ্গা।

সব্বাই একবার শুঁড়টা কপালে ঠেকিয়ে মা গঙ্গাকে নমস্কার করে। মনে মনে বলে—'বিপদে যেন না পড়ি মাগো।'

ওরা একসময় হাঁটতে হাঁটতে কলকাতার কাছে এসে পড়ে। আর তখন পুবের আকাশে ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার
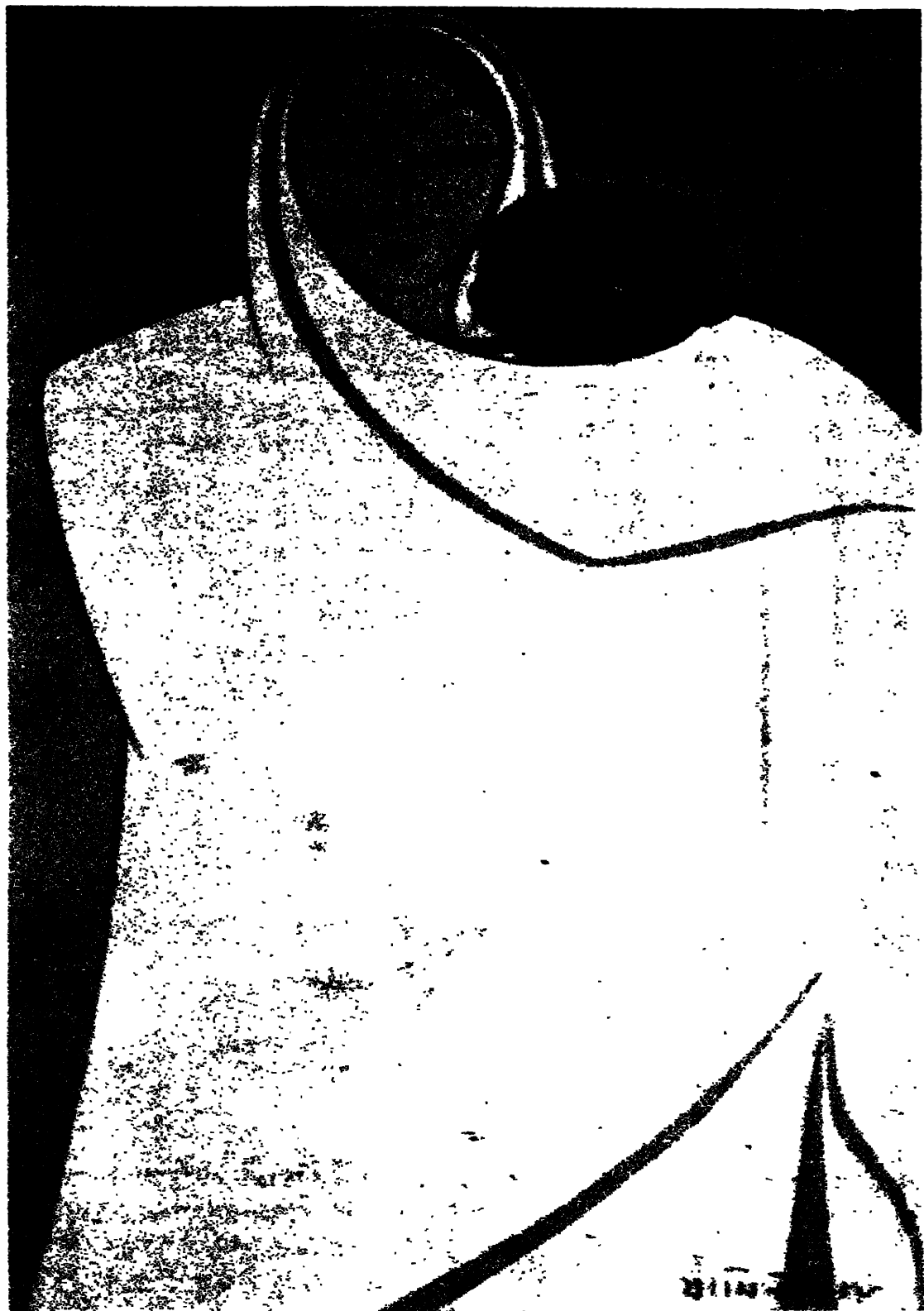
মা ও ছেলে

শিল্পী : যামিনী রায়

সরিয়ে ফরসা হয়। কে এক হাতি চেঁচিয়ে উঠে বলে, ভাইসব, আমরা কলকাতার কাছে এসে গেছি।

ছানাপোনা চুনো হাতির দল আনন্দে শাঁখের আওয়াজ ছোঁড়ে, ডিগবাজি খায় গোটা দুই তিন।

এদিকে ভোরের আলোতে লোকজন গাড়িঘোড়া পথে চলতে শুরু করে। সবাই এত হাতির সার বেঁধে চলা দেখে ভাবে, কোনো কিছুর উৎসবে হাতির মিছিল বেরিয়েছে। কিন্তু সভয়ে লক্ষ্য করে—মানুষ নেই, জন নেই—কেবলই হাতি আর হাতি।

ওদিকে খবর পৌঁছয় খাস কলকাতায়। কেউ কেউ সবে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলাচ্ছেন। কেউ হয়তো অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সেই সময় খবর এল হাতির মিছিল কলকাতায় আসছে।

চারদিকে হাতি হাতি রব পড়ে গেল। লালবাড়িতে বসল জরুরি আলোচনা। গুজগুজ খুচখুচ করে আলোচনায় ঠিক হল, শহরবাসীকে সাবধান করে দেওয়া হবে, কেউ যেন পথে না বেরোয়। দোকানপাট অফিস-কাছারি স্কুল-কলেজ ট্রামবাস সব বন্ধ রাখো। ঢাল, লাঠি, বন্দুক নিয়ে সব পুলিশ মিলিটারি পথে পথে টহল দেবে। হাতিদের যেন এতটুকু উত্যক্ত না করা হয়। ওরা যেমন খুশি পথ দিয়ে চলুক। কলকাতা ঘুরে ফিরে দেখুক। ব্যাপারটা কী হয় দেখাই যাক না !

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়োতে সব অনুষ্ঠান বাতিল। ঘন ঘন প্রচার শুরু হয়ে গেল। পুলিশের বেতারগাড়ি পথে পথে শহরবাসীকে সাবধান করে ঘোষণা করতে লাগল। পুলিশ মিলিটারি সব কোনোরকমে পোশাক-আশাক আঁটতে আঁটতে ঢাল লাঠি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

এদিকে হাতিমশাইরা তো লাইন করে বুটমার্চ করতে করতে কলকাতায় এসে ঢুকল। বড়ো বড়ো ঢাউস বাড়ির দিকে শুঁড় উঁচিয়ে পিট্‌পিট্ করে দেখতে লাগল। পথঘাট তো চেনে না, তাই সোজা নাক বরাবর পথেই হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে তারা চৌরঙ্গি পেরোল। গড়ের মাঠের ফাঁকা মাঠ দেখল। দূরের কেল্লাটা দেখে একজন বুড়ো-হাতির পুরনো কথা মনে পড়ায় হাপুস হাপুস করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ছানাপোনা হাতিরা কিচির-মিচির করে বলে উঠল, কলকাতায় লোকজন কোথায় রে ?

একজন জ্যাঠাহাতি তা শুনে দিলেন এক কড়া ধমক।

হাতিমশায়রা হাঁটতে হাঁটতে বলতে গেলে কলকাতার সব জায়গায় ঘুরে বেড়াল। শেষে তারা হাজির হল চিড়িয়াখানার কাছে। তার ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেখে চারিদিকে উঁচু করা পাঁচিল। সবাই একসঙ্গে ডাক ছাড়ল। ওদিকে ভেতরের হাতিভাই পায়ে শিকল এঁটে গাছপাতা চিবুচ্ছে। ওই ডাক শুনে তার মনটা কেমন অস্থির করে উঠল। সে পায়ের ভারি শেকলটা দুবার দে দোল দুলিয়ে একটানে ছিঁড়ে পাঁচিলের পাশে এসে হাজির হল। পেছনের দু-পায়ের ওপর খাড়া হয়ে ওদিকের সমবেত ভাইয়েদের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে একটা আনন্দের ডাক ছাড়ল। সব হাতিভাইরা তখন শুঁড় দিয়ে তাকে জড়াজড়ি করে আদর করল। চিড়িয়াখানার হাতিভাই বলল, তোমরা এসেছ কেন—এ বড়োই সাংঘাতিক জায়গা। মানুষগুলো ভালোই, তবে ভীষণ স্বার্থপর। ওদের স্বার্থে ঘা লাগলে ছেড়ে কথা কয় না। পালাও। কয়েকজন হাতিভাই তেড়ে বলল, কোথায় সেই স্বার্থপর মানুষের দল ? একটাকেও তো দেখছিনে ?

চিড়িয়াখানার হাতিভাই অনুনয়ের সুরে বলল, না ভাই। ওরা ভারি চালাক। তোমরা তেড়েমেড়ে উঠ না। নিশ্চয়ই সব আশেপাশে ঘাপ্‌টি মেরে আছে। ওদের সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে। তোমরা যদি বাঁচতে চাও, যদি এতটুকু রক্তক্ষয়, প্রাণহানি করতে না চাও তবে ঠান্ডা মাথায় সব আস্তে আস্তে চলে যাও।

এই বলে চিড়িয়াখানার হাতি একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাঁচিলের পাশ থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। কয়েকজন যুবক হাতি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল—নাঃ, এ হাতিকাকাটা একেবারেই হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন বন্দি থেকে সব তেজ একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে।

গোদাহাতির দল ওখান থেকে বুটমার্চ করতে করতে পেছন-পথে ফিরে চলে। কিন্তু এবার দলের মধ্যে কেমন দুঃখু দুঃখু ভাব দেখা যায়। বিশেষ করে মামণি হাতিদের। চিড়িয়াখানার হাতির কথা শুনে ওদের বুক দুরদুর করে। ছানাপোনাদের গা ঘেঁসে ঘেঁসে চলে। সত্যি তো, যদি বিপদ হয় !

বাবাহাতিদেরও কেমন কেমন লাগতে শুরু করে। কলকাতার চেহারাটা কেমন যেন বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ঠেকে। তারা নিজেদের মধ্যে খানিক আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, ফিরে চল। কলকাতার আকর্ষণ এখন আর নেই। এখানে পদে পদে বাধা, ভয়, বিপদ।

হাতির দল ফিরে চলে জুড়িয়ে যাওয়া লুচির মতো। মিলিটারি পুলিশ পথের ধারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মধ্যে একজনের হাতি-শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলো মনে পড়ায় গা চনমন করে ওঠে। আঃ—এত কাছে হাতি। একটা শিকার করে ফেললে হয় না। এই ভাবনাটা তার মাথার মধ্যে কিলবিল্ করতে থাকে। কিন্তু হাতির দলটা তখন খানিকটা দুরেই চলে গেছে। হঠাৎই হাত ফস্‌কে ট্রিগারে চাপ লেগে আকাশমুখো একটা গুলি বোঁ করে বেরিয়ে যায়। আওয়াজ হয়—দুম্। ব্যস্, আর যায় কোথায় ! বিরাট চলমান কালো পাহাড়টায় বুঝি ভূমিকম্প জেগে ওঠে। হাজারো শাঁখের আকাশবিদারী শব্দ। কলকাতাবাসীর কানের পরদা ছিঁড়ে যায় আর কী ! হাতির দল ভয়ে রাগে ঘাবড়ে ভেবড়ে লাফাতে শুরু করে। এলোপাথাড়ি দৌড়োতে থাকে।

পুলিশ মিলিটারি এসব কাণ্ড জন্মেও দেখেনি। তারা বন্দুক টন্দুক ফেলে দিয়ে তো দে দৌড়, দে দৌড়। এদিকে খবর চলে যায় লালবাড়িতে। সেখানে বসে জরুরি সভা।

দাঁড়ান। আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে। শুনেছি হাতিরা বেশ গানবাজনার সমঝদার। কলকাতার সব সেরা গায়ক বাদকদের খবর দিলে কেমন হয় ?

সবাই সমস্বরে বললেন, দারুণ ভালো প্রস্তাব।

এরপরেই কলকাতার সেরা গাইয়ে বাজিয়েদের জরুরি খবর দেওয়া হল। তারা খবর পেয়ে তক্ষুনি সব ময়দানে গিয়ে হাজির। তারা দূর থেকে দেখে হাতিরা সব এলোপাথাড়ি লাফাচ্ছে, আর মাটি কাঁপছে ধড়াস ধড়াস। তারা ভয়ে ভয়ে যে যার যন্ত্র বার করে ভাঁজতে বসে সুর। গলা খাঁকারি দিয়ে গলায় তোলে গান। আর মজার ব্যাপার, মন্ত্রের মতো কাজ হয়। গানবাজনার সুরে বাতাস খেলে ওঠে, হাতিরা সেই বাতাসে সুরের গন্ধ পেয়ে নেশায় বুঁদ হয়। মুহূর্তে ওদের ধড়াস ধড়াস লাফানো যায় থেমে। শুঁড় দোলায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো গানবাজনার তালে তালে।

একালের
গল্প
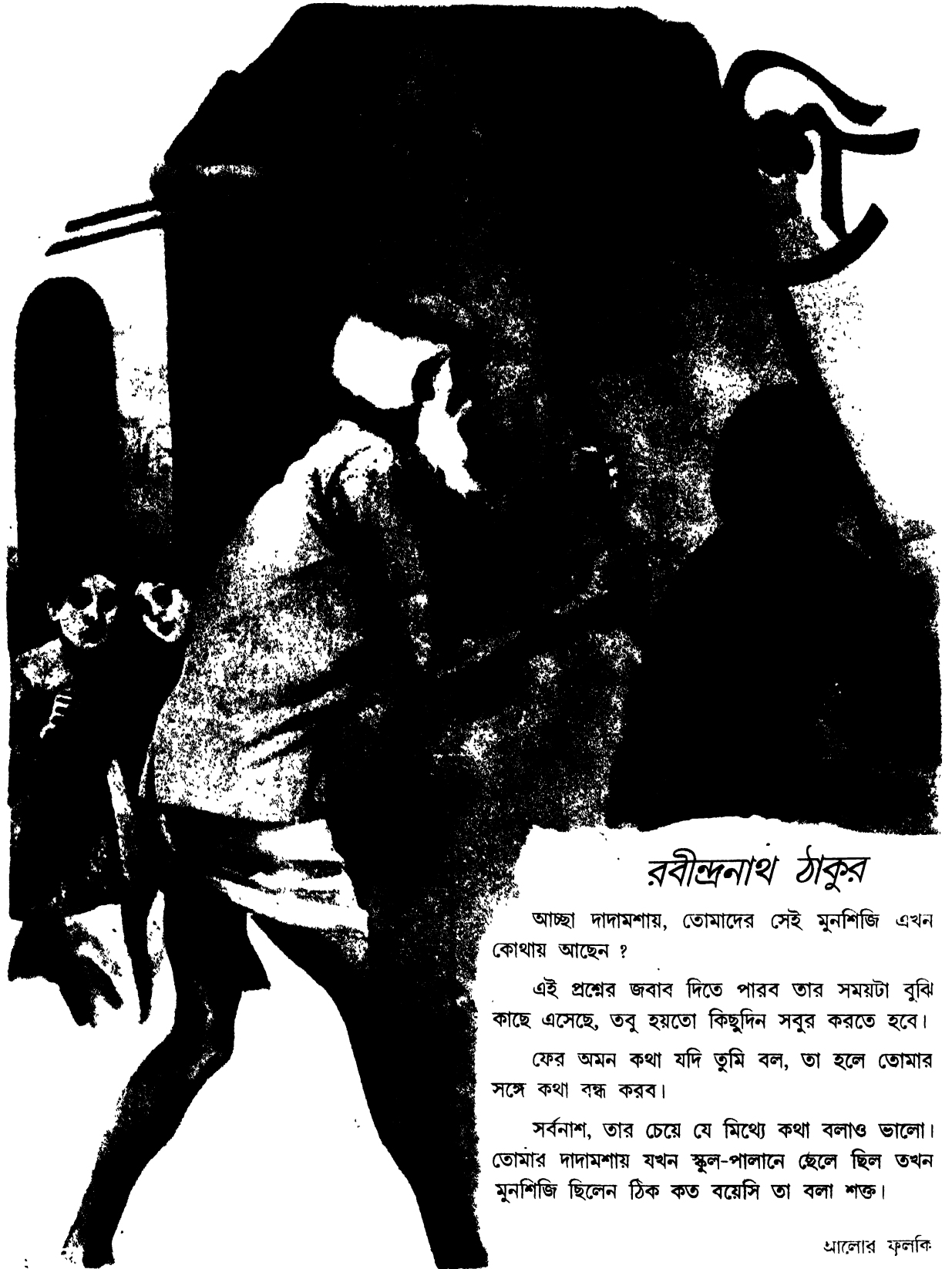
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন ?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বুঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন সবুর করতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।

সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যখন স্কুল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন ঠিক কত বয়েসি তা বলা শক্ত।

আলোর ঝলকি

তিনি বুঝি পাগল ছিলেন ?

হাঁ, যেমন পাগল আমি।

তুমি আবার পাগল ? কী-যে বল তার ঠিক নেই।

তার পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল।

কী রকম শুনি।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।

তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা। কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।

দেখ দিদি, সত্য কখনও সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধে সে না খাটে। বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোক নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে করে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই। মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট করে কথা বল না, তোমার অর্ধেক কথা আমি বুঝতে পারি নে।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরো।—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুন্শি, দাদাকে ফারসি পড়াতেন। কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় কখানার উপরে একটা চামড়া ছিল লেগে, যেন মোম-জামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনও জেতে কখনও হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুনশির ছিল গুমর তাতে তিনি কখনও কাবুর কাছে হটেন নি। তাঁর বিদ্যেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কম্‌তি, সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত, ফারসি-পড়া-বিদ্যে তাহলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে। কিন্তু, ফারসির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিদ্যে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চেঁচানি কিংবা কাঁদুনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে করে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু। তিনি কপাল চাপড়িয়ে বলতেন, মুনশিজি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুনশি বিশেষ দুঃখিত হতেন না—একটু মুচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত, মুনশিজি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মুনশি নিজের পাওনা বলেই নিজের টেঁকে গুঁজতেন। এই তো গেল গান।

আরও একটা বিদ্যে মুনশির দখলে ছিল। তারও সমঝদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্ণুর রুটি বেঁচে গেল, সুরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু মুনশির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল একাডেমিতে, ডিক্রুজ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনা কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিদ্যেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তবুও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড় জালই হোক, ডিক্রুজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাতুম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মুনশি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না ? বাস্ রে, তার ইংরেজি ভাষার কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয়। হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয়নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠিখেলার কারদানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্দুর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে।

হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনও ছায়াটার পায়ে, কখনও তার ঘাড়ে, কখনও তার মাথায়। আর, মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চারদিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, শাবাশ্ ! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে কখনও হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি', তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির জিত রইল। সবাই বলত 'শাবাশ্', আর মুনশি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায় ? আমিও ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি। সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই বলে বর্ণনা করে।

* *

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের,
অন্তর মনটা ছিল নেপোলিয়নের।
ইংরেজ ফৌজের সাথে দ্বার রুধে,
দু-বেলা লড়াই হত দুই চোখ মুদে।
ঘোড়া টগ্‌বগ্ ছোটে, ধুলা যায় উড়ে,
বাঙালি সৈন্যদল চলে মাঠ জুড়ে।
ইংরেজ দুদ্দাড় কোথা দেয় ছুট,
কোন্ দূরে মস্‌মস্ করে তার বুট।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে,
দেশে তার জয়রব ওঠে চারিধারে।
যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্তৃতা
কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা।
ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা,
প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা।
কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা—
রোজ পেন্‌সিল তার কেড়ে নেয় গোরা।
খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে
খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এঁটে।
রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেড়ে,
ভুদ্‌দ্ একদিন সেটা নিয়ে গেল কেড়ে।
কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ,
হাততালি দিতে দিতে চেঁচায় প্রতাপ।
বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই,
ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তার ডাকনাম ছিল লালু। ভালো নাম অবশ্য একটা ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জানো বোধ হয়, হিন্দিতে 'লাল' শব্দটার অর্থ হচ্ছে—প্রিয়। এ-নাম কে তাকে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সংগতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভরতি হলাম, লালু বললে, সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম, লালু, তোমার পুঁজি ত দশ টাকা। সে হেসে বললে, আর কত চাই, এত ত ঢের।

সবাই তাকে ভালোবাসত। তার কাজ জুটে গেল। তার পরে কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, লালু ছাতি মাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটোখাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে তামাশা করে বলত,—যা যা দৌড়ো— পারসেন্টেজের খাতায় এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

আরও ছোটোকালে যখন আমরা বাংলা ইস্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রি। তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামানদিস্তার ডাঁটি, একটা নরুন, একটা ভাঙা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরোনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল,—কী জানি কোথা থেকে সে এ-সব সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এ দিয়ে পারত না সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল-সুদ্ধ সকলের ভাঙা ছাতি সারানো, শ্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া—এমন কত কি। কোনো কাজে কখনও না বলত না। আর করতও চমৎকার। একবার 'ছট্' পরবের দিনে কয়েক পয়সার রঙিন কাগজ আর শোলা কিনে কী একটা নতুন তৈরি করে সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রি করে ফেললে। তার থেকে আমাদের পেটভরে চিনেবাদাম-ভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পরে বছর যায়, সকলে বড়ো হয়ে উঠলাম। জিমনাস্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস তেমনি অপরিসীম। ভয় কারে কয় সে বোধ করি জানত না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারত না। এতে ছেলে-বুড়ো-গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতাম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় একনিমিষে কোথা থেকে আসে ! দু-একটা ঘটনা বলি। পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ি কালীপুজো, দুপুর-রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটল ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসল,—উপায় ? এত রাত্রে ঘাতক মিলবে কোথায় ? দেবীর পুজো পণ্ড হয়ে যায় যে ! কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়ল তার কাছে, লালু ঘুম ভেঙে উঠে বসল, বললে—না।

না কি গো ? দেবীর পুজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে !

লালু বললে, হয় হোক গে। ছোটোবেলায় ও-কাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করব না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগল, আর দশ-পনরো মিনিট মাত্র সময়, তার পরে সব নষ্ট, সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,—না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও, সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচল। সময় নেই,—তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়ল, বাড়িসুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চিৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়্গ নিমিষে উর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামল, তার পরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কালো মাটি রাঙা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ক্রমশ ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এল। যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আবার তার কপালে চড়ল সিঁদুর, গলায় দুলল রাঙা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ংকর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এল,—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার-কয়েক হাত-পা আছড়ে কী জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হল ; তার কাটা-গলার রক্তধারা রাঙামাটি আরও খানিকটা রাঙিয়ে দিলে।

ঢুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে, উঠোনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহু লোকের বহু প্রকারের কোলাহল ; সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদ্রিত-নেত্রে ইষ্টনাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ংকর একটা হুংকার দিয়ে উঠল। সমস্ত শব্দ-সাড়া গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কী ! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরছে, চেঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কই ?

বাড়ির কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দুটো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার-দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশকণ্ঠে গর্জন করে উঠল—নেই পাঁঠা ? সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাব ধরে নরবলি দেব—মা মা—জয় কালী ! বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়ল, তার হাতের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরচে। তখন যে কাণ্ড ঘটল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটল সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়েছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করচে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মতো হয়েছে, একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে,—কিন্তু এ-সব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠল—মনোহর চাটুজ্জে কই ? পুরুত গেল কোথায় ?

পুরুত রোগা লোক সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর-দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েচেন। কিন্তু বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলো হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু ! বাবা ! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ— আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোটো ভাইয়ের মতো।

সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো তোমাকে বলি দেব ! মায়ের আদেশ !

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখ্‌খনো নয়—মা যে জগজ্জননী !

লালু বললে—জগজ্জননী ! সে জ্ঞান আছে তোমার ? আর দেবে পাঁঠা-বলি ? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে ? বলো।

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন কোনোদিন নয় বাবা, আর কোনোদিন নয়, মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করচি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।
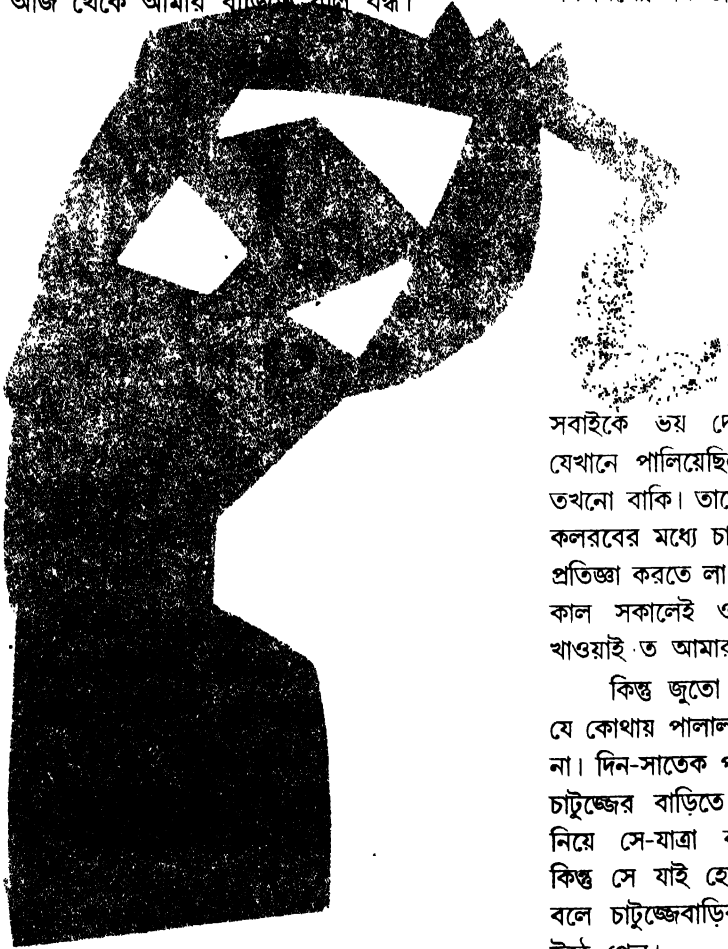
ঠিক তো ?

ঠিক বাবা ঠিক। আর কখনো না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালাল কোথা দিয়ে ? গুরুদেব ? সে কই ? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুংকার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুরদালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলার ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠল। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে, লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ—করে হেসে উঠে দুম্‌ করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল।

তখন কারও বুঝতে বাকি রইল না খুন-চাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার চালাকি। লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটল। ঠাকুরের পুজো তখনো বাকি। তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে, এবং মহা হইচই কলরবের মধ্যে চাটুজ্জে মশাই সকলের সম্মুখে বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন—ওই বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি। ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালাল, সাত-আটদিন কেউ তার খোঁজ পেলে না। দিন-সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধুলো নিয়ে সে-যাত্রা বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জেবাড়ির কালীপুজোয় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।

রামগোপাল হাইস্কুলের মাস্টার প্রবোধ ভটচাজ। বয়স ত্রিশ, আমুদে লোক, ছাত্ররা তাকে খুব ভালোবাসে। পুজোর বন্ধের দিনকতক আগে পাঁচটি ছেলে তার কাছে এল। তাদের মুখপাত্র সুধীর বললে,—স্যার, মহা মুশকিলে পড়েছি।

প্রবোধ জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কী ?

—গেল বছর আমার বড়দার বিয়ে হয়ে গেল জানেন তো ? তার শ্বশুর ভৈরববাবু খুব বড়োলোক, দেওঘরের কাছে গণেশমুণ্ডায় তাঁর একটি চমৎকার বাড়ি আছে। বউদি বলেছে, সে বাড়ি এখন খালি, পুজোর ছুটিতে আমরা জনকতক স্বচ্ছন্দে কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আসতে পারি।

—এ তো ভালো খবর, মুশকিল কী হল ?

—ভৈরববাবুর বলেছেন, আমাদের সঙ্গে যদি একজন অভিভাবক যান তবেই আমাদের সেখানে থাকতে দেবেন।

—তোমার বড়দা আর বউদিকে নিয়ে যাও না ?

—তা হবার জো নেই, ওরা মাইসোর যাচ্ছে। আপনিই আমাদের সঙ্গে চলুন স্যার ! ক্লাস টেনের আমি, ক্লাস নাইনের নিমাই, নরেন, সুরেন—আর ক্লাস এইটের পিন্টু,—আমরা এই পাঁচজন যাব, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

...প্রবোধ বললে—সব ত বুঝলুম, কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে চাও কেন ? মাস্টার সঙ্গে থাকলে তোমাদের ফুর্তির ব্যাঘাত হবে না ?

সজোরে মাথা নেড়ে সুধীর বললে,—মোটেই একদম একটুও কিচ্ছু ব্যাঘাত হবে না, আপনি সে রকম মানুষই নন স্যার। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের তিন ডবল ফুর্তি হবে।

নিমাই নরেন সুরেন সমস্বরে বললে,—নিশ্চয় নিশ্চয়।

...প্রবোধ যেতে রাজি হল।

দেওঘর আর জসিডির মাঝামাঝি গণেশমুণ্ডা পল্লিটি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। বিস্তর সুদৃশ্য. বাড়ি, পরিচ্ছন্ন রাস্তা, প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভালো। ভৈরববাবুর অট্টালিকা ভৈরব কুটির আর তার প্রকাণ্ড বাগান দেখে ছেলেরা আনন্দে উৎফুল্ল হল এবং ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখতে লাগল। বাগানে অনেক রকম ফলের গাছ। গোটা কতক আতা গাছে বড়ো বড়ো ফল ধরেছে, অনেকগুলো একেবারে তৈরি, পেড়ে খেলেই হয়।

প্রবোধ বললে,—ভারি আশ্চর্য তো, ভৈববববাবুর দরোয়ান আর মালি দেখছি অতি সাধু পুরুষ।

সুধীর বললে,—মনেও ভাববেন না তা, আমি এখানে এসেই সব খবর নিয়েছি স্যার। দরোয়ান মেহী পাঁড়ে আর মালি ছেদী মাহাতো এদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া। দুজনে দুজনের ওপর কড়া নজর রাখে, তাই এ পর্যন্ত কেউ চুরি করবার সুবিধে পায়নি।⋯

নিমাই বললে—যদি দু-তিন সের দুধ জোগাড় করা যায় তবে চমৎকার আতার পায়েস হতে পাববে। আমি তৈরি করা দেখেছি, খুব সহজ।

সুধীর বললে—বেশ তো, তুই তৈরি করে দিস। ও পাঁড়েজি, তুমি কাল সকালে তিন সের খাঁটি দুধ আনতে পারবে ?

পাঁড়ে বললে,—জরুব প.রব হুজুর।

নাওয়া খাওয়া আর বিশ্রাম চুকে গেল। বিকেল বেলা সকলে বেড়াতে বেরুল। ঘণ্টাখানেক বেড়াবার পব ফেরার পথে সুধীর বললে, দেখুন স্যার, এই বাড়িটি কী সুন্দর, ভীমসেন ভিলা ! গেটের ওপর কী চমৎকার থোকা থোকা হলদে ফুল ফুটেছে।

আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে পিন্টু চেঁচিয়ে উঠল—ওই, ওই, ওই একটা নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেল।

নিমাই বলল, এদিকে দেখুন স্যার, উঃ কী ভয়ানক পেয়ারা ফলেছে, কাশীর পেয়ারার চাইতে বড়ো বড়ো। নিশ্চয় ওই বাড়িরও দরোয়ান আর মালির মধ্যে ঝগড়া আছে, তাই চুরি যায়নি।

ফটকে তালা নেই। সুধীর ভিতরে ঢুকে এদিক-ওদিক উঁকি মেরে বললে, কাকেও কোথাও দেখছি না, কিন্তু ঘরের জানলা খোলা, মশারি টাঙানো রয়েছে। বোধ হয় সবাই বেড়াতে গেছে। দরোয়ান, ও দরোয়ানজি, ও মালি ?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সকলে ভিতরে এসে ফটকের পাল্লা ভেজিয়ে দিলে।

নিমাই বললে, একটা পেয়ারা পাড়ব স্যার ?

প্রবোধ বললে, বাজারে প্রচুর পেয়ারা দেখেছি, নিশ্চয়ই খুব সস্তা, খেতে চাও তো কিনে খেয়ো। বিনা অনুমতিতে পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয় তা জানো না ?

—জানি স্যাব ? চুরি করব না, শুধু একটা চেখে দেখব কাশীর পেয়াবার চাইতে ভালো কি মন্দ।

প্রবোধ পিছন ফিরে গম্ভীরভাবে একটা তালগাছের মাথা নিরীক্ষণ করতে লাগল। মৌনং সম্মতিলক্ষণম ধরে নিয়ে নিমাই গাছে উঠল। একটা পেয়ারা পেড়ে কামড় দিয়ে বলল,—বোম্বাই আমের চাইতে মিষ্টি।

সুধীর বললে,—এই নিমে, স্যারকে একটা দে।

নিমাই একটা বড়ো পেয়ারা নিয়ে হাত ঝুলিয়ে বললে,—এইটে ধরুন স্যার, একটু চেখে দেখুন কী চমৎকার !

পেয়ারায় কামড় দিয়ে প্রবোধ বললে,—সত্যিই খুব ভালো পেয়ারা। আর বেশি পেড়ো না, তা হলে ভারি অন্যায় হবে কিন্তু। লোভ সংবরণ করতে শেখো।

ততক্ষণ নিমাইয়ের সব পকেট বোঝাই হয়ে গেছে, তাব সঙ্গীবাও প্রত্যেকে দু-তিনটে করে পেয়েছে। সুধীর বললে,—এই নিমে, শুনতে পাচ্ছিস না বুঝি ? স্যার রাগ করছেন, নেমে আয় চট করে, এক্ষুনি হয়ত কেউ এসে পড়বে।

হঠাৎ ক্যাঁচ করে গেটটা খুলে গেল, একজন মোটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর একটি রোগা বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করলেন। দুজনের হাতে গামছায় বাঁধা বড়ো বড়ো দুটি পোঁটলা। নিমাই গাছের ডাল ধরে ঝুলে ধুপ করে নেমে পড়ল।

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বললেন,—অ্যাঁ, এসব কী, দল বেঁধে আমার বাড়ি ডাকাতি করতে এসেছ ? ভদ্রলোকের ছেলের এই কাজ ? ঝব্বু সিং, এই ঝব্বু সিং—বেটা গেল কোথায় ?

পোঁটলা দুটি নিয়ে মহিলা বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। ঝব্বু সিং এক লোটা বৈকালিক ভাং খেয়ে তার ঘরে ঘুমুচ্ছিল, এখন মনিবের চিৎকারে উঠে পড়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল। সে হুঁশিয়ার লোক, গেটে তাড়াতাড়ি তালা বন্ধ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে,—হুজুর, হুকুম দেন তো থানে মে খবর দিয়ে আসি। হো বৈজনাথজি, ছিয়া ছিয়া, ভদ্দর আদমির ছেলিয়ার এহি কাম !

হুজুর বললেন,—খুব হয়েছে, ডাকাতেরা চোখের সামনে সব লুটে নিলে আর তুমি বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলে। তারপর, মশায়দের কোত্থেকে আগমন হল ? এরা তো দেখছি ছোকরা, বজ্জাতি করবারই বয়স ; কিন্তু তুমি তো. বাপু খোকা নও, তুমিই বুঝি দলের সদ্দার ?

প্রবোধ হাতজোড় করে বললে—মহা অপরাধ হয়ে গেছে স্যার। এই নিমাই, সব পেয়ারা দরওয়ানজির জিম্মা করে দাও। আমরা বেশি খাইনি সার, মাত্র দু-তিনটে চেখে দেখেছি। অতি উৎকৃষ্ট পেয়ারা।

—কৃতার্থ হলুম শুনে। এরা বোধহয় স্কুলের ছেলে। তোমার কী করা হয় ? নাম কী ?

—আজ্ঞে, আমার নাম প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য, মানিকতলার রামগোপাল হাইস্কুলের মাস্টার। এরা সব আমার ছাত্র, পুজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে।

—খাসা অভিভাবকটি পেয়েছে, খুব নীতিশিক্ষা হচ্ছে। আমাকে চেন ? ভীমচন্দ্র সেন, রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। রায়বাহাদুর খেতাবও আছে, কিন্তু এই স্বাধীন ভারতে সেটার আর কদর নেই। বিস্তর চোরকে আমি জেলে পাঠিয়েছি। তোমার স্কুলের সেক্রেটারিকে যদি লিখি—আপনাদের প্রবোধমাস্টার এখানে এসে তার ছাত্রদের চুরিবিদ্যে শেখাচ্ছে, তা হলে কেমন হয় ?

—যদি কর্তব্য মনে করেন তবে আপনি তাই লিখুন স্যার, আমি আমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করব। তবে একটা কথা নিবেদন করছি। কেউ অভাবে পড়ে চুরি করে, কেউ বিলাসিতার লোভে করে, কেউ বড়োলোক হবার জন্যে করে। কিন্তু কেউ কেউ, বিশেষত যাদের বয়স কম, নিছক ফুর্তির জন্যেই করে। আমি অবশ্য ছেলেমানুষ নই, কিন্তু এই ছেলেদের সঙ্গে মিশে, এই শরৎ ঋতুর প্রভাবে, আর আপনার এই সুন্দর বাগানটির শোভায় মুগ্ধ হয়ে আমারও একটু বালকত্ব এসে পড়েছে। এই যে পেয়ারা চুরি দেখছেন, এ ঠিক, মামুলি কুকর্ম নয়, এ হচ্ছে শুধু নবীন প্রাণরসের একটু উচ্ছলতা।

—হুঁ। ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা। রবি ঠাকুর তোমাদের মাথা খেয়েছেন।...

—স্যার, যে কুকর্ম করে ফেলেছি তার বিচার একটু উদারভাবে করুন। আপনি ধীর স্থির প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তি, ছেলেমানুষি ফুর্তির বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন—

—কে বললে ঊর্ধ্বে উঠে গেছি ? আমাকে জরদ্‌গব গিধড় ঠাউরেছ নাকি ?

—তাহলে আশা করতে পারি কি যে আমাদের ক্ষমা করলেন ? আমরা যেতে পারি কি ?

—পেয়ারাগুলো নিয়ে যাও, চোরাই মাল আমি স্পর্শ করি না। আচ্ছা, এখন যেতে পার, এবারকার মতন মাপ করা গেল।

এমন সময় মহিলাটি বাইরে এসে বললেন,—কী বেআক্কেল মানুষ তুমি, এরা তোমার এজলাসের আসামি নাকি ? তুমি এদের মাপ করবার কে ? তোমাকে মাপ করবে কে শুনি ? এখন যেয়ো না বাবারা, এই বারান্দায় এসে একটু বোসো।

ভীমবাবু বললেন,—এদের খাওয়াবে নাকি তোমার ভাঁড়ার তো ঢুঁ ঢুঁ, চা পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে, হরি সরকার বাজার থেকে ফিরলে তবে হাঁড়ি চড়বে।

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, যা আছে তাই দেব। মিনিট দশ সবুর করতে হবে বাবারা।

গৃহিণী ভিতরে গেলে ভীমবাবু বললেন,—উনি ভীষণ চটে গেছেন, না খাইয়ে ছাড়বেন না। অগত্যা ততক্ষণ এই এজলাসেই তোমরা আটক থাকো। এখানে উঠেছ কোথায় ?

প্রবোধ বললে,—ভৈরব কুটিরে, স্টেশনের দিকে যে রাস্তা গেছে তারই ওপর।

ভীমবাবু বলেন,—কী সর্বনাশ ! যার ফটকের পাশে বেগনি বুগনভিলিয়ার ঝাড় আছে সেই বাড়ি ?

—আজ্ঞে হাঁ। বাড়িটার কোনো দোষ আছে ?

—নাঃ, দোষ তেমন কিছু নেই। তোমরা ওখানে উঠেছ তা ভাবিনি।

···একটু পরে ভীমবাবুর পত্নী একটা বড়ো ট্রেতে বসিয়ে একটি ধূমায়মান গামলা এবং গোটাকতক বাটি আর চামচ নিয়ে এলেন। ভীমবাবু একটা টেবিল এগিয়ে দিয়ে বললেন,—এ কী এনেছ, আতার পায়েস যে। এর মধ্যেই তৈরি করে ফেললে ?

গৃহিণী বললেন,—আর তো কিছু নেই, এই দিয়েই ছেলেরা একটু মিষ্টিমুখ করুক।

ভীমবাবু বললেন,—সবটাই এনেছ নাকি ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আর লোভ কোরো না বাপু। ছেলেরা যে পেয়ারা পেড়েছে তাই না হয় একটা খেয়ো। চিবুতে না পারো তো সেদ্ধ করে দেব।

সুধীর সহাস্যে বললে,—স্যার, আমাদের ওখানে বিস্তর আতা ফলেছে, ইয়া বড়ো বড়ো। কাল সকালে পায়েস বানিয়ে আপনাদের দিয়ে যাব।

ভীমবাবু বললেন—না-না, অমন কাজটি কোরো না। আতা আমার সয় না।

* *

ভৈরব কুটিরে ফিরে এসে নিমাই বললে,—এ কী ! গাছের বড়ো বড়ো আতাগুলো গেল কোথায় ?

সুধীর বললে—বোধহয় পাঁড়েজি সদ্দারি করে পেড়ে রেখেছে। ও পাঁড়ে, আতা কী হল ?

পাঁড়ে ব্যস্ত হয়ে এসে মাথায় একটু চাপড় মেরে করুণ কণ্ঠে বললে,—কী কহবো হুজুর, বহুত ঝামেলা হয়ে গেছে। এক মোটা-সা বুঢ়া বাবু আর এক দুবলা-সা বুঢ়ি মাঈ এসেছিল। বাবু পটপট সব আতা ছিঁড়ে লিলে। আমি মানা করলে খাফা হয়ে বললে, চোপ রহো উল্লু। আমার ডর লাগল, শায়দ কোই বড়া অপসর উপসরকা বাবা-উবা হোবে—

সুধীর বললে—হাতে লাল গামছা ছিল ?

—জি হাঁ, উসি সে তো বাঁধ কে লিয়ে গেল।

হাসির প্রকোপ একটু কমলে প্রবোধ বললে,—যাক্ আমরা ঠকিনি, আতার পায়েস খেয়েছি, পেয়ারাও পেয়েছি। কিন্তু ভীমচন্দ্র সেন মশাইয়ের জন্য দুঃখ হচ্ছে, তাঁর গিন্নি তাঁকে বঞ্চিত করেছেন।

নিমাই বললে,—ভাববেন না স্যার, দিন দুই পরেই আবার বিস্তর আতা পাকবে, তখন পায়েস করে ভীমসেন মশায় আর তাঁর গিন্নিকে খাওয়াব।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের কথা।

দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক কালীকান্ত চক্রবর্তীর নাম তখন বাংলার অনেকেই জানিত। তাঁহার বাস ছিল বর্ধমান জেলার মানকরের কাছে পলাশবাড়ি গ্রামে। গ্রামখানি ছিল বেশ সমৃদ্ধ—হাট-বাজার, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী সবই গ্রামে ছিল। গ্রামের চার ধার বেড়িয়া খাল—দূরে দামোদরের

বাঁক। তখন ওইদিকে রেলপথ বসে নাই। গ্রামের উত্তর ও পূর্বদিকে ছিল দিগন্তপ্রসারী বিশাল প্রান্তর।

চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ির পার্শ্বে তাঁহার নিজস্ব একখানি আম-কাঁঠাল ও তাল-নারিকেলের সুবৃহৎ বাগান ছিল। বাগানের ধারে ছিল তাঁহারই পৈতৃক বিখ্যাত 'কৃষ্ণ দিঘি।' দিঘিটির উত্তর পাড়ের মাঠে বাস করিত কয়েক ঘর বাগদি। চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন খুব অবস্থাপন্ন। জায়গা-জমি ও টাকাকড়ি তাঁহার বেশ ভালোই ছিল।

তর্কপঞ্চানন ঠাকুরের বাড়ির উত্তরদিকের যে মাঠ সেখানি ছিল যোজন বিস্তৃত। সে মাঠে প্রায়ই হইত রাহাজানি ও ডাকাতি। আশ্চর্যের বিষয় যে সেই বিশাল মাঠের মধ্যে মাত্র একটি তালগাছ ছিল। সেই তালগাছের কাছে ছিল অনেক কালের পুরাতন দিঘি। দিঘিটির নামই ছিল, "ডাকাতের দিঘি।" আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারি নাই, তাহা কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে খনিত হয়। যাহা হউক, ডাকাতেরা সেই পথে কোনো পথিককে পাইলেই তাহার সর্বস্ব লুঠ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ওই দিঘির জলে ফেলিয়া দিত। সেজন্য ওই পথে লোক চলাচল ছিল কম।

চক্রবর্তী মহাশয়ের দিঘির পাড়ে যে বাগদিরা বাস করিত তাহারাও ছিল ডাকাত। কিন্তু তাহারা পলাশবাড়ি গ্রামে রাহাজানি বা ডাকাতি করিতে সাহস করিত না। কারণ তাহারা তর্কপঞ্চানন ঠাকুরকে বড়ো ভয় করিত— তাঁহার ব্রহ্মতেজের জন্য নয়, তাঁহার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের জন্য।

বাগদিদের সর্দারের নাম ছিল নিতাই। তর্কপঞ্চানন ঠাকুর প্রত্যহ সকালে উঠিয়া দিঘির পাড়ে গিয়া হাঁক দিতেন—'নিতাই—'

নিতাই ঘরের বাহিরে আসিয়া উত্তর দিত, "এই যে বাবাঠাকুর, পেন্নাম হই।"

চক্রবর্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতেন, "কাল রেতে বাড়ি ছিলি তো ?'

নিতাই বলিত, "হাঁ, দেবতা।"

তর্কপঞ্চানন তাহাকে চুরি-ডাকাতি ছাড়িয়া সৎপথে জীবনযাপনের উপদেশ দিতেন।

উত্তরে নিতাই বলিত, "আজ্ঞে বুঝি তো সব। কিন্তু শয়তানটা যে দুপুর রেতে জাগিয়ে তোলে।"

তর্কপঞ্চানন নিতাইয়ের উত্তরে হাসিতেন। নিতাই মুখে তাঁহার দাসানুদাস হইলেও মনে মনে ছিল তাঁহার ঘোর শত্রু।

পলাশবাড়ি হইতে চারক্রোশ দূরে ছিল থানা। থানার দারোগাটি ছিলেন ভারি জবরদস্ত। ডাকাতেরা তাঁহার দাপটে অস্থির ছিল। তিনি সদরে লিখিয়া পঞ্চাশজন সিপাহিকে আনিয়া তাঁহার থানায় রাখিয়াছিলেন। এবং প্রতিদিন দাগি ডাকাতদের থানায় ডাকাইয়া ধমকাইতেন। ডাকাতরা জানিত ইহার মূলে আছেন তর্কপঞ্চানন ঠাকুর। মাঝে মাঝে তিনি তর্কপঞ্চাননের বাড়ি আসিয়া সেদিককার খবরাখবর লইতেন। এই সব কারণে স্থানীয় ডাকাতদের তাঁহার প্রতি ছিল মনে মনে আক্রোশ।

লোকে বলিত, "তর্কপঞ্চাননের ঘরে ঘড়াভরা মোহর আছে।"

ডাকাতরা তাই তাঁহার গতিবিধির উপর নজর রাখিত। তিনি কোথায় কতদিনের জন্য শিষ্যবাড়ি যান, কবে কোথায় যাইবেন নিতাই এই সব খবর সংগ্রহ করিত এবং বাহিরের ডাকাতদের জানাইত। তর্কপঞ্চাননও তাহা জানিতেন এবং সতর্ক ছিলেন। তিনি গ্রামের বাহিরে কোথাও গেলে তাঁহার সঙ্গে থাকিত চারজন বলিষ্ঠ ছাত্র ও তাঁহার কানাই-বলাই নামে দুটি গোয়ালা ভৃত্য। কানাই ও বলাই ছিল অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ। লাঠি ধরিতে, তলোয়ার চালাইতে সড়কিবাজিতে তাহাদের সামনে দাঁড়ায় সে-অঞ্চলে কেহ ছিল না। তাহাদের মূর্তিও ছিল কালান্তক যমের মতো। আবার, তর্কপঞ্চাননও ছিলেন লাঠিবাজিতে, তলোয়ার চালাইতে পরম পটু। তাঁহার বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর হইলেও দেহ ছিল সুগঠিত ও দীর্ঘকায় এবং চলাফেরা ছিল যুবজনোচিত।

কিন্তু ডাকাতেরাও গোপনে পরামর্শ করিয়াছিল, "মরি আর বাঁচি এক রেতে ঠাকুরের বাড়ি লুঠবই।" আর এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল নিতাই সর্দার।

সেবার তর্কপঞ্চানন মহাশয় বাড়ি নাই, নবদ্বীপে শিষ্যবাড়ি গিয়াছেন। নিতাই এই খবর জানিত। সে বাহিরের ডাকাতদের তাহা জানাইলে তাহারা পরদিনই গোপনে আসিয়া তাহার বাড়িতে বৈঠক বসাইল। স্থির

হইল পরদিন অমাবস্যার রাত্রিতে তাহারা ঠাকুরবাড়িতে ডাকাতি করিবে। তখন শ্রাবণ মাস। ডাকাতদের কপালগুণে সেদিন দুপুর হইতেই আকাশ কালো করিয়া মেঘ করিয়াছিল এবং শেষবেলা হইতেই বৃষ্টি-বাদলের তাণ্ডব শুরু হইল। গ্রামের পথ-ঘাট দিয়া জল ছুটিতে লাগিল। গ্রামে অমাবস্যা রাত্রির স্বাভাবিক অন্ধকার মেঘে মেঘে গাঢ় আর ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের লোক যে যাহার ঘরে কবাট আঁটিয়া ঘুমাইতেছে। এমন সময়ে ডাকাতদল নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চুপি চুপি তর্কপঞ্চাননের বাড়ির দিকে চলিল। নিতাই হইয়াছে তাহাদের সর্দার।

এদিকে ঘরে একখানি বড়ো তক্তপোষের উপর তর্কপঞ্চানন মহাশয় শুইয়া আছেন। তিনি সন্ধ্যার একটু পরে ফিরিয়াছেন। ঘরের মেঝেয় তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দেবী বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। বাহিরে জলকাদায় ছপ্ ছপ্ শব্দ হইতেছে যেন অনেকগুলি কী আসিতেছে।

জগদম্বা সে শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিলেন, ''বাইরে মানুষ চলছে।''

তর্কপঞ্চানন উত্তর করিলেন, ''এ দুর্যোগে কি মানুষ বেরুতে পারে?''

ব্রাহ্মণী বলিলেন, ''ওই শোনো।''

তর্কপঞ্চানন বলিলেন, ''ও গোরুর পায়ের শব্দ।''

জগদম্বা বলিলেন, ''গোরুর আর মানুষের শব্দে কি তফাত নেই।'' এই বলিয়া তিনি ঘরের প্রদীপটা তাড়াতাড়ি হাঁড়ির আড়ালে রাখিলেন। তারপর আবার বলিলেন, ''উঠে বস। লাঠিটা আর সড়কিটা হাতে নাও।''

এইবার তর্কপঞ্চাননেরও মনে হইল ঘরের দিকে অনেকগুলি লোক আসিতেছে। তিনি একটা জানালার পাশে আসিয়া তাহা একটু ফাঁক করিয়া বিদ্যুতের আলোকে দেখিলেন, বাহিরে অনেক লোক, সকলের হাতেই হাতিয়ার। তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছিল। তাহাতে পরিষ্কার দেখিলেন, সকলের আগে তলোয়ার হাতে আসিতেছে—নিতাই।

জগদম্বা আর একটি জানালা ফাঁক করিয়া দেখিলেন, জানালার নিচে কয়েকটি লোক বসিয়া সিঁদ কাটিতেছে। ভিতের ধারে কতকগুলি ইঁট ও রাবিশ পড়িয়া আছে। তিনি সেখান হইতে ভয়ে ঘরের ভিতর সরিয়া আসিয়া পঞ্চানন ঠাকুরকে বলিলেন, ''আর রক্ষে নেই। এদিকে সিঁদেল চোর দেওয়ালে সিঁদ কাটছে।''

তর্কপঞ্চানন বলিলেন, ''চুপ কর। ভয় নেই।'' বলিয়া তাড়াতাড়ি মালকোঁচা বাঁধিতে বাঁধিতে স্ত্রীকে বলিলেন, ''কোমর বেঁধে বলির খাঁড়া হাতে নিয়ে সিঁদের মুখে দাঁড়াও। চোর যেমন পা গলাবে অমনি মায়ের নামে দেবে কোপ।''

জগদম্বা বলিলেন, ''কানাই-বলাইকে খবর দেবে কী করে?''

''দিচ্ছি'' বলিয়া তর্কপঞ্চানন বগলে সড়কি ও হাতে লাঠি লইয়া সদর দরজার দিকে চলিয়া গেলেন।

এদিকে ডাকাতেরা সদর দরজায় আসিয়া কবাটে ধুমধাম শব্দে ধাক্কা দিতে দিতে হাঁক দিল, ''দরজা খোলো। নইলে কেউ প্রাণে বাঁচবে না।''

ডাকাতেরা এই সময় একবার 'হা-রে-রে' বলিয়া হুংকার ছাড়িল। গ্রামের কেহ কেহ বুঝিল ডাকাত পড়িয়াছে কিন্তু কাহার বাড়ি তাহা জানিতে পারিল না। এবং জানিবার চেষ্টাও করিল না। সেই দুর্যোগে কে বাহির হইবে?

তর্কপঞ্চানন ভিতর হইতে হুংকার দিলেন, ''নিতাই, তোর একদিন কি আমারই একদিন। ওখানে দাঁড়া। এক পা নড়বি নে। আমি খুলে দিচ্ছি দরজা। দেখি তোদের কার ঘাড়ে কটা মাথা।''

নিতাই তর্কপঞ্চানন ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাইয়া প্রথমটা একটু ভড়কাইয়া গেল। সে জানিত না যে, তিনি ফিরিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই সকলের সহিত হাঁক দিল, ''জয় মা কালী''। সেই হাঁকে কানাই ও বলাই-এর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তর্কপঞ্চাননের টোলের ছাত্ররাও জাগিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিল যে, বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছে। কানাই-বলাই তৎক্ষণাৎ লাঠি-সড়কি লইয়া বাহির হইল। ছাত্ররাও লাঠি লইয়া প্রস্তুত হইল।

তর্কপঞ্চাননের দরজায় তখনও আঘাত হইতেছে। শালকাঠে প্রমাণসই কালো দরজা ভাঙিয়াও ভাঙিতেছে না। নিতাই উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল, ''ঠাকুর, এবার তোমার মাথা নিয়ে তবে ছাড়ব। খোলো দেখি দরজা।''

এদিকে তখন কানাই-বলাই ডাকাতদের উপর বাঘের মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। ঠকাঠক লাঠির শব্দ উঠিতেছে। এক একবার 'বাবারে গেলাম রে' বলিয়া আর্তনাদ উঠিতেছে।

ঠাকুরমহাশয় দরজা খুলিয়াই নিতাইকে ডাকিলেন, "চলে আয়। দেখ্ আমি কেবল তর্কপঞ্চানন নই, লগুড় পঞ্চানন। বাপের বেটা হোস্ তো এগিয়ে আয়।"

নিতাইও অগ্রসর হইয়া তাঁহার মাথায় লাঠি চালাইতেই তিনি নিমেষে সে আঘাত ঠেকাইয়া লাঠি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর দুইজনে চলিল জীবনমরণ মল্লযুদ্ধ। অপরদিকে কানাই বলাই ও ছাত্রদের আক্রমণে ডাকাতদলের কতক পলাইল, কতক জখম হইল, একজন মরিল। ছাত্ররাও কেহ কেহ আঘাত পাইল। রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। গ্রামের লোকেরাও সাহসে ভর করিয়া ছুটিয়া আসিল। তখন ডাকাতদলের আর একজনও সেখানে থাকিল না, পলাইয়া গেল। রহিল কেবল যে নিহত সে ও অত্যন্ত আহত যাহারা তাহারা। চক্রবর্তী মহাশয় ও নিতাই তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উঠানের জলকাদায় পড়িয়া আছেন। জগদম্বা দেবীর খড়্গাঘাতে একজন চোরের একখানি পা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া পালাইয়াছিল। রক্তক্ষরণে সেও তখন মুমূর্ষুপ্রায়।

সকলে নিতাই ও অন্যান্য ডাকাতদের বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া থানায় খবর দিল এবং তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে ধরাধরি করিয়া ঘরে তুলিয়া শোয়াইয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

তর্কপঞ্চানন মহাশয় ও জগদম্বা দেবীর সাহসের তাহারা প্রশংসা করিতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া থানা হইতে দারোগাবাবু সদলবলে আসিলেন। ডাকাতদের ধরিয়া চালান দিলেন। বিচারে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইল।

সেই ডাকাতদের কথা লোকে অনেকদিন ভুলিয়া গেলেও তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সাহসের গল্প কিন্তু বালক-বৃদ্ধ সকলেই করিতেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের উত্তরাধিকারীদের আমরা দেখিয়াছি।

স্বীকার করছি, সেদিন শিকার করতে যাওয়াটা পাকা শিকারির মতো কাজ হয়নি।

সকাল থেকেই খেপে খেপে আকাশের বুকে কালো মেঘ উঠছে এবং তার সাথি হয়ে আসছে উদম ঝোড়ো হাওয়া আর ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে মাঠ-ঘাট-বাট সমস্ত।

দুর্যোগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু সাঁওতাল পরগনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন, এই

অল্পক্ষণের দুর্যোগেই ঘাট-বাট-মাঠের অবস্থা হয় কতটা বিপদজনক এবং ছোটো ছোটো পাহাড়িয়া নদীগুলো পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে দুকূল ভাসিয়ে হয়ে ওঠে কতটা দুর্দমনীয়! আর অরণ্যরাজ্য তো দুরধিগম্য হয়ে ওঠে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা তিন বন্ধু, তিন সরকারি কর্মচারী এবং প্রত্যেকেরই হাতে ছুটি আছে আর মাত্র একদিন। ছুটি ফুরোলেই আবার পায়ে পরতে হবে কাজের শৃঙ্খল! অতএব ছুটি ফুরোবার আগের দিনটাকে যেন-তেন প্রকারে কাজে লাগাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের হাতে ছিল তিনটে ছব্‌রা-ছোঁড়া বন্দুক, কারণ স্বপ্নেও কোনোদিন বাঘ-টাঘ মারিনি, তাই আমাদের পাখি শিকার ছাড়া অন্য কোনো উচ্চাভিলাষ ছিল না। কিন্তু বেরুবার সময় ডাকবাংলোর খানসামার মুখে শোনা গেল একটা বেমক্কা কথা।

বললে, "হুজুর, বেলা পড়বার আগেই বাংলোয় ফিরে আসবেন।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?"

—"অন্ধকার পথে চলতে গেলে বিপদে পড়তে পাবেন।"

—"বিপদ? বাঘ-ভাল্লুক?"

—"না।"

—"তবে?"

সে আর জবাব না দিয়ে বাংলোর ভিতর চলে গেল। তার মুখ দেখে মনে হল, এ সম্বন্ধে আর কোনো কথাই সে খোলসা করে বলতে রাজি নয়। অল্পক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করলুম, কিন্তু বিপদটা কী হতে পারে, কিছুই আন্দাজ করা গেল না। তারপরেই পড়লুম উত্তেজনার আবর্তে—শিকারের উত্তেজনা। ডাকবাংলো ও খানসামার স্মৃতি পর্যন্ত মন থেকে মুছে গেল।

অস্থায়ী ঝড়ঝাপটা আর বৃষ্টির দাপটে মাঝে মাঝে কষ্ট পেয়েছিলুম নিশ্চয়ই, তবে তা সত্ত্বেও তিনটে বালিহাঁস ও একটা চখা বা চক্রবাককে হস্তগত করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলুম না। তারপরেও আমাদের উৎসাহ-বহ্নি নির্বাপিত হয়নি। কিন্তু হঠাৎ দুটো ব্যাপার উপলব্ধি করা গেল: আমরা ফেরবার পথ ভুলেছি এবং বেলাবেলি যথাস্থানে ফিরতে না পারলে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের অবস্থা হবে কানামাছির মতো।

আমরা তখন একটা অরণ্যের ভিতর দিয়ে পদচালনা করছি। মাথা তুললে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় অস্তগত সূর্য তার সমস্ত আলো এখনও আকাশ থেকে মুছে দিতে পারেনি, কিন্তু এরই মধ্যে দলে দলে নানাজাতের পাখিরা বাসামুখো যাত্রা শুরু করেছে এবং কোনো কোনো দল নিরাপদে বাসায় ফিরে সমস্বরে আরম্ভ করে দিয়েছে দৈনিক সান্ধ্য-সংগীতের সাধনা।

দীনেশ বললে, "তাড়াতাড়ি পা চালাও—নইলে বিপদ হবে ঘনীভূত! অন্ধকার নামলেই চাঙা হয়ে ওঠে বনের বাঘ ভাল্লুকরা।"

প্রমথ বললে, "তাড়াতাড়ি পা চালাতে তো বলছ, কিন্তু পা চলাব কোন্ দিকে? কে জানে এই বন থেকে বেরুবার পথ?"

আচম্বিতে অপরিচিত হেঁড়ে গলা শোনা গেল—"আমি জানি।" সচমকে মুখ ফিরিয়ে চারিদিকে তাকিয়েও আবিষ্কার করা গেল না, কোথা থেকে সেই অভাবিত আকস্মিক কণ্ঠস্বরের উৎপত্তি। সামান্য দুটি শব্দ—"আমি জানি।" কিন্তু শুনেই কেন জানি না, বুকটা কেমন ধড়ফড় করে উঠল।

আগেই বলেছি, সূর্য অস্তমিত হলেও আকাশ তখনও গোধূলি আলোকের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। বনের ফাঁকে ফাঁকেও মাটির ঘাসের পাটি ধুয়ে যাচ্ছিল আলোকের করুণা-ধারায়। কিন্তু যেখানে পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ বনস্পতিদের বিরাট পত্রছত্র আলোর ধারাকে ঝোপঝাপের উপরে নেমে আসতে দেয়নি, সে সব জায়গায় জমজমাট হয়ে অন্ধকার তার চির-বান্ধবী রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করছে।

কোথাও কোথাও অন্ধকারের প্রভাব কিছু অল্প বটে, কিন্তু সেখানেও জঙ্গল ক্রমেই বেশি ছায়াচ্ছন্ন ও অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। এইরকম একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দীনেশ বলে উঠল—"ও কে ওখানে?"

ভালো করে চেয়ে দেখলুম একটা মনুষ্যমূর্তি ওখানে প্রতিমূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সাদা ধবধবে আলখাল্লার মতো লম্বা জামা প্রায় তার পা পর্যন্ত

ঝুলে পড়েছে এবং রহস্যময় ছায়ার ভিতর থেকে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে দিচ্ছিল জামার সেই শুভ্রতাই।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম। তার দুটো অতি উজ্জ্বল চক্ষু মাছের চোখের মতো নিষ্পলক এবং তাদের দৃষ্টি যেন বনজঙ্গলের বাধা পার হয়ে চলে গিয়েছে দূরদূরান্তরে।

আমরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম প্রায় মিনিট খানেক। এই লোকটাই কি কথা কইছিল ?

শুনলুম তো বাংলা কথা, কিন্তু লোকটাকে তো বাঙালি বলে মনে হল না, বোধ হয় বিহারি। এখানকার অনেক লোক বাংলায় বেশ কথা বলতে পারে।

বাঙালি হোক, এমন অসময়ে প্রায় অন্ধকারের সঙ্গে গা মিলিয়ে বিজন বনে লোকটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে কী করছে ? এটা বেড়াবার বা বিশ্রাম করার জায়গা নয় এবং তাকে শিকারি বলেও সন্দেহ হল না, কারণ সে নিরস্ত্র।

কিন্তু একটা ব্যাপার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। তার সাদা আলখাল্লার নানা জায়গায় মাটির ছাপ এবং তার হাত দুখানার উপরেও কাদামাটির পুরু প্রলেপ। কেশপাশ, গোঁফ-দাড়িও মাটির লেপন থেকে মুক্ত নয়।

তার দেহের উচ্চতা ছয় ফুটের কম হবে না। মাথায় অযত্নবিন্যস্ত তুলোর মতো সাদা লম্বা চুল এবং রাশিকৃত পাকা গোঁফ-দাড়ি তার মুখের অধিকাংশ ঢেকে বুকের তলা পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। বয়স বোধ করি ষাট পার হয়েছে, কিন্তু তার দেহ এখনও রীতিমত ঋজু ও বলিষ্ঠ।

আমরা যে তিন-তিনটে মানুষ তীক্ষ্ণ ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপও করলে না দেখে শেষটা আবার আমি প্রশ্ন করলুম, "মশাই, এই বন থেকে বেরুবার পথ কোন্‌দিকে, বলতে পারেন ?"

তবু তার ভাবান্তর নেই, সে ফিরেও তাকাল না। তবু মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্তিও হল না। তবে চোখ দুটো আরও চক্‌চক্ করে উঠল। কেবল নীরবে দক্ষিণ বাহু তুলে সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তার ডানদিকটা।

—"ধন্যবাদ মশাই, ধন্যবাদ। দয়া করে বলতে পারেন আমাদের আর কতটা পথ চলতে হবে ?"

কোনো জবাব না দিয়েই মূর্তিটা স্যাঁৎ করে সরে গেল ঝোপের ভিতর চোখের আড়ালে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বন্যবরাহ সভয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ রবে চিৎকার করে সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে প্রাণপণে দৌড় মেরে পালিয়ে গেল।

আমি বিস্মিত স্বরে বললুম, "বুনো বরাহ হচ্ছে দারুণ হিংস্র জীব, সে পালিয়ে গেল কার ভয়ে ?"

দীনেশ শিউরে বলে উঠল, "উঃ ! কী ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে !"

প্রমথ বললে, "হাওয়াটা আসছে ওই ঝোপের দিক থেকেই। কী আশ্চর্য, হাওয়াটা হঠাৎ এতটা কন্‌কনে হল কেন ?

কেবল হাড় কাঁপানো বরফের মতো ঠান্ডা হাওয়া নয়—সেই সঙ্গে আমি পেলুম স্যাঁৎসেঁতে কাঁচা মাটির গন্ধ। মনে জাগল কেমন অমঙ্গলের আশঙ্কা এবং অজানা বিভীষিকার ইঙ্গিত। এ কি অকারণে ?

ঝোপের ভিতর দিকে আর একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চালনা করলুম। সেখানে তখন আসর পেতেছে রাত্রির অন্ধকার এবং সেই অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠেছে দুটো নীলাভ দীপ্তি—ঠিক যেন কোনো হিংস্র জন্তুর ক্ষুধিত চক্ষু। ওটা কী জন্তু হতে পারে ? ওকে দেখেই কি চম্পট দিলে বন্যবরাহটা ? কিন্তু সেই অদ্ভুত বুড়োটা তো ওই ঝোপেই ঢুকেছে। তার কি প্রাণের ভয় নেই ?

তার ভয় না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের আছে। ওই দীপ্তচক্ষু জন্তুটা যে আমাদেরই লক্ষ্য করছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, "চলো, চলো, ধরো ওই ডানদিকের পথ! এই অলক্ষুনে বন থেকে বেরিয়ে পড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি !"

বনের মধ্যে তখন আলো-আঁধারির খেলা। কাছাকাছি চোখ চলে, কিন্তু দূরের দিকটা ঝাপসা হয়ে এসেছে। কোথাও ছাড়া-ছাড়া ঝোপঝাপ, কোথাও দুর্ভেদ্য জঙ্গলের প্রাচীর, কোথাও খণ্ড খণ্ড জমি। একাধিক জায়গায় বৃষ্টিভেজা নরম মাটির উপরে নজরে পড়ল সন্দেহজনক ভয়াবহ হিংস্র জন্তুর পদচিহ্ন। বলা বাহুল্য, আমাদের চলার গতি বেড়ে উঠল।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝলুম না, কিন্তু আচম্বিতে চারিদিকে যেন মহা তোলপাড় পড়ে গেল। আমাদের

পিছন দিক থেকে বেগে ছুটে এল একদল হরিণ, একদল বন্যবরাহ, অনেকগুলো হায়েনা, শেয়াল, খরগোশ প্রভৃতি। তারা কেউ আমাদের প্রতি দৃকপাতও করলে না—বেশ বোঝা গেল, দারুণ আতঙ্কের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তারা পলায়ন করছে। তারপর বিদ্যুৎ-চমকের মতো দেখা দিয়েই পালিয়ে মিলিয়ে গেল একটা চিতাবাঘও।

শুনেছি অরণ্যে দাবানল জ্বললে সব জানোয়ার এইভাবে একত্রে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়, কিন্তু এখানে তো দাবানলের উৎপাত নেই, আছে কেবল সন্ সন্ বর্ষার ঝরন। তবে এতগুলো জানোয়ারের এমন বিষম আতঙ্কের কারণ কী ?

আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য না করে পারলুম না। বিহঙ্গদের দিবান্তকালের গানের জলসা সমানে চলতে চলতে আচমকা থেমে গেল—যেন কী এক অস্বাভাবিক বিপদের সম্ভাবনা হঠাৎ তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিলে, একটা পাখিও আর টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলে না।

তারপরেই আমাদের পিছন থেকে বইতে শুরু করল হু হু করে একটা প্রবল ও তুষার-শীতল হাওয়া—একটু আগেই ঝোপের কাছে পেয়েছিলুম যার অভাবিত ও অসহনীয় স্পর্শ।

হতবুদ্ধির মতো ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একবার পিছন দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে বাধ্য হলুম।

দূরে আবছা দেখা যাচ্ছে চলন্ত শ্বেতবর্ণের একটা কিছু, আরও নিকটস্থ হলে বোঝা গেল, সেটা আলখাল্লার মতো একটা সাদা ধবধবে লম্বা ঢিলে জামা। জামার উপর দিকে ঝোড়ো বাতাসের তোড়ে লটপট করে উড়ছে রাশি রাশি তুলোর মতো শুভ্র লম্বা মাথার চুল ও মুখের শ্মশ্রু ! এবং সেই রাশিকৃত চুলের শুভ্রতার মাঝখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য দুটো নীলাভ দীপ্তি। বুঝতে বিলম্ব হল না লম্বা জামা পরে হন্ হন্ করে এদিকে এগিয়ে আসছে সে কোন্ দীপ্তচক্ষু মূর্তি। কিন্তু কেন এগিয়ে আসছে ?

মূর্তি যত এগিয়ে আসে, হাওয়ার কন্‌কনানি তত বেড়ে ওঠে, মনে হয় সর্বাঙ্গে যেন তুষারপাত হচ্ছে। তারপরেই চারিদিক ভরে যায় স্যাঁৎসেঁতে কাঁচা মাটির গন্ধে। সদ্য-খোঁড়া ভিজে মাটি।

কে এই বলিষ্ঠ বুড়ো ? ওকে দেখেই কি দারুণ ভয়ে হিংস্র জন্তুরা দলে দলে ছুটে পালিয়ে যায় এবং স্তব্ধ হয়ে যায় গীতকারী পাখিদের কণ্ঠস্বর ? এবং বইতে থাকে তুহিন-শীতল হাওয়া ?

কিন্তু কেন, কেন, কেন ?

দুটো নীলাভ দীপ্তি, দুটো জ্বলন্ত চক্ষু ক্রূর, হিংস্র বুভুক্ষু ! মাছের চোখের মতো নিষ্পলক।

সহসা এক অজানিত বিপুল আতঙ্কে আমার সারা দেহ মন সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল—পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলুম, "প্রমথ ! দীনেশ ! পালাও, পালাও, পালাও !"

অল্পক্ষণ পরেই বনের সীমানা পার হয়ে আমরা খোলা জায়গায় এসে পড়লুম। আকাশে আলোর চোখ মুদে এসেছে বটে, কিন্তু রাত্রির কালিমা ভালো করে তখনও জমে ওঠেনি—সে হচ্ছে দিবানিশির রহস্যময় সন্ধিক্ষণ।

খানিক দূরে পশ্চিম দিকে দেখা যাচ্ছে ছাই-রং মাখা একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের স্তূপ।

প্রমথ আনন্দে বলে উঠল, "ওই যে জাফরগঞ্জের নবাব-বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। চেনা জায়গার এত কাছে এসে পড়েও আমরা পথ হারিয়ে বনে বনে অন্ধের মতো ঘুরে মরছিলুম !"

নেই আর সেই বরফের মতো ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শ, নেই আর সেই সদ্য-খোঁড়া কাঁচা মাটির গন্ধ।

দীনেশ সবিস্ময়ে হাত তুলে বলে উঠল, "দেখো, দেখো ও আবার কী ?"

ধ্বংসাবশেষের বরুজের উপরে আকাশের গায়ে জেগে রয়েছে আলখাল্লা-পরা একটা দীর্ঘায়ত মূর্তি—ঝোড়ো হাওয়ায় লটপট করে উড়ছে তার মাথার লম্বা চুলগুলো। দীপ্ত উজ্জ্বল নীলাভ চক্ষুর অস্তিত্ব এত দূর থেকে বোঝা গেল না।

সমস্ত শুনে ডাকবাংলোর খানসামা বললে, "আগেই তো আপনাদের বেলা পড়ে এলে বনের ভেতরে থাকতে মানা করেছিলুম।"

আমি বললুম, "কিন্তু কিছুই তো তুমি খুলে বলোনি !"

খানসামা মৃদু হেসে বললে, "খুলে বললে আপনারা কি বিশ্বাস করতেন ?"

—"তোমার কথাটা কী ?"

—"হুজুর, আপনারা মুবারক খাঁয়ের পাল্লায় পড়েছিলেন।"

—"কে সে ?"

—"জাফরগঞ্জের নবাবদের শেষ বংশধর। নবাবিত্ব ঘুচে গেছে তার পূর্ব-পুরুষদের আমলেই, নবাববাড়িও এখন ভেঙে চুরে একটা ইঁটের পাঁজার মতো অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে। মুবারক খাঁয়ের পেশা ছিল খুন-ডাকাতি-রাহাজানি। শেষটায় সে ধরা পড়ে আর বিচারে ফাঁসি হয়।"

—"ফাঁসি হয় ? সে বেঁচে নেই !"

খানসামা বললে, "না হুজুর। কিন্তু নানা জনে নানা-কথা বলে। সূর্য অস্ত গেলেই মুবারক নাকি নিজের হাতে কবরের মাটি খুঁড়ে রোজ আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। অনেকে নাকি সাঁঝের বেলায় বনের ভেতরে গিয়ে তাকে দেখে পালিয়ে এসেছে, আবার অনেকে নাকি পালিয়ে আসতে পারেনি, এমনকী তাদের লাসগুলো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি।"

খানসামা আমাদের নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করবার জন্য বাংলোর ভিতরে চলে গেল। আমরা খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলুম।

তারপর দীনেশ হঠাৎ হো-হো রবে অট্টাহাস্য করে বলে উঠল, "সব ঝুটা বাবা, সব ঝুটা ! বনের ভিতরে গিয়ে আমরা পড়েছিলুম এক পাগলের পাল্লায় !"

প্রমথ বললে, "আর সেই বরফের মতো ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা !"

—"সারাদিন থেকে ঝড়বৃষ্টি চলছে। মাঝে মাঝে কন্‌কনে হাওয়ার প্রকোপ বেড়ে ওঠা একটুও অস্বাভাবিক নয়।"

—"কিন্তু সেই স্যাঁৎসেঁতে কাঁচা মাটির গন্ধ ?"

—"বৃষ্টি পড়লেই মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ বেরুতে থাকে।"

—"কিন্তু কার ভয়ে জানোয়ারগুলো এমন করে পালিয়ে গেল ?"

—"নিশ্চয়ই তারও একটা সংগত কারণ আছে—আমরা যা জানি না।"

আমার মতামত উহ্য রইল।

পারম্পর্য

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কর্তা বুড়ো হয়েছেন, একটা খানসামা না হলে আর চলে না। এমন খানসামা চাই যে নিজেই সব দেখেশুনে কাজকর্ম করবে, কর্তাকে তার জন্যে বকাবকি করতে হবে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা চটপটে খানসামা জুটল। সে বললে দশঘরার নবাববাবুর বাড়িতে তার খানসামাগিরির শিক্ষা আরম্ভ, তারপর চোরকাঁটার জমিদার, শেষে ঘুঘুচরের মহারাজ—এঁদের কাছে কাজে সে হাত পাকিয়েছে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোনো কাজ শিখতে তার বাকি নেই। শুনে কর্তা ভারি খুশি, বললেন,—বেশ, তুমিই থাক। কাজকর্ম সব দেখে-শুনে নাও।

সে কাজকর্ম সব বুঝে নিচ্ছে এমন সময় কর্তা তাকে ডেকে বললেন—ওহে, কাজ তো বুঝে নিচ্ছ, কাজের পারম্পর্য বোঝো?

সে মাথা চুলকে বললে,—আজ্ঞে না কর্তা, টুলো পণ্ডিতের ঘরে তো কাজ করিনি যে ও কথার মানে বুঝব।

কর্তা বললে,—পারম্পর্য মানে—এই, পরপর আর কী। যেমন ধর তোমায় তেল আনতে বললুম, তুমি তখনই বুঝবে এরপরে স্নানের জলের দরকার, তারপরেই ভাতের ঠাঁই করে ভাত, তারপর তামাক, তারপর ঘুমের বিছানা তৈরি! এই এক হুকুম থেকেই তোমাকে তার পরের পরের কাজগুলি বুঝে নিয়ে করতে হবে।—একেই বলে কাজের পারম্পর্য। বুঝলে?

খানসামা হাত জোড় করে বললে,—আজ্ঞে বুঝলুম। কর্তা বললেন,—দেখ, এখানে যদি চাকরি বজায় রাখতে চাও, তাহলে ওই পারম্পর্য বুঝে কাজ করতে হবে। খানসামা বললে,—যে আজ্ঞে।

সেইদিন রাত্রে কর্তার একটু মাথা ধরল। তিনি নতুন খানসামাকেডেকে পাঠালেন মাথাটা একটু টিপে দেবার জন্যে। দু-মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, আধঘণ্টা গেল,—খানসামার দেখা নেই। কর্তা বিরক্ত হয়ে ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন শেষ রাত্রি তখন খানসামা এসে দরজা ঠেলাঠেলি করে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। কর্তা চেঁচিয়ে উঠে বললেন—কে রে?

—আজ্ঞে আমি হুজুর।

কর্তা রেগে উঠে বললেন, এতক্ষণে তোমার আসবার ফুরসত হল—পাজি ব্যাটা!

—আজ্ঞে কি করব হুজুর পারম্পর্য করতে করতে একটু দেরি হয়ে গেল।

—এতক্ষণ ধরে কী পারম্পর্য করছিলি ব্যাটা?

—আজ্ঞে আপনি বলে পাঠালেন আপনার মাথা ধরেছে, তাই বুঝলুম এরপরেই ডাক্তার ডাকতে হবে, ছুটলুম ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার এলেই ওষুধ দেবে তো? ছুটলুম দাওয়াইখানায় তাদের বলতে, তাড়াতাড়ি দোকান না বন্ধ করে। ওষুধ খেয়ে আপনার অসুখ যদি না সারে তা হলেই তো পটল তুলবেন—সেই ভেবে উকিলকে খবর দিতে ছুটলুম, যদি উইল করেন। তারপর শ্মশানের ভাবনা—খাট জোগাড় করা, কাঠ জোগাড় করা, লোকজন ডাকা। তারপর শ্রাদ্ধ—বামুন-পুরুতকে খবর দেওয়া, কী-কী জিনিস চাই তার ফর্দ করা—সব এই একরাত্রের মধ্যেই করে ফেলেছি কর্তা। দেখুন না হুজুর, আপনার বৈঠকখানায় লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। এখন কিছু টাকা দ্যান, দেনাগুলো মেটাই, তারপর নেমন্তন্ন করতে বেরুতে হবে।

কর্তা সব শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন,—পারম্পর্য তো এখনও শেষ হয়নি বাপু!

খানসামা অবাক হয়ে বললে, তাই নাকি, আর তো আমার কিছু মাথায় আসছে না কর্তা।

—মাথায় এনে দিচ্ছি তোমার, রোসো না!—বলে আবার বললেন— কর্তার মৃত্যুর পর তার খানসামা কি আর থাকে?

—আজ্ঞে কর্তা, বলে খানসামা মুখ কাচুমাচু করতে লাগল।

কর্তা বললেন, তা হচ্ছে না বাপু, পারম্পর্য যখন এতদূর পর্যন্ত টেনেছ তখন ওর শেষ অবধি তোমায় নিয়ে যেতে হবে।

খানসামা কটমট করে চেয়ে বললে—আচ্ছা! বলে ঝট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

কর্তা ভয়ে-ভয়ে ভাবতে লাগলেন চাকরটা এর পরেও পারম্পর্য করতে অগ্রসর হয় কি না।

শামশের খাঁর মতো দস্যু খোরাসান রাজ্যে দ্বিতীয়টি ছিল না; তবে তার এক বিশেষত্ব ছিল যে, ধনীর ধন লুণ্ঠন করে সে গরিবদের পালন করত, আর ডাকাতি করতে গিয়েও যথাসম্ভব মানুষের জীবন বাঁচিয়ে চলত।

সুলতানের সৈনিকেরা চারিদিকে তার সন্ধানে ফিরত। তাকে ধরবার জন্যে বড়ো রকমের পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। একদিন সে ধরা পড়ল। এক গরিব বিধবা আর তার অনাথ শিশুদের মাঝে-মাঝে সে কিছু দিয়ে যেত তাদের ভরণ-পোষণের জন্যে। সুলতানের কর্মচারীরা গোয়েন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুযোগ বুঝে একদিন এসে তাকে গেরেফতার করল।

যথাসময় শামশের খাঁর বিচার হল আর বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। দেশের গরিব দুঃখীরা কাঁদতে লাগল। তাদের দরদি বন্ধু শামশের খাঁ বিপদে আপদে আর তাদের সাহায্য করতে আসবে না।

বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে প্রহরীদের সতর্ক পাহারা। আজ শামশের খাঁর ফাঁসির দিন। নির্দিষ্ট

সময়ে সৈনিকেরা শামশের খাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে এল। ফাঁসি-কাষ্ঠ প্রভৃতি সব প্রস্তুত; বিচারকের আদেশ হলেই শামশের খাঁকে ফাঁসিতে চড়ানো হবে। কাছে অবর্ণনীয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে মানুষ এই দস্যুপ্রবরের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ জনতার মধ্যে ভীষণ কলরব উঠল। চারিদিকে সেই একই চিৎকার, 'সুলতানের মৃত্যু হয়েছে—সুলতানের মৃত্যু হয়েছে'। সুলতানের মৃত্যু—সে-তো যা তা ব্যাপার নয়। নতুন সুলতান সিংহাসনে বসবেন, দেশের শাসনতন্ত্র বদলে যাবে; কার ভাগ্যে কী আছে কেউ বলতে পারে না। বিচারক, রাজকর্মচারী, সৈনিক প্রহরী প্রভৃতি সকলেই দৌড়ল প্রাসাদের দিকে। অপরাধীর কথা সকলে ভুলে গেল। তার তত্ত্বাবধানের জন্য কেউ সেখানে রইল না।

সজাগ-বুদ্ধি শামশের খাঁ দেখলে আত্মরক্ষার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। কালবিলম্ব না করে সে বধ্যভূমি থেকে অদৃশ্য হল।

এদিকে রাজকর্মচারীরা প্রাসাদে গিয়ে দেখলে, সুলতান প্রথামতো জাঁকজমকের সঙ্গে সিংহাসনে বসে দরবার করছেন। কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই।

লজ্জায় তাঁদের মস্তক হেঁট হয়ে গেল। স্পষ্টই তারা বুঝল, ভিত্তিহীন বাজে গুজব শুনে তারা প্রতারিত হয়েছে। কাউকে কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করবার কিংবা বলবার প্রবৃত্তি মোটেই তাদের হল না। বিনা বাক্যব্যয়ে দৌড়ে তারা বধ্যভূমিতে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে যা দেখল তাতে তাদের মাথা একেবারে ঘুরে গেল। শামশের খাঁ বধ্যভূমিতে নেই। সুযোগ বুঝে সজাগ-বুদ্ধি দস্যু অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল; কিন্তু শামশের খাঁর কোনো চিহ্ন কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

ঘটনার বিষয় অবহিত হয়ে সুলতান গুজব সৃষ্টিকারীর সন্ধান করতে আদেশ করলেন। চারিদিকে খোঁজতল্লাশ করে রাজকর্মচারীরা এক গরিব বৃদ্ধকে রাজদরবারে উপস্থিত করলেন।

সুলতান বৃদ্ধকে সম্বোধন করে বললেন, 'বৃদ্ধ, তুমিই আমার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ রটিয়েছিলে?'

বৃদ্ধ—হাঁ হুজুর! এ অপরাধ আমিই করেছি।

সুলতান—কেন করেছ? আমি কি বিচারক বাদশা নই? আমি কি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষণ কাজ করে যাচ্ছিনে?

বৃদ্ধ—হুজুর, গরিব পরওয়ার, আপনি আমাদের মঙ্গলের চিন্তায় সর্বদা রত আছেন। আর তার জন্য আমরা আপনার কাছে একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। তবে কিনা জানেন, আপনার মৃত্যুর মিথ্যা গুজব রটিয়ে আমি আপনার কোনো অনিষ্ট করতে পারব না; আর সেই গুজবের ফলে যদি আমার একজন উপকারী বন্ধু মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পায়, তাহলে তার উপকারের প্রতিদান দেওয়া হবে। জানেন হুজুর, আমার মেয়ের বিয়ের সময় হাতে আমার একটিও পয়সা ছিল না। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখছিলুম। আত্মীয়দের কাছে গেলুম, তাঁরা আমাকে সাহায্য করতে তাঁদের অক্ষমতা জানালেন। আমার কয় ভাই বেশ সংগতিপন্ন। তাদের কাছে সাহায্য চাইলুম। তারা বললে, দিন বড়ো খারাপ, এখন পয়সা হাতছাড়া করা যেতে পারে না। শেষে অগতির গতি আল্লার শরণাপন্ন হলাম। রাতে নমাজের পর মসজিদে বসে খোদার কাছে আমার প্রয়োজন জানালুম। মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছি, এমন সময় দীর্ঘকায় একজন বলিষ্ঠ লোক আমাকে অভিবাদন করে বললে, 'বৃদ্ধ! খোদার কাছে তোমার আত্মনিবেদন আমি শুনেছি। কত টাকা হলে তোমার অভাব পূরণ হতে পারে?' লোকটির কথা শুনে আমার মনে হল, আল্লা আমার প্রার্থনা শুনেছেন, আর আমার প্রয়োজন মেটাবার জন্য লোকটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি বললুম, 'জনাব, আমার প্রয়োজন এক হাজার টাকার কমে পূরণ হবে না। এত টাকা কে আমাকে দেবে?' দীর্ঘকায় মানুষটি বললেন, 'আমার সঙ্গে এস।' আমি তাঁর সঙ্গে গেলুম। অনেক পথ অতিক্রম করে রাজধানীর উপকণ্ঠে তিনি এক বাগানে প্রবেশ করলেন। আমিও সঙ্গে গেলুম। বাগানে সুন্দর এক দ্বিতল বাড়ি। তিনি আমাকে দাঁড়াতে বলে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি ফিরে এলেন, হাতে টাকার একটি থলি। সঙ্গে দুজন বলিষ্ঠকায় জোয়ান। আমায় সম্বোধন করে বললেন, 'এই নাও, এই থলিতে দুই হাজার রৌপ্যমুদ্রা আছে। প্রয়োজন পূরণ হবার পরও তোমার হাতে উদ্বৃত্ত কিছু থাকবে। চোর-ডাকাতের ভয় আছে, তাই এই দুই জোয়ানকে তোমার সঙ্গে পাঠালাম। এরা তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে। ভবিষ্যতে যদি কখনও প্রয়োজন হয় দস্যুসর্দার শামশের খাঁকে স্মরণ করবে।'

শামশের খাঁর নাম শুনে গা আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। তার বিষয়ে কত সব অদ্ভুত কাহিনি শুনেছি। এই দস্যুর মন যে এত উদার, এত উচ্চ, স্বপ্নেও তা ভাবিনি।

আমার মুখের ভাব দেখে শামশের খাঁ হেসে বললেন, 'আমায় এখন চিনলে তো? আর অবাক হয়ে থাকবার দরকার নেই। এখন বাড়ি যাও। কবে তোমার মেয়ের বিয়ে? বেশ, আমি বিয়ের সভায় উপস্থিত থাকব। পোলাও-কোর্মা খেয়ে আসা যাবে। তবে সাবধান, সভায় আমার পরিচয় প্রকাশ কোরো না।'

শামশের খাঁর কথা ও ব্যবহারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম। বিয়ের আসরে শামশের খাঁ যথাসময়ে দুই সঙ্গী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর আমার মেয়ের জন্য সুন্দর কয়েকটি অলংকার নিয়ে এসেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। তারপর হঠাৎ তাঁকে ফাঁসির ময়দানে দেখলুম। শামশের খাঁর বদান্যতার স্মৃতি আমার মানসপটে জ্বল-জ্বল করে জ্বলে উঠল। খোদাকে সম্বোধন করে একান্ত মিনতির কণ্ঠে আমি বললুম, 'হে সর্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভু! শামশের খাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ সত্যই উপস্থিত হয়েছে। কী করে এই চরম বিপদের সময় আমার উপকারী বন্ধুর দানের প্রতিদান দিতে পারি, আমায় তা বলে দাও। তুমি সব করতে পার প্রভু, এইটুকু করবার ক্ষমতা আমায় দাও।'

"আমার প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই কে যেন আমায় বলে দিলে, চিৎকার করে বল, 'সুলতান মারা গেছেন'—'সুলতান মারা গেছেন'। আমি তৎক্ষণাৎ 'সুলতান মারা গেছেন', 'সুলতান মারা গেছেন' বলে চিৎকার করে উঠলুম। তারপর যা ঘটেছে আপনার তা জানা আছে। আপনি জ্ঞানী, ক্ষমাশীল এবং বিচারক। উদারতা এবং মহানুভবতার জন্য দেশ-বিদেশে আপনার যথেষ্ট সুনাম আছে। আপনি আমার কাজের বিচার করুন"।

বাদশা মন্ত্রী মুসাকে সম্বোধন করে বললেন, 'শামশের খাঁ তো দেখছি যে-সে লোক নয়। গরিবদের প্রতি তার যথেষ্ট দয়া। সে সত্যিকারের একজন মহানুভব ব্যক্তি। এ হেন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া কি বাঞ্ছনীয়?' বিজ্ঞ মন্ত্রী বললেন, 'বান্দা নওয়াজ, আমিও শামশের খাঁর মহানুভবতার অনেক কাহিনি শুনেছি। সে এই গরিব বৃদ্ধকে দুঃসময়ে সাহায্য করেছিল বলেই বৃদ্ধ তার বিপদের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে খোদার ফেরেস্তার মতোই এসে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে রক্ষা করেছে। আমাদের রসুলে করিম সত্যই বলেছেন : দান এবং পরোপকার মানুষের বিপদের সময় কাজে আসে। এ সত্যের আজ এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। শামশের খাঁ যে প্রকৃত একজন বীর এবং উচ্চমনা লোক স্পষ্টই তা বোঝা যাচ্ছে। এরূপ লোককে শত্রু করার চেয়ে বন্ধু করাই বাঞ্ছনীয়। আপনি তার পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে উক্ত রাজকার্যে নিয়োজিত করুন। রাজ্যের তাতে মঙ্গলই হবে।'

সুলতান উজিরের কথার সমীচীনতা স্বীকার করলেন। শামশের খাঁর নামে এক রাজকীয় পত্র পাঠানো হল। পত্রে পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে উক্ত রাজপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল।

শামশের খাঁ যথাসময়ে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করলে। সুলতান তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন এবং সেনানীর পদে বহাল করলেন। উত্তরকালে এই শামশের খাঁ রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

পথ চেয়ে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝম্‌ঝম্ বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন-পনেরো ধরে বর্ষা নেমেছে,—তাব আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভট্‌চাজের বাড়ি আজ দুদিন হাঁড়ি চড়েনি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমি-জমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ি

ঘুরে ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়িতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে, ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান বাড়ি থেকে যে-কটি ধান এনেছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েছে—ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষিদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়েস বারো, গোপালের দশ। কদিন থেকে পেট ভরে না খেতে পেয়ে ওরা দু-ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

নেপাল বললে—এই গোপলা, খিদে পেয়েচে না তোর?

গোপাল ছিপ চাঁচতে-চাঁচতে বললে—হুঁ দাদা!

—মাকে গিয়ে বল্। আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।

—মা বকে। তুমি যাও দাদা।

—বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনীকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে—ও চুনী, শুনে যা।

চুনী বয়সে নেপালের চেয়ে বড়ো। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে। বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—কী?

—আয় না ভেতরে?

—না, যাব না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটিপিসিমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েছে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।

—কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?

—ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েছে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবারে; ওদের বাড়ি লোকজন খাবে।

—সত্যি?

—তা জানিস না বুঝি? আমাদের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করবে, গাঁয়েও বলবে।

—আমাদেরও করবে?

—সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?

চুনী চলে গেলে নেপাল ছোটো ভাইকে বললে—আজ কী বার রে? তা তুই কি জানিস? আজ শুক্কুরবার বোধ হয়। মঙ্গলবার নেমন্তন্ন।

গোপাল বললে—কী মজা, না দাদা?

—চুপ করে থাক। তোর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। তাল-নবমীর বের্তোয় তালের বড়া করে, তুই জানিস?

গোপাল সেটা জানত না। কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশি হয়ে উঠল। সত্যিই তা যদি হয়, তাহলে সে সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেছে কাছে। আজ কী বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে। নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ি যাবার পথে পড়ে জটিপিসিমার বাড়ি।

নেপাল বললে—তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ি ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ি তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে!

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদিঘি। নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটিপিসিমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী। গ্রামসুদ্ধ ছেলেমেয়ে তাঁকে বলে জটিপিসিমা।

পিসিমা বললেন—কী রে?

—তাল নেবে, পিসিমা?

—হ্যাঁ নেব বইকি! আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।

ঠিক এই সময় দাদার পিছু-পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েছে।

জটিপিসিমা বললেন—পেছনে কে রে? গোপাল? তা, আজ সন্ধেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?

নেপাল সলজ্জমুখে বললে—মাছ ধরতে।

—পেলি?

—ওই, দুটো পুঁটি আর ছোটো একটা বেলে।—তাহলে যাই পিসিমা?

—আচ্ছা এসো গে বাবা। সন্ধে হয়ে গেল। অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।

জটিপিসিমা তাল সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ দেখালেন না, বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না—যদিও দুজনেরই আশা ছিল, হয়তো জটিপিসিমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন।

দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলে—তাল নেবেন তাহলে?

—তাল? তা, দিয়ে যেয়ো বাবা। কটা করে পয়সায়?

—দুটো করে দিচ্ছি পিসিমা। তা, নেবেন আপনি.... তিনটে করেই নেবেন।

—বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।

—মিশকালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে—কবে তাল দিবি দাদা?

—কাল।

—তুই ওদের কাছে পয়সা নিসনে দাদা!

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে—কেন রে?

—তাহলে আমাদের নেমন্তন্ন করবে, দেখিস এখন।

—দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়োব আর পয়সা নেব না?

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু-হু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পুবদিকের জানলার কপাট দড়ি-বাঁধা; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খট্ খট্ শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে।

সে শুয়ে শুয়ে ভাবছে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে, তবে আর ওরা নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনও করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখনও ওঠেনি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, সামান্য একটু টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।

গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশের সেই তালদিঘির ধারে।

মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওড়া লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে—কী খোকা-ঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?

—তাল কুড়ুতে দিঘির পাড়ে।

—বড্ড সাপের ভয়, খোকা-ঠাকুর। বর্ষাকালে ওখানে যেয়ো না একা-একা।

গোপাল ভয়ে ভয়ে দিঘির তাল-পুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগল।

বড়ো আর কালো কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসার পথে আরও গোটাতিনেক ছোটো তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, অত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই; দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটিপিসিমার বাড়ি হাজির।

জটিপিসিমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোর-গোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক হয়ে বললেন—কীরে খোকা?

গোপাল একগাল হেসে বললে—তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসিমা!

—বারে, এ যে ভালো তাল দেখছি! ক-পয়সা রে?

—একটা পয়সাও দিতে হবে না। এমনি দিলাম পিসিমা।

জটিপিসিমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে তালনবমী কবে জিগ্যেস করে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার।

সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকেল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। বাঁশঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে বাদলার হাওয়ায়। বকুলতলার ডোবায় কটকটে ব্যাঙের দল থেকে-থেকে ডাকছে।

গোপাল জিগ্যেস করলে—ব্যাঙগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?

গোপালের মা বলেন—নতুন জলে ডাকে, এখন পুরোনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।

—আজ কী বার, মা?

—সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কী দরকার?

—মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?

—তা হয়তো হবে, কী জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কী দরকার আমার?

সারাদিন কেটে গেল।

নেপাল বিকেলের দিকে জিজ্ঞেস করলে—জটিপিসিমার বাড়িতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে জটিপিসিমা বললে—গোপাল তাল দিয়ে গেছে পয়সা নেয়নি। কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!

—ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা। কাল তো তালনবমী।

—সে এমনি নেমন্তন্ন কববে—পয়সা নিলেও করবে। তুই একটা বোকা!

—আচ্ছা দাদা। কাল তো মঙ্গলবার, না?

—হুঁ।

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ির পাশের বড়ো বকুলগাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে; জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে, কাল সকালটা হলে হয়! কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!

* * * *

জটিপিসিমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়—খোকা, কাঁকুড়ের ডাল্না আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।

জটিপিসিমার বড়ো মেয়ে লাবণ্যদি একখানা থালায় গরম-গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললে—খোকা, ক-খানা নিবি তিল-পিটুলি? বলেই লাবণ্যদি থালাখানা উপুড় করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তারপর জটিপিসিমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন—খোকা, যাই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হল! খা খা, খুব খা—আজ যে তালনবমী রে!

কত কী চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ বাতাসে, খেজুরগুড়ের পায়েসের সুগন্ধ বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠল। সে বসে বসে খাচ্ছে কেবলই খাচ্ছে। সবারই খাওয়া শেষ, ও তবু খেয়েই যাচ্ছে···

লাবণ্যদি হেসে-হেসে বলছে—আর নিবি তিল-পিটুলি?

* * * *

—ও গোপাল?

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানলার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপ-ঝাড়, তাদের সেই আতা-গাছটা··· সে শুয়ে আছে তাদের বাড়িতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেছে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন—ওঠ্ ওঠ্, বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে, তাই বোঝা যাচ্ছে না।

বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—আজ কী বার মা?

—মঙ্গলবার।

তাও তো বটে! আজই তো তালনবমী। ঘুমের মধ্যে ওসব কী হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়ল, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েছে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইল।

বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা শিরশির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইল বটে, কিন্তু কই, জটিপিসিমাদের বাড়ি থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এল না!

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাঁদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড়ো ছেলে পাঁচু আর ও-পাড়ার হরেন।....

গোপাল ভাবলে—এরা যায় কোথায়।

এ দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্চাজ ও তার ছোটো ভাই দীনু, সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে।

দীনু ভট্‌চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে—এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?

গোপাল বললে—কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

—জটিপিসিমাদের বাড়ি তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। বলেনি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কিনা, সবাইকে তো বলেনি!

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? শুধু তোমাদের করবে? নিশ্চয়ই করবে আমাদের। আমরা এর পরে যাব।

রাগ করার মতো কী কথা সে বলেছে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক হয়ে বললে—বা রে! তা, অত রাগ করিস কেন? কী হয়েছে?

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়ল—বোধ হয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে আজ ক-দিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল?

তার সজল ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হাবু, হিতেন, দেবেন, গুট্‌কে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে-একে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে জটিপিসিমাদের বাড়ির দিকে চলে গেল।

বিশুদের বাড়ি একটা পুরোনো আমবাগানের ধারে। গাছগুলোর অর্ধেক এখন গিয়েছে মরে, আর বাকি অর্ধেকেও ফল তেমন ভালো হয় না। গাছের তো আর তেমন যত্ন নেই। কাজেই রাজভোগ আম ক্রমশ কুলের আঁটির মতো হয়ে উঠেছে, তাও আবার টক আর পোকা ধরা। বাগানের মালিক কেউ নেই বললেই হয়, তবু ওর ত্রিসীমানায় কাবুর ঘর-বাড়ি বাঁধবার জো নেই; কারণ যে বুড়ো আমবাগান লাগিয়েছিল, সে ছিল ভারি দুর্দান্ত লোক। বাগানের মধ্যে যার তার উৎপাত সহ্য করতে পারত না। মরবার দিন পর্যন্ত বাগান আগলেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, যাবার সময় পাড়ার দশজনকে ডেকে বলে গিয়েছিল, "দেখ, আমি এই

বাগানেই যখ হয়ে থাকব, কেউ যদি বাগানের মাটি এক কোদাল কাটে কিংবা গাছের ডাল একটিও ভাঙে তো আমি তাকে দেখে নেব।"

পাড়ার যত দুষ্টু ছেলে ছিল, সবাইকার মা-মাসিরা ছেলেদের দিবারাত্রি ওই বুড়োর গল্প শোনাত। ভয়ে তাই ছেলেগুলো গরমের দিনে শুদ্ধ দুটো কাঁচা আম পাড়তেও সাহস করত না। ননীর বাবা বলে যে, ছেলেবেলায় একদিন ঠিক দুপুরবেলা ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে কেউ কোথাও নেই দেখে সে আম পাড়তে গিয়েছিল। গোটা পঁচিশ-ত্রিশ আম ঢিল মেরে পেড়ে কুড়োবার জন্যে যেই হেঁট হতে যাবে, অমনি পিছন থেকে তার চুলেব টিকিটা ধরে বুড়ো ভূতটা যা টান দিলে, বাবা, অনেকগুলো চুল ছিঁড়ে গিয়েছিল। টানের চোটে শূন্যেও বোধহয় দু-পা উঠে পড়েছিল। কত কষ্টে মাথা ঝাড়া দিয়ে টিকি ছাড়িয়ে ঘাড় যখন ফেরাল, দেখলে একটা তিনগজ লম্বা কালো হাত চুলটা ছেড়ে সোঁ করে ঝাঁকড়া গাছের পাতার মধ্যে লুকিয়ে গেল। সেদিন থেকে ও-বাগানে সে আর একটাও আম পাড়েনি। তা ছাড়া যখনই বাগান পার হয়, মাথায় একটা গামছা বেঁধে তবে যায়, কী জানি কখন ভূতের হাতে আবার টিকি বাঁধা পড়ে।

পাকু নাপিতের মাসি বলে, নদী থেকে জল আনতে একদিন তার সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি ওই পথেই ফিরছিল। পায়ের কাছে একটা আম পড়েছিল, লোভে পড়ে সেইটি মাত্র তুলেছিল, এমন সময় খরখরে গলায় আকাশ চিরে কে তাড়া দিয়ে উঠল, 'কে রে! কে রে!'

প্রাণ নিয়ে পালাতে যাবে, তাতেও কি রক্ষে আছে? ঝাঁকড়া ভালুকের মতো একটা মাথা, মুখ থেকে থুঃ করে একটা ঢেলা ছুঁড়ে মারলে,—মাসির কপালটাও গেল কেটে, আবার কলসিটাও হল ভেঙে টুকরো টুকরো। আজ পর্যন্ত আমবাগানের কাছ দিয়ে যখনই যায়, কপালের শিরাটা টন্‌টন্ করে ওঠে। ভূতের নজরটা ঠিক ওইখানে লেগে আছে। মাসি তাই ঘোমটাটা লম্বা করে টেনে ওপথে যায়।

আমবাগানের পরে নাপিতপাড়া, তারপর আর সব ভদ্রলোকের বাড়ি। রাত্রে বিশুদের বাড়ি আলো নিবিয়ে দিলে আমবাগানের অন্ধকারে ঘরবাড়ি আর কিছু দেখা যায় না। অতগুলো গাছ মাঝখানে পড়াতে সমস্ত নাপিতপাড়ার প্রদীপের আলো একেবারে আড়াল হয়ে যায়, অন্ধকারে বাইরে বেরোলে অনেক সময় মনে হত, বিশুদের বাড়িটাই বুঝি পৃথিবীর একমাত্র বাড়ি। আকাশের তারা ছাড়া আর পৃথিবীর কোথাও কোনো আলো আছে, কল্পনা করাও শক্ত হত, পায়ের তলার মাটি থেকে চারপাশের শাল ও আমগাছগুলির ডগা পর্যন্ত যেন কে একটা বিরাট তুলিতে কাজল দিয়ে আগাগোড়া লম্বা টান দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। তার ভিতরে কোনো ফাঁক নেই, কোনো আলাদা নকশাও নেই।

সেদিন নাপিতপাড়ার ওপারে গ্রামের ছেলেরা কালীপূজায় একটা ভোজ দিচ্ছিল। যে কজন ছেলে সাইকেল চড়তে জানত, দিন পনেরো ধরে পাড়ায় পাড়ায় সকাল সন্ধ্যা চাঁদা তুলে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ ছিল না। মানুষের ওপর জুলুম করে যে যত বেশি আদায় করতে পেরেছে তার নাম তত বেশি। বিশু বেচাবি স্বভাবত একটু ভিতু, তাই এই গেঁয়ো দেশের পথে সাইকেল চড়তে তার ভরসা হত না। পথগুলো যেন ঠিক জোঁকের পিঠের মতো থেকে থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে, আবার তারপরেই নেমে সমান। কলকাতার পথে হয়তো শেখা যেতে পারে মনে করে বিশু একবার মামাবাড়িতে ছোটোমামার সাইকেল ধার করে কালীতলায় শিক্ষানবিশি করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পথে গাড়ি ঘোড়া, মোটর, ট্রাম, বাস, রিক্‌শা এবং তার উপর গোরুর গাড়ির ভিড় দেখেই তো বেচারার মাথা থেকে পা পর্যন্ত টলতে শুরু করল। এ পথে হেঁটে চলতে মুহূর্তে দশবার যমরাজার মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে, এখানে সাইকেল চড়বে সে কী করে? কাজেই ওটা আর বেচারার শেখা হয়নি। তবে কালীপূজার ভোজে খেটেছে সে যথেষ্ট। সতরঞ্চি, শামিয়ানা, গামলা, আসন, এইসব সে নিজে জোগাড় করে এনে দিয়েছিল। কিন্তু যথাকালে তার আবার হয়ে বসল জ্বর।

কাল তো সবে সে ভাত খেয়েছে। আজ আর কাজকর্ম কিছু করতে পারবে না, শুধু নেমন্তন্নটা খেয়ে আসবে। বন্ধু-বান্ধব দশজনের সঙ্গে একসঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ গল্পগাছা তাও তো এইসব জায়গা ছাড়া কোথাও হয় না। আবার পূজার সময়ে যে নতুন জামা-জুতো করানো হয়েছিল, সেগুলোও বিজয়ার পর মোটে পরা হয়নি। সারাক্ষণই মন পড়ে থাকে সেগুলোর ওপর। কিন্তু মা

খালি বলে, "যখন-তখন ভালো জিনিসগুলো পড়ে ছিঁড়ে আর কালি মাখিয়ে নষ্ট করতে হবে না। নেমন্তন্নে পরে যাস এখন।"

কিন্তু নেমন্তন্ন কি ছাই পাড়াগাঁয়ে চাইলেই পাওয়া যায়? কাপড়-চোপড় কাজেই বাক্সের মধ্যে পচছে। আর ওগুলো না পরে বিশু ছাড়ছে না।

কিন্তু বিপদের ওপর আর এক বিপদ। দুই ভাই মিলে নেমন্তন্নে যাবে কথা ছিল। ইতিমধ্যে ছুটি দেখে ছোটো ভাই নিতুকে মাসিমা ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর বাগানের বেড়াটা বেঁধে দেবার জন্যে। সে বলেছিল, "দাদা, বিকেলবেলায় আমি ফিরে আসব, তারপর দুজনে মিলে যাওয়া যাবে এখন, একলা একলা যেতে আবার বড্ড ভয় করে।"

এদিকে সন্ধে হয় হয় তবু নিতুর দেখা নেই। মাসি ছুটির দিনে পেয়ে ছেলেটাকে প্রাণপণে খাটাচ্ছে আর কী। মা কখন থেকে বকছেন, "ওরে, যা, ছেলেটাকে আগ বাড়িয়ে নিয়ে আয়, দিদির বাড়িতে তো এমন একটা মনিষ্যি নেই যে দু-পা সঙ্গে আসবে। অন্ধকার হয়ে গেলে আজ আর ফেরা হবে না। নেমন্তন্ন খাওয়াও হবে না, তোকে মাঝরাত্তিরে একলা ফিরতে হবে।"

একলা নিমন্ত্রণে যাওয়া আর একলা ফিরে আসার ভয় বিশুর প্রাণে যথেষ্টই ছিল, কারণ মানুষটা সে স্বভাবত ভিতু। কিন্তু কুঁড়েমিটাও তার নিতান্ত কম ছিল না। একসঙ্গে ভাইকে আনতে যাওয়া আবার নিমন্ত্রণের সাজসজ্জা করা, নিতান্ত সহজ কাজ কী? অথচ না আনলেও নয়, নিতু ছেলেটা যে বিশুর চেয়েও ভিতু, তাকে সঙ্গে না আনলে সে মোটে আজ ফিরবেই না। অথচ এত অল্প সময়ে কী করে যে সব কাজ হয় তার ঠিক নেই।

তবু বিকেল থেকেই মুখে সাবান ঘষে আর গিলে দিয়ে কাপড় কুঁচিয়ে বিশু তৈরি হচ্ছিল। মা ক্রমাগতই তাড়া দিচ্ছিলেন, "ওরে, চট করে ও সব সেরে নে। অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে, তার উপর আবার মেঘও করছে। অমাবস্যার রাত্রে অতদূর যে যাবি শেষে পথ খুঁজে পাবি না।" কিন্তু কে বা শোনে কার কথা? বিশুর জুতো পালিশ করা, অবাধ্য চুলকে বশ করা আর এক সপ্তাহের অস্নানের ময়লাকে গা থেকে তোলা তো আর কম পরিশ্রমের কথা নয়। কাজেই দেরি যথেষ্টই হল।

শেষে সাজসজ্জা সেরে একটা লণ্ঠন আর একটা ছাতা নিয়ে বিশু যখন খিড়কির দরজা দিয়ে আমবাগানে বেরোল, তখন সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে। গাছের মাঝে-মাঝে ফাঁকগুলিও এমন অন্ধকারে ভরাট যে, মনে হয় প্রতি পায়ে-পায়ে এই অন্ধকারের গায়েই হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে, বিশু যেন তার লণ্ঠনের আলোর ফলা দিয়ে নিরেট অন্ধকারটা কাটতে কাটতে অগ্রসর হচ্ছিল। বাড়ির ভিতরে থাকতে সে বুঝতে পারেনি যে, বাইরেটা এমন পাতালপুরীর মতো অন্ধকার হবে। কিন্তু এখন আব উপায় নেই, দেরি যা হবার হয়েই গিয়েছে। ভাইটাকে মাসির বাড়ি থেকে আনতে হবে, নেমন্তন্নটাও বাদ দেওয়া চলে না কিছুতেই। 'যা থাকে কপালে', বলে বিশু এগোতে লাগল।

কিন্তু মনটা তার কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। ননীর বাবার আর পাকুর মাসির গল্প ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে যক্ষি বুড়োর চেহারাটা তার মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। ওই রাক্ষুসে চেহারা নিয়ে এই অন্ধকার পথে একবার যদি দাঁত খিঁচিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়, তাহলে বাপ-মায়ের নাম করবার আগেই তো দম আটকে প্রাণটি যাবে বেরিয়ে। ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে বিশু এগোচ্ছিল, যেন তাদের পায়ের শব্দে যক্ষির ঘুম না ভেঙে যায়। গরদের চাদরটাকেও মাঝপথে একবাব ভালো করে পাগড়ির মতো বাঁধলে, কী জানি কখন কোথা থেকে হাত বাড়িয়ে চুলের গোছাসুদ্ধ টান দেবে। ভূতের মরজি তো বোঝা যায় না। যতই ভালোমানুষ হও ভূতের কু-নজরে পড়তে বাধে না। ঘাড় মটকে যখন ধরবে তখন এত বড়ো নির্জন মাঠটায় চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। বাড়ির ভিতর আলোর মধ্যে মায়ের হাসিভরা চোখদুটির সামনে এ সব সাত রাজ্যের ভয়ের ভাবনা তার মোটেই হয়নি, নইলে মায়ের আঁচল ছেড়ে কে আসত মরণের মুখে? ভাবতে ভাবতে বিশুর ভয়টাই ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। এক পা বাড়ায় আর মনে হয়, এইবার পায়ের তলার মাটি থেকে হয়তো ভূত উঠে আসবে। উপরদিকে তাকিয়ে দেখে, তারার আলোটি পর্যন্ত নেই। ভূতরা যেন কালো ডানা আর কালো চুল মেলে আকাশের আলো পর্যন্ত আড়াল করে দিয়েছে। এত অন্ধকারে কোনো দিকে তাকাতে তার সাহস হয় না। পিছনে তাকালে মনে হয়- সারি সারি কালো ভূত যেন গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সব আলো

পাঁচিলের মতো আড়াল করে দিয়েছে। সামনে একটানা চললে মনে হয়, পিছন থেকে এই যেন কারা একশোটা লম্বা হাত বাড়িয়ে মাকড়সার জালের মতো তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরবে।

বেচারি কী করে? মুখটা নিচু করে নিঃশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত আটকে কোনো রকমে এগোতে লাগল।

আমবাগানের শেষ প্রান্তে দপ্ করে একটা আলো জ্বলে উঠল। প্রথমেই বুকটা ধক্ করে উঠল। তবু বিশু ভাবলে : "আঃ, বাঁচা গেল বাবা, কে একটা মানুষ, আলো নিয়ে আসছে। এত অন্ধকারে একলা গা-টা ছমছম করছিল। এইবার একটু সাহসে ভর করে চট্‌পট্ দু-পা এগিয়ে যাওয়া যাবে।" বিশু যথাসাধ্য লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোতে আরম্ভ করল, যেমন করে হোক, পরান নাপিতের বাড়ি পৌঁছোতেই হবে। কিন্তু ও হরি! আলো তো আর ওপারে দেখা যায় না। গেল কোথায় সেটা? বেচারিকে নিতান্ত একলাই প্রাণ হাতে করে যেতে হবে। অন্ধকারে তাড়াতাড়ি এগোনোও যাবে না।

কষ্টিপাথরের গায়ে সোনার আঁচড়ের মতো আলোটা আর এক জায়গায় এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। বিশু তাকিয়ে দেখতে পেলে, থামের মতো মোটা মোটা পা নিয়ে প্রকাণ্ড একটা কুড়ি হাত লম্বা মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তার ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথা আর দাড়ি ভরতি মুখের দিকে ভালো করে তাকাবার আগেই দপ্ করে আলোটা নিবে গেল। মনে হল যেন সেই বিরাট মানুষটার একটা পা একটু নড়ে উঠল। এ কি আলেয়ার আলো, না, যক্ষের বাতি? বিশুর সমস্ত শরীরটা ভয়ে যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু ফিরে বাড়ি পালাবারও উপায় নেই। অনেকখানি সে এগিয়ে এসেছে। এখন বাড়িও হাতের কাছে নেই, নাপিতপাড়াও দূরে, যেদিকেই এগোতে যাবে সমান বিপদ। তার নড়বার ক্ষমতাও যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ভূত যদি হয়, তবে কোন্‌দিক থেকে সে ঘাড়ে এসে পড়বে তার তো কোনোই স্থিরতা নেই। দাঁড়িয়েই বিশু ভাবতে লাগল, এখন কী করা যেতে পারে। নিজের আলোটাও সে চাদর জড়িয়ে লুকিয়ে ফেললে, যাতে ভূতটা তাকে আলোর সাহায্যে অন্তত গ্রেপ্তার না করতে পারে। মার মুখখানা একবার মনে পড়ল। মা এসে কোলে তুলে নিলে আজ সে আবার ছোটো শিশুর মতো সব ভাবনা মার হাতে ছেড়ে দিতে পারে।

ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্,—একজোড়া ভারি পায়ের শব্দ বিশুর সব ভাবনা ঘুলিয়ে দিল। সেই বিরাট মানুষটার নিছক অন্ধকারে গড়া একজোড়া কালো পা বাতির আলোয় একটুখানি নড়তে দেখা গিয়েছিল, নিশ্চয় সেই পায়ের শব্দ। ক্রমেই এগিয়ে এগিয়ে আসছে। বিশু ভয়ে চোখ বুঝল। চোখে অমন মূর্তি সে কিছুতেই দেখতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্য! তার বন্ধ চোখের সামনে দিয়ে একটা নয় সেই সারি সারি কালো ভূত দাড়ি আর চুল নেড়ে হাঁটতে শুরু করল। দুই হাতে নিজের চোখদুটো সে টিপে ধরল। কিন্তু হায়রে কপাল, একজোড়া আগুনের চোখ যেন তার দুই চোখের উপর চেপে এসে বসল। তার থেকে বিন্দু বিন্দু তারার মতো আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিশু দুই চোখ চাপা দিয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু ভূতটা নাছোড়বান্দা। সে বিকট সুরে "আ-ও" বলে চিৎকার করে বোধহয় বিশুকেই ধরতে ছুটে আসতে লাগল। এবার আর বিশুর নিস্তার নেই। নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে শেষে ভূতের হাতে প্রাণটা দিতে হবে। বিশু আকাশ ফাটিয়ে একটা হাঁক দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও ভীষণ জোরে ছুট। তার চিৎকারে সমস্ত বাগানটা যেন কেঁপে উঠল। দৌড়েব চোটে পায়ের তলার মাটিসুদ্ধ কাঁপছিল। কিন্তু ভূতটা এবার নতুন ফন্দি আবিষ্কার করেছে। তার পায়ে হাঁটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিশু বড়ো বড়ো চোখ করে দেখলে, প্রকাণ্ড একটা অন্ধকারের পোঁটলা গড়াতে গড়াতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, এক এক পাক গড়াচ্ছে আর একবার করে "আ-ও" বলে চেঁচিয়ে উঠছে। ভূত যে আবার অমন অদ্ভুত হতে পারে তা বিশু কোনোদিন ভাবেনি।

আমবাগানের সেইখানটা পাহাড়ের মতো গড়িয়ে নেমেছে। কাজেই ভূতটা একবারে চাকার মতো তাড়াতাড়ি নেমে আসতে লাগল। বিশু দেখলে এবার আর ভূতের হাত থেকে নিস্তার নেই। কারণ ভূতের মতো অত জোরে ছুটে সে পালাতে পারবে না। অগত্যা বিশু তার শেষ সম্বল লণ্ঠনটা তুলে ভূতকে লক্ষ করে খুব জোরে ছুঁড়ে মারলে। কিন্তু কী আশ্চর্য, লণ্ঠনের ঘা খেয়ে ভূতটা আর কিছু না বলে, "ও বাবা, ভূতে মেরে ফেললে গো" বলে খুব কেঁদে উঠল। বিশু হতভম্ব হয়ে গেল। এতক্ষণে তার মনের মধ্যে একটু সন্দেহও হল, ভূতের

গলার স্বরটা যেন কেমন নিতুর মতন। "আচ্ছা রামে মারলেও মারবে রাবণে মারলেও মারবে।" যক্ষি পিছনে লাগলে কেউ বাঁচাতে পারবে না। একবার কাছে গিয়ে দেখাই যাক না, সত্যিই নিতু কি না।

বিশু ছুটে ভূতটার কাছে গেল। কিন্তু সে আরও জোরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, "ওগো যক্ষি মশাই, দোহাই তোমার আমায় মেরো না। আমি তোমার কিছু করিনি, শুধু নিজের বাড়ি যাচ্ছি।"

বিশু ভাবল—এ তো ভালো আপদ হল দেখছি। আমি মরছিলাম যক্ষির ভয়ে, আর বাঁদরটা কিনা আমাকেই যক্ষি ঠিক করলে? সে অন্ধকারে হাত্‌ড়ে ভয়ে ভয়েই ভূতের গায়ে হাত দিয়ে বললে "ওরে নিতে, ভূত নয় রে বাঁদর, আমি বিশু, তোর দাদা।"

নিতু বললে, "যক্ষি মশাই তুমি বুঝি জাদুবিদ্যা শিখেছিলে? ইচ্ছে হতেই অমনি আমার দাদা সেজে বসলে। দোহাই, আমায় খেয়ো না।"

বিশু তার মাথায় একটা চাঁটি দিয়ে বললে, "ফের যক্ষি যক্ষি করবি তো চাঁটিতে মাথার তালু উড়িয়ে দেব। তোকে কে বলেছে আমি যক্ষি?"

নিতু এইবার কোনো রকমে উঠে বসে বললে, "বাবা, অত বড়ো মাথা নিয়ে অন্ধকার আমবাগানে ভূত ছাড়া কি মানুষে বেড়ায়? তা ছাড়া আলোটা যে যক্ষির বাতির মতো একবার নিবছিল আর একবার জ্বলছিল?"

বিশু বললে, "ভূত পাছে আমায় দেখে ফেলে, এই ভয়ে আমি আলোটা থেকে থেকে আড়াল করছিলাম। তোর আলোটাও তো থেকে থেকে নিবে যাচ্ছিল।"

নিতু বললে, "আমার মোটে আলোই ছিল না। একটা মোমবাতি পকেটে ছিল, খানিক জ্বলেই নিবে গেল, তা গাছের গোড়ায় বসে বসে বার বার দেশলাই জ্বেলে সেটাকে জ্বালাতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই শেষপর্যন্ত পারলাম না। হাওয়াতে বটগাছের ঝুরিগুলো দুলছিল, পাতা নড়ছিল, সে মহা মুশকিল।"

বিশু বললে, "তাই দেখে আমি ভাবলাম, যক্ষি বুঝি জটা নাড়ছে। ঢের নেমন্তন্ন খাওয়া হয়েছে; বাবা, চল এবার দু-জনে বাড়ি পালাই। মা তাঁর একজোড়া ভূতকে দেখে খুব খুশি হবেন।"

আমার ভাইঝি রাণুর প্রথম ভাগের গণ্ডি পার হওয়া আর হইয়া উঠিল না।

তাহার সহস্রবিধ অন্তরায়ের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—এক তাহার প্রকৃতিগত অকালপক্ক গিন্নিপনা; আর অন্যটি, তাহার আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাহার দৈনিক জীবনপ্রণালী লক্ষ করিলে মনে হয়, বিধাতা যদি তাহাকে একেবারে তাহার ঠাকুরমার মতো প্রবীণা গৃহিণী এবং কাকার মতো এম এ-বি এল করিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহাকে মানাইতও ভালো এবং সেও সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরবর্তী

ভাবী নারীত্ব হঠাৎ কেমন করিয়া যেন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীর-মনটিতে আর আঁটিয়া উঠিতেছে না—রাণুর কার্যকলাপ দেখিলে এইরকমই একটা ধারণা মনে উপস্থিত হয়। প্রথমত, শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপারেই তাহার ক্ষুদ্র নাসিকাটি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—খেলাঘর সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না, ফ্রক জামাও না, এমনকী নোলক পরাও নয়। মুখটা গম্ভীর করিয়া বলে, "আমার কি আর ও সবের বয়েস আছে মেজকা?"

বলিতে হয়, "না মা, আর কী—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকল।"

রাণু চতুর্থকালের কাল্পনিক দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় মুখটা অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে।

আর দ্বিতীয়ত—কতকটা বোধহয় শৈশবের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াই—তাহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কাকার আইন পুস্তক পর্যন্ত আর সবগুলির সহিতই তাহার বেশ সৌহার্দ্য আছে, এবং তাহাদের সহিতই তাহার দৈনিক জীবনের অর্ধেকটা সময় কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রথম ভাগের নামেই সমস্ত উৎসাহ একেবারে শিথিল হইয়া আসে। বেচারির মলিন মুখখানি ভাবিয়া মাঝে-মাঝে আমি এলাকাড়ি দিই—মরে করি, যাক গে বাপু, মেয়ে—নাই বা এখন থেকে বই স্লেট নিয়ে মুখ গুঁজড়ে রইল, ছেলে হওয়ার পাপটা তো করেনি! নেহাতই দরকার বোধ করা যায়, আর একটু বড়ো হোক তখন দেখা যাবে 'খন।

এই রকমে দিনগুলো রাণুর বেশ যায়; তাহার গিন্নিপনা সতেজে চলিতে থাকে, এবং পড়াশুনারও বিষম ধূম পড়িয়া যায়। বাড়ির নানা স্থানের অনেক সব বই হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হয়, তাহার খোঁজ দুরূহ হইয়া উঠে এবং উপরের ঘর নিচের ঘর হইতে সময়ে অসময়ে রাণুর উঁচু গলায় পড়ার আওয়াজ আসিতে থাকে—ঐ ক-য়ে য ফলা ঐক্য, ম-য়ে আকার ণ-য়ে হ্রস্বই ক-য়ে য-ফলা মাণিক্য, বা পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, অথবা তাহার রাঙা কাকার আইন মুখস্থ করার ঢঙে—হোয়ারঅ্যাজ ইট ইজ, ইত্যাদি।

আমার লাগে ভালো, কিন্তু রাণুর স্বাভাবিক স্ফূর্তির এইরকম দিনগুলা বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভালো লাগে বলিয়াই আমার মতির হঠাৎ পরিবর্তন হইয়া যায় এবং কর্তব্যজ্ঞানটা সমস্ত লঘুতাকে ভ্রূভঙ্গি করিয়া প্রবীণ গুরুমহাশয়ের বেশে আমার মধ্যে জাঁকিয়া বসে। সনাতন যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতা নিরাকরণ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক দিই, "রাণু?"

রাণু এ স্বরটি বিলক্ষণ চেনে; উত্তর দেয় না। মুখটি কাঁদো-কাঁদো করিয়া নিতান্ত অসহায় ভালোমানুষের মতো ধীরে-ধীরে আসিয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়ায়, আমার আওয়াজটা তাহার গলায় যেন একটা ফাঁস পরাইয়া টানিয়া আনিয়াছে। আমি কর্তব্যবোধে আরও কড়া হইয়া উঠি; সংক্ষেপে বলি, "প্রথম ভাগ। যাও।"

ইহার পরে প্রতিবারই যদি নির্বিবাদে প্রথম ভাগটি আসিয়া পড়িত এবং যেন-তেন-প্রকারেণ দুইটা শব্দও গিলাইয়া দেওয়া যাইত তো হাতেখড়ি হওয়া ইস্তক এই যে আড়াইটা বৎসব গেল, ইহার মধ্যে মেয়েটাও যে প্রথম ভাগের ও-কয়টা পাতা শেষ করিতে পারিত না, এমন নয়। কিন্তু আমার হুকুমটা ঠিকমতো তামিল না হইয়া কতগুলা জটিল ব্যাপারের সৃষ্টি করে মাত্র—যেমন, এরূপ ক্ষেত্রে কোনো কোনো বার দুই-তিনদিন পর্যন্ত রাণুর টিকিটি আর দেখা যায় না। সে যে কোথায় গেল, কখন আহার করিল, কোথায় শয়ন করিল, তাহার একটা সঠিক খবর পাওয়া যায় না। দু-তিনদিন পরে হঠাৎ যখন নজরে পড়িল, তখন হয়তো সে তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে চায়ের আয়োজনে মাতিয়া গিয়াছে, কিংবা তাঁহার সামনে প্রথম ভাগটাই খুলিয়া রাখিয়া তাহার কাকাদের পড়ার খরচ পাঠানো কিংবা আহার্যদ্রব্যের বর্তমান দুর্মূল্যতা প্রভৃতি সংসারের কোনো একটা দুরূহ বিষয় লইয়া প্রবল বেগে জ্যাঠামি করিয়া যাইতেছে, অথবা তাঁহার বাগানের জোগাড়যন্ত্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া সব বিষয়ে নিজের মন্তব্য দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার দিকে হয়তো একটু আড়চোখে চাহিল; বিশেষ কোনো ভয় বা উদ্‌বেগ নাই—জানে, এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, যেখানে সে কিছুকাল সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন।

আমি হয়তো বলিলাম, "কই রাণু তোমায় না তিনদিন হল বই আনতে বলা হয়েছিল?"

সে আমার দিকে না চাহিয়া বাবার দিকে চায়, এবং তিনিই উত্তর দেন, "ওহে, সে একটা মহা মুশকিল ব্যাপার হয়েছে, ও বইটা যে কোথায় ফেলেছে—"

রাণু চাপা স্বরে শুধরাইয়া দেয়, "ফেলিনি—বল, কে যে চুরি করে নিয়েছে—"

"হ্যাঁ, কে যে চুরি করে নিয়েছে, বেচারি অনেকক্ষণ খুঁজেও—"

রাণু জোগাইয়া দেয়, "তিনদিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও—"

"হ্যাঁ, তোমার গিয়ে, তিনদিন হয়রান হয়েও শেষে না পেয়ে হাল ছেড়ে—"

রাণু ফিসফিস করিয়া বলিয়া দেয়, "হাল ছাড়িনি এখনও!"

"হ্যাঁ, ওর নাম কী, হাল না ছেড়ে ক্রমাগত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা হোক, একখানা বই আজ এনে দিয়ো, কতই বা দাম!"

রাগ ধরে, বলি, "তুই বুঝি এই কাটারি হাতে করে বাগানে বাগানে বই খুঁজে বেড়াচ্ছিস? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!"

কাতরভাবে বাবা বলেন, "আহা, ওকে আর এ সামান্য ব্যাপারের জন্য গালমন্দ করা কেন? এবার থেকে ঠিক করে রাখবে তো গিন্নি?"

রাণু খুব ঝাঁকাইয়া ঘাড় নাড়ে। আমি ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাই, "তোমায় অত করে শেখাই, তবু একটু মনে থাকে না দাদু। কী যেন হচ্ছ দিন দিন!"

কখনও কখনও হুকুম করিবার খানিক পরেই বইটার আধখানা আনিয়া হাজির করিয়া সে খোকার উপর প্রবল তম্বি আরম্ভ করিয়া দেয়। তম্বিটা আসলে আরম্ভ হয় আমাকেই ঠেস দিয়া, "তোমার আদুরে ভাইপোর কাজ দেখ মেজকা। লোকে আর পড়াশুনা করবে কোথা থেকে?"

আমি বুঝি, কাহার কাজ। কটমট করিয়া চাহিয়া থাকি।

দুষ্টু ছুটিয়া বামালসুদ্ধ খোকাকে হাজির করে—সে বোধহয় তখন একখানা পাতা মুখে পুরিয়াছে এবং বাকিগুলার কী করিলে সবচেয়ে সদ্‌গতি হয়, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে। তাহাকে আমার সামনে ধপ করিয়া বসাইয়া রাণু রাগ দেখাইয়া বলে, "পেত্যয় না যাও, দেখ। আচ্ছা এ ছেলের কখনও বিদ্যে হবে মেজকা?"

আমি তখন হয়তো বলি, "ওর কাজ, না তুমি নিজে ছিঁড়েছ রাণু? ঠিক আগেকার পাঁচখানা পাতা ছেঁড়া। যত বলি, তোমায় কিছু বলব না— খান তিরিশেক বই তো শেষ হল!"

ধরা পড়িয়া লজ্জা-ভয়-অপমানে নিশ্চল নির্বাক হইয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, নেহাত নৃশংস না হইলে উহার উপর আর কিছু তাহাকে বলা যায় না, তখনকার মতো শাস্তির কথা ভুলিয়া তাহার মনের গ্লানিটুকু মুছাইয়া দিবার জন্য আমায় বলিতেই হয়, "হ্যাঁরে দুষ্টু, দিদির বই ছিঁড়ে দিয়েছিস? আর তুমিও তো ওকে একটু-আধটু শাসন করবে রাণু? ওর আর কতটুকু বুদ্ধি, বল?"

চাঁদমুখখানি হইতে মেঘটা সরিয়া গিয়া হাসি ফোটে। তখন আমাদের দুইজনের মধ্য হইতে প্রথম ভাগের ব্যবধানটা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং রাণু দিব্য সহজভাবে তাহার গিন্নিপনার ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময়টা সে হঠাৎ এত বড়ো হইয়া যায় যে, ছোটো ভাইটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাপ, খুড়া, ঠাকুরমা, এমনকী ঠাকুরদাদা পর্যন্ত সবাই তাহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং স্নেহ ও করুণার পাত্র হইয়া পড়ে। এইরকম একটি প্রথম ভাগ ছেঁড়ার দিনে কথাটা এইভাবে আরম্ভ হইল—"কী করে শাসন করব বল মেজকা? আমার কি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় আছে, খালি কাজ কাজ আর কাজ।"

হাসি পাইলেও গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "তা বটে, কতদিকে আর দেখবে?"

"যে দিকটা না দেখেছি সেই দিকেই গোল—এই তো খোকার কাণ্ড চোখেই দেখলে! কেন রে বাপু, রাণু ছাড়া আর বাড়িতে কেউ নেই? খাবার বেলা তো অনেকগুলি মুখ; বল মেজকা! আচ্ছা, কাল তোমার ঝাল-তরকারিতে নুন ছিল?"

বলিলাম, "না, একেবারে মুখে দিতে পারিনি!"

"তার হেতু হচ্ছে, রাণু কাল রান্নাঘরে যেতে পারেনি—ফুরসত ছিল না। এই তো সবার রান্নার ছিরি? আজ আর সে রকম কম হবে না, আমি নিজের হাতে দিয়ে এসেছি নুন।"

আমার শখের ঝাল-তরকারি খাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলাম, "তুমি যদি রোজ একবার করে দেখ মা—"

গাল দুইটি অভিমানে ভারি হইয়া উঠিল।

—"হবার জো নেই মেজকা, রাণু হয়েছে বাড়ির আতঙ্ক। 'ওরে, ওই বুঝি রাণু ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে—রাণু বুঝি মেয়েটাকে টেনে দুধ খাওয়াতে বসেছে, দেখ্, দেখ্—তোকে কে এত গিন্নিত্ব করতে বললে বাপু?' হ্যাঁ মেজকা,

এত বড়োটা হলুম, দেখেছ কখনও আমায় গিন্নিত্ব করতে—কখনও—একরত্তিও?''

বলিলাম, ''বলে দিলেই হল একটা কথা, ওদের আর কী।''

''মুখটি বুজে শুনে যাই। একজন হয়তো বললেন, ওই বুঝি রাণু রান্নাঘরে সেঁধোল! রাঙি বেড়ালটা বলে, আমি পদে আছি। কেউ চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে রাণু বুঝি ওর বাপের-—আচ্ছা মেজকা, বাবার ফুলদানিটা আমি ভেঙেছি বলে তোমার একটুও বিশ্বাস হয়?''

এ ঘটনাটা সবচেয়ে নূতন, গিন্নিপনা করিয়া জল বদলাইতে গিয়া রাণুই ফুলদানিটা চুরমার করিয়া দিয়াছে, ঘরে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমি বলিলাম, ''কই, আমি তো মরে গেলেও এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না।''

ঠোঁট ফুলাইয়া রাণু বলিল, ''যার ঘটে একটুও বুদ্ধি আছে, সে করবে না। আমার কী দরকার মেজকা, ফুলদানিতে হাত দেবার? কেন, আমার নিজের পের্‌থোম ভাগ কি ছিল না যে, বাবার ফুলদানি ঘাঁটতে যাব?''

প্রথম ভাগের উপর দরদ দেখিয়া ভয়ানক হাসি পাইল, চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, ''মিছিমিছি দোষ দেওয়া ওদেব কেমন একটা রোগ হয়ে পড়েছে।''

দুষ্টু একটু মুখ নিচু করিয়া রহিল, তাহার পর সুবিধা পাইয়া তাহার সদ্য দোষটুকু সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া লইবার জন্য আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া আরও অভিমানের সুরে আস্তে-আস্তে বলিল, ''তোমারও এ রোগটা একটু একটু আছে মেজকা,—এক্ষুনি বলছিলে, আমি পের্‌থোম ভাগটা ছিঁড়ে এনেছি।''

মেয়ের কাছে হারিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

বই হারানো কি ছেঁড়া, পেট-কামড়ানো, মাথাব্যথা, খোকাকে ধরা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো যখন অনেকদিন তাহাকে বাঁচাইবার পর নিতান্ত একঘেয়ে এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তখন দুই-এক দিনের জন্য নেহাত বাধ্য হইয়াই রাণু বই স্লেট লইয়া হাজির হয়। অবশ্য পড়াশুনা কিছুই হয় না। প্রথমে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে। সংসারের উপর কোনো কিছুর জন্য মনটা খিঁচড়াইয়া থাকায় কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি সকলের নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মনটা বেশি সজাগ থাকে তো ধমক খাইয়া বই খোলে; তাহার পর পড়া আরম্ভ হয়। সেটা রাণুর পাঠাভ্যাস, কি আমার ধৈর্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরীক্ষা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ-আম'-র পাতা শেষ করিয়া 'অচল-অধম'-র পাতায় আসিয়া অচলা হইয়া আছে। বই খুলিয়া আমার দিকে চায়—অর্থাৎ বলিয়া দিতে হইবে। আমি প্রায়ই পড়াশুনার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র উপদেশ দিয়া আরম্ভ করি, ''আচ্ছা রাণু, যদি পড়াশুনা না কর তো বিয়ে হলেই যখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে—মেজকাকা কী রকম আছে, তাকে কেউ সকালবেলা চা দিয়ে যায় কিনা, নাইবার সময় তেল কাপড় গামছা দিয়ে যায় কিনা, অসুখ হলে কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কিনা—এ সব কী করে খোঁজ নেবে?''

রাণু তাহার মেজকাকার ভাবি দুর্দশার কথা কল্পনা করিয়া মৌন থাকে, কিন্তু বোধহয় প্রথম ভাগ-পারাবার পার হইবার কোনো সম্ভাবনাই না দেখিয়া বলে, ''আচ্ছা মেজকা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না? আমায় একটুও বলে দিতে হবে না। এই শোনো না—ওই ক-য়ে-য-ফলা—''

রাগিয়া বলি, ''ওই ডেঁপোমি ছাড়ো দিকিন, ওই জন্যেই তোমার কিছু হয় না। নাও, পড়ো। সেদিন কত দূর হয়েছিল? 'অচল' 'অধম' শেষ করেছিলে?''

রাণু নিষ্প্রভভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানায়, ''হ্যাঁ''।

বলি, ''পড়ো তা হলে একবার।''

'অচল' কথাটির উপর কচি আঙুলটি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আমার মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিতে থাকে এবং স্নেহ করুণা প্রভৃতি স্নিগ্ধ চিত্তপ্রবৃত্তিগুলি বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। মেজাজেরই বা আর দোষ দিই কী করিয়া! আজ এক বৎসর ধরিয়া এই 'অচল' 'অধম' লইয়া কসরত চলিতেছে; এখনও রোজই এই অবস্থা।

তবুও ক্রোধ দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলি, ''ছাই হয়েছে। আচ্ছা, বলো—অ—চ—আর ল—অচল।''

রাণু অ-র উপর হইতে আঙুলটা না সরাইয়াই তিনটি অক্ষর পড়িয়া যায়। 'অধম'ও ওইভাবেই শেষ হয় অথচ ঝাড়া দেড়টি বৎসর শুধু অক্ষর চেনায় গিয়াছিল।

তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ''কোনটা অ?''

রাণু ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া আঙুলটি সরাইয়া ল-এর উপর রাখে।

ধৈর্যের সূত্রটা তখনও ধরিয়া থাকি, বলি, "হুঁ, কোন্‌টা ল হল তাহলে?"

আঙুলটা সট করিয়া চ-এর উপর সরিয়া যায়। ধৈর্য-সাধনা তখনও চলিতে থাকে, শান্তকণ্ঠে বলি, "চমৎকার! আর চ?"

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে বইয়ের দিকে চাহিয়া থাকে, তারপর বলে, "চ? চ নেই মেজকা?"

সংযত রাগটা অত্যন্ত উগ্রভাবেই বাহির হইয়া পড়ে, পিঠে একটা চাপড় কষাইয়া বলি, "তা থাকবে কেন? তোমার ডেঁপোমি দেখে চম্পট দিয়েছে। হতভাগা মেয়ে—রাজ্যের কথার জাহাজ হয়েছেন, আর এদিকে আড়াই বৎসর প্রথম ভাগের আড়াইটে কথা শেষ করতে পারলে না! কত বুড়ো বুড়ো গাধা ঠেঙিয়ে পাস করিয়ে দিলাম, আর এই একরত্তি মেয়ের কাছে আমায় হার মানতে হল' কাজ নেই আর তোর অক্ষর চিনে। সন্ধে পর্যন্ত বসে বসে খালি অ-চ আর ল—অচল; অ-ধ আর ম—অধম এই আওড়াবি। তোর সমস্ত দিন আজ খাওয়া বন্ধ।"

বিরক্তভাবে একটা খবরের কাগজ কিংবা বই লইয়া বসিয়া যাই; রাণু ক্রন্দনের সহিত সুর মিশাইয়া পড়া বলিয়া যায়।

বলি বটে, সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়িতে হইবে; কিন্তু চড়টা বসাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া যাই যে, সেদিনকার পড়া ওই পর্যন্ত। রাণু এতক্ষণ চক্ষের জলের ভরসাতেই থাকে এবং অশ্রু নামিলেই সেটাকে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগায়। কিছুক্ষণ পরে আর পড়ার আওয়াজ পাই না, বলি, "কী হল"।

রাণু ক্রন্দনের স্বরে উত্তর করে, "নেই"।

"কী নেই?"—বলিয়া ফিরিয়া দেখি, চক্ষের জল 'অচল-অধম'-এর উপর ফেলিয়া আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কথা দুইটা বিলকুল উড়াইয়া দিয়াছে—একেবারে নিচের দুই তিনখানা পাতার খানিকটা পর্যন্ত।

কিংবা আঙুলের ডগায় চোখের ভিজা কাজল লইয়া কথা দুইটিকে চিরান্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে; এইরূপ অবস্থাতে বলে, "আর দেখতে পাচ্ছি না, মেজকা।"—এইরকম আরও সব কাণ্ড।

চড়টা মারা পর্যন্ত মনটা খারাপ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ওর ধূর্তামি দেখিয়া হাসিও পায়। মেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার থিয়োরিটা ফিরিয়া আসে; বলি, "না তোর আর পড়াশুনো হল না রাণু; স্লেটটা নিয়ে আয় দিকিন—দেগে দিই, বুলো। পিঠটায় লেগেছে বেশি? দেখি?"

রাণু বুঝিতে পারে, তাহার জয় আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহার সব কথাই চলিবে। আমার কাঁধটা জড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকে, "মেজকা!"

উত্তর দিই, "কী?"

"আমি মেজকা, বড়ো হইনি?"

"তা তো খুব হয়েছ। কিন্তু কই, বড়োর মতন—"

বাধা দিয়া বলে, "তা হলে স্লেট ছেড়ে ছোটো কাকার মতো কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসব? চারটে উট পেন্সিল আছে আমার। স্লেটে খোকা বড়ো হয়ে লিখবে'খন।"

হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলে, "ও মেজকা, তোমার দুটো পাকা চুল গো! সর্বনাশ! বেছে দিই?"

বলি, "দাও। আচ্ছা রাণু, এই তো বুড়ো হতে চললাম, তুইও দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ি চলবি। লেখাপড়া শিখলিনি, মরলাম কি বাঁচলাম, কী করে খোঁজ নিবি? আমায় কেউ দেখে-শোনে কি না, রেঁধে-টেঁধে দেয় কি না—"

রাণু বলে, "পড়তে তো জানি মেজকা, খালি পের্‌থোম ভাগটাই জানি না, বড়ো হয়েছি কিনা। বাড়ির আর কোন্ লোকটা পের্‌থোম ভাগ পড়ে মেজকা, দেখাও তো!"

দাদা ওদিকে ধর্ম সম্বন্ধে খুব লিবারেল মতের লোক ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাটা যেমন গভীর করিয়া রাখিয়াছিলেন, খ্রিষ্ট এবং কবেকার জরাজীর্ণ জুরুয়াস্ত্রিয়ানবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানটা সেইরূপ উচ্চ ছিল। দরকার হইলে বাইবেল হইতে সুদীর্ঘ কোটেশন তুলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেন এবং দরকার না হইলেও যখন একধার হইতে সমস্ত ধর্মমত সম্বন্ধে সুতীব্র সমালোচনা করিয়া ধর্মমত মাত্রেরই অসারতা সম্বন্ধে অধার্মিক ভাষায় ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া যাইতেন, তখন ভক্তদের বলিতে হইত, "হ্যাঁ, এখানে খাতির চলবে না বাবা, এ যার নাম শশাঙ্ক মুখুজ্জে!"

দাদা বলিতেন, "না, গোঁড়ামিকে আমি প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজি নই।"

প্রায় সব ধর্মবাদকেই তিনি 'গোঁড়ামি' নামে অভিহিত করিতেন এবং গালাগাল না দেওয়াকে কহিতেন 'প্রশ্রয় দেওয়া'।

সেই দাদা এখন একেবারে অন্য মানুষ। ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল খান না এবং জলের অতিরিক্ত যে বেশি কিছু খান বলিয়াই বোধ হয় না। পূজা পাঠ হোম

লইয়াই আছেন এবং বাক্ ও কর্মে শুচিতা সম্বন্ধে এমন একটা 'গেল গেল' ভাব যে, আমাদের তো প্রাণ 'যায় যায়' হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তেরা বলে, "ওরকম হবে এ তো জানা কথাই, এই হচ্ছে স্বাভাবিক বিবর্তন; এ একেবারে খাঁটি জিনিস দাঁড়িয়েছে।"

সকলের চেয়ে চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে, এই অসহায় লাঞ্ছিত হিন্দুধর্মের জন্য একটা বড়ো রকম ত্যাগ স্বীকার করিবার নিমিত্ত দাদা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং হাতের কাছে আর তেমন কিছু আপাততঃ না পাওয়ায় ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে ছোটো কন্যাটির উপর।

একদিন বলিলেন, "ওহে শৈলেন, একটা কথা ভাবছি, ভাবছি বলি কেন, একরকম স্থিরই করে ফেলেছি।"

মুখে গম্ভীর তেজস্বিতার ভাব দেখিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, "কী দাদা?"

"গৌরীদান করব স্থির করেছি, তোমার রাণুর কত বয়স হল?"

বয়স না বলিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম, "সে কী দাদা! এ যুগে—"

দাদা সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "যুগের এ আর সে নেই শৈলেন, ওইখানেই তোমরা ভুল কর। কাল এক অনন্তব্যাপী অখণ্ড সত্তা, এবং যে শুদ্ধ সনাতন ধর্ম সেই কালকে—"

একটু অস্থির হইয়া বলিলাম, "কিন্তু দাদা, ও যে এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু।"

দাদা বলিলেন, "এবং শিশুই থাকবে ও, যতদিন তোমরা বিবাহবন্ধনের দ্বারা ওর আত্মার সংস্কার ও পূর্ণ বিকাশের অবসর করে না দিচ্ছ! এটা তোমায় বোঝাতে হলে আগে আমাদের শাস্ত্রকাররা—"

অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, "সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওর তো এই সবে আট বছর পেরুল দাদা, ওর শরীরই বা কতটুকু আর তার মধ্যে ওর আত্মাই বা কোথায়, তা তো বুঝতে পারি না! আমার কথা হচ্ছে—।"

দাদা সেদিকে মন না দিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, "আট বৎসর পেরিয়ে গেছে! তা হলে আর কই হল শৈলেন? মনু বলেছেন, 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষে তু রোহিণী'—জানি অত বড়ো পুণ্যকর্ম কি আমার হাত দিয়ে সমাধান হবে!—ছোটোটার বয়স কত হল?"

রাণুর ছোটো রেখা পাঁচ বৎসরের। দাদা বয়স শুনিয়া মুখটা কুঞ্চিত করিয়া একটু মৌন রহিলেন। পাঁচ বৎসরের কন্যাদানের জন্য কোনো একটা পুণ্যফলের ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়ার জন্য মনুর উপরই চটিলেন, কিংবা অত পিছাইয়া জন্ম লওয়ার জন্য রেখার উপরই বিরক্ত হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আমিও আমার রুদ্ধশ্বাসটা মোচন করিলাম। মনে মনে কহিলাম, "যাক্, মেয়েটার একটা ফাঁড়া গেল।"

দুইদিন পরে দাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপস্থিত হইলে বলিলেন, "আমি ও-সমস্যাটুকুর একরকম সমাধান করে ফেলেছি শৈলেন। অর্থাৎ তোমার রাণুর বিবাহের কথাটা আর কী। ভেবে দেখলাম, যুগধর্মটা একটু বজায় রেখে চলাই ভালো বই কী—"।

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, হর্ষের সহিত বলিলাম "নিশ্চয়, শিক্ষিত সমাজে কোথায় ষোলো-সতেরো বছরে বিবাহ চলছে দাদা। এ সময় একটা কচি মেয়েকে—যার ন' বছরও পুরো হয়নি—তা ভিন্ন খাটো গড়ন বলে—"

"ঝাঁটা মারো তোমার শিক্ষিত সমাজকে। আমি সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে, যদি এই সময়েই রাণুর বিয়ে দিই, তা মন্দ কী? বেশ তো যুগধর্মটাও বজায় রইল, অথচ ওদিকে গৌরীদানেরও খুব কাছাকাছি রইল। ক্ষতি কী? এটা হবে যাকে বলতে পারা যায়, মডিফায়েড গৌরীদান আর কী।"

আমি একেবারে থ হইয়া গেলাম। কী করিয়া যে দাদাকে বুঝাইব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দাদা বলিলেন, "পণ্ডিত মশায়েরও মত আছে। তিনি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখে বললেন, কলিতে এইটিই গৌরীদানের সমফলপ্রসূ হবে।"

আমি দুঃখ ও রাগ মিটাইবার একটা আধার পাইয়া একটু উষ্মার সহিত বলিলাম, "পণ্ডিতমশায় তাহলে একটা নীচ মিথ্যা কথা আপনাকে বলেছেন দাদা, আপনি সন্তুষ্ট হলে উনি এ কথাও বোধহয় শাস্ত্র ঘেঁটেই বলে দেবেন যে, মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেও আজকাল গৌরীদানের ফল হবার কথা। কলিযুগটা তো ওঁদের কল্পবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন যে বিধানটি চাইবেন, পাকা ফলের মতো টুপ করে হাতে এসে পড়বে।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আমিই কথা কহিলাম, "যাক, ওঁরা বিধান দেন, দিন বিয়ে। আমি এখন আসি, একটু কাজ আছে।"

আসিবার সময় ঘুরিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ বলে ভাবছি, মাস চারেক একটু পশ্চিমে গিয়ে কাটাব; হপ্তাখানেকের মধ্যে বোধহয় বেরিয়ে পড়তে পারব।"

বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

অভিমানের সাহায্যে ব্যাপারটা মাস তিন-চার কোনো রকমে ঠেকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু তাহার পর দাদা নিজেই এমন অভিমান শুরু করিয়া দিলেন যে, আমারই হার মানিতে হইল। ধর্মের পথে অন্তরায় হইবার বয়স এবং শক্তি বাবার তো ছিলই না, তবুও নাতনির মায়ায় তিনি দোমনা হইয়া কিছুদিন আমারই পক্ষে রহিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে ওইদিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। আমি বেখাপ্পা রকম একলা পড়িয়া গিয়া একটা মস্তবড়ো ধর্মদ্রোহীর মতো বিরাজ করিতে লাগিলাম।

রাণুকে ঢালোয়া ছুটি দিয়া দিয়াছি। মায়াবিনী অচিরেই আমাদের পর হইবে বলিয়া যেন ক্ষুদ্র বুকখানির সমস্তটুকু দিয়া আমাদের সংসারটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। পারুক, না পারুক—সে সমস্ত কাজেই আছে এবং যেটা ঠিকমতো পারে না, সেটার জন্য এমন একটা সংকোচ এবং বেদনা আজকাল তাহার দেখিতে পাই, যাহাতে সত্যই মনে হয়, নকলের মধ্য দিয়া মেয়েটার এবার আসল গৃহিণীপনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। অসহায় মেজকাকাটি তো চিরদিনই তাহার একটা বিশেষ পোষ্য ছিলই; আজকাল আবার প্রথম ভাগ বিবর্জিত সুপ্রচুর অবসরের দরুন একেবারে তাহার কোলের শিশুটিই হইয়া পড়িয়াছে বলিলে চলে।

সময় সময় গল্প হয়; আজকাল বিয়ের গল্পটা হয় বেশি। অন্যের সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে রাণু ইদানীং লজ্জা পায় বটে, কিন্তু আমার কাছে কোনো দ্বিধা-কুণ্ঠাই আসিবার অবসর পায় না; তাহার কারণ আমাদের দুইজনের মধ্যে সমস্ত লঘুত্ব বাদ দিয়া গুরুগম্ভীর সমস্যাবলির আলোচনা চলিতে থাকে। বলি, "তা নয় হল রাণু, তুমি মাসে দুবার করে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে আমাদের সংসারটি গুছিয়ে দিয়ে গেলে। আর সবই করলে, কিন্তু তোমার মেজকাকাটির কী বন্দোবস্ত করছ?"

রাণু বিমর্ষ হইয়া ভাবে; বলে, "আমরা সব বলে বলে তো হয়রান হয়ে গেলাম মেজকা যে, বিয়ে কর, বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা? রাণু কি তোমায় চিরদিনটা দেখতে শুনতে পারবে মেজকা? এরপর তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো? মেয়ে আর কতদিন নিজের বল?"

তোতাপাখির মতো, কচি মুখে বুড়োদের কাছে শেখা বুলি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব, ঠিক করিতে পারি না; বলি, "আচ্ছা, একটা গিন্নিবান্নি কনে দেখে এখনও বিয়ে করলে চলে না? কী বল তুমি?"

এই বাঁধা কথাটি তার ভাবি শ্বশুরবাড়ি লইয়া একটি ঠাট্টার উপক্রমণিকা। রাণু কৃত্রিম অভিমানের সহিত হাসি মিশাইয়া বলে, "যাও মেজকা, আর গল্প করব না; তুমি ঠাট্টা করছ।"

আমি চোখ পাকাইয়া বিপুল গাম্ভীর্যের সহিত বলি, "মোটেই ঠাট্টা নয় রাণু; তোমার শাশুড়িটি বড়ো গিন্নি শুনেছি, তাই বলছিলাম, যদি বিয়েই করতে হয়—"

রাণু আমার মুখের দিকে রাগ করিয়া চায় এবং শেষে হাসিয়া চায়। কিছুতেই যখন আমার মুখের অটল গাম্ভীর্য বদলায় না, তখন প্রতারিত হইয়া, গুরুত্বের সহিত বলে, "আচ্ছা, আমি তাহলে—না মেজকা, নিশ্চয় ঠাট্টা করছ, যাও—"

আমি চোখ আরও বিস্ফারিত করিয়া বলি, "একটুও ঠাট্টা নেই এর মধ্যে রাণু; সব কথা নিয়ে কি আর ঠাট্টা চলে মা?"

রাণু তখন ভারিক্কি হইয়া বলে, "আচ্ছা তাহলে আমার শাশুড়িকে একবার বলে দেখব'খন, আগে যাই সেখানে। তিনি যদি তোমায় বিয়ে করতে রাজি হন তো তোমায় জানাব'খন; তার জন্যে ভাবতে হবে না।"

তাহার পর কৌতুকদীপ্ত চোখে চাহিয়া বলে, "আচ্ছা, মেজকা, পের্‌থোম ভাগ তো শিখিনি এখনও—কী করে তোমায় জানাব বল দিকিন, তবে বুঝব হ্যাঁ—"

আমি নানা রকম আন্দাজ করি; বিজয়িনী ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া বলে, "না হল না—কক্ষনো বলতে পারবে না, সে বড্ড শক্ত কথা।"

এইসব হাসি তামাসা গল্পগুজব হঠাৎ মাঝখানেই শেষ হইয়া যায়; রাণু চঞ্চলতার মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে, "যাক, সে পরের কথা পরে হবে; যাই, তোমার চা হল কিনা দেখি গে।"

কিংবা—"যাই, গল্প করলেই চলবে না, তোমার লেখার টেবিলটা আজ গুছোতে হবে, এক ডাঁই হয়ে রয়েছে—" ইত্যাদি।

এইরকমভাবে রাণুকে নিবিড় হইতে নিবিড়তরভাবে আমার বুকের মধ্যে আনিয়া দিতে দিতে বিচ্ছেদের দিনটা আগাইয়া আসিতেছে।

বুঝি-বা রাণুর বুকটিতেও এই আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা তাহার অগোচরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। কচি সে, বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখনই আজকাল ছুটি পাইলে নিজের মনে স্লেট ও প্রথম ভাগটা লইয়া হাজির হয়, তখনই বুঝিতে পারি, এ আগ্রহটা তাহার কাকাকে সান্ত্বনা দেওয়ারই একটা নূতন রূপ; কেননা, প্রথম ভাগ শেখার আর কোনো উদ্দেশ্য থাক, আর না থাক, ইহার উপরই ভবিষ্যতে তাহার কাকার সমস্ত সুখ-সুবিধা নির্ভর করিতেছে— রাণুর মনে এ ধারণাটুকু বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখন আর একেবারেই উপায় নাই বলিয়া তাহার শিশুমনটি ব্যথায় ভরিয়া উঠে; প্রবীণার মতো আমায় তবুও আশ্বাস দেয়, "তুমি ভেবো না মেজকা, তোমার পের্‌থোম ভাগ না শেষ করে আমি কখনও শ্বশুরবাড়ি যাব না। নাও, বলে বলে দাও।"

পড়া অবশ্য এগোয় না। বলিয়া দিব কী, প্রথম ভাগটা দেখিলেই বুকে যেন কান্না ঠেলিয়া উঠে। আবার প্রতিদিনই গৌরীদানের বর্ধমান আয়োজন। বাড়ির বাতাসে আমার হাঁফ ধরিয়া উঠে। এক-একদিন মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরি, বলি, "আমাদের কোন্ দোষে তুই শিগ্‌গির পর হতে চললি রাণু?"

বোঝে না, শুধু আমার ব্যথিত মুখের দিকে চায়। এক-একদিন অবুঝভাবেই কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠে; এক-একদিন জোরগলায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, "তোমার কষ্ট হয় তো বিয়ে এখন করবই না মেজকা, বাবাকে বুঝিয়ে বলব'খন।"

একদিন এইরকম প্রতিজ্ঞার মাঝখানেই সানাইয়ের করুণ সুর বাতাসে ক্রন্দনের লহর তুলিয়া বাজিয়া উঠিল। রাণু, কুণ্ঠিত আনন্দে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ একরকম হইয়া গিয়া মুখটা নিচু করিল। বোধ করি তাহার মেজকাকার মুখে বিষাদের ছায়াটা নিতান্তই নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

গৌরীদান শেষ হইয়া গিয়াছে; আমাদের গৌরীর আজ বিদায়ের দিন। আমি শুভকর্মে যোগদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি নাই, এ-বাড়ি সে-বাড়ি করিয়া বেড়াইয়াছি। বিদায়ের সময়ে বর-বধূকে আশীর্বাদ করিতে আসিলাম।

দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে পাট-বস্ত্র ও অলংকার পরা মালা-চন্দনে চর্চিত রাণুকে দেখিয়া আমার তপ্ত চক্ষু দুইটা জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ও যে বড্ড কচি, এত সকালে কী করিয়া বিদায়ের কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায়? ও কি জানে, আজ কতই পর করিয়া ওকে বিদায় দিতেছি আমরা?

চক্ষে কোঁচার খুঁট দিয়া এই পুণ্যদর্শন শিশুদম্পতিকে আশীর্বাদ করিলাম। রাণুর চিবুকটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, "রাণু, তোর এই কোলের ছেলেটাকে কার কাছে—?" আর বলিতে পারিলাম না।

রাণু শুনিয়াছি এতক্ষণ কাঁদে নাই। তাহার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, সংসারের প্রবেশ-পথে দাঁড়াইতেই ওর অসময়ের গৃহিণীপনাটা সরিয়া গিয়া ওর মধ্যকার শিশুটি বিস্ময়ে কৌতূহলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার কথার আভাসে সেই শিশুটিই নিজের অসহায়তায় আকুল হইয়া পড়িল। আমার বাহুতে মুখ লুকাইয়া রাণু উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কখনও কচি মেয়ের মতো ওকে ভুলাইতে হয় নাই। আমার খেলাঘরের মা হইয়া ওই এতদিন আমায় আদর করিয়াছে; আশ্বাস দিয়াছে। সেইটাই আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল; ভালো মানাইত। আজ প্রথম ওকে বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা দিলাম— যেমন দুধের ছেলেমেয়েকে শান্ত করে বুঝাইয়া, মিথ্যা কহিয়া কত প্রলোভন দিয়া।

তবুও কি থামিতে চায়? ওর সব হাসির অন্তরালে এতদিন যে গোপনে শুধু অশ্রুই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে থামিল। অভ্যাসমতো আমার করতল দিয়াই নিজের মুখটা মুছিয়া লইল। তাহার পর হাতটাকে একটু টান দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "এদিকে এসো, শোনো মেজকা।"

দুইজনে একটু সরিয়া গেলাম। সকলে এই সময় মাতা-পুত্রের অভিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণু বুকের কাছ হইতে তাহার সুপ্রচুর বস্ত্রের মধ্য হইতে লাল ফিতায় যত্ন করিয়া বাঁধা দশ-বারোখানি প্রথম ভাগের একটা বান্ডিল বাহির করিল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, "পের্‌থোম ভাগগুলো হারাইনি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।"

গলা ভাঙিয়া পড়ায় একটু থামিল, আবার বলিল, "সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি, মেজকা, খু-ব লক্ষ্মী হয়ে পড়ে পড়ে এবার শিখে ফেলব। তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেবো না মেজকা।"

ডাকাতের ডুলি

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

চালদাপুরের জঙ্গলের কাছে যখন পালকি এসে পৌঁছোল, তখন ভর-সন্ধ্যা।

বেহারারা পথের ধারে পালকি নামিয়ে বললে—"হুজুর, আর এগোতে সাহস হয় না, সামনে তিন ক্রোশের মধ্যে গাঁ নেই—"

হরি ডাক্তার এতক্ষণ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। বেহারাদের একটানা "হুঁ হুঁ হো হো-ও-ও" সুরে বর্ষার মেঠো বাতাসে তাঁর চোখদুটো একটু বুজে এসেছিল। অবস্থাটা হঠাৎ বদলে যাওয়ায় তন্দ্রাটুকু ছুটে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন—"কী বললি?"

"হুজুর, সামনে চালদাপুরের জঙ্গল। সাঁজও লাগল। জল-কাদায় পা বসে যায়। বৃষ্টিও বুঝি এল—"

—"তাই বলে একটা লোক মারা যাবে?"

—"কী করব হুজুর? আমাদেরও তো প্রাণ—"

"হুঁ!" বলেই ডাক্তারবাবু উঠে বসলেন, তারপর পালকির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে বললেন—"ওই চাঁদখালির আলো দেখা যায় না?"

—"হ্যাঁ"।

এমন সময় দূরে একপাল শিয়াল তারস্বরে ডেকে উঠল। ডাক্তারবাবু বললেন—"ওখানে যেতে পারবি?"

—"না হুজুর। ওদিকে যেতে হলে ও জঙ্গলটার পুর্বদিক ভাঙতে হবে—"

—"বটে! জঙ্গলে আছে কী?"

—"হুজুর, রাতের বেলা যেনাদের নাম করতে নেই, ওদিকে আছেন তেনারা, আর মাঝ বরাবর হল টিয়ার আড্ডা। আমরা যাব না"—

—"তাই বলে একটা লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে?"

গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে একজন বেহারা বললে—"কী করব হুজুর? ঘরে ছেলে-পুলে ছেড়ে এসেছি—'.

হরি ডাক্তার ধমক দিয়ে উঠলেন—"মিছে কথা! কোনো বেটার ছেলে নেই। ওই যে, কে যায় না? এই—কে যায়?"

অন্ধকার ততক্ষণে আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। যা স্পষ্ট ছিল, তা হয়ে গেছে ছায়া, যা ছায়া ছিল তা গলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে! যে যাচ্ছিল, সে ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়াল। তার হাতে একখানা লাঠি।

ডাক্তারবাবু বললেন—"হারিকেন জ্বাল্। ওই লোকটাকে এদিকে ডাক্—"

বাইরে পালকির লোহার টানার সঙ্গে একটা হারিকেন বাঁধা ছিল। একজন সেটা খুলে নিয়ে জ্বালতে লাগল। এদিকে ডাক্তারবাবুর আর ডাকের দেরি সইছিল না; নিজেই হাঁকলেন—"এই কে তুমি? এদিকে এসো—"

লোকটা কাছে আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি যাচ্ছ কোন্ দিকে? বাড়ি কোথায়?

সে লাঠি দিয়ে দেখিয়ে বললে—"জঙ্গলের ওপারে—"

—"তা তো বুঝলাম। জঙ্গলের ওপারে কোথায়?"

—"আজ্ঞে কর্তা, তুলসীপুরেই বটে, তবে—"

ভালো ডাক্তার পুরোনো হলে একটুতেই চটেন। হরি রায় তার উপর খুব ভালো ডাক্তার ও বুড়োমানুষ। ধমক দিয়ে বললেন—"আহাম্মক কোথাকার!"

ধমক খেয়ে লোকটা যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল। ডাক্তারবাবু বললেন। "এখন যাচ্ছিস কোথায়?"

"আজ্ঞে জঙ্গলের ওপারে—"

—"হুঁঃ! আমায় চিনতে পারিস? সাতগড়ের হরি ডাক্তারের নাম শুনেছিস?"

লোকটা এবার হাতজোড় করে নিচু হয়ে নমস্কার করে বললে—"আজ্ঞে কর্তা, নাম শুনেছি, কিন্তু তেনার ওষুধ খাইনি।

—"আমিই সাতগড়ের হরি ডাক্তার। আমার ওষুধের বাক্সটা মাথায় করে তুলসীপুরের সতীশ মণ্ডলের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবি? দু-টাকা বক্‌শিস দেব—"

হারিকেনটা ততক্ষণে জ্বালা হয়ে গেছে। তার ম্লান আলোয় হরি ডাক্তার দেখলেন, লোকটার চেহারা চোয়াড়ের মতো, কিন্তু শরীর বেশ লম্বা। তার চোখের দৃষ্টি সরল নয়, বাঁকা ও রুক্ষ এবং মাথায় লম্বা চুল, পরনের কাপড় ও গায়ের চাদরখানা ময়লা।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"পারবি?"

সে বললে—"আজ্ঞে তা পারি—"

বেহারারা বললে—"হুজুর! এই জঙ্গল ভেঙে রাতের বেলায় আপনি—"

ডাক্তারবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন—"চুপ!"

তারপর "আমার ছাতি, লাঠি, স্টেথস্‌কোপ আর ওষুধের বাক্সটা বার কর।" —বলতে বলতে তিনি জুতো পায়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পালকি থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়ালেন।

পালকির ভিতরে তোষকের নিচে দু-পাশে ছিল ছাতা ও লাঠি; পায়ের দিকে দেওয়ালের গায়ে তাকের ওপর ছিল স্টেথস্‌কোপও ওষুধের বাক্স। বেহারারা সেগুলো বার করতেই ডাক্তারবাবু স্টেথস্‌কোপটা কোটের পকেটে পুরে ছাতা ও লাঠিখানা হাতে নিতে নিতে লোকটাকে

বললেন—"এই শুনছিস? ওরে! বাক্সটা মাথায় নে। খবরদার! ওর তলায় তেলের দাগ লাগে না যেন—"

লোকটা গায়ের চাদরখানা দিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললে—"কর্তা! আমরা গরিব মানুষ তেল পাব কোথায়?"

তারপর বাক্সটা মাথায় তুলে নিতে, ডাক্তারবাবু লাঠি দিয়ে লণ্ঠনটা দেখিয়ে একজন বেহারাকে বললেন—"ওটা ওর হাতে দে। চল"—

বেহারারা বললে—"হুজুর! আমরা?"

—"তোরা বাড়ি গিয়ে ছেলেপুলেকে নাড়ু খাওয়া গে-

—"হুজুর, আমাদের ওপর মিছে রাগ করলেন। এই আঁধার রাতে একেবারে যমের মুখে—"

ডাক্তারবাবু কয়েক পা গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—"যেতে পারবিনে, এ কথা আগে বললিনে কেন? যা-যা বেটারা! আমার ভয় নেই। যম আমার সাঙাত!"

বেহারারা উত্তর না দিয়ে শূন্য পালকি কাঁধে তুলে সাতগড়ের দিকে ফিরে চলল। কিন্তু তাদের পা আর চলে না। ভয়ে বুক দুরু-দুরু করছে। "আজকের রাতে এক মহা সর্বনাশ হবে। জয় মা কালী!—"

সেদিন সকাল থেকে সারাক্ষণই বৃষ্টি হয়েছে; বিকেলের দিকে কিছুক্ষণের জন্য ধরেছিল, আবার ঝুর ঝুর করে নামল। হরি ডাক্তার ছাতা খুলে মাথায় দিলেন। বাক্সটার উপর ছিল একখানা অয়েলক্লথের ঢাকনি।

যেতে যেতে ডাক্তারবাবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অন্ধকারে ও বৃষ্টিতে সব চুপ্সে, মুছে, ধেব্ড়ে কালো হয়ে আছে। হারিকেনের আলোয় যেটুকু দেখা যায়, সেটুকুব দৃশ্যও বিশ্রী। কেবল জল-কাদা, ঝোপ-জঙ্গল, মাঝে-মাঝে দুটি একটি বড়ো গাছ। এর ওপর দিয়ে বাহকের কোমর থেকে পা দুখানার সুদীর্ঘ কালো ও মোটা ছায়া নাচতে নাচতে চলেছে। বাতাস উঠেছিল। চারধার থেকে বৃষ্টি বিন্দুর টুপ্টাপ্ শব্দ, ভিজে ডালপালার দীর্ঘশ্বাস এবং ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁর সরু মোটা নানারকম ডাক একসঙ্গে জোট পাকিয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু অনুমান করলেন, দুজনে চালদাপুরের জঙ্গলে এসে পড়েছেন। তবুও জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় এলাম রে?"

—"কর্তা! চালদাপুরের জঙ্গলে। ওই বাঁয়ে শিবকালীর পাট—"

ডাক্তারবাবু সেদিকে ফিরে তাকালেন; কিন্তু অন্ধকারে দেখবেন কী? হঠাৎ তার মনে পড়ল, এতক্ষণ লোকটার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি; বললেন—"তোর নাম কীরে?"

—"কর্তা! আমরা গরিব লোক; আমাদের আবার নাম কী?"

ডাক্তারবাবু মনে মনে বললেন,—বেটা আচ্ছা আহাম্মক তো! প্রকাশ্যে বললেন—"তবুও—"

—"আজ্ঞে, বুনো! কর্তা, একটু ডান দিক ঘেঁষে আসবেন। বাঁয়ে গর্ত—"

ডান ধার ঘেঁষে যেতে যেতে ডাক্তারবাবু থম্‌কে দাঁড়ালেন, বললেন—"বুনো, ও কীসের শব্দ রে? কে কাঁদছে না?"

সত্যই একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কে যেন দূরে কোথায় কাঁদছে—"আহা-হা-হা-আহা-হা-হা!"

বুনো সমানে চলতে লাগল; ডাক্তারবাবুর কথার জবাব দিলে না।

—"হাঁ-হাঁ-নিশ্চয়ই কাঁদছে। এই দাঁড়া! ওই শোন, এ যে আর্তনাদ!"

—"কর্তা! চুপচাপ চলে আসুন। এখনও শিবকালীর পাট ছাড়াইনি—"

বাতাসের সজল সুরে শব্দটা প্রায় মিশেই গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু ভাবলেন, 'তবে কি সত্যি চালদাপুরের জঙ্গলের পুবে—'

তিনি মাথা নিচু করে চলেছেন। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ বার দুই পেঁচার ডাক শুনতে পেলেন—একটা কাছে, আর একটা তার কিছু দূরে। পেঁচা রাতের বেলাতেই ডাকে। এতে আর ভয়ের কী?

তারপর আরও কিছুদূর গিয়েই একটা সুতীক্ষ্ণ শিসের শব্দে ডাক্তারবাবু চম্‌কে উঠলেন। শব্দটা বাতাসে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে, ডালের ফাঁক দিয়ে, বনের তলা দিয়ে, গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ওই দূর থেকে ও শিস ভেসে আসছে। আবার একটা পেঁচা ডেকে উঠল।

ডাক্তারবাবু হাঁকলেন—"এই বুনো, দাঁড়া—"

বুনো ফিরে দাঁড়াল।

—"কিছু বুঝতে পারছিস?"

—"না কর্তা—"

আবার দূর থেকে শিস ভেসে এল। ডাক্তাবাবুর আর সন্দেহ রইল না। তিনি বত্রিশ বছর ডাক্তারি করছেন—এ পথেও বার কয়েক এসেছেন, অবশ্য দিনের বেলা। কিন্তু এ রকমটা কখনও হয়নি। নিশ্চয়ই আজ তিনি টিয়ার হাতে পড়েছেন! বললেন—"এই বুনো—" কিন্তু তাঁর কথা শেষ না হতেই পাশের জঙ্গল থেকে দুটি ছায়ামূর্তি এসে তাঁর হাত দু-খানা চেপে ধরলে।

বুনো তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে উঠল—"খবরদার! সরে দাঁড়া। কেউ ওঁর গা ছুঁবিনে—"

লোকদুটো চট্ করে সরে দাঁড়াল।

বুনো হারিকেনটা ওপর দিকে তুলে বললে—"কর্তা, সঙ্গে কী আছে?"

ডাক্তারবাবু বুনোর মুখের দিকে চোখ তুলে বললেন—"একটা ঘড়ি আর চেন, কয়েক আনা পয়সা, চশমা জোড়া—" বুনোর মাথায় তখনও ওষুধের বাক্সটা ছিল। সে তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"আর কিছু নেই?"

—"হরি ডাক্তার মিছে কথা বলে না—"

—"এই বিচ্ছু, বাক্সটা ধর। বুড়োটার কাপড়-চোপড় তল্লাশ করব।"

বিচ্ছু বাক্সটা বুনোর মাথা থেকে নিজের মাথায় তুলে নিতেই, বুনো ডাক্তারবাবুর সামনে এগিয়ে এল।

হরি ডাক্তার বললেন—"তুই বুঝি টিয়া?"

—"হ্যাঁ গো মশায়। এবার দাও তো সঙ্গে কী আছে?"

হরি ডাক্তার চেনটা বুক থেকে খুলে, ঘড়িটা বুক-পকেট থেকে বার করে, টিয়ার হাতে দিতে দিতে বললেন—"এ সবে তোর কী হবে? বেচলে দশ টাকাও পাবি না।"

—"ওই সঙ্গে তোমার জানটাও খাব—"

—"তাতে কী লাভ হবে? যে লোকটার চিকিৎসাব জন্যে যাচ্ছি, মাঝ থেকে সেই মারা যাবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। আমি রোগী দেখে ফিরে আসি; সেখানে যে টাকাগুলো পাব সেগুলো আর এইসব তোকে দিয়ে যাব—"

—"ওরে বংশী, বুড়োটার রগড়ের কথা শোন। প্রাণ দিতে কেউ ফিরে আসে? ওই করে পালাতে চাও যাদু!"

"পালাবার হলে এ জঙ্গলে রাতের বেলা ঢুকতাম না। ছাপ্পান্ন বছর বেঁচেছি, আর দু-চার বছর না বাঁচলে ক্ষতি কী? ছেলেটা ছিল, সেটাও তো মারা গেছে—"

—"তবে আর দেরি কেন? এখনই মর"—বলেই টিয়া তার হাতের মোটা লাঠিখানা তুললে।

—"দেখ টিয়া, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার বড়ো আনন্দ হয় রে। ওটা আমাব অভ্যেস হয়ে গেছে। একবার রোগীটাকে দেখব। যদি আমার কথা কিছু শুনে থাকিস, তাহলে এটাও নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিস, হরি ডাক্তারের যে কথা সেই কাজ। আমি ঠিক ফিরে আসব।"

টিয়া কী যেন ভাবলে; তারপর বললে—"আচ্ছা আমি তোমায় এখান থেকে ডুলিতে চড়িয়ে তুলসীপুর নিয়ে যাব। সেই ডুলিতেই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু খবরদার! আমার যদি কোনো ক্ষতি হয়, আর যদি ফিরে না আস, তাহলে তোমার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তোমায় খুন করে গাছে টাঙিয়ে রাখব। কেউ ঠেকাতে পারবে না—"

হরি ডাক্তার খুব সহজ সুরে বললেন—"আচ্ছা"—

—"ওরে বংশী, ডুলি আন্। হিরু আর মদ্দাকেও ডেকে আনবি।—"

মিনিট দশেকের মধ্যে একখানা ডুলি এল। ডাক্তারবাবু তাতে উঠে বস্‌লেন। বেহারা হল বিচ্ছু, বংশী, হিরু আর মদ্দা; টিয়া নিল হাতে হারিকেন, মাথায় ওষুধের বাক্সটা; জল-কাদা ভেঙে ডাক্তারবাবুকে কাঁধে নিয়ে বাহকরা ছুটে চলল। তাদের গলা থেকে একটা শব্দ বার হচ্ছে—উঁহু-হুঁ-হুঁ-উঁহু-হুঁ-হুঁ—"

আবার বৃষ্টি পড়ছে ; দূরে শিয়াল ডেকে উঠল। ডাক্তারবাবু চুপ করে বসে ভাবছেন, এ মন্দ নয়। গল্পে শুনেছি ভূতের ওঝারা ভূতের পালকি চড়ে বেড়ায়। আমি চলেছি ডাকাতের ডুলিতে।

রাত তখন বারোটা হবে। জঙ্গলটা শেষ হয় আর কী—এমন সময় হঠাৎ চারধার থেকে মশাল ও বন্দুক
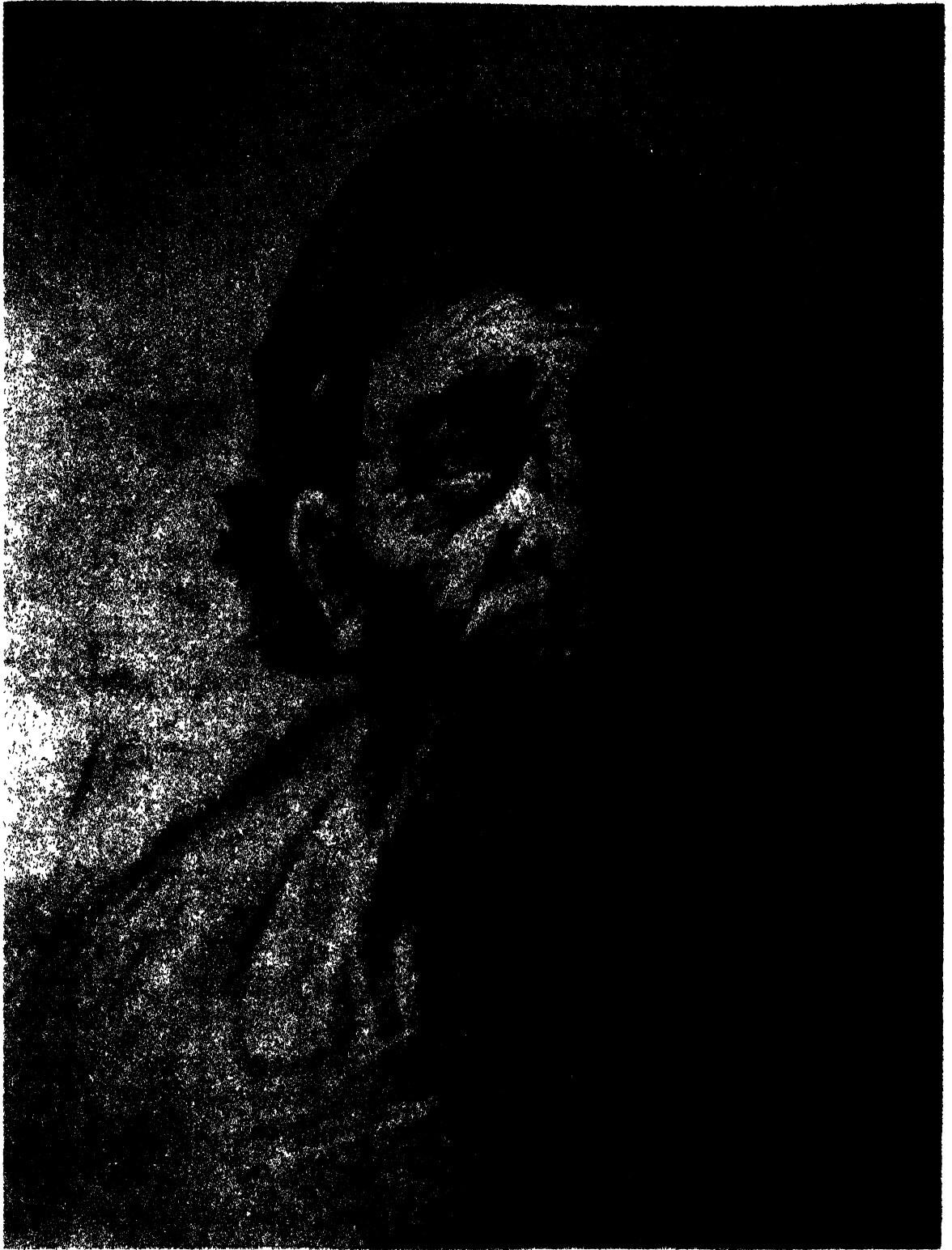
ফকির

শিল্পী : দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

হাতে একদল লোক ডাক্তারবাবুর ডুলি ঘিরে ধরে হাঁকলেন—"এই, খাড়া রহো—"

বাহকরা স্থির হয়ে দাঁড়াল। হরি ডাক্তার ডুলি থেকে মুখ বার করে দেখেন, সামনে দারোগা সাহেব; হাতে পিস্তল। দারোগা সাহেব হরি ডাক্তারকে দেখেই বললেন—"তাজ্জব ব্যাপার! ভেবেছিলাম ডুলিতে টিয়া বেটা বউ সেজে পালাচ্ছে; তার বদলে আপনি—"

—"হাঁক শুনে আর মশালের আলো দেখে আমারও বুক কাঁপছিল—বুঝি ডাকাতটার হাতে পড়লাম, এখন দেখছি আপনি—"

—"আপনার সাহস আছে তো ডাক্তারবাবু! এই রাত্রে জঙ্গল ভেঙে চলেছেন কোথায়?"

—"কী আর করি বলুন? যাচ্ছি তুলসীপুর সতীশ মণ্ডলের বাড়ি। তার ছেলের কলেরা। জানেন তো আমরা ডাক্তার মানুষ—যমের সাঙাত; আমাদের সময় অসময় কিছুই নেই। আপনি এমন অসময়ে এই জঙ্গলে?"

—"খবর পেয়েছি, বেটা এখন এই জঙ্গলে আছে, আপনাব ডুলি কোথাকার?"

—"সাতগড়ের—"

—"পালকিতে এলেন না কেন।"

—"পাওয়া গেল না!"

—"বটে? আপনার ডুলির বেহারাগুলোর চেহারা কিন্তু ভালো নয়। যেটার মাথায় বাক্সটা আছে সেটা ঠিক—"

ডাক্তারবাবু দারোগাসাহেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"কোনোদিন হয়তো বলবেন আমার চেহারাও খুনির মতো—"

দারোগা সাহেব হাঁকলেন—"এই জমাদার! ডাক্তার বাবুকো যানে দেও।......নমস্কার।"

"নমস্কার!" ডাক্তারবাবু হাঁকলেন—"ওরে শশী! পা চালিয়ে চল! বেটারা এখানেই রাত কাবার করবি?"

বেহারারা এবার আরও জোরে শব্দ করতে লাগল—"উঁহু-হুঁ-হুঁ-উঁহুঁ-হুঁ-হুঁ—"

তাদের পা আরও জোরে চলছে।

তারপর তারা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যখন তুলসীপুরে সতীশ মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত ঠিক একটা। চারধার নিঝুম, কেবল দূর থেকে চৌকিদারদের হাঁক ভেসে আসছে।

মণ্ডল মশায়ের বৈঠকখানার বারান্দায় বসে কে যেন 'ফুড়ৎ' 'ফুড়ৎ' শব্দে হুঁকো টানছিল। তার পাশে একটা হারিকেন জ্বলছে। বারান্দার এক কোণে একটা কুকুর শুয়েছিল। বেহারারা ডুলিখানা অন্ধকারে উঠোনে নামাতেই কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে উঠে দাঁড়াল। যে লোকটা হুঁকো টানছিল, সে বললে—

—"কে এল?"

বংশী বললে, "সাতগড়ের ডাক্তারবাবু—"

লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে ভিতর বাড়ির দিকে চলে যেতেই ডাক্তারবাবু ডুলি থেকে বেরিয়ে এলেন। টিয়া হঠাৎ তার কাদা-মাখা পা-দুখানি জড়িয়ে ধরে বললে—"কর্তা, আপনি আমার মা-বাপ। এই পা ছুঁয়ে কিরে করে গেলাম, আমার জান থাকতে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। ওরে বংশী, এই মদ্দা, তোরা দেবতার পায়ের ধুলো জিভে মাথায় ঠেকা—"

ইতিমধ্যে মণ্ডল মশায় বেরিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে টিয়ার দল হাওয়া।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবু সাতগড়ে নিজের বৈঠকখানার বারান্দায় জলচৌকির উপর বসে তামাক খাচ্ছেন। দুপুরে তুলসীপুর থেকে আসবার পথে শুনেছিলেন, পুলিশ চালদাপুরের টিয়ার আড্ডার সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু কারুকে ধরতে বা কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি।

তিনি নিজের মনে বলে উঠলেন—"বেটা বাহাদুর!" এমন সময় একটা ছায়ামূর্তি অন্ধকার উঠোনের ওপর দিয়ে এসে তাঁর জলচৌকির সামনে একজোড়া বড়ো ইলিশ মাছ ও চারটে আনারস রেখে মাটিতে টিপ করে মাথা ঠুকেই মিলিয়ে গেল।

এটা চল্লিশ বছর আগের ঘটনা। এখন সে ডাক্তারবাবু বা টিয়া কেউ নেই। কিন্তু চালদাপুরের জঙ্গলের খানিকটা আছে। সেখানে গেলে শিবকালীর পাট আজও দেখা যায়।

বাগানের মধ্যে কালীবাড়ির পাকা বারান্দায় বসিয়া কৃষ্ণদাসবাবুর পুত্র শিবনাথ একটা ধনুকে জ্যা রোপণ করিয়া টান দিয়া ধনুকটার সামর্থ্য পরীক্ষা করিতেছিল। অনতিদূরে মন্দিরের উঠানে তাহাদের রাখাল শম্ভু বাউরি বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। প্রভু এবং ভৃত্য দুজনেই বালক, বয়স তেরো-চৌদ্দের বেশি নয়। একপাশে খান দুই ছোটো বাঁশের লাঠি ও কতকগুলি পাথর জমা করা রহিয়াছে। এগুলি তাহার যুদ্ধের সরঞ্জাম। গ্রামের অপর পাড়ার ছেলেদের সহিত সে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। পূজার সময় হইতেই দুই পাড়ার কিশোর-রাষ্ট্রের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। দুই পাড়ার প্রতিমার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া তর্ক

হইতে এ বিরোধের সূত্রপাত। দুই পাড়ার প্রতিমাই অবশ্য একই কারিগরের গড়া, তবুও তো তাহার ভালো-মন্দ আছে? এ বিষয়ে কোনো মীমাংসা না হওয়ায় ও-পাড়ার ছেলেরা দাবি করিয়াছিল, তাহাদের প্রতিমা অধিক জাগ্রত। সে বিষয়ে শিবনাথের পাড়ার পরাজয় হইয়াছে, কারণ ও-পাড়ার মানসিক বলিদান হয় বাহান্নটি আর তাহার পাড়ায় মাত্র আটটি। এই শোচনীয় পরাজয়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শিবনাথ ও-পাড়ার ছেলেদের ফুটবল ম্যাচে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল। ম্যাচে শিবনাথের পাড়া জিতিল, কিন্তু সেই হইল যুদ্ধের সূত্রপাত। ম্যাচে হারিয়া ও-পাড়ার ছেলেরা শিবনাথের দলের একটি ছেলের মাথা ফাটাইয়া দিল।····

তাহার পরই খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, ও-পাড়ার ছেলেরা এ পাড়ায় আসিলেই ইহারা বন্দি করিবার চেষ্টা করে,····এ-পাড়ার ছেলেরা ও-পাড়ায় গেলে বেশ ঘা কতক খাইয়া বাড়ি ফেরে। শেষপর্যন্ত শিবনাথ শক্তির চরম পরীক্ষার জন্য বিপক্ষকে প্রকাশ্য যুদ্ধে আহ্বান করিল। বাল্যমনের চাপল্য এবং খেয়ালের অন্তরালে শিবনাথের মনে আরও একটা বস্তু ছিল, সেটা তাহার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। ইহারই মধ্যে স্কুল-পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও সে আরও অনেক বই পড়িয়া ফেলিয়াছে।····বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ সে পড়িয়াছে। ওই অসমতল খোয়াইগুলি, ও তো ঠিক পার্বত্য পথের মতো। সে অবিলম্বে মনে মনে রাজসিংহের পদ্ধতিতে আপন সৈন্য সমাবেশ পদ্ধতি ছকিয়া লইল, এবং কয়জন বন্ধুকে লইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া নিপুণ সেনাপতির মতোই সৈন্য-সমাবেশ করিল।····ফলও হইল আশানুরূপ,—পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিবনাথের জয় হইয়া গেল, শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।····বন্দি হইল জন কয়েক, জন কয়েক পলায়ন-পথে কাঁকরে পা হড়কাইয়া পড়িয়া আহত হইল, বাকি দলের পশ্চাতে শিবনাথের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অনুসরণ করিল, বন্দি যাহারা হইয়াছিল, শিবনাথ তাহাদের সহিত মন্দ ব্যবহার করিল না, সসম্মানে সকলের সহিত সন্ধি করিয়া আপনার বাগানের কিছু ফল উপহার দিয়া বিদায় করিল।····এখন শিবনাথ বসিয়া আছে বিপক্ষ দলের দলপতির প্রতীক্ষায়। কিন্তু অনুসরণকারীরা এখনও কেহ ফিরে নাই।····

শম্ভু বলিল, ওরা আর আসবে না বাবু। সন্‌জে হয়ে এল, চলেন, বাড়ি যাই। সেই কখন আইচেন বলেন দেখি।

শিবনাথ এইবার মুখ তুলিয়া চাহিল, সত্যিই আর বেলা নাই, সূর্য পাটে বসিয়াছে, পূর্ব দিগন্ত অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে।···

শম্ভু বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বাড়ি চলে গিয়েছে সব। খিদে নেগেছে, আর সব যে যার বাড়ি গিয়েছে।

মীমাংসাটা শিবনাথের মনঃপুত হইল না, যুদ্ধ করিতে আসিয়া ক্ষুধার তাড়নায় সৈন্য সামন্তেরা বাড়ি চলিয়া যাইবে কী!···

শিবনাথ হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।··· ক্যাসাবিয়াঙ্কার কথা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। ক্যাসাবিয়াঙ্কা আপনার স্থান ছাড়িয়া এক পা সরিয়া যায় নাই। সমুদ্র সে দেখে নাই, যুদ্ধজাহাজও কখনও দেখে নাই, কিন্তু তবু তাহার চোখের সম্মুখে ক্যাসাবিয়াঙ্কার ছবি ফুটিয়া উঠিল। নীল জল, জ্বলন্ত জাহাজ, তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া কিশোর ক্যাসাবিয়াঙ্কা।····

সহসা তাহার কল্পনায় বাধা পড়িল। ও কী! দুইটা বড়ো শিয়াল একটা কচি বাছুর মুখে করিয়া লইয়া আসিতেছে! না, শিয়াল তো নয়। জানোয়ার দুইটা আরও অনেক বড়ো। দেখিতে শিয়ালের মতো হইলেও শিয়ালের ভঙ্গির সহিত অনেক পার্থক্য। শিয়াল তো এমন লেজ সোজা করিয়া চলে না। তাহাদের গমন-ভঙ্গি তো এমন দৃপ্ত নয়। মুখের চেহারার সঙ্গেও তো শিয়ালের মুখাকৃতি মেলে না। সে সতর্কতা প্রকাশ করিয়া শম্ভুকে ডাকিল, শম্ভু! শম্ভু!

কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমায় শম্ভু সচকিত হইয়া উঠিয়া সাড়া দিল, কী?

শিবনাথ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, দেখেছিস!

শম্ভু বলিল, এঃ কাজ সেরে ফেলিয়েছে ব্যাটারা। মরে গিয়েছে বাছুরটা।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, শেয়াল তো নয়, হেঁড়োল নাকি রে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়া পাজি জাত। এঃ রক্ত পড়ছে দেখেন দেখি!

শিবনাথ ধনুকটা নামাইয়া বলিল, মারব এক তির?

না। যাক, চলে যাক। তেড়ে আসবে, ছিঁড়ে ফেলাবে আম্মাদিগে। বাঘের জাত তো।

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উভয়ে জানোয়ার দুইটার দিকে চাহিয়া রহিল। শিবনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতেছিল।···

শিবনাথের কৌতূহল ধীরে-ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল, রাশিয়ার বরফাচ্ছন্ন মেরুপ্রদেশের বিবরণের মধ্যে উল্‌ফের কথা পড়িয়াছে—উল্‌ফ, হায়েনা, নেকড়ে বাঘ, হুড়ার।

সে বলিল, চল, একটু এগিয়ে দেখি।

কৌতূহল শম্ভুরও বাড়িতেছিল, সে বলিল, গাছের আড়ালে আড়ালে চলেন।

গাছের আড়ালে আড়ালে আসিয়া অনেকটা নিকটে পৌঁছানো গেল। শিবনাথ দেখিল, জানোয়ার দুইটা জিভ বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে। আশ্চর্য, সে মুখব্যাদান ভঙ্গিমার মধ্যে স্পষ্ট হাসির রেখা পরিস্ফুট! জানোয়ার হাসে! হাঁ, হাসে, বাড়ির কালুয়া কুকুরটার মুখেও আনন্দের আতিশয্যে এমন ভঙ্গি দেখা দেয়, সেও হাসে। একটু পরেই একটা জানোয়ার অদ্ভুত শব্দ করিয়া উঠিল, আবার, আবার। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, তবু অস্পষ্ট আলোকে শিবনাথ দেখিতে পাইল, ছোটো ছোটো কুকুরছানার মতো কয়টা ছানা একটা গর্ত হইতে কুঁ-কুঁ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল।

শম্ভু বলিল, বাচ্চা হয়েছে ব্যাটাদের। একটা-দুটো-তিনটে। দেখেন দেখেন, মজা দেখেন, বাচ্চাগুলোর তেজ দেখেন।

বাছুরটার ক্ষতস্থান হইতে নির্গত রক্তধারা চাটিতে চাটিতে ছানাগুলি বিবাদ শুরু করিয়া দিয়াছিল।…অল্প কিছুক্ষণ পরেই ধাড়ি দুইটা মৃত পশুশাবকটাকে টানিয়া লইয়া বুকের দুই পাশ ছিঁড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে শাবকগুলার সে কী গর্জন!

শম্ভু বলিল, চলেন, আর লয়। এই সময়ে আমরা চলে যাই। খেতে নেগেছে ব্যাটারা, এইবার মারামারি করবে। আঁধারও হয়ে এল। খোয়াইগুলোর ভেতর আবার সাপ-খোপ বেরুবে।

শিবনাথের কৌতূহল মেটে নাই, পশু দুইটার আহার-আত্মসাতের কলহ দেখিবার জন্য প্রবল আগ্রহ হইতেছিল, কিন্তু সে আর আপত্তি করিতে পারিল না। তাহার মায়ের সুন্দর কঠিন মুখের দৃষ্টি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।…

গ্রামে যখন তাহারা প্রবেশ করিল, তখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। পথের উপর গাঢ় অন্ধকার। গ্রামের দেব-মন্দিরে-মন্দিরে কাঁসর-ঘন্টা ধ্বনিত হইতেছে। শিবনাথ আশ্বস্ত হইল, তাহার মা-পিসিমা এখন ঠাকুরবাড়িতে; সে তাড়াতাড়ি বই লইয়া পড়িতে বসিয়া যাইবে।…

সমস্ত বিকেলটা কোথায় ছিলি রে শিবু?

শিবনাথ চমকিত হইয়া বইখানা রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পিসিমা গৃহদেবতার নির্মাল্য হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মাকে না দেখিয়া শিবনাথ আশ্বস্ত হইয়া উৎসাহভরেই বলিল, আজ দুটো হেঁড়োল দেখলাম পিসিমা।

শিবনাথের মাথায় নির্মাল্য স্পর্শ করাইয়া পিসিমা প্রশ্ন করিলেন, কোথায়?

আমাদের দেবীবাগের পাশেই বাসা করেছে। আজ একটা বাছুর মেরে মুখে করে নিয়ে এল। এঃ যে রক্তটা পড়ছিল!

মুশকিল করলে তো! বাছুর ছাগল ভেড়া মেরে সর্বনাশ করবে দেখছি।

তিনটে ছোটো ছোটো এইটুকু—

শিবনাথের কথা আর শেষ হইল না, দ্বারপথের দিকে সহসা দৃষ্টিপাত করিয়াই সে নীরব হইয়া গেল। দুয়ারের সম্মুখেই তাহার মা কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মা বলিলেন, কিন্তু ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করেছ কেন শিবু?

শিবনাথ সম্মুখে অভয়দাত্রী পিসিমার উপস্থিতির ভরসায় সাহস করিয়া বলিল, মারামারি কেন করব? যুদ্ধ করেছি।

যুদ্ধ ?

হ্যাঁ, যুদ্ধ। ওরা যুদ্ধ করবে বলে এই দেখ পত্র দিয়েছে।

সে নিজের পকেট হইতে বিপক্ষের যুদ্ধ-প্রস্তাব গ্রহণ করার সম্মতি-পত্রখানা বাহির করিল।

কিন্তু যুদ্ধ কিসের জন্যে? এক গ্রামে বাড়ি, ভাইয়ের মতো সকলে—

পিসিমা একবার বাধা দিয়া বলিলেন, বেশ করেছে। ওদের বাপরা চিরকাল আমাদের হিংসে করে এসেছে, এখনও অপমান করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। এখন থেকেই আবার ছেলেদের আক্রোশ দেখ না!

মা হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, না না ঠাকুরঝি, দেশে-ঘরে ঝগড়া করা কি ভালো? তাইলে জানোয়ারে আর মানুষে তফাত কী?

শিবনাথ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল নেকড়েগুলোর কলহের কথা।

এক-একসময় মাকে তাহার এত ভালো লাগে!

দাদুর উত্তর

বনফুল

খোকন তখন ছোটো ছিল, মাত্র দশ বছর বয়স। একদিন গঙ্গার ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখছিল সে। ভাদ্রের শুভ্র [illegible] মেঘে ভরা পশ্চিমের আকাশ [illegible] রং। যে সাতটা রং রামধনুতে [illegible] তো আছেই, তাছাড়া আছে [illegible] জানে না। ফিকে [illegible] সঙ্গে ফিকে [illegible] টুকরোটিকে [illegible] অদ্ভুত [illegible] মাঝে-মাঝে [illegible] একটা [illegible] আবির মেখে বসে আছে, পাহাড়ের উপর [illegible] শাড়ি পরে হাত তুলে কাকে ডাকছে ওই শ্যামলা রঙের ছোট্ট মেয়েটি, উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা শ্বেতহস্তী, তার মুখে লালের আভা আর সর্বাঙ্গ দুগ্ধ-ধবল। একটা রূপকথা যেন মূর্ত হয়েছে পশ্চিম আকাশে। ও-পাশ থেকে ঝরে পড়ছে একটা আলোর ঝরনা, এ-পাশে ছোটো ছোটো মেঘগুলি ভেসে চলেছে রঙের নদীতে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল খোকন। হাতে ছিল চিনেবাদামের ঠোঙা। হাতে ধরাই ছিল, খেতে ভুলে গিয়েছিল খোকন। তন্ময় হয়ে সে চেয়ে ছিল পশ্চিম আকাশের দিকে। কী মহোৎসব হচ্ছে ওখানে, অথচ কোনো গোলমাল নেই, হাততালি নেই, মাইক নেই।

একটু পরেই কিন্তু খোকন বলে উঠল—এ কী? রংগুলো সব ফিকে হয়ে যাচ্ছে যে! বদলেও যাচ্ছে! একটা অন্ধকারের পরদা ঢেকে ফেলছে সব যেন। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে রাত্রি নেমে এল। খোকন হতভম্ব হয়ে বসে রইল। তার বারবার মনে হতে লাগল, এত শীঘ্র সব ফুরিয়ে গেল কেন? কোথা গেল এত রং? কেনই বা এসেছিল, কেনই বা চলে গেল? চানাচুরের ঠোঙাটার সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল সে। চানাচুর বার করে চিবুতে লাগল, কিন্তু গঙ্গার ধার থেকে উঠতে পারল না সে। কীসের একটা মোহ তাকে যেন আটকে রাখল, অনেকক্ষণ। যে অপরূপ দৃশ্য সে এতক্ষণ দেখেছে তা যে আবার আকাশে দেখা দেবে এ আশা তার ছিল না, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যে উত্তরটা সে খুঁজছে এত রং কোথায় গেল, তা বোধহয় এইখানেই পাওয়া যাবে। অনেকক্ষণ বসে রইল, কিন্তু কোনো উত্তর পেল না সে।

বাড়ি ফিরে গেল শেষে। গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যা সে আরও কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু এ সব কথা মনে হয়নি।

সব সময় সব কথা কি মনে হয় ? হঠাৎ তার মনে পড়ল নিউটন সাহেব আপেলের গাছ থেকে পড়া দেখে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল গাছ থেকে আপেলটা কীসের টানে মাটিতে পড়ছে। আপেল-পড়া তিনি নিশ্চয়ই আগে অনেকবার দেখেছিলেন, কিন্তু একবারই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল আপেল পড়ে কেন ? খোকনেরও একবার মনে হয়েছে এত রং কোথা থেকে এল, কোথায়ই বা গেল। হয়তো সে-ও একদিন বড়ো একটা আবিষ্কার করে ফেলবে এর উত্তর থেকে।

বাড়ি ফিরে দেখল মনীশবাবু বসে আছেন। মনীশবাবু তার প্রাইভেট টিউটার। রোজ সন্ধ্যাবেলা পড়াতে আসেন। তাঁকে দেখে খোকন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সত্যিই আজ বেড়িয়ে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

"খোকন, আজ তোমার এত দেরি যে ? কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

"গঙ্গার ধারে বসেছিলাম। কী সুন্দর সূর্যাস্ত যে দেখলাম মাস্টারমশাই ! মেঘে মেঘে কী চমৎকার রং ! ভাবছিলাম এত রং আসে কোথা থেকে। আর আসেই যদি, কিছুক্ষণ পরে চলে যায় কেন ? একটু পরে সব অন্ধকার হয়ে গেল। তাই গঙ্গার ধারে বসে বসে ভাবছিলাম কেন এমন হয়—"

মাস্টারমশাই বললেন—"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। রং আসে সূর্যের আলো থেকে। পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘুরছে, তাই আমাদের দিন-রাত্রি হচ্ছে। তাই সূর্যকে সকালে পূর্বদিকে আর সন্ধ্যায় পশ্চিমদিকে দেখা যায়। সূর্য যখন চক্রবাল রেখার কাছে থাকে তখন আলোর রংগুলো আমরা দেখতে পাই, আর তখন সেখানে যদি মেঘ থাকে তাহলে সে রং মেঘে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে, তাই মনে হয় সূর্য ক্রমশ সরে সরে উপরের দিকে উঠছে। উপরে উঠলে সূর্যের আলোর রং আমরা দেখতে পাই না, সাতটা রঙে মিলে যে সাদা আলো হয়েছে সেইটেই তখন দেখতে পাই, সে আলোকে আমরা বলি রোদ—"

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"দুপুর বেলায় সূর্যের রং দেখা যায় না কেন ?"

মাস্টারমশাইয়ের বিদ্যা অল্প। তিনি বিশদ করে ব্যাপারটা খোকনকে বোঝাতে পারলেন না।

বললেন—"যায় না বলেই যায় না। এখন তুমি ইতিহাসটা খোলো দেখি !"

মাস্টারমশাই সোৎসাহে ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। ইতিহাস শেষ করে ভূগোল, তারপর অঙ্ক—।

পুরো দুটি ঘণ্টা পড়িয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

বাইরের প্রকাণ্ড হলটার একধারে খোকনের পড়ার টেবিল। আর একধারে একটা খাট। সে খাটে খোকনের দাদু সন্ধের সময় শুয়ে শুয়ে বই পড়েন তামাক খেতে খেতে। মাস্টারমশাই চলে যাবার পর দাদু খোকনকে ডাকলেন।

"দাদু, শোনো। আজ গঙ্গার ধারে গিয়েছিলে বুঝি—সূর্যাস্ত দেখলে ?"

"হ্যাঁ, অতি চমৎকার। কিন্তু অত রং এলই বা কেন, গেলই বা কেন তা বুঝতে পারলাম না। মাস্টারমশাই যা বললেন তা-ও আমার মাথায় ঢুকল না।"

দাদু মুখটিপে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "আমি কিন্তু উত্তরটা জানি। শুনবে সেটা ?"

"বলো না—"

"সূর্য মহা দাতা লোক। সর্বদা দান করছেন। তাই তাঁর ছেলে কর্ণ দাতাকর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সকালে এসেই একবার অজস্র রং দান করেন, আবার সন্ধ্যাবেলা অস্ত যাবার সময়ও অজস্র রং দান করেন। তাঁর সেই অজস্র দানের ছবি খানিকক্ষণের জন্য আকাশে ফুটে ওঠে। তারপর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। তাই আর আকাশে দেখা যায় না—"

"তাই নাকি। পৃথিবীতে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে সে সব রং ?"

"সর্বত্র। তোমার মায়ের মুখে, তোমার বাবার ভালোবাসায়, তোমার বোনের চোখের দৃষ্টিতে সেই রং রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমার হাসিতেও হয়তো একটু আছে সেই রং। সবার মধ্যেই আছে। ফুলে আছে, ফলে আছে, পাখির পালকে আছে, প্রজাপতির ডানায় আছে। আমাদের স্নেহে, ভালোবাসায়, ত্যাগে, ক্ষমায় সেই রং লুকিয়ে আছে। সেই রঙেই পৃথিবী রঙিন।"

দাদুর উত্তরটা খোকনের ভালো লাগল। এখন খোকন বড়ো হয়েছে। বিজ্ঞানের বই পড়ে সন্ধ্যা উষার বর্ণমহিমার তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু দাদুর উত্তরটা এখনও ভালো লাগে তার। মাঝে-মাঝে এ-ও মনে হয় ওইটেই হয়তো সত্যি।

সদাশিবের আদিকাণ্ড

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব গাঁয়ে টিক্‌তে পারল না। একে তো সে বাপ-মা মরা ছেলে, মামার বাড়িতে মানুষ, তার ওপর গাঁ-সুদ্ধ লোক তার ওপর চটা। সবাই বলে—'আমরা না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেলাম, আর তোর এমন তেল-চিক্‌চিকে চেহারা হল কী করে? নিশ্চয়ই আমাদের খাবার চুরি করে খাস।'

সদাশিব কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—'কক্ষনো না। কার চুরি করে খেয়েছি তোমরাই বল।'

তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না, কিন্তু শাসিয়ে দেয়— যেদিন ধরব সেদিন একঠাঁই মাস একঠাঁই হাড় করব।'

সত্যিই গ্রামেব অবস্থা ভারি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহারাষ্ট্র দেশের এক প্রান্তে পশ্চিমঘাটের খাঁজের মধ্যে ছোট্ট গ্রামটি এতদিন বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল, কিন্তু কয়েক বছর থেকে এমন উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যে বলবার কথা নয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বেধেছে। উত্তর থেকে মোগলরা এসে দৌলতাবাদ মহলে বসেছে। আর দক্ষিণে আছে আদিলশাহি বিজাপুর রাজ্য। দুই পক্ষে ঠোকাঠুকি লেগেছে। যুদ্ধ তো চলছেই, তার ওপর দুই পক্ষের সিপাহিরা সুবিধা পেলেই গ্রাম লুট করছে। গ্রামবাসী চাষারা সারা বছর পরিশ্রম করে যা দু-চার দানা জোয়ার-বাজ্‌রি তুলছে তা গ্রামবাসীদের পেটে যাচ্ছে না, বেশির ভাগই সিপাহিরা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। কথায় বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়, গ্রামের অবস্থা হয়েছে তাই। আধ-পেটা খেয়ে গ্রামের লোক কোনোরকমে বেঁচে আছে। উপরন্তু সম্প্রতি আর এক উপসর্গ হয়েছে। শিবাজি নামে এক মারাঠা যুবক

একদল ডাকাত জোগাড় করে চারিদিকে লুট-তরাজ করে বেড়াচ্ছে। গরিব চাষাদের ওপর সে হানা দেয় না, তার নজর রাজা-বাদশার ওপর। ভারি ডাকাবুকো লোক, কাউকে ভয় করে না। লোকে বলে শিবাজি নাকি মোগলদের তাড়িয়ে আর বিজাপুরী মুসলমানদের দমন করে মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করতে চায়। কিন্তু তা কি পারবে শিবাজি? মোগলদের তাড়ানো কি সামান্য ডাকাতের কাজ? মাঝ থেকে দেশের লোকের দুর্দশা বেড়েই যাচ্ছে। কারুর ঘরে অন্ন নেই, সকলের চেহারা কঙ্কালসার।

কেবল সদাশিবের চেহারা ওরই মধ্যে একটু শাঁসে-জলে। তার বয়স সতেরো কি আঠারো বছর, বেঁটে-খাটো কর্মঠ দেহ, চিকণ শ্যাম গায়ের বর্ণ, মুখখানি ভালো মানুষের মতো। আচার আচরণেও শান্তশিষ্ট। কিন্তু গাঁয়ের সবাই তার শত্রু। সবাই ভাবে ছোঁড়া কোথা থেকে বেশি খাবার পায়? তার মামা সখারাম কিপ্‌টে মানুষ, সে নিজে না খেয়ে ভাগনেকে বেশি খেতে দেবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। সবাই সদাশিবের ওপর নজর রাখে, কিন্তু কেউ কিছুই ধরতে পারে না। তাদের খালি রাগ হয়। তারা জানে না যে গ্রামে সদাশিবের একটি বন্ধু আছে, সে নিজে সিকি-পেটা খেয়ে নিজের খাবারের ভাগ সদাশিবকে দেয়। গাঁয়ে কেবল ওই একটি লোক সদাশিবকে ভালোবাসে।

একদিন গ্রীষ্মের বিকাল বেলা সদাশিবের মামা সখারাম বললেন,—'বাবা সদাশিব, তোমাকে আর আমি খেতে দিতে পারছি না, এবার তুমি নিজের রাস্তা দেখো।'

গাঁয়ের বারোয়ারি বটতলায় পাঁচজন মাতব্বর উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সামনেই সখারাম কথাটা তুললে, বোধহয় মাতব্বরদের সঙ্গে আগেই সলাপরামর্শ করে রেখেছিলেন।

সদাশিব হাঁ করে মামার মুখের পানে চেয়ে রইল, শেষে বললে,—'তুমি খেতে না দিলে আমি খাব কী?'

গাঁয়ের বিঠ্‌ঠল পাটিল বললেন, —'তুমি জোয়ান হয়েছ, নিজে পরিশ্রম করে রোজগার করে খাবে। মামা তোমাকে কতদিন খাওয়াবে?'

সদাশিব বললে,—'আমি পরিশ্রম করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তোমরা আমায় কাজ দাও।'

একজন মোড়ল হাত উলটে বললেন,—'কাজ কোথায়? দেখছ না আমরা সবাই হাত গুটিয়ে বসে আছি? কার জন্যে চাষবাস করব? সিপাহিদের জন্যে?'

সদাশিব বললে,—'তবে আমি কী করব বলে দাও।

বিঠ্‌ঠল পাটিল খিঁচিয়ে উঠলেন,—তা আমরা কী জানি? তোমাকে গাঁয়ের কেউ চায় না। তুমি কালই যেখানে ইচ্ছে চলে যাও।'

সদাশিব ছল্‌ছল্‌ চোখে সকলের পানে তাকাতে লাগল। বললে,—'কোথায় যাব? আমি যে গাঁয়ের বাইরে যাইনি।'

একজন মাতব্বর বললেন, 'যাবার ভাবনা কী? মোগলদের দলে ভিড়ে পড় গিয়ে। তুমি তো আমাদের মতো রোগা পট্‌কা নও, বেশ মোটা-তাজা আছ। মোগলরা লুফে নেবে।'

আর একজন বললেন, 'বিজাপুরীদের দলেও যোগ দিতে পার।'

তৃতীয় মাতব্বর রসিকতা করে বললেন,—'সবচেয়ে ভালো, তুমি শিবাজির ডাকাতের দলে জুটে যাও। তোমার চুরি করা অভ্যাস আছে। ডাকাতের দলে খুব কদর হবে।'

সদাশিব আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে নদীর কিনারাতে বসল। গ্রামের প্রান্তে ছোটো পাহাড়ি নদী, গ্রীষ্মের তাপে প্রায় শুকিয়ে এসেছে, তীরে ঝোপঝাড় জঙ্গল। একটা পনস গাছ নিঃঝুমভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গাছে একটিও ফল নেই, ইঁচড় অবস্থাতেই গাঁয়ের লোক পেড়ে নিয়ে গেছে। সদাশিব তার একটা নিচু ডালে উঠে বসে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ভাবতে লাগল।

সদাশিব অনেকক্ষণ ভাবল, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পেল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সদাশিব তখন ডাল থেকে নেমে নদীর তীর থেকে দুটি নুড়ি কুড়িয়ে আনল, নুড়ি দুটি পনস গাছের ডালের ওপর রেখে গাঁয়ে ফিরে চলল। দুটি নুড়ির সংকেত কেবল একজন বুঝবে—দুই প্রহর রাতে এখানে এসো, দেখা হবে।

ফিরে যেতে যেতে সদাশিব দেখল গাঁয়ের ঝি-বউরা নদীতে জল নিতে আসছে। সে তাদের এড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে গ্রামে ফিরে গেল।

পাহাড়ের উপত্যকায় রাত্রি আসে তাড়াতাড়ি। ফিরে এসে মামির দেওয়া আধখানা শুকনো বাজরির রুটি খেয়ে বাইরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল রাতদুপুরে। পুব আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠি উঠি করছে। সদাশিব নিঃশব্দে উঠে

ছায়ার মতো নদীর পানে চলল। পনস গাছের তলায় অন্ধকার, কিন্তু সদাশিব অন্ধকারে দেখতে পায়। সে দেখল গাছের নিচু ডালে ঠেস দিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাঁয়ের মোড়ল বিঠ্ঠল পাটিলের মেয়ে কুমকুম।

সদাশিব তার পাশে গিয়ে গাছের ডালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কুমকুমের বয়স যদিও তেরো-চৌদ্দ বছর, তাকে দেখলে মনে হয় নয় দশ বছরের মেয়ে। ছোটোখাটো শরীরটিতে কিন্তু বেশ সৌষ্ঠব আছে। বেশি কথা কয় না, কিন্তু ভারি বুদ্ধিমতী। এতটুকু মেয়ের যে এত বুদ্ধি থাকতে পারে তা কেউ ভাবতেও পারে না।

ফিস্‌ফিস করে কথা হল। সদাশিব বললে—'কুঙ্কু, সব খবর জানিস তো?'

কুঙ্কু বলল—'জানি। এই নাও, খাও।'

বলে হাতের খাবার সদাশিবের মুখের কাছে ধরল। সদাশিব খাবারে কামড় দিয়ে দেখলে—পুরনপুরি। অনেকদিন সে পুরনপুরি খায়নি, মনের সুখে চিবুতে চিবুতে বললে,—এবার আমি চলে যাব, তুই পেট ভরে খেতে পাবি। সিকি-পেটা খেয়ে খেয়ে তোর বাড়-বৃদ্ধি কমে গেছে।

কুঙ্কু বললে,—'আহা, ভারি জান তুমি। সিকি টুকরো রুটি খেয়েই আমার পেট ভরে যায়, বাকি রুটি কি ফেলে দেব? তাই তোমার জন্য রেখে দিই।'

এতক্ষণে চাঁদ একটু উঠেছে, গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ঠান্ডা জ্যোৎস্না তাদের মুখে পড়েছে। সদাশিব বললে,—'আমি চলে গেলে কী করবি?'

কুঙ্কু এ কথার জবাব দিল না, বললে—'সকালেই চলে যাবে?'

সদাশিব বলল,—'হাঁ। তোর বাবা গাঁয়ের পাটিল, সে চলে যেতে বলেছে। যদি না যাই মেরে তাড়াবে। ভাবছি সকাল হবার আগেই চলে যাব?

কুঙ্কু বললে,—'কোথায় যাবে?'

সদাশিব কিছুক্ষণ পুরনপুরি চিবিয়ে বললে—'তা জানি না। কেউ বলে মোগলদের দলে যাও, কেউ বলে বিজাপুরীদের দলে যাও। তুই কী বলিস?'

কুঙ্কু বললে,—'আমি বলি তুমি পুনায় যাও, শিবাজির দলে যোগ দাও। শিবাজিকে লোকে ডাকাত বলে, কিন্তু তিনি সত্যি ডাকাত নন। তিনি বিদেশি শত্রুদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে লড়ছেন। তিনি যখন রাজা হয়ে বসবেন তখন দেশে সুখ শান্তি ফিরে আসবে।'

সদাশিব উৎসাহ ভরে বললে,—'তুই ঠিক বলেছিস কুঙ্কু, আমি শিবাজির দলে যোগ দেব। মোগল আর বিজাপুরীদের জ্বালায় পেট ভরে খেতে পাই না, ওদের দেশ থেকে তাড়াব।'

পুরনপুরি খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুঙ্কু সদাশিবের হাতে একটা থলি দিয়ে বললে,—'এটা নাও, পথে কাজে লাগবে।'

থলিতে কী আছে সদাশিব জিজ্ঞাসা করল না, থলিটা কাঁধে ফেলল, কুঙ্কুর কাঁধে হাত রেখে বললে,—'কুঙ্কু, এবার যাই। আবার দেখা হবে।'

কুঙ্কু বললে,—'এসো। আবার দেখা হবে।'

কুঙ্কু দাঁড়িয়ে রইল, সদাশিব বেরিয়ে পড়ল। সে আর ঘরে ফিরে যাবে না, সিধা পুনার দিকে যাত্রা করবে। আকাশে চাঁদ আছে, এই বেলা বেরিয়ে পড়াই ভালো। কিন্তু পুনার দিকে যেতে হলে গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সদাশিব গ্রামের ভিতর দিয়ে চলল। মরা জ্যোৎস্নায় অসার গ্রামটিও যেন মরে গেছে। সদাশিব একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তার চোখ ছলছল করতে লাগল।

কুঙ্কুদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সদাশিব দেখল, বিঠ্ঠল পাটিলের ঘোড়াটা বাড়ির সামনের মাঠে বাঁধা রয়েছে। ঘোড়াটার চেহারা দেখে দুঃখ হয়, হাড় জিরজির্ করছে। যে গাঁয়ে মানুষই পেটভরে খেতে পায় না, সে-গাঁয়ে ঘোড়াকে কে খেতে দেবে? গ্রীষ্মকালে বনের ঘাসও শুকিয়ে গেছে।

ঘোড়াটার পানে চেয়ে চেয়ে সদাশিবের মনে ভারি কষ্ট হল। আহা! ঘোড়াটা বোধ হয় বাঁচবে না, না খেতে পেয়ে মরে যাবে। এমন একটা জন্তু না খেতে পেয়ে মরে যাবে? তার চেয়ে—

সদাশিব একবার সতর্কভাবে চারিদিকে তাকাল। নিঃশব্দ নিশুতি গ্রাম, কোথাও সাড়া নেই। সে পা টিপে টিপে ঘোড়ার কাছে গেল, তার গলার রশি খুলে মুখে লাগাম বসাল, তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে চলল।

গ্রামের বাইরে গিয়ে সদাশিব ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, তারপর পুনার দিকে মুখ করে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

গ্রাম থেকে পুনায় যাবার কোনো সড়ক নেই, পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে যেতে হয়। তবে পুনা শহরটা কোন্ দিকে তা মোটামুটি সদাশিবের জানা ছিল। সে সেই দিকে চলল। পাহাড়ের গুহায় জঙ্গলে অনেক হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আছে—দলবদ্ধ শিয়াল, দলবদ্ধ নেকড়ে, বুনো

কুকুর, তরস। তরক্ষু বা হায়েনাকে এদেশে তরস বলে। কিন্তু সদাশিবের বরাত ভালো সে জন্তু-জানোয়ারের হাতে পড়ল না। জানোয়ারেরা বোধ হয় অন্যদিকে শিকারে বেরিয়েছে।

ক্রমে সকাল হল, চাঁদ ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে গেল, সূর্য উঠল। পাহাড়ি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালেও রাত্রিবেলা ঠান্ডা থাকে, দিনে গরম। সূর্য যত উঁচুতে ওঠে গরম তত বাড়তে থাকে। সদাশিবের ঘোড়াটা অনাহারে শীর্ণ, তবুও সে পাহাড়ি ঘোড়া, সদাশিবকে পিঠে নিয়ে পাহাড় ভেঙে চলেছে। কখনও চড়াই কখনও উতরাই, একের পর এক ঘাট আর উপত্যকা। দেখলে মনে হয় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ হঠাৎ জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে।

কোথাও জনমানব নেই। গ্রামের চিহ্ন নেই। একবার উপত্যকায় নেমে সদাশিব দেখল, ছোটো উপত্যকার নাবাল কোণে ঝরনার জল জমেছে, গ্রীষ্মের তাপে একেবারে শুকিয়ে যায়নি। ঘোড়াটাও দেখতে পেয়েছিল, সে বলগার ইঙ্গিত পাবার আগেই সেই দিকে ছুটল।

ছোট্ট ডোবার মতো জলাশয়, তাকে ঘিরে সবুজ ঘাসের পাড়। সদাশিব ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলি ভরে জল খেল, ঘোড়াটাও চোঁ চোঁ করে খুব খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে কচি ঘাস খেতে লাগল।

কিছু দূরে একটা পাথরের চাঁই উঁচু হয়ে ছায়া করেছিল, সদাশিব সেই ছায়ায় গিয়ে বসল। কুক্কু থলিতে কী দিয়েছে এখনও দেখা হয়নি।

থলিতে বেশি কিছু নেই। কয়েক মুঠো ভুট্টার দানা, মোটা মোটা দুটো বাজরির রুটি, আর একটা বজ্রের মতন কঠিন মুগের লাড়ু। সদাশিব খাবার জিনিসগুলো স্নেহভরে নিরীক্ষণ করতে করতে ভাবল—কুক্কু যা খাবার দিয়েছে তাতে একদিন কেন, দু-দিন চলে যাবে। সে কল্পনার চক্ষে দেখতে লাগল গ্রামে এতক্ষণে কী হচ্ছে। পাটিলের ঘোড়া অদৃশ্য হওয়ায় নিশ্চয় খুব হই চই পড়ে গেছে। সদাশিবের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে কয়েক মুঠি ভুট্টার দানা খেয়ে আবার পেট ভরে জল খেল, তারপর ঘোড়ায় চড়ে আবার চলল। ঘোড়াটাও ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ঘাস খেয়ে নিয়েছে।

দুপুরবেলা সদাশিব এক পাহাড়ের ডগায় উঠে ঘোড়া দাঁড় করাল। চারিদিকে চেয়ে দেখল, সূর্যের খরতাপে আকাশ বাতাস যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দূরে অনেকগুলো পাহাড়ের পরপারে একটা দুর্গের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কোন্ দুর্গ বলা যায় না। মহারাষ্ট্র দেশের পাহাড় পর্বতের খাঁজে খাঁজে কত দুর্গ আছে। কোনোটি বিজাপুরীদের দখলে, কোনোটি মোগলদের দখলে, আবার কোনোটি শিবাজি ছলে-বলে দখল করে নিয়েছেন। ওই দুর্গটা কার দখলে তা না জেনে ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাছাড়া ওখানে যেতে হলে কোন্ পথে কত পাহাড় ঘুরে যেতে হবে তা কে জানে। তার চেয়ে নাকের সোজাই যাওয়া ভালো।

সারাদিন সদাশিব চলল। খিদে পেলে ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই কিছু খেয়ে নিল। অবশেষে সূর্য যখন পাটে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় সে একটা নতুন উপত্যকায় পৌঁছল। বেশ বড়ো উপত্যকা, অনেক গাছপালা, মাঝখান দিয়ে একটা সরু নদী বয়ে গেছে। সদাশিব ভাবল, পুনার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, হয়তো মানুষের দেখা পাব। তা যদি নাও পাই, এখানে রাত কাটানো শক্ত হবে না। অনেক বড়ো বড়ো গাছ আছে।

উপত্যকায় নেমে এসে সদাশিব কিন্তু জনমানুষের সন্ধান পেল না। আগে এখানে গ্রাম ছিল, এখনও নদীর পাড়ে ছাইয়ের একটা চক্র তারই সাক্ষী দিচ্ছে, গ্রামবাসীরা শত্রুর আক্রমণে মরেছে, যারা পেরেছে পালিয়েছে। শত্রু গ্রাম লুট করে ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেছে।

নদীর পাড় থেকে জলের ধারে গিয়ে সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়ার লাগাম খুলে সামনের পা ছেঁদে দিয়ে ছেড়ে দিল। নদীর ধারে কচি ঘাস আছে। ঘোড়া তাই খাবে কিন্তু বেশি দূরে পালাতে পারবে না।

তারপর সে জলের ধারে পাথরের ওপর বসে পেট ভরে খাবার খেল, থলি প্রায় খালি হয়ে গেল। শুধু মুগের লাড়ুটা সে কালকের জন্য রেখে দিল। কাল লোকালয়ে পৌঁছুতে পারবে কি না বলা যায় না। কিছু রসদ থাকা ভালো।

খাওয়া শেষ করে সদাশিব গাছ খুঁজতে বেরুল। রাত্রে মাটিতে শোওয়া চলবে না, নেকড়ে, তরস আছে। গাছে উঠে রাত কাটানোই সবচেয়ে নিরাপদ। নদী থেকে খানিকটা দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছ রয়েছে, বুনো জাম গাছ। গাছের ডালে ডালে থোকা থোকা কালো ফল ফলেছে, গাছের তলায় ঝরে পড়া পাকা জাম বিছিয়ে আছে। সদাশিব দেখল এই গাছটাই উপত্যকার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গাছ, এতবড়ো গাছ আর একটাও নেই। সদাশিব আর দ্বিধা করল না। সে গাছে উঠে পড়ল। মাটি থেকে পনেরো হাত উঁচুতে একটি জুতসই ডালে বসে অন্য একটি ডাল ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে সে চোখ বুজল।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। সদাশিবের শরীরে সারাদিনের ক্লান্তি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মানুষের গলার আওয়াজে। সদাশিব চোখ খুলে দেখল আকাশে চাঁদ উঠেছে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, দু-জন লোক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ চোখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাদের সাজ পোশাক সৈনিকের মতো, হাতে বল্লম। সদাশিব নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগল তারা নিজেদের মধ্যে কথা কইছে।

একজন বললে, 'এসো মিঞা এই গাছতলায় পোঁতা যাক!'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'এই গাছের তলায় কেন? অন্য গাছ কী দোষ করেছে?'

প্রথম ব্যক্তি বললে, 'বুঝলে না, এই গাছটা এখানকার সব চেয়ে বড়ো গাছ। পরে যখন আমরা মাল উদ্ধার করতে আসব তখন খুঁজে বেড়াতে হবে না। জানা থাকবে যে-গাছটা সব চেয়ে বড়ো তার তলাতেই মাল পোঁতা আছে।'

'তা বটে। বেশ, তাহলে এখানেই গর্ত খোঁড়া যাক।'

দু-জনে বল্লমের ফলা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। তারা মারাঠি ভাষায় কথা বলছিল, তাই সদাশিব বুঝল ওরা মোগল নয়, বিজাপুরী দলের মুসলমান সিপাহি। তারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কথাবার্তা বলতে লাগল। পাথুরে মাটি সহজে খোঁড়া যায় না। একজন ক্লান্ত হয় তো অন্য জন খোঁড়ে। সদাশিব গাছের ওপর থেকে তাদের কথা শুনতে শুনতে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল।

বিজাপুরীদের একটা দুর্গ থেকে আর একটা দুর্গে খাজনা যাচ্ছিল। সঙ্গে পঞ্চাশজন রক্ষী ছিল। ডাকাতের ভয়ে দিনের বেলায় মাল চালান হয় না, রাত্রে হয়। আজ সন্ধ্যাবেলা এরা দুটো গোরুর গাড়িতে মোহর আর টাকা চাপিয়ে দুর্গ থেকে যাত্রা করেছিল। আশা করেছিল, ভোর হবার আগেই দুর্গে পৌঁছে যাবে, দুই দুর্গের মাঝে কেবল দশ বারো ক্রোশের তফাত। কিন্তু ডাকাতেরা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে এরা পারল না। রক্ষীদের মধ্যে কয়েকজন মারা গেল, কয়েকজন পালিয়ে গেল। ডাকাতেরা একটা গোরুর গাড়ির মাল লুটে নিল।

দ্বিতীয় গোরুর গাড়িটাকে তখনও একদল রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। ডাকাতেরা এবার সেটাকে আক্রমণ করল। কিন্তু আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের দলের একটা লোক গুরুতর আহত হলে, তার ঘোড়াটাও মারা পড়ল। সে বোধ হয় দলের নেতা। ডাকাতেরা তখন আহত নায়ককে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, দ্বিতীয় গোরুর গাড়িটাকে লুঠ করল না।

ডাকাতেরা যখন চলে গেল তখন রক্ষীদের মধ্যে মাত্র এগারো জন লোক আছে। পাঁচ-ছয় জন মারা গেছে, বাকি পালিয়েছে। এই এগারো জন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল—ডাকাতেরা তো একটা গোরুর গাড়ি লুটে নিয়ে গেছে, এরা এগারোজন দ্বিতীয় গোরুর গাড়ির মাল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে, তারপর কাল সদরে গিয়ে বলবে, দুটো গোরুর গাড়িই লুট হয়ে গেছে। কেউ আর অবিশ্বাস করবে না। দ্বিতীয় গোরুর গাড়িতে কেবল মোহর ছিল। এগারোজন নিজেদের মধ্যে মোহর সমান ভাগ করে নিয়ে যার যেদিকে ইচ্ছে চলে গেল। এরা দু-জন এখানে এসেছে, গাছের তলায় নিজেদের ভাগের মোহর পুঁতে রেখে সদরে ফিরে যাবে। তারপর সুযোগ-সুবিধা বুঝে এখানে ফিরে আসবে এবং গুপ্তধন তুলে নিয়ে যাবে।

সদাশিব গাছে বসে শুনল। সে চুপটি করে রইল, একটু নড়লে চড়লে এরা যদি টের পায় তাহলে তাকে কেটে ফেলবে। যা হোক, গর্ত খোঁড়া হলে ওরা দুটো থলি তার মধ্যে রেখে আবার মাটি চাপা দিল। তারপর কথা বলতে বলতে চলে গেল। সদাশিব শুনতে পেল একজন বলছে,—'সিপাহির কাজ আর নয়। এবার এই টাকা দিয়ে একটা দোকান খুলব, খুব বড়ো আতর গোলাপের দোকান। হবে না?'

অন্য সিপাহি বললে, 'আরে মিঞা, ওসব মতলব ছাড়ো। দোকান করলেই লোকের চোখ টাটাবে। তার চেয়ে চুপটি করে ঘরে বোসো গিয়ে, আর তোমাকে খেটে খেতে হবে না।'

'আমি তো মাল নিয়ে হজ করবার নামে বেরিয়ে পড়ব, একেবারে দিল্লিতে গিয়ে বসব। তারপর দুদিন যেতে না যেতেই দেখব ওম্‌রাহ হয়ে বসেছি। শোভানাল্লা।'

কথা বলতে বলতে তারা চলে গেল। সদাশিব অনেকক্ষণ কান খাড়া করে রইল। যখন দেখল কোনো দিক থেকে সাড়া-শব্দ আসছে না, তখন সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল।

গর্তের ঢিলে মাটি আঙুল দিয়ে খুঁড়তে বেশি কষ্ট হল না। গর্তের তলা থেকে দুটো থলি বেরিয়ে এল।

সদাশিব গুনে দেখল, প্রত্যেক থলিতে চারশো চকচকে সোনার টাকা। সে আগে কখনও সোনার টাকা দেখেনি, চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল।

এই সময় হঠাৎ পিছন দিকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। সদাশিব চমকে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রায় একশো গজ দূরে নদীর ধার দিয়ে একদল ঘোড়সওয়ার আসছে। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে না, কদম চালে আসছে, সদাশিব বিদ্যুদ্বেগে সোনার টাকাগুলো নিজের থলিতে ভরল, থলিটা শক্ত করে কোমরে বাঁধল, তারপর আবার গাছে উঠে বসল। গাছের তলায় বেশি আলো নেই, ঘোড়সওয়ারেরা বোধ হয় তাকে দেখতে পায়নি।

ঘোড়সওয়ারের দল সদাশিবের গাছের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন একজন সওয়ার হাত তুলে বললে—'দাঁড়াও।'

সকলে দাঁড়াল। সওয়ার বললে, 'নদীর কাছে ওটা কী জানোয়ার?'

আর একজন বলে উঠল, 'জয় ভবানী! ঘোড়া! এখানে ঘোড়া এল কোত্থেকে?'

আর একজন বললে,—'ঘোড়া! কোত্থেকে এল জানবার দরকার নেই। ধরে নিয়ে এস ঘোড়াটাকে। আমাদের দরকার।'

দু-জন সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে নদীর দিকে গেল। সদাশিব গাছের ওপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল। ওরা যে মারাঠা হিন্দু তা ওদের কথা শুনে বোঝা যায়। হয়তো যে ডাকাতের দল বিজাপুরীদের খাজনা লুঠ করেছে এরা তারাই। কিন্তু—এরা যদি সদাশিবের ঘোড়া নিয়ে চলে যায় তা হলে তো ভারি বিপদ। সদাশিব তাহলে শিবাজির কাছে যাবে কেমন করে? সদাশিব গাছের ওপর আর স্থির থাকতে পারল না। হোক ডাকাতের দল, তাই বলে তার ঘোড়া নিয়ে যাবে। সে গাছ থেকে নেমে এল। ঘোড়সওয়ারের দল হঠাৎ গাছ থেকে একটা লোক নেমে আসছে দেখে অবাক হয়ে গেল—'আরে! এ আবার কে?'

একজন বল্লম বাগিয়ে বললে,—'কে রে তুই?'

সদাশিব মোটেই ভয় পেল না, বললে,—'আমি তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' সওয়ারেরা সর্দারকে দেখিয়ে দিল, সদাশিব সর্দারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দারের বয়স বেশি নয়, বড়ো জোর কুড়ি একুশ। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, দুই হাতে একজন আহত লোককে সামনে ধরে আছে। সর্দার কোলের লোকটিকে বলছে,—'যেসা, তোমার কষ্ট হচ্ছে না?'

আহত ব্যক্তি বলছে,—'কিছুই কষ্ট হচ্ছে না। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দাও, আমি ঠিক যেতে পারব।'

এই সময় দু-জন সওয়ার সদাশিবের ঘোড়াটাকে এনে সর্দারের সামনে হাজির করল। তারা ঘোড়ার ছাঁদনদড়ি খুলে মুখে লাগাম লাগিয়েছে। সর্দার চোখ তুলল। প্রথমেই সদাশিবের দিকে তার চোখ পড়ল। সর্দার বললে,—'তুমি কে?'

'আমার নাম সদাশিব। তোমরা আমার ঘোড়া ধরেছ কেন?'

সর্দার বললে,—'ঘোড়ার মালিক তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমার বাড়ি ডোঙ্গরপুরে।'

'ডোঙ্গরপুরে! সে তো এখান থেকে অনেক দূর!' তুমি গ্রাম থেকে এতদূর এলে কী করে?'

'আমি শিবাজির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

সর্দার কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে সদাশিবের পানে চেয়ে রইল—'তাই নাকি? শিবাজির সঙ্গে তোমার কী দরকার?'

'আমি শিবাজির অধীনে যুদ্ধ করব।'

সর্দার এবার হাসল, বললে,—'তা বেশ। আমরাও শিবাজির দলের লোক। তুমি আমাদের সঙ্গে এসো না?'

'যেতে পারি। কিন্তু আমার ঘোড়া?'

'তোমার ঘোড়াটা আমাদের একটু দরকার আছে। দেখতে পাচ্ছ আমাদের দলের একজন জখম হয়েছে, ওর ঘোড়াটা মরে গেছে। তাই ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ঘোড়াটা পেলে ওকে তার পিঠে বসিয়ে দেব। কেমন, দেবে তোমার ঘোড়া? গড়ে পৌঁছে তুমি তোমার ঘোড়া আবার ফেরত পাবে।'

সর্দারের কথা বলার ভঙ্গি এত মিষ্টি না-বলা যায় না। সদাশিব রাজি হল, বললে,—'কিন্তু আমি যাব কী করে?'

সর্দার বললে,—'তোমাকে আমি নিজের ঘোড়ায় তুলে নেব। আমার ঘোড়াটা মজবুত আছে, দু-জনের ভার বইতে পারবে।'

তখন কয়েকজন সওয়ার ধরাধরি করে আহত লোকটিকে সর্দারের ঘোড়া থেকে নামিয়ে সদাশিবের

ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। সদাশিব সর্দারের পিছনে ঘোড়ার পিঠে বসল। ঘোড়সওয়ারের দল আবার আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করল।

চলতে চলতে সদাশিব লক্ষ্য করল, সর্দার ছাড়া অন্য সব সওয়ারের ঘোড়ার দু-পাশ থেকে লম্বা লম্বা ছালা ঝুলছে, দেখলেই বোঝা যায় ছালার ভিতর ভারি মাল আছে। সদাশিবের মনে আর সন্দেহ রইল না যে এরাই বিজাপুরীদের খাজনা লুঠ করেছে। সঙ্গে একজন আহত লোক রয়েছে, সবই মিলে যাচ্ছে।

সওয়ারের দল আবছায়া জ্যোৎস্নায় উপত্যকার ভিতর দিয়ে লম্বালম্বি চলল। সদাশিব দেখল এরা পাহাড়ের পিঠ বেয়ে বেশি উঠছে না, এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় যাবার গুপ্তপথ কোথায় আছে এরা সব অন্ধি-সন্ধি জানে। সেই সব সোজা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। চলতে চলতে সর্দারের সঙ্গে দু-চারটে কথা হল। সর্দার প্রশ্ন করলে, 'তুমি গ্রাম থেকে চলে এলে কেন?'

সদাশিব সরলভাবে বললে,—'মামা তাড়িয়ে দিয়েছে।' তারপর গ্রামের অবস্থা বর্ণনা করল।

শুনে সর্দার বললে,—'মারাঠি দেশে সর্বত্র এই অবস্থা. মোগলদের তাড়াতে না পারলে দেশের অবস্থা ফিরবে না।'

সদাশিব প্রশ্ন করল,—'তোমরা এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?'

সর্দার বললে,—'তুমি যখন শিবাজির দলে যোগ দিতে যাচ্ছ তখন তোমাকে বলতে দোষ নেই। আমরা বিজাপুরীদের খাজনা লুঠ করতে গিয়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হল না। সদাশিবের কোমরে যে লুঠের মোহর বাঁধা আছে তা সে বললে না। সর্দারকে বলে কী হবে? বলতে হয় একেবারে শিবাজিকে বলবে।

সদাশিব এবার প্রশ্ন করল,—'তোমরা এখন কোথায় যাচ্ছ?'

সর্দার বললে,—'আমরা তোর্ণা দুর্গে যাচ্ছি।'

'কিন্তু শিবাজি তো পুনায় থাকেন।'

'এখন তোর্ণা দুর্গে আছেন।'

'তোর্ণা দুর্গ কি শিবাজির?'

'কিছুদিন আগে বিজাপুরীদের ছিল, এখন শিবাজির।'

'শিবাজি ভারি বীর—না?'

'শিবাজির দলের সবাই বীর। তুমি শিবাজির দলে যোগ দিতে যাচ্ছ, তোমাকেও বীর হতে হবে।'

সদাশিব মারাঠা ছেলে, তার শরীরে ভয়ডর নেই, সে সহজভাবে বললে—'হব।'

ওরা যখন তোর্ণা দুর্গে গিয়ে পৌঁছাল তখন পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। উঁচু টিলার ওপর দুর্গ, লোহার দরজা। দু-জন সওয়ার বল্লমের কুঁদো দিয়ে দরজায় ঘা দিল—'হর হর মহাদেও।' অমনি দরজা খুলে গেল। সকলে দুর্গে প্রবেশ করল।

প্রথমেই আহত লোকটিকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে সর্দার এবং আরও কয়েকজন দুর্গের লোক ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। দুর্গের অঙ্গন ঘিরে ঘরের সারি, মানুষ থাকার ঘর, রান্নাঘর, আস্তাবল, সব আছে। সওয়ারেরা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার রাশ ধরে, আস্তাবলে নিয়ে গেল। সদাশিব একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। দুর্গে আরও অনেক লোক আছে। দু-চারজন স্ত্রীলোকও আছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, কেউ কুয়া থেকে জল তুলছে, কেউ কাঠ ফাঁড়ছে, কেউ তলোয়ারে শান দিচ্ছে, কেউ ঘোড়া দলাই মলাই করছে। মেয়েরা এক জায়গায় বসে জাঁতা ঘুরিয়ে জোয়ার-বাজারি পিষছে। সকলেই কাজ করছে। যে সওয়ারেরা ডাকাতি করতে গিয়েছিল তারা আবার আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের কাঁধে দুটি করে ছালা। তারা ছালাগুলিকে অঙ্গনের মাঝখানে জমা করল। তারপর একজন বয়স্থ কর্মচারী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ইনি বোধহয় শিবাজির খাজাঞ্চি। বড়ো বড়ো পাকা গোঁফ, পাকা গালপাট্টা, মাথায় নাকতোলা পাগড়ি-টুপি। ইনি এসে ছালা উজাড় করে পাথরের মেঝের উপর টাকা ঢাললেন। স্তূপাকার রুপার টাকা। সেকালে টাকাকে হোন বলত, এক হোন চার টাকার সমান।

খাজাঞ্চি গুনে গুনে হোন দু-ভাগ করলেন। সকলে ঘিরে দেখতে লাগল আর নিজেদের মধ্যে রঙ্গ-তামাসা করতে লাগল। সদাশিব একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল।

টাকা দু-ভাগ করে খাজাঞ্চি প্রথমে এক ভাগ ধামায় পুরে তোশাখানায় রেখে এল। ওটা শিবাজির অংশ। তারপর বাকি যারা সঙ্গে ছিল তাদের ভাগ বাঁটোয়ারা শুরু হল। চল্লিশজন জোয়ান লুঠ করতে গিয়েছিল, টাকা সমান চল্লিশ ভাগ হল। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল একশো আশি হোন। সবাই নিজের নিজের ভাগ নিয়ে চলে গেল।

সদাশিব চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল। কী মজার এদের জীবন। দলে যোগ দেবার জন্য তার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

এই সময় একজন বল্লমধারী রক্ষী এসে বলল,—'তোমার নাম সদাশিব? এসো, শিবাজি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

সদাশিব সঙ্গে সঙ্গে চলল। না জানি শিবাজি কেমন লোক। তিনি কি আমাকে নেবেন? যদি বলেন, তোমার বয়স কম, তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না।

একটি বড়ো ঘর, পাথরের মেঝে, পাথরের দেওয়াল, সরু সরু দুটি জানালা দিয়ে দুর্গের বাইরে দেখা যায়। শিবাজি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। হেসে বললেন,—'এসো সদাশিব'।

সদাশিব হাঁ করে তাকিয়ে রইল। যে সর্দারের সঙ্গে সে এক ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, সে-ই শিবাজি! এত কম বয়েস! এই বয়েসে সমস্ত দেশে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে! সে অবাক হয়ে বলল,—'তুমি শিবাজি?'

শিবাজি বললেন,—'তুমি ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছ দেখছি।—হাঁ আমিই শিবাজি।'

সদাশিব বললে,—'তুমি নিজে গিয়েছিলে লুঠ করতে?'

'হাঁ। নিজের কাজ আমি নিজেই করি।'

'তুমি একজন আহত লোককে কোলে করে আনছিলে?'

'ও আমার বাল্যবন্ধু যেসাজি কঙ্ক। ও যদি জখম না হত তাহলে দুটো গাড়িই লুঠ করতে পারতাম। কিন্তু সে যাক, তোমার বয়স কত?'

সদাশিব বললে,—'সতেরো কি আঠারো।'

শিবাজি বললেন—'বেশ, যুদ্ধ করবার বয়স হয়েছে, কিন্তু তোমার হাতিয়ার কই? হাতিয়ার না হলে কী দিয়ে যুদ্ধ করবে?'

সদাশিব হাঁ করে তাকিয়ে রইল—'হাতিয়ার?'

শিবাজি বললেন,—'হাঁ তলোয়ার বল্লম সাঁজোয়া এসব না হলে কি যুদ্ধ করা যায়?'

সদাশিব নিরাশ কণ্ঠে বললে,—'এসব তো আমার কিছুই নেই।'

শিবাজি বললেন,—'যারা আমার দলে যুদ্ধ করতে আসে তারা নিজের ঘোড়া আর হাতিয়ার নিয়ে আসে। এখনও সৈন্যদের ঘোড়া ও হাতিয়ার দেবার ক্ষমতা আমার হয়নি, যখন হবে তখন দেব। তোমার ঘোড়া আছে কিন্তু হাতিয়ার নেই। এই অবস্থায় কী করা যেতে পারে?'

হঠাৎ সদাশিবের মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ তার মনেই ছিল না যে তার কোমরে থলি মধ্যে সোনার টাকা আছে। সে লাফিয়ে উঠে বললে—'আমার টাকা আছে, সোনার টাকা!'

এই বলে কোমর থেকে থলি খুলে শিবাজির পায়ের কাছে সব মোহর ঢেলে দিয়ে বললে,—'রাও, এই নাও তোমার ভেট। আমাকে তোমার দলে ভরতি করে নাও।'

এবার শিবাজি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। শেষে বললেন,—'এত মোহর তুমি কোথায় পেলে?'

সদাশিব তখন মোহর পাওয়ার ইতিহাস বলল। শুনে শিবাজি খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন, 'সাবাস! আমরা লুটেছি রুপার টাকা আর তুমি লুটেছ সোনার মোহর। তোমার বুদ্ধিও আছে দেখছি। তোমার মতো লোক আমি চাই। সব মোহর আমাকে দিতে হবে না। তবে আমার এখন টাকার দরকার, তাই তোমার টাকা আমার তোশাখানায় জমা রাখলাম। যখন চাইবে তখন ফেরত পাবে। উপস্থিত একটি মোহর তুমি নিজের কাছে রাখো, এক মোহরে তোমার সমস্ত হাতিয়ার হবে। তুমি তলোয়ার খেলা জান?'

সদাশিবের বুক আবার দমে গেল। সে বললে, 'না।'

শিবাজি বললেন,—'সে জন্য ভাবনা নেই। আমার নাপিত জীবমহালা মহারাষ্ট্র দেশের সেরা তলোয়ারবাজ, সে তোমাকে তলোয়ার খেলা শেখাবে। এক মাসের মধ্যে তুমি শিখে যাবে।'

সদাশিব উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে,—'আমি কবে তোমার সঙ্গে লড়াই করতে বেরুব রাও?'

শিবাজি তার আগ্রহ দেখে হাসলেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন,—'তার এখনও দেরি আছে। সামনে বর্ষা এসে পড়ল। বর্ষার সময় কোনো কাজ হয় না। এই কয় মাসে তুমিও তৈরি হয়ে যাবে। তারপর দশহরার দিন বেরুব। কী বল?'

'হাঁ রাও।'

শিবাজি তখন খাজাঞ্চিকে ডেকে মোহরগুলো নিয়ে যেতে বললেন। আর তলোয়ারবাজ জীবমহালাকে ডেকে বললেন—'জীবা, তোমার একজন শাকরেদ এসেছে। ওকে ভালো করে তলোয়ার খেলা শেখাও।'

বাঘ

মনোজ বসু

বনকাপাসি গ্রামে এরকম অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কোনো দিন ঘটে নাই।

সকালবেলা তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে মহাশয় গাড়ু হাতে বাঁশবাগানের মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় যেন কেঁদো বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্যে গাড়ু ফেলিয়া তিন লাফে বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। ডাকটা কোন্ দিক হইতে আসিল তাহা সঠিক সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। কোন্ দিকে যে চূড়ান্ত নিরাপদ জায়গা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন, এমন সময় দেখা গেল জাল কাঁধে ছিদাম মালো উত্তর-মুখো বিলের দিকে চলিয়াছে।

—শুনিসনি ছিদাম?

ছিদাম কিছু শুনিতে পায় নাই।

—শেষকালে দিনমানেও কেঁদো ডাকতে আরম্ভ করল।

কথার মাঝখানেই পুনরায় বাঘের ডাক এবং যেন আরও একটু নিকট।

ছিদামের মাছ ধরা হইল না, ফিরিল, পা-গুলি একটু ঘন ঘন ফেলিয়াই। বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের বয়স হইয়াছে এবং বাতের দোষ আছে। তিনি তো দৌড়াইতে পারেন না—কোনোগতিকে মিত্তিরদের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, একপাশে পাইক নিমাই হুঁকা শোলক করিতেছে এবং ভিতরে মিত্তিরের সেজো ছেলে বুধো তারক চক্কোত্তির সঙ্গে দাবা খেলিতেছে। বাঁড়ুজ্যে বাঘের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিনজনেই জোয়ান। বুধো এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর হইতে সড়কি বাহির করিয়া আনিল, নিমাই পাইক লইল তাহার পাঁচহাতি লাঠি, এবং হাতের কাছে জুতসই আর কোনো অস্ত্র না দেখিয়া তারক চক্কোত্তি একটানে একটা বড়ো ডাল ভাঙিয়া কাঁধে করিল। তিন বীরপুরুষ বাহির হইয়া পড়িল—আগে তারক, মাজে বুধো, শেষ নিমাই।

ওই-ওই, আবার বাঘ ডাকে!

একেবারে পাড়ার মধ্যে। দিঘির পাড়ে কিংবা হলুদ ভুঁইয়ের মধ্যে। সর্বনাশ—দিনদুপুরে হইল কী। তারক পিছাইয়া পড়িল। মাত্র জিওলের ডাল সম্বল করিয়া গোঁয়ার্তুমিটা কিছু নয়। নিমাই কহিল,—ফেরা যাক সেজো কর্তা, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনি।

বুধো তাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু আর আগাইল না, সড়কিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সন্তর্পণে সেখানে দাঁড়াইল।

ওই—ফের!

একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে! আমবাগানের আড়ালে—দশ হাতও হইবে না। বাবারে! তারক ও নিমাই দৌড় দিল। বুধো একা একা কী করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে মোড় ঘুরিয়া সামনে আসিয়া পড়িল—

বাঘ নয়, দুজন মানুষ!

একজনের মাথার উপরে চৌকা লালচে রঙের কাঠের বাক্স, বাক্সর ওপর গামছায় বাঁধা পুঁটুলি। অপরের বাঁ হাতে হুঁকা, ডান হাতে অবিকল ধুতুরা ফুলের মতো গড়নের বৃহদাকার একটি চোঙা। সেই চোঙা এক-একবার মুখে লাগাইয়া শব্দ করিতেছে, আর যেন সত্যকার বাঘের আওয়াজ হইতেছে।

বুধো লোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের উঠানে দাঁড়াইল।

বাঁড়ুজ্যে তখনও সেখানে ছিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও দু-চারজন জুটিয়াছে। বাঘের গল্প হইতেছে—পাঠশালায় পড়িবার সময় একবার বাঁশের বাড়ি দিয়া ঘনশ্যাম মিত্তির একটা গো-বাঘার সামনের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন—সেই সব অনেক কালের কথা। গল্প ভালো জমিয়াছে, এমন সময় উহারা আসিল।

—কী আছে তোমার ওতে?

—গ্রামোফোন—গান আছে, এক্‌টো আছে, সাহেব-মেমের হাসি—একেবারে যেন ঠিক সত্যি, ছাদ ফেটে যাবে মশাই।

বাঁড়ুজ্যে বলিলেন—তুমি আর নতুন কী শোনাবে বাপু! আমাদের এই গাঁয়ে যাত্রা বল আর ঢপ-কবি-বৈঠকি বল, কোনো কিছুই বাকি নেই। গেল বারেও ঠাকুরবাড়ি যাত্রা হয়ে গেল—নীলকণ্ঠ দাসের দল। নীলকণ্ঠ দাসের নাম শোনোনি—হাকোবার নীলকণ্ঠ?

রাম মিত্তির বলিলেন—সাহেব-মেম তো ইংরাজিতে হাসে। ও ইংরাজি-মিংরাজি আমরা কেউ বুঝতে পারব না। তবে গান—এক্‌টো,—তা তুমি কি একলাই সব কর? কীসের দল বললে তোমার?

চোঙা হাতে লোকটি বলিল—গ্রামোফোন—কলের গান। আমি কিছু করব না মশাই, সব এই কল দিয়ে করাব।

বলিয়া সে সঙ্গীর মাথার বাক্সটি দেখাইল।

প্রিয়নাথ থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল। গ্রাম সুবাদে রাম মিত্তিরের ভাইপো বলিয়া তাহার সামনে তামাক খায় না। একটা শেষ টান মারিয়া একটু আগাইয়া হুঁকাটা অশ্বিনী শীলের হাতে দিয়া সে বলিল—তোমার ওই বাক্স এক্‌টো করবে? কাঠে কখনও কথা কয়? মন্তোর-তন্তোর জানো নাকি?

বামুনপাড়ার নিত্যঠাকরুন দিঘির ঘাটে স্নান করিয়া ঘড়া কাঁখে ঘটি হাতে সবেগে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পথের সকল অশুচিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন।

কথাটা তাঁহর কানে গেল। মন্ত্র থামাইলেন না, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃত্তান্তটি শুনিলেন।

এ পাড়া ও পাড়ায় অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া গেল—মিত্তিরবাড়ি এক আশ্চর্য কল আসিয়াছে তাহা মানুষের মতো গান গায় ও এক্‌টো করে। খুকিরা এবং যেসব ছেলে পাঠশালায় যায় না, সকলেই ছুটিল। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা অবশ্য এমন গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করিল না—তবু দেখিতে গেল।

চোঙাওয়ালা লোকটার নাম হরষিত—জাতে পরামানিক। উঠানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু নিতান্তই নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতেছে : এত যে লোক জমিয়াছে তাহার যেন নজরেই আসিতেছে না। চক্কোত্তিদের খুঁচি খানিক আগে আসিয়াছে। আঙুল দিয়া টেপিকে দেখাইয়া দিল, ওই সেই কল। কিন্তু টেপিকে বোকা বুঝাইলেই হইল! ছোটো চৌকা কাঠের বাক্স—উহাই নাকি আবার গান গায়। যাঃ!

সকলে রাম মিত্তিরকে ধরিয়া বসিল—তুমি কায়েতদের সমাজপতি, এ গান তোমাকে দিতে হবে। রাম মিত্তিরের হইয়া সকলে দর কষাকষি আরম্ভ করিল। টাকায় আটখানি করিয়া গান, দু-টাকায় সতেরো খানা অবধি হইতে পারে—তার বেশি নয়। এক্‌টোর দর অন্যত্র হইলে বেশি হইত। কিন্তু এতগুলি ভদ্রলোক যখন বলিতেছেন, তখন তা আর কাজ নাই। মোটের উপর হরষিতের বিবেচনা আছে। এক টাকায় নয়খানি রফা হইল।

তখন পকেট হইতে একটা চক্‌চকে গোলাকার বস্তু, হাতল, কাঁটার কৌটা প্রভৃতি বাহির করিয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া চৌকা বাক্সে হরষিত সেগুলি পরাইয়া ফেলিল, চোঙাটিও বাক্সের গায়ে বসাইল। তারপর গামছার পুঁটুলি খুলিয়া হাত-আয়না, চিরুনি ও কাপড় সরাইয়া বাহির করিল কালো পাতলা পাথর—

কাহারও আর নিশ্বাস পড়ে না।

হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—বায়নার টাকা দিন। অগ্রিম দেবেন না, বলেন কী মশাই? আমার সাহেব বাড়ির কল—

থালায় করিয়া টাকাটি ঠিক আসরের মধ্যস্থলেই রাখা হইল, যে যে পেলা দিতে চাহিবে, তাহাদের কাহারও যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয়। তারপর হরষিত কলের উপর একখানা পাথর বসাইয়া টিপিয়া দিল, আর পাথর চরকির মতো ঘুরিতে লাগিল। তারপর সেই ঘুরন্ত পাথরে যেই আর-একটা মাথা বসাইয়া দেওয়া, অমনি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল তবলা, বেহালা, ইংরাজি বাজনা, ঢোল, করতাল—বোধ করি পৃথিবীতে সুর-যন্ত্র যা কিছু আছে সবগুলিই।

ইতিমধ্যে হই হই করিয়া একপাল ছেলে আসিয়া পড়িল, এই উপলক্ষে পাঠশালা ছুটি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেরা আর কতটুকু গণ্ডগোল করিতে পারে? কলের মধ্যে যেন এক কুড়ি পাঠশালায় একত্রে সমস্বরে নামতা পাঠ হইতেছে। হাঁ—কল যে সাহেববাড়ির, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরষিত বলিয়াছিল—ছাত ফেটে যাবে, সেটাই বুঝি সত্য-সত্য ঘটিয়া বসে।

কিন্তু এত যে গোলযোগ, পাথরখানা বদলাইয়া দিতেই চুপচাপ। ক্রমশ শোনা গেল চোঙের ভিতর হইতে একলা গলায় গীত হইতেছে—ধিনতা ধিনা পাকা নোনা। একেবারে স্পষ্ট আর অবিকল মানুষের গলা। মানুষ দেখা যায় না, অথচ মানুষই গাহিতেছে।

মন্টুর অনেকক্ষণ হইতে মনে হইতেছিল, ওই চোঙের ভিতর কাহারা বসিয়া বাজাইতেছে—ঠিক তাহার বুড়ো দাদু যেমন দুলিয়া দুলিয়া তেহাই দিয়া থাকেন, তেমনি আবার তেহাই দেয়। এবারে গান শুনিয়া তাহার আর এক ফোঁটা সন্দেহ রহিল না।

চোঙের অধিবাসী সেই গায়ক ও বাদক-সম্প্রদায়কে দেখিতে ছেলেদের দল ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু কলের ভিতর হরষিত এমনি করিয়া দলসুদ্ধ পুরিয়া ফেলিয়াছে যে কাহাকেও দেখিবার জো নাই।

বাঁড়ুজ্যে ঠিক সামনে বসিয়াছেন। গান-বাজনার আসরে এই স্থানটি তাঁহার নিত্যকালের। বনকাপাসিতে কত মজলিস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ওস্তাদ তো একজনও আসিল না যে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের পায়ের ধুলা না লইয়া চলিয়া যাইতে পারিল।

প্রিয়নাথ বলিল—ও বাঁড়ুজ্যে মশায়, গান-বাজনায় চুল তো পাকালেন, কত গানই গেয়ে থাকেন, এমন সুর-লয় শুনেছেন কখনও? নাপ্‌তের পো ডাকিনি-সিদ্ধ, অপ্সরি-কিন্নরী ধরে এনে গান গাওয়াচ্ছে যেন।

গানের পর গান চলিল। একটা গানের এক জায়গায় ভারি তানের প্যাঁচ মারিতেছিল। অশ্বিনী শীল অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল—কী কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানি! দেবতা-টেবতা-বেহ্ম-বিষ্টুর চেয়ে ওরা কম কীসে? বাঁড়ুজ্যে মশায়, আপনার সেতারের টুং-টাং আর রামপ্রসাদীগুলো এবার ছাড়ুন।

কলের বলবান রাগিণীর তলায় অশ্বিনীর গলা চাপা পড়িল, বাঁড়ুজ্যে তাহার সদুপদেশ শুনিতে পাইলেন না।

কিন্তু বাঁড়ুজ্যের আর কী আছে ওই সেতারের টুং-টাং ছাড়া? চকমিলানো পৈতৃক প্রকাণ্ড বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে—চামচিকার বসতি। সেখানে থাকিবার লোক তিনটি—মন্টু, তার দিদিমা এবং তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে স্বয়ং। নারানিও ছিল—সেই সকলের শেষ। সাত বছর আগে মন্টুকে ছ-মাসের এতটুকু রাখিয়া সেও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। ছয়-ছেলের মা বাঁড়ুজ্যেগিন্নি একে একে সবকটিকে বিসর্জন দিয়া এই শেষের ধন মরা-মেয়ের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পাড়ার সকলে আসিয়া আর সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু বাঁড়ুজ্যের চোখে জল নাই। রাম মিত্তির কাঁদ কাঁদ গলায় কহিলেন—বুক বাঁধো বাঁড়ুজ্যে, ভগবানের লীলা। তখন বাঁড়ুজ্যে স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন—ওই যে অবুঝ মেয়েমানুষ উঠোনের ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, ওকে গিয়ে তোমরা প্রবোধ দাও—আমার কাছে আসতে হবে না, ভাই। শুধু তিনি তাকের উপর হইতে সেতারটি নামাইয়া দিতে বলিলেন।

এতকাল বাদে কিনা অশ্বিনী শীল তাঁহাকে সেতার বাজনা ছাড়িয়া দিতে বলিল।

এক একটা গান হইয়া গেলে হরষিত কাঁটা বদলাইয়া আগের কাঁটা ফেলিয়া দিতেছিল। তাই কুড়াইতে ছেলেমহলে কাড়াকাড়ি। একবার আর একটু হইলে মন্টু কলের উপর গিয়া পড়িত। হরষিত তাড়া দিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্যে মন্টুকে ডাক দিলেন—তুই দাদু আমার কাছে আয়—এসে ঠান্ডা হয়ে বোস তো।

নারানির সেই ছ-মাসের মন্টু এখন কত বড়ো হইয়াছে।

কিন্তু মন্টু আসিল না, উহার অনেক কাজ। কাঁটা কুড়ানো তো আছেই, গানও লাগিতেছে বড়ো ভালো। তাছাড়া চোঙের ভিতর বসিয়া যে গায়ক গাহিতেছে, তাহার মূর্তি-দর্শন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ এখনও ঘটে নাই।

যখন ভালো করিয়া বুলি ফুটে নাই, বাঁড়ুজ্যে তখন হইতে মন্টুকে তবলার বোল শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় রাম মিত্তির প্রভৃতি দু-চারজন বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি গিয়া বসেন। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি বাদলা এক একদিন এমন চাপিয়া পড়ে যে কেহ বাড়ির বাহির হইতে পারে না। না পারুক, তাহাতে এমন কিছু অসুবিধা ঘটে না। সেদিন মন্টুর সেতার-শিক্ষা আরও বিপুল উদ্যমে চলে। ভারি তাল কাটে, লজ্জা পাইয়া মন্টু বলে—বুড়োদাদা, আজ আর হবে না, ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুম পাইলেই হইল। লাউয়ের খোলের ভিতর হইতে সুর আদায় করা সোজা কর্ম নয়।

অশ্বিনী পাল বনকাপাসির সুবিখ্যাত সংকীর্তনের দলে খোল বাজাইয়া থাকে। উল্লসিত হইয়া সে পুনশ্চ বলিয়া উঠিল আজই বাড়ি গিয়ে খোলের দল ছিঁড়ে খড়মে লাগাব। মরি মরি,—কী কীর্তনটাই গাইল রে। আমাদের গানের পরে আজ ঘেন্না হয়ে গেল।

রাম মিত্তির ক্ষীণ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—মন দিয়ে শুনেছ বাঁড়ুজ্যে? অন্তরার দিকটায় তালে গোলমাল করে গেল না?

বলিয়াছিল বটে আমির খাঁ ওস্তাদ বাঁড়ুজ্যের কান ভালকুত্তার মাফিক। খাঁ সাহেব অনেক কায়দা করিয়াও বাঁড়ুজ্যের কানকে ফাঁকি দিতে পারে নাই, কারচুপি ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। দিল্লিওয়ালা আমির খাঁ অবধি ভুল করিতে পারে, কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য কাঠের বাক্সর গানে একবিন্দু খুঁত ধরিবার জো নাই। রাম মিত্তির তালের কিছু বোঝেন না, তিনি ভুলের কথা বলিলেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বাঁড়ুজ্যে কী ভুল ধরিবেন?

বিকালেও আর এক বাড়ি বায়না—কামারপাড়ায়। মন্টু শুনিতে গিয়াছে, বাঁড়ুজ্যের মাথাটা কেমন টিপ টিপ করিতেছিল বলিয়া যাইতে পারেন নাই। আধঘুমের মধ্যে বাঁড়ুজ্যের মনে হইল, কে যেন আসিয়া কপাল টিপিয়া দিতেছে আর ডাকিতেছে—বাবা! মেজছেলে মানিকের গলা না? দশ বছরেরটি হইয়াছিল। গোলাঘাটার বড়ো ইস্কুলে পড়িতে যাইত। কিন্তু মানিক নয়, মানিক গিয়াছে ঘুড়ি উড়াইতে—নারানি-নারানি। নারানি ডাকিতেছে—বাবা, বাঘ এয়েছে—খোকাকে ধরল যে!

নারানি মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে।..... ঘরের মধ্যে বাঘ? সেতারের তাল কাটিয়া গেল। মারো সেতারের বাড়ি বাঘের মাথায়—মারো-মারো। মন্টুকে ছাড়িয়া বাঘ সেতার কামড়াইয়া ধরিল, তার ছিঁড়িল, চিবাইয়া চিবাইয়া আগাগোড়া একেবারে তছনছ। তা যাক, মন্টু কই?—মন্টু! বাঁড়ুজ্যে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—মন্টু!

মন্টু গান শুনিয়া ফিরিয়াছে। তাহার আর আনন্দ ধরিতেছিল না। বলিল—বুড়োদাদা, তুমি গান শুনলে না—আমরা শুনে এলাম, দুই টাকার গান। এবেলা আরও খাসা খাসা। তুমি অমনি ভালো করে গাও না কেন দাদা?

বাঁড়ুজ্যে কহিলেন—ভালো গাইনে?

মন্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না! তুমি গাও ছাই—বুধোকাকারা বলেছে।

বাঁড়ুজ্যে একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপব যেন কত বড়ো রসিকতার কথা—প্রবলবেগে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—জানিসনে ও মন্টু, জানিসনে—ও যে কোম্পানি বাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? গোটা জেলাটা জুড়ে ওদের রাজ্যি, আর আমি ব্রহ্মোত্তরের খাজনা পাই মোটে একান্ন টাকা সাত আনা—বলিতে বলিতে সেতারটা পাড়িয়া লইলেন।

মন্টু বলিল—সেতারে কত ঝঞ্ঝাট, কলের গান আপনা-আপনি বাজে। আমাকে একটা কলের গান এনে দিতে হবে।

বাঁড়ুজ্যে বলিলেন—দেব, বুঝলি দাদু, কলের গান দেব আর সেই সঙ্গে কলের হাত-পা-নাক-চোখওয়ালা একটা নাতবউ—কী বলিস?

বলিতে বলিতে গলাটা যেন বুজিয়া আসিল, তবু বলিতে লাগিলেন—ওস্তাদের কত গালাগালি খেয়েছি, সরস্বতী ঠাকরুনকে কত চিনির নৈবিদ্যি খাইয়েছি। এখন আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। তোরা যখন বড়ো হবি মন্টু, ততদিনে সরস্বতী, দুর্গা, কালী, শালগ্রামটা পর্যন্ত কলের হয়ে যাবে। খুব কলের পুজো করিস।

সন্ধ্যা গড়াইয়া যায়। আজ বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি কেহ আসে নাই। মন্টুও নাই। কেবল রাম মিত্তিরের খড়মের ঠকঠক সিঁড়িতে শোনা গেল।

—কী বাঁড়ুজ্যে, একা একা খুব লাগিয়েছ যে! সুরটা পূরবী বুঝি?

বাঁড়ুজ্যে তদ্‌গত হইয়া সেতার বাজাইতেছিলেন। বলিলেন—দোসর কোথায় পাই ভাই? চাঁদা তুলে ঠাকুরবাড়িতে আবার কলের গান দিচ্ছে—মন্টু গেছে সেখানে। একা একাই বাজাচ্ছি, কেমন লাগছে বলো তো?

রাম মিত্তির বলিলেন, এখন রেখে দাও, এসব তো রোজ শুনব। চলো. ঠাকুরবাড়ি যাওয়া যাক। বাঁড়ুজ্যেকে লইয়া রাম মিত্তির ঠাকুরবাড়ির আসরে বসিলেন। হরষিতের কলে ইতিমধ্যে দু-খানি গান সারা হইয়া একটো শুরু হইয়াছে :

কী করিলি অবোধ বালিকা?
সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান—

চেহারা তো দেখা যায় না, তবে হাঁ—গলা শুনিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বক্তা ভীম, রাবণ বা অন্ততপক্ষে তস্য পুত্র মেঘনাদ না হইয়া যায় না।

বাঁড়ুজ্যে বলিলেন—তুমি বাপু, একখানা পূরবী বাজাও তো?

হরষিত ঘোর প্যাঁচের মানুষ নয়, জবাব সোজা করিযাই দিল—হুকুম-টুকুম চলবে না মশাই, যা বাজাই শুনে যান—আমার সাহেববাড়ির কল।

অতএব সাহেববাড়ির কলের যেরূপ অভিপ্রায় হইল, বনকাপাসিব সমুদয় শ্রোতা তটস্থ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। ইহা আমির খাঁ ওস্তাদের মজলিস নয় যে ফরমায়েশ খাটিবে।

অকস্মাৎ ঘটর ঘটর ঘ্যাস্! গান থামিয়া গেল। কলের কোথায় কী কাটিয়া গিয়াছে। এতগুলি শ্রোতা বিরসমুখে বসিয়া রহিল। যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া হরষিত কাঠের বাক্সটা খুলিয়া আল্‌গা করিয়া ফেলিল।

কলের ভিতর মানুষ নাই, কেবল লোহালক্কড়।

হরষিত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু মেরামত হইল না। তখন থালা হইতে বায়নার টাকা ও পেলার পয়সা তুলিয়া লইয়া উলটোগাঁটে ভালো করিয়া গুঁজিয়া সে বলিল—রাত্তিরে আর নজর চলে না মশাই। সকালেই ঠিক করে বাকি গানগুলো শুনিয়ে দেব, কিরূপা করে মশাইরা সকলে পদধূলি দেবেন।

ঠাকুরবাড়িতে গ্রামস্থ সকল মহাশয়েরই সকালে যথাসময়ে ভিড় হইল। কিন্তু হরষিত নাই, কলের গান নাই, এমনকী নিতা ঠাকরুনের পিতলের ঘটিও নাই। জল খাইবার জন্য হরষিতকে ঘটিটি দেওয়া

মিথ্যাচার

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রামেব ইস্কুলে মাস্টারি করতে এলেন বিনয় সান্যাল।

ছোটো ইস্কুলের ছোটো মাস্টাব। টিকিটের ওপর সই করে রসিদ লিখতেন পঞ্চাশ টাকার, কিন্তু পেতেন মাত্র তিরিশ টাকা।

নিজে এই কাজ করতেন আর ছাত্রদের বলতেন,—যদি বড়ো হতে চাও তো জীবনে কোনোদিন মিথ্যাচার কোরো না।

এই কথা শুনে একদিন একটা বখাটে ছাত্র তাঁকে খুব বিপদে ফেলে দিলে। বললে,—তা যদি বলছেন তো স্যার, আমাদের গাঁয়ের নুটু বোরেগি এত বড়ো হল কেমন করে?

—কেন? নুটু কী করেছে?

ছাত্রটি বললে, —হরদম মিছে কথা বলছে। রানিগঞ্জে যে জিনিস এক টাকায় কিনে আনছে, এখানে সেই জিনিস বিক্রি করছে দেড় টাকায়। নুটু বোরেগির মস্ত বড়ো গোলদারি দোকান, আর সুদের কারবার।

বিনয়বাবু হেসে বললেন,—ব্যবসায় দোষ নেই। ব্যবসা করতে গেলে মিছে কথা বলতেই হয়।

ছেলেটার ইচ্ছে ছিল আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার। ইচ্ছে ছিল আরও কীসে কীসে দোষ নেই জেনে নেবার।

কিন্তু পারলে না জিজ্ঞাসা করতে। বিনয়বাবু বই খুলে পড়া ধরে বসলেন।

কথাটাকে বিনয়বাবু তখনকার মতো চাপা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজের মনেও তখন সেই এক প্রশ্ন : জীবনে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করলে দোষ হয় না?

রাত্রে বিনয়বাবুর ভালো ঘুম হল না। বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে তিনি তাঁর মনের মতো করে সে প্রশ্নের মীমাংসাও করে ফেললেন।

জীবনে বড়ো হওয়া মানে বড়োলোক হওয়া। আর বড়োলোক হওয়া মানেই ধনবান হওয়া।

অবশ্য আর এক রকমেরও বড়ো হওয়া আছে। চরিত্রবান হওয়া, সৎ হওয়া, পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। তাতে শ্রদ্ধা পাওয়া যায়, সম্মান পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থ পাওয়া যায় না।

সেরকম বড়ো তিনি হতে চান না। শুধু শ্রদ্ধাসম্মানে পেট ভরবে না।

তিনি চান টাকা। তিনি চান সুখ। জীবনকে তিনি উপভোগ করতে চান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো পবিত্র প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ টাকার রসিদ লিখে তিরিশটি টাকা উপার্জন করতে যদি কোনো অপরাধ না হয় তো কোনো মিথ্যাচারেই কোনো অপরাধ নেই।

বিনয়বাবু বিবাহ করেননি। স্ত্রী নেই, তবু তাঁর কষ্টের সীমা নেই। সে কষ্ট তাঁকে দূর করতেই হবে।

তিরিশ টাকা মাইনের স্কুল টিচার মনে মনে একদিন এই সংকল্প করে বসলেন।

নুটু বোরেগিকে একদিন দেখে এলেন বিনয়বাবু। নাকে-কপালে তিলক আঁকা, গলায় তুলসীর মালা।

সোনার গয়না বন্ধক দিতে এসেছে একটি মেয়ে। তারই সুদের হিসেব করছে।

তিলক ফোঁটা কেটে তুলসীর মালা পরে সে নিজে যা নয় তাই সেজে বসে আছে। ধার্মিক মানুষের মুখোশ পরেছে।

যৎসামান্য উপার্জনের আর একটি পথ ছিল বিনয়বাবুর।

আগে যেখানে ছিলেন সেখানে লোকজনকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন।

সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স আর বইগুলি সঙ্গে এনেছিলেন। ভেবেছিলেন রুগি পেলে এখানেও চিকিৎসা করবেন।

একদিন একটি রুগি পেলেন। তাঁরই ইস্কুলের একটি গরিব ছাত্রের হল অসুখ। একটি পাথরের বাটিতে জল দিয়ে তারই সঙ্গে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ মিশিয়ে তাকে তিনি খাইয়ে দিলেন।

ছেলেটি সেরে উঠল।

সে যে হোমিওপ্যাথি ওষুধে সেরেছে বিনয়বাবু সেকথা বললেন না। বললেন, তিনি একটি স্বপ্নাদ্য মন্ত্র জানেন। এ সেই সর্বরোগহর মন্ত্রপূত জল।

কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। প্রথমে সেই গ্রামের মধ্যে, তারপর গ্রামান্তরে।

প্রতিদিন নানা রকমের রুগি আসতে লাগল তাঁর কাছে। সবাইকে তিনি সেই মন্ত্রপূত জল দিতে আরম্ভ করলেন। মাথায় রাখলেন বড়ো বড়ো চুল। গোঁফ-দাড়ি কামালেন না। কপালে লাল একটি সিঁদুরের ফোঁটা কাটতে লাগলেন। গলায় পরলেন একটি রুদ্রাক্ষের মালা।

রাত্রে ঘরের ভেতর খিল বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা হোমিওপ্যাথি বই পড়েন। লোকে জানল গোপনে তিনি তন্ত্র-সাধনা করছেন।

রোজগার মন্দ হয় না, হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে যে রোজগার হত, এতে তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার হয়। মন্ত্রপূত জলের দাম তিনি নেন না। রোগীরা ভক্তিভরে মায়ের প্রণামি দিয়ে যায়।

এইবার ইস্কুলের চাকরিটি বিনয়বাবু ছেড়ে দিলেন। সবিনয়ে হাত জোড় করে হেডমাস্টারমশাইকে তিনি জানালেন, মায়ের আদেশ—এখন আর আমি কোনোরকম মিথ্যাচার করতে পারব না।

মিথ্যাচারটি কী হেডমাস্টারমশাই তা জানেন। পঞ্চাশ টাকার রসিদ সই করে তিরিশ টাকা নেওয়া তাঁর পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।

সত্যই তো। এমন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে সে অনুরোধও আর করা চলে না।

বিনয় সান্যালের ওপর হেডমাস্টারের শ্রদ্ধা যেন আরও বেড়ে গেল।

এদিকে আর এক সমস্যা। ইস্কুলের যে ঘরখানি তাঁকে দেওয়া হয়েছে সে ঘরখানি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে।

কোথায় তিনি যাবেন ভাবছেন, এমন দিনে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

নুটু বোরেগির এক ভগ্নিপতি এল সেই গ্রামে। পায়ে তার একটা দগ্‌দগে ঘা হয়েছে। ডাক্তারি চিকিৎসা করিয়েছে, অনেক ওষুধ লাগিয়েছে, অনেক ওষুধ খেয়েছে, কিছুতেই সারছে না। সে নাকি শুনেছে এই গ্রামে একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন, তার জলপড়া খেলে নাকি সব রোগ সেরে যায়।

বিনয় সান্যালের ডাক পড়লো নুটু বোরেগির বাড়িতে।

নুটুর ভগ্নিপতি বড়োলোক। বললে, আমার এই অসুখটি আপনি সারিয়ে যদি দিতে পারেন আপনাকে আমি ভালো টাকা দেব।

বিনয়বাবু বললেন, টাকা আমার নেবার উপায় নেই—মায়ের আদেশ। তবে মায়ের প্রণামি বাবদ কিছু দিতে পারেন। মায়ের একটি মন্দির করবার ইচ্ছে আছে আমার।

সে ইচ্ছা বিনয়বাবুর পূর্ণ হয়েছিল।

নুটু বোরেগির ভগ্নিপতির পায়ের ঘা সারতে এক মাস লাগল।

বিনয়বাবুকে সে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে।

সেই বিনয়-সাধুর নাম শুনেই আমি গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে।

কয়লাকুঠির দেশে ছোট্ট একটি শহরের এক প্রান্তে 'ভবানী মন্দির'। সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানীর সেবায়েৎ বিনায়ক-সাধু।

অনেকে বলে—সাধু মহারাজ।

সাধু-মহারাজের মন্ত্রপূত জল খেলে মানুষের সব রকম রোগ সেরে যায়। হাত আর মুখ দেখে জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবকিছু তিনি বলে দিতে পরেন। মা-ভবানীর প্রসাদি পুষ্প এবং কবচ ধারণ করলে মানুষ তার দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তি লাভ করে।

এই সব শুনেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম নিজের জীবনের কথা কিছু জানার উদ্দেশ্যে।

গিয়ে দেখলাম আমারই মতো বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক রোগশয্যায় শুয়ে আছেন। শরীরের বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে। চুলদাড়ি সব সাদা। একটিও দাঁত নেই, সব দাঁত বাঁধানো।

আমি গিয়ে কাছে বসতেই তিনি আমার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর যে লোকটি তাঁর পায়ে ধীরে-ধীরে হাত বুলোচ্ছিল সে লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে আমার অতীত জীবনের এমন সব কথা তিনি বলতে লাগলেন যা শুনে আমি একেবারে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

এই সাধুজি-মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করব কিনা ভাবছি, এমন সময় তিনি ম্লান একটু হেসে হঠাৎ আমার নাম ধরে ডেকে বসলেন।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে বসে আছি, মহারাজ বললেন, এখনও চিনতে পাবছ না আমাকে? আমি বিনয় সান্যাল। বিলাসগঞ্জের ইস্কুলে একসঙ্গে পড়েছি, ক্লাসে ফার্স্ট হতাম বলে—

আর বলবার দরকার হল না। আমাদের ইস্কুলেব সবচেয়ে ভালো ছেলে এই বিনয় সান্যালের বয়স তখন সতেরো কি আঠারো। সেই বিনয় এখন বৃদ্ধ। চিনব কেমন করে?

বললাম, এতক্ষণে চিনেছি ভাই। তুমি ছিলে সব চেয়ে গরিব।

হ্যাঁ।—বিনয় বললে, পিসির বাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছি। মা নেই, বাপ নেই, সুখ কাকে বলে জানিনি, সুখের মুখ কোনোদিন দেখিনি। পয়সার ওপর ছিল অসম্ভব লোভ।

তুমি ছিলে খুব বুদ্ধিমান।

বিনয় বললে—সেই বুদ্ধিই আমার সর্বনাশ করেছে। সেই বুদ্ধি দিয়ে এই দ্যাখো না কী করেছি। এখন এই পৃথিবী থেকে চলে যাবার দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই ভাবছি—মিথ্যা দিয়ে প্রবঞ্চনা দিয়ে সারা জীবন ধরে যে অর্থ আমি উপার্জন করেছি, সে পাপের বোঝা কোথায় নামিয়ে দিয়ে যাব? সঙ্গে তো কিছুই নিয়ে যেতে পারব না।

শেয়াল কেন হুক্কা হুয়া করে

সুনির্মল বসু

তিল-সংক্রান্তির দিন সাঁওতালরা ভালো খাওয়া-দাওয়া করে, দল বেঁধে জঙ্গলে শিকার করতে বেরোয়। ওই হল ওদেব উৎসব।

একবার এই তিল-সংক্রান্তির দিন, একদল সাঁওতাল শিকাব করবার জন্য একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলে ঢুকেছে। এখন, সেই বনে ছিল মস্ত এক বাঘ। সে দেখলে গতিক ভালো নয়। এখানে বেশিক্ষণ থাকলেই সাঁওতালদের তির

তার পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলবে। এই ভেবে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা ছিল। এক কাঠুরিয়া কাঠ কেটে তার গোরুর গাড়িতে বোঝাই করে সেই রাস্তা দিয়ে রোজ বাড়ি ফিরে যেত। সে দিনও বেচারা তার গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ির পথে চলেছে, এমন সময় বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে এসে বলল—"কাঠুরে ভাই, কাঠুরে ভাই, আজ আমাকে তুমি বাঁচাও। সাঁওতালরা দেখতে পেলে এখনি আমায় সাবাড় করে ফেলবে। আজ যদি তোমার কৃপায় প্রাণে বাঁচতে পারি, তবে কোনো দিন তোমার অনিষ্ট তো করবই না, বরং চিরদিন তোমার গোলাম হয়ে থাকব"।

কাঠুরিয়া গরিব হলেও তার প্রাণটা ছিল বড়ো ভালো। অন্যের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদত। সে তাড়াতাড়ি একটা থলির ভিতর বাঘকে ভরে ফেলল আর আশ্বাস দিয়ে বলল—"বাঘ ভাই, তোমার আর কোনো ভয় নেই।"

শিকার শেষ করে সাঁওতালরা সেই পথ দিয়ে নিজের নিজের গ্রামে চলে গেল। থলির ভিতর যে বাঘ আছে তা তারা জানতেই পারল না।

তারা চলে গেলে কাঠুরিয়া থলির মুখ খুলে দিল, আর অমনি বাঘ বেরিয়ে এসে চোখ দুটো লাল করে বলল—"আগে তোকেই খাই কি আগে গোরু দুটোকেই খাই?"

কাঠুরিয়া বেচারা তো হতভম্ব। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল—"সে কী ভাই, উপকারের প্রতিদান কি এই?"

বাঘ দাঁত কড়মড় করে বলল—"তা নয় তো কী, জিজ্ঞাসা করো না এই বটগাছটাকে।"

সেখানে এক প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, সে সমস্তই দেখেছিল। সে বললে—"উহুঁ ভাই; উপকারীর উপকার কেউ করে না। এই দেখো না, মানুষে আমার ছায়ায় বসে আবার আমারই ডাল কেটে নিয়ে যায়।"

বাঘ বলল—"কেমন কাঠুরিয়া, এইবার তোকে খাই?"

কাঠুরিয়া আর কী বলবে? সে বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

এমন সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। বাঘ বলল—"আচ্ছা, এই শেয়ালমামা যা বলবে তাই হবে।"

শেয়াল এসে সমস্ত কথা শুনল, তারপর ঘাড় নেড়ে বলল—"উহুঁ, ব্যাপারটা নিজের চক্ষে না দেখলে, কিছুই বলতে পারব না। বাঘকে আবার সেই থলির মধ্যে ঢুকতে হবে।"

বোকা বাঘ অমনি থলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আর শেয়াল আচ্ছা করে তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে কাঠুরিয়াকে বলল—"ন্যায় বিচার যদি চাও, তবে শিগ্‌গির বড়ো দেখে একটা মুগুর নিয়ে এসো।"

এতক্ষণে কাঠুরিয়ার সাহস আবার ফিরে এসেছে। সে একটা প্রকাণ্ড মুগুর এনে ধাঁই ধাঁই করে সেই থলির ওপর এমন মার দিলে যে, বাঘ একেবারেই ছাতু হয়ে গেল।

তারপর কাঠুরিয়া শেয়ালকে বললে—"ভাই, তোমার উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু—আর এই বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ তোমাকে তামাক খাবার জন্য একটা হুকা উপহার দেব।" এই বলে কাঠুরিয়া বাড়ি চলে গেল।

শেয়াল সেই দিন থেকে হুকার অপেক্ষায় বসে রইল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তাই যখনই তার হুকার কথা মনে পড়ে তখনই চিৎকার করে—"কই হুকা, হুকা ক্যা হুয়া, হুকা ক্যা হুয়া—"।

গম গম

সুনির্মল বসু

আজগুবিপুরে ছিল নামজাদা চোর—নাম ছিল তার আগড়ুম। কত লোককে যে সে ঠকিয়েছে তার আর শেষ নেই।

একদিন আগড়ুম বাজারে চলল গুড় বেচতে। হঠাৎ অবুঝনগরের মোড়ে আর একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হল। তার পিঠে দড়ি দিয়ে একটা তরোয়াল বাঁধা।

আগড়ুম বললে—"তুমি কে ভাই?"

লোকটি বললে,—"আমি বাগড়ুম। তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়?"

আগড়ুম উত্তর দিলে,—"আমার নাম আগড়ুম, বাড়ি আমার আজগুবিপুরে। গুড় বেচতে বাজারে চলেছি।"

বাগড়ুম বললে, "ভাই, আমি এই তরোয়ালটা বেচতে চলেছি। এটা আমার নিজের হাতে তৈরি। খুব ভালো, আর মজবুত। অনেক টাকা এর দাম।"

আগড়ুম বললে, "ভাই, তুমি আমার এই গুড়ের হাঁড়িটা নাও আর আমাকে তরোয়ালখানা দাও। আমার পাড়ায় ভয়ানক চোরের উৎপাত।"

বাগড়ুম বললে, "বেশ, আমাদের পাড়াতেও ভালো গুড়ের খুব অভাব।"

তারপর দু-জনে দুটি জিনিস অদলবদল করে নিয়ে গেল।

বাড়ি গিয়ে বাগড়ুম খানিকটা গুড় তুলে দেখল—ঈস্ হাঁড়িতে পচা গোবর ঠাসা! নাকে কাপড় দিয়ে পালাতে হয়। উপরে শুধু কিছু ভালো গুড়। আগড়ুম তো তাকে আচ্ছা ঠকিয়েছে!

এদিকে আগড়ুম বাড়ি ফিরে এসে ভারি খুশি হয়ে যেই তরোয়াল খুলল; অমনি দেখে, ভিতরে তরোয়াল-টরোয়াল কিছুই নেই, একটা সরু লিক্‌লিকে কাঠি।

দু-জনেই ভেবেছিল দু-জনকে বেশ ঠকিয়েছে।

আগড়ুম আজগুবিপুরের চোর আর বাগড়ুম আজবনগরের ঠগ্। বাগড়ুমের কাছে ঠকে গিয়ে আগড়ুম প্রতিজ্ঞা করল, তাকে ঠকাতেই হবে!

একদিন শীতকালে বিকেলবেলা আগড়ুম কিছু পচা ডিম নিয়ে বাগড়ুমের বাড়ি হাজির হল।

"বাগড়ুম, বাড়ি আছ হে?"

আগড়ুমের গলা চিনতে পেরে বাগড়ুম বললে,—"আরে, এসো এসো ভাই আগড়ুম। সেই তোমার টাট্‌কা গুড় দিয়ে এমন চমৎকার পিঠে করে খেয়েছিলাম যে কী বলব ভাই! এত পেট ঠেসে সেই পিঠে খেয়েছিলাম যে অসুখ হয়ে গেছে।"

আগড়ুম বললে—"ভাই, তোমার তৈরি তরোয়াল এত চমৎকার আর ধারালো যে তার তুলনা হয় না। যত চোর আর ঠগ সব ওই তরোয়ালের ভয়ে দেশ ছেড়ে পিটটান দিয়েছে। যাই হোক ভাই, আজ মানস সরোবরের দুধ-হাঁসের টাটকা তাজা ডিম এনেছি—কিছু রাখো। এমন ডিম ত্রিভুবনে মেলা ভার।"

বাগড়ুম বলল, "বেশ ভাই, আমি ডিম বড্ড ভালোবাসি, তুমি সব ডিমই আমাকে দিয়ে দাও ভাই! অসুখে ভুগছি, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না! ওই কোনার থলেটায় টাকা আছে, তোমার ডিমের যা দাম তা নিয়ে যাও।"

এই বলেই বাগড়ুম কাঁথা গায়ে দিয়ে হি হি করে কাঁপতে লাগল।

এদিকে ঘরের কোণে থলি-টলি কিছুই ছিল না। ছিল এক খুব বড়ো ভীমরুলের চাক। অন্ধকারে টাকার থলি ভেবে যেই আগড়ুম হাত দিয়েছে আর যায় কোথায়, বড়ো বড়ো ভীমরুল চারদিক থেকে এসে তাকে এমন কামড় দিতে লাগল যে, আগড়ুম প্রাণের দায়ে একবারে পগার পার।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দাদার কাছে পদে পদে এই হার আর মিনু কিছুতেই সইতে পারছে না। দাদা যা খুশি চাল দিয়ে বেড়ায় আর তার ইস্কুলের বিষয়ে একটা কোনো কথায় কেউ একবিন্দু উৎসাহ দেখায় না। মেয়ে বলে তার অনেক দুর্গতি। দাদা এবার ফোর্থ ক্লাসে প্রমোশন পেয়ে বড়ো ইস্কুলে উঠে গেছে—এখন থেকে তাকে দস্তুরমতো গাড়ি ঘোড়া বাস মোটর বাঁচিয়ে ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয় বলে তার কী আদর! আর সে কিনা এখনো জুজুর ভয়ে গাড়িতে চড়ে

ইস্কুল করছে! তাকে দিয়ে পৃথিবীর কোন্ কাজটা হবে শুনি? দাদা একদিন এরোপ্লেনে চড়ে বিলেত যাবে আর সে বাড়িতে বসে বসে উনুন ফোঁয়াবে, বার্লি জ্বাল দেবে, কাঁথা সেলাই করবে—মা তো অহর্নিশ এই বলেই বকে চলেছেন। যেখানে দাদার জন্যে আসছে একটা ফাউন্টেন পেন, সেখানে তার জন্য বড়োজোর এক গজ রিবন, দাদার জন্যে যেখানে দু-আনার টিফিন, সেখানে তার জন্য বরাদ্দ মাত্র এক পয়সার আলুকাবলি। কিছু বলতে গেলেই মা ধমকে ওঠেন,—ও ছেলে, ও বড়ো হয়ে কত পয়সা রোজগার করে আনবে! তোরা মেয়েরা তো খালি শুষে নিস—তোদের জন্যে যা খরচ, সে তো জলে ফেলা।

কিন্তু মেয়ে হয়েছে বলে এই অপমান মিনু আর সইতে পারছে না। সে বড়ো হতে পারবে না, এমন কোনো কথা আছে নাকি? ক্লাসের পরীক্ষায় এবার তো সে সেকেন্ড হয়েছে। দাদা ছুটে এসে বললে, জানি, দুজনের মধ্যে তো? আজ্ঞে না, তাদের ক্লাসে গোনাগুনতি বত্রিশটি মেয়ে। দাদা তবু নিরস্ত হবে না, টিপ্পনি কেটে বলবে—ভারি তো স্ট্যান্ডার্ড—একশোর মধ্যে কুড়ি পেয়ে ফার্স্ট হয়। আমাদের ছেলেদের কথায় তাকে সোজাসুজি ফেল করা বলে।

দাদার সঙ্গে কথায় সে পেরে ওঠে না, তাই অগত্যা সে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে বসে। দাদা তক্ষুনি ঠাট্টা জুড়ে দেয়—মেয়েরা কেবল কাঁদতেই পারে, আমরা হলে কাজে দেখিয়ে দিতুম। ওই কান্না আর এস্রাজ বাজানো ছাড়া তোরা আর কী করতে পারিস, সত্যি করে বল দিকিন?

ঈস্! মেয়ে হয়েছে বলে মিনু তো অমনি ভেসে আসেনি! বয়সে না হোক, দাদার চেয়ে সে কোনো অংশে কম নয়, তার হাতেও পাঁচটা করে আঙুল আছে। বেশ, তাই সে প্রমাণ করবে। পড়ে পড়ে আর সে দাদার বিদ্রূপ সইবে না। বাড়ির যত আদর দাদাকে, আর শাসন ফলাবার বেলায় এই মিনু! তাকে দিয়ে বাবা-মার টাকা পয়সার দিক থেকে কোনো লাভ নেই, সে তাই একটা খোলামকুচির সমান। আচ্ছা, মিনু দেখে নেবে, কাচের মতো সে ঠুনকো নয়, মনে মনে তার অসীম জোর।

সেদিনের ব্যাপারটা ভারি সঙ্গিন হয়ে দাঁড়াল। মিনুদের গানের শিক্ষয়িত্রী হঠাৎ বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর বিদায় নেবার উপলক্ষে মেয়েদের দিয়ে ছোটো-খাটো একটা নাচ আর ট্যাব্‌লো হবার কথা। মিনুর অবিশ্যি একটা পার্ট আছে, এবং তাদের হেড্ মিস্ট্রেস বলে দিয়েছেন যে, যারা প্লে করবে তারা যেন একখানা করে নতুন ধোলাই শাড়ি নিয়ে আসে। রঙে ছুপিয়ে নিতে হবে। অতএব মিনুর একখানা নতুন শাড়ি চাই এবং এক্ষুনি তা কিনে ডাইং-ক্লিনিং-এর দোকানে দিয়ে আর্জেন্ট ধুইয়ে আনতে হবে।

কথাটা সে পাড়ল গিয়ে বাবার কাছে, কিন্তু টিপ্পনি কাটতে এল দাদা—একেবারে কোরা শাড়ি কিনতে হবে তোকে কে বললে? নিয়ে তো যাবি কাচিয়ে, তোদের হেড্ মিস্ট্রেস বুঝবে কী করে যে পুরোনো না আনকোরা? যেমন তোর বুদ্ধি, কী শুনতে কী শুনিস তার ঠিক নেই।

মিনু রেগে লাল হয়ে বললে, না, আমার নতুন শাড়ি চাই। তুমি কেন সব তাতে সর্দারি করতে আস? তুমি মেয়ে-ইস্কুলের জান কী?

দাদা বললে, জানি, মেয়েগুলো হচ্ছে বোকা—যেমন খুশি তাদের বাঁদর-নাচ করানো যায়।—নতুন শাড়ি কাচো, তারপর রঙে ছুপিয়ে নাচো। দাদা একেবারে হেসে চৌচির।

ছল-ছল চোখে মিনু বাবার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করল। বাবা তাকে উলটে ধমকে উঠলেন, এই মেয়েটার ফ্যাশনের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে গেলাম। দাঁড়া কালই আমি তোর নাম কাটিয়ে আনছি।

ধমকের ধাক্কায় মিনু নাকে-মুখে কেঁদে উঠল, আর অমনি দাদা ধুয়ো ধরল—নতুন শাড়ি কাচো, তারপর রঙে ছুপিয়ে নাচো। নাচতে যদি না পার তো আঁচল ভরে হাঁচো।

ফল হল এই, মিনুর আর পার্ট করা হল না। দাদার জন্যে সেদিনও একটা ওপ্‌ন-ব্রেস্ট কোট এসেছে, আর তার বেলায় একখানা শাড়ির জন্যে বাবার ব্যাগে পয়সা নেই! দুত্তোর ছাই, এ বাড়িতে সে আর একদিনও থাকবে না, যে দিকে চোখ যায় সটান বেরিয়ে পড়বে। তার জন্যে যখন কারও মায়া নেই, তখন তাদের জন্য তার দুঃখ করতে ভারি বয়ে গেছে।

আজ রবিবার, বিকেল পাঁচটায় তাদের প্লে। নাচের কতকগুলি কায়দা সে মুখস্থ করে রেখেছিল, কিছুই তার দেখানো হল না—বাড়িতে বসে থেকে মুখ বুজে এই লজ্জা সে বইবে কী করে? না, আজই সে বেরিয়ে পড়বে—মা-বাবা বুঝুন, মেয়ে হয়েছে বলে নিতান্ত ফ্যাল্‌না নয়। তাকে আর ফিরে আসতে না দেখে দাদারও চোখ দুটো এক সময় ছলছল করে উঠুক।

কিন্তু কোথায় সে যাবে? দাদা অনেকদিন চাল দিয়ে বেড়িয়েছে যে খালাসি হয়ে নাকি বিলেত চলে যাওয়া যায়—জাহাজে নাকি ছোটো ছোটো ছোকরা চাকরের দরকার। কিন্তু সে যে নেহাত মেয়ে। হলই বা না হয় মেয়ে, তার ছেলে সাজতে কতক্ষণ? দাদার সেই সুট পরে মাথায় টুপি এঁটে বেরিয়ে পড়লেই হল! তার তখনকার চেহারার কথা মনে

করতেই মিনু ফুর্তিতে নেচে উঠল। হ্যাঁ, ছেলের পোশাকে বেরিয়ে পড়লেই ভালো—চট্ করে কিছু কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। এমনি ফ্রক পরে বেরুলে ধরা পড়তে তার বড়োরাস্তায়ও যেতে হবে না। মেয়ে হওয়ার কত অসুবিধে। তা হোক, সে যে এই ফাঁকে সুট পরতে পারবে এই ঢের।

দাদার ট্রাঙ্কের চাবিটা ওই পেরেকে লট্‌কানো আছে। ট্রাঙ্ক খুলে মিনু দাদার পাম্‌বিচের সুটটা বার করলে। কোটটা তার গায়ে বেশ হয়, কিন্তু প্যান্ট?—এক লাফে সে দাদার মতো অত লম্বা হয় কী করে? কুছ পরোয়া নেই। তার পায়ের ঝুলটা মেপে নিয়ে মিনু প্যান্টের ওপর সরাসরি কাঁচি চালালে—কল চালিয়ে তাতে মুড়ি ভেঙে নিতে কতক্ষণ? দুপুর বেলা মা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন, বাবা কোর্টে, দাদা গেছে বন্ধুর বাড়ি ক্যারম খেলতে। আসুক না একবার ফিরে—মিনু প্যান্ট পরে কোমরে বেল্ট বাঁধতে লাগল—মিনু চলে গেছে দুঃখ না করলেও অন্তত তার সুট নেই, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে। কেমন মজা!—দাদা তখন কেঁদে খুন, নাইকো কোট-প্যান্টালুন।

তারপর জুতো—একটু ঢলঢলে হচ্ছে বটে, তা ন্যাকড়া ঢুকিয়ে মিনু তার পায়ের মাপে জুতসই করে নিলে। কিন্তু চুল? চুল নিয়ে হল তার ভাবনা। মেয়েদের অনেক ঝঞ্ঝাট। এত রাজ্যের চুল নিয়ে তার কী হবে? কিন্তু নিজের হাতে মানান-সই করে বব্‌ই বা সে করে কী করে? থাকগে—কতদিনের চেষ্টায়, কত মাথা ঘসে এই চুল সে এমন ফাঁপিয়েছে ফুলিয়েছে, তা কেটে ফেলবার চিন্তায় তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। থাকগে—রুমাল দিয়ে বেশ আঁট করে বেঁধে সে তাতে টুপি চাপাল। চুলের জন্যে সামান্য বড়ো টুপিটা দিব্যি খাপে খাপে বসে গেছে দেখছি।

বাঃ! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে মিনু নিজেকে আর চিনতে পারছে না! 'হ্যালো, হাউ ডু ইউ ডু?' বাঃ, একেবারে খাঁটি সাহেব, খালাসির পোস্ট তার মারে কে? তারপর কিন্তু পয়সা, না? মিনু তার সাবানের ফাঁকা বাক্স ঘেঁটে দেখল, মোটে সাড়ে চার আনা জমেছে সাত দিনে। তাই সই। জুতো মশমশিয়ে মিনু সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল—সদর পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়, শিরদাঁড়া খাড়া করে। তারপর গ্যাটগ্যাট করে চলল মিনু—দুনিয়ার কারও তোয়াক্কা রাখে না। তবে একটা কথা, কাউকে গুড্‌মর্নিং বলে টুপি তোলা চলবে না—তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে।

বড়োরাস্তায় পড়ে মিনু ট্রাম-মোটরের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠল। হ্যাঁ, দাদা একা রাস্তা পেরোতে পারে, সে পারবে না? আর ওই তো পাঁচ নম্বরের বাস—ওই বাসে সে গেল বছর ন-দিকে আনতে বাবার সঙ্গে হাওড়া গিয়েছিল। আর জাহাজের খালাসি হতে চাও বা খানসামাই হতে চাও—হাওড়া তোমায় যেতেই হবে। অতএব, মিনু হাত তুলে ড্রাইভারকে বললে, বাঁধ্‌কে!

হ্যাঁ, বাসের টিকিট সে কাটবে বইকি, পয়সা তার নিজের কাছেই আছে। টিকিট কেটে মিনু দেখলে পকেটে আর মোটে দুটি আনি। এ দিয়ে সে কোন্ দূর দেশ জয় করে আসবে না জানি, তবু তার পকেটে আট পয়সা এখনো আছে, পৃথিবীতে কত মহাপুরুষ তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে একেবারে রিক্ত হাতেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে পয়সা নেই বলে পিছিয়ে থাকবে— তেমন ভীরু মেয়ে মিনু নয়।

হাওড়া স্টেশনে নেমে মিনুর মাথা ঘুরে গেল। সেই বিরাট জনতার সমুদ্রে পড়ে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এখন কোথায় সে যায় কাকে সে ডাকে। ফ্যালফ্যাল করে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল। বাড়ি ফিরে যাবারও উপায় নেই, পকেটে দু-পয়সা কম। তা ছাড়া এ পোশাকে এখন বাড়ি ফিরে গেলে দাদা আর তাকে আস্ত রাখবে না, যে কাঁচিতে সে তার প্যান্টালুনের পা কেটেছে, সেই কাঁচিতে দাদা তার কান কেটে দেবে নিশ্চয়। না, বাড়ি ফেরার নাম সে মনেও আনবে না—ওই বাড়িতে তার কেউ নেই। ভাইয়ের মধ্যে ওই এক দাদা—তাই তাকে ঘিরেই যত আদর উথলে উঠছে—আর সে হল কিনা মার ষষ্ঠ কন্যা! তার আর আর বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে, তাই হাতের কাছে মিনুকে পেয়ে তারই ওপর যত ধমক আর হুমকি। না, সে এই অবিচারের প্রতিশোধ নেবে, সে কখনো বাড়ি ফিরে যাবে না! যা থাকে অদৃষ্টে, সে তার নিজের পায় ভর করে দাঁড়াবে।

সারি সারি প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ফটকের সামনে বিস্তর ভিড়। ওই নম্বরের ট্রেনটাই বোধহয় আগে ছাড়বে। মিনু ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দলে পড়ে কখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে তার খেয়াল ছিল না—হয়তো পরনে তার সাহেবি পোশাক দেখেই তাকে সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়েছে কিংবা ওই বড়ো দলটার সঙ্গে মিশে যাওয়াতে আলাদা করে তার কাছে কেউ টিকিট চায়নি। মিনু বুক ফুলিয়ে হেঁটে একটা ইন্টার ক্লাসের কামরায় এসে উঠল। গাড়িতে ভিড় থাকলে কী হবে, এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোকরাটিকে দেখে সামনের বেঞ্চিতে একটি বুড়ো ভদ্রলোক তার বিছানা গুটিয়ে তাকে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিল।

ট্রেন তারপর সময় বুঝে ছেড়ে দিল। যাত্রীদের ভাঙা ভাঙা কথা-বার্তা শুনে মিনু বুঝতে পারছে গাড়িটা চলেছে

কাশী—কিন্তু সেটা যে কতদূরে মিনু তার দুই চোখে কোনো কূল পাচ্ছে না। তারপর বেলা যতই গড়িয়ে গিয়ে চারিদিক অন্ধকারে কালি হয়ে উঠতে লাগল, ততই তার, বলতে লজ্জা হয়, ভীষণ কান্না পেতে লাগল। জানলার বাইরে চেয়ে মিনু দেখতে পেল, গাছপালা আকাশ-মাটি সব তার থেকে অবিশ্রান্ত দূরে সরে যাচ্ছে—সামনে তার আঁকড়ে ধরবার আর কিছু নেই। তাকে না পেয়ে বাড়িতে বাবা-মা কেমন দিশেহারা হয়ে উঠেছেন সেই কথা ভাবতেই কান্নায়—তার সমস্ত শরীর তোলপাড় করে উঠল। কিন্তু না, কাঁদবে কী! বাবা-মা বুঝুন, একবার হারিয়ে গেলে তার দাম কেমন এক-নিমেষে ছেলেব সমান হয়ে ওঠে।

না, এত সহজেই সে মুষড়ে পড়বে না। ওই ভদ্রলোকের ল্যাজ ধরে সে কাশী—কাশীই সই। সেখান থেকে আবার সে নতুন পথ খুঁজে নেবে। বেরিয়ে এসে আবার যদি সে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যেই হাত-পা ছুঁড়তে থাকে তো সবাই তাকে একবাক্যে বলবে,—দুয়ো! একবাক্যে বলবে, মেয়ে! বিপদে পড়ে বিপদকে বশ করতে না পারলে সে আবার একটা মানুষ কী!

কিন্তু আসানসোলে হঠাৎ টিকিট-চেকার উঠতেই মিনুর মুখ ব্লটিং কাগজের মতো সাদা হয়ে এল। ত্রস্ত চোখে কামরার চারদিকে সে চাইতে লাগল, কেউ তার হয়ে একখানা হাফ-টিকিট দেখায় কিনা। কিন্তু সে গুড়ে বালি। চেকার শেষকালে তারই কাছে এসে হাত পাতলে—টিকিট?

মিনু চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, টিকিটের আমি কী জানি? এইটুকু ছেলের কাছে টিকিট থাকে নাকি?

চেকার বললে, তবে তোমার টিকিট কার কাছে আছে দেখিয়ে দাও।

মিনু বেমালুম তার পাশের বুড়ো ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিয়ে বললে, কই, আমর হাফ-টিকিটটা দেখাননি?

ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন, বিঘত খানেক হাঁ করে বললেন, হাফ-টিকিট? ছোঁড়া বলে কী! তোমার টিকিট আমি কোথায় পাব?

মিনু ভড়কে গিয়ে বললে, কোথায় পাবেন তার আমি কী জানি। ছেলেমানুষদের টিকিট বড়োদের কাছেই থাকে। আমি তো আর নিজে রোজগার করি না।

ভদ্রলোক জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মারমুখো হয়ে বললেন, তোর টিকিট আমার কাছে থাকবে কেন? আমি তোর কে? আমার সঙ্গে তোকে নিয়ে যাব কোন্ আক্কেলে?

তারপর সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, বাপের জন্মে আমি একে চিনি না। ছোটো বলে খাতির করে তখন একটু জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলুম বলে এখন একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পা চালাতে চাইছে!

গাড়িময় তুমুল শোরগোল পড়ে গেল। চেকার মিনুর আরও সামনে এসে গর্জন করে উঠল—তুমি কোথায় যাবে?

মিনু ঘাড় উঁচিয়ে চেকারের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে, তা আমি কী জানি!

চেকার রুক্ষ গলায় বললে, তবে কে জানে?

সেই বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে ছোট্ট আঙুল বাড়িয়ে মিনু বললে, ও।

ও তোমার কে হয়?

মিনু ঢোঁক গিলে বললে, ও আমার জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই? ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠছিলেন, ওই ম্লেচ্ছ ছেলের আমি জ্যাঠামশাই? পাজিটা বলে কী! আমার নাম বলো দিকি?

মিনু বললে, তা আপনিই ভালো বলতে পারবেন।

ভদ্রলোক রেগে বলতে গেলেন, শুনুন কথা! আমার নাম জানে না, ধাম জানে না,—দিব্যি ভাইপো ফলাচ্ছে। আচ্ছা, তোর বাবার নাম কী? তা তো জানিস!

মিনু স্বচ্ছন্দে বললে, শ্রীমোহিতকুমার বসু।

বসু! ভদ্রলোক গাড়ি ফাটিয়ে হেসে উঠলেন, আর আমার নাম হচ্ছে শ্রীশিবপদ সান্যাল। এই দেখুন আমার পইতে। সুটকেসের ওপর এই দেখুন আমার নাম পেস্ট করা—S. P Sanyal। আমার দুনিয়ায় কোনো ছোটো ভাই-ই নেই—আব আজ কিনা আমি হঠাৎ জ্যাঠামশাই হয়ে গেলুম!

সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে আবার তিনি হাঁক পাড়লেন—এ ছেলে কাব সঙ্গে এসেছে?

কার সঙ্গে আবার! সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, এ গাড়িতে কেউ এর অভিভাবক নেই মশাই।

চেকার মিনুর সামনে হাত নেড়ে ফের গর্জন করে উঠল, বলো তোমার টিকিট কোথায়?

ততক্ষণে মিনুর চোখে জল এসে গেছে। লোকগুলি কী নিষ্ঠুর—অসহায় একটা ছেলের বিপদে কেউ এগিয়ে বুক দিয়ে সাহায্য করতে আসছে না। কয়েকটা তো মোটে টাকা—সে বড়ো হয়ে নিশ্চয় সেই ঋণ শোধ করে দিত। এতটুকু কারও মায়া নেই! মিনু উঠে দাঁড়িয়ে আরেকটি ভদ্রলোককে লক্ষ করে বললে, আপনি আমার টিকিটটা দয়া করে কিনে দিন না! আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে আমিও না হয় যাব।

ও বাবা! কী সর্বনাশ! সেই কোণের ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।—কেন, আমি কেন তোমার টিকিট কাটতে যাব? আমি কী দোষ করলাম!

জ্যাঠামশাই ছেড়ে এবার মামা পাকড়ালে নাকি? চেকার চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল। এ তো দেখছি ভারি দুঁদে ছেলে!

ভদ্রলোক দুজন সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, জোচ্চোর, জোচ্চোর—এতটুকু বয়স থেকেই জোচ্চুরিতে হাত পাকাচ্ছে। ভীষণ ধড়িবাজ, পাকা পকেটমার।

চেকার ফের হুংকার দিলে—শিগ্‌গির তোমার লোক দেখিয়ে দাও। নইলে এইখানেই নামিয়ে দেব বলছি!

ততক্ষণে মিনুর কান্না এসে গেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, ওদের ভেতর থেকে কেউ বাজি না হলে আমি লোক পাব কোত্থেকে?

আচ্ছা দাঁড়ান—একটা কথা মনে হতেই মিনুর মনে সাহস এল। বললে—আমার সঙ্গে আসুন দেখি অন্য কামরায় লোক পাই কিনা।

বলে সে সুড়ুত করে দরজা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

পালাল, পালাল! ধর ওই প্যান্টলুন-পরা ছোঁড়াকে—বিনা টিকিটে ট্রাভল করছিল, ধর, ধর, ওকে। বলে চেকার তাকে তাড়া করলে।

মিনু মোটেস পালাচ্ছিল না। সত্যিই সে প্ল্যাটফর্ম ধরে দৌড়ে গাড়িতে চেনা লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ পেছনে একটা শোরগোল শুনে চম্‌কে সে চেয়ে দেখল ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

ভয় পাওয়া খরগোশের মতো মিনু ভাসাভাসা চোখে ট্রেনের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল। ততক্ষণে চেকার তার ডান হাতটা নিজের বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধরেছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে বলল, এইটুকু বয়েসেই যে পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছ দেখছি!—সুট পরে ভেবেছ আমার চোখে ধুলো দেবে? এখনি পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দিচ্ছি—পাঁচটি ঘা বেত তো হোক।

দেখতে দেখতে তাদের ঘিরে ভিড় দাঁড়িয়ে গেলে। মিনু ভাঙা গলায় বললে, আরও কতক্ষণ গাড়ি দাঁড় করালেন না কেন, আমি ঠিক টিকিটের পয়সা এনে দিতুম।

—পয়সা এনে দিতে। পয়সা—তোমাকে দেওয়াচ্ছি! চেকার তাকে হিঁচড়ে টানতে লাগল। মিনু বললে, বারে, হাত ছাড়ো? লাগে না আমার?

—জোচ্চুরি করে রেল কোম্পানিকে ঠকিয়ে পিট্‌টান দিচ্ছিলে—তার লাগবে কী শুনি? নাঃ! চলো না— তোমাকে কোলে বসিয়ে দুধ-ভাত খাওয়াচ্ছি!—বলে, তার মাথা বাড়িয়ে বিশাল একটা চড় মারল।

মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। চড় খেয়ে মিনুর মাথার টুপিটা রুমালসুদ্ধ ছিটকে উড়ে পড়ল, আর অমনি তার স্তূপীকৃত চুল পিঠে-বুকে দু-কাঁধে গুচ্ছ হয়ে ছড়িয়ে গেল! টুপিটা মাথায় তাকে খানিকটা ঢ্যাঙা দেখাচ্ছিল, মুখটা দেখাচ্ছিল খানিকটা চোয়াড়ে—এখন হঠাৎ সে অনেকটা ছোটো হয়ে গেছে, মুখখানি একেবারে সদ্য ফোটা জুঁইয়ের মতো সুকুমার। কান্না লেগে মুখখানি ভোরবেলাকার বিষণ্ণ তারাটির চেয়েও করুণ দেখাচ্ছে।

সমবেত সবাই বিস্ময়ে শব্দ করে উঠল,—এ কী! এ যে দেখছি মেয়ে! ছোট্ট খুকি! এই ছদ্মবেশে ও এল কোত্থেকে?

তারপর তার ওপর শুরু হল কত প্রশ্ন, অতল সান্ত্বনা, অঢেল আদর।

কিচ্ছু তোমার ভয় নেই আমি থাকতে কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারবে না। তোমাকে ছেড়ে দেব। তোমার আবার টিকিট লাগবে না হাতি। পুলিশের সাধ্য কী তোমার গায়ে হাত তোলে? তুমি বলো কোত্থেকে তুমি এলে—কেন এলে—কার সঙ্গে এলে? কান্না কীসের? আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। চলো আমার সঙ্গে রিফ্রেসমেন্ট রুমে—তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না? খেতে খেতে আমাকে সব বলবে, কেমন? চেকার স্নেহে গলে গিয়ে মিনুকে অফুরন্ত আদর করতে লাগল।

আর মিনুও তার এই জীবনের নতুন উপাখ্যানটুকু তার কাছে আগাগোড়া বিবৃত করল।

তার পরের ব্যাপারটা খুব সোজা। ফিরতি ট্রেনে চেকার মিনুকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হল—তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। কী মজা, এবারও তার পয়সা লাগল না। বাড়ি ফিরে যেতে মিনুর আর এখন দুঃখ নেই। সে বুঝেছে পৃথিবীতে মেয়ে হওয়ারও সুবিধে কিছু কম নয়,—ভাগ্যিস মেয়ে হয়েছিল বলেই সে এমন শুভেলাভে বাড়ি ফিরতে পারছে, তার বদলে দাদা এলে তাকে এতক্ষণে সটান থানায় গিয়ে পড়তে হত।

থাকো তোমরা বাড়ির লোক সমস্ত রাত জেগে। কাল সকালের আগে মিনুর তোমরা দেখা পাচ্ছ না। কাল বুঝবে মিনুকে ফিরে পাওয়ার দাম, কাল ভুলবে টুপি আর পেন্টালুনের শোক। তোমরা রাত ভরে জাগো আর কাঁদো—মিনু দিব্যি সেকেন্ড ক্লাসে স্টেশনের দিককার লোয়ার বার্থে শুয়ে আরও বড়ো হবার স্বপ্ন দেখুক।

পুতুলের লড়াই

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘরসংসার গোছগাছ করে ইতনু, পুতনু আর মিকাইকে বিছানায় শুইয়ে তুতুলের পেটটা সেপ্‌টিপিন দিয়ে আটকে সবে খুকুর একটু ঘুম এসেছে—এমন সময় সদর দরজায়, ঝন-ঝন-ঝনাৎ !

দু-চোখ বগড়ে খুকু উঠে বসল। ওমা ! এত রাত হয়ে গেছে, সে টের পায়নি তো ! বাড়িতেও তো কেউ কোথাও নেই। মা বাবার বিবেচনাটাও বা কেমন ! বলে গেল, এই এখুনি আসছি মাসির বাড়ি থেকে, তাই না খুকু রাজি হয়েছিল পুতুল খেলা নিয়ে ঘরে থাকতে। 'এই এখুনি' বলে গিয়ে এত রাত পর্যন্ত কিনা বাড়ি আসবার নাম নেই ! এখন খুকু করে কী !

সদর দরজায় আবার ঝন-ঝন-ঝনাৎ। ভিখু—ভিখুই বা গেল কোথায় ! দরজাটা খুলে দিয়ে সে তো একটু খোঁজ করে আসতে পারে। যা কুঁড়ের ধাড়ি চাকর ! বাড়িতে কেউ নেই দেখে হয়তো নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কী আর করে ! অগত্যা খুকুকে নিজেই গিয়ে দরজাটার কাছে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয়, 'কে তুমি, কী চাও ?'।

দরজার বাইরে থেকে ভারি গলার আওয়াজ আসে, 'দরজা খোলো, টেলিগ্রাম আছে।'

টেলিগ্রাম ! এত রাত্রে টেলিগ্রাম এল আবার কার ! খুকু এবার দরজাটা একটু ফাঁক করে খুলে উঁকি মেরে দেখে, বাইরের অন্ধকারে একটা লম্বা আবছায়া চেহারা দাঁড়িয়ে আছে। খুকুকে সে হাত বাড়িয়ে একটা খাম আর কাগজ দিয়ে বললে, 'সই করো।'

'সই তো করব, কিন্তু টেলিগ্রামটা কার ?'

'টেলিগ্রাম ইতনুর।'

ওমা ! ইতনুর নামে টেলিগ্রাম আবার কী। আট বছর বয়স হল, এমন কাণ্ড তো সে জন্মে দেখেনি ! তবু সই করে টেলিগ্রামটা খুকুকে নিতেই হল। ঘরে ফিরে এসে টেলিগ্রামটা খুলতে গিয়ে সে অবাক ! ইতনু, পুতনু, মিকাই, তুতুল সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে বিছানা ছেড়ে।

'দেখি কী টেলিগ্রাম।'—বলে ইতনুই খামটা খুকুর হাত থেকে টেনে নিলে। তারপর টেলিগ্রামটা পড়ে তার সে কী মুখের চেহারা ! পুতনু, মিকাই আর তুতুল তো কেঁদেই আকুল। শুধু নেহাত কাঠের তৈরি বলেই ইতনুর চোখে জল নেই—সে একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

'আরে কী হয়েছে, কী ব্যাপারটা ?', খুকু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে। পুতনু আর মিকাই কেঁদে ফেলে বললে, 'ইতনুকে যুদ্ধে যেতে হবে।'

'যুদ্ধে যেতে হবে ? সে আবার কী ?'

'হ্যাঁ, আমাদের সম্রাটের আদেশ', সম্রাটের উদ্দেশে ইতনু সেলাম জানালে।

'সম্রাটের আদেশ তো বুঝলাম, কিন্তু যুদ্ধ কার সঙ্গে ?', ইতনু এবার একটু যেন বিব্রত হয়ে বললে, 'যুদ্ধ কাঠের সঙ্গে কাঁচকড়ার।'

পুতনু মুখখানি কাঁচুমাচু করে বললে, 'আমি তো কাঁচকড়া। আমাদের সঙ্গে তোমাদের কীসের ঝগড়া ?'।

'ঝগড়া চিনেমাটির খবরদারি নিয়ে। কাঠ আর কাঁচকড়া দু-জনেই চিনেমাটিকে উদ্ধার করতে চায়, অথচ কেউ কাউকে আমল দিতে নারাজ।'

মিকাই ছল-ছল চোখে বললে, 'চিনেমাটি তো আমি ! আমায় উদ্ধার করবার জন্য তোমরা ঝগড়া করে মরবে কেন ? আমার দায় আমি কি নিজে সামলাতে পারি না?'।

ইতনু বললে, 'সে জানি না, তবে সম্রাটের যা আজ্ঞা তা তো না মেনে উপায় নেই ! আমায় যুদ্ধে যেতেই হবে।'

খুকু এতক্ষণ হাঁ করে এদের কথাবার্তা শুনছিল, এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'কিন্তু লড়াই মানে কী তা জানো ? আর কি তোমায় আস্ত ফিরে পাব !'

ইতনু কাঠের মতোই শক্ত হয়ে বললে, 'ফিরে যদি আর না আসি তাহলে জানবে, সম্রাটের জন্য জীবন দিয়ে আমি স্বর্গে গেছি।'

এর পর আর খুকু কী বলবে ! ইতনুকে আর কিছুতেই যখন ধরে রাখা যাবে না, তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে যাবার ব্যবস্থা তাকে করে দিতেই হল।

এই সেদিন ইতনুর একটা পা খাট থেকে পড়ে আলগা হয়ে গেছল। লোহার তার দিয়ে সেটা খুকু ভালো করে এঁটে দিলে। রোদ লাগলে ইতনুর গা বড়ো চটে যায়, তাই সঙ্গে দিলে একটু হরতেল।

বিদায় নেবার সময় সকলের চোখে জল। নেহাত কাঠ বলে তার কাঁদতে নেই, তবু ইতনুর চোখটা যেন চকচক করে উঠল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আর সে তাই দাঁড়াল না। কাঠের পা খটখটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পুতনু, মিকাই আর তুতুলকে নিয়ে খুকু খানিক চুপ করে বসে রইল। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ পুতনু আর মিকাই দু-জনেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমরাও এবার চলি তাহলে !'

'তোমরা কোথায় যাবে ?', অবাক হয়ে বললে খুকু। 'যার যে-যার দলে। কাঁচকড়া হয়ে যখন জন্মেছি তখন জাতের মান তো রাখতে হবে !' পুতনু সামনে পা বাড়াল।

মিকাই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে বললে, 'আমায় নিয়েই যখন এত কাণ্ড, তখন আমিই বা যুদ্ধে না গিয়ে করি কী !'।

তুতুল বেচারা নেহাত ভালোমানুষ, এতক্ষণ সে কোনো কথাই বলেনি। এবার কিন্তু সেও উঠে দাঁড়াল, 'তাহলে আমি কোথায় যাব !'।

পুতনু আর মিকাই দু-জনে করুণভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি আর কোথায় যাবে, তোমার তো নিজের বলতে কিছু নেই। শুধু খানিকটা সেলাই করা তুলো। তুমি তো জাত-পুতুল নও !'।

তুতুল ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। পুতনু আর মিকাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারা যেতে না যেতেই হঠাৎ সমস্ত আকাশ যেন যন্ত্রণায় ডাক ছেড়ে কঁকিয়ে উঠল।

সাইরেন ! সাইরেন ! উড়োজাহাজ আসছে বোমা ফেলতে ! তাড়াতাড়ি মোমবাতিটা নেভাতে গিয়ে তুতুলের পেটের তুলোয় আগুন প্রায় ধরে গিয়েছিল আর কী ! খুকু কোনোরকমে সেটা সামলে তুতুলকে বুকে নিয়ে চুপ করে টেবিলটার তলায় গিয়ে বসল। দুড়ুম ! দড়াম দুম্... বোমা পড়ছে চারিধারে। দড়াম করে একটা বোমা পড়ে খুকুর খেলার ঘরটাতেই আগুন ধরে গেছে।

এবার তুতুলই কোল থেকে নেমে খুকুকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল, 'শিগগির ! শিগগির এসো বেরিয়ে খুকুমা !'।

কিন্তু বেরিয়ে এসে যাবে কোথায় ! রাস্তাঘাট সব অন্ধকার। তারই মধ্যে আকাশে গোঁ গোঁ করতে করতে উড়োজাহাজগুলো বিশাল সব খ্যাপা ভোমরার মতো পাক দিচ্ছে, আওয়াজে রাস্তা কাঁপিয়ে দৈত্যাকারে কচ্ছপের মতো ট্যাংকগুলো গড়িয়ে চলেছে, মুহূর্তে গোলাগুলোতে আকাশ যেন ফেটে গিয়ে বজ্র ঠিকরে বেরুচ্ছে।

কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা বুঝি নেই। যেদিকে চাও শুধু যুদ্ধের সেপাই। দলে দলে তারা গান গাইতে গাইতে চলেছে।

কাঠেরা গাইছে : আমরা কাঠ, আমরা কাঠ !
লোহার মতো শক্ত গাঁট।
কাটতে পারি কাটাও পড়ি
নোয়াই নাকো ঘাড়।
চাঁদের হাটের দেশের মোরা
অমর গাছের ঝাড় !

কাঁচকড়ারা গাইছে : আমরা সেরা কাঁচকড়া,
সবচাইতে দর চড়া !
দুনিয়ায় আর আছে যারা
দাম তো তাদের পাঁচকড়া।
ঘরের খেয়ে তাড়িয়ে বেড়াই
বনের যত মোষ ;
দুধটা দুয়ে নিই বটে সব,
হয় কি তাতে দোষ ?

একে এই গোলমালে দিশেহারা, তার ওপর তুতুলের কথায় খুকু হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পায় না। তুতুল তখন তাকে টানতে টানতে বলছে, 'তুমি কিছু ভেবো না খুকু-মা, আমি কাছে থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই।' ছুটোছুটিতে এদিকে তুতুলের পেটের সেপ্‌টিপিনটা খুলে খানিকটা তুলো বেরিয়ে এসেছে। খুকু তাড়াতাড়ি তুলোটা ভরে দিয়ে সেপ্‌টিপিনটা এঁটে দিতে যাবে, এমন সময় কাছ থেকে কে হেঁকে উঠল, 'খবরদার'!

এখানে ঘাপ্‌টি মেরে এক কাঁচকড়া সিপাই বসে ছিল আগে তো চোখে পড়েনি ! খুকু আর তুতুল দুজনেই ভয়ে থম্‌কে দাঁড়াল।

সিপাই ধমক দিয়ে বললে, 'জান্‌তা নেই, হিয়া ঠারনেকা হুকুম নেহি।'

'আরে এ যে পুতনু !'

খুকু আর তুতুল দুজনেই বলে উঠল, 'আরে তুমি এখানে !'।

পুতনুও এবার তাদের চিনতে পেরে বললে, 'হ্যাঁ আমি এখানে পাহারায় আছি কিনা ! কিন্তু তোমাদের এখানে একা থাকা তো চলবে না। এ হল মিলিটারি এলাকা !'।

থাকা যদি না চলে তো আর উপায় কী ! খুকু তুতুলকে নিয়ে চলে যাবে, এমন সময় পুতনু তুতুলের পেট থেকে খানিকটা তুলো খাবলে নিয়ে বললে, 'কিছু মনে কোরো না ভাই, একটু তুলো ধার নিলাম, কাটাছেঁড়ার জন্য দরকার হয় কিনা !'।

অতখানি তুলো হারিয়ে তুতুল বেশ তখন কাবু হয়ে গেছে, তবু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'এটা কী রকম ব্যবহার ! আমার তুলো তুমি কেড়ে নিলে যে বড়ো !'।

পুতনুর এক মুহূর্তে অন্য রকম চেহারা। চোখ রাঙিয়ে বললে, 'নিয়েছি বেশ করেছি। জানো কত বড়ো আদর্শের জন্যে আমরা যুদ্ধ করছি ! চাল নেই, চুলো নেই, তার আবার একটু তুলো দিয়ে তেজ দেখ না !'।

খুকু তাড়াতাড়ি তুতুলকে নিয়ে ছুট না দিলে পুতনু তুতুলকে আরও খানিকটা হালকা করে দিত বোধহয়।

হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক খানিক ছুটোছুটি করে হয়রান হবার পর তুতুল বললে, 'চলো খুকু-মা, ইতনুর কাছে গিয়ে ধরা দিই। শুনেছি কাঠেরা ওপরে শক্ত বটে, কিন্তু ভেতরটা তাদের ভিজে।'

তুতুলের মুখের কথা খসতে-না-খসতে একদল কাঠসিপাই এসে তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। ভারি জমকালো পোশাকের একজন সেনাপতি এগিয়ে এসে কড়াগলায় তাদের জিজ্ঞেস করলে, 'কে তোমরা ? কাঠ, না কাঁচকড়া ?'।

খুকু অবাক হয়ে বললে, 'সে কী ! আমাদের চিনতে পারছ না ইতনু ?'।

ইতনু একটু লজ্জিত হয়ে বললে, 'তাই তো ! ভারি ভুল হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু তোমরা এই লড়াইয়ের মাঝখানে কেন ? যাও যাও, এখান থেকে শিগগির সরে পড়ো। হ্যাঁ—যাবার আগে একটু তুলো দিয়ে যাও দেখি।'

অনুমতির অপেক্ষা না করেই তুতুলের পেটটা সে প্রায় ফাঁক করে দিলে। তুতুল তখন এমন চুপ্‌সে গেছে যে একটা কথা বলবারও তার ক্ষমতা নেই।

খুকু আর কি সেখানে দাঁড়ায়। তুতুলকে নিয়ে তক্ষুনি সে ছুট দিলে। কিন্তু কোন্‌দিকে সে যাবে কিছুই যে জানা নেই। হন্তদন্ত হয়ে একজনকে ছুটে আসতে দেখে সে মিনতি করে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় গেলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি বলতে পার ?'।

'আরে এ-যে খুকু-মা আর তুতুল দেখছি ! তুতুল যেন বড়ো কাহিল হয়ে গেছে !'।

মিকাইকে দেখে খুকু এবার সত্যি খুশি। কাঠও নয় কাঁচকড়াও নয়, সে হল চিনেমাটি। খুকু তাই আবার বললে, 'দেখছো তো মিকাই, তুতুলের আমার কী হাল হয়েছে ! বল না মিকাই, ওকে নিয়ে কোথায় গিয়ে দু-দণ্ড জিরোই ?'।

'সেই তো হয়েছে মুশকিল !', বললে মিকাই, 'আমি নিজেই কোথায় আছি জানি না। আমার আদ্ধেক নিয়েছে কাঠ আর বাকি আদ্ধেক সদ্দারি করেছে কাঁচকড়া ! তা যেখানেই যাও আর একটু তুলো দিয়ে যাও দেখি তুতুল।'

তুতুলের হয়ে খুকু বাধা দেবার আগেই মিকাই ছোঁ মেরে যথাসম্ভব হাতিয়ে নিয়ে বললে, 'দুঃখী চিনেমাটির জন্যে তোমার এ দান জীবনে ভুলব না তুতুল ! আচ্ছা চলি তাহলে।'

তুতুল তখন ন্যাতা হয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। খুকু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে তার জল পর্যন্ত যেন আর নেই।

অনেকক্ষণ বাদে তুতুলের ক্ষীণ গলার স্বরে তার যেন সাড়া ফিরে এল। তুতুল ধীরে ধীরে বললে, 'আমার জন্য তুমি আব ভেবো না খুকু-মা।'

'না, আর ভাববার কিছু নেই, কিন্তু কী করব এখন !'।

'কিছু আর করতে হবে না। এইখানে কামানের গোলাফাটা এই গর্তে আমায় শুধু একটু শুইয়ে দাও। আমি জানি সব আমার গেলেও কোথায় যেন একটা বীজ এখনও আছে, যা যাবার নয়। এই যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন সেই বীজ থেকে হয়তো একটা চারা একদিন গজিয়ে উঠবে। হয়তো সে চারা থেকে গাছ হয়ে একদিন তাতে আবার সাদা মেঘের মতো তুলো ধরবে। তুমি তখন বড়ো হবে খুকু-মা, হয়তো চরকা কাটবে। তুলো হয়ে আমি যেন সেদিন তোমার চরকায় গিয়ে জড়াই। আমায় দিয়ে তুমি এমন সুতো কেটো যা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার রাখিবন্ধনে বাঁধা যায়। পৃথিবীতে আর যেন কেউ এমন যুদ্ধ না করে।'

তুতুলেব কথা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল, দুম্ দুম্, দড়াম ! ও কী ! গোলা পড়ছে, না কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে !

তাই তো, দরজায় ধাক্কাই তো ! খুকু তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেয়। মা-বাবা ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বলেন, 'ওমা খুকুমণি, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ! এই তো আধঘণ্টাও হয়নি গেছি, এরই মধ্যে দরজা দিয়ে ঘুম !'।

মোটে আধঘণ্টা ! খুকু অবাক হয়ে খেলাঘরের দিকে তাকায়। চোখে দেখেও তার বিশ্বাস হতে চায় না যে ইতনু, পুতনু, মিকাই, তুতুল যেখানে যেমন ছিল তেমনি শুয়ে আছে। কেবল যেন মনে হয়, তুতুলের পেটের সেপ্‌টিপিনটা আলগা হয়ে খানিকটা তুলো সেখান থেকে বেরিয়ে আছে।

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন চিংড়িহাটা দিয়ে হাঁটছিলেন। 'আমার পক্ষে এটা যেমন চিংড়িহাটা তেমনি আবার চ্যাংড়াহাটাও', বললেন হঠাৎ হর্ষবর্ধন।

'তার মানে?', গোবর্ধন জিগ্যেস করে।

'তুই একটা চ্যাংড়া তো। তোর মতন চ্যাংড়ার সঙ্গে হাঁটা মানেই চ্যাংড়াহাটা—তা ছাড়া আর কী!'।

গোবর্ধন দাদার কথার সমুচিত জবাব দিতে চায়, কিন্তু কোনো কথা খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকে।

'তোমার টেরিটি এবার বাগিয়ে নাও গো দাদা!', খানিক বাদে সে বলে ওঠে।

'কেন বল্ তো।'

'খদ্দের পাবে !'

'কীসের খদ্দের ?'

'আমরা এবার টেরিটিবাজারে এলাম কিনা !', গোবর্ধন প্রাঞ্জল করে : 'তোমার টেরির খদ্দের পাবে এবার।' এতক্ষণে উপযুক্ত একটা উত্তর দিতে পেরে সে মনে মনে পুলকিত হয়। দাদা কিন্তু কথাটা গায়ে মাখেন না। বলেন, 'পাখিস্থানটা কোথায় খুঁজে বার কর তো দেখি !'।

'ম্যাপ দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'ম্যাপ কীসের ?'

'ভারতবর্ষের। ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব—দুই সীমান্তে পাকিস্তান অবস্থিত।'

'দুত্তোর অবস্থিত—!', দাদা ভারি বিরক্ত হন, 'আরে আমি কি সেই পাকিস্তানের কথা বলছি নাকি ? টেরিটি-বাজার হচ্ছে পাখির বাজার। সেটা কোন্‌খানে দ্যাখ্ না ! ভালোমতন একটা পাখি কিনে নিয়ে বাড়ি যাব আজ।'

'বা-বা-বা', পাখির কথায় গোবরা লাফিয়ে ওঠে 'আমি পাখি ভারি ভালোবাসি দাদা। আমাকে একটা তোতাপাখি কিনে দিয়ো, তাকে আমি পড়াব।'

'দ্যাখ্ তাহলে কোথায় পাখির দোকানটা।'

দেখতে আর হল না : শোনা গেল দেখতে না দেখতেই। খানিক বাদেই পাখিদের কিচিরমচির কানে এল ওদের। সেই পাখোয়াজি গলার অনুসরণে একটু যেতে না যেতেই পাখির বাজার দেখা দিল। খাঁচায় খাঁচায় পাখির জটলা। পাখিদের হল্লা।

'আমাদের একটা তোতাপাখি দাও তো !', এক দোকানিকে গিয়ে দাদা বললেন।

'কীরকম তোতা ? শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত না উচ্চশিক্ষিত ?', জানতে চাইল পাখিওয়ালা।

'পাখি আবার উচ্চশিক্ষিত কীরকম ?', কৌতূহল হয় হর্ষবর্ধনের।

'বাংলা জানে, হিন্দি জানে, উর্দু জানে, তামিল জানে—'

'উড়ে ?', গোবর্ধন জানতে চায়।

'কী যা-তা বকচিস !', বাধা দেন দাদা : 'পাখি আবার উড়ে না তো কি ? ছেড়ে দিলেই তো উড়ে যাবে।'

'না-না, আমি বলছিলাম উড়িয়াদের ভাষা....'

'হ্যাঁ, তাও জানে', জানাল দোকানি : 'এক একটা আবার ইংরিজিও জানে বেশ।'

'বলো কী হে !', হর্ষবর্ধন তো হতবাক—'ভালোরকম জানে নাকি ? বটে ? ম্যাট্রিক পাশ করা পাখি ?'।

'না। ইংরেজি পড়তে পারবে না। তবে বলতে-কইতে পারে।'

'না। সেই রকম সাহেবপাখি আমাদের দিয়ো না।' গোবর্ধন আপত্তি জানায় 'সাহেবদের গ্যাট-ম্যাট আমরা বুঝতে পারব না।'

'হ্যাঁ, আমরা সাদাসিধে মানুষ, আমাদের আটপৌরে বাঙালি পাখি দেবে।'

দাদারও সায় ভায়ের কথায়। শুধু ভায়ের কথাই নয়, তাঁর পক্ষেও সেটা ভয়ের কথা।

'তাহলে একটু দাঁড়ান বাবু, এক্ষুনি আমাদের পাখির ডাক হবে। আর সব খদ্দের এসে পড়বে এক্ষুনি। তারা এলেই ডাক শুরু হবে। ওই যে তোতাটা দেখছেন, দাঁড়ে বসানো, ওটা বাংলানবিস। ওটাকেই না হয় সব আগে নিলামে চড়াব।'

খানিক বাদেই জনকয়েক খদ্দের জুটল। ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল পাখিদের। কেউ ময়না, কেউ টিয়া, কেউ শালিক, কেউ আবার সেই তোতাটাকেই পছন্দ করল। ডাক শুরু হল পাখিগুলোর। কয়েকটা শালিক ময়না এক-ডাকে বেরিয়ে গেল। তারপর তোতাপাখিটা উঠল নিলামে।

'পাঁচ টাকা', হাঁক দিল দোকানি।

'সাড়ে পাঁচ', ডাকল একজন খদ্দের।

'দশ টাকা', গোবর্ধনের ডাক।

'বিশ টাকা', হর্ষবর্ধন হাঁকলেন।

'বারে ! আমি তো ডাকছি! তুমি আবার আমার ওপর ডাকছ কেন ?', দাদার কাণ্ডে গোবরা তো অবাক :

'দর বাড়াচ্ছ মাঝ থেকে ? আমি কিনলে কি তোমার কেনা হবে না ?'।

'ও, তুই ডাকছিস বুঝি !', দাদা একটু অপ্রতিভ হন।

'পঁচিশ টাকা', গোবর্ধন ডাকল তখন।

'তুই আবার আমার ওপর ডাকলি যে। তুই আর আমি কি পৃথক ?', হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন : 'তুই যদি এমনি করিস তাহলে আমিও ফের তোর ওপরে ডাকব আবার। তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।

'না না, আর এমনটা হবে না, আমি কথা দিচ্ছি।···'

গোবর্ধন বলতে যায়, এমন সময়ে আবার ডাক ওঠে—'তিরিশ টাকা'।

'কে ডাকল আবার ?', হর্ষবর্ধন বলেন।

'আমি ডাকিনি····' গোবর্ধন বলে : 'আমার ডাক চল্লিশ।'

'পঞ্চাশ !'

'আবার তুমি ডাকছ দাদা ?'

'কই, আমি তো ডাকিনি। কে ডাকল তবে ?', বলে তিনি হাঁক পাড়েন . 'সত্তর। আমি ডাকছি সত্তর।'

'বাহাত্তর', মিহি গলায় শোনা যায়।

'নিরানব্বই', হর্ষবর্ধন ডাক ছাড়েন।

'এক শ আট', কে ডাকে কে জানে !

'তিন শ ছাব্বিশ', হর্ষবর্ধনের রাগ চড়ে, ডাক চড়ে।

'পাঁচ শ', গোবর্ধনের ডাক নয়।

'সাত শ', আবার কাতর ডাক।

'দু হাজার', হর্ষবর্ধনের হাঁক শোনা যায়।

'ব্যাস্, আর নয়', দোকানদার মাঝে পড়ে বলেন : 'দু হাজার এক···দু হাজার দুই····বাস। খতম্। দিন দু হাজার টাকা।'

কুড়িখানা এক শ টাকার নোট গুনে দিয়ে পাখি নিয়ে দু-ভাই রওনা দেন। কিছুদূর এসে দাদার খট্‌কা লাগে—'আরে, এতগুলো টাকা দিয়ে কিনলাম পাখিটা। কিন্তু পাখিটাকে তো বাজিয়ে নেওয়া হয়নি। এখন কথা বলতে জানে কি না এটা কে জানে।'

'উজবুক !'

'তুই আমাকে উজবুক বললি ?' : হর্ষবর্ধন ভারি খাপপা হন : 'উজবুক না উল্লুক কী বললি তুই ! ছোটো ভাই হয়ে কিনা দাদাকে উল্লুক বলে !'।

'আমি কোথায় বললাম ! বা রে !', গোবরা প্রতিবাদ করে।

'উজবুক কোথাকার !', পাখিটার গলা থেকে আসছে কথাটা, স্পষ্টই শোনা যায়।

'আরে, পাখিটা গাল পাড়ছে যে !'

'অবাক কাণ্ড !', গোবরা গালে হাত দেয়।

'আমি যদি কথা কইতে জানি না তবে এতক্ষণ কে কথা কইছিল তোমাদের সঙ্গে ?', তোতাপাখিটা বকে।

'তার মানে ?'

'নিলাম ডাকছিল কে ? নিলামের ডাক বাড়াচ্ছিল কে এতক্ষণ ?'

'মানে, তুমিই ডাক বাড়াচ্ছিলে ? বটে !', দুই ভাই বিস্ময় মানেন।

'চ ফিরে সেই পাখিওয়ালার আড়তে', হর্ষবর্ধন বলেন : 'যে পাখিটাকে এমন করে পড়াতে পারে সে না জানি····'

দু ভায়ে আবার ফিরে আসেন টেরিটিবাজারে।

'হ্যাঁ গা, তোমরা সামান্য পাখিটাকে এমন শিক্ষিত করলে কী করে ?'

'আলমবাজারে যে আমাদের পশুপক্ষীর ইস্কুল আছে বাবু !', ব্যক্ত করে আড়তদার : 'সেখানে আমরা জীবজন্তুদের শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করি।'

'বেশ ভালোকথা। আমি বলছিলাম কী, তোমরা যখন জীবজন্তুদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ কর, তখন আমার এই ভাইটিকেও যদি·····

'আপনার ভাইকে !'

'হ্যাঁ, আমার ভাইও একটা জন্তু তো।····জন্তু ছাড়া কিছু নয়।'

'আমি জন্তু !', গোবর্ধন ফোঁস করে ওঠে।

'তা জন্তু ঠিক না হলেও জানোয়ার তো বটেই। এমন জান বার করে দেয় আমার এক-এক সময়। মানুষ

হল না ছোঁড়াটা। একে আমি তোমাদের ইস্কুলে ভরতি করে দিতে চাই।'

'খাঁটি জানোয়ার নিয়ে আমাদের কারবার মশাই! সেখানে এসব ভ্যাজাল চলে না। আসল জীবজন্তু নিয়ে আসুন, মানুষ করে ছেড়ে দেব।'

'আপনারা কী শেখান ? শুনি ?'

'ইংরেজি, বাংলা হিন্দি, অঙ্ক, জিমন্যাস্টিক, ড্রিল, প্যারেড, সব। সার্কাসের বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ-হাতি—এদের শেখায় কারা ? আমরাই তো।'

'আচ্ছা, সেই ভালো', হর্ষবর্ধন বলেন তখন : 'গোবরাটার যখন ইচ্ছে নয়, মানুষ হতে চাইছে না যখন, আর আপনারাও যখন নারাজ, তখন ওর বদলে ওর কুকুরটাকেই ভরতি করব আপনাদের ইস্কুলে। দেখা যাক্ সেটা যদি আপনাদের কৃপায় শিক্ষিত হয়। তারপর তার দেখাদেখি আমার ভাইও যদি...' তার বেশি আর তিনি ব্যক্ত করেন না। 'এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান অ্যাডভাইস।' এই বলে শেষ করেন।

শেষটা গোবর্ধনের বুলডগটাকেই আলমবাজারের পশুপক্ষীর পাঠশালায় ভরতি করে দেওয়া হল। রীতিমতন আবাসিক বিদ্যালয়। পশুপক্ষীরা হোস্টেলে থাকে, ইস্কুলে পড়ে। গরমের আর পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসে; সব ইস্কুলের যেমন রেওয়াজ।

গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরল বুলডগ। দুই ভাই তাকে নিয়ে পড়লেন—কদ্দূর শিখেছে দেখা যাক।

'অঙ্ক পারিস—অঙ্ক ? দুই আর দুয়ে কত হয় ?'

'ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্', কুকুরটা পা ঠুকে জানাল—চার।

'বাঃ অঙ্কটা তো বেশ শিখেছে দেখছি ! নামতা জানিস, নামতা ? ষোল ষোলং কত হয় বলতে পারিস ?', গোবর্ধন শুধোয়।

কুকুরটা আর পা নাড়ে না, চুপ করে থাকে।

'একেবারে ষোল ষোলং !', হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন : 'কেউ তা পারে ? তুই পারিস বলতে—ষোল ষোলং ? আমি পারি ? কেউ পারে ? যে ও পারবে ?'

'আচ্ছা থাক। জিমন্যাস্টিক শিখেছিস ? ড্রিল ? প্যারেড ? লেফট...রাইট...লেফট...রাইট...।'

কুকুরটা লেজ নাড়ে কেবল।

'ওই তো শিখেছে। লেজের ড্রিলটাই শিখেছে দেখছি। ডাইনে বাঁয়ে নাড়ছে। ক্রমে ক্রমে শিখবে সব। ক-দিন আর পড়েছে বল।'

'সমস্কৃত শিখেচিস ?', গোবর্ধন শুধায়।

কুকুর চুপ।

'হ্যাঁ কি না বল্। শিখেছিস সমস্কৃত ?'

কুকুর নিরুত্তর।

'ওমা ! মাঝখান থেকে এ যে দেখছি তামিলটাও ভুলে গেল আবার ?'

'কীসের তামিল', জানতে চান দাদা।

'হুকুম তামিল', বলল গোবর্ধন : 'কথার কোনো জবাবই দিচ্ছে না দেখছ !'।

'কী করে শিখবে সমস্কৃত ? কুকুরেরা কি অনুস্বর উচ্চারণ করতে পারে ? অং বং বলতে পারবে কুকুর ? তোর যত বাড়াবাড়ি।'

'তাহলে জাতীয় ভাষা ? হিন্দি ?', গোবরার জিজ্ঞাসা।

কুকুরটা চুপ।

'বিজাতীয় ভাষা ? তাও কিছু শিখিসনি ? ইংরিজি, ফরাসি, গ্রিক, ল্যাটিন... ?', হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু।

'ম্যাও !', কুকুরটা মুখ খোলে এবার।...

'হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেয়েছে দেখছি', তোতাপাখিটা দাঁড়ে বসে পাকামি করে, ফোড়ন কাটে।

'মিউ !', করুণ সুরে কুকুরটা সাড়া দেয়।

নতুন রূপ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সন্ন্যাসীব নিয়ম, গৃহত্যাগ করে চলে যাবার বারো বছরের মধ্যে শুধু একবার স্বগ্রামে ফিরে আসতে হয়.....মা জীবিত থাকলে, মার সঙ্গে দেখা করতে হয়। তাই চৈতন্যদেব শুধু একবারের জন্য নবদ্বীপে ফিরে এসেছেন মাতৃ-চরণ দর্শন করে তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে আবার পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন....পায়ে হেঁটে তিনি বৃন্দাবন যাবেন....

পায়ে হেঁটে তিনি বৃন্দাবন চলেছেন... তাঁর চলার পায়ে পায়ে বাংলার মধ্যযুগের স্তিমিত-প্রাণ জনপদ নিমেষের মধ্যে যেন প্রাণের অকস্মাৎ জোয়ারে জেগে ওঠে....

কাউকে আহ্বান করেন না, কারও সঙ্গে কোনো কথা বলেন না....মাটির পথে এগিয়ে চলে আলোর মানুষ....

গৌড় তখন রাজধানী...নবাব হুসেন শাহ্-র রাজধানী।

গ্রাম-পথ ছেড়ে চৈতন্যদেব গৌড়ে প্রবেশ করেন।

দেখতে দেখতে সমগ্র গৌড় পথে বেরিয়ে আসে.... ঢেউয়ের মতন মানুষ চারদিক থেকে ছুটে আসে.... ঢেউয়ের মতন হাজার হাজার মানুষের মিলিত কলরোল হুসেন শাহ্-র নিস্তব্ধ প্রাসাদের চারদিকে ভেঙে পড়ে.... হুসেন শাহ্ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন.... তবে কি প্রজারা বিদ্রোহ কবল ? না, বাইরে থেকে কোনো শত্রু গৌড় আক্রমণ করল ?

আতঙ্কিত হুসেন শাহ্ প্রাসাদ-শীর্ষে উঠে দেখেন…

দেখেন, চারদিক থেকে মানুষ পথে ছুটে আসছে, কারও হাতে কোনো অস্ত্র নেই…সকলেই ক্ষণে ক্ষণে কপালে হাত ঠেকিয়ে অদৃশ্য কাউকে যেন প্রণাম করছে… কাকে যেন অনুসরণ করে চলেছে…

রাজা ছাড়া এত লোক একসঙ্গে কাউকে তো আর অভিবাদন করে না!

কী হল?

প্রাসাদ থেকে নেমে তিনি নিজে তাঁর দুই অতি-বিশ্বস্ত মন্ত্রী দবির খাস আর সাকর মল্লিকের কক্ষে উপস্থিত হলেন…বললেন—এখুনি তোমরা দুজনে গিয়ে দেখে এসো ব্যাপারটা কী!

দবির খাস আর সাকর মল্লিক তখন রাজস্বের একটা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন…প্রাসাদের অভ্যন্তরে মন্ত্রণাকক্ষের নিষিদ্ধ নিভৃতিতে…।

পথ দিয়ে চলে গেল নীবব সন্ন্যাসী…এলোমেলো করে দিয়ে গেল এতদিনের অভ্যস্ত হিসাবের পরিচিত খাতাকে…অবশ্য দবির খাস বা সাকর মল্লিক, কেউই সে-মুহূর্তে তার কোনো সংবাদই জানতেন না।

ছদ্মবেশে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বহুকষ্টে দেখা করে দবির খাস আর সাকর মল্লিক ফিরে এলেন…ফিরে এসে কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারীর মতন নবাবের কাছে সংগৃহীত সংবাদ জানালেন…

—আতঙ্কের কোনো কারণ নেই…কোনো বিদেশি শত্রু নয়, সিংহাসন-লোভী কোনো নতুন রাজাও নয়, মাত্র সংসার-ত্যাগী একজন সন্ন্যাসী…এতক্ষণ হয়তো গৌড় ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন…

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর হুসেন শাহ্ বললেন,—প্রাসাদ থেকে যে দৃশ্য আমি দেখেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, কোনো রাজা কোনোদিন এ অভিবাদন পায়নি। জনতার মুখের চেহারায় যেন আমি ইতিহাসের এক নতুন ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখলাম!

সেদিন গৌড়েশ্বরের প্রধানমন্ত্রী সাকর মল্লিক, কূটবুদ্ধি অতি বিচক্ষণ সাকর মল্লিক…রাজস্ব-পরিকল্পনা করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যান…কথার খেই হারিয়ে যায়…অবান্তর কথা বলে ফেলেন…

অর্থসচিব দবির খাস লক্ষ করেন…

—কী হল? উত্তর দিচ্ছ না যে?

সাকর মল্লিক নিজের ত্রুটি ঢাকবার জন্য উলটে অর্থ-সচিবকে ভর্ৎসনা করেন,—আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি তোমার কাণ্ড দেখে!

—কেন?

—সামান্য হিসাবের অঙ্কে তুমি আজ ভুল করছ… উলটে আমার ওপর দোষারোপ করছ! কী ব্যাপার?

দুজনেই দুজনের কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করেন…

সাকর মল্লিক বলেন,—আজ থাক, তুমি ক্লান্ত।

রাজস্বের হিসাব রেখে দিয়ে দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়েন…

সেইদিন রাত-প্রভাতেই দবির খাস দ্রুতগামী অশ্বে একাকী গৌড় ছাড়িয়ে রামকেলিতে সন্ন্যাসীর চরণে এসে লুটিয়ে পড়েন…সন্ন্যাসী তখন গ্রামের বাইরে গাছতলায় নিশিযাপন করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

দবির খাস সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেন,— আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন,—তোমাদের দুজনের জন্য আমি রামকেলিতে ইচ্ছা করেই নিশিযাপন করেছি… মধ্যরাত্রিতে সাকর মল্লিক এসেছিল…আমি জানতাম তুমিও আসবে…

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে দবির খাস বলে,—ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছি, কিন্তু অর্থ, নাম, প্রতিপত্তির মোহে নিজের নাম পর্যন্ত বদলে পর-ধর্মীর নাম নিয়েছি…প্রাণহীন রাজনীতির সাধনায় মানব-নীতি বিসর্জন দিয়েছি…যা চেয়েছিলাম তা সবই পেয়েছি, নাম, প্রতিপত্তি, রাজার ঐশ্বর্য…কিন্তু মন শুকিয়ে গিয়েছে…যে মুহূর্তে তোমাকে দেখেছি, সে মুহূর্তে মনের ভিতর আগুন জ্বলে উঠেছে… সে আগুনের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, কিছুই পাইনি। এ শূন্যতার জ্বালা থেকে বাঁচাও!

সন্ন্যাসী হাত ধরে দবির খাসকে তুলে পাশে বসান, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন,—আত্মগ্লানি এনো না রূপ! আজ আমি তোমার নতুন নামকরণ করলাম…যেমন করেছি সাকর মল্লিককে, নাম দিয়েছি—সনাতন। যাই হোক, সামনে তোমার নতুন জীবন…আমি জানি, তোমাকে আমার দরকার…সময় হলেই তোমাকে কাজে ডেকে নেব। আজ ফিরে যাও।

সন্ন্যাসী সামনের পথে এগিয়ে চলেন।

দবির খাসের বদলে এক নতুন মানুষ গৌড়ের দিকে ফিরে চলে, নাম তার—রূপ!

অসহযোগী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেনের বাবা হর্ষনাথ ধনেশগঞ্জের মস্ত আড়তদার। বছরখানেক আগে রমেনকে সে তার পিসতুতো ভগ্নীপতি সূর্যপদর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল---ছেলেটাকে একটু শান্তশিষ্ট ভদ্র বানাবার আশায়। রমেন একেবারে মারাত্মক-রকম দুরন্ত হয়ে উঠেছিল; কিছুতেই সে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। দু-তিনবার কোর্টে পর্যন্ত তাকে দৌড়তে হয়েছিল ছেলের জন্য। শেষে রমেন যখন একদিন ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার বসুর ছেলেকে মেরে রক্তারক্তি করে দিল, তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এ ছেলেকে সামলে চলা তার সামর্থ্য নয়। এ ছেলে তার সর্বনাশ করবে। যুদ্ধের বাজারে কতভাবে কত কামাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চটালে রক্ষা আছে?

দামি দামি ভেট নিয়ে সে সটান গিয়ে হাজির হল একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে, মার-খাওয়া ছেলেটির জন্যই উপহার রইল দুশো টাকার। লুটিয়ে পড়ল মিসেস বসুর পায়ের তলে। প্রার্থনা করল রমেনের নিস্তার। ছেলের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করবে আগেই ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল, তাই বিনা

দ্বিধায় জানিয়ে দিল যে, ভয় পেয়ে রমেন কোথায় পালিয়ে গেছে, ফিরে এলে খুঁটিতে বেঁধে তাকে চাব্‌কে লাল করে দেবে।

সেইদিনই রমেনকে নিয়ে সে কলকাতা রওনা হয়ে গেল, ছেলেকে সূর্যপদর জিম্মা করে দেবার জন্য।

রমেনের মা একটু আপত্তি করেছিল। 'উনি স্বদেশি-টদেশি করেন শুনেছি, খোকাকে আবার না বিগড়ে দেন।'

হর্ষনাথ বলেছিল, 'স্বদেশি না ছাই! জেলে যেত না স্বদেশি করলে? ওসব টাকা উপায়ের ফিকির। ছেলেদের নিয়ে দল-টল সমিতি-টমিতি করে চাঁদা তুলবার জন্যে। মাস্টারিতে কি কারও পেট চলে?'

শহরতলিতে সূর্যপদর বাড়ি। এক রাত্রির বেশি হর্ষনাথ থাকতে পারেনি। তার কত কাজ ধনেশগঞ্জে। সূর্যপদকে সব জানিয়ে অনুরোধ করেছিল, 'ছেলেটাকে তোমায় মানুষ করে দিতে হবে ভাই। শুধরে দিতে হবে।'

সূর্যপদ হেসে বলেছিল, 'দেব। ছেলেকে তোমাব মানুষ কবে দেব।'

একটা শর্ত করেছিল সূর্যপদ যে, এক বছরের মধ্যে রমেনকে ধনেশগঞ্জে নেওয়া চলবে না আর সোজাসুজি রমেনকে টাকা পাঠানো চলবে না। হর্ষনাথ রাজি হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

রমেনের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলে সূর্যপদ মোটে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল।

বলেছিল, 'আমি গরিব মাস্টার, তোমার ছেলের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু পঁচিশ টাকার বেশি খরচ ওর লাগবে না।'

পরের মাসে হর্ষনাথ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিল। কয়েকদিন পরে পঁচিশ টাকা ফেরত আসায় খুশি হয়ে রমেনের মাকে বলেছিল, 'না, লোকটি সত্যি ভালো। ছেলেটাকে শুধবে দিতে পারবে বলে মনে হয়।'

এক বছর পরে পুজোর ছুটিতে রমেন বাড়ি এল।

তার পরিবর্তন দেখে প্রথম ক-দিন হর্ষনাথ পরম খুশি যেমন চেহারায়, কথায়, ব্যবহারেও। তেমনই সে শান্তশিষ্ট-ভদ্র হয়ে এসেছে। উস্কো-খুস্কো ঝাঁকড়া চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা কিন্তু তাও আঁচড়ানো, জামা-কাপড় সস্তা দামের কিন্তু দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মুখখানা হাসিখুশি, কথা মিষ্টি, চাল-চলন নম্র। গুণ্ডার মতো চেহারা নিয়ে সারাদিন সে টো টো করে ঘুরে বেড়াত, খেলা আর মারামারি নিয়ে মেতে থাকত এমনই সে চঞ্চল ছিল এক বছর আগে, অকাজের পর অকাজ না করলে তার স্বস্তি ছিল না। একটা কথা কোনোদিন সে কারও শুনতো না। সে চাপল্য, শয়তানি আর অবাধ্যতা কোথায় উড়ে গেছে।

সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এই যা একটু দোষ। কিন্তু কোনো অপকর্মের খবর না পেয়ে এবং বাড়ি ফিরলে ছেলের দেহে বা কাপড় জামায় দুরন্তপনার চিহ্ন না দেখে হর্ষনাথ নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে, এতদিন পরে দেশে এসেছে, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে সাধ মিটিয়ে। ওতে আর কী আসে যায়?

দিন-সাতেক পরেই কিন্তু তার মনে খট্‌কা লাগে।

আড়ত থেকে ভাত খেতে বাড়ি ফিরে দেখে কী, শ-তিনেক দুর্ভিক্ষেব কাঙালি মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো বাড়ির পাশে ফাঁকা বটগাছতলায় পাত পেতে ভাত খাচ্ছে, পরিবেষণ করছে রমেন আর তারই বয়সী পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলে।

দেখে মুখ হাঁ হয়ে যায় হর্ষনাথের।

বাড়ির ভিতরে ধপাস করে বসে পড়ে ছেলেকে সে ডেকে পাঠায়।

'এ সব কী হচ্ছে?'

রমেন তখন উৎসাহে ফুটছে—'ওদের খাওয়াচ্ছি বাবা! কত হিসেব করে খাওয়াতে হচ্ছে জান? কদ্দিন ধরে খায় না, বেশি খেলেই মরবে। তা কি বোঝে ব্যাটারা? সবাই চেঁচাচ্ছে আবও দাও, আরও দাও। সামলানো দায়।'

'চাল-ডাল সব পেলি কোথায়?'

'মা দিয়েছে।'

রমেনেব মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আহা, আবদার ধরেছে, খাওয়াক ... সবাই আশীর্বাদ করছে। ভালো হবে।'

'ভালো হওয়াচ্ছি।'

বাড়ির ভাঁড়ারটাই প্রায় ছোটোখাটো একটি গুদামঘর। আগে হর্ষনাথ রমেনের মার কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি সংগ্রহ করল। তারপর বটতলার খাওয়া শেষ হলে সকলকে হাঁকিয়ে দিল।

আঁধার নেমে এল রমেনের মুখে। সে বললে, 'আমি ওদের সাতদিন রোজ খাওয়ার কথা বলেছি বাবা। তারপর ওরা গাঁয়ে ফিরে যাবে।'

'চুপ কর, বেয়াদব কোথাকার। সাতদিন ধরে খাওয়াবে! আমাকে ফতুর করার মতলব!'

দিন যায়। প্রতিদিন চারিদিকে ক্ষুধিতের কান্না হু-হু করে বেড়ে যেতে থাকে। বমেন আর হাসে না। খেতে বসে ভাত ছড়িয়ে উঠে যায়। দুধ পড়ে থাকে দুধের বাটিতে, সন্দেশ পিঁপড়েয় খায়।

হর্ষনাথ রাগ করে বলে, 'কী জ্বালা বাপু! কেন হয়েছে কী?'

'সবাই না খেয়ে মরে যাবে, তুমি কিছু করবে না বাবা?'

'দিলাম যে কুড়ি মণ চাল রিলিফ?'

'কুড়ি মণ! তোমার আড়তে হাজার হাজার মণ চাল রয়েছে। সবাই ছি-ছি করবে বাবা। সবাই আমায় ঘেন্না করছে তোমার ছেলে বলে।'

'চুপ কর! বেয়াদব কোথাকার!'

দু-দিন রমেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রমেনের মা কেঁদে-কেটে অস্থির হয়। মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হলেও হর্ষনাথ বাইরে মুখ গম্ভীর করে থাকে। রাগে ভয়ে দুশ্চিন্তায় তার মেজাজটা যায় বিগড়ে। ভাবে, রমেন ফিরলে মেরে তাকে আস্ত রাখবে না। দু-দিন পরে রমেন ফিরলে তার চোখের চাউনি দেখে দুটো ধমক দিতেও কিন্তু তার সাহস হয় না। কেমন এক খাপছাড়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে রমেন আজকাল তার দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছিল, দেখে তার কেমন ভয় ভয় করে।

'কোথায় গিয়েছিলি না বলে?'

'অনাথবাবুর সঙ্গে সাতগাঁয়ে।'

অনাথবাবুর সঙ্গে! তার পরম শত্রু অনাথবাবু, এই সেদিন যার জন্য প্রায় হাজার মণ চাল গুদামে তোলার বদলে বাঁধাদামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে তাকে।

রমেন আবেদন আর আবদারের সুরে বলে, 'কী অবস্থা হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। তুমি এক কাজ করো বাবা। যে দামে কিনেছিলে, এক টাকা লাভ রেখে চাল বেচে দাও। তোমার তো লোকসান হবে না, কত লোক বাঁচবে ভাব দিকি!'।

'লোকসান হবে না, না? চল্লিশ টাকার জায়গায় চোদ্দ টাকায় বেচলে লোকসান হবে না, কী হিসেব তুই শিখেছিস?', কথাটা হর্ষনাথ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

তখন রমেন বলে, 'তা হলে তোমার সব চাল আমি বিলিয়ে দেব বাবা। আগে থেকে বলে রাখলাম। তোমায় আমি মানুষ খুন করতে দেব না।'

'ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিসনি, থাবড়া খাবি।'

'বলে রাখলাম। দেখো।'

ছেলেমানুষের হালকা কথা, কে তা মনে রাখে? আড়তে তার কত লোকজন, গুদাম তালাবন্ধ, চাইলেই কি আর চাল বিলিয়ে দিতে পারবে রমেন—পঞ্চাশজন বন্ধু আর অনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এলেও নয়।

সে জন্য হর্ষনাথের ভাবনা হল না। ছেলের পাগলামি দেখে মনটা শুধু খারাপ হয়ে গেল। কী কুক্ষণেই ছেলেকে মানুষ হতে পাঠিয়েছিল সূর্যপদর কাছে! এর চেয়ে ছেলেটা শয়তান গুণ্ডা থাকাও ভালো ছিল—বয়স বাড়লে আপনি শুধরে যেত।

দিনকর্তক পরে হর্ষনাথ ব্যাবসার কাজে তিন দিনের জন্য বাইরে গেল। আড়তে বলে গেল, রমেন এসে গোলমাল করলে যেন ভালোভাবে শাসন করে দেওয়া হয়। আর অনাথ এসে হাঙ্গামা করলে যেন সোজা পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। একবার থানাটাও ঘুরে গেল, অনাথ কীভাবে তার ছেলের মাথা বিগড়ে দেবার চেষ্টা করছে জানিয়ে দেবার জন্য।

পরদিন সকালে আড়তে ও আড়তের সামনে হই হই কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। নিতাইচরণ আড়তের প্রধান কর্মচারী, বাবু নেই বলে আড়ত খুলতে লোক পাঠিয়ে নিজে একটু বেলা করে হেলতে দুলতে এসে দেখে কী, প্রায় শ-পাঁচেক লোক জমা হয়েছে আড়তের সামনে। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে নিতাইচরণের চক্ষুস্থির। আড়তের যে কোণে হাজার টিন তেল ছিল পরশু পর্যন্ত, সেখানে মেঝেতে তেল আর ময়লার পুরু পাঁকের ওপরেই আড়তের সবাই বসে আছে। তফাতে হর্ষনাথের দু-নলা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রমেন। রমেনের সমবয়সী ছেলেতে আড়ত বোঝাই।

'আসুন নিতাই কাকা। গুদামের চাবিটা দিন তো।'

'চাবি? চাবি কোথায় পাব? চাবি তোমার বাবার কাছে।'

'তাহলে ওখানে গিয়ে বসুন। দরজা ভাঙতে হবে।'

রমেনের এক বন্ধু তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তেল গাদায় ধপ্ করে বসিয়ে দেয়। রমেন বলে, 'এই বন্দুক নিয়ে একজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিলাম মনে আছে তো? কেউ কোনো ফন্দি-ফিকির চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। সত্যি সত্যি গুলি করব কিন্তু।'

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে রমেন ওদের পাহারা দেয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দেড়শো ছেলে গুদাম থেকে চাল বার করে বিতরণ করে। কাছে ও দূরের অনেকগুলি গাঁ থেকে হাজার হাজার লোক আসে চালের জন্য। রমেন গাঁয়ে গাঁয়ে ঢ্যাড়া পিটিয়ে দিয়েছিল।

পুলিশ দু-চারজন আসে কিন্তু ঢুকবার চেষ্টা করে না। বরং ভিড় আর হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে কিছু কিছু সাহায্যই করে। ভোরে রমেন নিজে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছিল তার বাবা আজ চাল বিতরণ করবেন। এই মর্মে বড়ো বড়ো কয়েকটা ইস্তাহারও আড়তের বাইরে টাঙিয়ে রেখেছিল।

সন্ধ্যার সময় চাল শেষ হল।

খবর পেয়ে পরদিনই হর্ষনাথ ফিরে এল। ছেলেকে সামনে রেখে গুম খেয়ে রইল। তার কান্না পাচ্ছিল।

প্রথম দুঃখ

বুদ্ধদেব বসু

'বাবা! ও বাবা!'

'উঁ।'

'তোমার কাঁচিটা একটু দেবে?'

'কাঁচি দিয়ে কী হবে?'

'দাও না একটু।'

'না। এই টেবিলের ছুরি কাঁচি আঠার শিশি কিচ্ছুতে আর হাত দিতে পারবে না। ওসব আমাব কাজেব।'

'আমার একটা কাজ আছে বাবা।'

'টুনি! এখান থেকে যাও। আমি লিখছি।'

অগত্যা টুনি বলল, 'তাহলে তোমার অ্যাশটেগুলো দাও, মেজে আনি।'

'অ্যাশটে বলে না, অ্যাশট্রে।'

'ও হ্যাঁ—অ্যাশট্রে। আমি তো অ্যাশট্রেই বলি আজকাল। ছেলেবেলায় ট্রামকে টাম বলতাম, না বাবা?'

'টুনি, তুমি কি কথাই বলবে এখানে দাঁড়িয়ে?'

'না বাবা, অ্যাশট্রেগুলো নিয়েই চলে যাব', হাত বাড়িয়ে টুনি একটা একটা করে কাছে টানতে লাগল, 'ইস্, কী ময়লাই হয়েছে! একেবারে ঝকঝকে করে আনব, কেমন বাবা?'
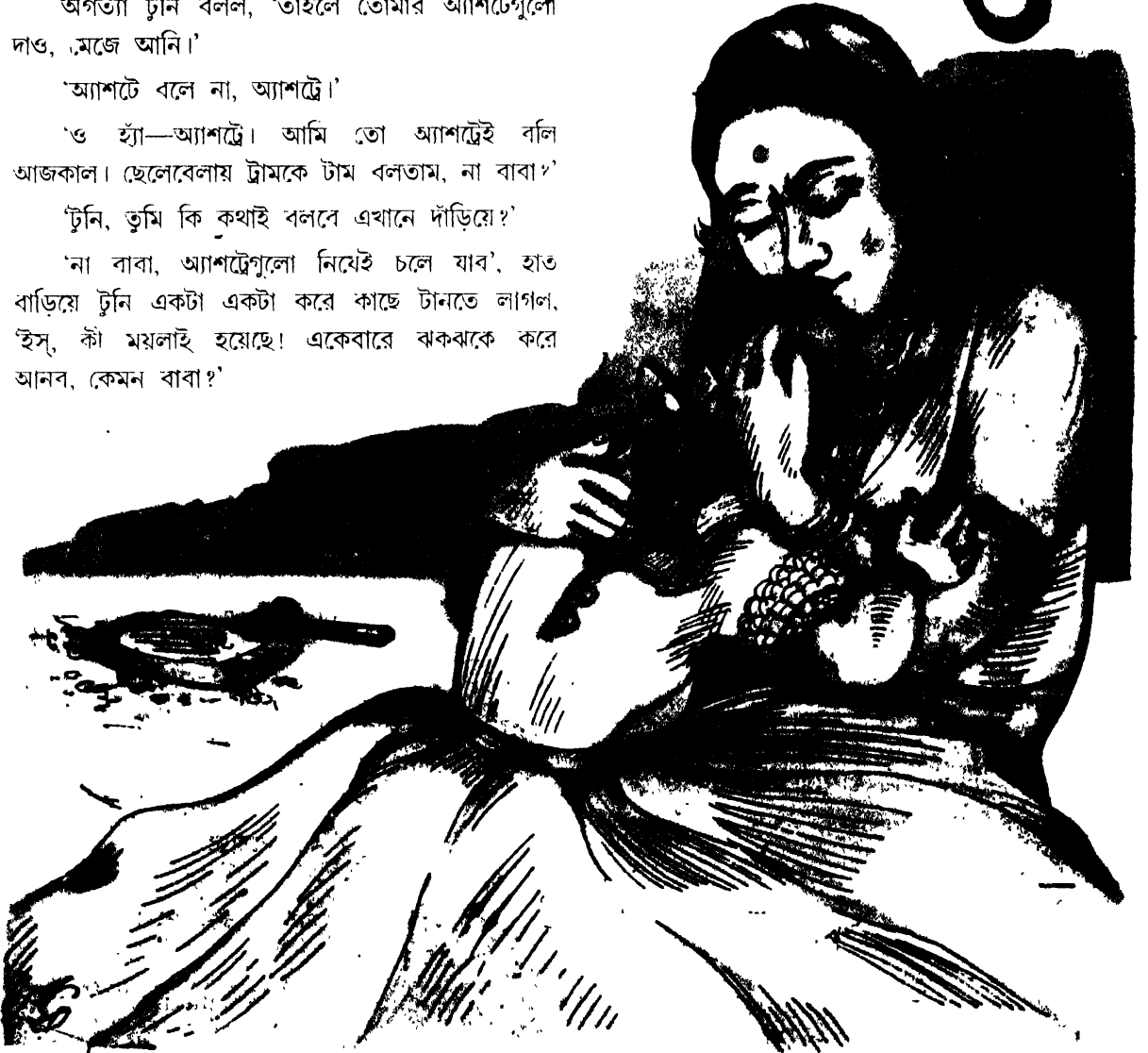
'টুনি তুমি কি এ-ই করবে সারাদিন, একটুও পড়বে না?'

'না, বাবা, পড়তে আমার ভালো লাগে না।'

'তাহলে আমার সেক্রেটারি হবে না তুমি?'

'তোমার সেক্রেটারি তো দিদি হবে। দিদিকেই তো তুমি প্রুফ দেখতে দাও।'

'বেশ তো তুমিও প্রুফ দেখো; ভালো করে বানান-টানান শিখে নাও চটপট।'

'না বাবা, ওসব দিদিই করুক।'

'আর তুমি?'

'আমি বাসন-টাসন মাজব আর তোমাকে চা করে দেব যতবার চাও। রোজ তিনটের সময় তোমাকে চা করে দিই না?'

'বাঃ! তুমি না দিলে চা খাওয়াই হয় না আমার।'

'কী করে হবে। কালী ঘুমিয়ে থাকে, কাঞ্চা বেরিয়ে যায়, মানকুমারীকে ডেকেই পাওয়া যায় না, আর মা—মা-ও ঘুমিয়ে থাকেন। তোমাকে যে চা দিতে হবে সে কথা ভাবেই না।'

'ভাগ্যিস ভাবে না! আর কেউ চা করলে ভালোই হয় না তোমার মতো।'

'এখন খাবে, বাবা? আনব চা করে?'

'এখন না, তিনটে তো বাজেনি এখনও—'

'ও! তাহলে এগুলো এখন মাজি গিয়ে, খুব ভালো করে মাজব তো—ততক্ষণে তিনটে বেজে যাবে।—ও মা! এই যে সেই থালাটা!'

'আর না টুনি, এখন যাও।'

'আমি ভেবেছিলাম ওটা হারিয়ে গেছে। কী সুন্দর! ওটা আমাকে দিয়েছিল, না বাবা?'

'তুমি চেয়ে নিয়েছিলে।'

'মোটেও না! আমাকে দিয়েছিল। সেই শান্তিনিকেতনে, না? কে যেন দিয়েছিল, বাবা? কী দেবী?'

'তপতী দেবী দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তপতী দেবী। কী সুন্দর দেখতে তপতী দেবী, আর কী সুন্দর বাড়িটা, আর কত বড়ো কুকুর! কেন দিয়েছিল বাবা?'

'দিয়েছিল বলে না, দিয়েছিলেন।'

'ও, হ্যাঁ—ভুলেই যাই। কেন দিয়েছিলেন?'

'চা খাবার পরে ওতে মশলা দিয়েছিলেন আমাদের, তুমি হাতে নিয়ে আর দিতে চাইলে না, তাই উনি তোমাকে দিয়ে দিলেন। ও তো একরকম চেয়েই আনা।'

'মোটেও না! আমি কক্খনো চাইনি! আচ্ছা বাবা! তপতী দেবীর মনে আছে থালাটার কথা?'

'যে দেয় তার কি মনে থাকে!'

'থাকে না, না? কিন্তু দেখলে তো মনে পড়বে?'

'তা হয়তো—'

'তপতী দেবী আমাদেব এখানে এলে কী মজা হয়! বেশ, আমরাও ওতে করে মশলা দিতে পারি ওকে।'

'ওকে বলতে হয় না, ওঁকে।'

'দেখলে তো চিনবেন যে ওঁরই থালা, আর কী রকম অবাক লাগবে তখন! বাবা, তপতী দেবীকে একদিন আসতে বলো?'

'উনি তো শান্তিনিকেতনেই থাকেন—'

'কোনোদি-ন কলকাতায় আসেন না?'

'আসেন মাঝে-মাঝে।'

'এলে একদিন বোলো, বোলো কিন্তু! বলবে তো?'

'বলব!'

'যাই এখন, তোমার অ্যাশট্রে মাজি গে, ঠিক তিনটের সময় চা দেব তো?', বলেই বারান্দার তুলসীর টব থেকে মাটি নিয়ে টুনি সবেগে অ্যাশট্রে মাজতে বসে গেল, আর তার বিদ্বান বাপ এতক্ষণে রেহাই পেয়ে ডিক্‌শনারি খুলে শক্ত-শক্ত কথা খুঁজতে লাগলেন লেখার মধ্যেই বসাবার জন্য।

বিকেলবেলা টুনি বললে সুমিকে, 'দিদি শোনো—জানো একটা মজা!'।

'কী হয়েছে?'

'সেই থালাটা খুঁজে পেয়েছি আজ, জান না!'

'থালা?'

'হুঁ-উ, সেই তপতী দেবীর থালা—সেই যে শান্তিনিকেতনে—মনে নেই তোমার—,

'ও-ও, তপতী দেবী!'

'কী সুন্দর ছোট্ট থালাটা আমাকে দিয়েছিল—মানে, দিয়েছিলেন—সেটা খুঁজে পেয়েছি, জান! তপতী দেবী এলে ওতে মশলা দেব—কী মজা হবে তখন!'

'এ আবার একটা মজা কী!'

'তপতী দেবীর তো আর মনে নেই থালাটার কথা, দেখে কীরকম অবাক লাগবে বল তো?'

'কেন, অবাক কেন?'

'বা রে! ওর থালাতেই ওকে মশলা দেব—উনি তো ভাবতেও পারবেন না সে কথা!'

'টুনিটা কী রে!' বলে তার পাঁচ বছরের বড়ো দিদি বেণি দুলিয়ে চলে গেল বন্ধুর বাড়িতে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র রিহার্সেলে।

সন্ধেবেলা মা-র কাছে এসে টুনি বললে, 'মা, একটা কথা শুনবে—রাগ করবে না তো?'।

'কী—বল না।'

'তপতী দি-কে একবার আসতে বলবে, মা?'

'তপতী-দি না, তপতী দেবী। শান্তিনিকেতনের তপতী দেবী।'

'একবার বলবে আসতে?'

'কেন, শুনি?'

'তপতী দেবী আমাকে একটা থালা দিয়েছিলেন—সেটা তো হারিয়ে গিয়েছিল—মানে, সত্যি হারায়নি, আমি ভেবেছিলাম হারিয়ে গেছে, কিন্তু আজ খুঁজে পেয়েছি বাবার টেবিলে ডিক্‌শনারির তলায়। তপতী দেবী এলে না—আমি না—সেইটে করে মশলা দেব। কী মজা হবে, না মা?'

'ভাবি মজা তো!', বলে মা উঠে গেলেন রান্নার তদারক করতে।

টুনি মার পিছনে পিছনে গিয়ে বলল, 'বলবে মা, আসতে?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বলব—'

'একটা চিঠি লিখে দাও না এখনই—'

'তোর বাবাকে বল গিয়ে—', বলে মা বঁটি পেতে চালকুমড়ো কাটতে বসে গেলেন।

বাবামশাই টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে তখনও লেখার উপর ঝুঁকে, সারাদিনে তাঁর পণ্ডিতি লেখার মাত্রই দু-পাতা এগিয়েছেন। টুনি এসে খুব নরম গলায় ডাকল, 'বাবা?'

'উঁ।'

'কী লিখছ, বাবা?', এবার একটু গলা চড়ল টুনির: 'কী লিখছ—গল্প না কবিতা? ছোটোদের না বড়োদের?'

'গল্পও না, কবিতাও না, প্রবন্ধ।'

'প্র-বন্ধ কী, বাবা?'

'যা ছোটো-বড়ো কেউই পড়ে না, তাকেই বলে প্রবন্ধ।'

'ও—ও! তার মানে তুমি কিছুই লিখছ না! তাহলে তো তুমি একটা চিঠিও লিখতে পার, বাবা।'

'খুব পারি।'

'তপতী দেবীকে একটা চিঠি লিখে দাও না বাবা, একদিন আসতে লিখে দাও। এখনই লেখো।'

কথার সঙ্গে কুস্তি করে করে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন বাবামশাই, লেখার বড়ো কাগজ সরিয়ে, চিঠির ছোটো কাগজ টেনে নিয়ে বললেন, 'কী লিখব, বল।'

'বললাম তো আসতে লেখো—আবার কী! লিখে টিকিট লাগিয়ে রেখে দাও, কাল সক্কালে উঠেই আমি ডাকে দিয়ে আসব। আর কাউকে দিয়ো না কিন্তু ডাকে দিতে।'

প্রবন্ধ লেখায় ক্লান্ত হয়ে টুনির বাবা সত্যিই একখানা চিঠি লিখে ফেললেন তপতী দেবীকে, আর সে চিঠি পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে চোখ খুলেই টুনি দিয়ে এল রাস্তার ডাকবাক্সে। তারপর বারান্দার রেলিং ধরে লাফাতে-লাফাতে একা-একাই চ্যাচাতে লাগল, 'কী মজা! কী মজা! কী মজা।'

*　*　*

টুনি ভেবেছিল চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তপতী দেবী চলে আসবেন—কিন্তু না! একদিন-একদিন করে কতদিন কেটে গেল, কে কোথায়! থালাটি মেজে-মেজে আয়নার মতো করে তুলল টুনি; বাবার টেবিলে রাখলে বাবা ওতে সিগারেটের ছাই ফেলবেন নিশ্চয়ই, মা-র ড্রেসিং টেবিলে রাখলে সিঁদুর-টিঁদুর লেগে নষ্ট হবে, তাই, একেবারে লুকিয়ে ফেলল খাটের জাজিমের তলায়। 'তপতী দেবী কবে আসবেন?', এ কথা জিজ্ঞেস করে মা-র তাড়া খেল সে, বাবার মুখে 'আসবেন একদিন' ছাড়া আর-কিছু শুনল না, আর দিদি? দিদিকে বলতে গেলেই এমন কলকল করে হাসে যে রীতিমতো ঘেন্না ধরে গেল টুনির। মাঝে-মাঝে থালাটি বের করে নাড়াচাড়া করে দেখে, আর কোনো চুপচাপ বেকার দুপুরবেলায় কি বৃষ্টি-পড়া বিকেলে জানলার ধারে বসে-বসে বলে, 'দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না, তপতী দেবী কেন আসে না!'

আপনমনেই বলে, আর—কেউ শোনে না সে কথা।

এক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে কলকাতার রাস্তায় ট্রাম পুড়ল, গুলি চলল, কত মানুষ লরি চাপা পড়ল, আর টুনির মাথা বাবার টেবিল ছাড়াল, আর সেই থালাটি আরও দু-বার হারিয়ে আরও দু-বার খুঁজে পাওয়া গেল। তারপর একদিন টুনি যখন শুয়ে-শুয়ে হাত-পা নেড়ে রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডে শোনা 'বীরপুরুষ' কবিতা আওড়াচ্ছে, হঠাৎ মা-বাবার কথার মধ্যে তপতী দেবীর নাম শুনে সে, 'হা-রে-রে-রে-রে-রে' বলতে বলতে থেমে গেল। হাত-পা নড়া বন্ধ হল তার, চোখদুটি স্থির হল, তারপর, আর থাকতে না পেরে উঠে বসে বলল, 'সত্যি নাকি বাবা?'

'কী'

'তপতী দেবী কাল আসবেন?'

বাপ বললেন, 'হ্যাঁ টুনি, তোমার তপতী-তপস্যা সার্থক হল এতদিনে।'

মা বললেন, 'কী, অতটুকু মেয়ের মুখে তপতী দেবী! মাসিমা বলতে পার না! কাল এলে মাসিমা বোলো, বুঝলে?'

টুনি আর-কিছু বলল না, লাফাল না, চ্যাঁচাল না; বালিশে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে মাথাটি একবার এ-কাৎ একবার ও-কাৎ করতে লাগল, বুকের ভিতর থেকে তার সমস্ত ছোট্ট শরীরটিতে সুখের একটা শিরশিরানি যেন ঘুমের মধ্যেও থামল না।

*　　*　　*

পরদিন দুপুরবেলা বারান্দার রোদ্দুরে বসে বসে সে থালাটি মেজে-মেজে এমন করে ফেলল যে মুখ দেখা যায়। মা-র পান সাজবার ডালাটা তোলা ছিল বাবার বইয়ের আলমারির মাথায়—হাতের কাছে পেলে দুই মেয়েই কুটুর কুটুর করে বড্ড মশলা খায় কিনা—টুনি একবার দেখে নিল মা বেশ ঘুমুচ্ছেন, তারপর একটা চেয়ার ঠেলে ঠেলে আলমারির কাছে নিয়ে তার উপর দাঁড়াল, তবু ভালো করে হাত পায় না—কসরত করে হাত বাড়িয়ে-বাড়িয়ে তুলে আনল কয়েকটি লবঙ্গ, এলাচ, সরু করে কাটা একটু সুপুরি, সবশেষে মাত্র একমুঠো ভাজা মৌরি মুখে পুরে নেমে এল, থালাটিতে সাজাল সুপুরি, লবঙ্গ, এলাচ, ভাঙা কাচের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে রেখে দিল ওই আলমারিতেই নিচের তাকে বড়ো-বড়ো শোয়ানো বইয়ের ওপরে, পাতলা একখানা বই দিয়ে ঢেকেও দিল। চেয়ারটা ঠেলে-ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেল ঠিক জায়গায়, তারপর পাটি-বিছানো খাটে মা-র পায়ের কাছে গড়াতে গড়াতে কখন স্থির হল, কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখল কেউ ঘরে নেই, আর বসবার ঘর থেকে যেন চায়ের টুং টাং আওয়াজ আসছে। হাওয়ার মতো ছুটল সেদিকে, কিন্তু ঘরে ঢুকল না, দরজার পরদা ধরে দাঁড়িয়ে রইল, পরদাটা দাঁতে চিবোতে গিয়েই মা-র বকুনি মনে করে থেমে গেল। ধবধবে সাদা কাপড় পরে ধবধবে রং নিয়ে তপতী দেবী বসে আছেন, তাঁর পাশে বসে চা ঢালছেন মা, বাবা অন্য একটা চেয়ারে বসে কবিতা-টবিতার কথা বলছেন, তার দিদিও একলা একটা চেয়ারে শাড়ি পরে বসে একটু-একটু তাকাচ্ছে, আর একটু-একটু নখ কামড়াচ্ছে। টুনি দু-বার সরে এসে আর একবার মুখ বাড়াল।

তপতী দেবী তাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, 'আরে এসো এসো, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

এক-পা দু-পা করে এগোল টুনি।

হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে তপতী দেবী বললেন, 'আমাকে মনে আছে তোমার? মনে আছে শান্তিনিকেতনের কথা?'

'মনে আছে মানে! আপনার নামই তো দিবারাত্র জপছে—তা কবিতার এই অধঃপতনের আসল কারণটা—'

টুনির বিদ্বান বাবা স্যান্ডউইচ খেতে-খেতে কবিতার অধঃপতনের কারণ দেখাতে লাগলেন, আর টুনি লাল হয়ে ঘেমো হাতে হাত ঘষে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল।

'তুমি কিছু খাবে না?', বলে তপতী দেবী তার হাতে একটুকরো কেক দিতে যাচ্ছিলেন, মা গম্ভীর গলায় বললেন, 'টুনি যাও, চোখমুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে ভালো জামা পরে এসো।'

'আহা থাক না—কী মিষ্টি দেখাচ্ছে ঘুম-ভাঙা চোখে', তপতী দেবী এ কথা বললেন, কিন্তু হাত সরিয়ে আনলেন কাঁধের ওপর থেকে। ছাড়া পেয়ে টুনি দৌড়ে পালাল।

ফিটফাট হতে অনেকটা সময় গেল তার। তার কারণ, প্রত্যেকটা কাজে তার খাটুনি বেশি; বাথরুমের কল সে হাতে পায় না, ড্রেসিং টেবিলের চেয়ারে উঠে হাঁটু

হেমন্তশ্রী

শিল্পী : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ভেঙে বসলে তবে তার মুখের ঠিক ছায়া পড়ে, চুল তার এত ঘন যে মাথা আঁচড়ানো তার বিভীষিকা, ফ্রকের পিছন দিকের বোতাম সে তো লাগাতেই পারে না, মা-ই তাকে সাজিয়ে দেন রোজ—আর দিদিও—কিন্তু দিদি কি এখন নড়বে ওখান থেকে, শাড়ি পরে পেখম মেলে বসেছে! সে-ও তো তার সবুজ শাড়িটা—কিন্তু তা কেমন করে হবে, নিজে-নিজে পরতেই পারবে না। ইস! ঘুমিয়ে পড়েছিল বলেই তো, নয়তো বেশ সেজে-টেজে থাকতে পারত দিদির মতো। দিদিটা এমন, একবার ডাকল না তাকে, আর মা—মা-ই বা কী রকম?

সাজগোজ শেষ করে আর-একবার পরদার ফাঁকে উঁকি দিল সে। ও মা! এরই মধ্যে চা খাওয়া হয়ে গেছে, তপতী দেবী উঠে দাঁড়িয়েছেন, চলে যাবেন নাকি এক্ষুনি! মরি-পড়ি করে সে ছুটল বাবার আলমারির দিকে, যেখানে তার এক বছরের সঞ্চিত সাধ বই-চাপা হয়ে লুকিয়ে আছে।

'আর একটু বসবেন না?'

'না ভাই, আজ চলি—খুব আনন্দ হল—'

'আমাদের প্রায়ই মনে পড়ে আপনার কথা।'

'সে আমার সৌভাগ্য—'

এই রকম সব কথাবার্তার মধ্যে, তপতী দেবী, মা, বাবা তিনজনেই যখন দরজার ধারে এগোচ্ছেন, আর শাড়ি-পরা দিদিও বড়ো বড়ো ভাব করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় ছোট্ট ঝাঁকড়া মাথা, দুটো দাঁত-পড়া টুনি টকটকে লাল মুখে ছুটে ঢুকল ঘরের মধ্যে, মা-র আর তপতী দেবীর মাঝখানে এসে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল, হাতে তার ঝকঝকে থালায় সাজানো কালো-কালো লবঙ্গ, সাদা-সাদা ছোটো এলাচ, আর সরু সরু চিকরি মিকরি সুপুরি। চলতে গিয়ে তপতী দেবী যেন বাধা পেলেন। পাশে তাকিয়েই মিষ্টি হেসে বললেন, 'বা রে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

টুনির মনে হল তপতী দেবীর মতো সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

'মশলা নিয়ে এসেছ—লক্ষ্মী মেয়ে! কিন্তু তোমার মা তো আগেই মশলা দিয়েছেন আমাকে।'

টুনির ঘাড় হেঁট হল, কেঁপে উঠল ভরা ভরা লালচে

'আচ্ছা দাও, তোমার থেকেও নিই একটু'; তপতী দেবী একটি লবঙ্গ তুলে নিলেন সেই থালা থেকে, যে থালা টুনি এক বছর ধরে তার ইচ্ছে দিয়ে উজ্জ্বল করেছে, কিন্তু তপতী দেবী থালাটি যেন চোখেই দেখলেন না।

টুনির থালা-ধরা হাতখানা থরথর করে কেঁপে উঠল।

তার দিকে তাকিয়ে টুনির বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আহা, আসল জিনিসটাই আপনি লক্ষ করলেন না, তপতী দেবী—টুনির হাতে আপনারই থালা, আপনিই দিয়েছিলেন ওকে—

'ও—ও! তাই নাকি?', হেসে হেসে, টেনে টেনে তপতী দেবী বললেন।

'আপনি এলে ওতে মশলা দেবে বলে মেজে মেজে বোধ হয় ক্ষয় করেই ফেলেছে—আর আপনি কিনা কিছুই বললেন না।'

বলে টুনির বিদ্বান বাপ হো-হো করে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মা-ও হাসলেন, শাড়ি-পরা দিদি খিলখিল করে উঠল, আর তপতী দেবী মুখ টিপে মুচকি হেসে মুখের কথায় যেন মধু ঢেলে দিলেন: 'ও মা! সত্যিই তো! থালাটি চাঁদের হাতে পড়ে চাঁদ হয়ে গেছে, দেখছি!'।

বলে নিচু হয়ে চুমু খেলেন টুনির কপালে।

টুনি পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মা ঘরে এসে ডাকলেন, 'টুনি!'

কোনো সাড়া নেই।

'বা-রে! মেয়েটা গেল কোথায়?' ঘরের চারদিকে তাকাতে-তাকাতে সবশেষে চোখে পড়ল, টুনি বসে আছে বাবার লেখার টেবিলের তলায় দেয়ালের দিকে মুখ করে।

মা কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'টুনি, শোনো!'

টুনির মাথা আরও নিচু হল, পিঠ আরও একটু বেঁকল।

'ও রাগ বুঝি? রাগ তো টুনটুনির হাতে ধরা', আপন মনেই মা বলতে লাগলেন, 'কিন্তু রাগের কারণটা কী তা-ই তো বুঝলাম না! কারণ না জানলে তো আর কিছু করা যায় না! তা বড়ো-বড়ো দুটো চমচম রেখেছিলাম টুনির জন্যে, যাই তবে, কাঞ্চাকেই দিই গে!'

এতেও কোনো ফল হল না।

তখন মা মেঝেতে বসে পড়ে মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কী রে, কী হয়েছে?'

টুনি ঢক করে একবার ঢোঁক গিলল।

'লক্ষ্মী, মা, শোনো', মা অন্যরকম চেষ্টা করলেন এবার, 'থালাটা কোথায় রে—কী সুন্দব মেজেছিলি, আর কী সুন্দর দেখাচ্ছিল মশলা সাজিয়ে! এমন কি টুনি ছাড়া আর কেউ পারে! তপতী দেবী দেখে তো অবাক!—কই দেখি থালাটা!—দেখি না!'।

হঠাৎ টুনির নিশ্চল শরীর থেকে হাতের এমন একটা দ্রুত ভঙ্গি হল যেন তলোয়ার উঠে এল খাপ থেকে। পরমুহূর্তেই ঝনঝন শব্দে দূরের মেঝেতে ছিটকে পড়ল মোচড়ানো তোবড়ানো একটা পিতলের পিণ্ড!

'এ কী!', মা চেঁচিয়ে উঠলেন: 'এ কী করে হল? ও, তাই! এই জন্যেই মেয়ে মুহ্যমান। আহা, এত সাধের থালা ওর! কী করে হল এ রকম?'

কোনো উত্তর নেই।

'তুমি করেছ?'

টুনি চুপ।

'কাঞ্চা?'

টুনি চুপ।

'নিশ্চয়ই কাঞ্চা—কাঞ্চা ছাড়া বাড়িতে এমন অলক্ষ্মী আর কে! দাঁড়া, ডাকছি ওকে।'

চকিতে মুখ ফিরিয়ে টুনি বলে উঠল, 'কাঞ্চা করেনি।'

'কে তবে?'

'আমি।'

'তুই!'

'হ্যাঁ।'

'সত্যিই তুই!'

'হ্যাঁ।'

'তুই পারলি ওরকম করতে!'

'বিশ্রী! বিশ্রী থালা', টুনিব গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল, 'এত পিটোলাম হাতুড়ি দিয়ে—তবু কি ভাঙল!'

'অ্যাঁ! হাতুড়ি দিয়ে—'

গলা চড়াতে-চড়াতে মা ঝপ করে থেমে গেলেন, বাকি কথাগুলি যেন গিলে ফেলে হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কাছে টেনে আস্তে বললেন, 'কেন রে, কেন করলি এ রকম?'

'বেশ করেছি! চাই না! ও থালা আর চাই না!', বলতে-বলতে টুনির গলা ভেঙে গেল।

মা তাকে দু-হাতে কোলে টেনে বললেন, 'টুনি, বলো তো কী হয়েছে—আমাকে বলো।'

আর সঙ্গে-সঙ্গে মা-র বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে, ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে মুখ দিয়ে আওয়াজ না করে টুনি কাঁদতে লাগল এমনভাবে যেন সে এখনও প্রাণপণ চেষ্টা করছে কাঁদবে না। কান্নার বেগে দম আটকে এল, ছোট্ট শরীরটি মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে উঠল, লাবণ্য-ভরা মুখখানায় এমন সব রেখা ফুটে উঠল যা তার মা আগে কখনও দেখেননি।

এ কান্না কী, কান্না কেন, মা-ও যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। ছোটোদের দুঃখ, ছোটোদেব মেজাজ মবজি জেদ, এ তাব কোনোটাই নয়; এ কান্না যেন বড়োদের মতো, যে কান্না বড়োবা কাঁদে জীবনে একবাব দু-বার এ যেন সেই। মা কিছু বললেন না, কী বলবেন ভেবে পেলেন না, এক হাতে মেয়েকে জাপটে ধরে আব-এক হাতে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন শুধু; মনটা তাঁরও যেন বড্ড খারাপ হয়ে গেল।

আস্তে-আস্তে কান্না ফুরিয়ে এল, ফুরিয়ে গেল, টুনি শান্ত হল। আরও একটু চুপ করে থেকে মা ডাকলেন, 'টুনি।'

'উঁ।'

'এখন বল কী হয়েছে।'

টুনি কিছু বলল না।

মা বললেন, 'তপতী দেবী কত ভালো বললেন তোকে, বললেন, "কী লক্ষ্মী, কী সুন্দর মেয়ে—"।'

'বলে দিলে ওরকম সবাই বলে।'

'বলে দিলে মানে?'

'বাবা তো বলে দিলেন', কান্না শেষের ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে প্রায়-শোনা-যায়-না এমন গলায় টুনি বলতে লাগল, 'বাবা বলে দিলেন, তবে তো—! আর তোমরা সবাই হাসলে, আর···আর···আমি তো খেলছিলাম না, আমি তো সত্যি···'

আর বলতে পারল না টুনি, তার মনের কথা বলবার ভাষা তো সে জানে না, কেউ কি জানে তার মনের কথা, সে কি নিজেই জানে? ফোলা ফোলা লাল চোখ মা-র চোখে একবার রেখেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল, এমন একটি নিশ্বাস পড়ল তার, এমন শান্ত, মৃদু গভীর, যে তার অর্থ না-বুঝেও মা-র চোখে জল এল।

কি করে বুঝবো

আশাপূর্ণা দেবী

ছ-বছরের বুকু বাড়ির বাইরের রোয়াকে বসে খেলা করছিল। বাড়ির সামনে একখানা রিক্‌শা গাড়ি এসে থামল। রিক্‌শা থেকে নামলেন দুটি বেজায় মোটাসোটা ভদ্রমহিলা আর একটি বুকুর মতো বয়সেরই ছেলে। সেটিও নেহাত রোগা নয়।

বুকু খেলতে-খেলতে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়, আরে বাবা! রিক্‌শা গাড়ির অতটুকু খোলের মধ্যে এদের জায়গা হয়েছিল কী করে?

দুটি মহিলার মধ্যে একটি মহিলা রোয়াকে উঠে একগাল হেসে বলেন—কী খোকা, চিনতে পারছ?

বুকু দুই কোমরে দুই হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের দিকে সোজা তাকিয়ে যেন বেশ তলিয়ে একটু ভেবে নেয়, তারপর গম্ভীরভাবে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দু-দিকে মাথা নাড়ে।

মহিলাদুটি তো ওর ধরন দেখে হেসেই খুন!

একজন বলেন—আহা, আমরা এসেছিলাম সে-ই কবে! ওর মনে থাকবে কী করে!

বুকু বিজ্ঞের মতো বলে—তা ছাড়া তখন হয়তো অ্যাতো মোটা ছিলেন না আপনারা। অ্যাতো মোটা কাউকে দেখিইনি কক্‌খনো!

শুনেই দুজনের মধ্যে একজনের মুখ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, আর-একজন কিন্তু হেসে ওঠেন। খুক্-খুক্ করে হাসতে হাসতে বলেন—নির্মলার ছেলেটি তো আচ্ছা মজার কথা বলে! তা, তোমার মা বাড়ি আছেন তো খোকা?

—হ্যাঁ।

—চলো। বলে এঁরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েন।

শুধু ঢুকে পড়েন না, একেবারে বসেই পড়েন।··· বাইরের ঘরের হালকা-হালকা দুখানা বেতের চেয়ারের মধ্যে নিজেদেরকে বেশ কায়দা করে ঠেসে দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেন—কই খোকা, তোমার মা?

—মা! মা তো সেই তিনতলার ছাতে, রান্নাঘরে।

—ওরে বাবা!—আঁতকে ওঠেন এঁরা—তিনতলায়! সিঁড়ি ভেঙে আর উঠতে পারব না বাবা, রক্ষে কর। উঃ, বাড়ি থেকে কি আজ বেরিয়েছি? বার-দু-তিন বাস-বদল, শেষ-অবধি রিক্‌শয়!···যাও দিকিন বাবা ছুটে, তিনতলায় গিয়ে খবর দিয়ে এসো তোমার মাকে। বলো গে···উত্তরপাড়া থেকে ছেনুমাসিরা এসেছেন।

বুকু ছুটে ওপরে চলে যায়।

ইত্যবসরে নতুন-আসা ছেলেটি, যার নাম ডাম্বল, চেয়ারে গুছিয়ে বসার বদলে একখানা চেয়ার কনুইয়ের ধাক্কায় উলটেছে, টেবিল-ঢাকাটা কুঁচকে টেনে খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়েছে, টেবিলের ওপরকার খাতা-পত্তরগুলো এলোমেলো করেছে। একেবারে ঘরের ওদিককার দেওয়ালে-রাখা আলমারিটার একটা পাল্লা ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে চাবিবন্ধ কলটা বন্ধ অবস্থাতেই পাল্লার সঙ্গে খুলে বেরিয়ে এসেছে···সাজানো-গোছানো বইয়ের সারি থেকে একসঙ্গে তিন-চারখানা বই নামিয়েই—'দূর ছাই, ছবি নেই' বলে বইগুলো মাটিতে ফেলে রেখে, অবশেষে জানলার ধাপের ওপর উঠে বসে পা দোলাতে শুরু করেছে।

বুকু এসে বললে—মা আসছেন। বললেন যে—ও কী! কী কাণ্ড করেছ তুমি? আলমারি ভেঙে বই নামিয়েছ?

ডাম্বল অগ্রাহ্যভরে বুকুর দিকে চোখ-পিট-পিট করে তাকিয়ে উত্তর দেয়—ইস! আলমারি ভেঙে! একেবারে গুঁড়িয়ে ছাতু করে ফেলেছি বল। শুধু তো খুলেছি।

বুকু জোরগলায় বলে—তা খুলেছই বা কেন? ও-বই কার, তা জান? সেজকাকার! সেজকাকার বই মাটিতে!···ইঃ!

বুকুর কথার ধরনেই বোঝা যায়, 'সেজকাকা' লোকটি বিশেষ মোলায়েম নয়।

ডাম্বল কিন্তু বুকুর ভয়ের ধার ধারে না। ঠোঁট উলটে বলে—এঃ, ভারি তো বই! হতচ্ছাড়া বই! ছবি নেই!

বুকু গম্ভীরভাবে বলে—ছবি থাকবে কী জন্যে? ও কি ছোটোদের বই? ও তো বড়োদের বই। যেমন হাতির মতো চেহারা তোমার, তেমনই হাতির মতো বুদ্ধি। আচ্ছা আসুন না সেজকাকা; মজা দেখিয়ে দেবেন একেবারে! পিঠের ছাল তুলবেন তোমার!

মোটা মহিলা দুটি, যাঁদের মধ্যে একজনের নাম—ছেনুমাসি আর অন্যটির নাম বেণুমাসি, তাঁরা চোখ ড্যাব-ড্যাব করে বুকুর কথা শুনছিলেন, এইবার রেগে গম্‌গম্ করে ছেলেকে বললেন—ডাম্বল! বই তুলে রাখো! সব জায়গা নিজের বাড়ি নয়, বুঝলে?

এইতেই ছেলেকে শাসন করা হয়ে গেল ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁরা মনে-মনে বুকুর মুণ্ডপাত করেন। ····কী অসভ্য ছেলে বাবা! কথা নয় তো, যেন ইট-পাটকেল! ছেলেকে কী শিক্ষাই দিয়েছে নির্মলা।

এইবার ঘরে এসে ঢোকেন বুকুর মা নির্মলা।

আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে, ঢোকা দেখেই বোঝা যায়, কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরে ঢুকেই হই হই করে অভ্যর্থনা শুরু করে দেন—ওমা, আমার কী ভাগ্যি! ছেনুমাসি বেণুমাসি যে! এতদিনে বুঝি মনে পড়ল? আমি তো ভেবেছিলাম, ভুলেই গেছ আমাকে। সত্যি কতকাল পরে দেখা—কী আনন্দ যে হচ্ছে কী করে বলব! এত ভালো লাগছে ছেনুমাসি—

বুকুর মা যতক্ষণ কথা কইছিলেন, বুকু অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কথা শেষ হতেই বলে ওঠে—ও কী মা? এই মাত্তর যে বললে—বাবারে, শুনে গা জ্বলে গেল! অসময়ে লোক বেড়াতে আসা। ভালো লাগে না—এখন আবার ভালো লাগছে বলছ কেন?

ছেলের কথা শুনেই বুকুর মা-র মাথায় বজ্রাঘাত! এ কী সর্বনেশে ছেলে!

তিনি না-হয় বলেই ফেলেছেন দুটো কথা, তাই বলে এমনি করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে? ওদিকে ছেনু-বেণু দুই বোনের দুই দু-গুণে চারটি চোখ কপালে উঠে গেছে। তাঁরা বলে কত তোড়জোড় করে সেই উত্তরপাড়া থেকে ভবানীপুরে

ছুটে এসেছেন পাতানো বোনঝিটির সঙ্গে দেখা করতে, আর তার কাছে কিনা এই অভ্যর্থনা! এদিকে বুকুর মা-র যে সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে, তা তো আর এঁরা জানেন না। সে কথা অবিশ্যি ফাঁস করেন না বুকুর মা, ছেলের কথার উপর ঝাপ্‌টা মেরে বলেন—কী শুনতে কী শুনিস হতভাগা ছেলে, যা হয় বললেই হল?

ছেনুমাসি চালতা-চালতা গাল ফুলিয়ে তালের মতো করে গম্ভীরভাবে বলেন—আহা—তা ছেলেকে গাল দিচ্ছ কেন নির্মলা? সত্যিই তো, অসময়ে এসে পড়ে কাজের ক্ষতি করে দিলাম!

বুকুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন—কিচ্ছু না মাসিমা, এ সময়ে কোনো কাজ থাকে না আমার; এখন বিকেলবেলায় আবার এত কী কাজ?

কিন্তু বুকু শেষ করতে দেয় না। টপ্‌ করে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—বাঃ, কাজ নেই কী? এখনই তো গাদা গাদা কাজ! সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে না আমাদের? বাবা এলেই তো চলে যাব, তাড়াতাড়ি বুটিটুটি সব করে নেবে না?

এত তাড়াতাড়ি কথা বলে বুকু, তাকে আর কথার মাঝখানে থামানো যায় না।

এর পর যদি বুকুর মা কালো ছেলের কান মলে লাল করে ছাড়েন, দোষ দেওয়া যায় তাঁকে?

কান মলে দিয়ে মা ধমক দেন—যা বেরো হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! ভূতে পেয়েছে নাকি আজকে? সত্যি এ ছেলেকে ধরে আছাড় মারলে রাগ যায়। তোমরাই বল ছেনুমাসি? কেবল বানিয়ে কথা বলে!

বুকু চলে যেতে বুকুর মা ডাম্বলকে নিয়ে পড়েন।—ওমা ডাম্বল যে! দেখিনি এতক্ষণ! এত বড়ো হয়ে গেছে? আর কী সুন্দর দেখতে হয়েছে! বেণুমাসি, তোমার এই ছেলেটিই বোধহয় সবচেয়ে ফরসা, তাই না!

একেই তো পরের কালো ছেলেকে ফরসা বলা, বিচ্ছু ছেলেকে সোনা ছেলে বলা নিয়ম, তা ছাড়া আবার নিজের ছেলের বেয়াড়া কথাগুলো ভুলিয়ে দেবার জন্যে বেশি করেই বলতে হয় বুকুর মাকে। নইলে সত্যি কিছু আর ডাম্বল আহা-মরি ফরসা নয়।

বেণুমাসি এবারে একটু প্রসন্ন হয়ে বলেন,—না, ডাম্বলও ছেলেবেলায় ওইরকম ছিল। এখন রোদে ঘুরে-ঘুরে—তা, তোমার বুকুও তো কালো হয়ে গেছে।

—আমার বুকু তো কালোই ছেলে।⋯তারপর ডাম্বলবাবু, কী পড়তে-টড়তে শিখলে? ইস্কুলে ভরতি হয়েছ নাকি?

বেণুমাসি কী বলতে যাচ্ছিলেন, ডাম্বল তড়বড় করে বলে ওঠে—কাঁচকলা! ইস্কুলে ভরতি করে দিলে তো? আমার বাবাটি যে হাড়কেপ্পন! বলেন, সাত বছরেব ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাত টাকা! পারব না দিতে। পড়ে দরকার নেই, চাষবাস করে খাবে।

এবারে বেণুমাসির মুখ চুন!

ছোটো ছেলেদের সামনে যথেচ্ছ কথা বলার ফল টের পান। ছোটোবোনকে সামলাতে ছেনুমাসি হি-হি করে হেসে বলে ওঠেন,—তোর ছেলেটা কী পাকা পাকা কথা শিখেছে বেণু, শুনলে হাসি পায়! বাব্বা! ছেলের মুখে যেন খই ফুটছে!

ইত্যবসরে বেণুমাসি ধাতস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন—আজকালকার সব ছেলেই ওইরকম, দিদি। এই এক্ষুনি দেখলে না, নির্মলার ছেলে বুকু, ডাম্বল বই দু-খানায় একটু হাত দেওয়ার জন্যে কী রকম শাসাল? বলে কিনা—যেমন হাতির মতো দেখতে, তেমনই হাতির মতো বুদ্ধি! সেজকাকা তোমার পিঠের ছাল তুলবেন—এই সব। টেনে টেনে হাসতে থাকেন বেণুমাসি।

শুনে তো বুকুর মা-র আক্কেল গুড়ুম! হঠাৎ আজ কী হল ছেলেটার! সত্যিই ভূতে-টুতে পেল না কি! কই এমন অদ্ভুত বেয়াড়া তো ছিল না! কী আর করেন। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, সত্যি! এই ছেলেকে নিয়ে যে আমাদের কী জ্বালাই হয়েছে ছেনুমাসি, হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। যত বড়ো হচ্ছে, তত যেন যা তা হয়ে যাচ্ছে! কে জানে পাগলা-টাগলা হয়ে যাবে নাকি!

'পাগলা' বললে যদি দোষ খণ্ডায়! ছেনুমাসিরা অবিশ্যি তেমন বোকা নন যে, সহজে ছেলেকে পাগল বললেই তাই বিশ্বাস করবেন। মনে-মনে ভাবেন⋯মোটেই তা নয়, বরং পাগল বানাতে পারে লোককে।

হঠাৎ একটা হুড়মুড় ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে তিনজনই চমকে ওঠেন। আর কিছু নয়, শেলফের উপর থেকে টেবিল ল্যাম্পটাকে ফেলে ভেঙে শেষ করেছে ডাম্বল।

এবারে আবার ছেনু-বেণু দুই বোনের অপ্রতিভ হবার পালা, কিন্তু বুকুর মা 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' করে ওঠেন—আহা-আহা, যাক বেণুমাসি, ছেলেকে আর বকতে হবে না। ছোটো ছেলে দুরন্ত হবে না একটু ? মাটির পুতুলের মতন চুপ করে থাকবে ? ছটফটে ছেলেই আমার ভালো লাগে।

কাচ কুড়োতে-কুড়োতে বুকুর মা আরও বলেন, যে ছেলেরা ছোটোবেলায় দুরন্ত থাকে, তারাই নাকি বড়ো হয়ে মহাপুরুষ হয়।

তারপর গল্প চলে। যত সব মেয়েলি গল্প আর কী। কবে মেয়ের বিয়ে হল, কাদের বউয়ের কী কী গয়না হল, শাড়ির আজকাল কীরকম জলের দর হয়ে গেছে—ছেনুমাসিরা তো আলমারি বোঝাই করে ফেলেছেন শাড়ি কিনে কিনে, বুকুর মা রাখছেন না কেন এই বেলা,—এই সব আলোচনা।

গল্প থামাতে হয়, বুকু আর বুকুর সেজো খুড়িমা দুজনে মিলে অতিথিদের জন্যে চা আর খাবার নিয়ে আসেন। বড়ো-বড়ো রাজভোগ, ভালো-ভালো সন্দেশ, সিঙাড়া, নিমকি—

ছেনুমাসিরা 'খাব না-খাব না' করেন; অবিশ্যি যেন ভয়ানক একটা কষ্টকর কাজ করেছেন এইভাবে খেয়ে ফেলেনও সবই। ডাম্বল গাঁউ-গাঁউ করে সব-কিছু খেয়ে ফেলে, রেকাবির রস চাটে বসে বসে।

বুকুর মা বলেন—এই বুকু, তোর বাবা এসেছেন আপিস থেকে? বল্ গে যা, মাসিমারা এসেছেন।

—তা বাবা খুব জানেন! সেই জন্যেই তো চটেমটে লাল হয়ে বসে আছেন। বললেন—খুব যা হোক, ছেনুমাসিরা বেড়াতে আসার আর দিন পেলেন না! আমাদের সিনেমার টিকিটগুলো পচাবার জন্য বেছে বেছে আজই আসতে ইচ্ছে হল!

হায়-হায়! কী করবেন বুকুর মা! ছেলেকে চড় কষাবেন, না নিজেরই গালে-মুখে চড়াবেন? এ আবার কী ভীষণ শত্রুতা শুরু করেছে আজ বুকু। আর কী বলে মুখরক্ষা করবেন নিজের?

শুধু মনে-মনে ভাবতে থাকেন, এরা একবার উঠলে হয়। ছেলের হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করে ছাড়বেন।

শুধু হাত দিয়ে পেরে উঠবেন, না লাঠি-সোটা ধরবেন? ছেনুমাসিরা বিশ্বম্ভর মূর্তিতে বলেন—আচ্ছা তাহলে উঠি নির্মলা, তোমার অনেক ক্ষতি করে গেলাম—

বুকুর মা কোন্ মুখে আর বলবেন—আবার একদিন এসো ছেনুমাসি! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বোকার মতো। ডাম্বল জুতোর মধ্যে পা গলাতে গলাতে বুকুকে বলে—আমায় তো খুব বলা হচ্ছিল, তুই ইস্কুলে ভরতি হয়েছিস?

বুকু বুক টান করে বলে—নিশ্চয় !

—কোন্ স্কুল?

—আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

—ক-খানা বই রে?

—সে অনেক। সব মিলিয়ে সাত-আটটা।···বাবাঃ, আর কত দেরি করবে তোমরা? যাও এবার! রাত্তির হয়ে গেল যে! এখন মা কখনই বা রান্না করবেন, আর কখনই বা তোমাদের নিন্দে করবেন?

নিন্দে—!

ছেনুমাসিরা শুধু হার্টফেল করতে বাকি রাখেন!

আর বুকুর মা?

তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, হার্টফেল করেইছেন বুঝি বা!

এবারে ডাম্বল ঘুসি পাকিয়ে আসে—নিন্দে কেন রে! নিন্দে কীসের?

—বাঃ নিন্দে করা হবে না?—বুকু যেন অবাক হয়ে গিয়েছে, এইভাবে বলে—বেড়াতে-আসা লোক চলে গেলে, নিন্দে করতে হয় না তাদের? বলতে হবে না—ছেলেটা কী অসভ্য হ্যাংলা—মাসিরা কী অহংকারী—এসে তো মাথা কিনলেন, শুধু শুধু এক গাদা পয়সা খরচ হয়ে গেল? তা ছাড়া—

বুকু এত তাড়াতাড়ি কথা বলবে, ধরলে কথা থামায় কে? যা বলবার সবই বলে নেয় সে। তবু ওর 'তা ছাড়া—'কে থামিয়ে দিয়ে ছেনুমাসি বলেন—বলো বাবা, প্রাণ ভরে বলো—বলে গট্-গট্ করে চলে যান। পিছন-পিছন বেণুমাসি আর ডাম্বল।

আর ওঁরা বেরবার সঙ্গে-সঙ্গেই বুকুর মা রণচণ্ডী মূর্তি নিয়ে শুরু করেন ছেলে ঠেঙাতে।

ঠেঙান আর চেঁচান—বল্ শয়তান ছেলে, কেন ওরকম কথা বললি? বল্, বল্ শিগ্গির। মেরে মেরে তোকে মেরেই ফেলব আজ। তবু চুপ করে আছিস? কেন ওসব বললি? যতক্ষণ না বলবি, মার থামাব না, আমি।—লক্ষ্মীছাড়া পাজি বাঁদর। লোকের সামনে আমার মুখে চুন-কালি!

গোলমাল শুনে বুকুর বাবা এসে হাজির—কী হল কী? ছেলেটাকে বেধড়ক পিটোচ্ছ কেন?

—পিটোব না! বুকুর মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, —পিটিয়ে ওকে তক্তা করব আমি। জান—ও কী করেছে আজ?

একে-একে ছেলের ভূতুড়ে বুদ্ধির কথা বলতে থাকেন মা, আর শুনতে-শুনতে বাবা রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। তখন তিনিও লেগে যান প্রহারে।

সত্যি, যে ছেলে মা-বাপকে এভাবে বাইরের লোকের কাছে অপদস্থ করে, তাকে মেরে তক্তা করে ফেললেই কি রাগ মেটে?

দুজনে মিলে চেঁচান—বল্, বল্ কেন ওসব বললি? বুকু অনেকক্ষণ গোঁ ধরে চুপ করে মার খাচ্ছিল ; আর পারে না। ডুকরে কেঁদে উঠে বলে—নিজেই তো দুপুরবেলা একশোবার করে বললে—সবসময় সত্যি কথা বলবি, কারও কাছে কিছু লুকুবি না; এখন আবার নিজেই মারছ? কী করে বুঝব, আসলে কী করতে হবে?

লীলা মজুমদার

আমার ছোটোকাকা মাঝে-মাঝে আমাদের বলেন, এই যে তোরা আজকাল চাঁদে যাওয়া নিয়ে এত নাচানাচি করিস, সে কথা শুনলে আমাদের হাসি পায়। তোরা আবার এটাকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিস, ছোঃ!

আমরা তখন বলি, তার মানে? কী বলতে চাও খুলে বলো না?

ছোটোকাকা বলেন, তার মানেটা খুবই সোজা। চাঁদে যাওয়াটা কিছু-একটা তেমন আজকালকার ব্যাপারই নয়। পঞ্চাশ বছর আগে আমি নিজেই তো একরকম বলতে গেলে চাঁদে ঘুরে এসেছি।

আমরা তো অবাক!—একরকম বলতে গেলে কী? গেছিলে, না যাওনি?

ছোটোকাকা বইয়ের পাতার কোনা মুড়ে রেখে পা গুটিয়ে বসে বললেন, তাহলে দেখছি সব কথাই খুলে বলতে হয়। বয়স আমার তখন বারো-তেরো হবে, পুজোর ছুটিতে গেলাম মামাবাড়িতে। সেজমামা অনেক করে লিখেছেন। এমনিতেই আমি কোথাও গেলে সেখানকার লোকেরা খুব যে খুশি হয় বলে মনে হয় না। আর সেজমামা তো নয়ই। তা ছাড়া দিদিমা সারাক্ষণই এটা-ওটা দেন, খাওয়া-দাওয়া ভালো, পুকুরে ছিপ ফেললেই এই মোটা মোটা মাছ, গাছে চড়লেই ডাঁসা পেয়ারা। না যাবার কোনো কারণই ছিল না।

সেখানে পৌঁছে দেখি সেজমামা কোত্থেকে একটা লড়ঝড়ে মোটরগাড়ি জোগাড় করে আমাকে নিতে এসেছেন। আমাকে দেখেই, মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আগের চেয়ে যেন একটু ভারি-ভারি লাগছে! হ্যাঁ রে, তোর ওজন কত রে?

কিছুদিন আগেই ইস্কুলে সবাইকে ওজন করেছে। বললাম, আটত্রিশ সেরের সামান্য বেশি।

সেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, আবার বেশি কেন? সে যাক্ গে, ওতেই হবে, এখন গাড়িতে ওঠ্, চল্ তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাই, খুব ভালো খাওয়ায় তারা।

সেজমামাকে গাড়ি চালাতে দেখে আমি তো অবাক, তুমি আবার গাড়ি চালাতে পার নাকি?

সেজমামা বেজায় রেগে গেলেন, কী যে বলিস! আরে এই সামান্য একটা গাড়িও চালাতে পারব না? বলে কিনা যে আমি—যাক্ গে, চল্ তো এখন।

সোজা নিয়ে গেলেন কুণাল মিত্তিরের রহস্যময় বাড়িতে। ও বাড়ির ভেতরে এখানকার কেউ কখনও যায়নি, কুণাল মিত্তিরের নাম সবাই জানে, তবে তাকে কেউ চোখে দেখেনি। একটা উঁচু টিলার উপরে অদ্ভুত বাড়ি, বাড়ির চারিদিকে দেড়-মানুষ-উঁচু পাঁচিল, তার উপরে কাঁটাতারের বেড়া, দেয়াল কেটে লোহার গেট বসানো, সে সর্বদাই বন্ধ থাকে। শোনা যায় কুণাল মিত্তির নাকি নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, সেসব সাধারণের জন্য নয়, অতি গোপনে ও গুহ্যভাবে করতে হয়।

প্রকাণ্ড টিলাটার গা বেয়ে যদি চড়া যায়, উপরটা চ্যাপ্টা, সবটা ঘিরে পাঁচিল, আশেপাশে কোনো গাছগাছড়াও নেই যে তাতে চড়ে পাঁচিলের ভেতরে দেখা যাবে কিছু। তার উপরে মাঝে-মাঝে ভিতর থেকে বাড়ি-কাঁপানো-গর্জন শোনা যায়, লোকে বলে নাকি দু-জোড়া ডালকুত্তা দিনরাত ছাড়া থাকে। মোটকথা, কেউ ওদিকে বড়ো-একটা যায় না। চারিদিকে দু-তিন মাইলের মধ্যে কারও বসতিও নেই। ফাঁকা মাঠ আগাছায় ভরা।

সেইখানে তো গেলেন সেজমামা আমাকে নিয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাঁ গাঁ করতে করতে গাড়িটা তো টিলার উপরে চড়ল। তারপর প্যাঁক-প্যাঁক করে হর্ন বাজাতেই লোহার দরজা গেল খুলে। আমরাও ভিতরে গেলাম। অবাক হয়ে দেখি চমৎকার ফুলবাগান, একতলা লম্বা একটি বাড়ি, তার বারান্দায় বড়ো কালো একটা বেড়াল সোজা হয়ে বসে সবুজ চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে। একটা উঁচু দাঁড়ে নীল কাকাতুয়াও একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমাদের বলছি কেন, আসলে আমাকে দেখছে।

অমনি চারিদিক থেকে দলে দলে চাকর-বাকর ছুটে এসে মহা খাতির করে আমাদের নামাল। বারান্দা থেকে একজন ভদ্রলোকও এগিয়ে এলেন, ফরসা, কোঁকড়া চুল, বেঁটে, মোটা, বয়স বেশি নয়। সেজমামাকে ফিসফিস করে বললাম, এ নাকি সেই বৈজ্ঞানিক কুণাল মিত্তির যাকে কেউ চোখে দেখেনি!

শুনতে পেয়ে ভদ্রলোক চটে গেলেন, কেউ চোখে দেখেনি কী, আমি বিলক্ষণ দেখেছি! বিশ্রী দেখতে।

সেজমামা বললেন, আহা, বড়ো কথা বলিস। ওই তোর দোষ, কিছু মনে কোরো না, মনোহর—উনি কুণাল মিত্তির হতে যাবেন কেন, কুনাল মিত্তির ওঁর বাবা, ওঁর নাম মনোহর মিত্তির, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। একদিন উনি ওঁর বাবার চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবেন।

মনোহরবাবু তাই শুনে ছোটো গোঁফটাকে একটু নেড়ে বললেন, আর তুমিও তার চেয়ে খুব বেশি কম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবে না।—কী যেন নাম তোমার বললে?

বললাম, আগে বলিনি, এখন বলছি—ইন্দ্র।

খুশি হয়ে বললেন, ইন্দ্র? তা ইন্দ্রই বটে, চাঁদের মাটিতে প্রথম পা দেবার গৌরব হবে যার, সে ইন্দ্রের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে কম বলো দিকিনি।

চারপাশের লোকজনেরা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

আমার তো চক্ষু ছানাবড়া। চাঁদে যাব নাকি আমি? বললাম, সে আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একা যাব না, তা ছাড়া, আবার ফিরে আসব তো? ডিসেম্বরে আমার ক্রিকেট ম্যাচের সিট বলা আছে কিন্তু।

সেজমামা আর মনোহরবাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। শেষটা মনোহরবাবু বললেন, তা হ্যাঁ— তা ফিরে আসবে বইকি, যাবে আর আসবে না, সে কী একটা কথা হল নাকি! কিন্তু আর দেরি কীসের জন্য? চলো তো দেখি ইন্দ্র, আমার সঙ্গে।

গেলাম বাগান পেরিয়ে একটা জায়গায়। তার মাথার উপর দিয়ে লম্বা একটা কী বেরিয়ে রয়েছে, বিকালের পড়ন্ত রোদে চিক্‌চিক্ করছে, আগাটা ক্রমশ সূচালো হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

বেড়ার দরজা চাবি দিয়ে খুলে মনোহরবাবু সরে দাঁড়ালেন, আমি আগে ঢুকলাম।

গিয়ে যা দেখলাম সে কী আর বলব। আগাগোড়া অ্যালুমিনিয়মের মতো কী ধাতু দিয়ে তৈরি কী একটা বিশাল যন্ত্র, অবিকল উড়ুক্কু মাছের মতো দেখতে, তবে ডানাগুলো অনেক ছোটো আর পিছন দিকে বেঁকিয়ে বসানো। দেখলেই বোঝা যায় যে একবার ছেড়ে দিলেই অমনি সুড়ুৎ করে তিরের মতো উপরে উঠে, আকাশের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। চাঁদে যাওয়া এর পক্ষে সে রকম কিছুই শক্ত হবে না।

নিচে একটা গোল প্ল্যাটফরম্ ওটাকে চারদিকে ঘিরে আছে, সেটাই প্রায় একতলার সমান উঁচু হবে, তারও নিচে যন্ত্রটার আরও অনেকখানি রয়েছে। রুপোলি গায়ে কালো দিয়ে লেখা 'ধূমকেতু'। আর একজোড়া এই বড়ো বড়ো চোখ আঁকা। আশেপাশে কত রকম যন্ত্র দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, বোঝা গেল—একবার সেইগুলো খুলে দিলেই আর দেখতে হবে না!

মনোহরবাবু চোখ ছোটো করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পকেটে কী? ওরকম ঝুলে আছে যে? ও হবে না, যতটা সম্ভব হালকা হাওয়া চাই। এই বেদে, দেখো তো ওর পকেটে কী?

বেদে বলে লোকটা এগিয়ে আসতেই বললাম, এই খবরদার, তাহলে কিন্তু চাঁদে যাব না বলে রাখলাম।

মনোহরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ওরকম করিসনে বাপ, চাঁদে যাবি না কী রে? তুই না গেলে কে যাবে বল দিকিন? কেউ রাজিও হবে না, তা ছাড়া তোর প্যান্টের মাপে সব তৈরি। এখন না গেলে আমার জীবনের সব কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে! বলছি আমার শালাকে বলে তোকে মোহনবাগান ক্লাবের লাইফ মেম্বার করে দেব।

ওঁর হাত ধরে বললাম, দেবে তো ঠিক? বাবা! সেজমামা কত চেষ্টা করেও হতে পারেনি। শেষটা কিন্তু অন্যরকম বললে—

মনোহরবাবু রেগে উঠলেন, বলছি করে দেব, আবার অত কথা কীসের? ফিরে তো এসো আগে।

তারপর ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই বেদে, যাও নিচে গিয়ে পাওয়ার লাগাও দিকিন, নইলে—।

বেদে অমনি একটা ছোটো সিঁড়ি দিয়ে যন্ত্রের তলায় চলে গেল।

মনোহরবাবু সেজমামাকে বললেন, ও কি ওর বাবা-মার একমাত্র সন্তান?

আমি বললাম, আরে না না, আমরা দুটো ভাই, দুটো বোন! আচ্ছা, লাইফ-মেম্বার করে দেবেন তো? কারণ বাবা হয়তো চাঁদা দেবেন না।

মনোহরবাবু বললেন, তাই দেব, পকেটে কী আছে বের করে রাখো তো দেখি।

মেশিনের তলা থেকে একটা ঘড় ঘড় শব্দ শুরু হল, তারপর কেমন শোঁ-শোঁ করতে লাগল। মনোহরবাবু একবার নিজের হাতঘড়ি দেখে নিলেন। আমি পকেট থেকে লাট্টু-লেত্তি, ইয়ো-ইয়ো, রুমাল, নীল গুলি, রুমেনিয়ার দুটো ডাকটিকিট—মনাদা দিয়েছিল—আধঠোঙা নরম ঝাল ছোলাভাজা, টর্চ, আমার বড়ো গুলতিটা, আর এক কৌটো শট বের করে রাখলাম।

মনোহরবাবু তো অবাক!

এসব কিচ্ছু নেবার দরকার নেই, শুধু ওজন বাড়ানো। খালি এই নোটবই আর পেন্সিলটা নেবে। কী দেখবে, না দেখবে, শরীরে কেমন বোধ করবে, সব টুকে

রাখবে। আর এই হাতঘড়িটা নেবে, এতে সেকেন্ডের কাঁটা, তারিখের কাঁটা সব দেওয়া আছে। সব লিখবে, কখন পৌঁছালে ইত্যাদি—ও কী হল, চলে যাচ্ছ যে?

আমি বললাম, গুল্‌তি শট না দিলে আমি যাব না।

সেজমামা বললেন, থাক গে মনোহর, এখন মনে হচ্ছে তুমি বরং আর কাউকে দেখো।

মনোহরবাবু বললেন, বেশ, তাহলে. আমার হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি অন্য লোক দেখছি।

সেজমামা চুপ। আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে সেজমামা? আমার গুল্‌তি দিলেই আমি যাব। অবশ্য বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই আগে খানিকটা খেয়েও নেব। আর বলেছি তো—একা যাব না।

মনোহরবাবু চটে গেলেন, একা যাব না আবার কী? জানিস, ওই কাকাতুয়াটা আর বেড়ালটা দু-তিনবার একা গেছে, কিছু বলেনি?

বললাম, চাঁদ অবধি গেছে?

মনোহরবাবু বললেন, চাঁদ অবধি গেছে কি না বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলেই তো তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। নিদেন তোমার খাতা-পেন্সিলটা ওই যে ছোটো হাউই-মতন দেখছ, ওটাতে পুরে ফেলে দিতে পারবে তো, নিজে যদি নেহাতই—আচ্ছা সে থাক গে, এখন এই বড়িটা খাও দিকিনি, কেমন পেট ভরে যায় দেখো।

বলে আমার মুখে কী একটা হলদে বড়ি পুরে দিলেন, সে যে কী আশ্চর্য বড়ি আর কী বলব! খেতেই মনে হল, আমি লুচি মাংস চপ কাটলেট ভেটকি-ফ্রাই চিংড়ি-মাছের মালাইকারি রাবড়ি কেক চকলেট ছাঁচিপান সব খাচ্ছি। একেবারে পেট ভরে গেল। সেই বড়ির শিশিটা আমার হাতে দিয়ে মনোহরবাবু বললেন, এই নাও এক মাসের খোরাক। একটার বেশি দুটো বড়ি কোনোদিন খেয়ো না, খেলেই পেটের অসুখ করবে, মোটা হয়ে যাবে. যন্ত্রের ভিতর আঁটবে না। এসো, এই আরামকেদারাটাতে বসে পড়ো দিকিনি। হাওয়ার কোনো অভাব হবে না, এমন কল করেছি ভেতরে তোমার নিশ্বাসই আবার অক্সিজেন হয়ে যাবে।

বলে সেই লম্বা চোঙার মতন যন্ত্রটার গায়ে একটা দরজা খুলে, আমাকে একটা চমৎকার হাওয়ার গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন আর মাথার ওপর দিয়ে একটা অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে দিয়ে কোমরে চেয়ারের সঙ্গে বগলেস এঁটে দিলেন। মুখের জায়গাটা বোধহয় অভ্র দিয়ে তৈরি, সব দেখতে পাচ্ছিলাম। নাকের কাছে ছ্যাঁদা, নিশ্বাস নিতে পারছিলাম। তারপর দেখি সেজমামা তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র নিজের পকেটে ভরছেন। চেঁচিয়ে বললাম, গুল্‌তি দিলে না? গুল্‌তি না দিলে যাব না বলেছি না?

অভ্রের মুখোশের ভেতর থেকে কথা শোনা গেল কি না জানি না। কিন্তু সেজমামার বোধহয় একটু মন কেমন করছিল, কাছে এসে কী যেন বলতে লাগলেন, এক বর্ণও শুনতে পেলাম না, যন্ত্রের শোঁ-শোঁ গোঁ-গোঁতে কান ঝালাপালা। দারুণ রেগে গিয়ে সেজমামার কাছা আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে লাগলাম, দাও বলছি, গুল্‌তি না নিয়ে আমি কোথাও যাই না।

এদিকে মনোহরবাবু বার বার ঘড়ি দেখছেন, যন্ত্রটা কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে, অথচ আমি এমন করে সেজমামার কাছা আঁকড়েছি যে দরজাটা এঁটে দেওয়া যাচ্ছে না। শেষটা হঠাৎ রেগেমেগে উঠে সেজমামাকে সুদ্ধ ভেতরে পুরে দিয়ে মনোহরবাবু দরজা এঁটে দিলেন।

বাবা! দিব্যি ফাঁকা ছিল ভেতরটা, সেজমামা ঢোকাতে একেবারে ঠেসাঠেসি হয়ে গেল, নড়বার-চড়বার জো রইল না। দরজা বন্ধ করাতে বাইরের শব্দ আর কানে আসছিল না, সেজমামা চিৎকার করতে লাগলেন, ও মনোহর, ফেরবার কল শিখিয়ে দিলে না যে, ফিরব কী করে?

তা কে কার কথা শোনে! ভীষণ জোরে ফুলে উঠে বোঁ করে আকাশে উড়ে গেল। একবার মনে হল চারিদিকে চোখ-ঝলসানো আলো, তারপরেই মনে হল ঘোর অন্ধকার।

যখন জ্ঞান ফিরে এল বুঝলাম চাঁদে পৌঁছে গেছি। যন্ত্রটা আর নড়ছে না চড়ছে না, কাত হয়ে পড়ে আছে, সেজমামা আমার তলায়, একটু একটু নড়ছেন-চড়ছেন। মুখ তুলে কানের কাছে বললেন, আমার ডান পকেটে তোর টর্চটা আছে, দেখ তো নাগাল পাস কি না।

বুঝলাম ওঁর হাত নাড়বার জায়গা নেই। হাতড়ে হাতড়ে ঠিক পেলাম। ভয়ে ভয়ে জানালাম, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

যন্ত্রের ভেতরটা ভালো করে দেখলাম ভেতরের কলকব্জা সব ঠিক আছে। যে যার জায়গায় আটকানো। হাত দিয়ে আমার বাঁ পাশের জিপ ফাস্‌নার খুলে মুখোশ নামিয়ে ফেললাম।

অমনি এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগল। আঃ, চাঁদের বাতাসই আলাদা রে, এ পৃথিবীতে সে রকমটি হয় না।

সেজমামা বললেন,—বেড়ে খাসা কল বানিয়েছে তো মনোহর। বলেইছিল নামবার সময় এতটুকু ঝাঁকানি লাগবে না, এতটুকু ভাঙবে না, টস্‌কাবে না।

আমি এদিকে টর্চ ঘুরিয়ে দেখি, পড়বার সময় কাত হয়ে যাওয়াতে দরজার বাইরের ছিটকিনি গেছে খুলে, দরজা এখন হাঁ!

বললাম সে কথা সেজমামাকে, কিন্তু আমি না সরলে তাঁর নড়বার উপায় নেই। তখন কোমরের বগলেস খুলে সেজমামার পেটের ওপরে দুই পা রেখে এক লাফে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে পড়া আমার কাছে কিছুই নয়। পৃথিবীতে যখন থাকতাম এর চেয়ে কত উঁচু উঁচু জায়গা থেকে লাফাতে হয়েছে। সেজমামা শুধু একটু কোঁৎ করে উঠলেন।

বেরিয়ে বুঝলাম বোধহয় চাঁদের কোনো-একটা নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখের মধ্যে পড়ে গেছি। চারিদিকে মনে হল নরম ঘাস। মাথার ওপর তারাও দেখতে পেলাম, আবার এক কোনা দিয়ে বোধহয় আমাদের এই পৃথিবীটাকেই একবার একটু দেখতে পেলাম। ঠিক যেন আর-একটা চাঁদ। মনে হল আফ্রিকাটাকে যেন একটু একটু দেখতে পেলাম। তার পরেই আবার সেটা টুক করে ডুবে গেল।

তখন কানে এল যন্ত্রের ভেতর থেকে সেজমামা মহা চেঁচামেচি লাগিয়েছেন, টর্চের আলো দেখা, আমিও নামব।

অনেক কষ্টে নেমে আমার পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে বললেন, খিদেয় পেট জ্বলে গেল, সেই বড়ি একটা দে না?

টের পেলাম আমারও বেজায় খিদে পেয়েছে, দুজনে দুটো বড়ি খেলাম, তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে থেকে অন্ধকারটা একটু চোখ সওয়া হয়ে এল। আমরা যে একটা বেশ বড়ো গর্তের মতো জায়গাতে শুয়ে আছি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ঠিক যেন একটা বিরাট পেয়ালার মধ্যে রয়েছি। একটু একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল।

সেজমামা বললেন, কী রে, উঠে একটু দেখবি না?

বললাম, ভোর হোক আগে।

সেজমামা বললেন, আবার ভোর কী রে? এটা যদি চাঁদের উলটো পিঠ হয়ে থাকে, তা হলে তো ভোরই হবে না।

এবারে উঠলাম। বললাম, তাই-ই নিশ্চয় সেজমামা। এ পিঠটাতে তো সর্বদা আলো থাকে। দিনের বেলাও তাই দেখেছি, রাতেও তাই দেখেছি।

ফোঁস।

তিন হাত লাফিয়ে উঠলাম। ফোঁস করল কী? তবে কি চাঁদে হিংস্র জন্তুও আছে? বুকটা টিপটিপ করতে লাগল। কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম জোরে একটা ফোঁস ফোঁস। আমার মোটেই ভালো লাগল না। সেজমামা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, কী হবে রে?

কী আবার হবে? এক নিমিষে গুল্‌তিতে শট লাগিয়ে শব্দ লক্ষ করে দিলাম ছেড়ে। অমনি সে যে কী চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল সে আর কী বলব?

একটা কেন, মনে হল এক লাখ জানোয়ার এক সঙ্গে চেঁচাচ্ছে। সেই চেঁচানি শুনে চাঁদের মানুষেরা জেগে উঠে সব বড়ো বড়ো মশাল নিয়ে দেখি পেয়ালার একদিকের কানা বেয়ে নামছে। কী হিংস্র সব চেহারা! কী ষণ্ডা, পৃথিবীর মানুষদের চেয়ে তিন গুণ জোরালো। আর সে কী গর্জন, কান ফেটে যায়।

আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না। তারা হয়তো ওই অন্ধকারে আমাদের দেখতে পেল না। পড়ি মরি করে প্রাণপণে ছুটে অন্য ধারের ঘাসে ঢাকা ঢালু দেয়াল বেয়ে পিঁপড়ের মতো আমরা উঠে গেলাম। শরীরে আর এতটুকু ক্লান্তি বোধ করলাম না।

ওপরে উঠেই ছুট লাগালাম। আন্দাজে অন্ধকারের মধ্যে দু-পা না যেতেই চাঁদের পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুপ করে খানিকটা পড়েই গড়াতে লাগলাম।

সব সইতে পারি, বুঝলি? শুধু ওই গড়ানিটা আমার সহ্য হয় না। তখুনি মুর্চ্ছো গেলাম। আবার যখন জ্ঞান

ফিরে এল, দেখি সেজমামা আমার মুখে-চোখে ঠান্ডা জল ছিটোচ্ছেন। আমি নড়ে উঠতেই বললেন, বাপ, বেঁচে আছিস তাহলে? দাঁড়া, গাড়িটা আনি, আর এখানে নয়, চল্‌ একেবারে ভোরের গাড়িটা ধরা যাক।

সেজমামা গাড়ি আনতে গেলেন, আমি একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। আস্তে-আস্তে মাথাটা খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এলে বুঝলাম কুণাল মিত্তিরদের টিলার নিচে এসে পড়েছি। সেজমামা গাড়ি আনতেই বললাম, কী আশ্চর্য, না সেজমামা? যেখান থেকে চাঁদে গেলাম, আবার—ঠিক সেই একই জায়গায় এসে নামলাম।

সেজমামা বললেন, আশ্চর্য বই কী। আমরা বেঁচে আছি সেটা আরও আশ্চর্য!

তাই তো, যন্ত্রটা চাঁদেই পড়ে আছে, পকেট হাতড়াতে লাগলাম। সেজমামা বললেন, আবার কী?

কেন, সব লিখে রাখতে হবে না? ওখানে ঠান্ডা বাতাস আছে, জন্তু মানুষ সব আছে—।

সেজমামা বললেন, সে আমি মনোহরকে বলে দেব'খন। আর দেখ এ-সব কথা খবরদার বাড়িতে বলবিনে।

বাবা-মারা আমাদের দেখে অবাক।—এ কী, কাল গেলে, আজই এলে?

সেজমামা বললেন, সেখানে মহামারী লেগেছে। আমাকে আজই ফিরে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে আমি কাউকে কিছু বলতে পারছি না, পেট ফেঁপে মরি আর কী!

ছোটোকাকা থামলে আমরা বললাম, তবে কেন বললে, 'এক রকম বলতে গেলে' চাঁদে গিছলে?

ছোটোকাকা বললেন, তার কারণ এই ঘটনার মাস চারেক বাদে মা হাতে করে সেজমামার একটা চিঠি নিয়ে বাবাকে বললেন, শোনো একবার কাণ্ড। ওই যে আমাদের কুনাল মিত্তিরের ছেলে মনোহর না? সে নাকি এক উড়োজাহাজ বানিয়ে যেখানে কুনাল মিত্তিরের গবেষণা-গরুরা চরছিল সেখানে নামিয়ে একাকার কাণ্ড করেছে। কুনাল মিত্তির দারুণ রেগে ওকে চাকরি দিয়ে বোম্বাই পাঠিয়েছেন।

বাবা বললেন, গবেষণা-গরু আবার কী জিনিস?

মা বললেন, ওমা, তাও জান না? কুণাল মিত্তির একরকম বড়ি বানিয়েছেন, তাতে সবরকম পুষ্টিকর জিনিস আছে, সে খেলেই পেট ভরে যায়। ওই টিলার মাথায় খানিকটা জায়গাকে পুকুরের মতো করে কেটে, অবিশ্যি তাতে জল নেই, সেখানে গরুগুলো ছাড়া থাকত। ওই বড়ি খেত আর মন ভালো করবার জন্য একটু একটু ঘাসও চিবুত। বাইশ সের দুধ দিত এক-একটা। ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া মনোহর সেইখানে উড়োজাহাজ নামিয়েছে। ব্যস, আর যাবে কোথায়, গরুরা সব দুধ বন্ধ করে দিয়েছে। কুণাল মিত্তির রেগে টং। ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়ে, এখন বলে নাকি ছেলের কোনো দোষ নেই, চমৎকার উড়োজাহাজ করেছে, কিন্তু পাড়ার কয়েকটা দুষ্টু লোক মিলেই নাকি ওর মাথাটা খেল। শুনলে একবার কথা?
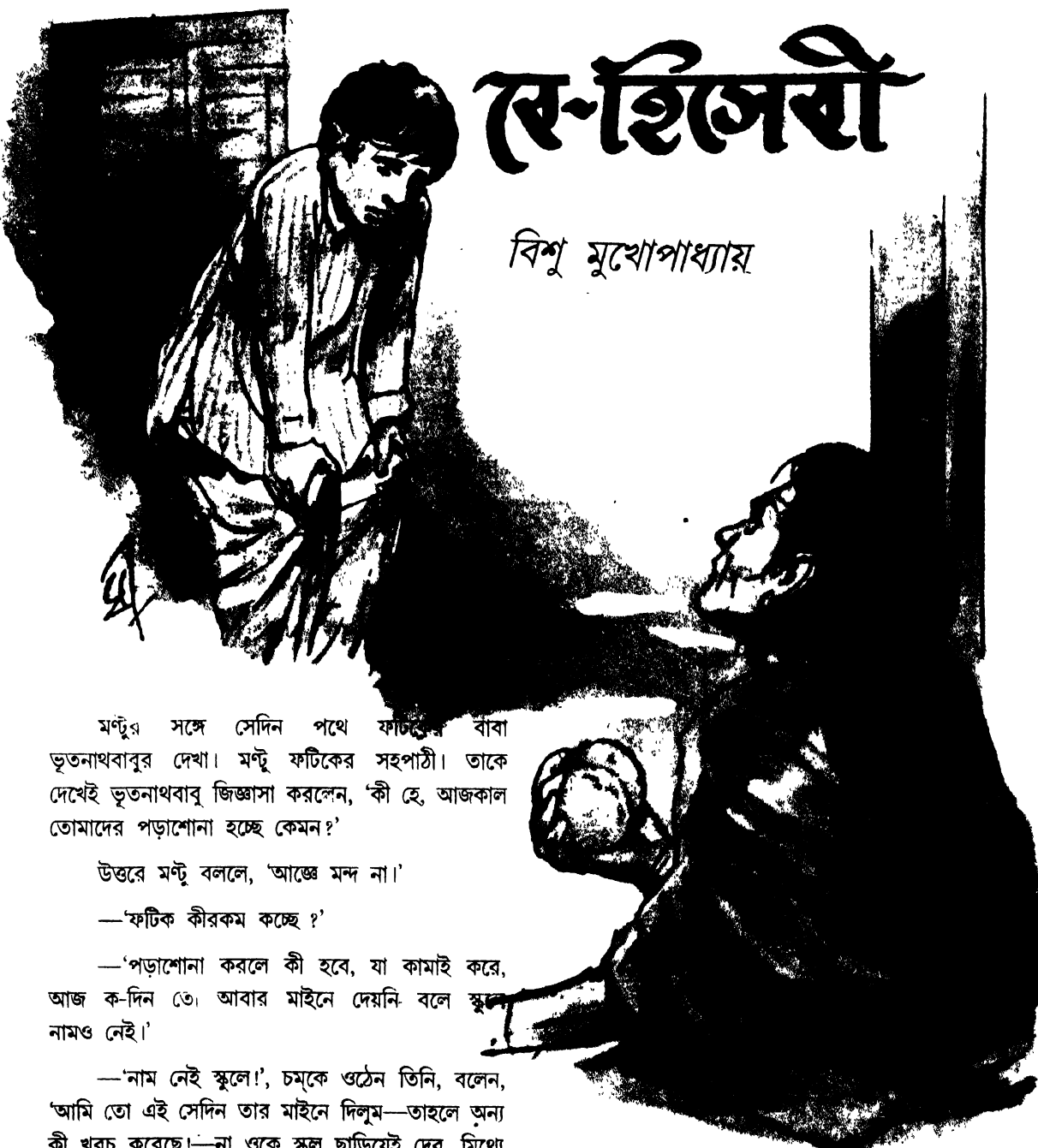
আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে গিয়ে গুলতিটা বের করে কাকদের মারতে লাগলাম।

হ্যাঁ রে, তোরা এখনও বসে রয়েছিস যে, আমাকে কি বইটা শেষ করতে দিবি না?

এই বলে ছোটোকাকা আবার পা মেলে বই পড়তে লাগলেন।

বে-হিসেবী

বিশু মুখোপাধ্যায়

মণ্টুর সঙ্গে সেদিন পথে ফটিকের বাবা ভূতনাথবাবুর দেখা। মণ্টু ফটিকের সহপাঠী। তাকে দেখেই ভূতনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হে, আজকাল তোমাদের পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?'

উত্তরে মণ্টু বললে, 'আজ্ঞে মন্দ না।'

—'ফটিক কীরকম কচ্ছে ?'

—'পড়াশোনা করলে কী হবে, যা কামাই করে, আজ ক-দিন তো আবার মাইনে দেয়নি বলে স্কুলে নামও নেই।'

—'নাম নেই স্কুলে!', চমকে ওঠেন তিনি, বলেন, 'আমি তো এই সেদিন তার মাইনে দিলুম—তাহলে অন্য কী খরচ করেছে!—না ওকে স্কুল ছাড়িয়েই দেব, মিথ্যে মাসে মাসে টাকাগুলো জলে যাচ্ছে।'

আর কথা বলেন না তিনি, রাগে দুঃখে গরগর করতে করতে বাড়ির দিকে ফেরেন। গলির মোড় ঘুরে বাড়ির কাছ বরাবর যেতেই দেখেন, কয়েকজন ছোকরা তাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

—'কী হে, তোমাদের আবার খবর কী?'

—'আজ্ঞে, জানেন তো আমরা মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষের জন্যে চাঁদা তুলছি', দলের ভেতর থেকে একটি ছেলে উত্তর দেয়।

—'ওঃ!' বলেই তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যাবার মতলবেই ছিলেন, হঠাৎ ফটিকের কথাটা মনে পড়ায় একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফটিকের কাছ থেকে কত নিলে?'

একজন একটু হেসে নম্রভাবে বললে, 'সে আর কী দেবে বলুন, আপনি যে পাঁচ টাকা দিয়েছেন, সে তো তারই দেওয়া।'

—'কী বললে, আমি পাঁচ টাকা দিয়েছি?'

—'আজ্ঞে, আপনি দুর্ভিক্ষের জন্য যে চাঁদা দিয়েছেন, সে তো আমাদেরই'—কথাটা তার শেষ হতে পেল না। ভূতনাথবাবু ভীষণ গর্জন করে উঠে বললেন, 'হতচ্ছাড়া, স্কুলের মাইনে ভেঙে দুর্ভিক্ষের চাঁদা দেওয়া!...তা দেবে বই কী—নবাব খাঞ্জাখাঁর নাতি—কত ধানে কত চাল, তা তো আর তাকে জানতে হয় না!'

সত্যি ফটিকের স্বভাবই এমনই—একেবারে ছোটোবেলা থেকেই। দরজায় ভিখিরি এসে একবার ডাক দিলে হয়, অমনি ফটিক ছুটল, কাউকে কিছু না বলে, ভাঁড়ার থেকে লুকিয়ে এক রেকাব চাল, চারটে আলু বা দুটো পয়সা দিয়ে এল তাকে। জামা-কাপড় ছেঁড়া কী নতুন কে তার তোয়াক্কা করে—ফটিক দিলে ওপর থেকে ছুঁড়ে।

বড়ো হতে সবাই বলত অত্যন্ত বেহিসেবি ফটিক। তা একটু সে যে না ছিল তা নয়। শুধু পয়সা-কড়ি সম্পর্কে কেন, জামা-কাপড়, ছাতা, জুতো কোনো বিষয়েই তার তেমন হুঁস ছিল না। জিনিসপত্র হারাতেও সে ছিল অদ্বিতীয়।

ফটিকের বাবা এসব ব্যাপারে ভারি চটতেন। সত্যিই তো গেরস্তঘরের ছেলে এমনই নিত্য যদি জিনিসপত্র হারায় বা দানধ্যান করে আসে তো কত কিনে দেওয়া সম্ভব! খেলতে গিয়ে খেলার মাঠে কয়েক জোড়া চটি সে হারাল। বর্ষার সময় স্কুলে দু-বার দুটো ছাতা সে ফেলে এল—তা আর পাওয়া গেল না। পড়ার বইপত্র সম্বন্ধেও সে ঠিক এমনই।

ফটিকের বাবা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন ফটিককে নিয়ে। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, 'আর আমি তোকে যদি কিছু কিনে দিই তো আমার নাম নেই—তুই পড়তে হয় পড়, না হয় চুলোয় যা!'

ফটিকের মা ছেলের হয়ে বাপের সঙ্গে তর্ক করেন। আর ফটিকের বাবা বলেন, 'তুমিই আরও ওর মাথাটা খেলে!—দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো, অমন ছেলে থাকায় না-থাকায় সমান!' ভূতনাথবাবু খাপ্পা হয়ে উঠেছেন।

—'বালাই-ষাট, তোমার মুখে যে কিছুই আটকায় না। এক ছেলে নিয়ে ঘর কর—টাকা তোমার সঙ্গে যাবে?', ফটিকের মা চোখে জল এনে ফেলেন কথা বলতে বলতে।

ব্যাপারটা ফটিকের কাছে সম্পূর্ণ লুকোনো ছিল, কিন্তু ঘটনার পরিণতি বাবা ও মা-র কাছে ফাঁস হয়ে এই সময়েই যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে তা জানলে সে কখনোই এমন সময় বাড়ি ঢুকত না।

ফটিক দোরগোড়ায় পা দিতে না দিতেই, 'এই যে হতচ্ছাড়া, ঘর-জ্বালানে পর-ভুলুনে এলেন। তোর জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব রে—পোড়া কপাল আমার, তা নইলে আর এমন হয়।' কর্তার সমস্ত বকুনির ঝোঁকটা ফটিকের মা নিজের হাতে তুলে নিলেন যেন এবং ফটিকের বাবাকে বকবার অবসর না দিয়ে, নিজেই বকে চললেন অনর্গল।

ভূতনাথবাবু এতক্ষণ অন্যদিকে লক্ষ করছিলেন। হঠাৎ ফটিকের দিকে দু-পা এগিয়ে এসে তার গায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে, চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তোর গায়ের আলোয়ানটা কই?'

ফটিক এমনিতেই অপ্রস্তুত হয়েছিল, তাড়াতাড়ি বলে ফেললে, 'কাল রাত্রে টুটুলদের বাড়ি ফেলে এসেছি, আজ নিয়ে আসব।'

—'শীতের রাতে গায়ের কাপড় ফেলে এলি কী বলে! কী সর্বনাশ, এখনও এক মাস হয়নি যে রে! নতুন গায়ের কাপড়, খাস লুধিয়ানার লুই, করকরে পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনে দিলুম, আর এর মধ্যেই—চ', চ' দেখি টুটুলদের বাড়ি এক্ষুনি যাই!'

ফটিকের মা প্রমাদ গুনলেন। এক বিপদের সমাধান করতে গিয়ে আর-এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে হল তাঁকে। তবু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার যেমন কথা, অমনই চ' এক্ষুনি; আগে ঠান্ডা হয়ে খাওয়াদাওয়া করুক তারপর যাবে'খন, ও তো বলছে, আজ নিয়ে আসবে রাত্রে।'

স্ত্রীর মুখ-ঝামটা খেয়ে ভূতনাথবাবু তখনকার মতো আর কথা বাড়ালেন না, মনে মনে গজরাতে গজরাতে স্নান করার ব্যবস্থায় মন দিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য ; ফটিকের বাবা তা কল্পনাও করতে পারেননি।

আগের দিন খেলার মাঠ থেকে সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে সে যখন বাড়ি ফিরছে রাত তখন প্রায় সাড়ে সাতটা হবে। ক-দিন থেকে হাওয়া চালিয়ে শীতটাও পড়েছে জাঁকিয়ে। আলোয়ানটা বেশ করে গায়ে মুড়ি দিয়েই ফিরছিল ফটিক। এমন সময় হঠাৎ সে দেখলে, ফুটপাতের উপর একটি ভিখিরির ছেলেকে একটা বুড়ো মারধর করছে আর বলছে, 'ব্যাটা চোর, আমার কাঁথা নিয়ে পালাচ্ছিলি যে ?' বুড়োটাও জরাজীর্ণ, পথের ভিখিরি ; শতচ্ছিন্ন তার বেশ এবং যে কাঁথাটা নিয়ে তাদের এই মারামারি ও ঝগড়ার সূত্রপাত সেটার অবস্থাও এদের অবস্থারই মতো।

এসব ব্যাপারে ফটিকের উৎসাহ চিরদিনই। তাই সে সাগ্রহে ব্যাপারটা দেখতে ফুটপাতের উপর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শুধু দাঁড়িয়ে গেল না, ফটিক বুড়োটাকে বলে বসল, 'এই বুড়ো, তুমি ওকে মারছ কেন ?' বুড়োটা তার কাঁথাটা ছেলেটার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়েছে তখন। সেটাকে গায়ে বেশ করে মুড়ি দিতে দিতে সে বললে, 'দেখ না বাবু, এই শীতে সবে ওটা মুড়ি দিয়ে একটু ঘুমিয়েছি, আর ব্যাটা চোর কিনা গা থেকে চুপি চুপি কাঁথাটা খুলে নিয়ে পালাচ্ছে !'

ছেলেটা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর কাঁপছিল শীতে। ফটিক তার দিকে চেয়ে মুরুব্বি চালে বললে, 'কেন তুই ওর কাঁথা নিয়ে পালাচ্ছিলি ?'

তখন সে অত্যন্ত কাতর ও করুণভাবে ফোঁপাতে ফোঁপাতে উত্তর দিলে, 'বাবু, আমার মা-র ভয়ানক জ্বর, শীতে কাঁপছিল, তার গায়ে দেবার কিছু ছিল না, তাই আমি ওটা'—আর বিশেষ কিছু বলতে পারল না সে।

ব্যাপারটা ফটিকের কাছে খানিক স্পষ্ট হল। সে বললে, 'কোথায় তোর মা, চল্ দেখি মিথ্যে বলছিস কি না।'

ছেলেটি ফটিককে সঙ্গে নিয়ে চলল। কিছুটা গিয়েই, রাস্তার উপর একটা গাড়িবারান্দার তলায় ছেলেটি দেখাল যে, ওই তার মা। জায়গাটায় সামনের বাড়ির নিচের জানালা দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছিল। ফটিক সেই সামান্য আলোতেই তার দিকে দেখে নিলে একবার। শীতের রাত্রে এইসব সর্বহারা মানুষদের দুর্দশা তার নতুন র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চলাকে যেন উপহাস করে উঠল। প্রায় নগ্ন, জরাজীর্ণ এক প্রৌঢ়া রমণী সমস্ত শরীরটাকে কুণ্ডলীর মতো করে ধূলামলিন রাস্তার আবর্জনার সঙ্গে পড়ে আছে।

ফটিক একবার কী ভেবে নিলে, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে, প্রৌঢ়ার গায়ে হাত দিয়ে দেখলে। সত্যিই আগুন উঠছে তার গা থেকে। ফটিকের গায়ে কে যেন সপাং করে একটা বেত মারলে। গায়ে তার উলের সোয়েটার, তার উপর ফ্লানেলের সার্ট এবং সার্টের উপর এই নতুন আলোয়ান। কিছুতেই সেটাকে আর তার গায়ে রাখা সম্ভব হল না। আস্তে আস্তে সেটাকে গা থেকে খুলে প্রৌঢ়ার গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল সে। ছেলেটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, মুখ দিয়ে শুধু সে বললে, 'বাবু !' আর প্রৌঢ়া সেটিকে সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে, চোখ বুজিয়েই বলে উঠল, 'আঃ !'

ফটিক আর কোনো কথা না বলে, হনহন করে সেখান থেকে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলে। বাবা কী বলবে, মা-র কাছে কী কৈফিয়ত দিতে হবে, সে সময় কিছুই তার মনে ছিল না। স্বভাবটাই তার এমনই এবং আজ সকালেও একথা তার মনে হয়নি। কিন্তু এইবার, এতক্ষণে ব্যাপারটার গুরুত্ব তার যেন কিছুটা উপলব্ধি হল। কিন্তু এখন আর কী করতে পারে সে !

খাওয়া-দাওয়ার পর ফটিকের বাবা আবার ওই প্রসঙ্গ তুললেন। মাথায় অন্য-কিছু আর ঢুকছে না তখন তাঁর। ফটিককে ডেকে তিনি বললেন, 'আজ রাত্রে যদি গায়ের কাপড় না নিয়ে ঘরে ঢুকিস তো তোর একদিন কি আমার একদিন !'

ফটিকের মা বলেন, 'আনবে গো আনবে, গায়ের কাপড় আর তোমার যাবে কোথা !' তারপর ফটিকের

দিকে চেয়ে বলেন, 'দেখিস, আবার আজও ভুলিসনি যেন—উনি ভাবছেন, এটাও বুঝি তুই কাকে দিয়ে এসেছিস।'

বিকালের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ফটিক। নানা দুশ্চিন্তায় তার মন ভারি হয়ে উঠেছে। এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরতে ঘুরতে তার ইচ্ছা হয় একবার সেই ভিখারিনীকে দেখে আসতে। একটা রাস্তার মোড় থেকে দুটো কমলালেবু কিনে সে এসে হাজির হয় সেইখানে। তারই সেই গায়ের গরমের চাদরটা মুড়ি দিয়ে তেমনই পড়ে আছে স্ত্রীলোকটি। ফটিক তার পকেট থেকে লেবুদুটো বার করে তাকে ডাকে। স্ত্রীলোকটি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। লেবুদুটো হাতে নিয়ে বলে, 'বাবা, রাজা হও তুমি, কাল তুমিই আমায় বাঁচিয়েছ। জ্বরের ঘোরে তখন কিছুই বলতে পারিনি, আজ আমি অনেক ভালো আছি।'

ভিখারিনী যখন ফটিকের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন তার সেই ছেলেটি সেখানে ছিল না। একটু পরেই সে কোথা থেকে দৌড়ে এসে ব্যস্ততার সঙ্গে বললে, 'বাবু, এসেছ বাবু তুমি—দাঁড়াও একটু, চলে যেও না।'

বলেই সে ছুটে সামনের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

চারতলা মাড়োয়ারিদের বিরাট বাড়ি সেটা। সেই বাড়িরই গাড়িবারান্দার তলায় রাস্তার ফুটপাতে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির সঙ্গে ভিতর থেকে বয়োবৃদ্ধ এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক গায়ে বালাপোশ জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। এসেই ফটিককে বললেন, 'তুমিই কাল এদের গায়ের গরমের চাদর দিয়ে গিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ, বড়ো কষ্ট পাচ্ছিল ওই স্ত্রীলোকটি', উত্তরে ফটিক বললে।

—'আমি কালই নিচের জানালা থেকে তোমায় লক্ষ করছিলুম, কিন্তু একটু পরেই বাইরে এসে আর দেখতে পেলুম না।'

কথা কয়টি বলেই ফটিকের হাত ধরে তিনি বললেন, 'এসো, ভিতরে এসো।'

বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলছিলেন ভদ্রলোক। তিনি তাকে নিয়ে গিয়ে দোতলার একটি সুসজ্জিত ঘরে সোফার উপর বসালেন। নিজেও বসলেন তার পাশে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'তোমাদের বাড়ি কোথায়, কে কে আছেন বাড়িতে, তুমি কী পড়, তোমার বাবা কী করেন', প্রভৃতি বহু প্রশ্ন। তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, 'আজ তুমি গায়ের কাপড় নাওনি কেন?'

ফটিক বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তর দিলে, 'আমার জামাতেই শীত ভাঙে, গায়ের কাপড়ের প্রয়োজন হয় না।'

—'তবে কাল গায়ের কাপড় নিয়েছিলে যে?', প্রশ্ন করেন তিনি।

—'আমার চেয়ে আর একজনের প্রয়োজন যে এত বেশি হতে পারে, কালকের আগে আমি তা বুঝতে পারিনি।'

বৃদ্ধের চোখে জল এসে গেছে। তিনি কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'এক মিনিট বসো বাবা, আমি আসছি।'

মিনিট পাঁচ-সাত পরে একটি মোড়ক নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। এসে, 'আমার একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে বাবা', বলেই তিনি মোড়কটা খুলে একখানা নানা রঙের হাতে কাজ-করা লম্বা-চওড়া কাশ্মিরি শাল বার করে বললেন, 'এটা তোমায় গায়ে দিতে হবে বাবা। আমায় তুমি যে শিক্ষা দিয়েছ, তার দাম এর লক্ষ গুণ; তবু আমি সান্ত্বনা পাব তুমি এটা গায়ে দিলে।'

ফটিক হতবাক হয়ে গেছে। এ কল্পনাও সে মুহূর্তের জন্যেও করেনি। তার চোখেও জল আসার উপক্রম হয়েছে—কী উত্তর দেবে সে! তবু সে না বলে পারলে না, 'এ যে অনেক দামি, তার চেয়ে আপনি—', ফটিকের কথা শেষ হতে না দিয়েই তিনি বললেন, 'না, তা হবে না, এটাই তোমায় নিতে হবে—সম্পূর্ণ নতুন এটা, এই বছরেই কেনা, কেউ গায়ে দেয়নি এখনও।'

ফটিক বললে, 'না, সে জন্যে নয়।'

—'তবে?'

—'বাবা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন।'

—'কেন? আচ্ছা চলো, তোমার বাবার কাছে আমি নিজেই নিয়ে যাব; এমন যাঁর ছেলে, তাঁর সঙ্গেও আমার আলাপ হওয়া দরকার।'

পটুয়া

শিল্পী : কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার

বাবার কথা তুলে ফটিক যেন একটু বিব্রতই হয়ে বললে, 'না, আপনি কেন আবার কষ্ট করে যাবেন?'

—'কষ্ট কীসের। অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার গাড়ি তোমায় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে, আর আমিও যাব তোমার সঙ্গে সেই গাড়িতে।'

ফটিকদের বাড়ির সামনে গলির মধ্যে অতি কষ্টে বিরাট মোটরগাড়ি এসে থামল। দিনের বেলা হলে গাড়ি দেখতেই গলিতে লোক জড়ো হত।

গাড়ির দরজা খুলে দোরের কড়া নাড়ল ফটিক।

সাধারণত এ সময় ফটিকের বাবা বাড়িতেই থাকেন। ইতিপূর্বে দরজার সামনে গাড়ি থামার শব্দ তাঁর কানে গিয়েছিল। গায়ে একটা বিছানার ময়লা চাদর জড়িয়েই তিনি এসে দরজা খুললেন।

ফটিক বললে, 'বাবা'—

'বাবা' বলামাত্রই তাকে আর অন্য কথা বলতে না দিয়ে, ভূতনাথবাবু বলে বসলেন, 'আবার কী কাণ্ড ঘটিয়ে এলি—গাড়ি আবার কার?'

ফটিকের বাবার কথা শেষ হবার পূর্বেই সেই বৃদ্ধ মাড়োয়ারি ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমেই বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম—আমার নাম বংশীধর জালান। এমন রত্ন ছেলের পিতা আপনি—ভাগ্যবান!'

ফটিকের বাবা একেবারে থ। নমস্কারের বদলে হাত তুলে নমস্কার অবশ্য তিনি করেছেন, কিন্তু ব্যাপার কী!

ব্যাপারটা সংক্ষেপে মাড়োয়ারি ভদ্রলোকই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললেন তাঁকে। তারপর শালটা বার করে বললেন, 'ফটিককে বলুন আপনি, এটা ওকে গ্রহণ করতে।'

ফটিক বললে, 'এত দামি শাল নিয়ে আমি কী করব, তার চেয়ে আপনি একটা সাধারণ গায়ের কাপড় কিনে দেবেন আমাকে।'

ফটিকের বাবা ইতিমধ্যেই শালটাকে নিয়ে নাড়াঘাঁটা আরম্ভ করে দিয়েছেন; চোখদুটো যেন তাঁর একটু বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, 'তা হোক, উনি নিজে দিচ্ছেন যখন, তখন না বলতে আছে কী? গুরুজনদের কথা তুমি তো কখনও অমান্য কর না। নাও, হাতে করে নাও; তা না হলে ওঁকে অপমান করা হবে—ওঁদের দানের কি শেষ আছে।'

পাছে ওটা আবার বেহাত হয়ে যায় সেই ভাবনাই তখন বোধহয় তাঁর বেশি হচ্ছিল মনে মনে।

'ওঁদের দানের কি শেষ আছে'— কথাটা শুনে বংশীধরবাবু বললেন, 'তার থেকে আপনাদের দানের মূল্য অনেক বেশি। যাদের আছে, তাদের তো দেবার কথাই; কিন্তু যাদের নেই তারা যদি দেয়, তা সে যত সামান্যই হোক—সেই হল সবচেয়ে বড়ো দান। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ধন্য হলুম। আজ আসি।'

বলেই আবার ফটিকের দিকে চেয়ে বললেন, 'ফটিক, মধ্যে মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করলে খুশিই হব।'

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক চলে যেতেই ফটিকের বাবা খপ্ করে শালটা ফটিকের হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

ফটিক বললে, 'নিয়ে নিলে কেন, দাও ওটা।'

ফটিকের বাবা বললেন, 'হ্যাঁ আবার দিই, তুই দান করে আসবি বলে!'

ফটিকের মা এতক্ষণ দরজার আড়াল থেকে সব শুনছিলেন। তেড়েফুঁড়ে তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী বললে, আবার দিই দান করে আসবি বলে—আসলে দান করে এসেছিল বলেই তো অমন জিনিসটা পেলে।' বলে তিনিও আবার খপ্ করে ফটিকের বাবার হাত থেকে শালখানা তুলে নিয়ে বললেন, 'ও তোমারও নয়, ওরও নয়—কী বল্ রে ফটিক? —ও আমার!'

বলেই সেটাকে গায়ে জড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি।

সুবোধ ঘোষ

পয়লা পৌষ। কাঁকুলিয়া।

স্নেহের পুতুল,

একটা গল্প বলি শোনো। সে অনেকদিন আগের কথা, আমরা তখন খুব ছোটো। ছোটো আমাদের বাংলা স্কুল, ছোটো আমাদের ক্লাসের বেঞ্চ আর ডেস্ক, ছোটো আমাদের খেলার মাঠে ছোটো একটি ফুটবল। অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়েছিল। ছ-সাতটা ছোটো ছোটো খরগোসের তাড়া খেয়ে একদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। তখন সূর্য ডুবছে, দূরে পশ্চিমের শালবনের ভেতর একটা অভ্রখনির মুখ থেকে বয়লারের কালো ধোঁয়া আকাশে উঠে ডুবন্ত রোদের ছোঁয়ায় লাল হয়ে উঠেছে। আর পুবে, আরও অনেক দূরে, পাহাড়তলির আবছায়ার মধ্যে একটা গির্জার ঘণ্টা বাজছে—ঢং ঢং ঢং। ঘণ্টার শব্দটা সেদিন বড়ো করুণ হয়ে বাজছিল।

মাত্র ছ-সাতটি ছোটো ছোটো কোমল চেহারার খরগোস একটা নিদারুণ মজবুত চেহারার বাঘকে ধরবার জন্য মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। বাঘের দুরন্ত মূর্তিটাও প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছিল শালবনের দিকে, খোলামেলা মাঠের আলোবাতাস থেকে পালিয়ে গিয়ে বোধ হয় জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়তে। বাঘটা

এক-একবার পেছু ... আরও ...রে দৌড়তে থাকে, ঊর্ধ্বশ্বাসে. ভয়ে ভ...

...য়ে নয়। গল্পটা ব...

প্রথমেই একটু ভুল হল পুতুল, কিছু মনে কোরো ! এ... গল্পে যে বাঘের কথা বলছি, সত্যি তার লেজ ছিল না আর ছ-সাতটি যে ছোটো ছোটো খরগোসের কথা বলছি,

তাদেরও সত্যি সত্যি চারটি করে পা আর দুটো করে খাড়া খাড়া কান ছিল না। এই গল্পের বাঘ সত্যি করে বাঘই নয়, আর এই গল্পের খরগোস সত্যি করে খরগোসও নয়।

তবে তারা কী?

তারা কী, সেই কথাই বলছি।

এখনও তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছ না পুতুল। লেজ নেই এ কেমন বাঘ? চার পা নেই, এ কেমন খরগোস? গল্পটা নিশ্চয় মিথ্যে।

না পুতুল, গল্পটা মিথ্যে নয়। সত্যি সত্যি একদিন মাঠের ওপর দিয়ে খরগোসের মতন ছোটো ছোটো ছ-সাতটি ছেলে, প্রকাণ্ড বাঘের মতো একটা মানুষকে ধরতে তাড়া করেছিল। আর সেই বাঘের মতো মানুষটা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেই যে গেল তো গেলই, আর ফিরে এল না। আর তাকে কোনোদিন আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু আজ অনেকদিন পরে তারই কথা আমার মনে পড়েছে। তার নাম বাসুদেব।

কুস্তিগীর বাসুদেব, বাড়ি গোরখপুর জেলায়; লম্বায় প্রায় ছ-ফুট, বুকের বেড় আটচল্লিশ ইঞ্চি, গর্দানটা বাঘের ঘাড়ের মতো। বাসুদেব যখন দম টেনে শরীর ফুলিয়ে টান হয়ে দাঁড়াত, তখন তাকে কেমন দেখাত জান? মহাবলীপুরমে অতি পুরোনো যুগের একটা মন্দিরের ভগ্নস্তূপে আজও একটা দ্বারপালের পাথুরে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বাসুদেবকে দেখাত ঠিক এইরকম পাথুরে প্রহরীর মতো। ওর সমস্ত শরীরটাই যেন একটা গায়ের জোরের মূর্তি, কারও সাধ্য নেই যে ওকে ধাক্কা দিয়ে একটুও নড়িয়ে দিতে পারে।

এই বাসুদেবের সঙ্গে কী করে আমাদের পরিচয় হল, তারপর কী হল, এবং তারপর আরও কী একটা অদ্ভুত রকমের কাণ্ড হয়ে গেল, সেই গল্পই বলছি।

আমাদের ছোটো একটা কুস্তির আখড়া ছিল। বাংলা স্কুলের মালী শিবুর ঘরের পেছনে ছোটো একটা ঝিঙে খেতের পাশে, ছোটো একটা একচালার নিচে আমরা আখড়া তৈরি করেছিলাম। আমাদের ছোটো আখড়া, একজোড়া ছোটো ছোটো মুগুর ছিল। আর ছিল শিবুমালীর দেওয়া একজোড়া পুরনো খড়ম, বুকডন দেবার জন্য। দেড় পয়সা দামের একটা মাটির ধূপদানও ছিল আমাদের। গন্ধমাদনধারী শ্রীহনুমানজির একটা চার পয়সা দামের ছোটো ছবিও রেখেছিলাম আখড়াতে, কুস্তির আগে হনুমানের ছবিটাকে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে আমরা পুজো করতাম।

আমাদের কুস্তির আখড়ার বর্ণনা শুনে তোমার বোধ হয় হাসি পাচ্ছে পুতুল। কিন্তু জান না তো, আমাদের আখড়া আর মুগুর যতই ছোটো হোক না কেন, আমাদের ওস্তাদেরা কেউ ছোটো ছিলেন না। কুস্তির সময় আখড়ার একদিকে থাকতেন বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর গামা কাল্লু ও কিক্কড় সিং, আর একদিকে থাকতেন হেকেনস্মিট ও গচ। প্রত্যেক দিন সকালবেলায় তাল ঠোকার শব্দে পৃথিবীর এইসব বিখ্যাত কুস্তিগীরদের চমকে দিয়ে আমরা বেদম কুস্তি লড়তাম।

কথাটা একটু পরিষ্কার করেই বলি, নইলে তুমি আবার অবিশ্বাস করবে। কথাটা হল, আমাদের আখড়ার একচালাটার খুঁটোতে ওইসব বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীরদের এক-একটা ছবি ঝুলত। খবরের কাগজ থেকে কেটে ওইসব ছবি আমরা জোগাড় করেছিলাম। আমাদের তাল ঠোকার শব্দে আর হুটোপুটির বাতাসে ছবিগুলি সত্যিই এক-একবার নড়ে উঠত। হলই বা ছবি, আমরা ওঁদের সবাইকে আমাদেরই আখড়ার সদস্য বলে মনে করতাম। তবে নীরব সদস্য, এই যা দুঃখ। নইলে আমাদের ফূর্তিভরা কুস্তি দেখে ওঁরাও নিশ্চয় তারিফ করে উঠতেন—সাবাস্ বাহাদুর।

কাজেই আমাদের আখড়া যতই ছোটো হোক, আমাদের ভরসা আর বিশ্বাস ছোটো ছিল না। মোলায়েম ময়দার মতো আখড়ার সেই মাটিকে আমরা মাসে একবার করে পাঁচ আনার দই মাখিয়ে আরও অপার্থিব করে তুলতাম। সেই মাটি গায়ে মেখে দশটা বুকডন দিতেই আমাদের নিশ্বাস কেমন যেন দুরন্ত হয়ে উঠত। মনে হত, এইভাবে একটা বছর কুস্তি করতে পারলেই আমরা এক-একটি লৌহভীম হয়ে যাব, যা কোনো ধৃতরাষ্ট্র চূর্ণ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, আমাদের শহরে একটা লোক ছিল যাকে আমরা ধৃতরাষ্ট্র বলে মনে করতাম। অন্ধ নয়, তবে চোখদুটো ছোটো ছোটো। মিট্‌মিট্ করে আমাদের দিকে তাকাত, যেন আমরাই ওর সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

এঁর নাম দুবেজি, রাজাবাহাদুরের পোষা পালোয়ান। রাজা রহিস আর জমিদারের ছেলে ছাড়া আজেবাজে কোনো মানুষের ছেলেকে দুবেজি কুস্তি শেখাতেন না। তিনি তো আর যে-সে পালোয়ান ছিলেন না। তাঁর আখড়াটাও যা-তা ছিল না। আমরা শুনেছিলাম,

রাজাবাহাদুরের আখড়ার মাটি রোজ দু-সের ঘি দিয়ে মাখা হয়। দুবেজি স্বয়ং রোজ এক পোয়া গাওয়া ঘি চুমুক দিয়ে খান, মোষের দুধ এক বালতি, পেস্তা ও বাদাম এক সের; তা ছাড়া দিস্তা দিস্তা রুটি তো আছেই। তাঁর প্রকাণ্ড বুকটা সর্বদা ফুলে থাকত, যেন এক পালোয়ানি অহংকারের ঢাক, ভুঁড়িটা যেন চর্বির জয়ঢাক, আর গালদুটো ভাইটামিনের ডুগডুগি। প্রতিদিন সকালবেলা রাজাবাহাদুরের ঘি-খেকো আখড়ার সামনে দুবেজি লেংটি পরে জবুথবু হয়ে বসে থাকতেন, আর চারজন চেলা তাঁকে তেল মাখাত। তখন তাকে মনে হত, ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরির শুঁড়কাটা পাথুরে হাতিটার মতো—যেমন অতিকায়, তেমনই নিরেট আর তেমনই ভোঁতা!

কিন্তু আমরা যাই মনে করি না কেন, তাতে কী আসে যায়? পালোয়ান দুবেজির খ্যাতিও ছিল প্রকাণ্ড। তাঁর নানারকম কেরামতি আর কীর্তির গল্প শহরময় সবাই জানত। তিনি নাকি জীবনে একশো পালোয়ানকে হারিয়েছেন, কিন্তু নিজে আজ পর্যন্ত হারেননি। তিনি নাকি একবার শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় পথে একটা ভালুককে টেলিগ্রাফের খুঁটি তুলে পিটিয়ে পিটিয়ে হালুয়া করে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এ হেন ভল্লুকসূদন দুবেজি প্রতি রবিবার দু-চারজন চেলা নিয়ে আমাদের আখড়ায় উপস্থিত হতেন আর ঠাট্টা করে হেসে হেসে একেবারে অস্থির হয়ে বলতেন—বাহবা বাহবা! যৈসা আখড়া তৈসা কুস্তি!

দুবেজি পালোয়ান আমাকে ডাকতেন—ব্যাং বাবাজি। হরিশকে ডাকতেন—মক্ষি মহারাজ। আর কানুকে ডাকতেন—পতঙ্গ পালোয়ান। দুবেজি এইভাবে এক-একবার এসে আমাদের শুধু ব্যাং মাছি আর পোকামাকড়ের সঙ্গে তুলনা করে, ঠাট্টা করে, তুচ্ছ করে চলে যেতেন।

হরিশ এক-একসময় সহ্য করতে না পেরে দুবেজি পালোয়ানকে মুখের উপর শুনিয়ে দিত—আপ তো গোদা হাতি হ্যায়।

দুবেজি তক্ষুনি রেগে কট্‌মট্‌ করে তাকাতেন—কেয়া বোলা রে মক্ষি? হাড্‌ডি তোড় ডালুঙ্গা, খবরদার!

রেগে উঠলেই আমাদের হাড্ডি গুঁড়ো করে দিতে চাইতেন দুবেজি, আমরা সবাই চুপ করে যেতাম। দুবেজি মাঝে-মাঝে আমাদের গায়ে পড়ে এইভাবে অপমান করে চলে যেতেন। আমাদের আখড়াটাকে কেন জানি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমরা শুধু ভাবতাম—দুবেজির এই অহংকার কবে চূর্ণ হবে?

কিছুদিন পরে, আজকের মতোই শীতের একটি সকালবেলায় আমরা রাঁচি রোডের ওপর দাঁড়িয়ে একটা দৃশ্য দেখছিলাম। কোলিয়ারির এক সাহেবের মোটরগাড়িটা হঠাৎ ড্রাইভারের ভুলে রাস্তার পাশে একটা ছোটো খাদের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। ড্রাইভার বার বার ইন্‌জিন স্টার্ট করে, সবরকম গিয়ার দিয়েও গাড়িটাকে নড়াতে পারছিল না। সাহেব ড্রাইভার আর আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে গাড়িটাকে ঠেলে ঠেলেও রাস্তার ওপর ওঠাতে পারলাম না।

এমন সময় একটি লোক উপস্থিত হল। ধুলোয় ঢাকা খালি পা, ছেঁড়া চাদর গায়ে জড়ানো। মুখটা শুকনো। কিন্তু দেখতে লম্বা-চওড়া। কোনো কথা না বলে লোকটা এগিয়ে এল। মোটরগাড়ির বাম্পারটা ধরে দুটো হ্যাঁচকা টান দিয়েই গাড়িটাকে একেবারে রাস্তার ওপর উঠিয়ে দিল। আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাহেব তাকে থ্যাংকস্‌ জানিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

আমরা তাকে সশ্রদ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলাম—আপ কোন্‌ হ্যায় মহারাজ?

লোকটি বলল—আমার নাম বাসুদেব, কুস্তি করি, রাঁচি থেকে হেঁটে হেঁটে আসছি।

এত বড়ো শক্তিধর বাসুদেব, কিন্তু তার মলিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে বড়ো দুঃখ হচ্ছিল। এ দশা কেন?

বাসুদেবের কাছেই তার দুঃখের ইতিহাস শুনলাম। আজ তিন দিন বাসুদেব কিছু খায়নি। বেচারা বড়ো গরিব, গোরখপুরে তার বাপ মা ভাই বোন সবাই আছে। তারাও বড়ো কষ্টে আছে, বাসুদেব আজ দু-মাস হল বাড়িতে একটা পয়সা পাঠাতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করে একটা দারোয়ানি চাকরিও পাচ্ছে না বাসুদেব।

আমরা বললাম—আপনি। আমাদের এই শহরে খুঁজলে নিশ্চয় একটা কাজ পেয়ে যাবেন।

বাসুদেব বলল—কিন্তু যতদিন না পাই, ততদিন···?

আমরা বললাম—ততদিন আমরা চাঁদা করে আপনাকে রোজ দু-সের করে আটা দেব, আপনি আমাদের কুস্তি শেখাবেন।

—বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!

বাসুদেব পালোয়ানের শুকনো মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বাসুদেবকে ওস্তাদ পেয়ে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কুস্তি-চর্চা শুরু করে দিলাম। বাসুদেবের কাছে আমরা কত নতুন নতুন প্যাঁচ আর কাট্ শিখলাম। ঢাক কুলা সখি কালাজঙ্গ, বাহিরালি বগ্‌লি আর ধোবিয়া আ ছাড়, ঘিস্‌সা রদ্দা উখাড়—এক কুস্তিময় স্বর্গের অজস্র আশীর্বাদে আমরা ধন্য হয়ে গেলাম, সার্থক হল আমাদের আখড়া।

বাসুদেব পালোয়ানকে পেয়ে আমাদের গর্বের অন্ত ছিল না। এইবার আমরা দুবেজির অহংকার চূর্ণ করব, নিশ্চয় করব। একদিন সটান রাজাবাহাদুরের আখড়ায় গিয়ে আমরা কুস্তির চ্যালেন্‌জ নিয়ে উপস্থিত হলাম—বাসুদেব ভার্সাস দুবেজি।

দুবেজি নাক সিঁটকে বললেন—ঝিঙে খেতের আখড়ার একটা বাজে পালোয়ানের সঙ্গে আমার মতো পালোয়ান লড়বে না। ভাগো হিঁয়াসে।

আমরা দলবেঁধে সারা শহর বাসুদেব ওস্তাদের গুণ গেয়ে আর দুবেজিকে দুয়ো দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম—বাসুদেব ওস্তাদ হুর রে! দূর রে দুবেজি দূর রে! শহরের চকের ওপর এসে আমরা আরও জোরগলায় ছড়া গেয়ে ঘটনাটা প্রচার করে দিলাম—

ডবকে মারে ঘবমে ঘুসা
হাত্‌থি দুবেজি হো গিয়া মুসা।

হাতির মতো দুবেজি ইঁদুর হয়ে গেছে, ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে আছে।

সত্যি সত্যি সারা শহরে একদিনের মধ্যেই দুবেজির দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানল, বাংলা স্কুল আখড়ার বাসুদেব নামে এক নতুন ওস্তাদের চ্যালেন্‌জ নিতে পারেনি ভিতু দুবেজি, রাজাবাহাদুরের আখড়ার জরদ্গব পালোয়ান।

বোধ হয় এই শহরময় ধিক্কারে অতিষ্ঠ হয়েই রাজাবাহাদুরের লোক এসে একদিন জানিয়ে গেল—চ্যালেন্‌জ নেওয়া হল। আগামী ষষ্ঠীর দিনেই ধর্মশালার আঙিনায় বাসুদেবের সঙ্গে দুবেজি লড়বেন।

রাজাবাহাদুরের লোক চলে যেতেই বাসুদেব ওস্তাদ আমাদের হাসতে হাসতে বলল—ঘাবড়াও নেহি খোকাবাবু, ওই হাতিকে আমি কুমড়োর মতো তুলে নিয়ে আছাড় দেব। দেখে নিও।

এই দৃশ্যটা দেখবার জন্যই আমরা দিন গুনছিলাম। কবে ষষ্ঠী আসবে? কবে দেখতে পাব, অহংকারের হাতি দুবেজি ফাটা কুমড়োর মতো চিৎ হয়ে পড়ে আছে আখড়ার ওপর, আর আমরা নেচে নেচে হুর্‌রে দিচ্ছি বাসুদেব ওস্তাদকে। ষষ্ঠীর দু-দিন আগে রাজাবাহাদুরের লোক এসে কুস্তির তারিখ পিছিয়ে দিতে বলল, কারণ দুবেজি অসুস্থ।

বাসুদেব বলল—আচ্ছা। আমরাও বললাম—আচ্ছা। ঠিক হল চতুর্দশীর দিন কুস্তি হবে।

কিন্তু চতুর্দশীর দিনেও কুস্তি হল না। আমরা আশ্চর্য হয়ে বাসুদেবকে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার ওস্তাদ?

বাসুদেব ওস্তাদ বলল—ও হ্যাঁ, আমাকে দুবেজি খবর পাঠিয়েছে, মাঘের দশ তারিখে কুস্তি হবে।

বার বার তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছে। আমরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যে আরও বেশি করে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম, বাসুদেব ওস্তাদ আগের মতো আর প্রতিদিন আমাদের কুস্তি শেখাতে আসছেন না। তিন-চার দিন পরপর আসেন, কিছুক্ষণ থেকেই চলে যান। মুখে মুখেই আমাদের বাহবা দিয়ে চলে যান, আগের মতো আখড়ায় নেমে আমাদের সঙ্গে আর কুস্তি করেন না।

আমরা আরও আশ্চর্য হলাম, বাসুদেব ওস্তাদ আর আমাদের কাছে দু-সের আটার জন্য পয়সা দাবি করেন না। বরং একদিন এসে উলটে আমাদেরই সকলকে বরফি আর কিসমিস খাইয়ে গেলেন।

এরপর একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলাম, চকের ওপর পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বাসুদেব ওস্তাদ অনেকের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছেন, তাঁর মাথায় একটা রঙিন কাপড়ের পাগড়ি।

বাসুদেব ওস্তাদের উন্নতি হোক আমরা সবাই সেটা চাই। কিন্তু এই হঠাৎ উন্নতির রহস্য আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এখনও কোথাও কোনো চাকরি পাননি বাসুদেব ওস্তাদ, তবুও বেশ সুখে আছেন মনে হচ্ছে। অথচ দুবেজিকে কুমড়োর মতো তুলে আছাড় দেবার প্রতিজ্ঞা এখনও পূর্ণ হয়নি।

শেষপর্যন্ত একটা দিন পাকাপাকিভাবে স্থির হল। ধর্মশালার আঙিনার মাটি খুঁড়ে নতুন আখড়া তৈরি হল। ঢেঁড়া পিটিয়ে শহরে প্রচার করা হল—আগামী রবিবার বাসুদেব বনাম দুবেজির কুস্তি, বিকেল সাড়ে চারটা।

কুস্তির দিন আমাদের মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ, পুতুল। দুবেজির দর্প এতদিনে চূর্ণ হবে, ভাবতে ভাবতে আগের রাতটা আমাদের ঘুমই হল না। সকালবেলা

গিয়ে আমরা ধর্মশালার আখড়ার মাটি থেকে সব কাঁকর বেছে দিয়ে এলাম।

ঠিক বিকেল সাড়ে চারটায় কুস্তি আরম্ভ হল। ধর্মশালার আঙিনায় লোকে লোকারণ্য, রাজাবাহাদুর একটা জরির পাগড়ি নিয়ে এসে বসেছেন। যিনি জয়ী হবেন তাঁকে এই উপহার দেওয়া হবে।

জয় মহাবীর বলে প্রচণ্ড হাঁক দিয়ে তাল ঠুকে আখড়ায় প্রথমে নামলেন হস্তীকায় দুবেজি। অন্যদিক থেকে একটু বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে কী একটা কথা উচ্চারণ করে আখড়ায় নামলেন বাসুদেব ওস্তাদ। আমরাই জোরে হাঁক দিয়ে বাসুদেব ওস্তাদকে উৎসাহ জানালাম।

ধস্তাধস্তি, ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টি তাল ঠোকা, আর পাঁয়তাড়াই চলল অনেকক্ষণ। কুস্তিটা মোটেই জমছিল না। দুবেজি আর বাসুদেব, দুজনেই কেন যেন অনর্থক বার বার গায়ে মাটি মাখেন, আর বার বার তাল ঠোকেন। আমরাও দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

হঠাৎ একবার দেখলাম, দুবেজির গর্দানটা অসাবধানে একেবারে বাসুদেব ওস্তাদের বগলের কাছে চলে এসেছে। এমন সুন্দর সুযোগ! আমাদের আর তর সইছিল না। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম—মারো ধোবিয়া বাসুদেব ওস্তাদ।

বাসুদেব ওস্তাদ একটা হুংকার দিয়ে দুবেজির গর্দানটা বগলে চেপে সেই মারাত্মক ধোবিয়া আছাড়ের একটা ঝাঁকুনি দিলেন। কিন্তু হায়, হঠাৎ হাতটা যেন পিছলে গেল, নিজের ঝাঁকির টাল সামলাতে না পেরে বাসুদেব ওস্তাদ যেন একটা গুলিবিদ্ধ বাঘের মতো ছিটকে গিয়ে আখড়ার মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। জয় মহাবীর গর্জন করে দুবেজি বাসুদেব ওস্তাদের বুকের ওপর বুক দিয়ে মাটিতে চেপে রাখলেন। বাসুদেব ওস্তাদ হেরে গেলেন।

জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! রাজাবাহাদুরের দল আনন্দে চিৎকার করে উঠল। বিজয়ী দুবেজি ধুলোমাখা শরীর নিয়ে হাসিমুখে রাজাবাহাদুরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজাবাহাদুর দুবেজিকে জরির পাগড়ি পরিয়ে দিলেন। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন একটা অন্ধকার দেখছিলাম, সত্যিই লৌহভীম চূর্ণ হয়ে গেল। পরাজিত লৌহভীমের ব্যথার রক্ত যেন আমাদের চক্ষের অন্ধকারের ভেতর নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে, আমাদের চোখে জল আসছিল।

রাজাবাহাদুরের দল তখন দুবেজিকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবার আয়োজন করছিল। আমরা দেখলাম বাসুদেব ওস্তাদ ধর্মশালার আঙিনা থেকে একটু দূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ছেন আর মাঝে-মাঝে আমাদের দিকে করুণভাবে তাকাচ্ছেন।

ধর্মশালার দারোয়ান হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের কাছে এসে চুপে চুপে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—দুঃখ করবেন না, খোকাবাবু। এটা মিলি কুস্তি হয়েছে। ব্যাটা বাসুদেব দুবেজির কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে ইচ্ছে করে হেরেছে।

চমকে উঠলাম আমরা। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমাদের বাসুদেব ওস্তাদ কি কখনও এরকম ছোটো কাজ করতে পারে?

তবু আমরা সবাই একসঙ্গে বাসুদেব ওস্তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—বাসুদেব ওস্তাদ, আপনি কি দুবেজির কাছে টাকা নিয়ে…।

বাসুদেব ওস্তাদ চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিয়ে বললেন—কে বললে? বিলকুল মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা…।

বলতে বলতে বাসুদেব ওস্তাদ হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলেন। আমরা পেছু-পেছু যেতে-যেতে ডাকলাম—বাসুদেব ওস্তাদ।

বাসুদেব ওস্তাদ মুখ ফিরিয়ে বললেন—মিথ্যে কথা!

বাসুদেব ওস্তাদ রাস্তার ওপর দিয়ে খুব জোরে জোরে হেঁটে চললেন। আমরাও পেছু-পেছু ডাকতে ডাকতে চললাম—শুনুন বাসুদেব ওস্তাদ, শুনুন, শুনুন…।

চলতে চলতে শহরের বাইরে এসে পড়লেন বাসুদেব ওস্তাদ। আর একবার মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখতে পেয়েই ব্যস্তভাবে মাঠের ওপর নেমে পড়লেন। তারপর দৌড়তে আরম্ভ করলেন। আমরাও পেছু-পেছু তাড়া করে দৌড়ে চললাম। কানু বলে উঠল—ধর ধর ধর।

বাসুদেব ওস্তাদ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করলেন। একটা বাঘ সাংঘাতিক ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা ছ-সাতটি ছোট্ট ছোট্ট খরগোস তাকে তাড়া করে চলেছি। তখন পশ্চিমে সূর্য ডুবছে, আর পুবে অনেক দূরে পাহাড়গুলির আবছায়ার মধ্যে একটা ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং, করুণ সুরে।

বলতে পারো পুতুল, কেন বাসুদেব ওস্তাদ এত ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন?

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার ভাইঝি রাণু। আমি যখন ইতালির কাপ্রি দ্বীপ থেকে রাণুকে চিঠি লিখেছিলুম এক আশ্চর্য ঘটনার খবর দিয়ে, রাণুর সে চিঠি এত ভালো লেগেছিল যে, সে আমাকে না জানিয়েই পত্রিকায় তা ছাপিয়ে দিয়েছিল।

এবার রাণু আমায় লিখেছে চিঠি। তাতেও আছে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা। আমিও রাণুকে না জানিয়ে তা পত্রিকায় ছাপিয়ে দিচ্ছি। কাজেই এতে রাণুর মনে করবার কিছু নেই।

রাণু গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে লম্বা এক ছুটি কাটাতে। সেখানে আমাদের 'ডেরা' নামে একটি ছোট্ট বাড়ি আছে। সেইখানেই ছিলেন রাণুর মা, বাবা আর রাণু। সেইখান থেকেই চিঠিটা পাই।

ডেরা… শ্রাবণ ১৩৬৮

শ্রীচরণেষু,

জেঠামশাই, এবারে শান্তিনিকেতনে এসে বড়ো ভালো লাগল। স্কুল বন্ধ। বাবা বলেছেন, স্কুল খোলবার আরও এক মাস পরে কলকাতায় ফিরব। কারণ, বাবা

লম্বা ছুটি নিয়েছেন। কাজেই ছুটি, ছুটি, ছুটি। ছুটির কূলকিনারাহীন সমুদ্রে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছিলুম।

আপনি শুনেছিলেন কি না জানি না, এখানে আসবার আগের দিন এক অদ্ভুত উপায়ে আমার একটা খরগোস লাভ হয়েছিল। স্কুল থেকে আমাদের বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে ফিরছি, আমাদের ফটকের কাছে দেখি, কী একটা থর-থর করে কাঁপছে। কাছে গিয়ে দেখি, ওমা, এ যে একটা খরগোস! আমি জন্তু-টন্তু দেখলে ভয় পাই, কিন্তু এটাকে টপ করে কখন যে কোলে তুলে নিয়েছি, টেরও পাইনি, ভয় তো পাই-ইনি। খরগোসটাও দিব্যি আমার কোলে উঠে আরাম করে বসে কেমন করে যেন আমার মুখের দিকে তাকাল। সত্যি বলছি জ্যেঠামশাই, মনে হল যেন, মানুষের চাউনি। আমি তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় ভরে খেতে দিলুম। কার খরগোস, কোথা থেকে ভয়ে পালিয়ে এল জানি না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পোষ মেনে গেল। তার পরদিন তো খরগোসটাকে নিয়ে চলে এলুম ডেরায়। বৃন্দাবন মালী কাঁঠালতলায় তার জন্যে একটা কাঠের ঘর তৈরি করে দিলে। আমি তাকে পাতা, তরকারি আর ফল খাওয়াতে লাগলুম।

এমন লক্ষ্মী খরগোস আমি কখনও দেখিনি। কেবল আমার কোলে আসতে চাইত আর কেমন করে যেন আমার মুখের দিকে তাকাত। হঠাৎ আমার মনে হল, আচ্ছা এটা কি সত্যিই খরগোস না আর কিছু? রূপকথায় পড়া যায় শাপ দিয়ে, মন্ত্র পড়ে মানুষকে জন্তু বানিয়ে দেয়—এ সে রকম কিচ্ছু নয় তো? সত্যি, বিডন স্ট্রিটে হঠাৎ খরগোস এল কোথা থেকে?

খরগোসটাকে কোলে নিয়ে কাঁঠালতলায় চুপটি করে বসে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতুম। রূপকথার ব্যাং-রাজপুত্রের কথা মনে পড়ত, রাজার ছেলেদের দাঁড়কাক হয়ে যাওয়ার কথা। বসে থাকতে থাকতে আকাশের চাঁদ উঠত আর হঠাৎ মনে হত, এ খরগোসটা একটা রাজকন্যা—শাপভ্রষ্ট কোনো রাজার মেয়ে! তারপর ভালো করে লক্ষ করে দেখতুম ওর ব্যবহারগুলোও অনেকটা মানুষের মতো। মানুষ-ঘেঁষা তো বটেই। ফুরফুরে হাওয়া দিলে চাঁদ উঠলে কেমন যেন উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে মানুষের মতো! কই, অন্ধকার হলেই তো অন্য পাঁচটা জন্তুর মতো ঘুমোয় না!

সারাদিন ধরে টুকরো কাপড় কেটে আমি রাজকন্যার পোশাক সেলাই করলুম। খরগোসটাকে পরিয়ে দিতে, ওমা, সে একটুও আপত্তি না করে পরে রইল। মনে হল যেন ও সাজতে-গুজতে বেশ ভালোবাসে। সেই পোশাক পরিয়ে মাঝে-মাঝে আমি তার সঙ্গে খেলা করতুম। বাইরের কেউ এলে পোশাক খুলে দিতুম। বাইরের লোকের কথা তো বলা যায় না—হাসাহাসি করতে পারেন! আর রাজকন্যাকে নিয়ে অমন হাসাহাসি আমার সইবে না। সেই থেকে আমি তাকে রাজকন্যা বলে ডাকতুম। সে-ও দিব্যি সাড়া দিত।

রূপকথায় পড়ছিলুম, শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র-রাজকন্যাদের কোনোদিন না কোনোদিন কেটে যায়। কিছু একটা হয়, তারপর আবার তারা নিজেদের রূপ ফিরে পায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, এরও কেটে যাবে। সেদিন কী মজাই হবে! একটি জলজ্যান্ত পরমাসুন্দরী রাজকন্যা আমাদের বাড়িতে। কী করব আমরা তাকে নিয়ে, ভেবেই পেলুম না।

একদিন বারান্দার পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছি; অনেক রাত হবে তখন, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি ফুটফুটে জ্যোৎস্না, তারই এক টুকরো আমার বিছানার ধারে এসে পড়েছে। ফিনফিনে সাদা চাদরের মতো চাঁদের আলোয় বাইরেটা মোড়া। কাঁঠালগাছের কালো কালো পাতাগুলোর ওপর কে যেন রুপোর জল ঢেলে দিয়েছে। এমন দেখিনি কখনও! আমি লাফিয়ে উঠে পড়লুম। হঠাৎ মনে হল, এই চাঁদের আলোয় আমার রাজকন্যার শাপ কেটে যাবে। হয়তো কেটেই গেছে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়লুম কাঁঠালতলায়। গিয়ে দেখলুম, কোথায় কী! রাজকন্যা যেমন কে তেমনই কাঠের ঘরের মধ্যে ঘুমোচ্ছে। আমি আস্তে-আস্তে তাকে জোর করে নিয়ে এলুম। মাটিতে নামিয়ে দিতে চাইলুম, কিন্তু নামতে চাইল না, কোল আঁকড়ে পড়ে রইল। আমি তখন তাকে কোলে করেই খোলা আকাশের তলায় চাঁদের আলোয় নিয়ে এলুম। মনে করলুম, এই জ্যোৎস্না লেগে ওর শাপ কেটে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না। যেমন খরগোস তেমনই রইল। তখন আমি তাকে আবার তার ঘরে ভরে রেখে চললুম নিজের বিছানায়, শুতে।

দু-পা এগিয়েছি হঠাৎ খড়-খড় খড়-খড় করে একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এল। শব্দটা নিশিকান্তবাবুর বাড়ির

বেড়ার দিক থেকে আসছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল একজোড়া খরগোস। চলেছে বেড়ার গা ঘেঁষে। এর আগে শান্তিনিকেতনের মাঠে-ঘাটে কখনো খরগোস চোখে পড়েনি, তাই একটু অবাক হলুম। চললুম নিজের ঘরের দিকে। আবার খড়-খড় শব্দ। দেখি আরও দুটো খরগোস চলেছে, বেড়ার গা ঘেঁষে। তারপর আরও দুটো, আরও দুটো! কী আশ্চর্য! এত খরগোস যায় কোথায়? ভারি কৌতূহল হল। চুপিচুপি বাগানের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লুম দেখতে। বেরিয়ে দেখি, লম্বা একসারি খরগোস চলেছে পূর্বপল্লির মাঠের দিকে। আমিও চললুম গা ঢাকা দিয়ে, একটু দূরে দূরে। শেষে পূর্বপল্লির মাঠে গিয়ে পৌঁছলুম। ততক্ষণে খরগোসের দল গোল হয়ে ছুটোছুটি লাফালাফি শুরু করেছে। আমি একটা কাশ-ঝোপের আড়ালে নিঃসাড়ে বসে দেখতে লাগলুম। কত রকম খেলা তাদের, কত রকম নাচ, চাঁদের আলোয় এমন দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মাঝে-মাঝে দু-একটা খরগোস আমার ঝোপের কাছে এসে পড়েছিল, কিন্তু আমি এমন চুপটি করে বসেছিলুম যে, তারা টেরও পেল না।

তারপর হঠাৎ এক কাণ্ড। খরগোসগুলো ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে আরম্ভ করল। মুহূর্তের মধ্যে মাঠ খালি। আর আশ্চর্য ব্যাপার! মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি ভারি সুন্দর ছেলে—কোথা থেকে এল কিছুই বুঝতে পারলুম না। ছেলেটি আস্তে-আস্তে হেঁটে একটা গাছতলায় গিয়ে বসল। বসে চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল। আমি তখন ঝোপ থেকে বেরিয়ে তার কাছে গেলুম। গিয়ে বললুম—তুমি কে?

—আমি?—বলে ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বললে,—আমি খরগোস-রাজার ছেলে—রাজপুত্র।

আমি অবাক হয়ে বললুম—খরগোস-রাজার ছেলে?

—হ্যাঁ, আমার বাবা খরগোসদের রাজা। এখানে যারা একটু আগে ছিল, তারা সব আমার সঙ্গী। আমার সঙ্গে খেলা করে। আমি হঠাৎ মানুষ হয়ে যেতে ভয়ে তারা পালিয়ে গেছে।

আমি আরও অবাক হয়ে গেলুম—তুমি খরগোস, মানুষ হয়ে গেছ?

—হ্যাঁ, আমাদের একজন ডাইনী আমায় শাপ দিয়েছে। প্রতি মাসের পূর্ণিমার রাত একটার সময় আমি মানুষ হয়ে যাই। পূর্ণিমার রাতে খরগোসদের মেলা, খরগোসদের খেলা, খরগোসদের নাচ। এর চেয়ে আনন্দের জিনিস আমাদের আর কিছু নেই। অথচ মাঝরাতে আমি ডাইনীর শাপে মানুষ হয়ে গেলুম, সাথীরা পালিয়ে গেল,..এর চেয়ে দুঃখ আর কোথায়? আমি এখন মন ভার করে ভোর পর্যন্ত একা এই গাছের তলায় বসে থাকব। ভোর হলে তবে খরগোসের রূপ ফিরে পাব। এই হয় মাসের পর মাস।—বলে ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

আমি বললুম—তোমার বন্ধুরা তোমায় তো চেনে, তোমার শাপের কথাও জানে নিশ্চয়, তবে তোমায় দেখে পালাল কেন?

ছেলেটি বললে—ও বাবা, তা-ও জান না? মানুষের মতো ভয়ংকর জীব কি আর আছে? মানুষকে কে না ভয় করে? হঠাৎ আমি মানুষ হয়ে গেলে ওরা আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না—ভয়ে পালিয়ে যায়!

আমি বললুম—তোমার শাপ কাটবে না? শাপ কাটবে না? শাপ কাটাবার নিশ্চয় কোনো উপায় আছে।

—উপায় আছে, কিন্তু বড়ো শক্ত। আমি যখন মানুষের রূপ ধরব, তখন যদি কোনো খরগোস সাহস করে আসে, আমি তার গায়ে হাত বুলোলে সে না যায়, তা হলেই শাপ কেটে যাবে। কিন্তু দেখলে তো, আমার নিজের বন্ধুরাই কেমন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, আমায় দেখে? কোথায় পাব আমি তেমন খরগোস?

আমি লাফিয়ে উঠলুম। বললুম—শোনো রাজপুত্র। আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি। আমার কাছে ঠিক সেইরকম একটি খরগোস আছে। ভারি লক্ষ্মী। তার গায়ে তুমি হাত বোলাতে পার। তাকে কোলেও নিতে পার।

রাজপুত্র চোখ বড়ো বড়ো করে বললে—সত্যি?

আমি বললুম—আনব?

বলে ছুটলুম ডেরার দিকে।

বাড়ি পৌঁছে কাঁপা হাতে আস্তে-আস্তে রাজকন্যাকে কোলে তুলে নিলুম। এই আমার রাজকন্যা। একে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি। এ যেদিন রাজকন্যার রূপ নেবে সেদিন কোথা থেকে রাজপুত্র খুঁজে এনে বিয়ে দেব সে ভাবনাও ভেবেছি। বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে আমার কেমন দুঃখ হবে তা-ও জেনেছি। আর আজ সেই রাজপুত্র

এসে হাজির। ভোর হবার আগেই একে রাজপুত্রের হাতে সঁপে দেব। এমনটি যে হবে, এ যেন আমি আগে থেকেই জানতুম। মনে-মনে গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম। নইলে কী করে আমি আপনা থেকে টের পাব যে, খরগোস হলেও ও রাজকন্যা?

এইসব ভাবতে ভাবতে ধীরপায়ে আমি ততক্ষণে পূর্বপল্লির মাঠে গাছতলায় খরগোস রাজপুত্রের কাছে পৌঁছে গেছি।

রাজপুত্র আমায় দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

—এই দেখ রাজপুত্র, কাকে এনেছি। তুমি হাত বোলাও এর গায়ে, আদর কর, কিচ্ছু বলবে না।

রাজপুত্রের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি এসে আমার কোল থেকে রাজকন্যাকে নিজের কোলে নিয়ে আদর করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত্র আর নেই। হঠাৎ পায়ের কাছে দেখি একটা খরগোস। আমায় দেখে ছুটে পালাচ্ছে ভয়ে। রাজকন্যা ছুটছে তার পিছু পিছু। একটু দূরে গিয়ে রাজকন্যা থমকে দাঁড়াল, আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, আমি ভাবলুম—ও কি রাজপুত্রকে ছেড়ে আমারই কাছে ফিরে আসতে চায় নাকি? রাজপুত্রও দেখি দাঁড়িয়েছেন! এগিয়ে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। খরগোসের ভাষা বুঝি না—হয়তো ওদের মধ্যে দুটো কথা বলাবলি হয়ে থাকবে! দেখলুম, দুজনে লাফাতে লাফাতে খোয়াই পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে রেল লাইনের দিকে চলেছে। দূরে এক বেড়ার ধারে পৌঁছে মনে হল রাজকন্যা আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে দেখল। তারপর একলাফে বেড়ার আড়ালে রাজপুত্রের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল পারুলডাঙার দিকে।

আমি চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে এলুম। সুখ পেলুম এই ভেবে যে, এক রাজপুত্রকে আমি শাপ-মুক্ত করলুম, আর রাজকন্যাকে উপযুক্ত বরের হাতে সঁপে দিলুম।

প্রণাম নেবেন। ইতি-

রাণু

চড়ুইদের শত্রু

সুকুমার দে সরকার

বাড়িটা পুরোনো পেছনে তার মস্ত এক বাগান।

আম, কাঁঠাল, পেয়ারার দল গলাগলি করে বড়ো হয়েছে। জায়গাটা রোদে, জলে, ছায়ায়, সবুজে,—কেমন একটা স্নিগ্ধ সুনিবিড়ো! তাই বাগানটা পাখিদের ভারি পছন্দ।

প্রতিদিন সকালে-সন্ধেয় নানারকমের পাখি এসে জোটে বাগানটায়। জোড়ে-জোড়ে আসে শালিকেরা, জোড়ে-জোড়ে টিয়ার দল সবুজের বিদ্যুৎ হেনে যায়, ছাতারেরা লাফাতে-লাফাতে পোকা খোঁজে আর হাঁক দেয়, টক্ কট্রর কট্ টক্! খুরখুর করে কাঠবেড়োলি একছুটে গিয়ে সুপুরি গাছের মাথায় উঠে যায়। রং-বেরঙের শুঁয়োপোকা নিজের চারধারে জাল বুনে হঠাৎ একদিন প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়। লম্বা দেবদারু গাছটার গায়ে বসে পাখিদের ছুতোর তার ছুঁচোলো ঠোঁটটা গাছের গায়ে ঠুকতে থাকে—ঠক্-ঠক্-ঠক্, ঠক্-ঠক্-ঠক্। ঝড়ের আগে এঁটো পাত, কাকের দল তো আছেই।

সেই বাগানে যেদিন চড়ুই-জোড়াটা এল, কাকেরা সেদিন নিজেদের দিকে চেয়ে চোখ ঠেরেছিল। চড়ুইদের সেদিকে নজর দেবার সময় নেই। চড়ুই-কর্তা থেকে থেকে উড়ে এসে পেয়ারার ডালে বসে, বুকের পালকগুলো ফুলোয়, ছোটো ডানা দুটো ঝাড়া দেয়—যেন বলতে চায়,—দেখেছ? দেখেছ আমার পালকগুলোর বাহার? দেখেছ কেমন ডানা?

আম-ডালের ওপরে বসে গুন্ডা-কাকটা রকম-সকম দেখে ঘাড় হেলিয়ে বলে ওঠে,—ক্কঃ! যেন একটা উপহাস্যি—হাঃ।

চড়ুই-গিন্নি উড়ে এসে লাগায় এক ঠোক্কর।

যেন বলতে চায়, দিন-রাত কুঁড়েমি! রূপের গরবেই গেলেন! এদিকে বাসা বাঁধবার সময় চলে যায়। খড়টা-কুটোটা—এত সব করে কে, বাপু?

গিন্নির ঠোকর খেয়ে চড়ুই-কর্তা শশব্যস্তে উড়ে যায়। চড়ুই-গিন্নি আমগাছটার তলায় কয়েক গোছা শুকনো ঘাস নিয়ে টানাটানি করতে থাকে।

শালিক-গিন্নি উড়ে এসে আম-ডালটায় বসে বলে, কী গো চড়ুই-মাসি, কবে এলে?

চড়ুই-গিন্নি মাথাটা হেলিয়ে বলে, এই তো, আজকেই! বাসা খুঁজতে কি কম হয়রানি হতে হয়েছে? তা এবার ওই পুরোনো বাড়ির ঘুলঘুলিটা ভালো পাওয়া গেছে। রোদ-জলের হাত থেকে ডিমেরা থাকবে ভালো।

শালিক বলল,—তা বেশ বেশ! পাড়াটাও ভালো, খাবার-দাবারেরও অভাব নেই, ওদিকে একটা ধানের মরাইও আছে। থাকবে ভালো—শুধু ওই যা গুন্ডা-কাকগুলোকে বিশ্বাস নেই।

হুঁ! চড়ুই-গিন্নি জবাব দেয়—আর সাপ-খোপ নেই তো?

থাকলেও ওই উঁচু ঘুলঘুলিতে উঠবে কী করে?

ও বুকে-হাঁটা শয়তানগুলোকে মোটেই বিশ্বাস নেই এই তো সেবারে.....

শালিক-গিন্নি বাধা দিয়ে বলে ওঠে—চুপ চুপ! ওইখানে ওই একটা গুন্ডা-কাক শুনছে। উনি আবার গুন্ডার সেরা! বাচ্চা হবে শুনলে আর রক্ষে থাকবে না!

চড়ুই-গিন্নি আড়চোখে কাকটাকে দেখে নিয়ে বলে,—যাই বাবা, কত কাজ পড়ে আছে।

চড়ুই ফুরুৎ করে উড়ে যায়। শালিক, কিছুই হয়নি যেন এমনি একটা ভাব করে গান ধরে—টক্ কট্ কট্ করর!

গুন্ডা-কাকটা হঠাৎ—কক্ ক্কঃ কোয়া বলতে বলতে উড়ে যায়। সে কী শুনেছে কে জানে? ছোটো পাখি চড়ুইদের শত্রুর অভাব নেই।

* * * *

চড়ুইদের বাসা-বাঁধা হয়ে গেল। নরম তুলতুলে ছোট্ট বাসা।

চড়ুই-কর্তাও বাসার জন্য যথেষ্ট খেটেছে; তাই চড়ুই-মা মোটের ওপর সন্তুষ্ট। সে এখন বাসার মধ্যে দিনরাত তার বুক ডুবিয়ে বসে থাকে; তার মানে হল সে তার সাদা-সাদা ছোটো ডিম দুটোয় তা দিচ্ছে। মন তার ভরে উঠেছে, জীবন সম্পূর্ণ।

মাঠের ওপর ঝিমঝিমে রোদ। কোথা হতে, থেকে থেকে অদৃশ্য একটা পাখি ডেকে উঠছে—কুক্ কুক্ কুক্ কুক্। টিয়ারা সবুজের বিদ্যুৎ হেনে, এ-ডালে, ও-ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীতে একটা নিশ্চিন্ত শান্তি। চড়ুই-কর্তা পেয়ারার ডালে বসে গান ধরেছে—চীপ্ চীপ্ চীকাপি চীপ।

এমনি ভাবে মৃদুগতি জীবন চলেছে বয়ে। সেই ঝিমঝিমে সোনালি রোদের পানে চেয়ে চড়ুই-মার মনে হয়—তার ডিমগুলো ফুটবে, ছোটো ছোটো রোঁয়াহীন বাচ্চাগুলোকে বুক দিয়ে বড়ো করতে হবে, তারা উড়তে শিখবে—তবে তার শান্তি, তবে তার ছুটি। কিন্তু জীবনে শত্রুর অভাব নেই।

এমনি ভাবে দিন কেটে চলে। যে ঘরটায় চড়ুইরা বাসা বেঁধেছিল, সে ঘরটায় সেদিন একটা লোক, আর তার পিছনে একটা ছোটো ছেলে ঢুকল।

লোকটা ঘরে ঢুকেই বলল, এঃ। ঘরটায় এত খড়-কুটো নোংরা এল কোথা থেকে রে। এই বে, চড়ুই-পাখি বাসা বেঁধেছে! আর তিস্টোনো যাবে না। খোকন, একটা লাঠি নিয়ে আয় তো!

খোকন বলল, গুল্‌তি আছে বাবা!

মার্ দেখি।

খোকন পকেট থেকে গুল্‌তি বের করে টিপ্ করে ছাড়ল দুটো ঢিল। চড়ুই-মা চিৎকার করে বাইরে বেরিয়ে

এল। এদিকে খোকনের বাবা একটা লম্বা লাঠি নিয়ে এলেন। চড়ুই-মা কাঁ কাঁ করে চিৎকার করতে করতে মাথার ওপর ঘুরতে লাগল।

বাড়ির গিন্নি—মাথায় চওড়া লাল পাড়—ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কী হচ্ছে রে, খোকন? খোকন তখন গুল্‌তিটা বাগিয়ে হেলে দাঁড়িয়েছে। বললে, সরে যাও মা, চড়াই শিকার করছি। গিন্নি কিছুক্ষণ বাপ আর ছেলের কীর্তি দেখলেন, তারপর চড়াইটার ওপর নজর পড়ল তাঁর! পাখিটা তখন পাগলের মতো ডানা ঝাপ্‌টাচ্ছে আর চিৎকার করছে!

গিন্নি বলে উঠলেন, আহা! তারপর কর্তার দিকে ফিরে—হ্যাঁ গো, কী হচ্ছে কী? একটা জীবের বাসা ভেঙে দিতে আছে? মায়ের প্রাণ। কী করছে দেখ তো, পাখিটা! এস, চলে এস। খোকন, গুল্‌তি পকেটে পোর্‌। চড়াই শিকার হচ্ছে! কাক মারতে পারিস না?

কাকগুলো বেজায় চালাক মা!

তুই বুঝি বোকা?

খোকন তীব্র প্রতিবাদ করে। এমনি করে বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায় চড়ুই-বাচ্চাদের কচি জীবন। কিন্তু জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যেন চিরলীলা।

সেদিন রাত তখন গভীর। ডানার মধ্যে ঠোঁটটা গুঁজে চড়ুই-কর্তা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, বাইরের বাগান নিস্তব্ধ, ঝরা পাতার মৃদু খসখস শব্দ ছাড়া। বুকের নিচে ডিমগুলো নিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে চম্‌কে উঠে কান খাড়া করে চড়ুই-মা! মায়ের কত ভাবনা, কত ভয়! ওই বুঝি পেঁচার ডানার আওয়াজ! ওই তো পেয়ারার ডালে বাদুড় এসে মাথা নিচু করে ঝুলতে লাগল। হঠাৎ রাত-নিশুতিতে কাকের দল চিৎকার করে উঠল কেন? ঝিঁঝিটা ডেকেই চলেছে। আর—

হঠাৎ চড়ুই-মা ভীষণ একটা চমকে তন্দ্রা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। কানে তার ভয়ংকর এক শত্রুর শব্দ ভেসে এসেছে, হিস্‌ হিস্‌ হিস্‌ হিস্‌!

চড়ুই-মা লাফিয়ে উঠে কাঁ কাঁ করে চেঁচাতে লাগল। খোকার বাবা ঘুমের ঘোরেই বিরক্ত স্বরে বলে উঠলেন, আঃ জ্বালাতন!

কী হয়েছে গো? খোকার মা জিজ্ঞেস করলেন।

শুনছ না? একে তো নোংরার ঠেলায় অস্থির, তার ওপর চিৎকারে রাতে ঘুমোতে দেবে না। বলেছিলাম তখন বাসা ভেঙে দেই!

গিন্নি বললেন, কিন্তু চেঁচাচ্ছে কেন? দেখ না গো, হয়তো বেচারার কোনো বিপদ হয়েছে! আহা, ছোটো পাখি!

তোমার দেখছি দয়া উথলে উঠল!

গিন্নি কোমল স্বরে বললেন, দেখ না একবার, ওঠো না! নাও, দেশলাই জ্বালো।

খোকার বাবা উঠে দেশলাইটা জ্বাললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে যা নজরে পড়ল তাতে তাঁর সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল।

খোকার বিছানার খাটের পায়াটা জড়িয়ে একটা কালো সাপ! খোকার ঘুমন্ত পায়ের সঙ্গে সাপটার মাত্র হাতখানেক ব্যবধান।

খোকার বাবার মুখ দেখে গিন্নি কী বলে উঠতে যাচ্ছিলেন। খোকার বাবা বলে উঠলেন, একদম চুপ, নড়বে না। দেশলাইটা নাও, যেই বলব—জ্বালবে।

খোকার বাবা নিঃশব্দে নেমে মোটা একটা ডান্ডা তুলে নিলেন। চাপা গলা শোনা গেল অন্ধকারে, জ্বালো।

হঠাৎ দেশলাইয়ের শিখাটা, গর্জন করে লাফিয়ে উঠতেই সাপটা চমকে মাথা ঘোরালো। সেই তার শেষ। পরমুহূর্তেই মাথাটা তার থেঁতলে গেল। ঘুম থেকে আচমকা জেগে ভয় পেয়ে খোকা চেঁচিয়ে উঠল, মা—মা!

খোকার মা খোকাকে জড়িয়ে ধরলেন, ভয় কীরে! কিন্তু তাঁর নিজের বুক তখন ঢিপ ঢিপ করছে; কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। সাপটাকে তিনিও দেখেছিলেন।

চড়ুই-মা তখন চিৎকার থামিয়ে আবার ডিমগুলোর ওপর বসেছে। ডিমগুলোর তখন অদ্ভুত একটা স্পন্দন!

ভোরবেলা কর্তাকে ডিমগুলো আগলাতে বলে চড়ুই-মা খাবারের সন্ধানে বেরোল। তিনদিন আজ সে অনবরত ডিমগুলোর ওপর বসে আছে, দিনটা ফুটে উঠেছে চমৎকার!

নির্মেঘ নীল আকাশ। বাগানের সবুজ গাছগুলো হাসিমুখে যেন সূর্যকে আবাহন জানাচ্ছে; সেই মাত্র একটা

প্রজাপতি জন্ম নিয়ে বাতাসে পাখা মেলে দিল। টিয়ার জোড়াটা সবুজের ঢেউ খেলিয়ে উড়ে গেল তিরের মতো। ধানের মরাইটা থেকে ফিরে এসে চড়ুই-মা আমপাতার ফাঁকে বসল। ছাতারেরা বাগানে জোড়া-পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁজছে। তারা বললে, এস না চড়ুই-মাসি, বাচ্চাদের জন্য দুটো নরম-নরম পোকা নিয়ে যাও না?

এখন ডিম ফুটে বেরোয়নি, বাচ্চারা।—চড়ুই-মা বলল।

ওপরের একটা ডাল থেকে গুন্ডা-কাকটা সাড়া দিল, ক্বঃ। ক্বঃ! আর হঠাৎ একটা ঢিল ওর কানের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে হুশ্ করে বেরিয়ে গেল। কাকটা চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে। আমগাছের আড়াল থেকে গুল্‌তিটা পকেটে পুরল খোকা। নাঃ! কাকগুলো বেজায় চালাক! ওদের মারা প্রায় অসম্ভব।

বিরক্ত হয়ে খোকা দুধ খেতে ছুট দিল।

বাসায় ফিরতেই দূর থেকে অতি মৃদু পিঁক্ পিঁক শব্দ চড়ুই-মার কানে যেন মধু ঢেলে দিল!

চড়ুই-মা ডানা ছড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চাদের ওপর।

*　*　*　*

দিন কেটে চলেছে, নিঃশব্দ ব্যগ্র শিথিল দিন। চড়ুই-মার বাচ্চাগুলো দিন-দিন বেড়ে উঠছে। চড়ুই-মার মন খুশিতে, আশায়, গর্বে ভরপুর। কেমন সুন্দর তার বাচ্চা দুটি। এমন বাচ্চা কারও হয় না—শালিকদেরও না, ছাতারদেরও না, এমনকী টিয়াদেরও না, হতভাগা কাকদের তো কথাই নেই! চড়ুই-মা পেয়ারার ডালে বসে আনন্দে গান ধরে, 'চীপ্ চীপ্ চীকাপি চীপ্!' চড়ুই-কর্তা মুখে করে বাচ্চাদের জন্য পোকা নিয়ে আসে। বাসার মধ্যে থেকে দুটো কচি-কচি মুখ বেরিয়ে হাঁ-হাঁ করতে থাকে। চড়ুই-মার বুক তখন আনন্দে ভরে ওঠে। পৃথিবীতে যেন নতুন আলো, পৃথিবীতে যেন নতুন বন্ধন! জীবনের একটা মধুর তৃপ্তি!

তারপরে বাচ্চাদের গায়ে নতুন পালক দেখা দেয়, ডানায় আসে আকাশের প্রেরণা। বাচ্চারা লাফিয়ে-লাফিয়ে বাইরে আসতে চায়। চড়ুই-মা ধমক দেয়, না, এখনও সময় হয়নি।

সেদিন আবার শালিক-জোড়ের সঙ্গে দেখা। শালিক-গিন্নি বলে, কী গো চড়ুই-মাসি, বাচ্চারা কেমন?

খুব ভালো। চড়ুই-মা জবাব দেয়।

উড়তে শিখবে কবে?

এই তো হয়ে এল।

শালিক-গিন্নি গম্ভীর মুখে বলে, খুব সাবধান, চড়ুই-মাসি! গুন্ডা-কাকগুলোর রকম-সকম ভালো নয়, সবসময়ে ওরা যেন কিসের জটলা পাকাচ্ছে।

চড়ুই-কর্তা পাশ থেকে বলে, ঈস! আসুক না একবার! এমন ঠোক্কর দেব!

চড়ুই-মা ধমক দেয়—থামো দেখি! মুরোদ জানা আছে।

*　*　*　*

সেদিনের প্রভাতটা গলানো রুপোর রং নিয়ে শুরু হয়েছে। রোদের সোনালি পরশমণি সবে লেগেছে আকাশে। প্রজাপতিরা ফুল ছেড়ে হালকা হাওয়ায় ভাসাল পাখা।

চড়ুইদের বাচ্চা দুটো ছটফট্ করে উঠল। ওই দূরান্তের নীল আকাশ, ওই দূরে বাঁকা নদীর ইশারা চোখ ঠেরেছে তাদের পাখায়। বুকে দুরু-দুরু আশার কল্পনা।

চড়ুই-মা কর্তাকে বলল,—ওগো, দেখছ একবার কাকগুলোকে?

কাকগুলো সেদিন যেন কোন্ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চড়ুই-কর্তা ঘুরে এসে বলল, নেই।

বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে এল চড়ুই-মা।

ওই যে, পেয়ারার ডাল, আগে ওই পর্যন্ত। বাচ্চাদের বলল চড়ুই-মা।

দু-জোড়া ছোটো ছোটো নবীন ডানা প্রথম মুক্ত হল আকাশে। পেয়ারার ডালের ওপর গিয়ে বসল বাচ্চারা।

বাঃ বাঃ বেশ হয়েছে! এইবার ওই ধানের মরাই। সোজা আসবি আমার পিছনে। দল ছাড়বি না কেউ।

আগে চড়ুই-মা, পেছনে তার দুই বাচ্চা, আর তাদের পেছনে চড়ুই-কর্তা শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তির্যক গতিতে ধানের মরাইটার দিকে বাঁক নিল।

আকাশ নিঃস্তব্ধ—পৃথিবী স্থির। হঠাৎ সভয়ে মাথার ওপর চড়ুই-মা শুনল গুন্ডা-কাকটার ডাক—ক্কঃ-ক্কঃ-ক্কঃ-আ—!

কাকের দল ওঁত পেতে ছিল। ঝাঁপিয়ে তেড়ে এল চড়ুই-বাচ্চাদের দিকে। নরম-নরম চড়ুই-বাচ্চার মাংস আজ কাকদের লাগবে ভালো। চড়ুই-মা চেঁচিয়ে উঠল, বাসার দিকে, বাসার দিকে! দলটা বিদ্যুতের মতো বাঁক নিল বাসার দিকে।

গুন্ডা-কাকও কম ক্ষিপ্র নয়। সে তখন একটা বাচ্চার মাথার ওপর এসে পড়েছে। কাকটা ছোঁ মারল; কিন্তু তার আগেই চিৎকার করে চড়ুই-কর্তা প্রচণ্ড এক ঠোক্কর লাগাল কাকের মাথায়।

হাজার হোক চড়ুইয়ের ঠোক্কর, কাকের কী হবে? কিন্তু তাক্‌টা ফসকে গেল। চড়ুই-কর্তাকে ঝেড়ে ফেলে গুন্ডা-কাকটা যমের মতো তেড়ে গেল বাচ্চাদের দিকে। বাচ্চাটা চেঁচিয়ে উঠল, চিঁ-চি....!

গুন্ডা-কাক ছোঁ মারবার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে চড়ুই-মা তার উদ্যত থাবার মধ্যে গিয়ে পড়ল। তাক্‌টা আবার ফসকে গেল। গুন্ডা-কাকটা ডানার এক ঝাপটায় চড়ুই-মাকে ছিটকে ফেলে, ঘুরেই দ্বিতীয় বাচ্চাটার পানে তেড়ে এক ডুব মারল।

ভয়ই প্রাণী-জগতের সবচেয়ে প্রচণ্ড বিপদ। বাসাটা কাছে এসে গেছে। হয়তো বাচ্চাটা যদি ভয় না পেত, তাহলে নিরাপদে বাসায় পৌঁছতে পারত। কিন্তু বাচ্চাটা ভয় পেয়ে উলটো-মুখে বাঁক নিল ঠিক গুন্ডা-কাকটার দিকে।

সভয়ে সে দেখল, তীক্ষ্ণ একটা ক্রূর লম্বা চঞ্চুর পেছনে একজোড়া লাল চোখ, আর কালো দুটো বাঁকানো থাবা, বিদ্যুতের মতো তার দিকে এগিয়ে আসছে—আর তার পিছনে একটা সেই যমদূতের দল।

চিৎকার করে উঠে চড়ুই-বাচ্চা চোখ বুজতে গেল। কিন্তু সে ক্ষমতাও তখন তার চলে গেছে।

আর নিমেষের ব্যবধান। বৈদ্যুতিক মুহূর্ত!

সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। গুন্ডা-কাকটা শূন্যে যেন লাফিয়ে উঠে ছিট্‌কে পিছিয়ে গেল এক হাত। গলা দিয়ে তার একটিমাত্র শব্দ বেরোল,—ক্কঃ!

তারপরে একটা ভারি সিসের মতো ঝপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল কাকটা। কাকের দল কা-কা করে চেঁচাতে চেঁচাতে মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

খোকা চেঁচিয়ে উঠল, মা মা, দেখে যাও একটা কাক শিকার করেছি। আনাড়ি খোকার হাতের গুল্‌তির টিপ্ আচম্‌কা চড়ুই-বাচ্চার জীবন বাঁচিয়ে দিল।

* *

চড়ুইদের বাসা ছাড়বার সময় হয়েছে।

আকাশ ডাক দিয়েছে তাদের, রহস্য-মধুর ডাক। বাচ্চাদের পাখা এখন সবল। শালিকেরা চিকি-মিকি করে নদী-পারে উড়ে চলেছে।

বাগানের ফুলের দল মাথা নুইয়েছে। ঝরা পাপড়ির দলে ছেয়ে গেল বাগান। টিয়ার দল দেশান্তরে যাত্রা করেছে যাযাবর পাখায়। কাঠঠোকরার বাসা-গড়া শেষ। দেবদারুর কোটরে আজ দেখা যায় তাদের। ফুলের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতিরা নিয়েছে বিদায়। গাছের সবুজে লেগেছে হলুদের ছোপ। প্রকৃতি রূপ পরিবর্তন করছে।

মরণ, জীবনের একটা বাধা; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন আজও উত্তাল,—স্রোতে।

রঙিন কাঁচ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাজা থমকে দাঁড়াল। রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের জগৎটা ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে জানালার শার্সিতে নাক ঠেকিয়ে রাজা দাঁড়িয়েছেন। শার্সির এই জায়গাটার কাঁচটা ঘন নীল।

এই নীল অংশটুকুর ভিতর দিয়ে যখন বাইরে তাকানো যায় তখন যেন মনে হয় গভীর রাত; সাধারণ রাত্রি নয়, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঠিক যে সব রাত দেখা যায়। রূপকথার রাজপুত্তুর যে রাতে পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে বেড়িয়ে পড়েন এ সব রাত সেই রাত। সবই স্থির হয়ে আছে তবু একটা নীল আলোর অনুজ্জ্বল মহিমা, ঘন নীল।

রাজা লাল-কাঁচের শার্সিতে সরে এল, প্রখর তপন তপ্ত প্রান্তর যেন জ্বালায় জ্বলছে, একটা বুকফাটা হাহাকার। যেন কাছেই কোথায় পৃথিবীব্যাপী অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছে। কী ভয়ানক!

রাজা লাল-কাঁচের শার্সি থেকে সরে গেল। রান্নাঘর থেকে অস্পষ্টভাবে মার চুড়ির আওয়াজ ভেসে আসছে; বাসনের শব্দ, তরকারিব লোভনীয় গন্ধ। রাজা আজ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে, এবার সে বেরোব, এ এক নিরুদ্দেশ যাত্রা। মা যদি দেখে ফেলেন তাহলেই কিন্তু আর বেরোনো যাবে না।

রাজা একটু ইতস্তত করল। তারপর আবার সবুজ কাঁচে মুখ রাখল। ঘন নীলের পর এই সবুজটাই তার বেশ ভালো লাগে। এই সবুজ কাঁচের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎটাই কেমন নতুন নতুন মনে হয়। মনে হয় যেন সদ্যস্নাত পৃথিবীতে বসন্তের সমারোহ।

এই অংশটায় মুখ লাগিয়ে রাজা অনেকক্ষণ চুপ পরে দাঁড়িয়ে রইল। এই একটা জগতেই তো রাজপুত্তুররা দৈত্যদের হাত থেকে রাজকন্যাদের উদ্ধার করেছেন। জিয়নকাঠির স্পর্শে নিদ্রিতপুরীর রাজকন্যার হাজার বছরের পুরাতন ঘুম ভাঙিয়েছেন—এই সেই অপূর্ব পৃথিবী!

বেরোবার সময় রাজা অতি সাবধানে দরজাটা বন্ধ করল,—মা না এতটুকু আওয়াজ পান। ঠিক এই মুহূর্তে মায়ের সঙ্গে কোনো কথা বলার তেমন ইচ্ছে নেই রাজার।

নিজের জন্য একান্তভাবে একটু অবসর চাই রাজার। সেই নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দের পরম-রমণীয় লগ্নে তাকে সবকিছু করে ফেলতে হবে। সময় বড়ো কম।

সামনের বাগানের এক পাশ থেকে দুটি কাঠি সংগ্রহ করল, একটি লম্বা, মুখটা কিঞ্চিৎ ছুঁচোলো আর একটি মোটা এবং ছোট্ট। বড়ো কাঠিটা দিয়ে রাজা একটা গণ্ডি আঁকল, যে রহস্যময় গণ্ডি দিয়ে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে রেখে গিয়েছিলেন। সেই ধরনের গণ্ডি, মন্ত্রপূত গণ্ডি, বিপদ ও বিভীষিকার হাত থেকে এই গণ্ডিই তাকে রক্ষা করবে।

এরপর আর কেউ কাছে না থাকায় রাজা নিজেই নিজেকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর গলায় বলল,—রাজাবাবু, সাবধান! দুশমন একেবারে সামনে—।

রাজার হাতে অস্ত্র আছে। লম্বা কাঠিটা তীক্ষ্ণধার তলোয়ার হয়ে উঠেছে। দুটি আঙুল দিয়ে সেই তলোয়ার সজোরে ধরে আছে রাজাবাবু। শত্রুর সামর্থ্য কী তার সামনে আসে?

একটু অগ্রসর হতেই পাশের বাড়ির বেড়ালটা এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে মার্জারসুলভ মার্জিত ভঙ্গিতে গর্জন করল—ম্যাঁ-ও-ও।

শব্দটা শোনাল যেন যুদ্ধং দেহি—

ঈষৎ পিছু হটে লেজটি তুলে সে বীরদর্পে দাঁড়িয়েছে। রাজাবাবুর তলোয়ার ঝন্ ঝন্ করে উঠল,—সেই দিকে লক্ষ্য করে, সে এগিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সেই বেড়ালের মাসিত্ব ঘুচে গেল, দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘ। বাগান নয়, ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তার চোখ দুটি জ্বল-জ্বল করছে।

রাজাবাবু বীর বিক্রমে বলে উঠল—আঃ—। তারপর সবলে সেই তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে গেল—

বেড়ালটা লাফিয়ে পিছনে হটে গেল— উঃ-শ্-শ্-শ্-শ্-শ্ গররর। রাজাবাবু কিন্তু ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। সে আরও এগিয়ে গেল, হাতে তলোয়ার আছে, ভয় কী তার। বেড়ালটা ভয়ে ভয়ে পাতার আড়ালে সরে পড়ল।

বিজয়ী রাজাবাবু দীপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল। সামনের বাগানের দিকে।

এইখানেই সেই গুপ্ত গহ্বর আছে, রাজাবাবু সহজেই তা দেখতে পায়। তার চোখে কিছুই লুকোনো থাকে না, সে সব দেখতে পায়। সহজে বুঝে নেয় মাটির বুকে ঠিক কোন্ অংশে হাজার বছরের সঞ্চিত গুপ্তধন লুকোনো আছে। রাজাবাবুর তলোয়ার এখন কোদালের ভূমিকায়। শ্বাসরোধ করে এক মনে রাজাবাবু মাটি খুঁড়ছে।

সহসা কোদালের ওপর কঠিন কিছু যেন ঠেকল। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অধীর আগ্রহে রাজা খুঁড়ে যায় মাটি। সোনার মতো কী যেন চিক্-চিক্ করছে। এই সেই হাজার বছরের গুপ্তধন। অপরে হয়তো পিতলের বোতাম বলে অবহেলা করবে রাজাবাবু কিন্তু জানে কী এর মূল্য।

চারিদিকে তাকিয়ে রাজাবাবু মাটি দিয়ে আবার সেই অমূল্য রত্ন ঢেকে ফেলল,—বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেতে পথে সহস্র কৈফিয়ত দিতে দিতেই প্রাণান্ত হবে।

ক্লান্ত রাজাবাবু বাগানের একপাশে বেঞ্চিটিতে বসে পড়ল। তার হাতের কাঠি দুটো এখন ফাইটার প্লেনের কন্ট্রোল, ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজাবাবু এক ঝাঁক শত্রু বিমানের ওপর। আগুন জ্বলে ওঠে—নিচে থেকে আওয়াজ আসছে ববমুম্, বম্ম্। ধুলো আর ধোঁয়ায় ধরণী ধূসর। তিনখানা প্লেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এদিকে ফ্লাইট লেফটেনান্ট রাজাবাবুর বিমানের পুচ্ছে আগুন ধরেছে—রাজাবাবু প্যারাসুটের সাহায্যে কোনোমতে নিরাপদে মাটিতে নামল!

বাগানের মাঝপথে এসে রাজাবাবু থামল। ক্রিকেটের পিচ। চমৎকার পিচ। আন্তঃরাজ্য খেলায় রাজাবাবু ব্যাট করছেন, সেঞ্চুরিতে পৌঁছোতে আর মাত্র কয়েকটি রান বাকি। অবশেষে রাজাবাবু একটি বাউন্ডারি করল। খেলায় শেষপর্যন্ত ওদের দল-ই জিতে গেল। দর্শকদের সে কী উত্তেজনা! সবাই ঘিরে দাঁড়াল। সবাই কাঁধে তুলে নিয়ে হই হই করছে। কী উল্লাস! সবাই মিলে ওকে প্যাভিলিয়নে নিয়ে গেলেন।

রাজাবাবু খুব মান বাঁচিয়েছে। কী ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং! একখণ্ড বরফ মুখে তুলে নিয়ে সে জনতার সংবর্ধনার জবাব দেয়। কী অপূর্ব উত্তেজনা!

রাজাবাবু বর্তমানে আবিষ্কারে মত্ত। দশটি নতুন ধরনের প্রাণী সে আবিষ্কার করেছে। একটির নাম গজক্ষয়। হাতি ক্ষয় পেয়ে শূকর শাবকের মতো ছোটো হয়ে গেছে।

বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাঁচায় পোষার বাসনা ছিল। কিন্তু তা আর হল না। হাতের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডটি ঘোরাতেই সেসব অদৃশ্য হল!

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখা যায়, জয়া ডেক চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে, পা টিপে নিঃশব্দে এসে তার পিছনে দাঁড়াল রাজকুমার। তারপর ধীরে-ধীরে তার চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে বলল, রাজকুমারী জাগো—।

জয়া ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল, মাথা তুলে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে রাজা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে ওঠে—ওরে বাব্বা! রাজা যে!

—রাজা নয়, রাজপুত্র, তুমি রূপকুমারী, হাজার বছর ধরে এমনই ঘুমিয়ে আছ!

জয়া তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে—বলল, ডাইনি দেখবে! আমি তোমাকে একটা ভালো ডাইনি দেখাব।

রাজা বলল, সত্যি! সত্যিকার ডাইনি? ও, কতদিন যে ডাইনি দেখিনি।

জয়া মুখের ওপর আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করে। রাজার পিছনে একটা জানালার ধারে এসে দুজনে দাঁড়ায়। এখান থেকে নিচের ছোটো ঘরটা দেখা যায়।

জয়া চুপি-চুপি বলে—ওই দেখ! সাবধান, ও যেন দেখতে না পায়। তাহলেই হয় ভেড়া নয় বেড়াল বানিয়ে দেবে।

রাজা বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দেয়—সত্যিকার ডাইনিই বটে। ঘরের ভিতর বেশ কয়েকটা বেড়াল।

ডাইনিটা কিন্তু এমনই সেজে আছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে জয়ার দিদিমা। কিন্তু যারা জাদু জানে তাদের চোখে ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

রাজা ও জয়া দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। তারপর হাসতে হাসতে দৌড়ে পালায়।

রাজা যখন বাড়ি পৌঁছোল তখন সন্ধ্যা নামছে। বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মা সামনে এসে দাঁড়ালেন। রান্নাঘর থেকে ঠিক লক্ষ করেছেন।

বললেন—হ্যাঁ রে! এতক্ষণ কোথায় ছিলি। সাড়া শব্দ নেই। উদাসীন ভঙ্গিতে রাজা বলে—না, কোথাও নয়। এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

বা রে, ঘুম থেকে উঠেই পালিয়েছিস! খাবার পড়ে আছে।

মা একটু রেগে গেছেন।

রাজা কোনো কথা না বলে ওপরের সিঁড়ির ধারে সেই রঙিন শার্সির পাশে দাঁড়াল।

শুনতে পেল মা বাবাকে বলছেন, ছেলেটা দিন দিন যেন কেমনতর হয়ে যাচ্ছে। দিনরাত আনমনা—

রাজা ভালো করে সব শুনতে পায় না। ওদিকে কান নেই। মন অন্যদিকে। বাইরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গোলাপি কাঁচের ভিতর রাজা তাই দেখছে।

সারা পৃথিবীটায় যেন ফুল ফুটেছে। লাল, নীল, হলুদ—যেন অজস্র গোলাপের হাতছানি।

নাম
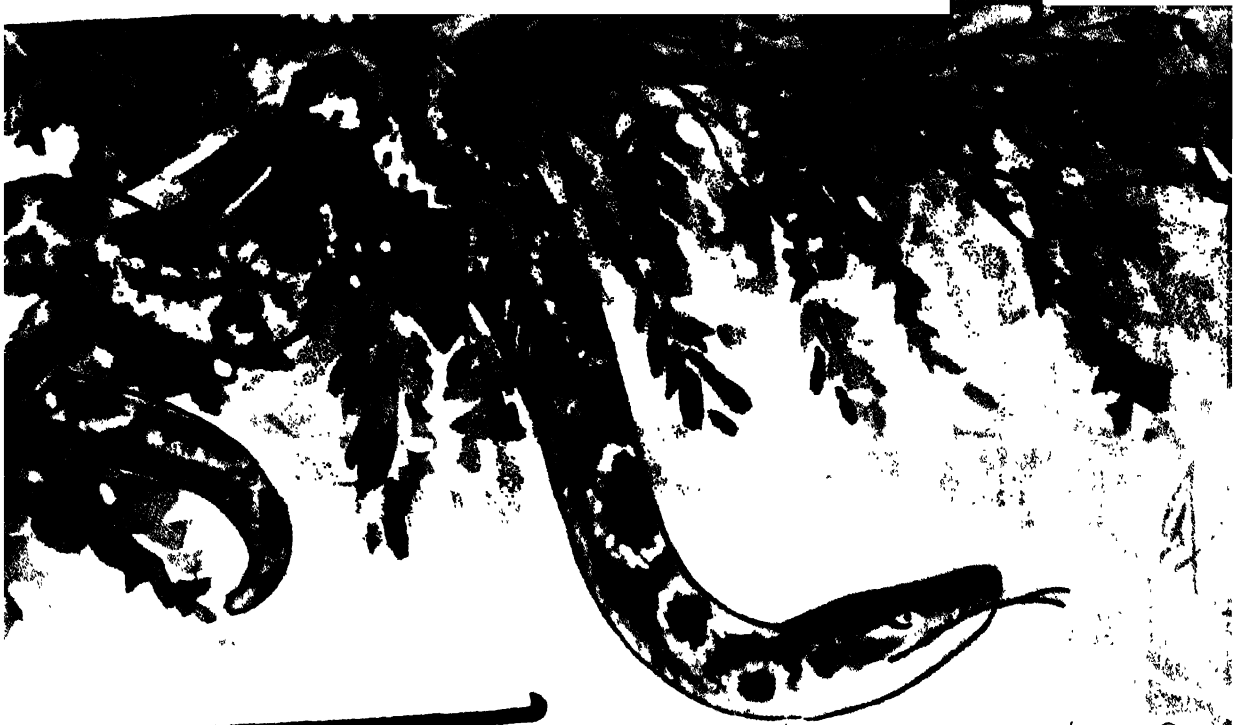
বিমল মিত্র

এ দেশ বড়ো সাংঘাতিক দেশ। এখানে খ্যাতি বড়ো দুর্লভ। এখানে খ্যাতি সহজে আসে না, অর্জন করতে হয়। এখানে আমির ওম্‌রাহ থেকে শুরু করে সামান্য রিক্‌শাওয়ালা পর্যন্ত টাকার কাঙাল হোক আর না-হোক, নামের কাঙাল। অন্তত রিক্‌শাওয়ালারাও যে আবার খ্যাতির কাঙাল হয় তার একটা নজির আমি দিতে পারি। শখের বাজারের এক রিক্‌শাওয়ালাই তার প্রমাণ।

রিক্‌শাওয়ালাটাকে সবাই দেখেছে। শখের বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্যাসেঞ্জারের আশায়। খালি পা, খালি গা, খালি মাথা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কিন্তু তার নামটা যে কী তা লোকে কেমন করে জানবে?

জানা গেল অদ্ভুত উপায়ে।

শখের বাজারের মোড়ের মাথায় একটা বিরাট শিরীষ গাছ ছিল, বহুকালের গাছ। ডালপালা বেরিয়ে সমস্ত জায়গাটা ছায়া করে রাখত। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা কে একজন ওপর দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠল—সাপ—!

দু-চারজন যারা ছিল তারাও দেখলে—একটা ময়াল সাপ শিরীষ গাছটার ডগায় মোটা একটা ডাল জড়িয়ে নিচু দিকে মুখ করে রয়েছে। নিচের রাস্তার দিকে চেয়ে জিভটা চুক্‌চুক্ করে এক-একবার বার করছে।

দুজন থেকে চারজন, চারজন থেকে দশজন। এমনিভাবে ভিড় বাড়তে লাগল। হরিশবাবু অফিসে বেরিয়েছিলেন—তাঁর আর অফিস যাওয়া হল না। তিনি সাপ দেখে সেখানেই থমকে দাঁড়ালেন। বাসে ওঠবার জন্য যারা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল তারাও এসে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সাপ দেখতে লাগল। বাসের ড্রাইভার কন্‌ডাক্টররাও এক ফাঁকে সাপটাকে দেখে নিয়ে গেল। মোট কথা, শখের বাজারে সেদিন সকলের কাজকর্মের দফা রফা হয়ে গেল।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত ভিড়, যাকে কেন্দ্র করে এত জটলা, সেই সাপটা কিন্তু নির্বিকার। তেতলা সমান উঁচু থেকে যেমন নিচের দিকে চেয়ে ছিল তেমনি চেয়েই আছে, নড়ে না চড়ে না—শুধু চুক্‌চুক্ করে এক-একবার জিভ বার করে।

পাড়ার বান্ধব-সমাজের সেক্রেটারি পান্নালাল বাজারে গিয়েছিল। সাপের খবর শুনে বাজারের থলেটা বাড়িতে রেখেই দৌড়ে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল। বললে—আপনারা এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন? এখনও কোনো স্টেপ্ নেননি কেন? চিড়িয়াখানাতে খবর দিয়েছেন?

চিড়িয়াখানা! কথাটা সকলের কানেই গেল।

পান্নালাল বললে,—এখুনি চিড়িয়াখানায় খবর দিলেই তারা এসে ধরে নিয়ে যাবে সাপটাকে। তাহলে কোনো হাঙ্গামা থাকবে না আর—

পান্নালাল একাই নয়। বান্ধব সমাজের আরও সব হোমরাচোমরা পান্ডারাও এসে পড়েছিল, তারাও সেই একই কথা বললে। এটা তো চিড়িয়াখানারই ডিউটি। খবর দিলেই লোক চলে আসবে।

তা সেই ব্যবস্থাই হল, চিড়িয়াখানায় টেলিফোন করে দেওয়া হল। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জিপ গাড়িতে করে এসে হাজির হল লোক। সঙ্গে চটের থলে, লম্বা একটা দড়ি। আর একটা বাঁশ। বহুদিনের পুরোনো লোক সতীশবাবু; এই সাপ ধরাই কাজ সতীশবাবুর। বিশ বছর ধরে এই কাজই করে আসছে। গাড়ি থেকে নেমে সতীশবাবু সাপটাকে ভালো করে দেখলে ঘুরে ঘুরে। তারপর বললে—আপনাদের একটা কাজ করতে হবে স্যার—

পান্নালাল বললে—কী কাজ বলুন?

সতীশবাবু বললে—আপনারা কেউ একজন গাছে উঠে এই বাঁশ দিয়ে সাপটাকে খোঁচা দিন—খোঁচা দিলেই সাপটা মাটিতে পড়ে যাবে, তখন আমি নিজে সাপটাকে থলের মধ্যে পুরে ফেলব—

পান্নালাল বান্ধব-সমাজের সেক্রেটারি। শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। বান্ধব-সমাজের অন্য পান্ডারাও একটু ভয় পেলে। কে উঠবে গাছে! কার এত সাহস!

সতীশবাবু বললে—আমি গাছে উঠে খোঁচা দিতে পারি—কিন্তু তাহলে আপনাদের নিচের থেকে সাপটাকে ধরতে হবে—

তাতেও কেউ রাজি নয়। ভিড়ের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। হরিশবাবু, পরেশ সান্যাল, তারাও শুনলেন। কার এমন বুকের পাটা যে সাপের মুখে খোঁচা দেবে।

হরিশবাবু সাবধান করে দিলেন। বললেন—তোমরা এত কাছে যেয়ো না হে। ছুটে এসে কামড়াতে পারে। সাপ বলে কথা—

পরেশ সান্যাল বললেন—এর তো একটা বিহিত করতে হয় দাদা—পাড়ার মধ্যে সাপ, এ কেমন কথা! কোত্থেকে এল?

পান্নালাল বললেন—তোমরা ছোকরা মানুষ, তোমরা কেউ ওঠ না গাছে—

কেউ রাজি নয়। আস্তে-আস্তে ভিড়টা যেন পাতলা হতে শুরু হল, সবাই এ-ওর মুখের দিকে চায়। সবাই চায় একজন কেউ উঠুক—তারা দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে! পনেরো মিনিট কেটে গেল, কেউই রাজি হয় না শেষপর্যন্ত। সতীশবাবু বললেন—আপনারা যখন কেউই রাজি নন—তখন আমি যাই—

হঠাৎ কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠল—আমি রাজি হুজুর, আমি উঠতে পারি—

সবাই ফিরে দেখলে চেয়ে। শখের বাজারের রিক্‌শাওয়ালা, খালি পা, খালি গা, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা চেহারা।

—আমি সাপটাকে পাড়তে পারি, হুজুর।

সতীশবাবু বললে—পারবি তুই? তাহলে ওঠ্ গাছে, এই বাঁশটা নিয়ে ওঠ্—

রিক্‌শাওয়ালাটা বললে—কিন্তু একটা কথা দিতে হবে হুজুর।

সতীশবাবু বললে—কী কথা?

—আজ্ঞে, চিড়িয়াখানার কাঁচের ঘরে আমার নাম ছেপে দিতে হবে যে, আমি সাপটাকে পেড়ে দিয়েছি।

সতীশবাবু বললে—তা দেব। তুই ওঠ্ তো এখন—

পান্নালাল এগিয়ে এল—বললে— তা কী করে হয়? একটা রিক্‌শাওয়ালার নাম হয়ে যাবে অমনি অমনি—?

সবাই সেই কথাই বললে। হরিশবাবু, পরেশ সান্যাল, আর আর মাতব্বররাও আপত্তি করলেন। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, সরকারি খাতায় তার নাম্ উঠে যাবে ছাপার অক্ষরে! পাড়ার পাঁচজন থাকতে শেষে একটা রিক্‌শাওয়ালার খ্যাতি হয়ে যাবে চিরকালের মতো? তাই কখনও হয়? লোকে বলবে কী? না না মশাই, অত বেয়াড়া আবদার ভাল নয়।

রিক্‌শাওয়ালাটা বললে—তাহলে আপনারাই সাপ পাড়ুন। আমার নামিয়েও দরকার নেই, আমার নামেরও দরকার নেই—

পান্নালাল বললে—তুমি চটছ কেন হে, আমরা তো অন্যায় কিছু বলিনি। তোমার নাম থাকলে লোকে বলবে কী? শেষে তো পাড়ারই বদনাম! লোকে দেখে বলবে, শখের বাজারে আর লোক ছিল না?

রিক্‌শাওয়ালাটা বললে—তাই তো বলছি বাবু, আপনারাই পাড়ুন, আপনাদেরই নাম হোক—

পরেশ সান্যাল বললেন—তার চেয়ে, এক কাজ করো না বাবা, চার গণ্ডা পয়সা দিচ্ছি, চার গণ্ডা পয়সা নিয়ে সাপটাকে পেড়ে দে—লক্ষ্মী বাবা আমার, দেখছিস বিপদে পড়েছি—

—না হুজুর, পয়সা চাই না, আমার নাম চাই—

পান্নালাল বললে—খুব তো নামী লোক দেখছি হে তুমি, তা চার আনা পয়সায় রাজি না হোস, আরও চার আনা পয়সা দিচ্ছি, আট আনা মোট; এবার তো রাজি?

—না হুজুর, আটআনাই দিন আর আট টাকাই দিন, আমি আমার নাম চাই—

সবাই রিক্‌শাওয়ালার জিদ দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। বেটা নামের কাঙাল। পয়সার চেয়ে নামটাই বড়ো হল তোর রে!

সতীশবাবু বললে—আর দেরি করতে পারি নে স্যার। একটা সাপ ধরতে চোপর দিন লাগাব নাকি? যা হয় আপনারা একটা ঠিক করুন কিছু, আপনারা যার নাম বলবেন তার নামই ছাপা হবে।

শেষে পরামর্শ হতে লাগল মাতব্বরদের মধ্যে। পরামর্শের শেষে পান্নালাল বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, তোর কথাই রইল, তুই ওঠ্, তোর নামই ছাপা হবে।

রিক্‌শাওয়ালা বললে—একটা সাপ কতদিন বাঁচে হুজুর?

পান্নালাল বললে—পঞ্চাশ-ষাট-একশো বছর—

—যতদিন সাপটা বেঁচে থাকবে, ততদিন আমার নাম লেখা থাকবে তো?

—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ—

—তাহলে আমার নামটা আগে একটা খাতায় লিখে নিন হুজুর, শেষে গন্ডগোলের মধ্যে যদি ভুলে যান।

পান্নালাল পকেট থেকে ডায়েরি বই আর কলম বার করে বললে—কী নাম তোর, বল্?

—লিখুন হুজুর, শ্রীরুক্মিণীহরণ দাস,। গ্রাম বিষ্টুপুর, পোস্টাপিস কাঁঠিপোতা, জেলা বাঁকুড়া, পিতা...

—থাক থাক আর পিতার নাম দরকার নেই, তুই উঠে পড় বাবা, এখন বিপদ থেকে উদ্ধার কর্ আগে...

তখন রিক্‌শাওয়ালা 'জয় মা কালী' বলে গাছে উঠে পড়ল, উঠতে উঠতে একেবারে গাছের ডগায় গিয়ে উঠল। তারপর বাঁশের আগা দিয়ে একটা খোঁচা দিতেই সাপটা ধপাস করে মাটিতে পড়ল, আর নিচে সতীশবাবু তৈরিই ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে থলির মধ্যে পুরে ফেলেছে।

তারপর এতক্ষণ যত ভিড় জমেছিল, সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল গাড়ির কাছে। সতীশবাবু থলিটা গাড়িতে তুলে নিয়ে দড়ি দিয়ে মুখটা বেঁধে ফেলেছে। তারপর কাজ শেষ করে গাড়ি ছেড়ে দিলে। পাড়াসুদ্ধ সমস্ত লোক হই হই করে উঠল। গাড়িটা ধুলো ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল কলকাতার দিকে।

আপনারা এখনও চিড়িয়াখানায় যদি যান, সাপের ঘরে গেলে দেখতে পাবেন ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে সেই ময়াল সাপটা একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। লোকজন সামনে গেলে চোখ পিট-পিট করে শুধু চেয়ে দেখে। আর বাক্সের একটা কোণের দিকে লেখা আছে—Presented by the Bandhab Samaj, Sakher Bazar—শখের বাজার বান্ধব-সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত উপহার।

ধরিয়ে দাও ইনাম পা

ধীরেন্দ্রলাল ধর

শীতের অপরাহ্ণ। সূর্য আকাশে আছে, কিন্তু রোদে কোনো তাপ নেই। গঙ্গার হাওয়াটায় ঠান্ডার আমেজ যেন জোরালো হয়ে উঠছে।

দুটি ছেলে গঙ্গার ধারে একটি বটগাছের নিচে বসেছিল। মানিকচাঁদ ও মতিলাল।

মতি বলল—চল, আর ভালো লাগছে না। সূর্য এবার অস্ত যাবে, আমার শীত করছে।

মানিক বলল—আমার এই ঠান্ডা আর গায়ে লাগে না। পুরো সাতদিন জঙ্গলে গাছতলায় রাত কাটিয়েছি, তারপর জেলে ডিঙিতে এই নদীর উপর দিয়ে এসেছি সারারাত। এখন আর ঠান্ডাকে ঠান্ডা বলেই মনে হয় না। কীভাবে যে সেদিনগুলো কেটেছে ভাবা যায় না।

মতি বলল—তোদের তো অনেক পাইক ছিল। তারা বুঝতে পারল না?

—তুই আর বকিস নে—মানিক বললে—বাড়িতে দরোয়ান আর পাইক ছিল জন পঞ্চাশ, তারা মজনু শা-কে বুঝবে! বড়ো বড়ো ইংরেজ সেনাপতি তার কাছে ঘায়েল হয়ে গেল, দুঁদে জমিদাররা তার নাম শুনলে ভিরমি খায়। আমাদের মতো জমিদারের পঞ্চাশ জন পাইক সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। আর কে যাবে জান কবুল করে তার সঙ্গে লড়তে? সবাই তো মাইনে করা লোক বই তো নয়।

মতি বললে—তোরা যখন এতটাই জানিস, তখন কিছু টাকা দিয়ে দিলেই তো পারতিস। শুনেছি টাকা পেলেই সে চলে যায়।

সে চেষ্টাও বাবা করেছিলেন। ফকির বলল—'পাঁচ হাজার টাকা চাই।' অত টাকা বাবার কাছে নগদ ছিল না। বাবা বলে পাঠালেন 'দু হাজার নাও।' মজনু রাজি হল না, বলে পাঠাল 'পনেরো ঘর প্রজার বাস্তু পুড়েছে, তাদেরকে ঘর তৈরি করিয়ে দিতে খরচ পড়বে তিন হাজার, আর আমি নেব দু হাজার, কাজেই পাঁচ হাজারের কমে পোষাবে না।'

—তোরা ঘর পুড়িয়েছিলি?

—প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য করতে হয়েছিল, নায়েব গেল খাজনা আদায় করতে, বললে—'জমিদারকে মানিনে, খাজনা দেব না।' তখন পাইক গেল, ওরা তাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করলে। তখন রাতে হরি সর্দার গিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে এল।

—মজনু এই ধরনের ব্যাপারগুলো বড্ড অপছন্দ করে।

—তার পছন্দ-অপছন্দে আমাদের কী? আমরা কি তার প্রজা? আমাদেরকে তো কোম্পানির ঘরে চৈত কিস্তির খাজনা জমা দিতে হবে, কেউ না দিলে আমরা দেব কোত্থেকে?

—এখন তো সবই গেল, এখন দিবি কোত্থেকে?

—বাবা বলেছে—'আমিও সহজে ছাড়ব না। আমিও এর শোধ তুলব।' সেইজন্যেই তো বাবা এখানে এসেছে। মামাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে কী করা যায় ঠিক করবে।

মামাবাবু মানে মতিলালের বাবা জগৎরাম চৌধুরী।

মতি বলল—বাবা কী করবেন?

মানিক বলল—মামাবাবু একা কিছু করবেন না। কয়েকজন তালুকদারকেও ডাকা হয়েছে, সবাই বসে একটা পাকা ব্যবস্থা করতে হবে। মজনু শা-র এই অনাচার কোনোমতেই আর সহ্য করা উচিত নয়। তার অত্যাচারে কত জমিদার যে পথে বসেছে তার ইয়ত্তা নেই।

—চাষাভুষোদের জন্যে মজনু কিন্তু অনেক কিছু করে, তারা তাকে দেবতার মতো ভক্তি করে।

—মজনুই করে আর আমরা কিছু করি না? পুকুর কাটাচ্ছি, রাস্তা করছি—এ সব ফালতু? তুই কিচ্ছু জানিস নে।

—মতি আর কিছু বলল না। গাছতলা থেকে উঠে পড়ল, বলল—চল্।

আর কোনো কথা হল না। সোজা একটা বাগানের ভিতর দিয়ে এসে দুজনে একখানি বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

গঙ্গার সামনে জমিদারের মস্ত বাগানবাড়ি, সামনেই একতলার কাছারি-মহল। দোতলায় নাচঘর। এই ঘরে নাচ-গানের আসর বসে, সম্মানীয় অতিথি অভ্যাগত এলে, তাদেরকে এখানে আপ্যায়িত করা হয়।

আজকেও এই চৌধুরী বাড়ির নাচঘরে কিছু মাননীয় অতিথির সমাগম হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুগ্রহে আজ এক-একটি তালুকের বন্দোবস্ত নিয়ে বসে আছে। সাধারণ প্রজাদের কাছ থেকে এরাই খাজনা আদায় করে। চৈত্ কিস্তিতে যত টাকা কোম্পানির ঘরে জমা দেয়, তার অনেক গুণ বেশি এরা আদায় করে প্রজাদের কাছ থেকে। এই আদায়ের ব্যাপারে কোনো রকম জুলুম করতেই এরা পেছ-পা হয় না। কাছারিতে ডেকে এনে বেত মারা, বাঁশ ডলা, লেঠেল দিয়ে ঘরে আগুন দেওয়া, ধানের গোলা লুটে আনা, সব কিছুতেই এরা পারদর্শী। গাঁয়ের মানুষ এদের ভয়ে কাঁপে। কিন্তু তিন-চার বছর তাদের এই কাঁপুনি থেমে গেছে, আর তা থামিয়েছে মজনু শা। কোথাও কোনো অনাচারের খবর পেলে হয়, সেই তালুকদারের আর রক্ষা নেই। অযোধ্যা থেকে এই ফকির এসেছে বাংলাদেশের জমিদারদের শায়েস্তা করতে। একবার যে মজনুর নজরে পড়বে তার আর রক্ষে নেই, সর্বস্ব ফেলে প্রাণ নিয়ে তাকে পালাতে হবে। এবার মজনু এসেছে এই বগুড়া অঞ্চলে। মঞ্জরা জেলার ক-জন তালুকদার মোটা টাকা সেলামি দিয়ে রেহাই পেয়েছে। কালেশ্বরের তালুকদার বীরেন্দ্র ভঞ্জ বুখে দাঁড়িয়েছিল, তার সর্বস্ব গেছে। শোনা যাচ্ছে মজনু ফকির এবার এদিকে আসতে পারে, জগৎরাম সেইজন্যই আজ আর সবাইকে ডেকেছেন।

বিকালের আগেই আট-দশজন তালুকদার এসে পড়েছে। ঘোড়ায় চড়েই একা একা এসেছে। এ সব গুরুতর ব্যাপারে সঙ্গীসাথি সাক্ষী রাখতে নেই, কোনো সিপাই-বরকন্দাজকে আর বিশ্বাস করা যায় না। মজনু ফকিরের উপর কার কতটা অন্তরের টান আছে, জানা নেই। কীভাবে কথা চালাচালি হবে কে জানে।

সন্ধ্যা থেকেই জগৎরামের নাচঘরে বৈঠক শুরু হয়েছে।

তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে সবাই বসেছে। কথা বলছে বীরেন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী। সম্প্রতি মজনু ফকিরের সঙ্গে একমাত্র তারই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছে, এবং সর্বস্ব খুইয়ে এসেছে। তার কথাটাই সবার আগে শোনা দরকার।

সব শুনে হরিপুরের ভগৎরাম বলল—আমার বদমায়েস প্রজাকে আমি শায়েস্তা করব, তাতে মজনু ফকিরের কী? সে আমার জরিমানা ধরবার কে?

কিষেন গাঁওয়ের গোবিন সিং বলল,—কিন্তু না দিয়ে কী হল, সর্বস্ব তো খোয়াতে হল।

রামহাটির বিক্রম চৌধুরী বলল—টালবাহানা করে আর কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে এটা হত না। কোম্পানির ফৌজ এসে পড়ত।

বীরেন্দ্র ভঞ্জ বলল—মজনু ফকির অত বোকা নয়, সে সময়ের দাম জানে, সে ঝড়ের বেগে চলে, সে তোমার জন্যে এক জায়গায় বসে থাকবে? ততক্ষণে সে দু-চারটে কুঠি লুঠ করে বেরিয়ে যাবে। ও সব পুরানো প্যাঁচ তার কাছে খাটে না।

এবার জগৎরাম বলল—যা ঘটে গেছে, তা নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমাদের এখন কী করা উচিত সেইটেই হচ্ছে কথা।

নাচঘর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু গড়গড়া টানার শব্দ, আর তামাকুর ধোঁয়া।

বিক্রম চৌধুরীই প্রথম কথা বলল—ফকিরের পাঁচ হাজার সিপাই আছে, কামানও আছে। আমরা সকলে এককাট্টা হলেও পাঁচ হাজার বরকন্দাজে হবে না, আমরা তার সঙ্গে কোনোমতেই পারব না।

ভগৎরাম বলল—কেন পারব না? কোম্পানির সাহায্য নিলেই পারব।

গোবিন্দ সিং বললে—কোম্পানির যদি সে শক্তি থাকত তাহলে কোম্পানির ঢাকা ও ময়মনসিংয়ের কুঠি লুঠ হত না।

ভগৎরাম বলল—তবে কী বল, মজনুকেই আমরা বাংলার নবাব বলে মেনে নেব?

জগৎরাম বলল—আমি যা বলি শুনুন। কোম্পানির সেনাপতি ব্রেনান সাহেব সৈন্য নিয়ে এদিকে এসেছে। মজনুকে ধরার জন্য সে চেষ্টা করছে। মজনুকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা ইনাম দেবে বলেছে। আমাদের দরকার এখন যেভাবেই হোক মজনুকে ধরিয়ে দেওয়া। আমাদের সবাইকে তার গতিবিধির হদিশ রাখতে হবে। আর তা জানাতে হবে ব্রেনান সাহেবকে।

বীরেন্দ্র ভঞ্জ বললে—সে ব্যবস্থা আমি করেছি। কালেশ্বরে মজনুর সঙ্গে ব্রেনারের একটা বোঝাপড়া হবে। হয়তো তা দু-একদিন আগে হয়ে গেছে। তার কী ফল হল সে খবরটা আমি এখনও পাইনি, হয়তো আজই আমার লোক আসবে। মজনু যদি ঘা খায়, তবেই আমাদের সুরাহা।

ভগৎরাম বলল—তাহলে তো আজ আমরা এখানে কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারব না।

বীরেন্দ্র ভঞ্জ বলল—কেন পারব না, আমরা যে যার পাইক নিয়ে তৈরি থাকব। এবং কালেশ্বর পার হয়ে মজনু যদি এদিকে আসে তো গঙ্গার ধারে নাথপুরের মেলার মাঠে আমরা তাকে রুখব।

গোবিন্দ সিং বলল—সংখ্যায় তারা যদি অনেক বেশি হয়?

—হোক্ না।—বীরেন্দ্র ভঞ্জ বলল—আমরা মুখোমুখি লড়ব না, পাশ থেকে, পিছন থেকে বনবাদাড়ের আড়াল থেকে এলোমেলো লড়ব। শুধু হয়রানি করে দেরি করে দেওয়া, যাতে কোম্পানির ফৌজ এসে তাকে ধরে ফেলে।

জগৎরাম বলল—সেই সঙ্গে আর এক চাল চালতে হবে। আমাদের মধ্যে দু-একজন যাবে পাইকদের সঙ্গে আর বাকি সবাই ভালোমানুষ সেজে বসে থাকবে। মজনু যখন সেলামি দাবি করবে, তারা দিচ্ছি, জোগাড় করছি, বলে সময় নেবে।

সবাইকার মনে লাগল, মতলব পাকা হয়ে গেল। জগৎরাম এবার সকলের আহারাদির বন্দোবস্ত করল।

খেয়ে-দেয়ে এই রাতেই সবাই ফিরবে। হাতে সময় বেশি নেই। এ সব ব্যাপারে দু-এক দণ্ডে জীবনের গতি ঘুরে যায়।

মানিকচাঁদ ও মতিলাল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল. এবার তারা নেমে গেল নিচে।

মতিলালকে দেখে দরোয়ান ছুটে এল, বলল—দাদাবাবু খবর আছে! বড়োবাবুকে একবার খবর দিন।

মতিলাল বলল—বাবুরা সব খেতে বসেছে।

—তাহলে আপনি একবার ফটকে আসুন।

মতিলাল ফটকের সামনে গেল, একজন পাইক দাঁড়িয়েছিল, দরোয়ান বলল—বাবুরা খেতে বসেছেন, দাদাবাবুকে সব বল, উনি বাবুদের খবর দেবেন।

পাইক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—কালেশ্বরে মজনু ফকিরের দলের সঙ্গে ব্রেনান সাহেবের লড়াই হয়ে গেছে। মজনু হেরেছে চোট খেয়েছে। এই পথে দলবল নিয়ে সে আসছে, গঙ্গা পার হয়ে পালাবে। পিছনে ফিরিঙ্গি ফৌজ তাড়া করে আসছে। বাবুরা এখানে তাকে পাকড়াও করতে পারে। সময় বেশি নেই, ভোরের আগেই তারা এসে পড়বে। এরই মধ্যে তৈরি হতে হবে।

মতিলাল জিজ্ঞেস করল—মজনুর সঙ্গে কত লোক আছে?

পাইক বলল—দল ছড়িয়ে গেছে। এখন মজনুর সঙ্গে আছে বিশ-পঁচিশ জন। এই সময় ওকে পাকড়াও করার সুবিধা।

—এই পথে আসছে?

—হ্যাঁ, বোধহয় এইখান দিয়েই গঙ্গা পার হবে।

—মাত্র বিশ-পঁচিশ জন! তাহলে তো আমাদের পাইক দিয়েই কাম ফতে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তুমি বস, আমি খবর দিচ্ছি। এখনই বললে আর কেউ খাবে না, সব খাবার নষ্ট হবে। এখন তো সবে এক প্রহর হয়েছে। মজনুর এসে পড়তে তো সেই তিন প্রহর—বাবুরা খেয়ে নিক, তারপর বলব। এর মধ্যে পাইকদের আমি তৈরি হতে বলি, তুমি ততক্ষণ কিছু খেয়ে জিরোও।

তারপর মতিলাল দরোয়ানকে ডেকে বলল—দরোয়ানজি, হরি সর্দারকে জরুরি সেল্যাম দাও।

হরি পাইকদের সর্দার। সে আসতেই মতিলাল বলল—তোমার এখন কতজন পাইক আছে?

—বিয়াল্লিশ জন—দু-কুড়ি দুই।

—সবাইকে তৈরি হতে বল, বাবুরা খেয়েই বেরোবে, আজ 'বড়ো খেল্' দেখাতে হবে। বোঝা যাবে কার কবজির কেমন জোর!

—ঠিক আছে হুজুর। বলে হরি হাসতে হাসতে চলে গেল।

মতিও এল বাড়ির ভিতরে।

ভিতরে তখন খাওয়া চলছে। পোলাও ও মাছের প্রাচুর্যে তখন আসর জমাট। তখনকার লোকরা খেতে পারত, সেই আহারপর্ব সমাধা হতে রাত দেড় প্রহর কেটে গেল। তারপর মতি বলল মজনু ফকিরের খবর।

পঞ্চাশ জন পাইক নিয়ে জগৎরাম ও বীরেন্দ্র ভঞ্জ তখনই বেরিয়ে পড়ল। জমিদার দুজন চলল ঘোড়ায় আর পাইকরা চলল রণ্‌পায়ে।

শেষ রাতে তারা মজনুর দলকে ধরে ফেলল। জনাদশেক ফকির মজনুকে নিয়ে আসছিল ঘোড়ার পিঠে। মজনু হাতে ও পায়ে আঘাত পেয়েছিল, একটা ঘোড়ার পিঠে একখানি ছোটো খাটিয়া বেঁধে নিয়ে তার উপর ফকিরকে শুইয়ে, দলের লোকেরা হেঁটে আসছিল। জমিদারের পাইকরা তাকে ঘিরে ফেলল। মজনুর জ্ঞান ছিল, বলল—লড়াই করার দরকার নেই, দুজন সট্‌কে পড়ো, খবরটা সবাইকে জানিয়ে দাওগে। আর সবাই চুপচাপ চল, যেখানে এরা নিয়ে যায়। আট-দশজন লড়াই করলে সবাই খুন হয়ে যাবে।

বিনা বাধায় মজনু বন্দি হল। ভোরের দিকে জগৎরাম ফিরে এল বাড়িতে। জমিদাররা অপেক্ষা করছিল, বাড়ির মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। তখনই লোক পাঠানো হল কোম্পানির সেনাপতি ব্রেনান সাহেবের কাছে—মজনু শা ধরা পড়েছে।

কথাটা গাঁয়ের মধ্যেও প্রচার হয়ে গেল, দলে-দলে মানুষ আসতে লাগল মজনুকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য। গরিব প্রজাদের কাছে মজনু শা ফকিরের শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল অত্যধিক ও আন্তরিক। তারা বিশ্বাস করত যে মজনু ফকিরের দৈবশক্তি আছে। জগৎরাম তাদের সামনে বুক ফুলিয়ে পায়চারি করতে লাগল, বোঝাতে চাইল—দেখ, তোমাদের মজনুর চেয়ে আমার শক্তি আরও কত বেশি!

কিন্তু মুশকিল হল মজনুকে কয়েদ করা নিয়ে। কাছারি বাড়িতে ফকিরের দলকে তো বন্ধ করা হল। কিন্তু মজনুকে সেখানে রাখতে বাধা দিলে মতিলালের মা, বললে—অমন

মানী লোক, এত বড়ো ফকির, তার উপর চোট্ খাওয়া অশক্ত শরীর, ওঁকে অমনভাবে অনাদর দেখালে কী শাপমন্যি দেবে জানা নেই, ওর ভালোভাবে সেবাযত্নের দরকার। সাধু-সন্ন্যেসীকে অছেদ্দা করলে ধর্মে সইবে না।

জগৎরাম বাইরে যাই বলুক, মনটা দমে গেল। শেষ অবধি মজনুকে বার-বাড়ির একখানা ঘরে আলাদা রাখার ব্যবস্থা হল।

মতির মা বদ্যিকে ডেকে পাঠালেন—ফকির সাহেবের ক্ষতস্থানে প্রলেপাদির ব্যবস্থা করার জন্য।

ফকির মজনু শা-র বয়স হয়েছে, মাথার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু দেহের সামর্থ্য ও মনের জোর কমেনি। আঘাত ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তার যথেষ্ট। প্রথম জীবনে তিনি সাধন-ভজন নিয়েই মেতে ছিলেন, কিষানদের উপর বহু অনাচার ও অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে শেষে একদিন খোদার নামে তিনি তাদের পরিত্রাতার ভূমিকায় নামলেন। সমস্ত ফকিরদের একত্রিত করলেন, বাংলা ও বিহার তোলপাড় করে ঘুরতে লাগলেন। যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তাঁবেদাররা জুলুম করে সেখানেই তাঁর আবির্ভাব ঘটে, অত্যাচারীর শেষ করেন, অনাচার-প্রাপ্ত রাজস্ব লুঠ করেন, তারপর সরে যান। অত্যাচারীরা অত্যাচার চালাতে ভয় পায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সমৃদ্ধি লুঠতে এসেছিল, মজনু শা-কে 'বিদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে তারা তাকে দমন করতে চেষ্টা করে। বিদেশি হলেও তারা ভারতের বিধিসম্মত শাসক আর মজনু দেশবাসীর কল্যাণকামী হলেও রাজদ্রোহী। যে শক্তিমান সে যা বলে তাই বিধি, যা করে তাই বিধিসম্মত, আর দুর্বল যদি অবিচারের প্রতিবাদ করে তাহলে সেটা বে-আইনি ও অবৈধ।

মজনু শা ও তার ফকিরের দলকে দমন করতে এল সেনাপতি টমাস। রংপুরের যুদ্ধে টমাস নিহত হল। তিনমাস পরে ক্যাপটেন এডওয়ার্ড ময়মনসিংহের এক যুদ্ধে সসৈন্যে নিহত হল। তিন বছর পরে আর এক যুদ্ধে লেফটেন্যান্ট রবার্টসন আহত হল। তারপর দীর্ঘ ছ-বছর ধরে কোম্পানি এই বিদ্রোহী ফকিরকে কোনো মতেই দমন করতে পারেনি। ছ-বছরের চেষ্টায় লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের অদৃষ্টের চাকা ঘুরেছে, কালেশ্বরের যুদ্ধে মজনু পরাজিত ও আহত হয়ে পালাচ্ছে। এবং পালাবার পথে ধরা পড়েছে, কোম্পানির বশংবদ জমিদার জগৎরামের হাতে।

কিন্তু এ জন্য মজনুর কোনো ভাবান্তর নেই। বাহুতে ও হাঁটুতে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। কোনো যন্ত্রণাবোধের ভাব মুখে নেই, খাটিয়ায় বসে স্ফটিকের মালা জপে যাচ্ছেন অবিরত।

মানিক আড়াল থেকে বলে—কেমন ভড়ং দেখেছ, মালা জপছেন যেন কত বড়ো ফকির, এদিকে একটা পাকা খুনি।

মতিলাল বলল—লড়াই করা মানেই তো খুনোখুনি।

মানিক বলল—সে তো মুখোমুখি লড়াই, কিন্তু মজনু নিজের হাতে কত জমিদারকে কেটে ফেলেছে বলে শুনেছি।

—লোকে অমন অনেক কথা বলে, আবার যারা বলে তারাই এসে ওদের পায়ে মাথা ঠোকে।

—সে মাথা ঠোকে ভক্তিতে নয়, ভয়ে।

এমন সময় মজনু দরজার দিকে মুখ ফেরায়। এদের দুজনকে দেখতে পেয়ে হাসল।

মতিলাল বলল—আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, চল আলাপ করে আসি—

মানিক বলল—তুই যা, আমাব অত ভক্তি নেই, ওরই জন্য তো আজ আমরা পথে বসেছি।

মতিলাল ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ফকির হেসে মাথা দুলিয়ে বলল—বোসো!

সামনে দু-তিনটে বেতের মোড়া ছিল, মতি একটার উপর বসে পড়ল। ফকির জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কী?

—মতিলাল।

—জমিদারবাবুর ছেলে?

—হ্যাঁ।

কথায় কথায় মতির ভয় কেটে গেল। সোজা বলে বসল—শুনেছি আপনি নাকি খুব ভালো তলোয়ার খেলতে পারেন, বন্দুকের তাক্ নাকি ভুল হয় না?

—ও তো শুধু অভ্যাস খোকাবাবু, মন দিয়ে অভ্যাস করলে তুমিও পারবে।

—তুমি তো সন্ন্যাসী ফকির, তুমি মানুষ খুন কর কেন?

—তুমি সাপ দেখলে মার কেন?

—বিষ আছে, কামড়াবে।

—ঠিক তাই, মানুষের মধ্যে যারা সাপ আমি তাদেরকে মারি, না মারলে তারা সাপের মতো আরও অনেক মানুষের ক্ষতি করবে। এরাও হল সাপের জাত।

—তা বলে ফকির মানুষ খুন করবে?

—তোমাদের দুর্গা অসুর মারেননি? অন্যায়ের সাজা দেওয়া তো সাধু-সন্তদেরই কাজ।

মতি এর জবাব খুঁজে পায় না, চুপ করে কী যেন ভাবে, তারপর বলে—তাহলে আমার পিসেমশাই কি অসুর?

—কে তোমার পিসেমশাই?

—কালেশ্বরের বীরেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরী। আপনি তার পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ধরেছিলেন, না দেওয়ায় বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছে।

মজনুর মুখখানা মুহূর্তমধ্যে কঠোর হয়ে উঠল, আস্তে-আস্তে বললেন—কালেশ্বরের জমিদার ক-দিন আগে বিশঘর প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তারা দুশো আড়াইশো লোক গাছতলায় বাস করছে। তা কি তুমি জান?

—প্রজারা খাজনা না দিলে জমিদার তাদের শাসন করবে না?

—খাজনার একটা নিয়ম আছে, খাজনা মানে 'চৌথ্'—চারভাগ ফসলের একভাগ। বছরে একবার। যখন তখন যা খুশি তাই চাইলে প্রজারা পায় কোথায়, দেবে কোত্থেকে? ফসলের অর্ধেক চাই, নাহলে খেত থেকে ফসল কেটে নিয়ে যাবে, এ সব কী? গরিবের উপর—দুর্বলের উপর অত্যাচার নয়? যে অন্যের ঘর পোড়াবে তার নিজের ঘরও পুড়বে, এই হল খোদাতাল্লার বিধান—। হাতের বদলে হাত দিতে হবে, চোখের বদলে চোখ, খুনের বদলে খুন দিতে হবে, খোদাআল্লার ভোগ।

ফকিরের মুখের দিকে তাকিয়ে মতির তখন কথা বলতে ভয় করে।

মতির মুখের দিকে তাকিয়ে ফকির বোধহয় বুঝতে পারেন, তখনই হেসে বলেন,—মানুষ মানে কী জান খোকাবাবু? ধর্মপথ মেনে হুঁশিয়ারি হয়ে চলতে হবে, মান আর হুঁশ এই দুই নিয়ে মানুষ, যে এই সুরে সুর মিলিয়ে চলতে পারবে না সেই অসুর; তোমাদের দুর্গা কালী এসব অসুরদের মেরে ধরে শেষ করেছিলেন। বুঝলে খোকাবাবু!

মতি কী বুঝল কে জানে, চুপ করে তাকিয়ে রইল ফকিরের মুখের দিকে।

সেই থেকে মজনু ফকিরের সঙ্গে মতির ভাব জমে গেল।

যখন তখন মতি এসে মজনুর সামনের মোড়াটায় বসে থাকে।

মানিক বলে—তুই তো সারাদিনই ওর কাছে বসে থাকিস!

মতি বলে—আশ্চর্য মানুষ। কত রকমের কত কথা বলে, বসে বসে শুনি।

মানিক বলল—যা বলাব আছে বলে নিক, তারপর তো সাহেবরা ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিকাঠে লটকে দেবে। সব বলা শেষ!

মানিকের কথাটা মতির ভাল লাগে না। মজনু ফকিরের ফাঁসি হবে কথাটা শুনলে কেমন যেন কষ্ট হয়। সে যে কথাগুলো বলে, সেগুলো ঠিক তো খুনি ডাকাতের কথা নয়, তবে?

রাত্রে একসময় মতি মাকে জিজ্ঞাসা করে,—মা, এই মজনু ফকিরকে ইংরেজরা ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে?

—কে বললে? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—মানিক বলছিল।

—সে তাদের বিচারে যা হয় তারা করবে।

—লোকটা কিন্তু মা সত্যিকারের সাধু, কত ধর্মের কথা বলে।

—সাধু না হলে এত লোক মানবে কেন?

—আমাকে বললে, আমার অনেক শিষ্য আছে।

—তুইও বুঝি তাই ওর শিষ্য হয়েছিস? সারাদিন ওর কাছে বসে আছিস।

—অনেক গল্প বলে, অনেক কথা শোনা যায় ওর কাছে।

—তা যাক্, কথা শোন্ দুঃখ নেই, কিন্তু কিছু দিলে-টিলে খাস না যেন, ও আমদের শত্রু, ওরা অনেক জরিগুটি জানে, খাইয়ে মানুষ মারে। ওদের মুখ দেখে মন বোঝা যায় না। কত মন্তর-তন্তর জানে হয়তো সেইজন্যই তো আমি ওকে সেবাযত্ন করে খুশি রাখতে চাই। তুই ওর কাছে কম যাবি, সাবধানে থাকবি।

মা সাবধান করে দিলে মতির মন কিন্তু মজনুর দিকেই টানে। তার এই বয়সে অমন মানুষ সে আর দ্বিতীয় দেখেনি।

কোম্পানির সেনাপতি ব্রেনান সাহেব ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। দৈবক্রমে হাত-পা ভাঙেনি, তবে সর্বাঙ্গ ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শরীরটাকে জুতসই করতে দিন সাতেক তাকে থেকে যেতে হল কালেশ্বরে। তারপর জগৎরামের কাছে সে এত্তেলা পাঠাল—আমি যাচ্ছি। পরশু সকালে গিয়ে পৌঁছোব। বরকন্দাজরা হেঁটে যাবে, পুরো একটা দিন লাগবে।

খবর এল, এক হাজার বরকন্দাজ নিয়ে সাহেব আসছে। জগৎরাম তাদের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এই কদিনে মজনু ফকির মতির কাছে অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিকালবেলা মতি এসে বলল—ফকির সাহেব, কাল কোম্পানির গোরাফৌজ আসছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য।

মজনু হেসে বলল—তাই বুঝি বাইরে এত শোরগোল হচ্ছে!

—ওরা তোমাকে নিয়ে গিয়ে কী করবে, ফকির সাহেব, ফাঁসি দেবে?

—খোদার মরজি। এই জীবন খোদা দিয়েছেন খোদাই নিয়ে নেবেন।

—তোমার ভয় করছে না ফকির সাহেব?

—ভয় ভাবনা আমি সব খোদার উপর ছেড়ে দিয়েছি খোকাবাবু!

মজনু হাসেন আর মালা জপেন। মতি তাকিয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে।

একসময় ফকির বলেন—কী ভাবছ খোকাবাবু?

মতি সহসা বলার মতো কথা খুঁজে পায় না।

ফকির হাসতে হাসতে বলেন—অপরের ভালো যে করতে চায়, তাকে কষ্ট পেতে হয়, এই হল খোদার বিধান। খোদা তাকে পরখ্ করে দেখেন সে কতখানি সইতে পারে—খাঁটি না মেকি? খাঁটি হলে তবেই খোদার মেহেরবানি মেলে, না হলে নয়। যেখানে যা কিছু ঘটে সবই খোদার দয়া খোকাবাবু, তিনি মনে না করলে কিছুই ঘটে না। শুধু শুধু ভাবনা করে কোনও লাভ নেই। তুমি কিছু ভেব না খোকাবাবু, তুমি খেলা করগে—

মতিলাল বলল—শুধু আজকের দিনটা মাত্তর, কাল তো তুমি থাকবে না।

—আমাকে ধরতে পারার জন্য কাল তোমার বাবার কত সুখ্যাতি হবে। পাঁচ হাজার টাকা ইনাম মিলবে।

—তোমার দাম মাত্তর পাঁচ হাজার টাকা!

—ও তো খুব বেশি দাম খোকাবাবু, দু টাকায় মানুষ ছেলেমেয়ে বিক্রি করে দেয়। পাঁচ-সাত টাকা খাজনার জন্য কত লোককে লেঠেলরা ঠেঙিয়ে মারে তা তো জান না।

—এ ভারি বিশ্রী।

—তুমি যখন জমিদার হবে, তখন এটাকে সুশ্রী করার চেষ্টা কোরো খোকাবাবু।

—আচ্ছা, তুমি তো এখান থেকে পালিয়ে যেতে পার ফকির সাহেব?

—কী করে পালাব খোকাবাবু, হাতে চোট খেয়েছি, পায়ে চোট লেগেছে, দরজায় আট-দশজন পাইক বসে আছে।...

—ওরা তো রাতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

—দরজা বন্ধ করা থাকে খোকাবাবু।

—আমি যদি রাতে তোমার দরজা খুলে দিই?

—তাতে তোমার বাবার বদনাম হবে। কোম্পানির বরকন্দাজ এসে আমাকে না পেলে, তোমার বাবাকে গালমন্দ করবে।

—তাতে বয়ে গেল, তোমার জান বাঁচবে।

—কিন্তু আমি তো এখনও ভালো করে চলতে পারি না, কোথায় যাব? ওরা আমাকে ধরে ফেলবে।

—কেন ধরে ফেলবে? তুমি একটু হেঁটে আমাদের বাগানটা পার হয়ে ঘাটে চলে যাবে। সেখানে আমাদের পানসি আছে, ডিঙি আছে, ছিপ আছে। একেবারে চলে যাবে ওপারে।

—কিন্তু এ হাতে কি আমি দাঁড় ধরতে পারব?

—স্রোতের টানে ভেসে যেতে তো পারবে?

—খোদার মরজি। তিনি যা করবেন।

—তাহলে তুমি আজ রাতে জেগে থেকো, ওরা ঘুমুলেই আমি তোমার দরজা খুলে দেব।

এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মাথায় আসেনি মতিলাল তাই ভাবে। একসময় বাগানের ঘাটে গিয়ে সে দেখে আসে পানসি ও ডিঙি ঘাটে আছে কিনা! তারপর

দিন যত ফুরিয়ে আসে, মন চঞ্চল হতে থাকে। সন্ধ্যা অবধি গঙ্গার ঘাটে সে একা চুপ করে বসে থাকে। তারপর ঘাট থেকে ফিরে এসে সে মজনুকে মনে করিয়ে দিয়ে যায়, রাতে জেগে থেকো, আমি আসব।

ব্রেনান সাহেব ও তার দলবলের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে সেদিন জগৎরামের রাত এক প্রহর কেটে গেল। তারপর হাঁক ডাক থামল, আহারাদি শেষ করে ক্লান্ত দেহে যে যার শুয়ে পড়ল, রাত তখন দেড় প্রহরের কম নয়।

মতিলাল কিন্তু আজ আর শুল না। শুলেই তো এক ঘুমে সকাল হয়ে যাবে। মশারির মধ্যে পালঙ্কের বাজুর উপর ঠেস দিয়ে মতিলাল বসে রইল। রাত জাগার অভ্যাস নেই, বসে বসে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ দ্বিতীয় প্রহরের শিয়ালের ডাকে তার ঘুম ভাঙল। মতিলাল পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ল।

শিয়ালের ডাক থামল। মতিলাল বারান্দায় বেরিয়ে এল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। মতিলাল ধীরে-ধীরে দোতলা নেমে থেকে এল। চলল বার-বাড়ির দিকে। পাইকগুলো এখানে সেখানে খাটিয়া পেতে ঘুমোচ্ছে।

ফকিরের ঘরে শেকল তোলা ছিল, সন্তর্পণে শেকল খুলে মতিলাল ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। মজনু শা খাটের উপর বসে বসে মালা জপছেন। মতিলাল ফিস্‌ফিস্ করে বলল—চলুন!

দুজনে নিঃশব্দে উঠোন পার হয়ে গেল। খিড়কির দরজা দিয়ে এসে পড়ল বাগানে। তারপর বাগান পার হয়ে গঙ্গার ঘাটে। ডিঙি বাঁধা ছিল। মজনু ডিঙিতে গিয়ে উঠলেন। বইঠা তুলে নিলেন হাতে।

এক হাতে চোট ছিল, শুধু এক হাতে বইঠা বেয়েই মজনু গভীর জলে গিয়ে পড়লেন।

সকালবেলা গোলমালে মতিলালের ঘুম ভেঙে গেল।

মজনু শা-কে পাওয়া যাচ্ছে না, শেকল তোলা বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে ফকির উধাও!

জগৎরাম খেপে উঠেছেন—এ কখনও হতে পারে না, এ ওই পাহারাদার পাইকদের কারসাজি। ওদের ধরে আচ্ছা করে চাব্‌কে দিলেই সত্যি কথা বেরিয়ে পড়বে। সব ব্যাটাকে থামের সঙ্গে বাঁধো, তারপর আমি দেখছি।

জগৎরাম চাবুক হাতে বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে ব্রেনান সাহেব এসে পড়ল সদলবলে।

সব শুনে ব্রেনান বলে—দরজা বন্ধ, মানুষ পালিয়ে গেল—এ হতে পারে না। পাহারাদাররা সব জানে। ওদের মুখ থেকে কথা বের করতে হবে।

জগৎরাম নিজে হাতে চাবুক চালাতে লাগলেন। থামে বাঁধা মানুষগুলো কাতরাতে লাগল। চাবুকের দাগ পড়ে, মনে হয় চামড়া কেটে এখনই রক্ত বেরিয়ে আসবে। যার পিঠে পড়ে সে শিউরে ওঠে, কাতরে ওঠে—দোহাই বড়োবাবু আমি কিছুই জানিনে,—কালী মায়ের দিব্যি—

জলজ্যান্ত মানুষটা কি ঘর থেকে উবে গেল?

—ও শয়তান, বড়োবাবু। ও ফকির জাদু জানে।

জগৎরাম কোনো কথা শোনে না, চাবুক চালায়।

মতি এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়েছিল, সে আর সইতে পারে না। বলে ওঠে—আমি জানি ফকির কোথায়!

সবাই মতির মুখের দিকে তাকাল।

মতিলাল বলল—আমি তাকে মাঝরাতে নৌকোয় তুলে দিয়ে এসেছি।

—কেন?—জগৎরাম বলে।

—মজনু ফকির মানুষের ভাল করতে চায়, তোমরা তাকে ধরে ফাঁসি দেবে কেন?

জগৎরাম কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না। তারপর জিজ্ঞাসা করে—কখন তাকে বের করে দিয়েছিস?

—রাত দুই প্রহরে যখন শেয়াল ডাকে তখন।

বীরেন্দ্র ভঞ্জ বললে—এতক্ষণ সে উধাও হয়ে গেছে। আর তাকে ধরা যাবে না।

জগৎরাম এগিয়ে এল মতির সামনে, চিৎকার করে উঠল—বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে, তুই আজ থেকে আমার ত্যাজ্যপুত্তুর, জীবনে আর তোর মুখ দেখতে চাই না—বেরো—

ব্রেনান বলল, হি ইজ এ ডেন্‌জারাস্ বয়। ওই ছেলে টোমার জমিন্‌দারি নষ্ট করিবে।

মতিলাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

মতিলাল আর ফিরে আসেনি। কয়েক বছর পরে সন্ন্যাসী মতিগিরির নাম লোকে শুনেছিল মজনু শা ফকিরের চেলা বলে। বাংলা ও বিহারের অনেক অত্যাচারী জমিদারকে মতিগিরি টিট্ করেছিল। তবে সে আর এক কাহিনি।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সারা বাংলাদেশটা তিনি খালি ঘুরিয়াই বেড়াইতেন। আজ আছেন হয়তো বাঁকুড়ায়, রাত না পোহাইতেই বদলি হইলেন চাটগাঁয়। মারা পড়িতাম তাতে আমি বেচারি। এ অবস্থায় আর ছাই পড়াশুনা কী হইবে? সেকেন্ড ক্লাসে উঠিতেই তাই ঠিক হইল বাকি বছর দুটি মামাবাড়িতে থাকিয়া সেখানকার স্কুলে পড়িব। 'প্রি-ম্যাট্রিক' ক্লাসে উঠিয়াই তাই একদিন গাঁটরি-বোঁচকা বাঁধিয়া মামাবাড়ি আসিয়া হাজির হইলাম।

স্কুলে ভরতি হইবার আগের দিন মেজমামা ডাকিয়া লইয়া সাবধান করিয়া দিলেন,—দেখ কেষ্টা, বিশুর সঙ্গে কোনো দিন মিশিসনে যেন, পরকাল কিন্তু তাহলে ঝরঝরে হয়ে যাবে!

বিশু আবার কে রে? তা সে যে-ই হোক, তার কথা ভাবিবার আমার তখন মোটেই সময় ছিল না। কাল স্কুলে ভরতি হইব—লক্ষ্মীছাড়া স্কুলে আবার পরীক্ষা না করিয়া ভরতি করে না—কাজেই কোন্ বিষয়ে কতটা পড়া হইয়াছে সেটা তো জানিয়া লইতে হইবে! অবিনাশ, নিমাই, বিজয় প্রভৃতিকেও আসিতে বলিয়াছিলাম, তাহারা আসিয়া জুটিয়াছে। অবিনাশ বলিল, নদী নাকি শুনলাম বেজায় বেড়ে গেছে বে—চল নদীর ধারে যাওয়া যাক—বেড়ানোও হবে, জল দেখাও হবে, কথাবার্তাও সেই সঙ্গে বলা চলবে।

নদীব পাবে আসিয়া তো চক্ষুস্থির। নদী পাগল হইয়া গিয়াছে! পাগল হইলে মানুষের যেমন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, যা ইচ্ছে হয় তাই করে, নদীরও হইয়াছে তাই। শুধু গর্জনের কথাটাই একবার ধর না! শোঁ-ও-ও, শোঁ-ও-ও, করিয়া সে কি দারুণ শব্দ, বোধ করি দুই মাইল দূর হইতেও তাহা শোনা যায়। জলের সে কী ভীষণ নাচ। প্রায় হাত দশেক উঁচু হইয়া জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আর পরের মুহূর্তেই আছড়াইয়া পড়িয়া নদীর বুকখানা ফাটাইয়া দিতেছে। গোক্ষুরা সাপের ফণার মতো ঢেউগুলি সপাৎ সপাৎ করিয়া পাড়ের গায়ে ছোবল মারিতেছে, আর ঝুরঝুর করিয়া মাটি ভাঙিয়া পড়িতেছে নদীর মধ্যে। গোটা নদীময় ঘূর্ণিপাক,—যাকে তোমরা ভালো কথায় বল আবর্ত, তাই খেলিয়া বেড়াইতেছে। তীরে দাঁড়াইতে তো আমাদের সাহসেই কুলাইল না। যদি

একবার কোনোগতিকে পা ফসকাইয়া পড়িয়া যাই, তো আর দেখিতে হইবে না। নির্ঘাত মৃত্যু—হাজার সাঁতার জানিলেও বাঁচিবার ভরসা নাই।

এমন সময় কী দারুণ ব্যাপারই না দেখিলাম। দেখিলাম, মাঝনদী দিয়া মানুষের মতো কী যেন একটা ভাসিয়া যাইতেছে! হায়রে হায়, কোনো হতভাগাকে বুঝি নদী টানিয়া লইল রে, এক্ষুনি সে সতেরো হাত জলের নিচে তলাইয়া যাইবে। একটু ভালো করিয়া তাকাইতে দেখিলাম, লোকটা যেন সাঁতার কাটিয়া আমাদেরই দিকে আসিতেছে। সাবাস ভাই, সাঁতার শিখিয়াছিলে বটে! আমাদের কাছাকাছি আসিতেই কিন্তু ভয় আর বিস্ময়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার জো হইল। এ যে আমাদেরই সমবয়সী একটি ছেলে দেখিতেছি—দু-এক বছরের বড়ো হইতে পারে। মুখে তার এমনি স্ফূর্তির হাসি যে বেশ বুঝিলাম, ইচ্ছা করিয়াই নদীতে নামিয়া সে এই সাঁতার-বাজি খেলিতেছে—কখনো সে পড়িয়া যায় নাই। বাপরে বাপ, এই নদীতে সাঁতার-বাজি! এতবড়ো ডানপিটে ধুরন্ধর যে আমার কল্পনায়ও আসে না! কিন্তু আমি কোনো কথা বলার আগেই অবিনাশ, বিজয়, নিমাই—সকলে 'হাঁ হাঁ' করিয়া ছুটিয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'বিশুভাই, লক্ষ্মীভাই, উঠে পড়, উঠে পড়, মারা যাবি!'

ওঃ! এই তবে বিশু? এতক্ষণে বুঝিলাম, কেন মেজমামা ওর সঙ্গে মিশিতে এত করিয়া বারণ করিতেছিলেন।

বিশু কিন্তু উঠিল না। একটু মুচকি হাসিয়া কপ করিয়া একটা ডুব দিল। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ কোনোই সাড়া-শব্দ নাই, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আমরা নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। হাত চল্লিশেক দূরে আবার কপ করিয়া একটা শব্দ হইল। চাহিয়া দেখি বিশু মাথা তুলিয়া মাঝ-নদীর দিকে সাঁতরাইয়া চলিয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সব্বার প্রথমে কথা কহিল অবিনাশ। বলিল, কী আশ্চর্য পরিবর্তন ভাই। বছর দুই আগে এই বিশু ছিল কী গোবেচারা! সাত চড়েও কথা কইত না। আর সাহস তো ছিল না বল্লেই চলে! আর এখন? এখন ও না করতে পারে এমন কাজই নেই। কামানের সামনে বুক পেতে দাঁড়াতে বললেও বোধ হয় পিছ-পা হবে না।

বিজয় অবিনাশের কথায় সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ এখন মনে হয় 'বিশে ডাকাত'ই বুঝি আবার 'বিশু' নাম নিয়ে বাংলায় এসে জন্মগ্রহণ করেছে। অথচ কী ছিল বছর দুই আগে।

কথা কহিল না শুধু নিমাই। অবিনাশ তাই তার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই কী বলিস রে? নিমাই জবাব দিল, তোরা তো ওর পরিবর্তনে খুবই অবাক হয়ে গেছিস! তা হবিই তো! কিন্তু কেন যে ও এ-রকম বদলে গেল, সে ইতিহাস যদি জানতিস, তো এতে মোটেই আশ্চর্য হতিসনে। বরং এর উলটো হলেই তোরা আশ্চর্য হয়ে যেতিস।

—কী ইতিহাস রে ভাই, কী ইতিহাস?

—উহুঁ, সে আমি কিছুতেই বলতে পারব না, ওর বারণ আছে।

কত বলিলাম, নিমাই কিন্তু কিছুতেই কোনো খবর ভাঙিল না।

সাত-আট মাস কাটিয়া গিয়াছে। শহরের মাইল দুই দূরে একটা বড়োমতো খাল ছিল। সন্ধ্যা তখনও ঠিক হয় নাই, কিছু বাকি আছে, আমি সেইখান দিয়া একদিন যাইতেছিলাম। খালের উপরেই রেলের পোল। সেদিকে তাকাইতে গিয়া দেখি, বিশু পোলের ভাও (ওই যে প্রকাণ্ড উঁচু ধনুকের মতো জিনিসগুলো—ইংরেজিতে যাকে বলে আর্চ) বাহিয়া দিব্যি উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। আগের দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, ভাও নিশ্চয়ই পিছল হইয়া রহিয়াছে, যদি কোনোমতে পা একটুখানি পিছলাইয়া যায় তো একশ' হাত নিচে পড়িয়া একেবারে চুরমার হইয়া যাইবে, কেন না নিচে জল না থাকারই মতো। বিশুর কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নাই, খাসা বাহিয়া চলিয়াছে।

আমায় দেখিয়া বিশু নামিয়া আসিল, বলিল, হ্যাঁরে কেষ্টা, তুই নাকি আমার ইতিহাস জানবার জন্যে দিনরাত অবিনাশ আর নিমাইকে খোঁচাচ্ছিস, শুনতে ইচ্ছে হয়েছে নাকি তোর? বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল, বলিলাম, হ্যাঁ ভাই।

—আচ্ছা! চল তবে আমার সঙ্গে শ্মশান-খোলার দিকে।

খালের ধার ধরিয়া আমরা শ্মশান-খোলার দিকে চলিলাম। জায়গাটা বাস্তবিকই ভীষণ। আশে-পাশে দু-তিন

মাইলের মধ্যে মানুষের নাম গন্ধ নাই। আধ মাইলটেক দূরে একটা জঙ্গল, তাতে বোধকরি দিনের বেলায় হাতি-গণ্ডারও লুকাইয়া থাকিতে পারে।

বিশু আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে প্রায় মিনিট খানেক তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, দেখ, প্রায় দু-বছর হল আমি মরে গেছি!

একে তো সন্ধ্যাবেলা শ্মশানের কাছে বসিয়া, তাতে চারিপাশের দৃশ্যটা অমন চমৎকার, বিশুর চোখমুখের ভঙ্গি আর কথার ধরন শুনিয়া আমি যেন দশ হাত মাটির নিচে ঢুকিয়া পড়িলাম। ভয়ে হাঁটু দুটা কাঁপিতে লাগিল, গলা কাঠ হইয়া আসিল, কোনোমতে বলিলাম, ও কী কথা! ওতে আমার বড়ো ভয় করে।

বিশু বলিল, কিন্তু ওই ঠিক কথা যে! আমি তো মানুষ নই, আমি তো মরে গেছি! তোর সামনে দাঁড়িয়ে এ-তো মরা বিশুর প্রেতাত্মা!

আমি আর পারিলাম না, ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তোমরা হাসিতেছ? হাসো, ও অবস্থায় পড়িলে তোমরাও কাঁদিতে।

বিশু একটু নরম হইয়া বলিল, ব্যাপারটা শোন তবে। আগে ছিলাম আমি একেবারে নিরীহ গো-বেচারা। প্রথমবার যখন পরীক্ষায় ফেল হলাম, তখন বাড়ির সকলের কী টিটকারি! মানুষ বলে কেউ মনে করতেই চায় না, গোরু-গাধার সামিল মনে করে, আর উঠতে-বসতে খোঁটা দেয়। কপাল খারাপ, তাই পরের বছরও ফেল হলাম। আমার ছোটো ভাই শিবু আমার উপরে উঠে গেল। এবার আমার তিষ্টনই দায় হল। ঘরে টিট্‌কারি বাইরে টিট্‌কারি, টিট্‌কারি ছাড়া কেউ কথাই কয় না। মনে বড়ো দুঃখ হল, ভাবলাম, দূর ছাই, এ জীবন না রাখলে আর কী হয়? আজ জলে ডুবেই মরব! নদীর কাছে এসে কিন্তু একটি ভারি চমৎকার কথা মনে হল। ভাবলাম, এমনিভাবে মরতে যাই কেন? তার চেয়ে ভাবি না কেন যে আমি মরেই গেছি! তা হলে তো পৃথিবীতে কোনো কাজ করতেই আর পিছ-পা হব না, কেন না মরণের ভয়ই যদি না থাকল তবে আর কোন্ কাজ না করতে পারি? মরে তো আমি গেছিই, শুধু মরণের কষ্টটা তোলা রইল, আজ না পেয়ে দু-দিন পরে সেটা পাব! এবার এমন সব কাজ করতে আরম্ভ করব, যাতে পৃথিবীতে আমার একটা নাম থেকে যায়! সেদিন থেকেই আমি এ-রকম! এমন কাজ এখন নেই, যা আমি না করতে পারি। লোকে বলে আমার মতো সাহসী ছেলে নাকি দেশে আর একটিও নেই! এর মধ্যেই চার-পাঁচ বার খবরের কাগজে নাম উঠে গেছে।

মুখ দিয়া আমি আর একটি কথাও বাহির করিতে পারিলাম না।

ঠিক অমনি সময়ে জঙ্গলের দিক হইতে একটা ভীষণ শব্দ আসিল। আমি কলকাতায় অনেকবার গিয়াছি, চিড়িয়াখানাও দেখিয়াছি, বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ও বাঘের গলার আওয়াজ! ভয়ে সারা শরীর কাঁপিতে লাগিল। একটি পাকা বাঁশের মোটা লাঠি শ্মশানের কাছে পড়িয়াছিল, বোধ হয় কোনো হিন্দুস্থানি পোড়াইতে অসিয়া তাহার বন্ধুর দল তার সাধের লাঠিখানাও তারই কাছে রাখিয়া গিয়াছিল, বিশু সেখানা উঠাইয়া লইল। আবার বাঘের ডাক শোনা গেল—এবার আওয়াজ আরও কাছে। বিশু বলিল, আজ ভোরে নিশ্চয়ই কোনো ভালো লোকের মুখ দেখে উঠেছিলাম, কেননা আজ আমার জীবনের আশা পূর্ণ হবে। বাঘের সঙ্গে লাঠি হাতে লড়াই আমার জীবনের একটা মস্ত বড়ো সাধ। তুই সাইকেল চড়তে পারিস? কোনোমতে জবাব দিলাম, পারি।

—তবে এই যে চাবি, পোলের গায়ে আমার সাইকেল তালা-লাগানো আছে, খুলে নিয়ে তাতে চড়ে বাড়ি পালা!

বিশুর কথা শেষ হইতে না হইতে আবার সেই আওয়াজ, এবার খুব কাছে। সন্ধ্যা তখন ঘোর হইয়া আসিয়াছে, বাঁশের লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া বিশু সেই ভীষণ জানোয়ারের উদ্দেশে জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেল।

(সংক্ষেপিত)

সাথি

শিল্পী শৈল চক্রবর্তী

কেউ কম যাননা

ননীগোপাল চক্রবর্তী

চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে গল্প হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল চিকিৎসা সম্বন্ধে।

ত্রিলোচন বলল—"হাঁ, চিকিৎসা যদি থাকে, তবে কবিরাজি চিকিৎসা! হাতিটাকে একেবারে খাড়া করে তুলল!"

রাজবাড়ির সেই হাতিটা। সর্দিতে হাঁস্‌-ফাস্‌ করছে, কত ভ্যাটার্‌নারি, স্টেশনারি, কেউ কিছু করতে পারল না। হাতি শুয়ে পড়েছে তখন—যায় যায় আর কী!

ডাক পড়ল নেপাল কবিরাজের। নেপাল কায়কল্প চিকিৎসা করাচ্ছিলেন তখন্‌ রাজার মেসোমশায়কে। নেপাল ঠুকে দিলেন এক বড়ি—মহালক্ষ্মীবিলাস, এক চৌবাচ্চা পানের রস আর মধু দিয়ে—ব্যস! এক ঘণ্টা পরেই হাতি চড়চড় করে খাড়া হয়ে উঠল। এ তো তোমার হোমোপ্যাথি ওষুধ নয় যে, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায়

এক পয়সার চিনি ছেড়ে দিয়ে বলবে ডায়মন্ডহারবারের নিচে গঙ্গার থেকে সরবৎ তুলে খাও গে।''

''কী বললি হোমোপ্যাথির কথা?'', গোপালদা ঝংকার দিয়ে উঠলেন,—''যা জানিসনে তা নিয়ে কথা বলতে যাস কেন? এখনকার লোকের আয়ুও নেই—বেদ মেনেও তারা চলে না; কাজেই তোর ও আয়ুর্বেদ এখন অচল। ঘরের পোষা হাতির সর্দি লেগেছে এ তো সামান্য কথা। বনের বাঘ-ভাল্লুককে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে হোমোপ্যাথির একটা ডোজ্—তা জানিস?''

ত্রিলোচন মাথা চুলকিয়ে বলল—''না জানিনে।''

''তবে শোন্—

চিড়েখানার সিংহ দেখেছিস?—সিংহ, যার মাথায় লম্বা লম্বা চুল থাকে।

এয়ার রেডের ভয়ের কথা উঠল, এই সব মারাত্মক অথচ মূল্যবান জন্তুদের কী করা যাবে? বোমা পড়ে চিড়েখানার ঘর-দুয়ার ভেঙে গেলে—বাঘ, ভালুক, গন্ডার এসব জন্তু-জানোয়ার তো পাগলের মতো চারদিকে ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন উপায়?

ঠিক হল, বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের গুলি করে মারতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল যারা গুলি করবার জন্য নিযুক্ত থাকবে, বোমা পড়লে তারা আগে পালাবে, না আগে গুলি করবে? মৃত্যু-ভয় তো সকলেরই আছে!

তখন মিটিং করে প্রশ্ন তোলা হল—মৃত্যু-ভয় নেই কার?

উত্তর হল—অর্বাচীন শিশুদের আর পাগলের।

কিন্তু ওরা তো আর সুসংযতভাবে তাদের মারতে পারবে না।

আবার প্রশ্ন হল—সুসংযতভাবে পরকে মারতে হাত কাঁপে না কাদের?

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল—ডাক্তারদের।

ডাকো ডাক্তার।

অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা এসে বললেন—এসব হিংস্র পশুরাজ্যে আমাদের ব্যাবসা অচল।

তবে কী করা যায়?

বড়ো বড়ো মাথাওয়ালারা বললেন—ঘুম পাড়িয়ে রাখো। বোমা পড়ার আগেই ওদের মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন দাও। চলল মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন।''

কেবলরাম মুখফোঁড় লোক। সে অমনি জিজ্ঞাসা করল—''কেমন করে জ্যান্ত বাঘকে ইন্‌জেক্‌শন দিল?''

''তোমার যেমন ঢেঁকিরাম বুদ্ধি!—কেন, লেজে। লোহার গরাদের ভিতর দিয়ে লেজটা টেনে ধরে ডাক্তারেরা দিল সূচ ফুটিয়ে।

কিন্তু কিছুই হল না।

তখন ডাকো নকুলেশ্বর ডাক্তারকে।

জানলার একটা কপাট খুলে নকুল জিজ্ঞাসা করল—কে?

—আজ্ঞে, আমরা বড়োই মুশকিলে পড়ে—

—কী প্রয়োজন?

—আজ্ঞে, বাইরে আসুন, সব বলছি।

নকুল জানলার ফাঁক দিয়ে বলল—বাইরে যাবার জো নেই, আমি বিবস্ত্র। কন্ট্রোলের কাপড় জোগাড় করতে পারিনি। যা বলতে হয় ওখান থেকেই বলুন।

ওদের সব কথা শুনে—''

—''এক ডোজ্ 'নাক্স থার্টি' দিয়ে দিলে বুঝি?''—কেবলরাম জিজ্ঞাসা করল।

—''এক ডোজ্?—সামলাতে পারত চিড়েখানার সমস্ত জানোয়ার নকুলেশ্বর ডাক্তারের এক ডোজ্ ওষুধ? একটা মলিকুল। তাও বললে, এক চৌবাচ্চা ফিলটার জলের মধ্যে একটা ছোট্ট বড়ি ছেড়ে দিয়ে—রোজ সকালে এক ফোঁটা করে ওই চৌবাচ্চার জল আহারের সঙ্গে দিতে হবে।

ব্যস! তারপরেই দেখা গেল, নাক ডেকে চিড়েখানার জন্তু-জানোয়ার—বাঘ, ভালুক, সিংহ, গন্ডার, হস্তী প্রভৃতি ঘুমুতে আরম্ভ করেছে।

বিশ্বাস না হয় একবার দেখই না নকুলেশ্বরের ওষুধ খেয়ে। এই তো কাছেই ১৮৩ নং হেঁদারাম বোসের লেনে নকুলেশ্বর ডাক্তারের বাড়ি।''

তুলতুলির খেলাঘর থেকে রাগ করে পাঁচ-ছটা পুতুল পালিয়ে গেল। তাদের মধ্যে তুলোর ঘোড়া, লালচে রং-এর ভাল্লুক, চিকচিকে চোখ খরগোশ, হলদে আর কালো রং মেশা কুকুর আর কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটা।

ওখানে ওরা আর থাকবে না তাই পরামর্শ করে বাইরে এল। ওরা একটা বাড়ি তৈরি করবে। কাজেই কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুল তার ডোরাটানা হাওয়াই শার্টের পকেট থেকে নোটবই আর পেনসিল বার করে বাড়ির নকশা আঁকতে শুরু করে দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য পুতুলগুলো বাড়ি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে।

ভাল্লুক বললে, তুমি তো বেশ ফাঁকি দিচ্ছ হে, কই আমরা খেটে মরছি তুমি দিব্যি মজা করে ছবি আঁকছ?

—ছবি? বল কী হে, তার কি সময় আছে আমার? বাড়িটার মাপজোপ করতে হবে, একটা প্ল্যান করতে হবে, যেখানে সেখানে যা তা হলে তো চলবে না।—কাফ্রি পুতুল উত্তর দিল।

কাফ্রির আসল মতলব বুঝতে পেরে ভাল্লুক হা হা শব্দে হেসে উঠল। অন্য সব পুতুলরা ছুটে এসে বললে—কী হল হে ভাল্লুক ভায়া?

—আরে কিছু না, কিছু না—চল দেখি কাজ কতদূর এগিয়েছে। ওদের চলে যাবার পথের দিকে চোখ তুলে দেখল কাফ্রি পুতুল। তারপর আবার কাজে মন দিল।

কাফ্রি পুতুল ফাঁকি দিলেও অন্য সকলের যত্নে বাড়ি বেশ সুন্দর তৈরি হয়ে গেল। দোতলা বাড়ি, বেশ অনেকগুলো জানলা দরজা, নিচের তলার ঘরের কোলে চমৎকার বারান্দা। এখানে বসে চা খাওয়া হবে আর গল্পগুজব হবে পুতুলদের, খেলাধুলোও হতে পারে। উপরের তলায় শোবার ঘর বড়ো একটা, ছোটো একটা, তার তলায় রেলিং ঘেরা বারান্দা।

কাফ্রি পুতুল বড্ড একলা থাকতে ভালোবাসে—কাউকে দেখতে পারে না। এদের সঙ্গে থাকতে হবেই বলে যা মুখে মুখে একটু বন্ধুত্ব রেখেছে।

বাড়ি তৈরির পর কাফ্রি পুতুল কিন্তু ঠিক করে আছে ওপরের ছোটো ঘরখানা একলাই সে দখল করবে। কিন্তু সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে তো।

তাই সেদিন যখন সবাই বিকেলে বেরিয়ে বাড়ি ফিরল, সেই বারান্দায় চেয়ারে আর ইজিচেয়ারে বসে চা খেয়ে সব গল্প করছে আর সন্ধেবেলা খবর নিয়ে দৈনিক খবরের কাগজ বেরিয়েছে—সেটা নিয়ে কাফ্রি পুতুল একটু আলাদা হয়ে বসে পড়ছে। পড়ছে, না মনে মনে মতলব আঁটছে কে জানে।

—নাঃ বড্ডই নিঝুম লাগছে—এই বলে ভাল্লুক রেডিয়োটা খুলে দিল।

রেডিয়োতে তখন উচ্চাঙ্গ সংগীত হচ্ছিল।

কাফ্রি পুতুলটা রেগে গরগরিয়ে উঠল।

ভাল্লুক বললে—কী হয়েছে কী তোমার?

—কী হয়েছে তা কী ভাবছ তোমরা? রেডিয়োটা খুলে দিলে বেশ।

—কী হয়েছে তাই বলো।

—মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে খুলে পড়ে যাবে এখনি, আর তোমাদের যেমন গোলমাল তেমনি রেডিয়োর চেঁচামেচি।

কাফ্রি তখনও গজগজ করছে, এখানে নাকি শান্ত হয়ে বসা যায়, না কাগজ পড়া যায়—কেবল গোলমাল। খরগোশ বললে : তুমি বড্ড গোলমেলে মাসি। চুপ করে গান শোনো তো।

কাফ্রি পুতুল সে কথা শুনল না। একটু পরে সিঁড়ির দরজা খুলে দুপদাপ করে উপরে উঠে গেল।

আবার একটু পরে ওপর থেকেই চেঁচিয়ে বললে : আমার মাথার যন্ত্রণার জন্য এখনি এক কাপ গরম চা আদা দিয়ে খাব, কেটলি কই, জল গরম করব কীসে?

নিচে থেকে খরগোশ বললে : গ্যাস জ্বালো—ওখানেই কেটলি আছে।

ঘোড়া বললে : চা খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোও দেখি ঠান্ডা হয়ে।

কাফ্রি পুতুল রাগ দেখিয়ে কী করে আলাদা ঘরখানা দখল করবে তারই মতলব করছে মনে মনে। ভাল্লুক একগোছা বেলুন কিনে টাঙিয়ে রেখেছিল—একটা একটা করে কাফ্রি তাকে ফাটাতে আরম্ভ করল।

—শব্দ হচ্ছে কীসের?—ভাল্লুক চেঁচিয়ে বলে।

—ও কিছু নয়। এই বলে উপরের বারান্দায় বালতি করা যে জল ছিল হুড়হুড় করে ঢেলে দিল।

জলের ধারা নিচে এসে সব ভিজিয়ে দিল। খরগোশ উপরে উঠতে গিয়ে দেখে সিঁড়ির দরজা বন্ধ।

ঘোড়া বললে : তুমি কী আরম্ভ করেছ বলত, নিচে যতক্ষণ ছিলে বিরক্ত করেছ, ওপরে গিয়ে আবার জ্বালাচ্ছ কেন? কাগজখানা একটু পড়ছি তাও দেবে না? আচ্ছা লোক তো তুমি?

কাফ্রি পুতুল তখন একগোছা ঝাঁটা নিয়ে জল ফেলতে শুরু করেছে, ছিটিয়ে ছিটিয়ে ফেলছে আর সেগুলো এসে লাগছে নিচের তলায়।

সকলে মিলে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে: কী করছ কী? ভয়ানক বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

কোনো উত্তর দিল না কাফ্রি পুতুল, এমন কি খরগোশের ঠেলাঠেলিতেও দরজা খুলল না।

খানিক বাদে দুমদাম করে নামল কাফ্রি পুতুল।

খরগোশ চোখ পিটপিটিয়ে বললে : তুমি মাসি বড়ো রাগী।

—যাঃ যাঃ পুচকে ছেলে, কথা বলছে দেখ না বুড়োর মতো।

কাফ্রি পুতুলের ওপর সকলেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল—তাই খাওয়া দাওয়ার পর যখন সবাই উপরে উঠে দেখল—বড়ো লম্বা ঘরে এক একটা খাটে সকলের আলাদা বিছানা হয়েছে—আর কাফ্রি পুতুল আলাদা ছোটো ঘরে বিছানা করেছে তখন সকলে অসন্তুষ্ট না হয়ে খুশিই হল কারণ ওরা ওর সঙ্গ চাইছিল না।

মজা হল কাফ্রি পুতুলের। প্রথম দিন রাগ করে আর চেঁচামেচি করে সে দিব্যি একটা ঘর দখল করে নিল—আর সেইটাতেই সে বেশ কায়েমি হয়ে বসল।

চালাকি করলেও, তারপর থেকে আর সে ঝগড়া করেনি। এখন অকারণে তার মাথাও ধরে না, রেডিয়োর গানও খারাপ লাগে না।

টগবগ. ....টগবগ......টগবগ......

তেজি ঘোড়া ছুটে চলেছে তিরবেগে। লাগাম ধরে আছেন পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রি.)। তিনি চলেছেন মৃগয়ায়—ঘন বনের দিকে। একা নয়—কত পাইক-বরকন্দাজ তাঁর পিছনে সারি সারি ঘোড়ায় চড়ে চলেছে।

নির্জন পথ।

এমন সময় পথের পাশের একটা কুলগাছের আড়াল থেকে একটা পাথর এসে লাগল রণজিৎ সিংহের মাথায়। কেটে গেল কপাল। দরদর করে ঝরতে লাগল রক্ত।

কে মারল এই পাথর? সাহস তো কম নয়! রাজার গায়ে হাত! কিন্তু কুলগাছের কাছে এক বুড়ি ছাড়া কাউকে পাওয়া গেল না। শেষে বুড়িকেই ধরে আনা হল।

বিচারসভা বসল পরদিন।

বুড়িকে হাজির করা হল। কাঁপছে বুড়ি ঠকঠক করে। পরনে ময়লা ছেঁড়া তালি দেওয়া থান। চোখ দুটো যেন গর্তের ভিতর চলে গেছে—চোখে ভালো দেখতেও পায় না। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে।

রণজিৎ সিংহ বুড়িকে বললেন : তুমি পাথর ছুঁড়েছ?

বুড়ি মাথা নিচু করে নিচু গলায় বলল : হ্যাঁ।

রণজিৎ সিংহ তখন বললেন : কেন পাথর ছুঁড়েছ?

বুড়ি ধীরে জবাব দেয় : মহারাজ পাথর আমি আপনাকে ছুঁড়িনি। আমি কুলগাছে পাথর ছুঁড়েছি—কুল পাড়ার জন্যে। আমার ছেলেটা কাল থেকে কিছু খায়নি—কুল পেড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়াতাম। কিন্তু তা আর হল না—

বুড়ি কাঁদতে থাকে। করুণ দৃশ্য। সভার সকলে চুপ—কারও মুখে কোনো কথা নেই। সকলে ভাবতে থাকে। এমন সময় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন রণজিৎ সিংহ। তিনি রায় দিলেন : বুড়ি নির্দোষ—নিরপরাধ।

খাজাঞ্চিকে আদেশ দিলেন রণজিৎ সিংহ : এখনই বুড়িকে হাজার মোহর দাও আমার নিজের তহবিল থেকে।

সভাসদেরা বলে উঠলেন : মহরাজ, পাথর ছুঁড়ে বুড়ি আপনার রক্তপাত ঘটিয়েছে—তাই আইনের চোখে বুড়ি দোষী, অপরাধী—আর এই দোষের অপরাধের দণ্ড মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

রণজিৎ সিংহ একটু হাসলেন। তারপর বললেন : বনের কুলগাছকে পাথর দিয়ে আঘাত করলে সে দেয় কুল—অনাহারীর আহার। আর আমি এই গোটা রাজ্যের রাজা হয়ে তার থেকে বেশি কিছু কি দিতে পারি না? এ ছাড়া, যে রাজ্যের মানুষ অনাহারে থেকে বনের কুল খেয়ে পেট ভরায় আর খিদের জন্য যে রাজ্যে রক্তপাত হয়—সে রাজ্যের সব দোষ আর অপরাধের জন্য দায়ী রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই দণ্ড তো আমার নিজেরই প্রাপ্য।

রণজিৎ সিংহের কথা শুনে সকলে নির্বাক হয়ে যায়।
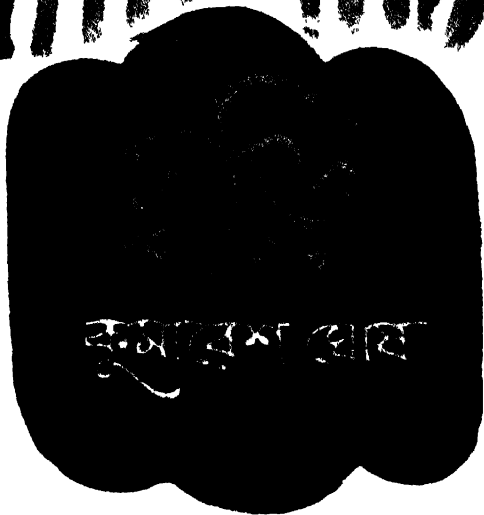
আমাদের সতু সেদিন একটা সরু ছড়ি হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢুকল। সতু মাস্টারমশাই নয়• আমাদের মতোই ছাত্র। কাজেই সেকালের মাস্টারমশাইদের মতো হাতে বেত বা ছড়ি নিয়ে ক্লাসে ঢোকার কোনো মানেই হয় না। অথচ সতুর হাতে বই-খাতার বদলে ছড়ি কেন?

—হ্যাঁরে, হঠাৎ ছড়ি হাতে যে? কী ব্যাপার?

—এখন নয়, টিফিনের সময় বলব। সে অনেক কথা।

সতুর ভালো নাম সত্যসুন্দর। ক্লাসের সময় সতু ছড়িটাকে বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখে এক মনে স্যারের দিকে চেয়ে রইল। যেন কত মন দিয়ে তাঁর পড়া শুনছে। আমরা কিন্তু স্যারের পড়ায় মনই দিতে পারলাম না। কেবল সতুর ছড়ির কথা ভাবতে লাগলাম। টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই আমরা সতুকে স-ছড়ি একটা ফাঁকা জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম,—এবার বল্। সতু

বলল,—এই ছড়ির জন্ম আজকে নয়, আমাদের দু-পুরুষ আগে। আমার ঠাকুরদা ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। খুব জাঁদরেল লোক। সাাহেবদের সঙ্গে ভারি মাখামাখি ছিল। তার কারণও ছিল। ফরেস্ট অফিসারের অনুমতি ছাড়া বনে শিকার করতে আসা সাহেবের বাবারও সাধ্যি ছিল না। তা ছাড়া রাত কাটাবে কোথায়, খানাপিনা করবে কোথায়, শিকারের ব্যবস্থা করে দেবে কে—সবই তো ফরেস্ট অফিসার! আমার ঠাকুরদার এলাকার মধ্যে। কাজেই ঠাকুরদাকে খাতির করত সাহেবরা—

—ছড়ির গল্প করতে গিয়ে বে-লাইনে চলে যাচ্ছিস যে?—জয় হেসে বলল।

—হ্যাঁ। এ দেখছি ছড়ি ছেড়ে সাহেব!—জ্যোতি ফোড়ন কাটলে।

—হ্যাঁ তাই,—সতু গম্ভীর হয়ে বললে,—আগে ছড়ি আর সাহেব একই ব্যাপার ছিল। সাহেবের হাতের ছড়ির মার অনেক নেটিভকেই খেতে হয়েছে জানিস? আবাব কারও সঙ্গে সাহেবদের বন্ধুত্ব হলে তা আবার টেনে ছেঁড়বার বা ছাড়াবাব উপায় ছিল না।

আমি দেখলাম, সতু অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বললাম, যাক ভাই, যা বলছিলি বল্। তোর ছড়ির গল্প ছাড়।

—আমি তো সুতো ছাড়ছি, ওরাই তো আটকাচ্ছে! —সতু পা নাচিয়ে বলল,—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সাহেবদের সঙ্গে মিশে মিশে ঠাকুরদার মেজাজও খুব কড়া হয়ে গেছল। একবার খবর এল উঁচু পাহাড়ের ওপরে একটা বড়ো পুরনো গাছ খানিকটা ভেঙে পড়েছে। শুনে ঠাকুরদা অর্ডার দিলেন, গাছটাকে কেটে ফেল। তখুনি লোকজন দড়ি, কোদাল, কুড়ুল, শাবল, করাত ইত্যাদি নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেল। ঠাকুরদা কোট-প্যান্ট হ্যাট পরে তাঁর স্টাফদের নিয়ে পাহাড়ের নিচে কড়া মেজাজে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইলেন। উঁচু পাহাড়ের ওপরে গাছ কাটা হতে লাগল ঠকাস-ঠক ঠকাস-ঠক। ঠাকুরদা তাঁর এক স্টাফের হাত থেকে দূরবিন নিয়ে মাঝে-মাঝে দেখতে লাগলেন গাছ কাটা। বিরাট মোটা গাছ তো! কাটতে কাটতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় গেল। শেষে মড়মড় মড়াৎ করে গাছটা পড়ল ভেঙে। ভেঙে পড়েই ওই বিরাট গাছ গড়-গড় করে গড়াতে লাগল পাহাড়ের গা দিয়ে! তারপর গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছে, গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই—

—কেন, পাহাড়ের গায়ে তো আরও গাছ ছিল নিশ্চয়ই, তাতে আটকে গেল না গাছটা?—অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বিশ্বজিৎ।

—না—জোর গলায় সতু বলল,—যার গড়াবার ইচ্ছে থাকে, সে গড়াবেই। যার চলবার ইচ্ছে থাকে সে চলবেই। পথের কোনো বাধাই মানবে না।

—তুই বল, তুই বল—জ্যোতি তাগিদ দিল।

—গাছটা গড়াতেই লাগল,—সতু বলল,—ঠাকুরদাও চোখে দূরবিন কষে দেখতে লাগলেন। কিন্তু কতক্ষণ দেখবেন? এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কেটে গেল। সারাদিনটা কেটে গেল। তবু গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই গাছটা। শেষে ড্যাম্ ইট বলে দূরবিন ফেলে দিয়ে রাগ করে চলে এলেন বাংলোয়। তখনও ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ করে আকাশ কাঁপিয়ে পাহাড় কাঁপিয়ে গাছ গড়াচ্ছেন। ঠাকুরদা তখুনি কাগজ টেনে নিয়ে তাঁর বড়ো সাহেবকে রেজিগ্‌নেশন লেটার লিখতে বসলেন, একটা কাটা গাছের ধীর গতির জন্য আমার অমূল্য সময় নষ্ট করতে চাইনে। অতএব এতদ্দ্বারা আমার কাজে ইস্তফা দিলাম।

—সে কী রে। জয় বলল, আজকাল তো সব কাজই 'হচ্ছে হবে' করে হয়। আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে কত দেরি হয় দেখিস নে? সে জন্য আবার কেউ চাকরি খোয়ায় নাকি?

—হ্যাঁ খোয়ায়! মেজাজ থাকা চাই!—সতু বলল,—আর ঠাকুরদা ওই গাছটার গড়ানোর ঢং থেকে বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন ওই গাছ গড়িয়ে নেমে আসতে আরও সময় নেবে। বাড়িতে ঠাকুমা সব শুনে বললেন, সে কী, গাছের ওপর রাগ করে চাকরি ছেড়ে এলে? ঠাকুরদা বললেন, ড্যাম্ ইট। একটা ঢালু পাহাড়ে কাটা গাছের ঢলামি দেখবার জন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব? ওর চাইতে ধান চাষ করব। বড়ো হলেই কাস্তে দিয়ে কাটব! অমন আস্তে-আস্তে গড়াবার ব্যাপার নেই। সঙ্গে-সঙ্গে ঝাড়লেই ধান। অবশ্য আমাদের তখন ধানি জমি ছিল তাই রক্ষে। বাবা তো তখন নাবালক।

—তারপর? তারপর কী হল?—জিজ্ঞেস করলাম।

বেশ জমিয়ে ফেলেছে সতু।

—তারপর অনেকদিন কেটে গেছে—সতু বলল—বাবা বড়ো হয়েছেন। ঠাকুরদা, ঠাকুমা মারা গেছেন। আমি জন্মেছি, বড়ো হয়েছি। কলকাতায় চলে এসেছি সবাই। কিছুদিন আগে বাবা কী একটা কাজে বাইরে গেছলেন ঠাকুরদার ওই ফরেস্টের কাছাকাছি। সেখানে তাঁর জানা ভদ্রলোকের মোটর ঠিক করে দেখতে গেলেন ঠাকুরদার, মানে তাঁর বাবার পুরোনো কর্মস্থল। সেখানে চৌকিদার রাম সিং বাবার পরিচয় পেয়ে খুব খুশি। বুড়ো মানুষ।

হাঁপানিতে ভুগছে। বাবাকে পেয়ে পুরোনো দিনের গল্প শুরু করে দিল,—আপনার পিতাজি তো বহুত কড়া আদমি থা। গাছ গির্নে কো দেরি হুয়া থা তো নোক্‌রি ছোড় দিয়া। তো সাব ঠিক কিয়া থা। উ গাছ বহুত বরিষ বাদ মাটিমে গিরা থা। উ বখত্ হাম ভি বুঢঢা হো গিয়া থা। ঠাইরিয়ে থোড়া—বলে রামসিং ঢুকল তার ঘরে। একটু পরে একটা ছড়ি হাতে বেরিয়ে এল সে। সতু তার হাতের ছড়িটা দেখিয়ে বলল,—এই সেই ছড়ি।

—তার মানে!—আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম।

সতু মুচকি হেসে বলল,—রামসিং যা বলেছিল শুনে বাবাও অবাক হয়ে গেছলেন। বলেছিল, গাছটা নাকি গড়াতে গড়াতে তার ছাল উঠে গিয়েছিল। শেষে ওই মোটা গাছ ক্ষয়ে ক্ষয়ে রোগা হতে হতে যখন মাটিতে এসে পড়ল, তখন দেখা গেল একটি ছড়ি হয়ে গেছে। রামসিং বাবাকে ছড়িটা দিয়ে বলল, এ ছড়িঠো আপ লিজিয়ে। আপকো পিতাজি গাছ দেখা, আপ উসকো ছড়ি দেখতা। লিজিয়ে। খুশি হয়ে বাবা ছড়িটা নিয়ে এলেন।

কদিন আগে আমার মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গেছলাম। কথায় কথায় আমার মাসতুতো বোন জপাকে বললাম, সতুর ছড়ির মজার গল্প। শুনেই জপা বলল,—সে কী দাদা, আমরা তো দেওঘরে গেছলাম। ওই তোমাদের সতু আর তার বাবা-মা-ভাই-বোনেরা গেছলেন দেওঘরে বেড়াতে। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকতেন ওঁরা। আমার সামনে সতু একটি ছড়ি কিনেছিল আট আনা দিয়ে। সরু, হলদে রং। মাথায় গোল চাক্‌তি তো?

আমি বললাম,—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো।

কোস্টারিকার

সাদা গোলার রহস্য

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী
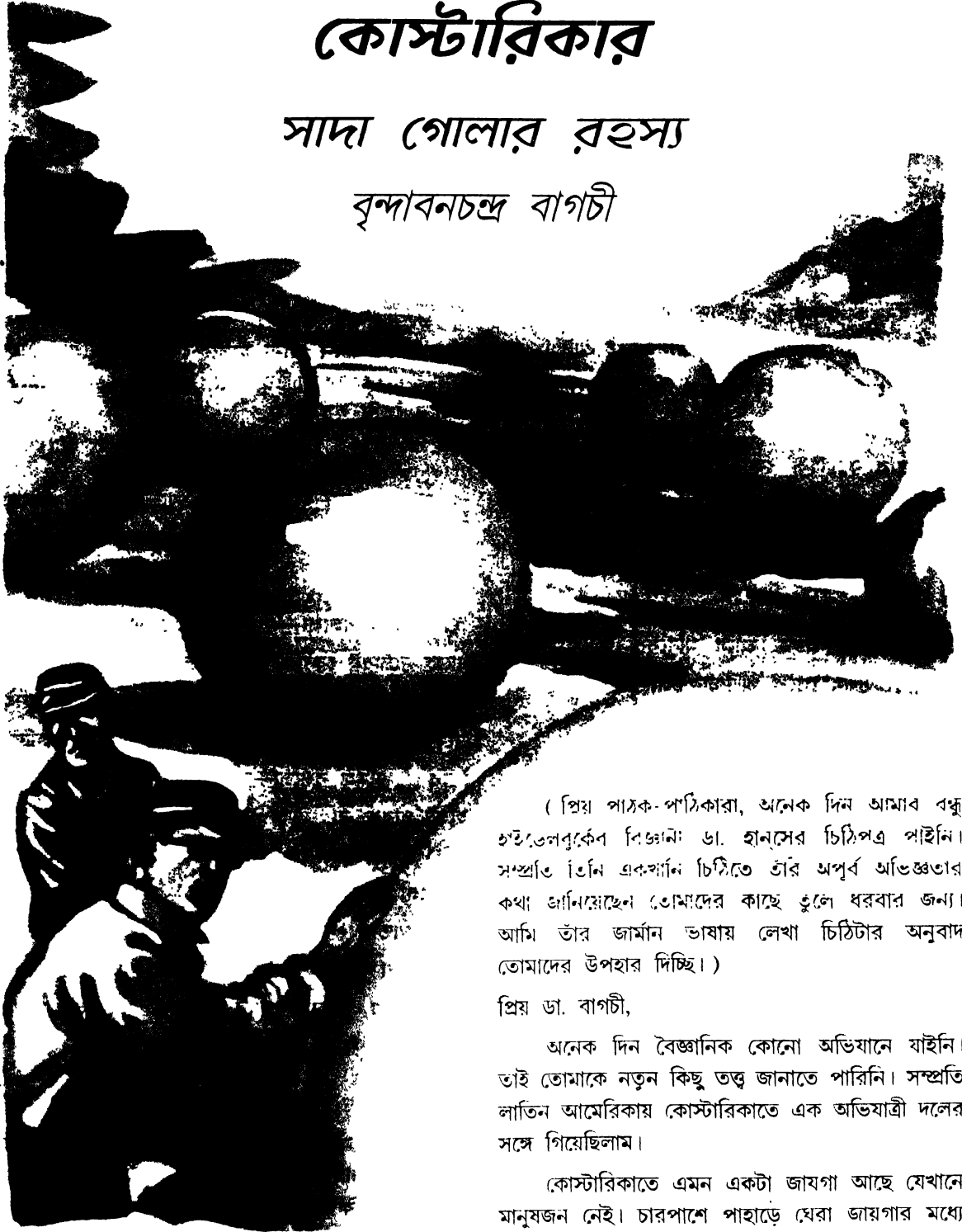
(প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, অনেক দিন আমার বন্ধু হাইডেলবুর্কের বিজ্ঞানী ডা. হান্‌সের চিঠিপত্র পাইনি। সম্প্রতি তিনি একখানি চিঠিতে তাঁর অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তোমাদের কাছে তুলে ধরবার জন্য। আমি তাঁর জার্মান ভাষায় লেখা চিঠিটার অনুবাদ তোমাদের উপহার দিচ্ছি।)

প্রিয় ডা. বাগচী,

অনেক দিন বৈজ্ঞানিক কোনো অভিযানে যাইনি। তাই তোমাকে নতুন কিছু তত্ত্ব জানাতে পারিনি। সম্প্রতি লাতিন আমেরিকায় কোস্টারিকাতে এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

কোস্টারিকাতে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে মানুষজন নেই। চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা জায়গার মধ্যে

বিরাট একটা সমতল জায়গা কয়েক মাইল জুড়ে, আর সেই সমতল জায়গা জুড়ে অদ্ভুতভাবে সাজানো আছে কয়েকশো সাদা সাদা পাথরের গোলা। আর সে কী ছোটো ছোটো কিছু? মোটেই তা নয়। এক একটা গোলার ওজন তিনশো মণের ওপর। আর কী সুন্দর মসৃণ নিখুঁত গোল! এত বড়ো মাপের গোলা অথচ ওদের ব্যাসের তফাত কোনো জায়গাতেই আট মিলিমিটারের বেশি নয়। বিস্ময়কর জিনিস। দেখে মনে হয় কোনো মানুষের দল এগুলো তৈরি করেছিল। আর তৈরি করেছিল কোনো উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়েই। প্রত্যেকটি গোলা এক মাপের, ওজন বা ব্যাসের দিক দিয়ে।

মাত্র বাইশ বছর আগে মানুষের চোখে পড়েছে এগুলো। তখন থেকে অভিযান চলছে এগুলো জানবার জন্য, আর নানা মুনির নানা মত শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন, এখানে কোনো প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, তারা এগুলি কোনো কারণে তৈরি করেছিল। কোনো বিজ্ঞানীদল বলছেন, না, এগুলি প্রকৃতি থেকেই তৈরি হয়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর কোনো কাচ জাতীয় জিনিসকে কেন্দ্র করে পাথর জমে ওঠার ফলে ওগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এবার একটা আন্তর্জাতিক অভিযাত্রীদল গিয়েছিল ওগুলোর রহস্য ভেদ করতে। আমাকেও ওই দলে নেওয়া হয়েছিল।

ওই গোলকগুলো কী বা কোথা থেকে এল—একথা জানবার জন্য চারদিকে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছিল। খুঁড়তে খুঁড়তে আবিষ্কার হয়েছিল একটা কবরখানা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বললেন এটা খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর হতে পারে।

সেই কবরখানার ভিতরেও দেখা গেল খুব সুন্দরভাবে তৈরি পাথরের বেদির উপরে ওই ধরনের সাদা গোলা রয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ ভালেরি বললেন—এগুলো নিশ্চয়ই ওপর থেকে টেনে আনা হয়েছে কোনো মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসাবে। কারণ মাটির উপরে এগুলো তৈরি হয়েছে, এখানে তৈরি হয়নি।

তা না হয় হল,—কিন্তু মাটির উপরে এগুলো কীভাবে তৈরি হল?

ভালেরি বলল—দুটো গোলা ভাঙা হয়েছে; দেখা যাচ্ছে দুটোরই কেন্দ্রবিন্দুতে কাচ জাতীয় কিছু জিনিস আছে। ওর চারপাশে নানা রকমের লাভা বা ছাই জমে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই এগুলো প্রকৃতির তৈরি।

এমিল বলল—তাহলে সবগুলো এক মাপের হতে পারত না, এক আয়তনের হতে পারত না। এটা সহজ কথা। আব এমন নিখুঁত গোলাকার সবগুলো হতে পারত না। মনে কর কেন্দ্রবিন্দুর কাচ জাতীয় পদার্থটা সমান নয়, তার পাশে জমে-ওঠা লাভা বা ছাই কী করে এমন গোল হয়ে মসৃণ হয়ে জমে উঠতে পারে? আর সবগুলো সমান ওজন আর সমান আয়তন অসম্ভব।

মসিয়ে ফাঁদে বলল—এর পাশের পাহাড়টায় কাল ডিনামাইট দিয়ে ফাটানো হবে। দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না যা থেকে এব সমাধান হতে পারে। যদি প্রাচীন সভ্যতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

বিরাট পাহাড়ের প্রাচীর। গ্রানাইট পাথরের শক্ত দেওয়াল যেন। ওর একটা জায়গায় ফুটো করে ডিনামাইট বসানো হবে। ঠিক সুবিধামতো জায়গা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল একটা সুন্দর গোল ছিদ্র আছে পাহাড়ের গায়ে। গভীরতা মাপা যায় এমন লোহার শিক চালিয়ে দেখা গেল গর্তটা পাহাড়ের ভিতরে অনেক দূর চলে গেছে। সবাই ওই গর্তটাই ডিনামাইট বসাবার উপযুক্ত জায়গা মনে করে ওইখানেই ডিনামাইট বসাল।

তারপর সে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গ্রানাইট পাথরের নিরেট দেওয়াল টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে পিছনের অনেকটা জায়গা বেরিয়ে পড়ল।

ধোঁয়া ধুলো পাথরের টুকরো এসব থিতিয়ে আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। খোঁজখবরের কাজ পরদিন হবে ঠিক হল। আমরা সবাই মিলে ক্যাম্প চেয়ার নিয়ে খোলা জায়গাটায় বসে ম্যাপ দেখে হিসাব-নিকাশ করছিলাম। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে। একটা কেমন ছাই ছাই রঙের কুয়াশামাখা সন্ধ্যা দেখা যায় আবার দেখাও যায় না। হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে এক দৃশ্য দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

সবাই চমকে বলে উঠল—কী কী ডা. হানস্? আঙুল দিয়ে শূন্যের দিকে দেখিয়ে দিলাম। আশ্চর্য দৃশ্য। যেখানটায় পাহাড়টা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ওইখানটার সামনে শূন্যে যেন ঝুলছে একখানা বিরাটকায় ফটোগ্রাফ। তাতে দেখা যাচ্ছে কতকগুলো মানুষ জাতীয় কিছু, আর মানুষই বোধ হয়। তবে কিম্ভুত পোশাক পরা (আমাদের বর্তমান কালের স্পেস স্যুট-পরা মানুষের মতো অনেকটা) আর অনেকটা লম্বা। এক-একজন এক-একটা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ মাটির

দিকে নুয়ে কোনো যন্ত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখছে কতকগুলো গোলাকার পদার্থ। দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট যন্ত্র। তার একটু অংশই মাত্র দেখা যাচ্ছে। জন পাঁচেক মানুষ দেখা যাচ্ছে নানা ভঙ্গিতে।

যেন কোনো অতীত ঘটনার একটা স্থিরচিত্র। (স্টিল ফটোগ্রাফ)। ওদের ছবির রংও যেন আবছা আবছা বোঝা যাচ্ছে।

অবাক হয়ে সকলে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। কারও মুখে কথা নেই। প্রায় পনেরো মিনিট পরে আঁধার গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, ছবিও মিলিয়ে গেল।

আমাদের সামনে ইতিহাস অতিক্রম করে কত হাজার বৎসর কে জানে তার একখানা ছবি ফুটে উঠল। আর সেই ছবিতে আমরা পেয়ে গেলাম ওই সাদা গোলার রহস্যের সমাধান।

বুঝলাম সুদূর অতীতে কত যুগ আগে কে জানে ওইখানে এসেছিল হয়তো বা গ্রহান্তরের কোনো অতি বুদ্ধিমান জীব, তারাই সাজিয়েছিল ওই গোলাগুলো কী উদ্দেশ্যে, তা আজ বলবার উপায় নেই। যে বিরাট যন্ত্রের একটা অংশ আমরা দেখলাম ওই যন্ত্র চেপেই তারা এসেছিল এবং এও দেখলাম যে এ গোলাগুলো তারাই সাজিয়েছে কোনো যন্ত্রের সাহায্যে। ওগুলো প্রকৃতি থেকে তৈরি হয়নি, প্রকৃতি থেকে তৈরি হয়েছে এই মত দিয়েছিল ভালেরি। সেও আর কথা বলতে পারল না এই ছবি দেখে।

কিন্তু ওই ছবি কোথা থেকে এল, কেমন করেই বা এল? শূন্যের আঁধারের পর্দায় কেমন করে প্রতিফলিত হল ওই ছবি? সারা রাত ভাবলাম। পরদিন বিস্ফোরণের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম পাথর ভেঙে গিয়ে ভেতরে বেরিয়ে পড়েছে চকচকে মসৃণ রঙিন কাচের মতো জিনিসে তৈরি এক বিরাট জায়গা। নিচ থেকে একটুখানি ভেঙে এনে পরীক্ষা করে দেখা গেল জিনিসটা অ্যাস্‌ফল্ট-মেশানো রজন, তাতে কিছু পরিমাণে ম্যাংগানিজ অক্সাইড আর লিমোনাইট মেশানোও আছে।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার আমরা সেইখানেই চেয়ার নিয়ে বসলাম, কিন্তু সেদিন অর অত স্পষ্ট ছবি পেলাম না। ওই একই ছবি ফুটল, কিন্তু খুব অস্পষ্ট। সারারাত্রি জেগে আমি রঙিন ফটোগ্রাফের পদ্ধতি এবং তত্ত্ব পড়ে ফেললাম। সকালে ওই ছবির রহস্য শোনালাম সবাইকে।

সুদুর অতীতে ওই গ্রানাইটের প্রাচীর থেকে ওই রজন মেশানো অ্যাস্‌ফল্‌টের স্তর পৃথক ছিল। ওই স্তরের বিশ্লেষণে যা আমরা পেয়েছি তা বঙিন ফটোগ্রাফ তোলবার জিনিসেরই কেমিক্যালস্। যখন ওই মানুষগুলো এসে এখানে ওই কাণ্ড-কারখানা করেছিল, তখন প্রখর সূর্যের আলো ছিল আর তাদের ফটোগ্রাফ উঠে গেছে ওই রজনের স্তরে।

ভালেরি বলল—তা কী করে হয়? ওই রজনের স্তরে তাদের আলোক প্রতিফলিত হবে কোন্‌খান দিয়ে? ওটা তো ঢাকা ছিল গ্রানাইট পাথর দিয়ে!

আমি হেসে বললাম—কেন, সেই সরু ফুটোটা যেটার মধ্য দিয়ে আমরা ডিনামাইট ঢোকালাম এ প্রশ্নের উত্তর তো সেটাই দিতে পারে। অর্থাৎ ওই ফুটোটাই ক্যামেরার ফুটোর কাজ করেছে।

এতকাল ওই ছবি রজনের স্তরেই আটকে ছিল। কাল বিস্ফোরণেব পরে সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এসে ওই স্তব বিকীরণ করছে, তার আলোক-তরঙ্গ যা গতকাল সন্ধ্যায় প্রজেক্টারের মতো শূন্যে ফুটিয়ে তুলছিল ওই বঙিন ছবি। কিন্তু আজ সারাদিন সূর্যের আলো পড়াতে ওই প্রতিফলনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই অত্যন্ত অস্পষ্ট ছবি আজও পেয়েছি। আগামীকাল আর ওটুকুও পাব না।

আমি চুপ কবলাম।

এমিল বলল—আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে ওই ফটোগ্রাফের একটা ফটোগ্রাফ নেওয়া যেত। আমি বললাম—তা তো আর সম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক, সাদা গোলক সম্বন্ধে বাইশ বছর ধরে সব গবেষণার শেষ লক্ষ্যে আমরা এসে পড়েছি যে ওগুলো প্রকৃতি থেকে তৈরি হয়নি। কোনো মানুষেরই কীর্তি। তারা ওই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য জাতিরই কেউ হোন বা গ্রহান্তরের মানুষই হোক।

তোমাদের দেশের ছোটো ছোটো কিশোর কিশোরীদের এই সত্য-সন্ধানী কাহিনি উপহার দিলাম, এটা কিন্তু নিছক গল্প নয়।

বিশ্বস্ত তোমার

এ হানস্ হাইডেলবুর্গ।

শোক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ইতুমাসি,

কাল তোমার জন্মদিনে আমি যেতে পারিনি। সন্ধ্যার দিকে বাবা গিয়েছিলেন, মা গিয়েছিলেন, বন্দনা টুটুলকে নিয়ে দাদাও গিয়েছিলেন তোমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে। শুধু আমিই গেলাম না। কেন যে যাইনি তা তুমি এতক্ষণে সকলের মুখে নিশ্চয়ই শুনেছ। তবু নিজে তোমাকে সব কথা খুলে না বলা পর্যন্ত আমি ঘুমুতে পারছিনে। কত রাত হয়েছে জান? এগারোটা। এত রাত অবধি আমি কোনোদিন জেগে থাকতে পারিনে। রাত নটা বাজতে না বাজতে আমার ঘুম এসে যায়। এই নিয়ে বাবা আমাকে কত বকেন, মাস্টারমশাই ঠাট্টা করে বলেন, ক্লাস টেনের ছাত্র তুমি, অন্তত রাত দশটা-অবধি তোমার জেগে

থাকা উচিত। তিনি আজও সন্ধ্যায় আমাকে পড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু আমি আজ আর তাঁর কাছে পড়িনি। সব কথা শুনে তিনি নিজে থেকেই চলে গেছেন। না, পড়ার জন্যে আজ আমাকে অবশ্য কেউ বকেনি। সারা বাড়িটা আজ চুপচাপ। আমার আজ আর ঘুম পাচ্ছে না। আমার পাশের বিছানায় দাদা শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে কী অদ্ভুতই না লাগে। যেন আর এক মানুষ। ঠিক তেমনই চেহারা বদলে যায় শোকার্ত মানুষের, জানলা দিয়ে আমাদের বিড়ালটাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। নারকেল গাছটার দিকে মুখ করে, আমাদের দিকে পিছন ফিরে ও চুপ করে বসে আছে। আর মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে 'মিউ-মিউ-মিউ!' সে ডাক যে কী তুমি জান না ইতুমাসি! সে ডাক শুনলে তোমারও কান্না পেত।

এই বিড়ালটার ইতিহাস তুমি তো আগাগোড়া জান। দেড় বছর আগে ওকে আমিই পার্কের ধার থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। তখন ওর কী চেহারা! যেমন রোগা, তেমনই নোংরা। ওর শোবার জায়গা করে দিলাম আমাদের তক্তপোষের তলায়। একটা প্যাকিং বাক্সের মুখ খুলে তার মধ্যে খবরের কাগজ বিছিয়ে ওর বিছানা তৈরি করে দিলাম। বাবা বললেন, কাগজের বিছানায় কি রাজকুমারীর মন উঠবে! ধুনুরি ডেকে লেপ-তোষকের অর্ডার দাও।

বিড়ালটা কী পাজি ইতুমাসি! দেখলাম বাবার কথাই ঠিক। বাক্সের বিছানা সত্যিই ও পছন্দ করল না। চুপিচুপি রাত্রে উঠে মশারির ভিতরে এসে একেবারে আমার পায়ের তলায় আস্তানা গাড়ল। ঘুমের মধ্যে দু-একদিন ওর গায়ে আমার লাথিও লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, ও কিছুতেই সেখান থেকে নড়ল না।

আদরে আদরে ওর চেহারা ফিরে গেল। তুমি বলতে, কী চমৎকার রং দেখেছিস? ওর নাম রাখ রঙ্গিণী। ধবধবে সাদা রঙের ওপর খানিকটা করে পাটকেলে আর খানিকটা করে ছাই-রঙের চাকতি। সবাই স্বীকার করল, এমন তিন-রঙা বিড়াল কেউ দেখেনি। যাই হোক, তোমার দেওয়া নামটাকে ছোটো করে আমি ওর নাম রাখলাম,—রঙন। নামটা শুনে শুনে ও শিখে ফেলল। তুমি তো দেখেছ রঙন বলে ডাকলে ও মিউ মিউ করে কেমন সাড়া দেয়!

তারপর তুমি তো সে ঘটনার কথা শুনেছ। মনে আছে তোমার সেই যেদিন ও হারিয়ে গেল, মানে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। স্কুল থেকে ফিরে এসে ডাকলুম রঙন, রঙন! কিন্তু কোনো সাড়া নেই। এঘরে-ওঘরে আনাচে-কানাচে কোথাও ওকে খুঁজে পেলাম না। আশেপাশের বাড়িগুলিও খুঁজলাম। কোথাও নেই। সন্ধ্যা উতরে গেল, রাত আটটা বাজল, নটা বাজল। কিন্তু দেখা নেই রঙনের। আমার ভয় হল নিশ্চয় ওকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। ওর রং দেখে, ওর রূপ দেখে অনেকেরই তো লোভ আছে ওর উপর। সেই লোভ হয়তো সামলাতে পারেনি। সেদিনও আমি মাস্টার-মশাইয়ের কাছ থেকে ছুটি নিলাম। বাবা শুনে রাগ করলেন,—। একটা বিড়ালের জন্য পড়া কামাই! এ কী ছেলেমানুষি!

বিড়ালটা সে রাতে আর ফিরল না। পরদিন ভোরে উঠে দেখি রঙন এসে হাজির। একা নয়, পিছনে পিছনে মস্তো একটা বিড়ালও আছে। এমন বিশ্রী তার চেহারা যে দেখলেই রাগ হয়। ওকে দেখে আমার দুই চোখ রাগে জ্বলে উঠল। আমি আস্ত একখানা ইট ছুঁড়ে মারলাম। হুঁড়কো বিড়ালটা ভারি চালাক। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাল। ইটখানা গায়ে লাগলে ওর আর এক পা-ও নড়তে হত না।

মারলাম ওকেও। অত মার খেয়েও রঙন কিন্তু আমার কাছ ছাড়া হল না। সকালবেলায় আমি যতক্ষণ বসে বসে পড়লাম টেবিলের নিচে, ও আমার পায়ের কাছে পড়ে রইল। সন্ধ্যাবেলাও সেখান থেকে নড়ল না, সারাদিনের মধ্যে ওকে আমি কাছে ডাকিনি, খেতে দেইনি, আদর করে কথা বলিনি। আমি যে কী ভীষণ রাগ করেছি তা ওর বুঝতে বাকি নেই। রঙন যে কী লজ্জা পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে, আমি ওর মিউ মিউ ডাক শুনেই তা বুঝতে পারলাম। ওদের অভিধানে তো ওই একটি শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় শব্দ নেই! সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সব ব্যাপারেই ওই 'মিউ'! ওই একই 'মিউ'র নানান মানে। একটু কান পাতলেই তা বোঝা যায়। আমি বেশিক্ষণ আর রাগ করে থাকতে পারলাম না।

দুঃখের পরে ফের সুখের দিন এল। কিছুদিন বাদেই আমরা বুঝতে পারলাম রঙনের বাচ্চা হবে। সবাই বললে, ওর বাচ্চা হলে আমাকেও দিও। কিন্তু বাচ্চা হল একটি মাত্র। কাকে বাদ দিয়ে কাকে দেই! বাচ্চাটা ওর মায়ের মতো তিন-রং পায়নি। সাদা আর কালোয় মেশানো ওর তুলতুলে গা, আমি সেই প্যাকিং বাক্সটার মধ্যে মা আর ছেলের জায়গা করে দিলাম। কিন্তু সেখানে

মশার কামড়ে টিকতে পারবে কেন? বাচ্চাটাকে নিয়ে রোজ রাত্রে ও আমার বিছানায় উঠে আসে। আমি কাউকে বলিনে। শুনলে মা যে রাগ করবে!

তারপর বাচ্চাটার চোখ ফুটল। এতদিন আমি রঙনকে আদর করেছি, এবার রঙনের আদর দেখতে লাগলাম। বাচ্চাটার মাথা শোঁকে, গা শোঁকে, পা ছড়িয়ে দিয়ে দিব্যি আয়েস করে দুধ দেয়, তারপর একসময় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যা নেই, সবসময় ঘুম। শুধু ঘুমনোই নয়, মাঝে মাঝে বাচ্চাটার ঘাড়ের দিকটা কামড়ে ধরে রঙন এ ঘর-ও ঘর করে। আমার গা শিউরে ওঠে: গেল বুঝি বাচ্চাটা! কিন্তু যায় না, এ হল রঙনের খেলা। সারাদিন ও বাচ্চাটাকে নিয়ে খেলে।

রঙনের ছেলের নাম কী রাখব তাই নিয়ে হল মহাচিন্তা।

কিন্তু আর দরকার নেই ইতুমাসি। নামের আর কোনো দরকার নেই।

আজকের দুপুরের ব্যাপারটা এবার বলি। তোমার জন্মদিনে যাব বলে আজ স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছি। সব গুছিয়ে-টুছিয়ে সবে আমরা খেতে বসেছি, তোমাদের গল্প করতে করতেই খাচ্ছি, ঠিক এই সময় ঘটে গেল কাণ্ডটা! রঙন ওর বাচ্চাটাকে বারান্দায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমার পাতের কাছে চোখ বুজে আরাম করে মাছের কাঁটা চিবুচ্ছিল, হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে আমরা চমকে উঠলাম। কোত্থেকে সেই কালো হুলো বেড়ালটা খ্যাঁক করে এসে বাচ্চাটার ঘাড় কামড়ে ধরেছে। আর একটা চিৎকার করে রঙন সেখানে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল। রাগ, দুঃখ আর ভয়ে মেশা সে চিৎকার যে কী, তা তুমি নিজে না শুনলে বুঝতে পারবে না, ইতুমাসি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ফেলে উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে জল-ভরা গ্লাসটা মারলাম ছুঁড়ে। কালো বেড়ালটার কিছুই হল না, এঁটো জলে শুধু মা-র শাড়ি ভিজে গেল। আর রক্তে ভিজে গেল আমাদের বারান্দা। খুনী বিড়ালটা গ্লাসের ঘা খেয়ে পালিয়েছে। রঙন ওর বাচ্চাটার মুখ শুঁকছে। রঙনের গায়ে নতুন রং লেগেছে ইতুমাসি, টকটকে লাল রং। কাছে এসে ভালো করে দেখলাম, যা হবার হয়ে গেছে। এক কামড়েই শেষ হয়েছে বাচ্চাটা। আমি এঁটো হাতেই লাঠি নিয়ে ছুটলাম। কিন্তু সেই খুনীটাকে সারা পাড়ায় আর খুঁজে পেলাম না।

মরা বাচ্চাটাকে দাদা যেন কোথায় ফেলে দিয়ে এসেছে। আমি তাকে আর ছুঁইনি, রঙনকেও না। ও রাক্ষুসী কেন মাছের কাঁটা খেতে গেল! কিন্তু সারাদিনের মধ্যে আর কিছু খায়নি রঙন। শুতেও আসেনি। মিউ মিউ করতে করতে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে গিয়ে বসছে ওই পথের ধারে, যে পথ দিয়ে দাদা ওর বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কতবার ওকে ধরে আনতে চেষ্টা করলাম, গায়ে মাথায় হাত বুলালাম, মাছ ভাত দিয়ে সাধাসাধি করলাম, কিন্তু কিছুতেই ও এল না, বরং রাগ করে আমার হাত একবার আঁচড়ে দিল।

তোমার কাছে গোপন করব না, আমিও কেঁদেছি, লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি। সবাই টের পেয়েছে, কিন্তু কেউ কিছু বলেনি, ঠাট্টা করেনি। কেন যে কান্না পাচ্ছে তাই ভাবি। আমার বিড়ালটা তো আছে। কিন্তু রঙনের রঙনটা যে নেই! কী নরম তুলতুলে ছিল বাচ্চাটা, আর কী সুন্দর!

একটু আগে মা এসে তাড়া দিয়ে গেল, 'ডন, শুয়ে পড়। আর রাত জাগিসনে।' এই নিয়ে পাঁচবার এল মা। মায়ের চোখদুটো ফোলা ফোলা, গলা ধরে গেছে। তোমাদের বাড়িতে বেশি দেরি করেনি। তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। কেন এসেছে জানি। তোমাদের বাড়িতে জন্মদিনের ভিড়। সেখানে তো লুকোবার জায়গা নেই। মা-রও আমার মতো লুকোবার জায়গা দরকার। আমি ভাবতাম টুটুল-বন্দনার মতো ছোটো ছেলেমেয়েরাই বুঝি শুধু কাঁদে। আজ দেখলাম তা নয়। বড়োরাও কম কাঁদে না। আমার মা তো কত বড়ো। মা তো কত বোঝে। বুঝলে কী হবে? মা যে কাঁদছে আমাদের তিনজনের জন্যে।

ইতি—

তোমার ডন।

ছেলেধরা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি আর ভুতো। একজন রোগা আর লম্বা, ঠিক যেন তালগাছ। অন্যজন মোটা আর বেঁটে, ঠিক যেন কোলা ব্যাঙ। পাঁচকড়ি আব ভুতো। চেহারায় তাদের মিল নেই, কিন্তু মনের দিক থেকে আশ্চর্য মিল। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে তারা বড়ো হয়েছে। বড়ো হয়েছে বটে, তবে মানুষ হয়েছে কি না—সে কথা থাক। তবে জীবনে তারা উন্নতি করবেই, যেমন করেই হোক করবে এবং করবে একসঙ্গে।

ছেলেবেলা থেকেই তারা একসঙ্গে মানুষ। পড়েছে একই ইস্কুলে। একই মাস্টারের কাছে খেয়েছে বকুনি, দাঁড়াতে হলে একই সঙ্গে দাঁড়িয়েছে বেঞ্চির উপর। একজন রোগা আর লম্বা। আর একজন মোটা আর বেঁটে। একই সঙ্গে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা দেবার সময় পাশাপাশি বসেছে। একই পরীক্ষায় একই সঙ্গে দুজনে ফেল করেছে। কারণ দুজনে তারা দুজনের খাতা দেখে টুকেছে বলে।

পড়াশুনো তাদের কিছুই হল না। বন্ধুত্ব হল আরও গাঢ়। দুজনেই বাড়িতে বকুনি খায়, তারপর বাইরে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এর দুঃখ ওকে জানায়। তারপর দুজনেই নিশ্বেস ফেলে আর প্ল্যান করে। যেমন করেই হোক বড়ো তাদের হতেই হবে। ভীষণ বড়ো হতে হবে। যাতে তাদের নাম শুনে লোকে চমকে যায়। যাতে রাস্তা দিয়ে তারা হাঁটলে লোকে বলে মানুষের মতো মানুষ দেখতে চাও তো ওই দেখো।

সুখে-দুঃখে, গালমন্দ খেয়ে, প্ল্যান করে আর নিশ্বেস ফেলে অনেকদিন কেটে গেল। পাঁচকড়ি আর ভুতো তখন আর ছোট্টটি নেই। দিব্যি বড়ো-সড়ো হয়ে উঠেছে। পাঁচকড়ি লম্বায় আরও বেড়েছে, চওড়ায় আরও কমেছে। আর ভুতো চওড়ায় অনেকটা বেড়েছে, তাই যেন লম্বায় খানিক কমেছে।

সময় যায়। দেখতে দেখতে লড়াই এসে গেল। চারদিকে হলস্থূল কাণ্ড। পাঁচকড়ি আর ভুতো যেখানেই যায় সেখানেই দেখে, লোকে কী ভীষণ ব্যস্ত। সবাই কিছু-না-কিছু করছেই। হয় লড়াই করতে যাচ্ছে, না হয় স্ক্রু আর ছুঁচ বেচে বড়োমানুষ হচ্ছে—কিচ্ছু না পেলে খাকি সার্ট আর পেন্টুলুন পরে লোকে সিভিক গার্ড কিংবা এ-আর-পি হয়ে বিড়ি টানছে আর ফুটপাতে গোল হয়ে বসে পাতাবিন্তি খেলছে। সবাই কিছু-না-কিছু করছেই। শুধু তাদের কপালেই কিছু জুটল না। দিনের পর দিন কাটতে লাগল বাড়ির লোকের গালমন্দ খেয়ে।

তারা অনেক বড়ো হয়ে গেছে। এখনও কিছু না করলে ভালো দেখায় না। তাই একদিন তারা ঠিক করল, যেমন করেই হোক কাল থেকে তারা কিছু করবেই। কিছু-একটা করতে হলে আগে দরকার কিছু টাকার। তাই পরের দিন দুজনেই বাড়ির লোকের পকেট হাতড়ে, বাক্স ভেঙে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। তারপর দুজনে ভালো করে গুনে দেখল কত টাকা তারা এনেছে। এক-দুই করে গুনতে গুনতে তিনশোতে এসে থামল। তারা মোট তিনশো টাকা জোগাড় করেছে। তিনশো টাকা তো আর কম নয়।

কিছু একটা করার আগে আর তারা বাড়ি ফিরবে না। তাই বাড়ি না ফিরে ইস্টিশানের কাছের দোকান থেকে সিঙাড়া আর জিলিপি পেট ভরে খেয়ে টিকিট কিনে তারা ট্রেনে চেপে বসল। সমস্ত রাত ভিড়ের ঠেলায় গা-গতর ছেঁচে গেল। সকালের দিকে লোকজন নেমে যেতে তারা যখন আরাম করে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোবার উপক্রম করছে এমন সময় রেল-কোম্পানির লোক এসে তাদের নামিয়ে দিল। বলল,—শিলিগুড়ি এসে গেছে, গাড়ি আর যাবে না।

রেলগাড়ি থেকে নেমে তারা প্রথমেই টের পেল ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে ইটের মতো শক্ত মিষ্টি আর চামড়ার মতো পুরি পেট ভরে খেয়ে এক গাছেব তলায় বসে ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে ভালো কবে তারা চারিদিকে চেয়ে দেখল।

পাঁচকড়ি বলল, ভুতো, ভগবান আমাদের ঠিক জায়গায় এনে দিয়েছেন। ওই দ্যাখ, সামনে হিমালয় পর্বত। আমরা গেরুয়া পরে সন্নেসি হয়ে ওই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরব। বনের ফল-মূল খাব। গাছতলায় ঘুমোব। আর বাড়ি ফিরব না।

ভুতো বলল, আরে, সন্নেসি হওয়া কি আর সোজা কথা ! তুই না হয় চিম্‌সে আছিস। ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াবি। কিন্তু এই ঢাউস শরীবটাকে টেনে টেনে আমি কী করে রাতদিন ঘুবে ঘুরে বেড়াই বল ? তাছাড়া জঙ্গলে তো বাঘ-টাঘ আছে। আমাদেব দুজনকে দেখলে তোর চিম্‌সে শরীর ফেলে আগে আমাকেই তারা গিলে ফেলবে। ওসব সন্ন্যেসি-টন্নেসি হওয়াতে কাজ নেই। তার চেয়ে আমি একটা প্ল্যান বলি শোন। সমস্ত রাত ধরে ভেবেছি। ভগবান আমাদের ঠিক জায়গাতেই এনে ফেলেছেন। এখানেই চমৎকার ব্যবসা জমবে। বলি প্ল্যানটা ?

পাঁচকড়ি নিশ্বাস বন্ধ করে বলল,—বল্‌।

ভুতো খুব ফিস্‌ফিস করে বলল,—এখানে আমরা ছেলেধরা হয়ে যাই।

ছেলেধরা ! সে কী রে ?

হাঁ, ছেলেধরা। ছেলেধরার ব্যাবসা কি নিতান্ত ছেলেখেলার ব্যাবসা হল ? আমাদের যারা প্রভু—সেই ইংরেজদের দেশেও এ ব্যাবসা জোর চলে। আর ইংরেজদের যারা প্রভু, সেই আমেরিকানদের দেশে তো এ ব্যাবসার কথাই নেই ! কোনো হাঙ্গামা নেই! বেশ বড়োলোকের একমাত্র ছেলে দেখে মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়ে নিয়ে যাব। তাকে ভালো খাওয়াব-পরাব আর তার বাবাকে খবর দেব অন্তত পাঁচ হাজার টাকা নগদ না দিলে ছেলে ফেরত পাবে না। টাকা সে দেবেই। তাহলেই দ্যাখ, আমরাও টাকা পাব, বাপও ছেলে ফেরত পাবে, ছেলেটাও দু-চারদিন আমাদের কাছে ভালো থাকবে, ভালো খাবে, লেখাপড়া করতে হবে না—কেন, এ ব্যাবসা খারাপ হল নাকি ?

নিজের নাক চুলকে পাঁচকড়ি তারিফ করে বলল, বাস্তবিক তোর মাথা আছে ভুতো। চল, এখনই বেরিয়ে পড়ি।

ভুতো বলল, চল। কিন্তু খুব সাবধান। এ ব্যাবসায় পদে পদে বিপদ। ধাঁ করে বেফাঁস কিছু করে বসিসনি যেন।

সমস্ত দিন ধরে ভুতো আর পাঁচকড়ি শিলিগুড়ি শহরটাকে চষে ফেলল। কিন্তু ধরার মতো ছেলে পাওয়া যায় কোথায় ? যদি বা ছেলে দেখে, খোঁজ নিয়ে জানে প্রথমত সে-ছেলে একমাত্র ছেলে নয়, দ্বিতীয়ত তার বাবার এমন অবস্থা নয় যে ছেলের জন্য হঠাৎ পাঁচ হাজার টাকা বার করতে পারে। এদিকে বড়োলোকও যে শহরে নেই তা নয়। তবে খোঁজ নিয়ে তারা জানল, বড়োলোকদের হয় ছেলেপিলে নেই, না-হয় তো ছেলেপিলে আছে, কিন্তু এ শহরে নেই। কেউ কলকাতায় মামার বাড়িতে হাওয়া খাচ্ছে, কেউ বা কালিম্পঙের বোর্ডিং-এ পড়ছে। ধরবার মতো ছেলে পাওয়া যে এত কঠিন, ভুতো আগে ঠিক এ-কথাটা জানত না।

ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধে হয়ে এল। ভুতো আর পাঁচকড়ি বেজায় ক্লান্ত। ছেলে ধরবার জন্য দুজনে দু-পকেট লজেন্‌জুসে ভরে ছিল। পকেটগুলো এখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে। নিজেরাই তারা খেয়েছে। খাওয়াবার মতো একটি ছেলেও তারা খুঁজে বার করতে পারেনি। সুয্যি ডুবু-ডুবু। হাঁটতে হাঁটতে তারা শহরের একেবারে একধারে এসে পড়ল। আর খানিক গেলে শহর ছাড়িয়ে তরাইয়ের জঙ্গলে এসে পড়বে। এমন সময় ভুতো হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর একটা আঙুল তুলে বলল,—স্‌-স্‌-স !

ফিসফিস করে পাঁচকড়ি প্রশ্ন করল, কী রে ?

আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে ভুতো বলল, ওই দ্যাখ, ভগবান এবারে মুখ তুলে চেয়েছেন।

ভুতোর আঙুল অনুসরণ করে পাঁচকড়ি দেখতে লাগল : কিছু দূরে একটা বড়ো বাড়ি। সেই বাড়ির ফটক ঠেলে সাত-আট বছরের একটা ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে এল। তার সামনে একটা কুকুর প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। কুকুরটাব ল্যাজে একটা টিনের কৌটো বাঁধা। ভুতো বলল, বাড়িটা যখন অত বড়ো, তখন নিশ্চয়ই তার মালিক খুব বড়োলোক। আর বাড়িটার ভেতর থেকে ছেলেটা যখন বেরল, তখন সে বাড়িওলার ছেলে না হয়ে যায় না। চল পাঁচকড়ি, আমরা পা টিপে টিপে এগোই। সন্ধেও হয়ে এসেছে, টপ করে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যাব।

তারা যখন কাছাকাছি এল, ছেলেটা তখন থেমেছে। ল্যাজের ওপরকার টিনের কৌটোটার ওপর চড়ে কুকুরটা গোল হয়ে নিজেই নিজের ল্যাজ কামড়ে গোঁ-গোঁ করে চিৎকার করছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে, আর ছেলেটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে লাফাচ্ছে আর মহা ফুর্তিতে নানারকম কু-স্বর বার করছে।

পকেট থেকে লজেন্‌জুস বার করে ভুতো ছেলেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, শোনো খোকা—

খোকা কী রে মুটকো !—কুকুরটার ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ভুতোকে সে বলল।

একটু হকচকিয়ে ভুতো বলল, না-না রাগ কর কেন খোকাবাবু ! আমি বলছিলুম কী, ওই বাড়িটা তোমাদের ?

ছেলেটা মুখ ভেংচে ভুতোর স্বর নকল করে বলল, বাড়িটা তোমাদের ? মর মোটা ! চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি ?

ভুতো পকেট থেকে এক মুঠো লজেন্‌জুস বার করে বলল, খোকাবাবু লজেন্‌জুস খাবে ?

এবার ছেলেটার মুখ-চোখের চেহারা বদলে গেল। এগিয়ে এসে গোটা পাঁচ-ছয় লজেন্‌জুস একসঙ্গে মুখে

পুরে কড়মড় করে চিবতে লাগল, বাকিগুলো পুরল তার হাফপ্যান্টের পকেটে।

এতক্ষণে পাঁচকড়ি এগিয়ে এসেছে। সে বলল, .আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে ? আরও অনেক লজেন্‌জুস দেব।

ছেলেটা বলল, এই শুঁটকো লোকটা আবার কে রে ! তুই আবার কোত্থেকে এলি ?

পাঁচকড়ি বলল, ভুতো আর আমি দু-ভাই কিনা—

বাঃ, বেড়ে ভাই তো !—হাততালি দিয়ে ছেলেটা বলল, রাম শ্যাম দুই ভাই, ব্যাঙ মার ঠুঁইঠাই ! তোর কাছে লজেন্‌জুস নেই ?

একমুখ হেসে একমুঠো লজেন্‌জুস বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে পাঁচকড়ি বলল, আমাদের সঙ্গে চলো খোকাবাবু। কত লজেন্‌জুস দেব, কত খেলনা দেব, কত গল্প বলব। যাবে ?

ঘাড় হেলিয়ে ছেলেটা বলল, এক্ষুনি যাব। কিন্তু সত্যি বলছিস তো, না মিথ্যে বলছিস ? যদি না দিস, তাহলে তোদের দু-ভাইকে বঁটি দিয়ে কেটে চচ্চড়ি করে খাব।

উৎসাহিত হয়ে ভুতো বলল, নিশ্চয় খাবে খোকাবাবু, এ আর বেশি কথা কী ? বাড়িতে বুঝি তোমার বাবা থাকেন ?

ছেলেটা বলল, শুধু বাবা কেন, বাবার চাকর থাকে, আমার ঝি থাকে, আরও কত লোক থাকে।

ছেলেটার হাত ধরে ভুতো ততক্ষণে শহরের বাইরের পথ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। পাঁচকড়ি চলেছে পিছন পিছন।

ভুতো বলল, খোকাবাবু, তোমার বাবার বুঝি অনেক টাকা আছে ?

ছেলেটা বলল, আছে বই কী ! চারটে সিন্দুক ঠাসা টাকা আছে। তবে জানিস, বাবা ভারি কেপ্পন, তোদের মতো একদিনও আমাকে লজেন্‌জুস খাওয়ায়নি। তা, তোরা শুঁটকো আর মুটকো হলে হবে কি—তোরা লোক ভালো। আমাকে আরও চকোলেট দিবি তো, আর লজেন্‌জুস আর একটা রেলগাড়ি আর একটা বন্দুক আর একটা তরোয়াল—

পাঁচকড়ি বলল, লজেন্‌জুস চকোলেট বিস্কুট যত চাইবে তত দেব। কিন্তু বন্দুক আর তরোয়াল নিয়ে কী করবে ?

ছেলেটা বলল, লড়াই-লড়াই খেলব। তুই শুঁটকো আছিস, তোর পিঠে চড়ে এই মুটকোটাকে শিকার করব। হাতি শিকার করা খেলব। কেমন, দিবি তো ?

মনে মনে শিউরে উঠলেও পাঁচকড়ি বলল, নিশ্চয়ই দেব। খোকাবাবু যা চাইবে তাই আমরা দেব।

ছেলেটা বলল, আর হাঁটতে পারছি না। এই শুঁটকো, তুই বোস, তোর কাঁধে চাপি।

পাঁচকড়ির কাঁধে চক্ষের নিমেষে চড়ে বসে ছেলেটা বলল, হ্যাট-হ্যাট-জলদি চল। তুই আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া হলি আজ থেকে। গোরুর মতো ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে চলছিস কেন ?

রাত্রি এগারোটা। ছেলেটা একটি ভাঙা কুঁড়েঘরে। চারদিকে শালগাছের জঙ্গল। জনমনিষ্যি কোনোদিকে নেই। ঝিঁঝির ডাক শুধু শোনা যায়। আর কোনো শব্দ নেই। কুঁড়ের ভিতর খড়ের গাদা। তার ওপরে ভুতো আর পাঁচকড়ির কোট বিছিয়ে বিছানা করা হয়েছে। বিছানায় শুয়ে সেই বাচ্চা ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছে।

ঘরের দরজার কাছে পাঁচকড়ি আর ভুতো বসে। তাদের চোখে ঘুম থাকলেও ঘুমোবার উপায় একেবারে নেই। ছেলেটাকে পাহারা দিতে হবে তো। শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছেলেটাকে কাঁধে করে এনে এই পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরটা তারা আবিষ্কার করেছে। এখানে তাদের খোঁজ সহজে কেউ যে পাবে তার সম্ভাবনা একেবারে নেই।

পাঁচকড়ি ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ভুতো ! খুদে শয়তানটা আমাকে তো শেষ করে ফেলেছে প্রায়। আমার ঘাড়টা এখনও রয়েছে কী করে, ঘাড়ের ওপর মাথাটাই বা কী করে আছে তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

ভুতো সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আরে, টাকা কি আর সহজে আসে ! মাথার ঘাম পায়ে না পড়লে টাকা রোজগার হয় না। পাঁচটি হাজার করকরে টাকা যখন হাতে পাবি, দেখিস ঘাড়ের ব্যথা-ট্যথা কোথায় উড়ে যাবে !

এই বলে ভুতো কাগজ-পেন্সিল বার করে চিঠি লিখতে বসল। ছেলেটার কাছ থেকে বহু কষ্টে তার আর তার বাবার নাম ভুতো বার করেছে : ছেলেটার নাম সুবোধ, আর তার বাবার নাম বরদাভূষণ পাইন। ভুতো লিখে চলল :

প্রিয় বরদাবাবু,

আপনার একমাত্র পুত্র সুবোধকে আমরা চুরি করে এনেছি। এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি, যেখান থেকে পুলিশের কিংবা ডিটেকটিভের সাধ্য নেই তাকে খুঁজে বার করে। অতএব আমাদের সঙ্গে চালাকি করে পুলিশ কিংবা ডিটেকটিভের শরণাপন্ন হবেন না। সুবোধকে ফিরে পেতে হলে আমরা যেখানে বলব ঠিক সেখানে নগদ পাঁচ-হাজার টাকা রেখে যাবেন। টাকা পাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার পুত্র হাসিমুখে বাড়ি ফিরবে।

আপনার বাড়ির উত্তর দিক ধরে চল্লিশ মিনিট হাঁটবার পর বাঁদিকে প্রকাণ্ড একটি অশ্বত্থগাছ দেখবেন। সেই অশ্বত্থগাছের গুঁড়িতে একটি গর্ত আছে। আজ রাত্রি বারোটায় একজন লোক মারফত সেই গর্তে একটি চিঠি পাঠিয়ে আপনি জানাবেন আমাদের শর্তে রাজি আছেন কি না।

আমাদের কোনোভাবে প্রতারিত করবার চেষ্টা করলে ইহ-জীবনে আর আপনার পুত্রকে দেখতে পাবেন না—এ বিষয়ে নিশ্চিত।

ইতি—

ছেলেধরা

চিঠি লেখা হবার পর ভুতো একবার সেটা পাঁচকড়িকে পড়ে শোনাল। ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে পাঁচকড়ি বলল, ভাই ভুতো, এই পাঁচ হাজার টাকাটা কেটে আড়াই হাজার করে দে। এই শয়তানটার জন্যে কেউ আড়াই হাজার দিলেই আমরা খুশি থাকব। কী বলিস ?

ভুতো উত্তরে বলল, দূর ভিতু।

পরের দিন ভোর হতে-না-হতেই ভুতোর চিৎকার শুনে পাঁচকড়ি জেগে উঠল। যা দেখল, তাতে তো পাঁচকড়ির চক্ষু স্থির হবার অবস্থা। সেই শয়তান ছেলেটা ইতিমধ্যে কখন ভুতোর বুকের ওপর চেপে বসে নাচতে শুরু করেছে। ভুতো মোটা মানুষ, কিছুতেই কায়দা করে তাকে সরিয়ে উঠে বসতে পারছে না।

পাঁচকড়ি ছেলেটাকে টেনে হিঁচড়ে কোনোরকমে নামিয়ে বেশ খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, হতভাগা ছেলে কোথাকার ! কী বাঁদরামো হচ্ছে ?

ছেলেটা চোখ পাকিয়ে বলল, খবরদার ! জানিস আমি ভোলা ডাকাত ? আমার গায়ে হাত ? আজ তোকে কুচিকুচি করে কেটে রাখব, তখন মজাটা টের পাবি।

এ ছেলের পক্ষে সব সম্ভব। পাঁচকড়ির সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মিষ্টি করে বুঝিয়ে তাকে বলল, ছিঃ সুবোধ ! ভুতো তোমার চেয়ে অনেক বড়ো। তার বুকে চেপে বসে নাচতে আছে নাকি ?

সুবোধ বলল, বা রে ! তোর কাঁধে উঠেছিলুম, ঘোড়ায় চড়া হয়েছিল। আজ আমার হাতিতে চাপার শখ হয়েছে। আজ মোটকার বুকে চড়ব না ?

পাঁচকড়ির মেজাজ সকাল থেকেই ভালো নেই। ঘাড়টা সমস্ত রাত এমন টনটন করেছে যে ভালো ঘুম একেবারেই হয়নি। তার ওপর ক্রমাগত 'মোটকা' আর 'শুঁটকো' আর তুই-তুই শুনতে শুনতে তার ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল। ছেলেটার কান ধরে ঘরের বাইরে এনে ভয় দেখাবার জন্যই বলল, যা দূর হ। এখানে তোকে বাঘে-ভালুকে ধরুক, আমরা কিছু জানি না।

রাগে গরগর করতে করতে পাঁচকড়ি ঘরে এসে বসল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাঁ করে একটা গোল পাথর এসে লাগল তার রগে। আর একটু হলেই তার ডান চোখটা কানা হয়ে যেত।

হন্তদন্ত হয়ে দুজনে বাইরে এসে দেখে ছেলেটা তার হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে গুলতি বার করে তাদের দিকে আবার টিপ করছে। ভুতোর উপস্থিতবুদ্ধি বেশি। পকেট থেকে তৎক্ষণাৎ একমুঠো লজেন্‌জুস বার করে বলল, ছি-ছি সুবোধ ! গুলতি দিয়ে কখনও মারতে আছে ? এই নাও লজেন্‌জুস।

বুক ফুলিয়ে সুবোধ গুলতিটা পকেটে রেখে লজেন্‌জুসগুলো কড়মড় করে চিবতে লাগল। তার পর খাওয়া শেষ হলে বলল, শিগ্‌গির খাবার দে। খিদে পেয়েছে। না দিলে তোদের কেটে খেয়ে ফেলব। জানিস, আমি ভোলা ডাকাত !

ভুতো বলল, তোমার জন্যই তো খাবার আনতে যাচ্ছি। তুমি লক্ষ্মী হয়ে পাঁচকড়িমামার কাছে গল্প শোনো। ততক্ষণে আমি খাবার কিনে আনি।

ইস্‌! মামা! বললেই হল কিনা! আমার মামা অমন শুঁটকো নাকি? শিগ্‌গির-শিগ্‌গির তুই খাবার কিনে আন। আমি ততক্ষণ এর সঙ্গে ঘোড়া-ঘোড়া খেলি। এই শুঁটকো, হামা দিয়ে বোস, আমি তোর পিঠে চড়ব। যতক্ষণ না খাবার আসে ততক্ষণ আমাকে পিঠে করে ঘুরে বেড়া।

এই বলে, বেশ শক্ত দেখে একটা ছপ্‌টি জোগাড় করে সুবোধ এগিয়ে এল।

কাতরস্বরে পাঁচকড়ি ভুতোর কানে কানে বলল, ভুতো ভাই। চিঠিটা দিয়েই তুই দৌড়ে চলে আসিস। একা থাকতে আমার ভয় করছে।

বলে শুকনো মুখে সে হামা দেবার ভঙ্গিতে ঘোড়া হয়ে বসল। সুবোধ চক্ষের নিমেষে তার পিঠে সোয়ার হয়ে বলল, হ্যাট-হ্যাট—

যাবার আগে ভুতোকে পাঁচকড়ি বলল, দোহাই তোর ভুতো, চিঠিতে পাঁচ হাজার কেটে আড়াই হাজারও করিস না। দু-হাজার কর। এর জন্যে দু-হাজার পেলেই যথেষ্ট।

চিঠিটা কায়দা করে সুবোধের বাবার বাড়িতে ফেলে বাজার করে ফিরতে ভুতোর বেশ খানিকটা দেরি হল। মাথার ওপর চড়চড়ে রোদ্দুর, গলদঘর্ম হয়েই ফিরল ভুতো। ফিরে দেখে বাড়িটায় কেউ নেই; না পাঁচকড়ি, না সুবোধ। কয়েকবার ভুতো তাদের নাম ধরে ডাকল। কোনো সাড়া নেই। অগত্যা একাই সে খাবার-দাবার বার করে খেতে শুরু করে দিল।

মিনিট পনেরো পরে দেখা গেল সামনের জঙ্গল ঠেলে পাঁচকড়ি বেরিয়ে আসছে। জামা-কাপড় ছেঁড়া, চোখ-দুটো টকটকে লাল, হাত-পা ছড়ে গেছে, ঘামে একেবারে সপসপে হয়ে ভিজে গেছে। তবু তার মুখে একটা প্রশান্ত মধুর হাসি। অনেক দিন রোগে ভোগবার পর জ্বর ছাড়লে লোকের মুখের চেহারা যেরকম হয় অনেকটা সে-রকম। পাঁচকড়ি ভুতোকে দেখে এগিয়ে এল। সে এগিয়ে আসার পর নিঃশব্দে সুবোধও জঙ্গল ঠেলে এসে দাঁড়াল।

পাঁচকড়ি পিছন না ফিরেই বলতে লাগল, ভুতো! এ ব্যাবসা ছেড়ে দে ভাই, আমাদের মতো দুর্বল জাতের পক্ষে এ ব্যাবসা করা সম্ভব নয়। আমরা বরং চাল-ডাল কিনে মুদির দোকান করি, সেই ভালো।

কেন, কী হল?

হবে আবার কী, ভুতোর সামনে মাটির ওপর বসেই পাঁচকড়ি শুরু করল—তুই চলে যাবার পর থেকে হতভাগা শয়তান তো আমাকে ঘোড়া করে একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। যতবার থেমেছি ততবার ছপ্‌টি চালিয়েছে সে—এই দেখ আমার গায়ে দাগ। ফুলে-ফুলে উঠেছে সমস্ত শরীর। তারপর সে একসময় বলল, এই শুঁটকো, তুই তো ঘোড়া। ঘোড়া ঘাস খায়। তুই তো কই খাচ্ছিস না? তোকে ঘাস খেতে হবে। তা-ও হাসিমুখে সহ্য করলুম। যা খিদে পেয়েছে তাতে ঘাস চিবুতে খুব কষ্ট হচ্ছিল না। তারপর সে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে লাগল: গর্তগুলো একেবারে ফাঁকা কেন? গাছ নড়লে হাওয়া হয়, না হাওয়া দিলে গাছ নড়ে? তুই এমন শুঁটকো তালগাছ হলি কী করে? আকাশের তারাগুলো গরম, না ঠান্ডা? ষাঁড় কী করে ডাকে? ময়না কথা কইতে পারে, কিন্তু বাঁদর আর মাছ কথা কইতে পারে না কেন? কেঁচোর কেন ফণা নেই? কমলালেবু গোল হয় কেন?—ভাই ভুতো, সত্যি বলছি, আমার সহ্যের সীমা একেবারে ভেঙে গেল। কোনো মানুষ এর চেয়ে বেশি অত্যাচার সহ্য করেনি। সেই হতভাগা ছোকরার ঘাড় ধরে টেনে তাকে রাস্তায় নিয়ে গেলুম, তারপর দু-গালে ঠাস-ঠাস করে চড় কষিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে এলুম।

ভুতো শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল, পাঁচকড়ি, তোদের বংশে কারও হার্টের অসুখ ছিল? পাঁচকড়ি বলল, না ভাই, হার্টের অসুখ কারুর নেই, মাঝে মাঝে এর-ওর শুধু সর্দি-কাশি হয়, ম্যালেরিয়া আর ইনফ্লুয়েন্‌জাও কয়েকবার হয়ে গেছে।

—তাহলে পেছন ফিরে একবার দেখ—বলল ভুতো। আর পাঁচকড়ি পিছন ফিরে সুবোধকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার কথা গেল ভুলে। তার সমস্ত মুখ থেকে রক্ত যেন জল হয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল।

* * *

রাত্রি প্রায় বারোটা। সেই অশ্বত্থগাছটায় সন্ধে থেকেই ভুতো চড়ে বসে আছে। দেখা গেল কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক সাইকেল থেকে নেমে টর্চ জ্বালিয়ে গুঁড়ির সেই গর্তটা খুঁজে তার মধ্যে একটি চিঠি ফেলে চলে গেল।

লোকটা চলে যাবার পর আরও আধঘণ্টা ভুতো নামল না। তারপর যখন নিঃসন্দেহ হল কেউ কোথাও নেই, নিঃশব্দে নেমে চিঠিটা বার করে সোজা চলে এল সেই কুঁড়েঘরটায়। ছেলেটা দিব্যি আরাম করে ঘুমোচ্ছে বটে, কিন্তু পাঁচকড়ি ঠায় জেগে বসে রয়েছে। মোমবাতির আলোয় তারা চিঠিটা পড়ল :

সবিনয় নিবেদন,

আমার মতে সুবোধের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে আপনারা একটু বেশিই চেয়েছেন। আমি আপনাদের নিকট পালটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনারা যদি আজ রাত্রের মধ্যেই সুবোধকে ফিরিয়ে দিয়ে যান এবং সেই সঙ্গে নগদ আড়াইশো টাকা দেন তবেই আমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নেব। আমার সন্তানের সঙ্গে আশা করি ইতিমধ্যে আপনাদের পরিচয় নিবিড় রয়েছে। সে-কারণেই মনে করি আমার এই প্রস্তাব আপনারা উপেক্ষা করবেন না।

ইতি—

বশংবদ

শ্রীবরদাভূষণ পাইন

ভুতো উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। পাঁচকড়ি তার হাত ধরে বলল, ভাই ভুতো, আড়াইশো টাকা তো ? তার বেশি তো নয় ? ভগবানের কী দয়া, আমাদের কাছে এখনও ওই টাকা রয়েছে। ভাই ভুতো, আর কথা বাড়াসনি। এ সুযোগ হেলায় হারাসনি। এখনই চল।

ভুতো খানিক গুম হয়ে বসে কী সব ভাবল, তারপর বলল, ঠিকই বলেছিস। এ সুযোগ হারানো ঠিক হবে না। ছেলেটাকে তোল।

ঘুম থেকে উঠে সুবোধ কিন্তু একেবারে বেঁকে বসল—কখনও বাড়ি যাব না। তুই যেমন মোটকা ভুতো, তোর বুদ্ধিটাও সে-রকম মোটা। বাড়িতে কে আমাকে রাতদিন লজেন্‌জুস দেবে ? কে ঘোড়া হয়ে পিঠে চাপিয়ে বেড়াবে ? কে গল্প বলবে ? বাড়িতে গেলেই তো মাস্টারমশাই আসবে, বাবার বেত লকলক করবে ! বাড়ি যেতে হয় তোরা যা, আমি কিছুতেই যাব না।

অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে, অনেক মিথ্যে কথা বলে শেষপর্যন্ত সুবোধকে বাড়ি যেতে রাজি করানো গেল। তাকে বলা হল তার বাবা সত্যি সত্যিই তার জন্য একটা বন্দুক কিনে এনেছে। বন্দুকের কথা শুনে সুবোধ তবু খানিকটা ভিজল। তারপর বলল, শুঁটকোর ঘাড়ে উঠে যাব না। মোটকার ঘাড়ে চড়ে যাব। ঘোড়ায় পিঠে চড়ে এসেছি, হাতির পিঠে চড়ে ফিরব।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় তারা তিনজন বাড়ি ফিরল। সুবোধের বাবা তাদের অপেক্ষাতেই জেগে ছিলেন। সুবোধকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ভুতো হাঁপাতে লাগল আর পাঁচকড়ি তাড়াতাড়ি করে গুনে দিল নগদ আড়াইশো টাকা।

সুবোধ যখন বুঝল, পাঁচকড়ি আর ভুতো তাকে রেখে চলে যাবে আর দেখল বন্দুক-টন্দুক সব বাজে কথা, চোখের নিমেষে সে ভুতোকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল। এতটা পথ তাকে কাঁধে করে এনেই ভুতোর যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। সে কাতরস্বরে সুবোধের বাবাকে বলল, আমরা আমাদের কথা রেখেছি, এবার আপনি আপনার কথা রাখুন।

—নিশ্চয়ই—বললেন সুবোধের বাবা। তারপর অমানুষিক শক্তিতে সুবোধকে ভুতোর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন।

মুক্তি পেয়ে ভুতো প্রশ্ন করল, কতক্ষণ ওকে ধরে রাখতে পারবেন ?

—আমার শরীরের শক্তি ক্রমশ কমে আসছে,—বললেন, সুবোধের বাবা,—তবু মনে হয় মিনিট দশেক আটকে রাখতে পারব।

—যথেষ্ট,—ভুতো বলল,—দশ মিনিটে আমি পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে যাব।

বলেই ভুতো দৌড় দিল। তার পিছন-পিছন ছুটল পাঁচকড়ি। ইস্কুলের স্পোর্টসে পাঁচকড়ি বরাবর দৌড়ে প্রথম হয়েছে আর মোটা বলে ভুতো কখনও ভালো দৌড়তে পারেনি। কিন্তু সেদিন শিলিগুড়ির ভোরবেলাকার আলোয় একটা আশ্চর্য কাণ্ড দেখা গেল। হাওয়ার আগে ভুতো দৌড়চ্ছে, তার মোটা শরীর যেন হালকা পালক হয়ে গেছে। আর খানিকটা পিছনে দৌড়চ্ছে পাঁচকড়ি। পাঁচকড়ি তাই বলে আস্তে দৌড়চ্ছিল না। যে-কোনো ভালো রেসের ঘোড়া তার সঙ্গে সেদিন পারত না।

কুট্টিমামার হাতের কাজ
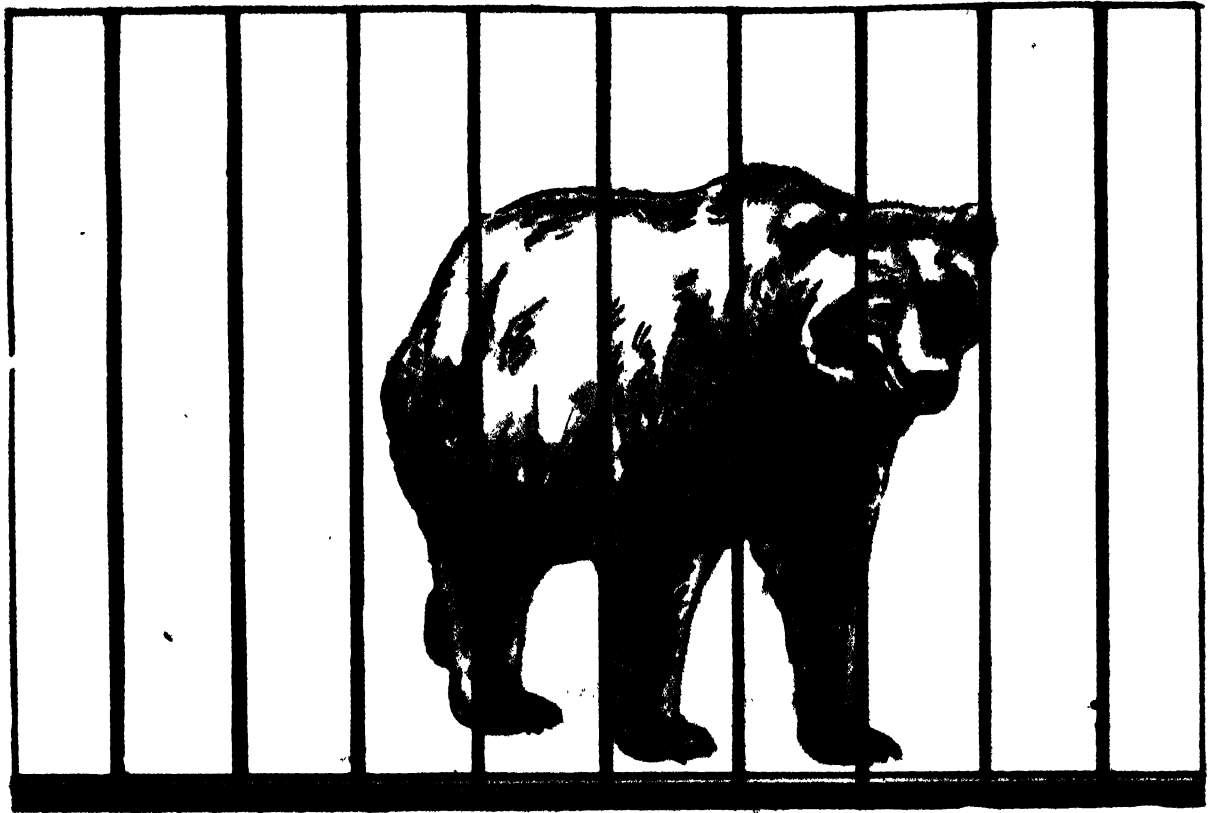
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চিড়িয়াখানার কালো ভালুকটার নাকের একদিক থেকে খানিকটা রোঁয়া উঠে গেছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের পটলডাঙার টেনিদা বললে, বল তো প্যালা—ভালুকটার নাকের ও-দশা কী করে হল ?

আমি বললাম, বোধহয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে, তাই।

টেনিদা বললে, তোর মুন্ডু !

—তাহলে বোধহয় চিড়িয়াখানার লোকেরা নাপিত ডেকে কামিয়ে দিয়েছে। মানুষ যদি গোঁফ কামায়, তাহলে ভালুকের আর দোষ কী ?

—থাম্ থাম্—বাজে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিসনি।—টেনিদা চটে গিয়ে বললে : যদি এখন এখানে কুট্টিমামা থাকত, তাহলে বুঝতিস সব জিনিস নিয়েই ইয়ারকি চলে না।

—কে কুট্টিমামা ?

—কে কুট্টিমামা ?—টেনিদা চোখদুটোকে পাটনাই পেঁয়াজের মতো বড়ো বড়ো করে বললে : তুই গজগোবিন্দ হালদারের নাম শুনিসনি ?

—কখনও না—আমি জোরে মাথা নাড়লাম : কোনোদিনই না। গজগোবিন্দ ! অমন বিচ্ছিরি নাম শুনতে বয়ে গেছে আমার।

—বটে ! খুব যে তড়পাচ্ছিস দেখছি। জানিস আমার কুট্টিমামা আস্ত একটা পাঁটা খায় ? তিন সের রসগোল্লা ফুঁকে দেয় তিন মিনিটে ?

—তাতে আমার কী ? আমি তো তোমার কুট্টিমামাকে কোনোদিন নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি না ! প্রাণ গেলেও না।

—তা করবি কেন ? অমন একটা জাঁদরেল লোকের পায়েব ধুলো পড়বে তোর বাড়িতে—অমন কপাল করেছিস নাকি তুই ? পালা-জ্বরে ভুগিস আর শিঙি মাছের ঝোল খাস—কুট্টিমামার মর্ম তুই কী বুঝবি র‍্যা ? জানিস, কুট্টিমামার জন্য ভালুকটার ওই অবস্থা ?

এবারে চিন্তিত হলাম।

—তা, তোমার কুট্টিমামার এ সব বদ-খেয়াল হল কেন ? কেন ভালুকের নাক কামিয়ে দিতে গেল খামকা ? তার চাইতে নিজের মুখ কামালেই তো ঢের বেশি কাজ দিত !

—চুপ কর প্যালা, আর বাজে বকালে রদ্দা খাবি—টেনিদা সিংহনাদ করল। আর তাই শুনে ভালুকটা বিচ্ছিরি রকম মুখ করে আমাদের ভেংচে দিলে।

টেনিদা বললে, দেখলি তো ? কুট্টিমামার নিন্দে শুনে ভালুকটা পর্যন্ত কেমন চটে গেল !

এবার আমার কৌতূহল ঘন হতে লাগল।

—তা ভালুকটার সঙ্গে তোমার কুট্টিমামার আলাপ হল কী করে ?

—আরে সেইটেই তো গল্প। দারুণ ইন্টারেস্টিং।—হুঁ হুঁ বাবা, এসব গল্প এমনি শোনা যায় না—কিছু রেস্ত খরচ করতে হয়। গল্প শুনতে চাস—আইসক্রিম খাওয়া।

অগত্যা কিনতেই হল আইসক্রিম।

চিড়িয়াখানার যেদিকটায় অ্যাটলাসের মূর্তিটা রয়েছে, সেদিকে বেশ ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা এসে বসলাম। তারপর সারসগুলোর দিকে তাকিয়ে আইসক্রিম খেতে খেতে গল্প শুরু করল টেনিদা।

আমার মামার নাম গজগোবিন্দ হালদার। শুনেই তো বুঝতে পারছিস, ক্যায়সা লোক একখানা। খুব তাগড়া জোয়ান ভেবেছিস বুঝি ? ইয়া ইয়া ছাতি—অ্যায়সা হাতের গুল ? উঁহু মোটেই নয়। মামা একেবারে প্যাঁকাটির মতো রোগা—দেখলে মনে হয় হাওয়ায় উলটে পড়ে যাবে। তার ওপর প্রায় ছ-হাত লম্বা—মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, দূর থেকে ভুল হয় বুঝি একটা তালগাছ হেঁটে আসছে। আর রং ? তিন পোঁচ আলকাতরা মাখলেও অমন খোলতাই হয় না। আর গলাব আওয়াজ শুনলে মনে করবি—ডজনখানেক নেংটি ইঁদুব ফাঁদে পড়ে চিঁ চিঁ করছে সেখানে।

সেবার কুট্টিমামা শিলিগুড়ি স্টেশনের রেলওয়ে রেস্তোরাঁয় বসে বসে দশ প্লেট ফাউলকারি আর সের তিনেক চালের ভাত খেয়েছে, এমন সময় গোঁ গোঁ করে একটা গোঙানি। তারপরেই চেয়ার-ফেয়ার উলটে একটা মেমসাহেব ধপাস করে পড়ে গেল কাটা কুমড়োর মতো।

হই-হই-রই-রই ! হয়েছে কী, জানিস ? চা-বাগানের একদঙ্গল সায়েব-মেম রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছিল তখন। মামার খাওয়ার বহর দেখে তাদের চোখ তো উলটে গেছে আগেই, তারপর আর দশ প্লেট খাওয়ার পরে মামা যখন আরও দু-প্লেটের অর্ডার দিয়েছে, তখন আর সইতে পারেনি।

—ও গড ! হেল্প মি, হেল্প মি—বলে তো একটা মেম ঠায় অজ্ঞান ! আর তোকে তো আগেই বলেছি—মামার চেহারাখানা—কী বলে—তেমন 'ইয়ে' নয় ? মামার চক্ষুস্থির !

দলে গোটা চারেক সায়েব—কাশীর ষাঁড়ের মতো তারা ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা ! কুট্টিমামা ভাবলে, ওরা সবাই মিলে পিটিয়ে বুঝি পাটকেল বানিয়ে দেবে। মামা জামার

ভেতর হাত ঢুকিয়ে পইতে খুঁজতে লাগল—দুর্গানাম জপ করবে ! কিন্তু সে পইতে কি আর আছে, পিঠ চুলকোতে চুলকোতে কবে তার বারোটা বেজে গেছে। ! ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দুটো সায়েব তখন এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রাণপণে দেঁতো হাসি হেসে মামা বললে, 'ইট ইজ নট মাই দোষ স্যার—আই একটু বেশি ইট স্যার—'

কুট্টিমামার বিদ্যে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কিনা, তাও তিনবার ফেল। তাই ইংরিজি এর বেশি আর এগোল না।

তাই শুনে সায়েবগুলো ঘোঁ-ঘোঁ-ঘুঁরু-ঘুঁক-হোয়া-হোয়া করে হাসলে। আর মেমেরা খি-খি-পিঁ-পিঁ-চিঁ-হিঁ করে হেসে উঠল। ব্যাপার দেখেশুনে তাজ্জব লেগে গেল কুট্টিমামার। অনেকক্ষণ হোয়া হোয়া করবার পরে একটা সাহেব এসে কুট্টিমামার হাত ধরলে। কুট্টিমামা তো ভয়ে কাঠ—এই বুঝি হ্যাঁচকা মেরে চিৎ করে ফেলে দিলে ! কিন্তু মোটেই তা নয়, সায়েব কুট্টিমামার হ্যান্ড শেক করে বললে, মিস্টার বাঙালি, কী নাম তোমার ?

কুট্টিমামার ধড়ে সাহস ফিরে এল। যা থাকে কপালে, ভেবে বলে ফেলল নামটা।

—গাঁজা-গাবিন্ডে হ্যাল্ডার ? বাঃ, খাসা নাম। মিস্টার গাঁজা গাবিন্ডে তুমি চাকরি করবে ?

চাকরি ! এ যে মেঘ না চাইতেই জল ! কুট্টিমামা তখন টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার—বাপের, অর্থাৎ কিনা আমার দাদুর বিনাপয়সার হোটেলে রেগুলার খাওয়া-দাওয়া চলেছে। কুট্টিমামা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইল।

সায়েবটা তাই দেখে হঠাৎ পকেট থেকে একটা বিস্কুট বের করে কুট্টিমামার হাঁ করা মুখের মধ্যে গুঁজে দিলে। মামা তো কেশে, বিষম খেয়ে অস্থির। তাই দেখে আবার শুরু হল ঘোঁ-ঘোঁ-হোঁয়া-হোঁয়া-চিঁ-চিঁ-পিঁ-পিঁ—হিঁ-হিঁ। এবারে মেম পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

হাসি-টাসি থামলে সেই সায়েবটা আবার বললে—হ্যালো মিস্টার বাঙালি, আমরা অফ্রিকায় গেছি, নিউগিনিতে গেছি, পাপুয়াতেও গেছি। গরিলা, ওরাং, শিম্পাঞ্জি সবই দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো একটি চিজ কোথাও চোখে পড়েনি। তুমি যদি আমাদের চা-বাগানে চাকরি নাও—তাহলে এক্ষুনি তোমায় দেড়শো টাকা মাইনে দেব। খাটনি আর কিছু নয়, শুধু বাগানের কুলিদের একটু দেখবে আর আমাদের মাঝে মাঝে খাওয়া দেখাবে।

এমন চাকরি পেলে কে ছাড়ে ? কুট্টিমামা তক্ষুনি এক পায়ে খাড়া। সায়েবরা মামাকে যেখানে নিয়ে গেল, তার নাম জঙ্গলঝোরা টি এস্টেট। মংপুর নাম শুনেছিস—মংপু ? আরে, সেই যেখানে কুইনিন তৈরি হয় আর রবীন্দ্রনাথ যেখানে গিয়ে কবিতা-টবিতা লিখতেন ? জঙ্গলঝোরা টি এস্টেটটা তারই কাছাকাছি।

মামা তো দিব্যি আছে সেখানে। অসুবিধার মধ্যে মেশবার মতো লোকজন একেবারে নেই, তাছাড়া চারিদিকেই ঘন পাইনের জঙ্গল। নানারকম জানোয়ার আছে সেখানে। বিশেষ করে ভাল্লুকের আস্তানা। তা, মামার দিন ভালোই কাটছিল। সস্তা মাখন, দিব্যি দুধ, অঢেল মুরগি। তাছাড়া সায়েবরা মাঝে মাঝে হরিণ শিকার করে আনত, সেদিন মামার ডাক পড়ত খাওয়ার টেবিলে। একাই হয়ত একটা সম্বরের তিন সের মাংস সাবাড় করে দিত, তাই দেখে টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দিত সায়েবরা। হোয়া-হোয়া-হিঁ-হিঁ করে হাসত।

জঙ্গলঝোরা থেকে মাইল তিনেক হাঁটলে একটা বড়ো রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে দার্জিলিঙে—বাসও পাওয়া যায় এখান থেকে। কুট্টিমামাকে বাগানের ফুট-ফরমাস খাটবার জন্যে প্রায়ই দার্জিলিঙে যেতে হত।

সেদিনও মামা দার্জিলিং থেকে বাজার নিয়ে ফিরছিল। কাঁধে একটা বস্তায় সের তিনেক শুঁটকি মাছ, হাতে একরাশ জিনিসপত্তর। কিন্তু বাস থেকে নেমেই মামার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

প্রথম কারণ, সন্ধে ঘোর হয়ে এসেছে—সামনে তিন মাইল পাহাড়ি রাস্তা। এই তিন মাইলের দুই মাইলই আবার ঘন জঙ্গল। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুস্থানি চাকর রামভরসার বাস-স্ট্যান্ডে লণ্ঠন নিয়ে আসবার কথা ছিল, সেও আসেনি। মামা একটু ফাঁপরেই পড়ে গেল বইকী।

কিন্তু আমার মামা গজগোবিন্দ হালদার অত সহজেই দমবার পাত্র নয়। শুঁটকিমাছের বস্তা কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে মামা হাঁটতে শুরু করে দিল। মামার আবার আফিং খাওয়ার অভ্যেস ছিল, তারই একটা গুলি মুখে পুরে দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পথ চলতে লাগল।

দু-ধারে পাইনের নিবিড় জঙ্গল আরও কালো হয়ে গেছে অন্ধকারে। রাশি-রাশি ফার্নের ভেতরে ভূতের হাজার চোখের মতো জোনাকি জ্বলছে। ঝিঁ ঝিঁ করে ঝিঁঝির ডাক উঠছে। নিজের মনে রামপ্রসাদী সুর গাইতে গাইতে কুট্টিমামা পথ চলেছে :

নেচে নেচে আয় মা কালী

আমি যে তোর সঙ্গে যাব—

তুই খাবি মা পাঁঠার মুড়ো

আমি তোর প্রসাদ পাব !

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিল তখন। হঠাৎ মামার চোখে পড়ল, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক সেই বনের ভেতর বসে কোঁ কোঁ করছে।

আর কে ! ওটা নির্ঘাৎ রামভরসা !

রামভরসার ম্যালেরিয়া ছিল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে জ্বর এসে পড়ত। কিন্তু ওষুধ খেত না—এমনকী, এই কুইনিনের দেশে এসেও তার রোগ সারাবার ইচ্ছে ছিল না। রামভরসা তার ম্যালেরিয়াকে বড্ড ভালোবাসত। বলল, উ আমার বাপ-দাদার ব্যারাম আছেন। উকে তাড়াইতে আমার মায়া লাগে।

কুট্টিমামার মেজাজ যদিও আফিংএর নেশায় বুঁদ হয়েছিল, তবু রামভরসাকে দেখে চিনতে দেরি হল না। রেগে বললে, তোকে না আমি বাস-স্ট্যান্ডে যেতে বলেছিলুম ? আর তুই এই জঙ্গলের মধ্যে বসে কোঁ কোঁ করছিস ? নে-চল—

গোঁ গোঁ আওয়াজ করে রামভরসা উঠে দাঁড়াল। কুট্টিমামা নাক চুলকে বললে, ইঃ, গায়ের কম্বলটা দ্যাখো একবার ! কী বদখৎ গন্ধ ! কোনোদিন ধুসনি বুঝি ? শেষে যে উকুন হবে ওতে ! নে—চল ব্যাটা গাড়ল। আর এই শুঁটকি মাছের পুঁটলিটাও নে। তুই থাকতে ওটা আমি বয়ে বেড়াব নাকি ?

এই বলে মামা পুঁটলিটা এগিয়ে দিলে রামভরসার দিকে।

—এঃ হাত তো নয়, যেন নুলো বের করেছে ! যাক্, ওতেই হবে।

মামা রামভরসার হাতে পুঁটলিটা গুঁজে দিলে জোর করে।

রামভরসা বললে, গোঁ-গোঁ-ঘোঁক !

—ইস্ ! সায়েবদের সঙ্গে থেকে খুব যে সায়েবি বুলি শিখেছিস দেখছি ! চল্—এবার বাসামে ফিরে কুইনিন ইনজেক্‌শন দিয়ে তোর ম্যালেরিয়া তাড়াব। দেখব কেমন সায়েব হয়েছিস তুই।

রামভরসা বললে, ঘুঁক্ ঘুঁক !

ঘুঁক্ ঘুঁক ? বাংলা-হিন্দি বলতে বুঝি আর ইচ্ছে করে না ? চল্—পা চালা—

কুট্টিমামা আগে-আগে, পিছে-পিছে শুঁটকি মাছের পুঁটলি নিয়ে রামভরসা। মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলে, কেমন থপাস থপাস হাঁটছে রামভরসা।

—উঃ, খুব যে কায়দা করে হাঁটছিস। যেন বুট পরে বড়ো সাহেব হাঁটছেন !

রামভরসা বললে, ঘঁচাৎ !

—ঘঁচাৎ ? চল বাড়িতে, তোর কান যদি কচাৎ করে কেটে না দিয়েছি, তবে আমার নাম গজগোবিন্দ হালদারই নয়।

মাইলখানেক হাঁটবার পর কুট্টিমামার কেমন সন্দেহ হতে লাগল। পেছনে পেছনে থপ থপ করে রামভরসা ঠিকই আসছে, কিন্তু কেমন কচর-মচর করে আওয়াজ হচ্ছে যেন ! মনে হচ্ছে, কেউ যেন বেশ দরদ দিয়ে তেলেভাজা আর পাঁপর চিবুচ্ছে। রামভরসা শুঁটকিমাছ খাচ্ছে নাকি ? তা কী করে সম্ভব ? রামভরসা রান্না করা শুঁটকির গন্ধেই পালিয়ে যায়—কাঁচা শুঁটকি সে খাবে কী করে।

মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল—কিন্তু বিশেষ বোঝা গেল না। একে তো নেশায় চোখ বুজে এসেছে, তার ওপর এদিকে একেবারে চাঁদের আলো নেই, ঘুরঘুটি অন্ধকার। শুধু দেখা গেল, পেছনে পেছনে সমানে থপথপিয়ে আসছে রামভরসা,—ঠিক তেমনই গদাইলস্করি চালে।

পায়ের নিচে পাইনের অজস্র শুকনো কাঁটাওয়ালা পাতা ঝরে রয়েছে। মামা ভাবলে, হয়তো তাই থেকেই আওয়াজ উঠছে এইরকম।

তবু মামা জিজ্ঞেস করলে, কিরে রামভরসা, শুঁটকি মাছগুলো ঠিক আছে তো ?

রামভরসা জবাব দিলে, ঘু-ঘু !

—ঘু—ঘু ? ইস্, আজ যে খুব ডাঁটে রয়েছিস দেখছি—যেন আদত বাস্তুঘুঘু !

রামভরসা বললে, হুঁ-হুঁ।

কুট্টিমামা বললে, সে তো বুঝতেই পারছি। আচ্ছা, চল তো বাড়িতে, তারপর তোরই একদিন কি আমারই একদিন !

আরও খানিকটা হাঁটবার পর মামার বড্ড তামাকের তেষ্টা পেল। সামনে একটা খাড়া চড়াই, তারপর প্রায় আধমাইল নামতে হবে। একটু তামাক না খেয়ে নিলে আর চলছে না।

মামার বাঁ কাঁধে একটা চৌকিদারি গোছের ঝোলা ঝুলত সবসময়ে : তাতে জুতোর কালি, দাঁতের মাজন থেকে শুরু করে টিকে-তামাক পর্যন্ত সব থাকত। মামা জুত করে একখানা পাথরের উপর বসে পড়ল, তারপর কল্‌কে ধরাতে লেগে গেল। রামভরসাও একটু দূরে ওঁৎ পেতে বসে পড়ল—আর ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।

—হুঁ—হুঁ।

—সে তো জানি, তামাকে আর তোমার অরুচি আছে কবে ? আচ্ছা দাঁড়া, আমি একটু খেয়ে নিই, তারপর প্রসাদ দেব তোকে।

চোখ বুজে গোটা-কয়েক সুখটান দিয়েছে কুট্টিমামা—হঠাৎ আবার সেই কচর-মচর শব্দ। শুঁটকিমাছ চিববার আওয়াজ নির্ঘাৎ !—

কুট্টিমামা একেবারে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রাগে ফেটে পড়ল।

—তবে রে বেল্লিক, এই তোর ভণ্ডামি ?—শুঁটকিমাছ হাম ছুঁতা নেই, রাম রাম !—দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে ! বলেই হুঁকো-টুকো নিয়ে মামা তেড়ে গেল তার দিকে। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, জ্বলজ্বলে একটা চাঁদ দেখা গেল সেখানে। একরাশ ঝকঝকে দাঁত বের করে রামভরসা বললে, ঘোঁক ঘরর্—ঘরর—

আর যাবে কোথায় ! হাতের আগুনসুদ্ধ হুঁকোটা রামভরসার নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে 'বাপরে-গেছিরে'—বলে কুট্টিমামার চিৎকার। তারপরেই ফ্ল্যাট, একদম অজ্ঞান।

রামভরসা নয়, ভালুক ! আফিং-এর ঘোরে মামা কিচ্ছুটি বুঝতে পারেনি। ভালুকের জ্বর হয় জানিস তো ? তাই দেখে মামা ওকে রামভরসা ভেবেছিল ! গায়ের কালো রোঁয়াগুলোকে ভেবেছিল কম্বল। আর শুঁটকিমাছের পুঁটলিটা পেয়ে ভালুক বোধহয় ভেবেছিল এও তো মজা মন্দ নয়। সঙ্গে সঙ্গে গেলে আরও বোধহয় পাওয়া যাবে। তাই খেতে খেতে পেছনে আসছিল। খাওয়া শেষ হলেই মামার ঘাড় মটকাত। কিন্তু ঘাড়ে পড়বার আগেই নাকে পড়ল টিকের আগুন ! ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে ভালুক তিন লাফে পগার পার !

বুঝলি প্যালা—ওইটেই হচ্ছে সেই ভালুক !

গল্প শুনে আমি ঘাড় চুলকোতে লাগলুম।—' ওইটেই যে সেই ভালুক—বুঝলে কী করে ?

—হুঁ-হুঁ, কুট্টিমামার হাতের কাজ, দেখলে কি ভুল হওয়ার জো আছে ? আরে-আরে, ওই যে ডালমুট যাচ্ছে। ডাক—ডাক, শিগ্‌গির ডাক—।
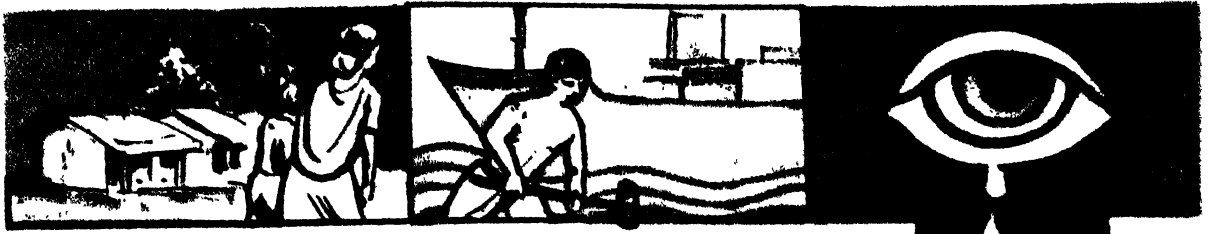
ছেলেটার নাম পাড়ু। পাড়ুর বাপ একদিন রাত্রে ফিরল খুব খুশি হয়ে। কী ব্যাপার ? না, চাকরি পেয়েছে সে। ওই যে ক্রোশখানেক হেঁটে গেলে, জাহাজ তৈরি করবার যে কারখানাটিতে যাওয়া যায়, সেই কারখানায় মজুরের কাজ পেয়েছে। এইবার ফ্যানের বদলে পুরোপুরি ভাতই জুটবে সকলের।

কালো আর পুরোনো একটা লম্বা প্যান্ট জোগাড় করে নিয়ে এসেছে ওর বাপ। ঘরে তেল নেই যে আলো জ্বালাবে। তাই একটু হেঁটে গিয়ে রাস্তার ধারের সরকারি আলোর নিচে বসে ওর বাপ আর মা পালাক্রমে সেই প্যান্টে ছুঁচ-সুতো দিয়ে তালি দিতে থাকে। পাড়ুর চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেছে, সে বড়ো বড়ো চোখ মেলে বাপের গল্প শুনছে একমনে। ওই যে ক্রোশখানেক দূরে 'পট্‌নম্' (বন্দর) আছে, যার কিনারায় জাহাজ-তৈরির কারখানাটা তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে সমুদ্র আর কতটুকু দূরেই বা ? একবার 'পঙ্গল' (পৌষ-সংক্রান্তি)-এর মেলা উপলক্ষে পাড়ু তার বাপ-মায়ের সঙ্গে গিয়ে শহর দেখে এসেছিল, সমুদ্র দেখে এসেছিল।

ছেলে বললে—জাহাজে কী হল, বলো না বাবা ?

বাপ হেসে বললে, মা-র দিকে তাকিয়ে,—দেখলে তো? ছেলের নেশা ধরে গেছে জাহাজের গল্পে। হবে না? জাহাজির ব্যাটা—জাহাজি! কিন্তু, ব্যাটা, আমার মতো তাগড়াই করা চাই শরীরটাকে, বুঝলি?

পাড়ুর বাপের স্বাস্থ্যটা দেখবার মতোই ছিল বটে। লম্বা-চওড়া—শক্তসমর্থ চেহারা—ভালো খেলে—ভালোভাবে থাকতে পারলে আরও কত সুন্দর হত কে জানে! পাড়ুর মা স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে কথাই ভাবছিল। সরদারকে দিয়ে-থুয়ে হপ্তা-হপ্তা যা আসে, তার সঙ্গে তার নিজের ঘুঁটে-বেচা পয়সা, কি ছ-বছরের ওইটুকু ছেলে পাড়ুর ছাগল-চরানো পয়সা, এসব যোগ করেও ভরপেট খাওয়া জোটে না। তাদের আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে!

ছেলে বললে,—জাহাজের গল্প বলো।

বাপ বললে—জাহাজের কারিগরদের কুলি দরকার হয় তো? পাঁচ/ছ-জন কুলি ওদের দরকার হয়ই। বাকি কুলি সব যায় কারখানার আলাদা আলাদা জায়গায়,—কেউ মাল বইছে—কেউ বোল্টু জড়ো করছে।

মা বললে—বোল্টু কী?

বাপ আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে,—বোল্টুই যদি না বুঝলে, তো, জাহাজের বুঝলে কী?

—বলো না তুমি? আমি মেয়েছেলে—আমি কী অত জানি?

বাপ একটা বিড়ি ধরিয়ে, তাতে সজোরে একটা টান দিয়ে, তারপরে বললে,—কারখানার ভিতরে যন্ত্র আছে, তাতে নানান সাইজের বোল্টু তৈরি হয়। কী রকম জানো? ধরো, খুব মোটা মোটা লোহার পেরেক, কেমন? আমার বুড়ো আঙুলের চেয়েও মোটা, পেরেকের মাথাটা যেমন গোল, এর মাথাটা অনেকটা গোলই বটে কিন্তু ঠিক পেরেকের মতো নয়। দেখে মনে হয়, ঠিক যেন টুপি বসানো। আমি দিন দুই বোল্টু জড়ো করার কাজ করছিলাম, যন্তর থেকে ছিট্‌কে-পড়া বোলটুগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জড়ো করে রাখতে হয় এক জায়গায় স্তূপাকার করে। কাজ মন্দ নয়, কিন্তু জাহাজ-তৈরির কাজের কাছে ওই কাজ—ছোঃ। ওই যে, বললাম, পাঁচ/ছ-জন লোক রোজ ওরা নেয় জাহাজের কাজে,—আমি ঠিক তাদের মধ্যে ঢুকে যাই।

ছেলে বললে,—জাহাজ তৈরি হয়ে যাবার পর জাহাজটা কোথায় যাবে?

—কথা শোনো ছেলের!—বাপ বললে,—কোথায় আবার যাবে! দেশ-বিদেশ ঘুরবে—সমুদ্রে-সমুদ্রে!

মা বললে—ওই জাহাজটা! তোমরা যেটা তৈরি করছ?

বাপ বললে,—হ্যাঁ, আমরা যেটা তৈরি করছি।

ছেলে আর তার মায়ের প্রশ্নই শুধু নয়, ছেলের বাপের মনেও সবসময় নানান জিজ্ঞাসা পাক খেকে বেড়ায় জাহাজের কাছে থাকতে থাকতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে প্রত্যেকটা জিনিস জেনে নেয় কাজের ফাঁকে-ফাঁকে। আর, কাজ-পাগলা লোক বলে কেউ বেজার হয় না ওর কথায়, ওকে বরং ভালোইবাসে সবাই। ওকে দিয়ে বাড়তি কাজও করিয়ে নেয় তারা। তা করিয়ে নিক, জাহাজ যারা তৈরি করছে, তাদের দেশের প্রথম জাহাজ,—তাদের মধ্যে সে নিজেও তো একজন,—পাড়ুর বাপের আত্মপ্রসাদ হচ্ছে এইখানে।

—তারপর কী হল, বাবা?

রোজ সন্ধ্যার পর চান-টান করে সে যখন তার ঝুপড়ির সামনে চাটাই পেতে বসে, তখন তার ছেলে এই সব প্রশ্ন করে, আর, তার কানে যেন কেউ মধু ঢেলে দেয়। মুখে সে বলে,—'কথা শোনো ছেলের'—কিন্তু, মনে মনে যে কত খুশি হয়, তা বলার নয়। তখন সে ভুলে যায় তার উদয়াস্ত খাটুনির কথা, ভুলে যায় কুলি-সরদারকে দৈনিক রোজগার থেকে ভাগ দেওয়ার কথা, ভুলে যায় প্রচণ্ড অভাবের কথা। এত খেটেও সে যা পায়,—তাতেও রোজকার খাবার খরচ ভালোমতো জোটে না। ভালোমতো না জুটুক, কিছুটা তো জুটছে,—এইতেই হবে। তারপর সে যদি কোনোদিন কারিগরদের খোশামোদ করে, কী সাহেবদের হাতে-পায়ে ধরে জাহাজে চড়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়তে পারে, তো ব্যস্,—আর কী চাই? লেখাপড়া-জানা লশকরও তো জাহাজে থাকে? তাদের দিয়ে ছেলের কাছে চিঠি লিখবে,—বাবা, আমি অমুক দেশে আছি। তোর জন্য জামা কিনেছি। শীতে এবার তোর কষ্ট হবে না। তোর মাকে দেখিস। তার জন্য খুব সুন্দর কম্বল কিনেছি একটা। তোর শরীরটা মজবুত করবি, বড়ো হয়ে আমার মতো 'জাহাজি' হবি তুই,—'জাহাজি লশকর'! কত মানুষ দেখবি, কত দেশ ঘুরবি। সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর মতো মজা কী আর আছে?

—কই বাবা, বলো? চুপ করে রইলে যে?

চমক ভাঙল পাড়ুর বাবার। চাটাইয়ের কাছেই — রাস্তার আলোয়—তিনখানা ইট সাজিয়ে উনুন ধরিয়েছিল পাড়ুর মা কাঠকুটো দিয়ে। তাতে, মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটছিল এতক্ষণ টগবগ করে। ফোটা ভাতের একটা গন্ধ আছে, সেই গন্ধ নাকে এসে লেগে খিদেটা বেশ বাড়িয়ে তুলছিল। কিন্তু এবার যে গন্ধটা পেল, তাতে খিদেটা আরও চনমন না করে উঠে পারেই না। একটু এগিয়ে এসে তাকিয়ে দেখে, শালপাতায় কিছু কুচোচিংড়ি রয়েছে। সেই মাছ পাতায় মুড়ে—তিন ভাগে ভাগ করে তিনটি পাতায় মুড়ে,—পোড়াবার ব্যবস্থা করছে পাড়ুর মা।

সঙ্গে সঙ্গে জিভে জল এল পাড়ুর বাবার। মাছের টুকরো ! ভাত—ভাতের ফ্যান, নুন আর কিছু শাক,—এ জুটলেই তারা বর্তে যায়, তার ওপরে—মাছ ! তবে তো খাবারটা বড়ো জুতসই হবে আজ ! কিন্তু পয়সা পেল কোথায় চিংড়িমাছের ? ঘুঁটে বিক্রি করে বোধহয় কিছু বেশি পয়সাই পেয়েছে আজ পাড়ুর মা।

ছেলে আবার তাড়া দিলে,—বাবা, বলো ?

—কী বলব ?

—জাহাজেব গল্প। জাহাজ কতদূর তৈরি হল ?

বাপ বললে,—দাঁড়া ব্যাটা, খেয়ে নিই আগে। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে।

তাই হল। কিছুক্ষণ পরে, যাকে বলে 'হাঁড়ি-চেঁচে-পুঁছে-খাওয়া',—তাই খেয়ে তিনজনে গোল হয়ে আয়েশ করে বসল পা ছড়িয়ে। তারপরে পাড়ুর বাবা বললে,— জাহাজ যেদিন জলে ভাসবে না, সেদিন নাকি রাজধানী থেকে রাজা আসবে জলে জাহাজ ভাসাতে।

পাড়ুর মা বললে—রাজা মানে ? রাজা তো ইংরেজ ! তবে যে ইংরেজ রাজারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে ?

পাড়ুর বাবা বললে,—কী মুশকিল, আমাদের দেশি রাজা হয়েছে না এখন ?

পাড়ুর মায়ের মনের সংশয় তবু যায় না। ভ্রু-কুঞ্চিত করে বললে,—সেদিন যে শহরের বাবুটি এসে আমাদের ঝুপড়িতে লোকজন জড়ো করে চেঁচিয়ে বললে,—রাজা আর কেউ রইল না, আমাদের 'রাজ' হয়েছে, কারও কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না,—সে কি তবে মিথ্যে ?

ঢোঁক গিলে পাড়ুর বাবা বললে,—মানে—হ্যাঁ— আমিও অমন কথা শুনছি বটে কারখানায় ! না-না— কথাটা মিথ্যে হবে কেন, 'পড়ি-লিখি' বাবুদের কথা কি মিথ্যে হয় ? আমাদের দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে। তবে দেরি হবে। এই যে জাহাজটা তৈরি হচ্ছে, দেরি একটু হচ্ছে না ? সব কাজ করতেই একটু দেরি হয়।

পাড়ুর এসব কথা ভালো লাগছিল না। সে বললে,—জাহাজ-তৈরির গল্প বলো।

বাপ ছেলের দিকে মুখ ফেরাল, তারপর বললে,— একদিন তোকে দেখিয়ে আনব। অনেকটা জায়গা একেবারে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে। শহরে বাবুদের ঘরবাড়ি দেখিসনি ? মন্দির দেখিসনি ? ওদের মেঝেগুলো কীরকম ? আমাদের ঝুপড়ির মেঝের মতো—মাটির ? মোটেই তা নয়। কেমন শক্ত-শক্ত, তাই না ? ওকেই বলে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। তুই ধপাস্ করে পড়ে যা, সিমেন্টে লেগে মাথা ফেটে যাবে একেবারে।

মা বললে,—আহা, কী অলক্ষুনে কথা ! ছেলে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটাবে কেন ?

বাবা বললে,—না—না, কথার কথা বলছি।

ছেলে বললে,—কবে নিয়ে যাবে আমাকে ?

—অমনি তাগাদা শুরু হল।—বাপ বললে,— ঢোকা অত সহজ ? সেপাই দাঁড়িয়ে থাকে কারখানার দরজায়, সরদারের কাছে গেলে লোহার চাকতি আছে, তাতে এক-দুই করে নম্বর দেওয়া থাকে, সেই নম্বর দেখিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। দাঁড়া না, সরদারকে বলে-কয়ে একদিন তোকে নিয়ে যাব।

মা বললে,—আমাকেও নিয়ে চল না, দেখে আসি।

বাপ বললে,—তুমি যে মেয়েছেলে, ঢুকতে দেবে কী ? আচ্ছা, সরদারকে বলে দেখব-খন।

মা বললে,—ছোটো ছেলেকে যদি ঢুকতে দেয় মেয়েছেলেকেও দেবে।

বাপ এবার একটু চিন্তায় পড়ল। কী যেন ভাবলে কিছুক্ষণ, তারপরে বললে,—সে-ও একটা কথা। পাড়ু তো ছোট্ট ছেলে, ওকে ঢুকতে দেবে কী ? পেল্লায় ক্রেনে করে যখন লোহার বড়ো-বড়ো পাতগুলো তুলে একটা জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিয়ে যায়,—তখন আমাদেরই ভয় করে, তোরা দেখলে তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যাবি।

—কেন, ভয় কেন ?

—ভয় নয় ?—বাপ বললে—যদি ফস্‌কে মাথার ওপরে পড়ে ? একেবারে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা।

মা আঁতকে উঠল,—অমন জায়গায় তুমি কাজ কর ?

বাপ আবার হাসল আত্মপ্রসাদের হাসি। বললে,—আমরা জোয়ান মরদ, তাছাড়া কাজ করতে করতে সব জেনে নিয়েছি। ঠিক কায়দা করে সরে দাঁড়াতে হয়। পড়ে যদি পড়ুক না, আমাদের গায়ে তো তখন এসে লাগছে না ! তবে, তোমরা হচ্ছ নতুন মানুষ, তোমরা ওসব দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারবে কেন ?

ছেলে বললে,—লোহার পাত দিয়ে কী করে বাবা ?—কথা শোনো ছেলের !—বাপ বললে,—জাহাজটা তৈরি হয় কীসে ? লোহার পাত দিয়ে নয় ?

ছেলে বললে,—তবে যে তুমি বললে—লোহার পেরেক দিয়ে—সেই যে কী একটা নাম—

বাপ বললে,—বোলটু।

আর তারপরেই মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে,—না গো, তোমার ছেলের বুদ্ধি আছে। ও ঠিক জাহাজি লশকর হবে। কেমন মন দিয়ে সব শোনে !

পাড়ুর মা সস্নেহে ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নেয়, বলে,—বাপের মতো হবি তো ?

ছেলে মাথা নেড়ে জানায়,—হুঁ।

বাপ বললে,—বোলটু দিয়ে জাহাজ হয় না, হয় পাত দিয়ে। বোলটু দিয়ে কী হয় জানিস ? কাঠ দেখেছিস তো ? কাঠের বাক্স ? একটা কাঠের তক্তা আর-একটা তক্তার সঙ্গে জোড়ে কী দিয়ে ? পেরেক দিয়ে, কেমন ? লোহার পাতগুলো জোড়ে ওই বোলটু দিয়ে। তবে লোহা তো ? ভীষণ শক্ত। সেইজন্যে বোলটু ঢোকাবার জন্য ফুটো করে নিতে হয়।

—কেমন করে ফুটো করে ?

বাপ বললে,—লোহা কাটবার কাঠি দিয়ে।

—সে আবার কী ?

বাপ বললে—কারিগররা চোখে পেল্লায় চশমা পরে—কালো কাচ দেওয়া থাকে চোখের কাছটাতে,—আর মুখখানা পাতলা লোহার পাত দিয়ে ঢাকা থাকে মুখোশের মতো। কাঠির আগুন ছিটকে চোখে-মুখে লাগতে পারে তো ? সেইজন্য। হাতে পরে চামড়ার মোটা মোটা হাতমোজা। এইসব পরে নিয়ে হাতে একটা যন্তর তুলে নেয়, তার মুখে লাগায় সাদা একটা বারুদের কাঠি। যন্তরটার সঙ্গে একটা রবারের নল আঁটা থাকে, সেই নলটা আবার পেল্লায় বড়ো একটা লোহার তৈরি বোতলের সঙ্গে লাগানো থাকে।

—লোহার বোতল ?

—হ্যাঁ। তোদের কাচের বোতলের মতোই দেখতে, —তবে, পেল্লায় বড়ো। তাতে নাকি থাকে—গ্যাস। সেই গ্যাস নল দিয়ে এসে ওই কাঠিতে লাগে। ব্যস, তখন কাঠিটা ছোঁয়াও লোহার ওপর,—'ক্রর্-ক্রর্-ক্রব্-ক্রর্'—একটানা একটা শব্দ হতে থাকে, আর দপ্ করে একটা আলো জ্বলে ওঠে ! ওই যে ছেলেরা দেওয়ালির সময় বাজি কেনে না ? যাকে বলে ফুলঝুরি ? গতবার তুমিই তো পাড়ুকে একটা-না-দুটো কিনে দিয়েছিলে মনে নেই ?

মা বললে,—মনে নেই আবার ? ভারি তো দুটো কাঠির মতো জিনিস, দাম নিয়েছিল,—একেবারে পঁচিশ পয়সা !

বাপ বললে,—তাতো নেবেই। মেহনত কী কম ওসব তৈরি করতে ? তা ওই ফুলঝুরির মতো ঝুরি ছিটকে পড়তে থাকে যতই ততই পুড়তে থাকে ওই কাঠিটা।

—কাঠিটাও পোড়ে ?

—হ্যাঁ। অবিকল ওই ফুলঝুরির মতো। পুড়ে পুড়ে লোহাটাকেও পোড়ায়। পুড়িয়ে পুড়িয়ে লোহার পাত কাটো, গর্ত কর, যা খুশি। তবে শক্ত হাতে ধরে থাকতে হবে যন্তরটা, এদিক-ওদিক নড়ে গিয়ে না এবড়োখেবড়ো হয়ে যায় ! তাহলে, সাহেব এসে ভীষণ দাঁতখিঁচুনি দেবে। বাব্বাঃ ! কারিগরদেরও ছেড়ে কথা কয় না !

এমনই রোজ গল্প। রোজ সন্ধের পর ওদের আসর বসে। বাপ, ছেলে আর মা। জাহাজ দিনের পর দিন ধরে কতটা তৈরি হল, বাপ ছেলে আর তার মায়ের কাছে ফিরিস্তি দেয়।

—জানিস ? শান-বাঁধানো চত্বরটাতে আজ বড়ো বড়ো সব কাঠ সাজিয়েছে। শানটা কীরকম করেছে জানিস ? ওপরে-নিচে গড়ানে। খানিকটা উঁচু থেকে ঢালু হয়ে একেবারে জলে গিয়ে মিশেছে।

আর-এক দিন।

—জানিস ? ওই যে বড়ো বড়ো কাঠ সাজিয়েছিল ? তার ওপরে আজকে লোহার পাত বসিয়েছে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সাজিয়ে,—সেগুলো জুড়ে দিয়েছে কারিগররা।

বোলটু দিয়ে নয়, কামাররা যে রকম ঝালাই করে, তেমনই ঝালাই করে, লোহার পাতগুলো অন্য পাতগুলোর মতো নয়, বেশ মোটা মোটা ! কারিগরদের জিজ্ঞাসা করলুম, তারা বললে, এর নাম—পেলেট্।

—পেলেট্ ?—না জিজ্ঞাসা করলে।

বাপ বললে,—শুধু 'পেলেট্' নয়,—'পেলেট্' তো সব লোহার পাতকেই বলে ওরা। এই মোটা পেলেট্গুলোকে বলে,—'কিল-পেলেট্ !'

ছেলেটা বাপের কথা আওড়ালে,—'কিল-পেলেট্' 'কিল-পেলেট !'

মা বললে,—তা এইবার আমাদের দুজনকে নিয়ে চলো ?

বাপ বললে,—জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সরদার বললে, —নিয়ম নেই। বললে,—যেদিন জাহাজটায় রং হয়ে যাবে—জাহাজটার 'ভাসান-যাত্রা' হবে,—রাজধানী থেকে 'দেশি রাজা' আসবে,—সেদিন 'কাঠ' দেবে, সেই 'কাঠ' দরজায় দেখিয়ে তোমরা ভিতরে ঢুকবে !

—কাঠ ?

বাপ বললে,—হ্যাঁ, কাঠ। একটা কাগজের টুকরো, তাতে সব লেখা থাকবে কিনা।

এরপর মাস-তিন-চার ধরে প্রতিদিন জাহাজ তৈরির গল্প শুনেছে মা আর ছেলে। আজ "ট্যাংকি" তৈরি হল! "ট্যাংকি' আবার কী ? বাবা বললে,—ওই যে খোল তৈরি হল না জাহাজের সেই খোলের নিচে জাহাজের মেরুদণ্ডের মতো কী বসিয়েছিল ? কিল-পেলেট্— বলেছিলুম না ? তা ওপরে ছোটো-ছোটো খোপ তৈরি করেছে আগাগোড়া,—জাহাজের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। সেই খোপগুলো ঢেকে দিয়েছে আবার লোহার পাত দিয়ে। মাঝে মাঝে গোল-গোল গর্ত রেখেছে। গর্তের ঢাকনাও আছে। এতে জল থাকবে।

তারপর।

—আজ 'ফল্‌কা' তৈরি হয়ে গেল।

—ফল্‌কা আবার কী ?

—জাহাজ মাল বইবে না ? জাহাজের আগা থেকে শেষ পর্যন্ত দোতলা সব পেল্লায় 'ঘর' তৈরি করেছে ট্যাংকির ওপরে। এক দুই, তিন, চার, পাঁচ। পাঁচটা ফল্‌কা। এক-দুই-চার-পাঁচে মাল বইবে। তিন নম্বরটা খুব ছোটো, তাতেও মাল বইবে বুঝি। আর, ওই যে এক-দুই ফল্‌কা বললুম ? ওর পরে 'তিন' তো ? ঠিক মাঝখানে। ওই তিন নম্বরের লাগোয়া পেল্লায় ঘর হচ্ছে আর একটা—সেখানে এনজিন বসবে। নানারকম কলকবজা বসবে। বয়লট্ বসবে।

—বয়লট্ কী ?

'বয়লট' কী, সে-সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ পাড়ুর বাবা এখনও করতে পারেনি, তাই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললে,—সে একটা ব্যাপার। তবে ওসব এখন বসবে না, জাহাজ জলে ভাসবে, কারখানার জেটিতে এসে লাগবে, তখন দু-তিন-চার মাস ধরে নাকি ওই সব বয়লট্, ইনজিন, কলকবজা ঠিকঠাক হবে।

—তাহলে এখন হচ্ছে কী ?

—জাহাজের খোল। ওপরে—সাহেবদের থাকবার ঘর—এই সব।

একদিন পাড়ুর বাবা এসে বললে,—কী উঁচু হয়েছে জাহাজটা ! নিচু থেকে ওপরে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। আর কী লম্বা ! আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত দু-বার ঘোরাঘুরি করলেই হাঁপ ধরে যায় !

অবশেষে সেই দিনটি এসে পড়ল। সন্ধের পর পাড়ুর বাবা এল, চান করল, খাওয়া-দাওয়া করল, কিন্তু বেশিক্ষণ বসল না বা শুল না, বললে,—কারখানায় যেতে হবে। সারারাত থাকব, রাতের ডিউটি পড়েছে।

মা আর ছেলে এই দিনটির জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল বহুদিন ধরে। রাজধানী থেকে 'দেশি রাজা' আসবে, সঙ্গে তার মেয়ে থাকবে, মেয়ের গায়ের রং নাকি শ্বেতপাথরের মতো,—এমনই ফরসা। দিনের পর দিন ধরে এসব গল্প শুনছে, তারা, কিন্তু কই, তাদের যাবার কথা তো কিছুই বলছে না পাড়ুর বাবা ?

অগত্যা, পাড়ুর বাপ প্যান্ট পরে বিড়ি ধরিয়ে সত্যিই যখন রওনা হল,—তখন আর থাকতে পারল না পাড়ুর মা, বললে,—আমরা যাব না দেখতে ?

পাড়ুর বাবা বললে,—কী করে আর যাবে ? 'কাঠ' পাওয়া গেল না। 'কাঠ' না দেখালে তো ঢুকতে দেবে না ! আজ রাত থেকেই ওখানে পুলিশের লোক গিজগিজ করছে !

পাড়ুর ইচ্ছা হল, ডাক ছেড়ে সে কেঁদে ওঠে ! দিনের পর দিন ধরে জাহাজের গল্প শুনেছে সে আর তার

মা। শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, জাহাজটা সত্যিই বুঝি তাদের। জাহাজের ভাসান-যাত্রাটা দু-চোখ মেলে, তারা একটু দেখতেও পাবে না ! না হয়, দূর থেকেই তারা দেখবে। তারা গরিব মজুরের বউ আর ছেলে, তারা রাজার কাছ দিয়েও যাবে না,—দূর থেকে একটু দেখতে পেলেই খুশি। না-না রাজাকে দেখতে চায় না, রাজার ধবধবে ফরসা মেয়েকেও দেখতে চায় না তারা। তারা দেখতে চায় শুধু সেই বিরাট জাহাজের চেহারাখানি, যার নিচে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়,—যার পাশাপাশি আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত দু-বার হাঁটলে হাঁপ ধরে যায় ! তারা দেখতে চায় শুধু তাদের দেশের সেই প্রথম-তৈরি-করা জাহাজটাকে, যার সঙ্গে পাড়ুর বাপের প্রতিদিনের শ্রম, প্রতিদিনের স্বপ্ন আর আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে আছে !

মা জিজ্ঞাসা করেছিল,—জাহাজ-তৈরি তো শেষ, আজ রাতে আর কাল সকালে তুমি কী করবে ?

বাপ বলেছিল,—রাত জেগে জাহাজের বাইরেটা রং করছে রং-করবার লোকেরা। সরদার আমাদের মধ্য থেকে দশজন তাগড়াই লোক নিয়েছে বেছে।—আমরা রং করার সময় জাহাজের এটা-ওটা সরাব, হাতুড়ি নিয়ে ঠুকব। পেল্লায় একটা হাতুড়ি দিয়েছে আমাকে। ঠোকবার কত-কী জিনিস আছে না ? অত বড়ো জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে শান-বাঁধানো মাটির ওপরে, এখানে বড়ো বড়ো কাঠ দিয়ে ঠেকা দেওয়া, ওখানে লোহার দড়ি দিয়ে বাঁধা। নইলে, কাত হয়ে পড়লে—অত লোক সব চিঁড়ে-চ্যাপটা হবে যে ! আমরা আছি হাতুড়ি নিয়ে সেই সব কাঠের গোঁজ ঠিকঠাক করে দেবার জন্য। রং করবার জন্য এখানকার গোঁজ খুলতে হবে ? বেশ, খুলে দিচ্ছি। মারো হাতুড়ি—মারো জোয়ান হেঁই-ও ! গোঁজ খুলল, তেমনই, জাহাজ না টলে পড়ে, সেটাও দেখতে হবে তো ? সরদার বললে,—ওখানে রং হয়ে গেছে। ওখানে এবার গোঁজটা লাগাও। ব্যস্ ! বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে নিলুম, টেনে তুললুম, গোঁজ দাও আবার—লাগাও হাতুড়ির বাড়ি—মারো জোয়ান হেঁই-ও !

মা বললে,—তা বলে, অত বড়ো জাহাজটা নড়ে উঠে জলে ভাসবে কী করে ?

ঠিক এই জিনিসটা পাড়ুর বাপের নিজের মাথাতেও ঢোকেনি।

কিছু দূরে বাঁশের বেড়া দিয়ে একটা জায়গা করা হয়েছে, যেখান থেকে মজুরদের পরিবারের লোকেরা ভাসান-যাত্রা দেখতে পাবে। তবে তাদের জন্য 'কাঠ' চাই। 'কাঠ' দেখাতে হবে কারখানার দরজায়, পুলিশদের কাছে। 'রাজা' আসছেন বোতাম টিপে জাহাজ জলে নামাতে। তিনি বক্তৃতা করবেন, 'মাইক' ঠিক হয়েছে। কত ফুল আর ফুলের মালা আনা হয়েছে। 'রাজা' আসা কি সোজা ব্যাপার ?

সেই 'রাজা আসা' আর 'জাহাজ-ভাসানো' যে পাড়ু শেষপর্যন্ত দেখতে পাবে না, এটা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে রাত্রে বাপ চলে গেল কাজে, আর কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেটা। মা কত বোঝাল। কত বললে,—আমরা সেই 'ফেরি' দিয়ে ওপারে চলে যাব শহরের দিকে ; সেখানকার একটা টিপিতে উঠে দেখব। 'রাজা' দেখতে পাব না অত দূর থেকে, কিন্তু 'জাহাজ'টা তো দেখতে পাব ?

পাড়ুর কান্না তবু থামেনি। কে বুঝবে তার মন ? ছাগল-চরিয়ে-বেড়ানো ছ-বছরের ছোট্ট ছেলে,—তার অভিমানের খবর কে রাখবে কতটুকু ? সে 'জাহাজ' দেখতে চায়নি, রাজা দেখতে চায়নি—তার মন যা একান্তভাবে দেখতে চেয়েছে,—সে হচ্ছে,—তার বাবার রূপ ! ওই যে বলেছিল, পেল্লায় একটা হাতুড়ি কাঁধে নিয়ে তার বাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এখানকার কাঠের গোঁজে ঘা দিচ্ছে, ওখানকার কাঠের গোঁজে হাতুড়ি মারছে,—মারো জোয়ান হেঁই-ও ! কী সুন্দর সুরটা ! তার বাবা তাদের কাছে গল্প করতে করতে যখন হঠাৎ সুর করে বলে উঠত,—'মারো জোয়ান হেঁই-ও !'—তখন, কী-এক অজানা আবেগে ভয়ে উঠত মনটা !

কিন্তু, ছ-বছরের ছেলের এই মানসিক অবস্থা বাইরে থেকে বুঝবে কে ? মা-ই একমাত্র অন্তরঙ্গ আশ্রয় ছেলের কাছে। অথচ, সেই মায়ের কাছেও ছেলে পরিষ্কার করে বলতে পারল না, সে কী চায় সত্যিকারের ! শুধু কান্না আর কান্না !

রাত তখন অনেক। ঝুপড়ির ভিতরে ঘুমন্ত ছেলেকে নিয়ে এসে শুইয়ে দিয়েছে ওর মা। চোখের নিচে শুকিয়ে আছে চোখের জলের রেখা, এখনও মুছে যায়নি। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে মায়ের চোখেও জল এসে গেল। বুকের ভিতরটা অজানা কী-এক ব্যথায় হু-হু করে উঠল মায়ের। ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সাত-পাঁচ কত-কী ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল মা। সেই ঘুম ভাঙল—বলা যায়—প্রায় শেষ রাত্তিরে। ঝুপড়ির ঝাঁপ ঠেলছে পাড়ুর বাপ—আর ডাকছে পাড়ুর নাম ধরে,—পাড়ুর মায়ের নাম ধরে।

শিল্পী : সূর্য রায়

ধড়মড় করে উঠে বসল মা। অবাক হয়ে বললে,—এ কী ! তুমি !

—আগড় খোলো।

আগড়টা খুলতেই হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে এল পাড়ুর বাপ। বুদ্ধশ্বাসে বললে,—পাড়ুকে তোলো। রাত আর বেশি নেই। চাঁদের পাশের তারাটি জ্বলজ্বল করছে, এখুনি ডুবে যাবে।

—কী হয়েছে ?

পাড়ুর বাপ বললে,—তুমিও তৈরি হয়ে নাও। ভোর-ভোর না গেলে দাঁড়াবার ভালো জায়গা পাবে না।

—বলছ' কী ?

পাড়ুর বাপ ততক্ষণে ছেলেকে ডেকে তুলেছে, বলছে,—ওঠ্-ওঠ্—ভাসান দেখবি না ? রাজা আসছে সকালে, বোতাম টিপবে ঠিক সাড়ে সাতটায়। শিগ্‌গির উঠে মুখটুক ধুয়ে নে।

পাড়ু উৎসাহে উঠে বসল, বলল,—যাব !

—হ্যাঁ।

মা বললে,—ঢুকতে দেবে আমাদের ?

বাবা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে,—'কাঠ' পেয়েছি যে ? আমাকে 'কাঠ' না দিয়ে পারে ? সবদারকে পঞ্চাশ পয়সা হাতে গুঁজে দিলুম যে !

—পঞ্চাশ পয়সা ! পেলে কোথায় ?

বাপ বললে,—কী আর করব ? ধার করলুম !

—ধার !

—উপায় কী ?

মা বললে—কিছু খেয়ে যাবে না ? ফ্যান রাখা আছে। 'পান্তো ভাত-মেশানো ফ্যান'।

—দাও, একটু খেয়েই যাই তাহলে।

'ফ্যান' খেতে-খেতে পাড়ুর বাপ একসময় বললে,—জানো ? একটা কথা বলি। কাউকে বোলো না। সরদার চুপিচুপি বলেছে আমাকে। ওই যে বোতাম টেপার কথা বলেছিলাম না ? রাজা বোতাম টিপবে, আর জাহাজ নড়ে উঠে জলে নামবে ? ওটা একদম ধাপ্পা। রাজা বোতাম টিপবে, আর জানবে, তার বোতাম টেপাতেই জাহাজ চলল,—কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। আমরা বিশজন তাগ্‌ড়াই মজদুর পেল্লায় হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। যেই আমাদের সাহেব সবুজ নিশান নাড়বে না ? অমনি আমরা বিশজন মজদুর হাতুড়ির ঘা লাগাব কাঠের গোঁজের ওপব। কাঠের গোঁজ আলগা হবে, আর জাহাজ চলতে থাকবে তরতর করে। আরও একটা ব্যাপার জানো ? কত কাঁদি কাঁদি কলা যে এনেছে তার ঠিক নেই ' সব পাকা কলা ! সেগুলি দলা করে জাহাজ যেখান দিয়ে সর্ সর্ করে যাবে, সেখানটা পিছল করে দিচ্ছে ! কী করে করছে ? না, কলা দিয়ে—দই দিয়ে। বেশ মজা, না ? খাবার জিনিস দিচ্ছে জাহাজকে। জাহাজ যেন ওসব খেয়ে জলে নামছে !

হো হো করে হেসে উঠল বাপ, বললে,—চললাম। সেই সওদাগরের গল্প শুনিসনি ? ছেলেকে সাপ এসে কাটবে লোহার ঘরে ঢুকে,—তাই পেল্লায় হাতুড়ি কাঁধে নিয়ে বাপ পাহারা দিচ্ছে লোহার ঘরেব চারদিকে, আমারও হয়েছে সেই সওদাগরের বেত্তান্ত,—আমাকে দেখে আবার হেসে ফেলিস না যেন ! সারা রাত হাতুড়ি নিয়ে—যে কাজ করতে হবে—তার মহড়া দিলুম যে !

কথার ধরনে মা এবার হেসে ফেলল। বাপ বললে,—মাকে নিয়ে আসিস পাড়ু, কেমন ?

সকাল সাড়ে সাতটা তখন প্রায় বাজে। জাহাজ থেকে খানিকটা দূরে বেশ-কিছুটা জায়গা জুড়ে বাঁশের বেড়া-মতো লাগানো হয়েছে। ভোর-ভোর আসায় একেবারে বেড়ার কাছেই দাঁড়াতে পেরেছে—পাড়ু আর তার মা।

যা দেখে তাতেই অবাক হয়ে যায়—মা। বলে,—বাব্বাঃ ! কত লোক।

মজুবরা জাহাজের পাশাপাশি ঘুরছে—সেখানে ভিড় নেই,—ভিড় পিছন দিকে ; অর্থাৎ জাহাজেব মুখ যেদিকে, সেইদিকে,—জলের উলটো দিকে। সেখানে কাঠের দোতলা পাটাতন হয়েছে, যেখানে চেয়ারের ওপরে বসে রয়েছে বড়ো বড়ো সব সাহেব আর বাবুরা !—তার আশেপাশেই ভিড় হয়েছে বেশি। 'রাজা' বোধহয় ওখানেই আসবেন। ওই পাটাতনে উঠেই মাইকে বক্তৃতা করবেন, জাহাজের গায়ে আস্ত নারকোল ভাঙবেন, টেবিলে-রাখা যন্তরটার বোতাম টিপবেন। তাঁর টেপা দেখে, একজন সাহেব একটু নিচে থেকে সবুজ নিশান দেখাবে, মজুররা হাতুড়ির ঘা মারবে, আর সমস্ত বাঁধন শিথিল করে দিয়ে জলে নামবে, দেশেব তৈরি করা দেশের প্রথম জাহাজ !

পাড়ুর মায়ের চোখ একবার জাহাজ—একবার জল—একবার রাজার পাটাতন—একবার তার স্বামী,—এরই মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু পাড়ুর বিস্ফারিত দুটি

চোখ ঠিক বাপের ওপরে পড়ে রয়েছে। বাপ তাদের দেখতে পেয়ে হাসছে, পেল্লায় হাতুড়িটা ঘাড়ের ওপরে রেখে সেই গল্পের সওদাগরের মতোই ঘোবা-ফেরা করছে। রাজার কাছে সে যেতে পারবে না, রাজাকে সে দেখতে পাবে না,—কিন্তু তাতে তার দুঃখ নেই,—সে একটা জাহাজের গায়ে ঠেশ-দিয়ে-বাখা কাঠের গুঁড়ির দিকে নজর রেখেছে সব সময়,—সবুজ নিশান উড়লেই সে ওখানে ঘা মারবে হাতুড়ি দিয়ে,—জাহাজ চলবে সঙ্গে সঙ্গে ! তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, রাজা বোতাম টিপবে না, সে-ই বোতামটি টিপবে—জাহাজেব এই 'ভাসান-যাত্রা'র্ পর্বে !

—পাড়ু-উ-উ ?

দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে বাপের গলা। আর আহ্লাদে যেন আটখানা হয়ে যায় পাড়ু—চিৎকার করে সাড়া দেয়,—নয়না ? ('বাপ'কে ওদের ভাষায় ওবা 'নয়না' বলে।)

পাশের বুড়ো লোকটি থমকে ওঠে, বলে,—চেঁচাচ্ছ কেন খোকা ?

কিন্তু পাড়ুকে থামায় কে ?

একটু পরেই, রাজার পাটাতনেব কাছে একটা বিবাট কোলাহল শোন যায়। সাহেবরা আর বাবুরা সব দাঁড়িয়ে ওঠে। জাহাজেব পাশেব লোকেরাও ছুটে যায় জলের উলটো দিকে—পাটাতনের কাছে। শুধু 'হাতুড়ি কাঁধে সওদাগব' পাড়ুর বাপ ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে, নড়ে না। সে শুধু হাসিমুখে ফিরে তাকায় তাব স্ত্রী আর পুত্রের দিকে।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে ওঠে—রাজাকে দেখবার চেষ্টা করে। একটা ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারপরেই দেখা যায়, জাহাজের পাশের লোকগুলো যেন তাড়া খেয়ে যে-যার জায়গায় ফিরে গেছে।

মাইকে বক্তৃতা শুরু হল। কিছু বোঝা যায় না। পাশের বুড়োটা তার পাশের বুড়োটাকে জিজ্ঞাসা করে,—কী বলছে ?

একজন 'রাজার ভাষা' খানিকটা বুঝত। বললে,—দেশের ভাবীকালের কথা বলছে। এই জাহাজ জলে ভাসবে, চলতে থাকবে দেশ-বিদেশের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাবীকালও এগিয়ে চলবে সুখের পথে, সমৃদ্ধির পথে !

হঠাৎ এই সময় একটা হই-হই শব্দ হল। বক্তৃতা থেকে গেছে। সাহেবরা হাততালি দিল। 'রাজার ভাষা' যে জানত, সে বললে,—নারকেল ফাটাল। এবার বোতাম টিপবে।

হই-হইটা বাড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কোথায় কখন যে সবুজ নিশান উঠল কে জানে। পাড়ুদের জায়গায় ঠেলাঠেলি বাড়ল। পাড়ু কিন্তু প্রাণপণে বেড়া ধরে আছে। তার চোখ তার বাপের দিকে। ওই যে হাতুড়ি উঠিয়েছে তার বাপ ! মারো জোয়ান, হেঁই-ও ! ওই যে গোঁজটা খুলে গিয়ে গুঁড়িটা পড়ে গেছে। আব সঙ্গে সঙ্গে—ওরে বাব্বাঃ—যেন মাথার ওপরে পাহাড়টা নড়ে উঠল।

মাইকে তখনও বক্তৃতা হচ্ছে। 'রাজার ভাষা' যে বোঝে, সে বললে,—ভাবীকালের কথাই বলছে !

জাহাজটা ততক্ষণে সরসর করে জলে নামতে চলেছে। সেটা দেখবাব জন্য পিছনের সমস্ত লোক সামনেব লোকগুলোকে ঠেলতে লাগল। বাচ্চা ছেলে পাড়ু প্রাণপণে বাঁশের খুঁটিটা ধরে আছে—তাকে নড়ায় কার সাধ্য ? সে বড়ো বড়ো চোখ মেলে দেখছে,—জাহাজটা জলে নামাব সঙ্গে সঙ্গে তাব বাবাও ছুটে চলেছে জলেব দিকে পাগলেব মতো ! আবও লোকজন ছুটছে অমনই করে—জাহাজেব পাশাপাশি। পাড়ুর চোখ তার বাপেব দিক থেকে একটুও ফেরেনি। হঠাৎ সে দেখতে পেল,—লোহার একটা দড়ি ছিঁড়ে গেল। সেই ছেড়া লোহার দড়িতে জড়িয়ে গেল তার বাপের পা। বাপ পড়ে গেল।কিন্তু জাহাজ ততক্ষণে জলে নেমে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে তাব বাপও চলে গেল জলেব মধ্যে।

প্রাণপণে চিৎকাব করে উঠল পাড়ু,—নয়না !

পেছনেব লোকগুলোর চাপে তাব মা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল একপাশে সেই বুড়োটাব পায়ের ওপর। তাড়াতাড়ি উঠে সামলে নিয়ে ছেলেটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে মা। ছেলে তখনও চিৎকার কবছে পাগলের মতো,—নয়না—নয়না !

লোকজনের চিৎকার—হই-হই—ভিড়—তার মধ্যে ওই কচি শিশুব কণ্ঠস্বব কোথায় মিলিয়ে গেল।

জাহাজ জলে নেমে গেছে। সবাই স্বস্তি পেয়েছেন। সাহেবদের মুখে হাসি ফুটেছে। মাইকে বক্তৃতা তখনও চলছে। রাজার ভাষা যে বোঝে, সে বললে,—জাহাজ যেমন বিনা বাধায় এগিয়ে গেল, জাতিও তেমনই যেন বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে পারে,—এই কথা বলছে।

লোকের ভিড় তখন ভিন্ন গতি নিয়েছে। তারা জলেব দিকেব বেড়া চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলে এগিয়ে গেল জাহাজ যে-জেটিতে এসে লাগবে, সেই জেটির দিকে।

।, পাড়ু আর তার মা ?

একে জিজ্ঞাসা করে, তাকে জিজ্ঞাসা করে! তারা বললে,—পাগল নাকি? একটা লোক জাহাজের দড়ির টানে জলে গিয়ে পড়বে, আর আমরা দেখতে পাব না? কেউ পড়েনি। খুঁজে দেখো, সে কাছেই কোথাও আছে।

মা বললে ছেলেকে,—তুই ঠিক দেখেছিলি?

ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বললে,—হ্যাঁ।

জাহাজের জায়গাটা ততক্ষণ চিতা-পুড়ে-যাওয়া শ্মশানঘাটের মতো স্তব্ধ। লোকজন কেউ নেই। দড়ি-দড়া কাঠ-কাঠরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওরা—মা আর ছেলে জলের কিনার পর্যন্ত চলে এল।

ছেলে বললে,—এইখান দিয়ে আমার বাবাকে টেনে নিয়ে গেছে জাহাজের দড়ি।

কিন্তু, কিছুই দেখা গেল না। জাহাজটা তখন অনেক দূরে চলে গেছে—অথই জলে। একটা মোটরবোট তার গায়ে গিয়ে লেগেছে।

মা ছেলেকে নিয়ে ফিরল।

জনে-জনে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারা আবার রেগে গিয়ে বললে—যত মাথাখারাপ এসে জুটেছে। একটা লোক মরে গেল জলে ডুবে, আর কেউ টের পেল না? সাহেবরা ছিল, বড়ো বড়ো বাবুরা ছিল, 'রাজা' নিজে ছিলেন, কেউ দেখতে পেলেন না, যে, একটা লোক জাহাজের দড়ি জড়িয়ে জলে ডুবে গেল—আর শুধু তোমার ছেলেই দেখল? মা-ও সেই কথা বললে ছেলেকে। বললে—ভুল দেখেছিস তুই। বাড়ি চল্। ঠিক সে ফিরে আসবে। ছেলে তবু কাঁদে। কারিগরটিকে সে নিজেই বললে,—দড়ি জড়িয়ে জলে পড়লে কী হয়? আবার উঠতে পারে তো? তবে আমার বাবা আর উঠে আসছে না কেন?

লোকটি বললে,—দড়ি জড়িয়ে সত্যিই যদি পড়ে থাকে তো ওঠবার আশা ছেড়ে দাও। লোহার দড়ি কি কম ভারি নাকি? একেবারে তলিয়ে নিয়ে যাবে। আর গায়ে ও-দড়ি জড়ালে, সে-জট ছাড়িয়ে লোকে উঠবে কী করে? তবে, তুমি ভেব না, একটা লোক জলে পড়ল, আর আমরা কেউ দেখলুম না?

—সবাই রাজা দেখছিল যে।

লোকটি বললে,—কী যে বল! রাজা দেখলে আর মানুষ দেখা যায় না বুঝি? হ্যাঁ মেয়ে, তুমি কী করছিলে তখন?

মা বললে,—ভিড়ের চাপে পড়ে গিয়েছিলুম।

লোকটি বললে,—বাড়ি যাও। ছোটো ছেলে, কী দেখতে কী দেখেছে!

বাড়ি ওরা ফিরে এল। দিন গেল, রাজা গেল, পাড়ুর বাপ আর ফিরল না। আবার পরদিন ওরা বেরুল। ঝুপড়ির লোকদের মধ্যে কেউই ঢুকতে পারেনি ভিতরে, সুতরাং ওরা কেউ কিছু বলতেও পারল না। কিন্তু কারখানার কুলিধাওড়ায় মা আর ছেলে রীতিমতো হাঁটাহাটি শুরু করল। তারা বললে,—আমাদের চোখ কি চোখ ছিল? চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। বাবুদের আর সাহেবদের জিজ্ঞাসা কর।

দিনের পর দিন যায়। সেখানেও এক কথা। একটা লোকের জীবন চলে গেল, আর তা কেউ দেখতে পেল না? কী দেখতে কী দেখেছে তোমার ছেলে।

শুনতে শুনতে শেষপর্যন্ত পাড়ুরই মনে হল, তাই হবে, সে-ই ভুল দেখেছে!

কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে তার বাবা গেল কোথায়? সমুদ্রে না, অন্য কোথাও কাজ খুঁজতে!

* * *

সেই ছ-বছরের ছোটো ছেলেটি আজ বিশ বছরের যুবক। মাকে নিয়ে আজও সে খুঁজে বেড়ায় তরে বাবাকে এ-দেশ থেকে ও-দেশে। ট্রেনে ওঠে। ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয় বিনাটিকিটের যাত্রী বলে। দু-তিনবার হাজতবাসও করেছে। মায়ের তবু আশা যায় না, নিশ্চয়ই সে কোথাও নতুন কাজ খুঁজে পেয়েছে। সে কাজ থেকে ছুটি পায় না, তাই আসতে পাবে না। আর, চিঠি লিখবে? নিজে তো লিখতে পারে না, কাউকে দিয়ে লেখাতে হবে। সে সময়ও কি তার আছে? কাজ আর কাজ! তাকে চিনিস না পাড়ু? যে কাজ-পাগল লোক, কাজ পেলে আর কিছু চায় না।

মায়ের শরীর অকালে ভেঙে পড়েছে, চোখেও ভালো দেখে না। এই অবস্থায় দেশে-দেশে ট্রেনে চড়ে যায়, হাঁটে আর ভিক্ষে করে। চৌদ্দ বছর এই করে কাটিয়েছে। আর, পাড়ু? এই চৌদ্দ বছরের অভিজ্ঞতায় সে অনেক জেনেছে, বুঝেছে অনেক। এখন তার বদ্ধমূল ধারণা,—সে যা দেখেছিল, ঠিকই দেখেছিল। মাকে সে-কথাটা আজও বোঝাতে পারে না, আবার তাকে এই বয়সে নিরাশ করতেও মায়া জাগে। কিন্তু তার নিজের মন? ধীরে ধীরে ইস্পাতের মতোই শক্ত হতে থাকে। তার বাপের মৃত্যুর যারা কিনারাটুকুও করতে পারল না,—তাদের প্রতি একটুও দয়া নেই তার—একটুও মায়া নেই।

ছেমেদিজয়েদা বা তিব্বতি জাদু

নলিনী দাশ

বাবুয়ার জন্মদিনে সে তার কয়েকটি ভাই ও বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিল। খাবার আগে গল্পগুজব, খেলাধুলা হচ্ছে, তার মধ্যে হঠাৎ বাবুয়া বলল, 'জানিস, আমার মাসতুতো ভাই রাজার একটু যৌগিক ক্ষমতা আছে !'

সবাই অবাক হয়ে তাকাল। তমাল বল্ল, 'বাজে কথা !' জ্যোতিপ্রিয় বলল, 'গুল মারিস না !' হীরক দীপক জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি ? সত্যি নাকি রে ?' বিনয় সহকারে রাজা বলল, 'সেরকম কিছু নয়, সামান্য একটু—' তার দাদা রতন বুঝিয়ে দিল, 'আমাদের এক জ্যাঠামশাই তিব্বতি-বাবার ভক্ত, তাঁর কাছেই দু-একটা মন্ত্র শিখেছে।' বাবুয়া বলল, 'রাজা ঘরের বাইরে চলে যাবে, তোরা যে-কোনো একটা তাস ভাববি আর রাজা ফিরে এসে ঠিক বলে দেবে।'
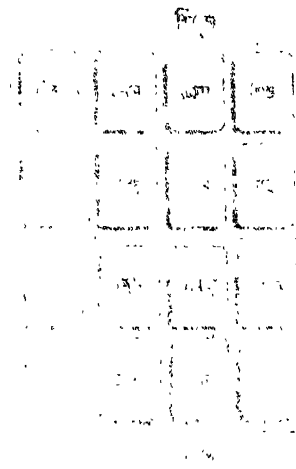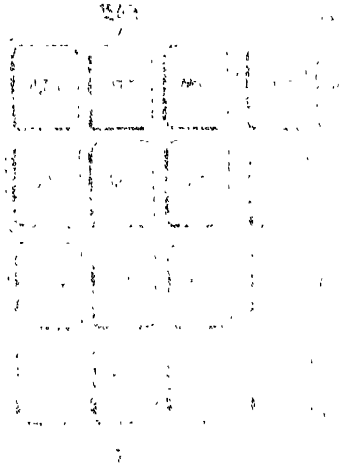
'তাই নাকি ? তাহলে প্রমাণ দেখা !' চ্যালেন্জ করল তপন। রাজা বলল, 'বাবুয়া প্রত্যেকবার আমাকে একটা কথা বলবে—অবশ্য তাসের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কথাটা শুনেই মন্ত্রের সাহায্যে আমি বুঝে নেব বাবুয়া কোন্ তাসটা ভেবেছে।'

রাজা ঘরের বাইরে গেলে বাবুয়া চটপট করে ছ-ভাগে ছ-টা ছ-টা করে বত্রিশটা তাস সাজিয়ে ফেলল।

গাগা বলল, 'আচ্ছা আমি এই চিড়েতনের ছক্কাটা ভাবলাম—এই দ্বিতীয় সারির প্রথম তাসটা। এবার রাজা ঘরে আসতে পারে।'

রাজা ঘরে ফিরে এসে মনোযোগ দিয়ে তাসগুলো দেখতে লাগল। নির্লিপ্তভাবে বাবুয়া বলল, 'পুলিশে রোজ কত ষাঁড় ধরছে জানিস ?' রাজা পকেট থেকে একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বার করে ভালো করে দেখে বলল, 'এই তো চিড়েতনের ছয়টা ভেবেছে'—

'কী করে বুঝলি ?', সুধীরের প্রশ্ন।

হীরকের ছোটো ভাই তিলক বলল, 'নিশ্চয় বাবুয়াদা চোখে চোখ ইশারা করে বলেছে।'

বাবুয়া বলল, 'বেশ, এর পরের বার আমি রাজার দিকে তাকাবই না।'

এবার রাজা বাইরে যেতেই সুমন্ত্র হরতনের গোলাম ভাবল—তৃতীয় লাইনের চতুর্থ তাস।

রাজা ফিরে এসে তাসগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বাবুয়া অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'কলা খেলেই বাবার সাংঘাতিক হাঁচি হয়।'

রাজা তাসগুলো একবার শুঁকে নিল, তারপর বলল, 'হরতনের গোলাম'। সবাই একেবারে অবাক !

ধীমান বলল, 'ও বুঝেছি—ওরা প্রত্যেকটি তাসের জন্য একটা আলাদা বাক্য ঠিক করে মুখস্থ করে রেখেছে।'

গাগা বলল, 'না না—প্রথম, দ্বিতীয়, এইভাবে মুখস্থ করেছে—দেখ্ না কেমন কায়দা করে সাজিয়েছে তাস।'

রতন বলল, 'ভাগ্ অত কথা কি কেউ মুখস্থ রাখতে পারে ?'

তিলক চোখ গোল করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বাবুয়াদাদা রাজাদাদা পারে, ওদের সা-ং-ঘা-তি-ক স্মরণশক্তি !'

তমাল আর জ্যোতি বলল, 'দাঁড়াও, ওদের চালাকি বার করছি। তুই একটা তাস ঠিক কর তিলক।'

'আমি ভাবলাম এই চিড়েতনের গোলামটা—দ্বিতীয় সারির শেষ তাসটা।'

এবার রাজা ঘরে আসতেই বাবুয়া হই চই করে উঠল, 'তিলকের হাতে ব্লেড কেন ? হাত কেটে যাবে যে !'

'কোথায় ? আমার হাতে ত কিছু নেই !', তিলক অবাক।

রাজা কিন্তু ঠিক বুঝেছে, বলল, 'ওই চিড়েতনের গোলামটা ভেবেছে।'

আবার রাজা ঘরের বাইরে গেলে হীরক আর দীপক বলল, 'আমরা আবার ওই চিড়েতনের গোলামটাই ভাবলাম—দেখি আবার তিলকের হাত কাটে কি না।''

কিন্তু বাবুয়া সে পথ দিয়েও গেল না, রাজা ঘরে আসতে সে বলল, 'জাপানি বাচ্চারা রুপোর ঝুমঝুমি ভালোবাসে তা জানিস ?'

রাজা চোখ বুজে কিছুক্ষণ তাসের উপর হাত বুলোল, তারপর বলল, 'আ—রে ! আবার দেখছি ওই চিড়েতনের গোলামটাই !'

তপন বলল, 'চালিয়ে যা, খেলা চালিয়ে যা, নিশ্চয় তোদের চালাকি ধরে ফেলব !'

গাগা ঠিক করল হরতনের নহলা—দ্বিতীয় সারির পঞ্চম তাসটা। রাজা আসতে বাবুয়া বলল, 'মা আমের আইসক্রিম বানিয়েছেন।' রাজা ঠিক তাসটা বার করল।

এইভাবে খেলা চলতে লাগল।

'একতলার কুকুরটা একটা ব্যাঙ মেরেছে'।—ইস্কাপনের পাঞ্জা, চতুর্থ সারির প্রথম তাস।

বাবুয়া বলল, 'The pot calls the kettle black'—রাজা ঠিক ধরে ফেলল—রুহিতনের ছক্কা, চতুর্থ সারির শেষ তাসটা।

প্রত্যেকবারই রাজা ঠিকমতন তাস খুঁজে বের করল।

ছেলেরা সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেল। কিছুতেই তারা বাবুয়া অথবা রাজাকে বেকায়দায় ফেলতে পারল না।

সুধীর বলল, 'তোমাদের যৌগিক ক্ষমতা আর তিব্বতি জাদু অবশ্য গাঁজা, ওসব আমরা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু খেলাটা দারুণ, আমাদের শিখিয়ে দিতেই হবে।'

'বলে দেব ? তোরা ধরতে পারলি না ত ?'

সুমন্ত, ধীমান ও রাণা বলে উঠল, 'না, না, পারলাম না। তাড়াতাড়ি আমাদের শিখিয়ে দে।'

'তবে শোন', বাবুয়া বলে চলল, 'এই ম্যাজিকের নাম হল ছেমেশিজফধা—মানে ছেলে-মেয়ে-শিশু-জন্তু-ফল-ধাতু। লক্ষ করে দেখ, তাসগুলি ছ-টা ছ-টা করে ছয় ভাগে সাজানো হয়েছে। ছয়টা ভাগের নাম যথাক্রমে ছেলে, মেয়ে, শিশু, জন্তু, ফল, ধাতু ; আবার প্রত্যেক ভাগের ছ-টা তাসের নামও সেই হিসাবে। বুঝতেই পারছিস, এই ম্যাজিক দেখাতে দুজন লাগে। একজন বাইরে যাবে, কোনো বিশেষ তাসের কথা ভাবা হলে, আবার ফিরে আসবে। যেমন রাজা করছিল। অন্যজন, আমার মতন, একটা কথা বলবে। সেই কথায় ছেলে-মেয়ে-শিশু-জন্তু-ফল বা ধাতুর উল্লেখ মাত্র দু-বার থাকবে। প্রথমটা বোঝাবে ভাগেব নাম, দ্বিতীয়টা সেই ভাগে তাসের নাম। উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন, প্রথমেই গাগা দ্বিতীয় সারির প্রথম তাসটা ভেবেছিল, মানে 'ছেলে'ব ভাগের 'জন্তু'। তাই আমি বললাম যে, পুলিশে ষাঁড় ধরছে। আর শেষবারে তোরা ভাবলি ৩৬ নম্বরের শেষ তাসটা, মানে 'ধাতু'র ভাগের 'ধাতু'। তাই বললাম 'কেটলি' আর 'পট'-এব কথা, যেহেতু দুটোই ধাতুর তৈরি। মা আমের আইসক্রিম বানালে হবে 'মেয়ে'র ভাগের 'ফল' আর কলা খেয়ে বাবা হাঁচলে হবে 'ফলে'র ভাগের 'ছেলে'।

সবাই মন দিয়ে ম্যাজিক শিখছে, হঠাৎ তিলক বলে উঠল, 'বাবে, আমার হাতে ব্লেড থাকলে শিশুর ভাগেব ধাতু হবে কেন ? আমি কি শিশু ?' সবাই হেসে উঠল।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বাবুয়া বলল, 'তাই ত, মস্ত বড়ো ভুল হয়ে গেছে, ছেলের ভাগের ধাতু বলা উচিত ছিল !' তিলক খুসি হয়ে গেল।

বাবুয়া আবার বলল, 'এইরকম গোলযোগ যাতে না হতে পারে, তাই যাদের মাঝামাঝি বয়স, মানে যারা এখনও শিশু, নাকি ছেলে বা মেয়ে, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাদের নাম না করাই ভালো। আবার যে জিনিস ধাতুর তৈরি কি না তাতে সন্দেহ হতে পারে, তাও বাদ দেওয়া উচিত। ইচ্ছা করলে জন্তুর মধ্যে পাখি, মাছ ও পোকা এবং ফলের মধ্যে মূল, ফুল বা পাতাও ঢোকানো যায়। তবে, এই বিষয়ে দুই ম্যাজিশিয়ানের মধ্যে আগে থেকে ভালো রকম বোঝাপড়া থাকা দরকার।'

প্রোফেসর হিজিবিজবিজ

সত্যজিৎ রায়

আমার ঘটনাটা কেউ বিশ্বাস করবে বলে বিশ্বাস হয় না। না করুক—তাতে কিছু এসে যায় না। নিজে চোখে না দেখা অবধি অনেকেই অনেক কিছু বিশ্বাস করে না। যেমন ভূত। আমি অবিশ্যি ভূতের কথা লিখতে বসিনি। সত্যি বলতে কী, এটাকে যে কীসের ঘটনা বলা চলে সেটা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে, আর আমার জীবনেই ঘটেছে। তাই আমার কাছে সেটা সত্যি, আর তাই সেটার বিষয়ে লেখা আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক।

আগেই বলে রাখি, যাকে নিয়ে এই ঘটনা তাঁর আসল নামটা আমি জানি না। তিনি বললেন তাঁর কোনো নামই নেই। শুধু তাই না, নাম নিয়ে ছোটোখাটো লেকচারই দিয়ে ফেললেন আমাকে। বললেন—

'নাম দিয়ে কী হবে মশাই? নাম একটা ছিল এককালে। সেটার আর প্রয়োজন নেই বলে বাদ দিয়ে দিয়েছি। আপনি এলেন, আলাপ করলেন, নিজের নামটা বললেন, তাই নামের প্রশ্নটা উঠছে। এমনিতে কেউ তো আসে না, আর তার মানে কারুর আমাকে নাম ধরে ডাকার প্রয়োজনও হয় না। চেনাশোনা কেউ নেই, কাউকে চিঠিপত্র লিখি না, কাগজে লেখা ছাপাই না, ব্যাংকে চেক সই করি না—কাজেই নামের প্রশ্নটাই আসে না। একটা চাকর আছে, সেটাও বোবা। বোবা না হলেও সে নাম

ধরে ডাকত না ; বলত বাবু। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। এমন কথা উঠতে পারে আপনি কী বলে ডাকবেন। এটা নিয়েই ভাবছেন তো ?....'

শেষটায় অবিশ্যি তাঁকে প্রফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্ বলে ডাকাই ঠিক হল। কেন, সেটা পরে সময়মতো বলছি। আগে একটু গোড়ার কথা বলে নেওয়া দরকার।

ঘটনাটা ঘটে গেল গোপালপুরে। উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার বহরমপুর স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট শহর গোপালপুর। গত তিন বছর আপিসের কাজের চাপে ছুটি নেওয়া হয়নি। এবার তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে—এই না-দেখা অথচ নামশোনা জায়গাটাতেই যাওয়া স্থির করলাম। আপিসের কাজ ছাড়াও বাইরে আমার আর-একটা কাজ আছে। সেটা হল অনুবাদের কাজ। আজ পর্যন্ত আমার করা সাতখানা ইংরিজি রহস্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ বাজারে বেরিয়েছে। প্রকাশক বলেন বইগুলোর কাটতি ভালো। কতকটা তাঁরই চাপে নিতে হয়েছে ছুটিটা। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে একটা গোটা বই অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে রয়েছে।

গোপালপুরে আগে কখনও আসিনি। বাছাইটা যে ভালোই হয়েছে সেটা প্রথম দিন এসেই বুঝেছি। এমন নিরিবিলি অথচ মনোরম জায়গা কমই দেখেছি। নিরিবিলি আরও এই জন্যে যে এটা হল অফ্ সিজন—এপ্রিল মাস।

হাওয়া-বদলের দল এখনও এসে পৌঁছয়নি। যে হোটেলে এসে উঠেছি, তাতে আমি ছাড়া আছেন আর একটি মাত্র প্রাণী—এক বৃদ্ধ আর্মেনিয়ান—নাম মিস্টার অ্যারাটুন। তিনি থাকেন হোটেলের পশ্চিম প্রান্তের একটা ঘরে, আর আমি থাকি পুব প্রান্তে। হোটেলের লম্বা বারান্দার ঠিক নিচ থেকেই শুরু হয়েছে বালি ; একশ গজের মধ্যেই সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই বালির উপর আছড়ে পড়ছে। লাল কাঁকড়াগুলো মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠে এসে ঘোরাফেরা করে। আমি ডেকচেয়ারে বসে দৃশ্য উপভোগ করি আর লেখার কাজ করি। সন্ধ্যায় ঘণ্টা দু-একের জন্য কাজ বন্ধ রেখে বালির উপর হাঁটতে বেরই।

প্রথম দু-দিন সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিম দিকটায় গেছি, তৃতীয় দিন মনে হল একবার পুব দিকটাতেও যাওয়া দরকার ; বালির ওপর আদ্যিকালের নোনাধরা পোড়ো বাড়িগুলো ভারি অদ্ভুত লাগে। মিস্টার অ্যারাটুন বলছিলেন এগুলো নাকি প্রায় তিন-চারশ বছরের পুরোনো। এককালে গোপালপুর নাকি ওলন্দাজদের এক ঘাঁটি ছিল। এসব বাড়ির বেশির-ভাগই নাকি সেই সময়কার। দেয়ালের ইটগুলো চ্যাপটা আর ছোটো ছোটো, দরজা জানলার বাকি রয়েছে শুধু ফাঁকগুলো, আর ছাত বলতেও ছাউনির চেয়ে ফাঁকটাই বেশি। একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখেছি, ভারি থমথমে মনে হয়।

পুব দিকে কিছুদূর গিয়ে দেখলাম এক জায়গায় বালির অংশটা অনেকখানি চওড়া হয়ে গেছে, আর তার ফলে শহরটাও সমুদ্র থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়ে কাত করে শোয়ানো রয়েছে অন্তত শ-খানেক নৌকো। বুঝলাম এইগুলোতেই নুলিয়ারা সকালে মাছ ধরতে বেরয়। নুলিয়াগুলোকেও দেখলাম এখানে-ওখানে বসে জটলা করছে, কিছু বাচ্চা নুলিয়া জলের কাছটাতে গিয়ে কাঁকড়া ধরছে, খানচারেক শুয়োর এদিকে-ওদিকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াচ্ছে।

এরই মধ্যে আবার দেখলাম একটা উপুড়-করা নৌকোর ওপর বসে আছেন দুটি প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক। একজনের চোখে চশমা, তিনি হাতে একটা বাংলা খবরের কাগজ হাওয়ার মধ্যে ভাঁজ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। আর একজন বুকের কাছে হাত দুটোকে জড়ো করে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বিড়ি খাচ্ছেন। আমি একটু কাছে যেতে কাগজওয়ালা ভদ্রলোকটি সেধে আলাপ করার ভঙ্গিতে বললেন—

'নতুন এলেন ?'

'হাঁ....এই....দু-দিন....'

'সাহেব-হোটেলে উঠেছেন ?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনারা এখানেই থাকেন ?'

ভদ্রলোক কাগজটাকে সামলাতে পেরেছেন। বললেন,—'আমি থাকি। ছাব্বিশ বছর হল গোপালপুরে। নিউ বেঙ্গলিটি আমারই হোটেল। ঘনশ্যামবাবু অবিশ্যি আপনার মতো চেন্‌জে এসেছেন।'

আমি 'আচ্ছা' বলে আলাপ শেষ করে এগোতে যাব এমন সময় ভদ্রলোক আর একটা প্রশ্ন করে বসলেন—

'ওদিকটায় যাচ্ছেন কোথায় ?'

বললাম, 'এমনি···একটু বেড়াব আর কী!'

'কেন বলুন তো?'

আচ্ছা মুশকিল তো! বেড়াতে যাচ্ছি কেন সেটাও বলতে হবে?

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আলো কমে আসছে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা কাল্‌চে নীল মেঘের চূড়া জমাট বাঁধছে। ঝড় হবে নাকি?

ভদ্রলোক বললেন, 'বছর-খানেক আগে হলে কিছু বলার ছিল না। যেখানে মন চায় নির্ভয়ে ঘুরে আসতে পারতেন। গত সেপ্টেম্বরে পূর্ব দিকে নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে মাইলখানেক দূরে একটি প্রাণী এসে আস্তানা গেড়েছেন। ওই পোড়োবাড়িগুলো দেখছেন, ওরই মতন একটা বাড়িতে। আমি অবিশ্যি নিজে দেখিনি সে-বাড়ি। এখানকার পোস্টমাস্টার মহাপাত্র বলছিল দেখেছে'।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'সাধু-সন্ন্যাসী গোছের কেউ?'

'আদপেই না।'

'তবে?'

'তিনি যে কী, সেটা মশাই জানতে পারিনি। মহাপাত্র বললে বাড়িটার ফাটাফুটো নাকি সব তেরপল দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। ভেতরে কী হয় কেউ জানে না। তবে ছাতের একটা ফুটো দিয়ে বেগ্‌নে ধোঁয়া বেরতে দেখা গেছে। বাড়িটা না দেখলেও লোকটাকে আমি দেখেছি ঠিক এইখানটেতেই বসে, আর ও হেঁটে যাচ্ছিল আমার ঠিক সামনে দিয়েই। পরনে হলদে রঙের কোট-প্যান্টুলুন। গোঁফ-দাড়ি নেই, মাথায় গুচ্ছের ঝাঁকড়া চুল। হাঁটবার সময় কী জানি বিড়বিড় করছিল আপন মনে। এমনকী একবার যেন গলা ছেড়ে হাসতেও শুনলুম। কথা বললুম কথার জবাব দিলে না। হয় অভদ্র, নয় পাগল। বোধ হয় দুটোই। ওনার আবার একটি চাকরও আছে। তাকে অবিশ্যি সকালের দিকটায় বাজারে দেখা যায়। এমন ষণ্ডামার্কা লোক দেখিনি মশাই। মাথায় কদমছাঁট চুল। ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। কতকটা ওই শুয়োরের মতোই। লোকটা হয় বোবা নয় মুখ বন্ধ করে থাকে। জিনিস কেনার সময়ও মুখ খোলে না। দোকানদারকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়। মনিব যেমন লোকই হোক না কেন, অমন চাকর যে বাড়িতে আছে, তার কাছাকাছি না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কী?'

ঘনশ্যাম লোকটিও ইতিমধ্যে উঠে পড়েছেন। বিড়িটাকে বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'চলুন মশাই'। দুই ভদ্রলোক তাঁদের হোটেলের দিকে রওনা দেবার আগে ম্যানেজারবাবুটি জানিয়ে গেলেন যে তাঁর নাম রাধাবিনোদ চাটুজ্যে, এবং আমি একবার তাঁর হোটেলে পায়ের ধুলো দিলে তিনি খুবই খুশি হবেন।

রহস্য-গল্প অনুবাদ করে করে রহস্য সম্পর্কে যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আমার মনে গড়ে উঠেছে সেটা তো আর নিউ বেঙ্গলি হোটেলের ম্যানেজারবাবু জানেন না! আমি বাড়ি ফেরার কথা একবারও চিন্তা না করে পুবদিকেই আরও এগোতে লাগলাম।

এখন ভাঁটার সময়। সমুদ্রের জল পিছিয়ে গেছে। ঢেউও অল্প। পাড়ের যেখানে এসে ঢেউ ফেনা কাটছে, তার কাছেই কয়েকটা কাক লাফালাফি করছে, ফেনাগুলো সরসর করে এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাচ্ছে, আর তারপরেই ফেনার বুড়বুড়িতে ঠোকর দিয়ে কাকগুলো কী যেন খাচ্ছে। নুলিয়া-গ্রাম ছাড়িয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর দূর থেকে ভেজা বালির ওপর একটা চলন্ত লাল চাদর দেখে প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম; কাছে গিয়ে বুঝলাম সেটা একটা কাঁকড়ার পাল, জল সরে যাওয়াতে দলে-দলে তাদের বাসায় ফিরে যাচ্ছে।

আর পাঁচ মিনিট পথ যেতেই বাড়িটাকে দেখতে পেলাম। তেরপলের তাপ্পির কথা আগেই শুনেছিলাম, তাই চিনতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি শুধু তেরপল নয়, বাঁশ, কাঠের তক্তা, মরচে-ধরা করগেটেড টিন, এমনকী পেস্ট বোর্ডের টুকরো পর্যন্ত বাড়ি মেরামতের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখে মনে হল, এক যদি ছাত ভেদ করে বৃষ্টির জল না পড়ে, তাহলে এ বাড়িতে একজন লোকের পক্ষে থাকা এমন-কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই লোকটি কোথায়?

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল, সে যদি সত্যিই ছিটগ্রস্ত হয়, আর তার যদি সত্যিই একটা ষণ্ডামার্কা চাকর থেকে থাকে, তাহলে যেভাবে উগ্র কৌতূহল নিয়ে বাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছি, সেটা বোধহয় খুব বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। তার চেয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করলে কেমন হয়? অ্যাদ্দুর এসে লোকটাকে একবার অন্তত চোখের দেখা না দেখেই ফিরে যাব?

এই সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল হল যে বাড়ির সামনের দরজার ফাঁকটার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন একটা নড়ে উঠল। আর তারপরেই একটি ছোট্টখাট্টো বেঁটে লোক বাইরে বেরিয়ে এল। বুঝতে বাকি রইল না যে ইনিই বাড়ির মালিক, আর ইনি বেশ কিছুক্ষণ থেকেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

'আপনার হাতে যে ছটা আঙুল দেখছি !—হেঃ হেঃ', হঠাৎ মিহি গলায় কথা এল।

কথাটা ঠিকই। আমার হাতে বুড়ো আঙুলের পাশে জন্ম থেকেই একটা বাড়তি আঙুল রয়েছে যেটা কোনো কাজ করে না। কিন্তু ভদ্রলোক অতদূর থেকে সেটা বুঝলেন কী করে ? এবার আরও কাছে এলে পর বুঝলাম তার হাতে রয়েছে একটা আদ্যিকালের একচোখা দূরবিন, আর সেইটে দিয়েই নির্ঘাৎ এতক্ষণ তিনি আমাকে স্টাডি করছিলেন।

'অন্যটা নিশ্চয়ই বুড়ো আঙুল ? তাই নয় কী ? হেঃ হেঃ।'

ভদ্রলোকের গলার স্বর অত্যন্ত মিহি। এত বয়সের লোকের এমন গলা আমি কক্ষনও শুনিনি।

'আসুন না—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?'

কথাটা শুনে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। রাধাবিনোদবাবুর কথায় আমার লোকটা সম্পর্কে একেবারে অন্যরকম ধারণা হয়েছিল ; এখন দেখছি দিব্যি খোশমেজাজি ভদ্র ব্যবহার। আমার চেয়ে এখনও হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক। সন্ধ্যার আলোতে তাঁকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, অথচ দেখার ইচ্ছেটাও প্রবল, তাই তাঁর অনুরোধে আপত্তি করলাম না।

'একটু সাবধানে, আপনি লম্বা মানুষ, আমার দরজাটা আবার'—হেঁট হয়ে মাথা বাঁচিয়ে ভদ্রলোকের আস্তানায় প্রবেশ করা গেল। একটা পুরোনো মেটে গন্ধর সঙ্গে সমুদ্রের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ আর আর-একটা কী জানি অচেনা গন্ধ মিশে এই পাঁচমেশালি জোড়াতালি বাড়ির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

'বাঁদিকে আসুন। ডানদিকটা আমার—হেঃ হেঃ— কাজের ঘর।' ডানদিকের দরজাটার ফাঁকটা দেখলাম একটা বড়ো কাঠের তক্তা দিয়ে বেশ পোক্তভাবেই বন্ধ করা রয়েছে। আমরা বাঁদিকের ঘরে ঢুকলাম। এটাকে বোধহয় বৈঠকখানা বলা চলে। এক কোণে একটা কাঠের টেবিলের উপর কিছু মোটা খাতাপত্র, গোটা তিনেক কলম, একটা দোয়াত, একটা আঠার শিশি, একটা বড়ো কাঁচি। টেবিলের সামনে একটা মরচে-ধরা টিনের চেয়ার, এক পাশে একটা বড়ো উপুড়-করা প্যাকিং কেস, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট চেয়ার। এই শেষটার আসবাবটি থাকা উচিত ছিল কোনো রাজবাড়ির বৈঠকখানায়। জাঁদরেল কাঠের উপর জাঁদরেল কারুকার্য, বসবার জায়গায় গাঢ় লাল মখমলের ওপর ফুলকারি।

'আপনি ওই বাক্সোটায় বসুন, আমি চেয়ারে বসছি'।

এই প্রথম একটা খটকা লাগল। লোকটা বদ্ধপাগল না হলেও, একটু বেয়াড়া রকমের খামখেয়ালি তো বটেই। তা না হলে একজন বাইরের লোককে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে প্যাকিং বাক্সে বসতে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে ?

অথচ জানলায় তেরপলের ফাঁক-দিয়ে-আসা সন্ধ্যার আলোতে তো তার চোখে কোনো পাগলামির লক্ষণ দেখছি না। বরং বেশ একটা ছেলেমানুষি হাসিখুশি ভাব। আর সেই কারণেই লোকটার বেয়াড়া অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর উপর কোনো বিরক্তির ভাব এল না। আমি প্যাকিং-কেসটার উপরেই বসলাম।

'তারপর বলুন', ভদ্রলোক বললেন।

কী বলব ? আসলে তো কিছুই বলতে আসিনি, শুধু দেখতেই এসেছিলাম, তাই ফস্ করে বলুন বললে বেশ মুশকিলেই পড়তে হয়। শেষটায় আর কিছু ভেবে না পেয়ে নিজের পরিচয়টাই দিয়ে ফেললাম।—

'আমি এসেছি ছুটিতে, কলকাতা থেকে ! আমি, মানে একজন লেখক। আমার নাম হিমাংশু চৌধুরি। এদিকে এসেছিলাম বেড়াতে, আপনার বাড়িটা চোখে পড়ল....'

'বেশ বেশ। পরিচয়টা পেয়ে খুশি হলাম। তবে আমার কিন্তু নাম-টাম নেই।

আবার খটকা। নাম নেই মানে ? নাম তো একটা সকলেরই থাকে ; এনার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন ? কথাটা তাঁকে জিগ্যেস করতেই ভদ্রলোক নামের উপর লেকচারটা দিয়ে দিলেন। সেটা শেষ হবার পর

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'আমার কথাগুলো বোধহয় আপনার মনঃপূত হল না। একটা কথা তাহলে বলি আপনাকে—আমি নিজে কিন্তু মনে মনে আমার একটা নাম ঠিক করে রেখেছি। অবিশ্যি এ নামটা কাউকে বলিনি, কিন্তু আপনার কিনা ছ-টা আঙুল তাই আপনাকে বলতে আপত্তি নেই'।

আমি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলাম। ঘরে আলো ক্রমশ কমে আসছে। চাকরটাকে দেখছি না কেন ? অন্তত একটা মোমবাতি বা কেরোসিনের আলো তো এই সময় ঘরে এনে রাখা উচিত।

ভদ্রলোক এবার হঠাৎ তাঁর মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার কানটা লক্ষ করেছেন কী ?'

এতক্ষণ করিনি, কিন্তু এবার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। মানুষের এরকম কান আমি কক্ষনও দেখিনি। উপর দিকটা গোল না হয়ে ছুঁচোল—ঠিক যেমন শেয়াল-কুকুরের হয়। এরকম হল কী করে ?

কান দেখিয়ে আমার দিকে ফিরে ভদ্রলোক হঠাৎ আর একটা তাজ্জব ব্যাপার করে বসলেন। তাঁর নিজের মাথার চুলটা ধরে দিলেন এক টান, আর তার ফলে সেটা হাতে খুলে এল। অবাক হয়ে দেখি—এক ব্রহ্মতালুর কাছে আর কানের পাশটাতে ছাড়া সারা মাথায় কোথাও একগাছি চুল নেই। এই নতুন চেহারা, আর তার সঙ্গে মিটিমিটি চাহনিতে দুষ্টু হাসির ভাব দেখে আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই একটা নাম বেরিয়ে পড়ল— 'হিজিবিজ্‌বিজ্'।

'এক্জ্যাক্টলি !', ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন'।

বললাম, 'দরকার নেই। হিজিবিজ্‌বিজের চেহারা ছেলেবেলা থেকেই মনে গেঁথে আছে।'

'বেশ, বেশ, বেশ। আপনি চান তো স্বচ্ছন্দে এ নামটা ব্যবহার করতে পারেন। এমনকী নামটার আগে প্রফেসর জুড়ে দিলে আরও ভালো হয়। অবিশ্যি এটা কাউকে বলবেন না। যদি বলেন তাহলে কিন্তু—হেঃ হেঃ হেঃ....'

এই প্রথম যেন আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল। কিংবা বেয়াড়া রকমের ছিটগ্রস্ত। এ ধরনের লোককে বরদাস্ত করা ভারি কঠিন। সব সময়ই কী বলবে কী করবে ভেবে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়।

দুজনের চুপ করে থাকাটাও ভালো লাগছিল না ; তাই বললাম, 'আপনার কানের ছুঁচোলো অংশটার রং একটু অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে?'

'তা তো হবেই', ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা তো আর আমার নিজের নয়। জন্মের সময় আমার এরকম কান ছিল না'।

'তাহলে কি ওটা আপনার চুলের মতোই নকল ? টানলে খুলে আসবে নাকি ?'

ভদ্রলোক আবার সেই খিলখিলে হাসি হেসে বললেন, 'মোটেই না, মোটেই না, মোটেই না !'।

নাঃ। লোকটা নির্ঘাত পাগল। বললাম, 'তাহলে ওটা কী ?'

'দাঁড়ান। আগে আমার চাকরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। একেও হয়তো আপনি চিনতে পারবেন।'

এতক্ষণ লক্ষ করিনি ; কোন্ ফাঁকে না জানি আর-একটি লোক পিছনের দরজা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা কেরোসিনের বাতি। এই সেই চাকর, যার কথা রাধাবিনোদবাবু বলেছিলেন।

ভদ্রলোক হাতছানি দিয়ে ডাকলে পর সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর কেরোসিনের বাতিটা রাখল। সত্যিই, এরকম যণ্ডামার্কা লোক এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লোকটার গায়ে একটা ডোরাকাটা ফতুয়া, আর একটা খাটো-করে-পরা ধুতি। পায়ের গুলি, হাতের মাস্‌ল্, কবজির বেড়, বুকের ছাতি আর গর্দানের বহর দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। অথচ লম্বায় লোকটা পাঁচ ফুট দু-তিন ইঞ্চির বেশি নয়।

'কারুর কথা মনে পড়ছে কি আমার চাকরকে দেখে ?', জিগ্যেস করলেন হিজিবিজ্‌বিজ্।

লোকটা বাতি নামিয়ে রেখে তার মনিবের দিকে ফিরে আদেশের অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিট-খানেক তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মিলটা মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে বললাম, 'আরে, এ যে ষষ্ঠিচরণ—!'

'ঠিক ধরেছেন, ঠিক ধরেছেন !', ভদ্রলোক খুশিতে বসে বসেই নেচে উঠলেন।

'খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতি লোফেন যখন তখন

দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন—'

'অবিশ্যি ওর ওজন ঠিক উনিশ মণ নয়, সাড়ে তিনের একটু বেশি। অন্তত সিক্সটি সেভেনে তাই ছিল। আর হাতি লোফাটার কথা জানি না, কিন্তু এখানে এসে অবধি ও প্রতিদিন সকালে দুটো আস্ত ধেড়ে শুয়োর নিয়ে লোফালুফি করে। এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এই যে আমার চেয়ারটা, এটা তো ও এক হাতে তুলে নিয়ে এসেছে।'

'কোত্থেকে ?'

'হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—সেটা আর নাই শুনলেন। যাও তো ষষ্ঠি, দুটো ডাব নিয়ে এসো তো আমাদের জন্য।'

ষষ্ঠি আজ্ঞা পালন করতে চলে গেল।

বাইরে মেঘের গর্জন। একটা দমকা হাওয়ায় তেরপলগুলো পট্‌পট্‌ শব্দে নড়ে উঠল। এইবারে না উঠলে দুর্যোগে পড়তে হতে পারে।

'আমার কানটার কথা জিগ্যেস করছিলেন না ?', ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা আসলে একটা বনবেড়ালের কান আর আমার ওরিজিন্যাল কান মিশিয়ে তৈরি।' কথাটা শুনে হাসিই পেয়ে গেল। বললাম,—'মেশালেন কী করে ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন—একটা মানুষের হৃৎপিণ্ড আর-একটা মানুষের শরীরে বসিয়ে দিচ্ছে, আর একটা জানোয়ারের আধখান মাত্র কান, একটা মানুষের কানের ওপর বসিয়ে দেওয়া যাবে না ?'

'আপনি কি আগে ডাক্তারি করতেন ? প্লাস্টিক সার্জারি জাতীয় কিছু ?'

'তা তো বটেই। করতাম কেন—এখনও করি, হেঃ হেঃ। তবে সে যেমন-তেমন প্লাস্টিক সার্জারি নয়। এই যেমন ধরুন—আপনার ওই যে বাড়তি বুড়োআঙুলটা—ওটা যদি আপনার না থাকত, তাহলে প্রয়োজনে ওটা লাগিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে হত জলের মতো সোজা।'

লোকটাকে অনেক চেষ্টা করলাম বড়ো ডাক্তার হিসেবে কল্পনা করতে, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। অথচ কানটার দিকে চোখ গেলে সত্যিই ভারি অদ্ভুত লাগছিল। কী বেমালুমভাবে জোড়া লাগিয়েছে ! বোঝার কোনো উপায় নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারি আর বিজ্ঞানের বই ছাড়া জীবনে কেবল মাত্র দুটি বই পড়েছি আমি—আবোল-তাবোল আর হ-য-ব-র-ল। আর দুটোর মধ্যেই যে ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে মনে ধরেছে সেটা হচ্ছে ওই প্রাণীগুলো—যাদের বলা হয় আজগুবি কিম্ভূত। এই যে সাধারণের বাইরে কিছু হলে বা করলে বা বললেই লোকে পাগলামি আব আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয়, এটার কোনো মানেই হয় না। আমি ছেলেবেলায় মোমবাতি চুষে খেতাম জানেন ? দিব্যি লাগে খেতে। আর মাছি যে কত খেয়েছি ধরে ধরে, তার কোনো গোনাগুন্তি নেই।'

ষষ্ঠিচরণ ডাব নিয়ে এসেছে, তাই ভদ্রলোককে একটু থামতে হল। দুটো কলাই-করা গেলাস টেবিলের উপব রেখে তাব উপর একটার পর একটা ডাব ধরে দু-হাতের তেলো দিয়ে চাপ দিতেই সেগুলো মট্‌মট্‌ করে ভেঙে ভেতরের জল পড়ল গিয়ে ঠিক গেলাসের ভেতর। ষষ্ঠিচরণ আমাদের হাতে গেলাস ধরিয়ে দিল।

ডাবের জলে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারি পড়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে স্পেশালাইজ করলাম কেন বলুন তো।'

'কেন ?', আমাব কৌতূহল বাড়ছিল। সেটা আর কিছুই না—ভদ্রলোকের কল্পনার দৌড় কদ্দূর সেটা জানবার জন্যে।

হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বললেন, 'কারণ শুধু ছবি দেখে মন ভরত না। খালি ভাবতাম এমন জানোয়ার যদি সত্যি থাকত। কোথাও সে আছেই ওসব প্রাণী, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি তাদের চাইছিলাম আমার ঘরের মধ্যে, আমার হাতের কাছে, আমার চোখের সামনে—বুঝেছেন ?

আমি বললাম, 'না মশাই, বুঝিনি। কোন্‌ সব প্রাণীর কথা বলছেন আপনি ?'।

'এই ধরুন বকচ্ছপ, কি গিরগিটিয়া, কি হাঁসজারু।'

বললাম, 'বুঝেছি। তারপর ?'

'তারপর আর কী। শুরু করলাম গিরগিটিয়া দিয়ে। দুটোই হাতের কাছে ছিল। টিয়ার মুড়ো আর গিরগিটির ল্যাজ। ঠিক যেমন বইয়ে আছে। প্রথম বাজিতেই কিস্তি মাত। বেমালুম জোড়া লেগে গেল। কিন্তু জানেন—'

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশিদিন বাঁচল না। খেতেই চায় না কিছু! না খেলে বাঁচবে কী করে? আসলে যা লেখা আছে সেটাই ঠিক—শরীরে শরীরে মিলে গেলেও মনের সন্ধিটা হতে চায় না। তাই এখন ধড়-মুড়ো সন্ধিটা ছেড়ে অন্য ইক্সপেরিমেন্ট ধরেছি।'

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ভাগ্যে ডাব খেতে দিয়েছে। চা-বিস্কুট হলে সাহস করে মুখে পোরা যেত না। ষষ্ঠিচরণ কোথায় গেল কে জানে। একটা খুট্‌খাট্‌ শব্দ পাচ্ছি। যেদিক থেকে আসছে, তাতে মনে হয় হয়তো ভদ্রলোক যেটাকে তাঁর কাজের ঘর বললেন, তার দরজাটা খোলা হচ্ছে।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মেঘের গুড়গুড়ানিটাও ভালো লাগছে না। আর বসা যায় না। ফিরে গিয়ে কাজে বসতে হবে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম।

'চললেন? কিন্তু আপনার কাছে যে একটা জিজ্ঞাস্য ছিল।'

'বলুন—'

'ব্যাপার কী জানেন—সবই জোগাড় হয়েছে—সজারুর কাঁটা, রামছাগলের সিং, সিংহের পেছনের দুটো পা, ভাল্লুকের লোম, সবকিছুই। কিন্তু খানিকটা অংশ যে আবার মানুষের—আর সেখানে তো ছবির সঙ্গে মিল থাকা উচিত, তাই নয় কি? সেরকম মানুষ আপনার চোখে কেউ পড়েছে কিনা জানতে পারলে সুবিধে হত।'

এই বলে ভদ্রলোক তাঁর টেবিলের উপর রাখা খাতাপত্রের নিচ থেকে একটা আদ্যিকালের আবোল-তাবোল বার করে সেটার একটা পাতা খুলে আমার চোখের সামনে ধরলেন। চেনা ছবি অবশ্যই। হাতে মুগুর নিয়ে একটা অদ্ভুত প্রাণী একটি পলায়নরত গোবেচারা মানুষের দিকে কটমট করে চেয়ে আছে—

ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না—তোমায় আমি মারব না, সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না⋯

'কেমন চমৎকার হবে বলুন তো এমন একটি প্রাণী তৈরি করতে পারলে। কিছুই না—তোড়জোড় সব হয়েই আছে, তলার দিকের খানিকটা জোড়াও লেগে গেছে, এখন দরকার কেবল একটি এইরকম চেহারার মানুষ।'

আমি বললাম, 'অত গোলগাল চোখ কি মানুষের হয়?'

'আলবৎ!', ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'চোখ তো গোলই হয়! চোখের পাতা দিয়ে গোলের অনেকটা ঢাকা থাকে বলে অতটা গোল মনে হয় না।'

আমি দরজার দিকে রওনা দিলাম। একে পাগল, তায় নাছোড়বান্দা, তায় আবার কথার ঝুড়ি।

'ঠিক আছে প্রফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌, কাউকে নজরে পড়লে জানাব।'

'অতি অবশ্যই জানাবেন। বড্ড উপকার হবে। আমি অবিশ্যি নিজেও খুঁজছি। আপনি কোথায় উঠেছেন সেটা বললেন না তো?'

শেষের প্রশ্নটা না শোনার ভান করে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। আর বেরিয়েই দৌড়। ভিজতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে যে বালি ওড়ে সেটা নাকে-চোখে ঢুকে বড়ো বিশ্রী অসুবিধার সৃষ্টি করে।

কোনোরকমে হাতদুটো মুখের সামনে ধরে চোখটাকে বাঁচিয়ে হোটেলে যখন ফিরেছি তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দেখি বাতি জ্বলছে না। বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক দিয়ে বেয়ারাকে ডাকতে যাব, কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন হল না। বেয়ারা মোমবাতি নিয়ে আমার ঘরের দিকেই আসছে। কী ব্যাপার জিগ্যেস করতে বললে, বেশি ঝড়-বৃষ্টি হলে বাতি নিভে যাওয়াটা নাকি গোপালপুরের একটা সাধারণ ঘটনা।

আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে খাটে বসে টিম্‌টিমে আলোতে লেখার কাজ শুরু করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছে। মনটা বার বার চলে যাচ্ছে প্রফেসর হিজিবিজ্‌বিজের দিকে। তিনশো বছরের পুরোনো ঝুরঝুরে বাড়িতে জোড়াতালি দিয়ে (এখানেও সেই আবোল-তাবোলের থুড়থুড়ে বুড়িটার কথাই মনে পড়ে) কীভাবে রয়েছে লোকটা! বদ্ধপাগল না হলে কি কেউ এরকম করে? আর ষষ্ঠিচরণ? কোত্থেকে এমন এক ষাঁড়ের মতো চাকর জোগাড় করলেন তিনি? আর

সত্যিই কি তিনি এই পূর্বদিকের বন্ধ ঘরটায় একটা অদ্ভুত কিছু করছেন ? লোকটার কথার কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে ? পুরোটাকেই অবশ্য পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু গোলমাল করছে ওর ওই কানদুটো। ওগুলো যে শুধু বেমালুম জোড়া হয়েছে তা নয় ; আসবার সময় কেরোসিনের আলোতে লক্ষ করেছি একটা কানের ছুঁচোল অংশটাতে আবার একটা ফোসকা পড়েছে। তার মানে সে কান শরীরেরই অংশ, আর শরীরের অন্য সব জায়গার মতো সেখানেও শিরা আছে, স্নায়ু আছে, রক্ত চলাচল আছে, সবই আছে।

সত্যি, যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে ওই কানটা না থাকলে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

পরদিন সকালে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে দেখি রাতারাতি মেঘ কেটে গেছে। চা খেতে বসে হিজিবিজ্‌বিজের কথা মনে হতে হাসি পেল। ব্যাপারটা আর কিছুই না—আবছা অন্ধকারে কেরোসিনের আলোয় অর্ধেক দেখেছি, অর্ধেক কল্পনা করেছি। হোটেলে ফিরে এসেও পেয়েছি সেই একই অন্ধকার, তাই মন থেকে খট্‌কার ভাবটা কাটবার সুযোগ পায়নি। আজ বালির উপর সকালের রোদ আর শান্ত সমুদ্রের চেহারা দেখে মনে হল লোকটা খ্যাপা ছাড়া আর কিছুই না।

পায়ের তলার গোড়ালির কাছে একটা চিন্‌চিনে ব্যথা অনুভব করছিলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম একটা জায়গায় ছোট্ট একটা কাটার দাগ। বুঝলাম কাল অন্ধকারে বালির উপর দিয়ে দৌড়ে আসার সময় ঝিনুক জাতীয় কিছুর আঁচড় লেগেছে। সঙ্গে ডেটল আয়োডিন কিছুই আনিনি, তাই ন-টা নাগাদ একবার বাজারের দিকে গেলাম।

বাজারে যাবার রাস্তাটা নিউ বেঙ্গলি হোটেলের সামনে দিয়ে গেছে। হোটেলের সামনেই বারান্দায় কালকের ঘনশ্যামবাবুকে দেখলাম একজন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা প্রবাল নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখছেন। আমার পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক মুখ তুললেন, আর তুলতেই আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল।

এই যে সেই আবোল-তাবোলের মুখ—যে মুখের খোঁজ করছেন ওই উন্মাদ প্রফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্ !

কোনো সন্দেহ নেই। সেই থ্যাবড়া নাকের নিচে দু-পাশে ছিটকে-থাকা লম্বা পাকা গোঁফ, লম্বা গলার দু-পাশে ঠিক ছবির মতো করে বেরিয়ে-থাকা শিরা, এমনকী চ্যাপটা থুতনির নিচে কয়েক গোছা মাত্র চুলের ছাগলা দাড়িটা পর্যন্ত। আসলে কাল কেন জানি না লোকটার হাবভাব পছন্দ হয়নি বলে ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকাইনি। আজকে চোখাচুখিটা হল বটে, আর আমি একটা নমস্কারও করলাম, ভদ্রলোক দেখলাম সেটা গ্রাহ্যই করলেন না। ভারি অভদ্র। কিন্তু তাও লোকটার জন্য দুশ্চিন্তা হল। ওই পাগলের খপ্পরে কখনোই পড়তে দেওয়া যায় না একে। হিজিবিজ্‌বিজ্ বা তার চাকর যদি একে দেখে, তাহলে নির্ঘাত বগলদাবা করে নিয়ে যাবে ওই ঝুরঝুরে বাড়িতে। আর তারপর যে কী করবেন সেটা মা গঙ্গাই জানেন।

ঠিক করলাম বাজার-ফেরতা একবার রাধাবিনোদ-বাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বলব। তাঁকে সাবধান করে দেব, তাঁর হোটেলের একমাত্র অতিথিকে যেন তিনি একটু চোখে চোখে রাখেন।

কিন্তু ডেটল কিনতে কিনতেই আমার সংকল্পটা যেন আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেল। রাধাবিনোদবাবুকে যেসব উদ্ভট কথা আমাকে বলতে হবে, সেগুলো কি তিনি বিশ্বাস করবেন ? মনে তো হয় না। এমনকী সেসব শুনে শেষটায় হয়তো আমাকেই পাগল বলে ঠাওরাবেন। তাছাড়া আমি যে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে হিজিবিজ্‌বিজের বাড়ি গেছি, সেটাও নিশ্চয় তাঁর মনঃপূত হবে না।

ফেরার পথে আর একবার ঘনশ্যামবাবুকে দেখে মনে হল—আমার চোখে যাকে ওই ছবির মতো মনে হচ্ছে, হিজিবিজ্‌বিজের চোখে সেটা নাও হতে পারে। সুতরাং যতটা ভয়ের কারণ আছে বলে ভাবছি, আসলে হয়তো ততটা নেই। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এদের কিছু না বলা, আর প্রফেসরকেও ঘনশ্যামবাবু সম্বন্ধে কিছু না বলা। এবার থেকে শুধু পশ্চিমদিকটায় বেড়াতে যাব, আর বাকি সময়টা হোটেলের ঘরে বসে লেখার কাজ করব।

হোটেলে ফিরতেই বেয়ারা বলল একটি ভদ্রলোক আমার খোঁজে এসেছিলেন। আমাকে না পেয়ে তিনি নাকি একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

অত্যন্ত খুদে খুদে প্রায় পিঁপড়ের মতো অক্ষরে লেখা হচ্ছে এই—

প্রিয় ষড়াঙ্গুল মহাশয়,

আজ সন্ধ্যাবেলা অবশ্যই একবার আমার গৃহে আসিবেন। সিংহের পশ্চাৎ ভাগের সহিত সজারুর কাঁটা এবং ভাল্লুকের লোম নিখুঁতভাবে জোড়া লাগিয়াছে। মুদ্গরও একটি তৈয়ার হইয়াছে চমৎকার। শৃঙ্গ তিনটে মস্তকের অপেক্ষায় আছে। এখন শুধুমাত্র মস্তক ও হস্তদ্বয় সংগ্রহ হইলেই হয়। ষষ্ঠিচরণ জনৈক ব্যক্তির সন্ধান আনিয়াছে ; মূল চিত্রের সহিত তাহার নাকি যথেষ্ট সাদৃশ্য। আশা করি, আজই আমার পরীক্ষা সফল হইবে। অতএব সন্ধ্যায় একবার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ে পদার্পণ করিলে যারপরনাই আহ্লাদিত হইব।

ইতি ভবদীয়

এইচ. যি বি।

মনে পড়ল বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাখার কথাটা হ-য-ব-র-লতে হিজিবিজ্‌বিজ্‌ই বলেছিল। চিঠিটা পড়ে মনে আবাব দুশ্চিন্তা দেখা দিল, কারণ মন বলছে ষষ্ঠিচবণ হয়তো ঘনশ্যামবাবুকেই দেখেছে।

সাবা দুপুর যতদূর সম্ভব মন দিয়ে লেখার কাজ করলাম। বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে দেখতে দেখতে মনটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল। উত্তর-পশ্চিম থেকে হাওয়া এসে এগিয়ে-আসা ঢেউগুলোর গায়ে লাগছে, আর তার ফলে ঢেউয়ের মাথাব ফেনাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

ছ-টা নাগাদ হঠাৎ দেখি রাধাবিনোদবাবু কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব নিয়ে বালির উপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—

'আমাব সেই গেস্টটিকে এদিক দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন ?'

'কে, ঘনশ্যামবাবু ?'

'আরে হ্যাঁ মশাই। কাল যেখানে ছিলুম আমরা, সেখানেই ওয়েট করার কথা আমার জন্য। এখন এসে দেখছি নেই। কাছাকাছির মধ্যে একটা লোক নেই যাকে জিগ্যেস করি ! এদিকে আমার হোটেলেও হাঙ্গামা— আমার সোনার ঘড়িটি চুরি গেছে—চাকরটাকে জেরা করতে দেরি হয়ে গেল। আপনার এদিক দিয়ে যায়নি বোধ হয় ?'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

'না, এদিক দিয়ে যায়নি', আমি বললাম, 'তবে একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার। একটা জায়গায় গেলে হয়তো খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। আপনার হাতের লাঠিটা বেশ মজবুত তো ?'

রাধাবিনোদবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'লাঠি ? হ্যাঁ তা লাঠি তো আমার সেই ঠাকুরদার···কাজেই···'

আমাব সঙ্গে আব কিছুই নেই—একটা করাত মাছের দাঁত কিনেছিলাম প্রথম দিন এসেই, সেইটে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। অন্য হাতে নিলাম আমার টর্চটা।

পূবদিকে যাচ্ছি দেখে রাধাবিনোদবাবু ধরাগলায় বললেন, 'নুলিয়াবস্তি ছাড়িয়ে যাবেন কি ?'

'হ্যাঁ। তবে বেশি দূর নয়—মাইল-খানেক।' সারা রাস্তা রাধাবিনোদবাবু শুধু একটি কথাই বার তিনেক বললেন—'কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই।'

প্রায় দেড় মাইল পথ এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লেগে গেল ঘণ্টাখানেক। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়িটার দিকে যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি রাধাবিনোদবাবুর উৎসাহ কমে আসছে। শেষটায় দশ হাত দূরে পৌঁছে হঠাৎ একেবারে থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার মতলবটা কী বলুন তো ?'

বললাম, 'অ্যাদ্দূরই যখন এলেন, তখন আর মাত্র দশটা হাত যেতে আপত্তি কীসের ?'

অগত্যা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমার পেছনে পেছনে। বাড়ির সামনে এসে টর্চ জ্বালাতে হল, কারণ ভিতরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কালকের কেরোসিনের বাতি এতক্ষণে জ্বলে যাবার কথা, কিন্তু জ্বলেনি। সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে টর্চের আলোতে প্রথমেই দেখলাম একটা লোক মাটিতে হুমড়ি দিয়ে পড়ে আছে। লোকটা মরেনি, কারণ তার বিশাল বুকটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে।

'এ যে সেই চাকরটা !', ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন রাধাবিনোদবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ষষ্ঠিচরণ।'

'আপনি নামটাও জানেন নাকি ?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলাম। ঘর খালি। প্রফেসরের কোনো চিহ্নই নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম কাজের ঘরের দিকে। দরজাটা অর্ধেক খোলাই ছিল। ষষ্ঠিচরণকে ডিঙিয়ে তবে ভেতরে ঢুকতে হল।

বৈঠকখানার মতোই ঘরের আয়তন। একদিকে টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত সরঞ্জাম—শিশি বোতল কাঁটাছুরি ওষুধপত্র ইত্যাদি। একটা উগ্র গন্ধে ঘরটা ভরে রয়েছে। এ গন্ধ আমি চিনি। ছেলেবেলায় চিড়িয়াখানায় জন্তুর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এ গন্ধ পেয়েছি।

'আরে—সে লোকটার পাঞ্জাবিটা রয়েছে দেখছি এখানে !', রাধাবিনোদবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

আজ সকালে পাঞ্জাবিটা আমিও দেখেছি। তিন-কোয়ার্টার হাতা ব্রাউন রঙের পাঞ্জাবি, বুকে সাদা বোতাম। এটা যে ঘনশ্যামবাবুরই পাঞ্জাবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর এই পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে এই ছমছমে অবস্থাতেও রাধাবিনোদবাবু চমকে উঠে হাঁপ ছাড়লেন। তিনি তাঁর সোনার ঘড়ি ফিরে পেয়েছেন।

'কিন্তু ওখানে এসব কী হচ্ছে বলুন তো ! কীসের সরঞ্জাম ওগুলো ? পাঞ্জাবি রয়েছে, পকেটে ঘড়ি রয়েছে, কিন্তু সে ব্যাটা মানুষটা গেল কোথায় ? আর সে বুড়োটাই বা কোথায় গেল ?'

বললাম, 'বাড়ির ভেতরে নেই সেটা ত বোঝাই যাচ্ছে চলুন বাইরে।'

ষষ্ঠিচরণ এখনও অজ্ঞান। তাকে আবার ডিঙিয়ে পেরিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে বালির উপর এলাম। এবারে সমুদ্রের দিকে চাইতেই আবছা অন্ধকারে একটা মানুষকে দেখতে পেলাম। সে এই দিকেই আসছে। আর-একটু কাছে আসতে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে তার উপর ফেললাম। প্রফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্ !

'ষড়াঙ্গুল মশাই কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি হিমাংশু চৌধুরি।'

'আর-একটু আগে এলেন না', ভদ্রলোক যেন গভীর আক্ষেপের সঙ্গে কথাটা বললেন।

'কেন বলুন তো ?', জিগ্যেস করলাম।

'ও তো চলে গেল। ছবির মতো মানুষ পেলাম। এক ঘণ্টায় জোড়া লেগে গেল, দিব্যি চলে ফিরে বেড়াল, পরিষ্কার কথা বলল, ষষ্ঠিচরণ ভয় পাচ্ছিল বলে ওর মাথায় মুগুরের বাড়ি মারল, আর তারপর চলে গেল সোজা সমুদ্রের দিকে। একবার ভাবলুম ডাকি। কিন্তু নাম তো নেই, কী বলে ডাকব। মানুষের মাথা, সিংহের পা, সজারুর পিঠ, রামছাগলের সিং—অথচ জলে যে গেল কেন সেটা বুঝতেই পারলাম না⋯।'

কথাটা বলতে বলতে ভদ্রলোক তাঁর অন্ধকার বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। আমার হাতের টর্চটা এতক্ষণ তাঁর উপর ফেলা ছিল, এখন হাতটা নিচে নামতে চোখে পড়ল বালির উপর পায়ের ছাপ। টাটকা পায়ের ছাপ। পা নয় থাবা।

ছাপ ধরে আলো ফেলে এগিয়ে গেলাম। ক্রমে ভিজে বালি এল, তাতে ছাপ আরও গভীর। কাঁকড়ার গর্তের পাশ দিয়ে, অজস্র ঝিনুকের ওপর দিয়ে ছাপ ক্রমে জলের দিকে গিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। এতক্ষণে রাধাবিনোদবাবু কথা বললেন : 'সবই তো বুঝলুম। ইনি তো বদ্ধপাগল, আপনি হয়তো হাফপাগল, কিন্তু আমার হোটেলের বাসিন্দা ওই বাটপাড়টা গেল কোথায় ?'

হাত থেকে করাতমাছের দাঁতটা জলে ফেলে দিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'সেটা না হয় পুলিশকে তদন্ত করতে বলুন। পাঞ্জাবিটা যখন এখানে পাওয়া গেছে, তখন এখানেই দেখতে বলুন। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে রহস্যের কূলকিনারা করতে গিয়ে পুলিশবাবাজিরও শেষটায় না আমার দশাই হয়—অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'

সাধুচরণের যন্ত্র

শিশিরকুমার মজুমদার

পাড়ার মন্টুবাবুর দোকানে কাজ করে সাধুচরণ মিস্ত্রি। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। না জানে এ হেন কাজ নেই। সামান্য একটা সুইচ বদলানো থেকে রেডিয়ো মেরামত— সব। তাই পাড়ার সবাই ওকে চেনে। ভালোবাসে।

তিনকুলে ওর কেউ নেই। মন্টুবাবুর দোকান আর আমাদের বাড়ির বৈঠকখানাই ওর জীবনের সব। সারাদিন দোকানের কাজের পর ও এসে শোয় আমাদের বৈঠকখানায়। একটু পাখার বাতাস না হলে রাতে ওর ঘুম ভালো হয় না, এ কথা ও নিজেই বলে। সাধুচরণের ঠাকুরদা আমাদের বাড়িতে কাজ করত। সে বুড়ো হলে

ওর বাবা কাজে যোগ দেয়। তার বাবার হাত ধরেই একদিন সাধুচরণ আসে আমাদের বাড়িতে।

আমার ছোটোকাকা বড়ো সরকারি চাকুরে; কিন্তু তাঁর নেশা ছিল রেডিয়ো। পয়সা খরচ করে রেডিয়োর কাজ শিখেছিলেন তিনি। বৈঠকখানার একপাশে ছোটোখাটো একটা কারখানা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। বাড়ির কাজ ছেড়ে সেখানেই ভিড়ে গেল সাধুচরণ। কাকাও হাতে কী একটা যন্ত্র ধরিয়ে দিয়ে হাতেখড়ি দিয়ে দিলেন ওর। ব্যস, সেই যে শুরু, সে কাজ এখনও চলছে।

কাকা বদলি হয়ে গেলেন বিদেশে। যাবার আগে সাধুচরণকে মন্টুবাবুর দোকানে ভরতি করে দিলেন। আর দিয়ে গেলেন তাঁর বৈঠকখানার কারখানার সব ভার। ভীষণ মন দিয়ে সে-কারখানা দেখাশুনা করে সাধুচরণ।

সেই সাধুচরণ একদিন কোথায় কাদের বাড়িতে একটা পুরোনো ভাঙা রেডিয়ো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রচণ্ড শক্ খেল, খেয়েই অজ্ঞান। শেষপর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে জ্ঞান ফেরাতে হল। তারপর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেল ও। যেন মনমরা, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে সারাক্ষণ। কোনো কাজ বা কিছুতেই তেমন যেন উৎসাহ নেই আর। শুধু কি তাই, রেডিয়োর কাজ করা তো ছেড়েই দিল একদম।

মন্টুবাবু প্রথমে অবাক হলেন, শেষে বকাবকি করলেন। সবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমাকে এসে বললেন,—দেখ তো হে, কী হল ওর। রেডিয়োর কাজে এত ভালো মিস্ত্রি ভূ-ভারতে নেই,—আর সেই কিনা ও কাজ একদম ছেড়ে দিল !

সেদিন সন্ধেবেলা বৈঠকখানায় ও আসতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ব্যাপার কী হে ? মন্টুবাবুর দোকান নাকি তুমি লাটে তুলে দেবার ব্যবস্থা করছ ? এ কাজটা কি ভালো হবে ? তোমার কথা না হয় ছাড়লাম, বুড়ো বয়সে মন্টুবাবু খাবেন কী ?

ও জিভ কেটে দু-কানে হাত ছুঁইয়ে বলল,—কী যে বল ছোড়দা, দোকান তুলে দেবার আমি কে ! আমার কী বিদ্যে আর বুদ্ধি ? সামান্য মিস্ত্রি আমি।

—তুমি মন্টুবাবুর দোকানে রেডিয়োর কাজ আর করছ না শুনলে কে আর যাবে ওর দোকানে বল ? কাজ না করা মানে তো দোকান তুলে দেওয়াই হল।

এ কথা শুনে যেন থমকে গেল সাধুচরণ। কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল,—ও কাজ আর আমি করতে পারব না। কোনো দিনও করতে পারব না।

কেন ? অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—শক্ কি আর কখনও তুমি খাওনি এর আগে যে এবারে খেয়েই এত ভয় পেয়ে গেলে !

—কারণ শক্ নয় ছোড়দা ! বলল সাধুচরণ, —না থাক, নয়ই বা বলি কী করে। কারণটা আমি বলতে পারব না। আমাকে তুমি মাপ করো।

—মাথার কি তোমার গোলমাল হল নাকি হে ? কী যা তা বলছ !

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল সাধুচরণ। আপনমনে মাথা নাড়ল ক-বার। শেষে বলল,—মাথা খারাপ বলছ,—যদি বলি তাই হয়েছে আমার, আর তার জন্যই ও কাজ আমি করতে পারব না আর, তবে তুমি কী বলবে ?

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। বলে কী সাধুচরণ ! শুনেছি সেই ভীষণ শক্ খাবার পর থেকেই ওর চালচলন যেন কেমন-একটু বদলে গেছে। কিন্তু তা বলে এই !

আমাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে ও বলল,—ঠিক পাগল হয়তো আমি নই। কিন্তু এমন একটা-কিছু হয়েছে আমার ওই শক্ খাওয়ার পর, যার জন্য সারাক্ষণ আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। তুমি জান ছোড়দা, কাজ আমি যা শিখেছি তা হাতেকলমে, বই পড়ে নয়। কেন যে কী হয় তা জানি না। জানি এটার সঙ্গে ওটার জোড় লাগালেই রেডিয়ো বাজবে। না বাজলে এটা ওটা সেটা দেখতে হবে,—ব্যস ! সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে তোমার কাকার কাছে শেখা কাজ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের দেখার ক্ষমতা বেড়ে এখন এমন হয়েছে যে কানে আওয়াজ শুনে, চোখে এক পলক দেখে তারপর চোখ বুজে যে কোনো রেডিয়ো আমি মেরামত করে দিতে পারি। সে বিশ্বাস আমার আছে। —সেই হল কাল ! খেলাম শক্, প্রচণ্ড শক্। মরেই যেতাম, নেহাত মৃত্যু লেখা নেই তাই আবার চোখ খুললাম। কিন্তু তারপর থেকে এ কী হল আমার ছোড়দা ? আমি তো ভয়েই মরি।

—কী হয়েছে বলবে তো ? কীসের ভয় ? কাকে ভয় ? আর ভয়ই বা কেন ? অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !

—শক্ খেয়ে আমার বুদ্ধি বোধ হয় ভীষণ বেড়ে গেছে। ভীষণ হতাশ হয়ে বলল সাধুচরণ,—এত বেড়ে গেছে যে আমি ভাল্ভ, কন্‌ডেন্সার, চোক, ট্রান্সফরমার এ সবের সঙ্গে গোটাকতক ট্রানজিস্টার লাগিয়ে মনে মনে একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেলেছি। ভয়ংকর এক যন্ত্র, যা কেউই

কোনো দিনও পছন্দ করবে না। সে যন্ত্র প্লাগে লাগিয়ে সুইচ দিলেই, মানুষের মনের গোপন ইচ্ছার কথা শুনিয়ে দেবে। সে ইচ্ছা যাই হোক না কেন, ভালো বা মন্দ !

ঘাবড়ে গেলাম আমি। তবে কি সত্যিই মাথার গোলমাল হল ওর ? এ বলে কী ও ! এমন অসম্ভব কথা কী করে ঢুকল ওর মগজে !

—মুশকিল কী জান ছোড়দা ? ওই যন্ত্রটা আমার মাথার মধ্যে এমনভাবে এঁটে গেছে যে আমি আর কোনো কাজ সম্বন্ধে কিছুই ভাবতে পারছি না ! যদি অন্য কাজে হাত দিই তবে শেষপর্যন্ত তাও ওই যন্ত্রটাই হয়ে দাঁড়াবে। আমি না চাইলেও হবে। মাথায় যে আমার ও ছাড়া আর কিছুই নেই এখন !

শুনে আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। হঠাৎ মনে পড়ল বাড়ির রেডিয়োটাও তো ক-দিন থেকে গোলমাল করছে। ওটার সাহায্যেই হয়তো আবার ওকে বাস্তব সত্যের মাঝে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। ওর হাতের সারানো রেডিয়ো যখন সত্যিই কারও মনের কোনো কথাই না বলে শুধু বাজবে, তখনই ওর অলীক বিশ্বাস ভেঙে যাবে। তাই বললাম,—যাক গে ওসব কথা। এখন যাও তো বৈঠকখানার কোথাও বসে আমাদের রেডিয়োটা মেরামত করো। ওটা গোলমাল করছে। তাই ডেকেছি তোমাকে। তোমার বাজে কথা শুনতে নয়।

—না না ছোড়দা, ওটা তুমি অন্য কাউকে দাও। —ভীষণ ভয় পেয়ে বলল সাধুচরণ,—ও যন্ত্রে আমি হাত দিলেই ওটা অন্য সুরে বাজবে। সে হবে ভীষণ বিচ্ছিরি। ধমকে উঠলাম আমি,—এসব কথা বলে আমাকে ভোলাবে তুমি ? বেসুরে বাজে তো বাজবে আমার রেডিয়ো। ওটা তোমাকে সারাতেই হবে। কোনো ওজর তোমার আমি আর শুনতে চাই না। যাও, বসো কাজে।

কোনো কথা না বলে সাধুচরণ চুপ করেই রইল।

শুতে যাবার আগে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি ও আমাদের রেডিয়োটা খুলে বসেছে কাজে। চারপাশে ওর রেডিয়োর নানান অংশ ছড়ানো। ডালাটার মধ্যে ঝুঁকে পড়ে আপন মনে কী যেন করছে ও। এতই তন্ময় কাজে সে আমাকে ও দেখতেই পেল না।

নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

গভীর রাতে ও আমাকে ডেকে তুলল। আবছা অন্ধকারের মাঝে দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে বলল,—যন্ত্রটা তৈরি হয়ে গিয়েছে ছোড়দা। দেখবে এসো।—

আলোর তলায় টেবিলের ওপরেই রেডিয়োটা বসানো ছিল। ওটা এতই পুরোনো যে ওতে আজকাল আর বাইরের স্টেশনগুলো তেমন করে ধরা পড়ে না। তবুও আমি বললাম,—নাও, চালাও ওটাকে। কোন্ স্টেশন ধরবে ? কলকাতা তো এখন বন্ধ।

আমার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন পাগলের মতো হি হি করে হেসে উঠল সাধুচরণ। আমি চমকে ফিরে তাকাতেই বলল —ওতে আব স্টেশন ধরা যাবে না ছোড়দা ! মন ধরা যাবে। হয় তোমার, নয় আমার। আমার মনে তো এখন ভয়, তোমার মনের কথাই ধরা যাক। কী বলো ?

প্লাগে তার লাগানোই ছিল। ও হাত বাড়িয়ে কট্ করে চাবিটা ঘুবিয়ে দিল। ভিতরের আলোটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। ভাল্‌ভগুলো একটু গরম হতেই ক-ড়-ড়-ড় করে একটু আওয়াজ তুলেই সে আওয়াজ ছাপিয়ে এক অশরীরী স্বর বলে উঠল,—ছি ছি, এত নীচ তুমি ! এত নীচ !! সাধুচরণের সর্বনাশের কথা ভাবতে তোমার লজ্জাও হয় না !

চমকে সাধুচরণ চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল আমার দিকে। অবাক হয়ে বলল,—সে কী ছোড়দা, আমার কী সর্বনাশের কথা ভাবছ তুমি ? অ্যাঁ, কী আছে তোমার মনে ? আমার মতো সামান্য লোক সম্বন্ধেও তোমার মনে পাপ !

থমকে গেছিলাম আমি ! হঠাৎ ভীষণ রাগে ফেটে পড়ে বললাম,—কী আবোল-তাবোল বলছ তুমি ?

আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে কী যেন আমার মধ্যে দেখল সাধুচরণ। কেমন করে যেন তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,—না না, ও কথা বললে আমি ভুলব না ছোড়দা ! কী আছে তোমার মনে তা খুলে বলতেই হবে। তিন পুরুষে আমরা তোমাদের নুন খেয়েছি। তোমাকে আমি কোনো খারাপ কাজই করতে দেব না। তা সে আমার বিপক্ষেই হোক বা আর কারও—।

আমি যে ওর এসব কথার কী উত্তর দেব ভেবেই পেলাম না।

ও গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—আমি জানি কী সর্বনাশের কথা ভাবছ তুমি। উকিলবাবু ক-দিন আসা-যাওয়া করছেন ! তোমাদের তো অনেক আছে ছোড়দা, বাবুমশাই ওই জমিটুকু আমাকেই লিখে দিয়ে গেছেন। যদি

কোনোদিন বাড়ি করি তাই। তা পারব না।— তবুও মিথ্যা করে ও জমি দখল নিলে তোমার পাপ হবে ছোড়দা। ও মতলব ছাড়ো।

সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ও, মনে হল আমার। উঃ, কী এক ভয়ানক পাগলের পাল্লায় পড়া গেল। এখন আমি করব কী !

সাধুচরণ আমার দিকে সারাক্ষণ গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল। কী ভীষণ ধারালো দৃষ্টি ওর ! —যেন আমাব মনের ভিতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে। কেমন করে আমি এখন ওর ওই ভীষণ দৃষ্টির সামনে থেকে সরে দাঁড়াব। ওকে যেন আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। হঠাৎ একটা বিশ্রী ইচ্ছা আমার মাথায় খেলে গেল। —একটু বোধ হয় আমি তাই নড়েওছিলাম। যন্ত্রটার অশরীরী স্বর তখুনি যেন ধমকে উঠল,—থামো।— চিরকালের মতো কারও মুখ বন্ধ করার সহজ উপায়টা তোমাকে কিন্তু নরকে নিয়ে যাবে। সে নরকে তুমি একদণ্ডও বাস করতে পারবে না। জ্বলে মরবে সারা জীবন। তার থেকে সহজ হবে সর্বনাশের চিন্তাটা মন থেকে দূর করা। সে তো অনেক সহজ কাজ। ইচ্ছা করলেই করা যায়।

আমি শিউরে উঠলাম।

কট্ করে যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়ে সাধুচরণ বলল,— কথাটা ঠিকই বলেছে ছোড়দা। পাপ থেকে পাপ বেড়েই চলে। শেষে সর্বনাশ হয়। তার থেকে পাপ মুছে ফেল মন থেকে। ব্যস্, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার সারা শরীর যেন কেমন করে উঠল। মাঝ-রাতে বিশ্বচরাচর যখন নিস্তব্ধ নিঝুম, তখন একটা পাগলের সামনে বসে এ আমি কী করছি ! ওই যন্ত্রটাই বা অমন পাগলের মতো এসব কী বলছে ? আমার মনের খবর কে জানে ? কেউ জানে না।— ও যন্ত্রটা জানল কেমন করে ! এ কী ভয়ংকর অসহ্য অবস্থা।

মনের পাপ মুছেই ফেল ছোড়দা।—শান্তভাবে বলল সাধুচরণ,—ও তুমি একটু চেষ্টা করলেই পারবে। আমি পেরেছি।—দেখবে ? কথার শেষে ও আবার চাবি ঘুরিয়ে যন্ত্রটা চালু করে দিল।

গানের সুরের মতো ভেসে এল গলা,— পৃথিবীর মানুষগুলো সব আকাশের চাঁদ-তারার মতো হোক ভগবান। তাদের মন মিঠে বাতাসের মতো হোক। আর সবাই রেডিয়োর কাজ শিখুক। পৃথিবী জুড়ে হোক শুধু রেডিয়োর গান-বাজনা। আর ভগবান, ত্রিলোচন তেলেভাজাওয়ালার তেলেভাজা যেন সবাই খেতে পারে রোজ।

কোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ করে আওয়াজ তুলে থেমে গেল যন্ত্র।

সাধুচরণ মহা লজ্জা পেয়ে বলল,—এঃ, আমার লোভের কথাটাও বলে ফেলল দেখছি। ছিঃ ছিঃ।—তা বলুক গে, আমার মন পরিষ্কার। তেমন তোমারও হোক ছোড়দা।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললাম,—অনেক সহ্য করেছি সাধু, আর নয়। বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে। বন্ধ করো তোমার যন্ত্র। শুধু তাই নয়, ওটা যেমন ছিল তেমনই করে দাও।

আমার কথা শেষ হতেই গ-ড়-ড়-ড় করে গর্জে উঠল যন্ত্রটা। ধমকে বলল,—হাত দিয়ো না বলছি আমার গায়ে। হাত দিয়ো না। হাত দিলেই আমি কামড়াব। হাত দিয়ো না। হাত দিলেই আমি কামড়াব। টু টুয়েন্টি ভোল্টের কামড়ই শেষ করে দেবে তোমাকে। আমি যা আছি তাই থাকতে চাই। তাই আমার খুশি।—গ-ড়-ড়-ড় করে আবারও ধমকেই যেন ও থামল।

আমি চেয়ার উলটে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম ভয়ে। আতঙ্কে বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে সাধুচরণ বলল,—কী সর্বনাশ, এখন কী হবে ছোড়দা ? আমার হাতের তৈরি যন্ত্র এখন আমাকেই কামড়াতে চাইছে ! ওকে বন্ধ করব কী করে ?

—কেন, বন্ধ করবে কেন ?—ফুঁসে উঠল যন্ত্র, —আমি তো তোমারই ভালো চাই। শয়তানের মনের খবর জেনে নাও, তাতে তো তোমারই লাভ। —তা নয়, এমন একটা যন্ত্র বানিয়ে এখন বোকার মতো গলা টিপে ধরতে চাও। বোকা কী আর গাছে ফলে ! নাও, চুপ করে বসো। বসে বসে মজা দেখো ! সারা পৃথিবীর মানুষগুলো কে কেমন আমি বলে দেব।

আমি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে বললাম,—এত রাতে এখানে আর অন্য মানুষ-জন কোথায় ? তুমি যা কিছু বলছ তা তো সবই আমার বিপক্ষে। ও শুনতে আর ভালো লাগছে না। এখন তোমাকে বন্ধ করে দিই। ভোরবেলা চালিয়ে দেব, যখন লোকজন সব আসবে।

গ-ড়-ড়-ড়,—ভীষণভাবে আবার গর্জে উঠল যন্ত্রটা। বলল,—চালাকির আর জায়গা পাওনি ! একবার বন্ধ করলে আর চালাবে আমাকে ? তাছাড়া ভোরে এ বাড়িতে আসবে কারা ? তোমারই তো বন্ধু-বান্ধব

আত্মীয়-স্বজনেরা। —তারা তো সবাই তোমারই মতো একসুরে বাঁধা। তাদের সামনে আমাকে চালু করবে তুমি! নিজের কুরূপ হাজার টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এ কেউ দেখতে চায়? আমাকে ঘাঁটিয়ো না বলছি। ছুব্‌লে দেব।

সাধুচরণ আলোর দিকে সরে এসে বলল,—ছোড়দা আমাদের অত খারাপ নয়। তুমি বাড়াবাড়ি করছ। মনে হয় তোমাকে আমি ভালো করে বাঁধতে পারিনি। ওই যে ইন্‌জিরিতে যাকে বলে টুনিং করা, তাই আর কী। তা ঠিক হয়নি বলেই অত চড়া সুরে কথা বলছ তুমি। একটু টুনিং করে দেব?

—নুন খেয়েছ, গুণ গাইবে এতো ভালো কথা!—বলল যন্ত্র,—তা বলে বদকেও ভালো বলবে? সে আবার কী! ওতো তোমার গিয়ে বলে,—মোসাহেবি। ছিঃ ছিঃ! মানুষ-জন আকাশের চাঁদ-তারা হোক এই যে ভাবে, তার এ সাজে না। চুপ করে বসে থাকো। যে ধরা পড়েছে সে ভুগুক। তোমার কী?

—বা রে, আমি তোমাকে না বানালে তো কেউই ধরা পড়ত না।—রাগ করেই বলল সাধুচরণ,—আর আমারই এখন মনে হচ্ছে আমি ঠিকমতো তোমাকে বানাতেই পারিনি। ট্রানজিস্টারগুলো বদল করতে হবে। চাই কি একটা চোকও বদল করতে হতে পারে।—তবেই তুমি ঠিক ঠিক কথা বলবে। এখন যা বলছ তা তো আবোল-তাবোল। কেউই বিশ্বাস করবে না তোমার কথা। চেঁচানোই সার হবে তোমার।

—বাজে মেলা বোকো না তো!—বলল যন্ত্র,—আবোল-তাবোল বকছি তো অমন চমকে চমকে উঠছে কেন গুণধর তোমার ছোড়দা?—আমি বলি তোমার ভালোর জন্যে·····আর তুমিই কিনা শাক দিয়ে মাছ ঢাকছ?

—থামাবে তোমার বকবকানি?—হঠাৎ হাই তুলে মুখের কাছে দুটো তুড়ি মেরে বলল সাধুচরণ,—ভীষণ ঘুম পেয়েছে!—রাতও তো কম হল না। চলো ছোড়দা, আমরা শুতে যাই। শূন্য ঘরে ভূতের মতো ও জ্বলুক একলা।

আড়ালে সাধুচরণ চোখ টিপল আমাকে।

আমরা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোলাম। সঙ্গে সঙ্গে করুণভাবে যন্ত্রটা চেঁচিয়ে উঠল,—বা রে, শূন্য ঘরে সত্যিই আমি জ্বলব নাকি একা! বাঃ, কার মনের কথা তা হলে আমি বলব? কে শুনবে তা? যেও না বলছি, যেও না তোমরা!

—চলে এসো ছোড়দা!—ধমকে উঠল সাধুচরণ,—ও যন্ত্র মেরামত না করে ওর সামনে বসার আর কোনোই মানে হয় না! চলো, চলো যাই শুতে।

যন্ত্রটা পিছনে চেঁচাতে লাগল, যেও না, যেও না, শোনো বলছি, শোনো·····

আমি ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম আমার ঘরে। সারা শরীর আমার ঘামে ভিজে গেছিল। বালিশে মুখ গুঁজে আমি যেন নিজের কাছ থেকেই নিজের মুখ লুকিয়েছিলাম। উঃ, কী, ভয়ংকর যন্ত্রই না বানিয়েছে সাধুচরণ!

তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

একটা সুরেলা শব্দে ঘুম ভাঙল যখন, তখন রোদ ঝলমল করছে চারদিকে। বেলা অনেক হয়েছে। বৈঠকখানায় রেডিয়ো বাজছে! কে যেন দরদ দিয়ে একটা চমৎকার গান গাইছে। ওটা আমাদের সেই পুরোনো রেডিয়োরই আওয়াজ। নিশ্চিন্ত মনে আমি উঠে গেলাম বৈঠকখানার দিকে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সাধুচরণ। রাত-জাগার চিহ্ন ওর চোখেমুখে। কেমন যেন হতাশ ভাব মেশানো সারা চেহারায়। করুণভাবে বলল,—ছোড়দা, তোমার কথাই ঠিক। সারা রাতে আমি অন্তত পনেরো বার সেই সার্কিটটা বানাতে চেষ্টা করেছি, তবুও রেডিয়োতে সারা পৃথিবীর খিচুড়ি ভাষাই বেজে উঠেছে খালি। আমি তাহলে বোধ হয় ভুলে গেছি সার্কিটটা। —না, বোধ হয় ও সার্কিটটা আমি জানিই না। ওটা হয় না। ওটা হতে পারে না। ও যে আমার মনের ভুল এখন তা বুঝতে পেরেছি। এ নিশ্চয়ই শক্‌ খেয়ে মাথার ঘিলু উলটে গেছিল। কাল সারা রাত তোমার ওই পুরোনো রেডিয়োটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘিলু ঠিক হয়েছে। ওটার জন্য মন্টুবাবুর দোকান থেকে সাতসকালে গিয়ে ছাব্বিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সার পার্টস্‌ ধারে আনতে হয়েছে। দামটা দিয়ে দিয়ো তাড়াতাড়ি। —যাই একটু ঘুমুই গিয়ে এখন।

প্রাণখুলে হেসে আমি বললাম,—টাকাটা দোকানে যাওয়ার সময় নিয়ে যেয়ো। বেশ ভালো মেরামত করেছ তো রেডিয়োটা, একদম নতুনের মতো বাজছে!

বাড়িটা জলের দরেই পেলেন বিটু বোস। ছ-খানা বড়োয় ছোটোয় ঘর, রান্নাঘর, জল-কল। মাত্র কুড়ি হাজার টাকা পাড়ার সবাই বললে : একটু ভালো করে দেখেশুনে নিলে পারতেন। অমন করে একদিনের নোটিশে বাড়ি কেনা ঠিক হল কি ? একটু দেখেশুনে—

সঙ্গে সঙ্গে বিটু বোসের স্ত্রী নিস্তারিণী বললে : দেখছ তো ! ওদেরও ওই বাড়িতে চোখ পড়েছিল। তখুনি

বলেছিলাম কাউকে জানিও না। কথা শুনলে না—জানালে রাজ্যসুদ্ধু সবাইকে ! এখন ভালোয় ভালোয় বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারলে বাঁচি। সবাই বলে বাড়ি-ঘর কপালে হয় ! তাই এরা হিংসেয় ফেটে মরছে। চলো, চলো ! ওই তো লরি এসেছে, উঠে পড়ো।

দশজন কুলি লাগিয়ে সব মালপত্র গাড়িতে তুলে ফেললেন বিটুবাবু। তারপর ভোঁ করে একেবারে খ্যাংড়াপট্টি স্ট্রিটের সেই বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

গাড়ি থেকে নেমে বিটুবাবু বললেন : আগে তো দখল নিই। তারপর অন্য কথা হবে।

বাড়ির কাছে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বিটুবাবুকে দেখে বললেন : এতদিন কোথায় ছিলে দাদা—বলেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বিটুবাবু দেখলেন পরনে নানা রঙের টুকরো জোড়া দেওয়া একটা আলখাল্লা আর মাথায় জটা জটা চুলের বাশ। যেন সারকাসের জোকার।

লরিওলা কাবুর সঙ্গে কোনো কথা না বলে সামনের খোলা বৈঠকখানাঘরে দুমদাম করে সমস্ত মালপত্র নামিয়ে চলে গেল। কারণ ভাড়া তার আগামই নেওয়া ছিল।

নিস্তারিণী ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে একটা ট্রাংকের ওপর বসলেন।

হঠাৎ ওপরে একটা শব্দ হতেই সেই অদ্ভুত পোশাক-পরা ভদ্রলোক একছুটে ওপরে উঠে গেলেন, তারপর চিৎকার করে বলতে লাগলেন : শব্দ—শব্দ আর কিছু নয়, বায়ুতে একটা তরঙ্গ। আহা তরঙ্গ বলতে কী বোঝা যায়। নদীর তরঙ্গ, জলের তরঙ্গ, জলতরঙ্গ, গানের তরঙ্গ—তরঙ্গে তরঙ্গে একেবারে ছয়লাপ।

বিটুবাবু বললেন : নিস্তারিণী, প্রাণ যাবে এবার। বোধ হয় পানু ঘোষ শত্রুতা করে একটা পাগলসমেত বাড়ি সস্তায় বিক্রি করে দিয়ে পালিয়েছে। এখন উপায় !

: বলো, রান্নাঘর কোথায় ? আগে তো দুটি খিচুড়ি করে খেয়ে নিই, তারপর বোঝা যাবে।

দুজনে নিচের তলায় বেশ-খানিকটা জায়গা খুঁজে একটা জনতা স্টোভে খিচুড়ি বসিয়ে দিয়ে স্নান করতে গেলেন। ওপরে তখনও তরঙ্গের বিশ্লেষণ চলছে পুরোদমে। তরঙ্গ থেকে জল, তার থেকে বিষ্টি, কত কী বলতে বলতে হঠাৎ ভদ্রলোক নিচে নেমে এসে বিটুবাবুর জন্যে থালা গ্লাসের সামনে পাতা আসনের ওপর বসে গিয়ে গোগ্রাসে সেই খিচুড়ি খেতে শুরু করে দিলেন। আর খেতে বসতে এসে বিটুবাবু তো অবাক। দেখেন, নিস্তারিণী ভয়ে কাঠ হয়ে এক কোনায় পালিয়ে আছে।

ভদ্রলোক নিজেই হাঁড়ি থেকে ঢেলে নিয়ে সবটুকু খিচুড়ি চেটে-পুটে খেয়ে বলল : বিদায়, তবে আজ আসি ?—বলেই দ্রুতপদে ওপরে চলে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বিটুবাবু বললেন : নিস্তারিণী, ভয় পেলে চলবে না। বাড়ি যখন কিনেই ফেলেছি তখন একটা বুদ্ধি করতেই হবে।

: চলো, কাল পানুবাবুর বাড়ি গিয়ে সব কথা বলি।

: কিন্তু কী লাভ ? তিনি হয়তো বলবেন, তখন তোমরা ভালো করে দেখে-শুনে কেনোনি কেন ? সে দোষ তো তোমাদেরই। তখন কী বলবে ? আর মিছিমিছি ওসব নিয়ে কথা বলাবলি করলে পাড়ার সবাই হাসবে। বলবে, আচ্ছা বোকা এরা ! দেখেশুনে কেনেনি, এখন ঝগড়া করতে এসেছে।

তবে এখন উপায় ?—নিস্তারিণী বললেন।

বিটুবাবু ভেবেচিন্তে বললেন : দেখি চেষ্টা করে কী করতে পারি।

বলে ওপরে চলে গেলেন। দেখলেন ভদ্রলোক যত রাজ্যের আরশোলা নিয়ে শিশিতে ভরে সযত্নে তাদের তাকে সাজিয়ে রাখছেন। শিশির গায়ে কোনোটাতে লেখা ১৯৫০ ; কোনোটাতে আবার ১৯০৫। আবার কোনোটাতে লেখা লঘূকরণ—তার ওপরে আরশোলা আর নিচে লালপিঁপড়ে।

বিটুবাবুকে দেখেই ভদ্রলোক একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে দড়াম করে ছাদের সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। বিটুবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন : এ কী ? আমার বাড়ি ভাঙছেন কেন ?

: দেখুন, আমি সিঁড়ি ভাঙবার অঙ্ক কষছি। প্রথম প্রথম এ সিঁড়িগুলো ভাঙতে ভারি কষ্ট হত। এখন একটা বড়ো হাতুড়ি আনবার পর সবটা একেবারে জল হয়ে গেছে।

বলেই ভাঙা সিঁড়ির ওপর এক ঘটি জল ঢেলে দিলেন। বিটুবাবু তো বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে

রইলেন। ছাদের সিঁড়ির সর্বনাশ করে দেবে আর কিছু বললেই—

তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

ভদ্রলোক বললেন : ছোটোবেলায় অঙ্কের স্যার বলেছিলেন, নেউলে, তোর প্রতিভা আছে। অঙ্কই তোর আসে ভালো, তাই দেখুন, সারা ঘরে শুধু অঙ্ক আর অঙ্ক।

বিটুবাবু দেখলেন, গোটা একটা যাদব-পাটিগণিত ছিঁড়ে আঠা দিয়ে সারা ঘরের দেয়ালে সে মেরে রেখেছে।

: দেখুন চৌবাচ্চার অবস্থা। একটা চৌবাচ্চা, দুটো মুখ। একদিক দিয়ে জল ঢোকে আর-একদিক দিয়ে জল বেরয়। আমি চৌবাচ্চাটিকেই ভেঙে ফেলেছি। তাহলে সব জলই বেরিয়ে যাবে, কোনো হাঙ্গামা থাকবে না।

বিটুবাবুর চোখে জল এল। এমন সুন্দর চৌবাচ্চাটা ভেঙেচুরে শেষ করে রেখেছে। বাড়ির আর কোথাও কিছু নেই। চারিদিকেই তার ল্যাবরেটরি আর পরীক্ষা।

বিটুবাবু খানিকক্ষণ খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর ভাবলেন, বিপদে তাল হারালে চলবে না। সুতরাং ভদ্রলোককে বললেন : আপনার আর কে আছে ?

: কেন ? আপনি !—বলেই একটা থালা থেকে খানিকটা ঝুল-কালি বিটুবাবুর মুখে মাখিয়ে দিয়ে থুতনিটা ধরে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন আর বলে চললেন : হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক—ঠিক বুঁচি পিসি। কোনো ভুল নেই।

ঘরে ফিরে এসে বিটুবাবু বললেন, নিস্তারিণী, কোনো উপায় নেই। বাড়ি ওই পাগলকে দিয়েই চলে যেতে হবে। আর ওই পাগলকে বাড়ি থেকে সরাতে পারেনি বলেই ধাপ্পা দিয়ে পানুবাবু আমাকে বেচে দিয়েছে। একটু ভালো করে দেখতে পর্যন্ত দিলে না। এখন কী করি বলো তো ! যাবই বা কোথায় ?

: আচ্ছা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। পানুবাবুর বাড়ি আমার কাকিমার বাড়ির পাশেই। আমি একটা ব্যবস্থা করছি। তুমি এ ক-দিন ওর দিকে চোখ রাখো আর কিছুতেই কিছু বোলো না। রেগে যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যেয়ো না। তা হলেই সব মাটি হয়ে যাবে।

নিস্তারিণী সকালবেলা উঠেই ভগবানের নাম সেরে বেশ করে সেজেগুজে একটা ট্যাক্সি করে কাকিমার বাড়ির দিকে চললেন।

পথেই দেখা পানুবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে। তিনি কালীঘাটে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন। মুখে আর তাঁর হাসি ধরে না। বললেন : আছেন কেমন ?

: খুব ভালো। বলব কী আপনাকে, এমন সুন্দর একটা বাড়ি আমাদের দিয়ে আপনারা যে কী উপকারই না করেছেন তা কী বলব।

পানুবাবুর স্ত্রী একটু ভুরু কোঁচকালেন। এ বাড়ি তাঁরা কত লোককে বিক্রি করতে চেয়েছেন, কিন্তু কেউ কেনেনি। আজ দশ বছরের চেষ্টায় বিটুবাবুকে বাড়ি না দেখিয়ে শুধু ধাপ্পা দিয়েই বিক্রি করেছেন। ওঁরা ভালো আছেন কী রকম ? কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পরে : তা বেশ, বলতে বলতে তিনি বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন।

কাকিমার বাড়িতে গিয়ে নিস্তারিণী শুনলেন—বাড়ি বিক্রির আনন্দে ছেলেমেয়ে নিয়ে পানুবাবু আর তাঁর স্ত্রী কাল ভোরেই তালা দিয়ে দু-দিনের জন্য দেওঘরে বেড়াতে যাচ্ছেন।

মাথায় একটা প্ল্যান এল নিস্তারিণীর। আবার একটা ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে এলেন তিনি।

ওপর থেকে ভদ্রলোক সমানে বলছেন : লন্ডন—নিউ ইয়র্ক—রাশিয়া—উলুবেড়ে। আহা—কী বিচিত্র সব জায়গা। পোল্যান্ড, বাঁশবেড়ে—গোবরডাঙা যেন স্বর্গ। বিটুবাবু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন।

তারপর ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসে একটা টুলের ওপর চেপে বসলেন। মনে হল ওধারের একটা বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে কারা যেন বেরুবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। কালকে নতুন এসে তো বিটুবাবু একেবারে কিছুই বুঝতে পারেননি।

কারা যেন ঘরের মধ্যে থেকে ধুপধাপ করছে। মনে হল এটা তো পাগলা গারদ নয় ? কিন্তু তাই বা কী করে হবে ? কিন্তু ঘরের মধ্যে যারা ধুপধাপ করছে তারা দরজার ওপর জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল।

: ভাঙ-ভাঙ কারা—আঘাতের পর আঘাত কর—বলে চিৎকার করতে লাগলেন ভদ্রলোক।

তারপর বিটুবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন : ওই যে দেখছ পাশের বাড়ি—ওই যে জানলা খুলে দেখছে সবাই। কাল লক্ষ করোনি। ওরাই সব গণ্ডগোলের গোড়া। ওরা আমাদের খেতে দেয় না। ডাক্তার এসে মারে আমাদের। লোক আমাদের সারা দিনরাত তালা বন্ধ করে রাখে।

আমাদের আমেরিকায় গোবরডাঙায় বা ঘুঘুডাঙায় কোথায়ও যেতে দেয় না।

এখনকার কথায় কিন্তু ওকে খুব পাগল বলে মনে হল না। কিন্তু এটা বোঝা গেল, ওরা এ বাড়ি থেকে মুক্তি পেতে চায়।

: একটা গাড়ি আনলে তোমরা লন্ডনে যাবে ?— বিটুবাবু বললেন।

: ও—হো—হো—হুরা ! সবাই বেরও গুহা ছেড়ে। আমরা লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করব। ওঠো ভাইসব, জাগো। এখন তোমাদের জাগার সময়—বলতে বলতে লোকটা সেই হাতুড়ি দিয়ে দড়াম দড়াম করে মেরে দরজা ভেঙে ফেলল আর পিলপিল করে ওর মধ্যে থেকে প্রায় জনা দশেক পাগল বেরিয়ে এল।

: চলো লন্ডন—বলেই তারা থলে ভরে বেড়ালের বাচ্চা, সোনাব্যাঙ, আরশোলা, ঝুড়ি ভরতি মরা কুকুর, খাঁচা ভরতি মরাপাখি নিয়ে দরজায় দাঁড়ানো লরিতে উঠে বসল এবং বিদ্যুৎগতিতে লরিটি তাদের নিয়ে একেবারে পানুবাবুর বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে দিল।

তারপর তারা এগারোজনে 'চল সই, চল্ জল আনি গে, জল আনি গে চল্' গান করতে করতে দড়াম দড়াম করে হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল।

: এবার আর সিঁড়ি ভাঙা নয়, দরজা ভাঙার অঙ্ক কষতে হবে ভাইসব। এসো, এসো—বলে সবাইকে বাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে, সেই প্রথম লোকটি দড়াম করে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল।

বিটুবাবুর আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। একটা রিকশা ডেকে বললেন : পাঁচ টাকা বকশিশ। চল—

চলতে চলতে শুনতে পেলেন, যেন বাড়ির ভেতর প্রলয় হচ্ছে।

লাল তারিখ

সোমেন্দ্রনাথ রায়

সকালবেলা ঘুম ভাঙলেই চোখে পড়ে, পশ্চিমের দেওয়ালে এক টুকরো আলোর আলপনা।

পুবের দেওয়ালে ভেন্টিলেটার, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে সেখানে গিয়ে বসে চড়াই পাখি। সেখান দিয়ে ভোরবেলা এক চিলতে রোদ্দুর আসে। তখন পাঁচটা বাজে।

মায়ের তখন চান সারা হয়ে যায়। ভিজে কাপড় বাইরের বারান্দায় শুকোতে দিয়ে এসে ভিজে ঠোঁটে চুমো খায় সেন্টু মিন্টুর গালে। তিড়বিড় করে ওঠে দাদাটা। মিন্টুর বেশ মজা লাগে। চোখ খুলতেই দেখতে পায় মাকে। আর ওই আলোর আলপনা।
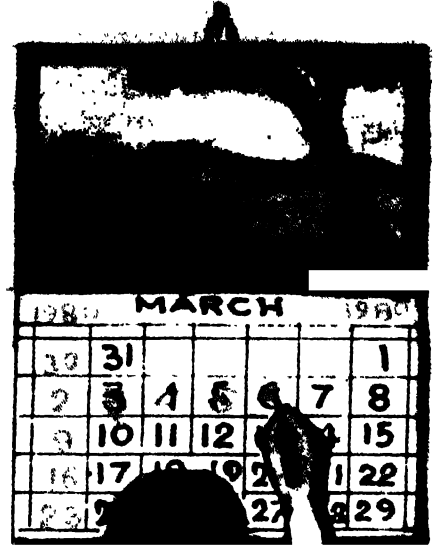
বাবার কপালে হাত বুলিয়ে মা ডাকে, ওঠো উঠবে না ? পাঁচটা বাজে।

উঠতে কারও ইচ্ছে হয় না। বাবা শুয়ে থাকে ওধারের দেওয়াল ঘেঁষে। একটা হাত মাথার নিচে, পা-দুটো একটার ওপরে আর-একটা। মা এধারে, একটুখানি জায়গায়। মাঝখানে শোয় সেন্টু মিন্টু। ইচ্ছেমতো হাত পা খেলিয়ে, ওলট পালট হয়ে। সেন্টু বাবার ধারে। মিন্টু মায়ের কোল ঘেঁষে।

মা আবার ডাকে, শুনছ, পাঁচটা বেজে গেল। দেরি হয়ে যাবে।

বাবা, উঁ, বলে পাশ ফিরতে চায়।

মা তাড়া দেয়, উঁ নয়, ওঠো।

উঠে বসে আড়মুড়ি ভাঙে বাবা। লুঙ্গি এঁটে নিয়ে বিছানা থেকে নামে। তিনজনের ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে ডাক দেয়, সেন্টু মিন্টু উঠে পড়ো। ওয়ান—

তার মানে, একটু থেমে আবার ডাক দেবে, সেন্টু মিন্টু উঠে পড়ো। টু—

তখনও যদি ওরা না ওঠে, তাহলে গলা চড়িয়ে বলবে, থ্রি—।

তখন উঠতেই হবে। না হলে হিড় হিড় করে খাট থেকে টেনে নামাবে বাবা। তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মিন্টু। দাদা চোখে আঙুল ঘষে, কাঁদে, আর ধমক খায়। মিন্টু বাবার কাছে গিয়ে বলে, বাবা, আমি ভালো ?

চশমা চোখে দিতে দিতে বাবা বলে, হ্যাঁ ভালো। নাও তাড়াতাড়ি চল।

একটু দূরে রাস্তার কল। টিপলে তোড়ে জল পড়ে। জল ছিটকোতে বেশ মজা। বাবা কিন্তু কেবলই তাড়া দেবে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নাও। এখন খেলা কবার সময় নয়।

মুখ ধুয়ে বাড়ি আসতে রেস হয় দাদার সঙ্গে। পিছিয়ে পড়ে মিন্টু। রাগ হয়ে যায়। বাবা হাসতে হাসতে কোলে তুলে নেয়। পিছিয়ে নেমে পড়তে চায় মিন্টু।

ঘরে এসে নাচতে থাকে। দাদা, আমি ফাস্ট, আমি ফাস্ট।

মা খাবার সাজিয়ে রাখে ঘরে। দাদা ঠিক ভালো গ্লাসটা নেবে। আমি খাব না, কিছুতেই খাব না। রেগে কেঁদে ফেলে মিন্টু।

বাবা জোর করে মুখে তুলে দেয় খাবার। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় দৃষ্টি। বিস্বাদ লাগে খাবার। আমি মার কাছে খাব। ভরতি মুখে অস্ফুট আবেদন জানায় মিন্টু।

না, দেরি হয়ে যাবে। খাবার হাতে নিয়ে ধমক দেয় বাবা।

শুধু দেরি হয়ে যাবে আর দেরি হয়ে যাবে ! তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরো ! তাড়াতাড়ি ইস্কুলে যাও। সোমবার থেকে শনিবার, রোজ এই রকম।

স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে বাবা। তারপর বাজার করবে। খবরের কাগজ পড়বে। আটটা বাজলে তেল মেখে চলে যাবে বাথরুমে। চান করে এসে খেতে বসবে মা-র সঙ্গে। খেয়ে দেয়ে আপিস চলে যাবে দুজনে।

ক্লাসে বসে বসে সব ভাবতে পারে মিন্টু। ঝরনা দিদিমণি জিজ্ঞাসা করে, বানান কর, গরীয়সী।

বিষম খায় মিন্টু। মা এতক্ষণে ঠাকুমাকে বলছে, আপনি ঝোলটা নামিয়ে নেবেন মা। আটটা বেজে গেছে। খাবার জায়গা করে চুলটা বেঁধে নিই। ছোটোপিসি দুলে দুলে পড়ছে। একটু পরে সেও চান করে খেতে বসবে।

কত দেরি হয়ে যায় রোজ স্কুল থেকে ফিরতে। খিদে পায়, রাগ হয়, কান্না আসে। দরোয়ান হরিধনের সঙ্গে বাড়ি আসে দু-ভাই। দাদার মুখটা শুকনো শুকনো, কালো কালো। মিন্টুর জিভে তিতকুটে স্বাদ।

সাড়ে দশটা বাজে। বাড়ি ফাঁকা। মা, বাবা আপিসে। ছোটোকাকা কলেজে। ছোটোপিসি স্কুলে। দাদু বাইরের ঘরে বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে। ঠাকুমা রান্নাঘরে দাদুর জন্যে পটলের ঝোল রাঁধছে। বইয়ের ব্যাগ বিছানায় ধপ করে ফেলে-টেলে বসে পড়ে মিন্টু। দাদা সঙ্গে সঙ্গে খেলতে ছুটে যায়। মিন্টুর ভালো লাগে না।

মা নেই। জুতো খুলতে গিয়ে ফিতেয় গেরো পড়ে যায়। মা ছিল খানিক আগে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার গায়ে পাউডারের দাগ। ঘামে গা কুটকুট করছে। কে জামা খুলে দেবে ? সকালের কাপড় ছেড়ে রেখে গেছে মা। হাত দেয় মিন্টু। আলনার গায়ে পেরেকে টাঙানো থাকে ছোটো ছাতাটা। নেই। মা নিয়ে গেছে। সকালের নরম আলোর আলপনা আর নেই দেওয়ালে। ফাঁকা হয়ে গেছে ঘরটা মাঠের মতো।

ঠাকুমা একসময়ে উঁকি দেয় ঘরে। ওমা, চুপি চুপি ঘরে এসে বসে আছ ? এসো, জামা খুলে দিই। হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আমার কাছে রান্নাঘরে বসবে চলো। তোমার জন্যে ঘন দুধ রেখেছি, মুড়ি দিয়ে খাবে চলো। দাদা গেল কোথা ?

ঠাকুমার আদর এখন ভালো লাগে না। কান্না ঠেলে আসে গলায়। মা-র কোলে মুখ গুঁজে থাকতে ইচ্ছে করছে। কেন যাবে মা আপিসে। বাদল, রঞ্জি, ওদের কারও মা তো যায় না। ঠাকুমা তো আপিস গেলেই পারে, মা তাহলে বাড়ি থাকে। মিন্টু সারাদিন থাকতে পায় মা-র কাছে।

তবু এক সময়ে ছাড়তেই হয় জামা-জুতো। দাদা আসে খেলা ছেড়ে। দাদু ডাক দিয়েছে বোধ হয়। স্নান করতে হয় দাদুর সঙ্গে। সবটাই যেন শাস্তির পালা। ইচ্ছেমতো মগের পর মগ জল মাথায় ঢালা যায় না। নামা যায় না চৌবাচ্চায়। দাদা মাঝে মাঝে বকুনি খায়। মারও খায় দাদুর কাছে। ঠাকুমা শাসায়, দাঁড়াও, বিনু আসুক, সব বলে দেব।

বিনু মানে বাবা, বউমা মানে মা।

মিন্টুও মাঝেমধ্যে বকুনি কিংবা মার খায় না এমন নয়। পালা করে যেন ভালো হয় ওরা। যেদিন সেন্টু ভালো থাকল, মিন্টু পুষিয়ে নিল সব রকমে। আবার যেদিন মিন্টু ভালো হয়ে রইল, সেদিন সেন্টুর শয়তানি সীমা ছাড়ায়।

খাওয়ার সময়ে চরমে ওঠে ঝামেলা। সেন্টু ডাল খাবে না, ঝোল খাবে না, শুকনো শুকনো ভাত অল্প একটু ঝোল দিয়ে মেখে খাবে। লঙ্কা খেতে চাইবে দাদুর মতো। মিন্টু গুছিয়ে খেতে পারে না। মাছ দেখলেই গায়ে জ্বর আসে। কাঁটা গলায় গেছে কি না গেছে, ওয়াক তুলবে। দাদু রেগে এক বাটি ঝোল ঢেলে দেবে সেন্টুর পাতে। রেগে কেঁদে ভাত নিয়ে ছড়াতে বসে দাদা। মিন্টু মাছ রেখে পালাতে চায়। বকাঝকা করেও খাওয়াতে পারেন না ঠাকুমা দুজনকে। দাদু হয়তো কোনোদিন মেরেই বসলেন কাউকে রাগের মাথায়। ঠাকুমাকে বলেন, ওদের আগে খাইয়ে দাও না কেন ? রোজ রোজ খাওয়ার সময়ে এরকম অশান্তি ভালো লাগে না। কাল থেকে দেবে না ওদের আমার সঙ্গে।

ঠাকুমা অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, দিই কি সাধে ? তোমার সামনে যা হোক তবু দুটো খায়। না খেয়ে না খেয়ে কী চেহারা হয়েছে দেখো না।

সত্যি ভালো লাগে না খেতে। মা কেমন কোলের ভেতরে নিয়ে খাওয়ায়। কেমন মেখে, বেছে, গল্প বলতে বলতে মুখে তুলে দেয় গরাস। কখন খাওয়া হয়ে যায় টের পাওয়া যায় না। দাদা খায় বাবার পাশে বসে। বাবার পাতের ভালো ভালো খাবারের ভাগ পায়। কিন্তু সে শুধু রবিবারে আর শুধু ছুটির দিনগুলোয়। ক্যালেন্ডারের পাতায় যে দিনগুলো লাল রঙে দাগানো থাকে।

সে সব দিনগুলোয় ভারি মজা। সেদিন মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নেয় তিনজনে। বাবা, দাদা আর মিন্টু। তারপর বাজারে যায়। দাদা ভালোবাসে ইলিশমাছ। মিন্টু ডিম ভালোবাসে। কত জায়গায় কত দরাদরি করে বাজার করে বাবা। সেন্টু নেয় ম্যাছের থলি, মিন্টু নেয় পানের গোছা।

বাজার থেকে ফিরে কাগজ পড়তে বসে বাবা। মা-ও এসে বসে এক কাপ চা নিয়ে। কথা বলে। বোধ হয় আপিসের কথা। ভালো বুঝতে পারে না মিন্টু। মা-র গা ঘেঁসে দাঁড়ায় তবু। দাদা লুডো মেলে ডাকে, মিন্টু, খেলবি আয়।

খেলা যখন জমে ওঠে, বাবা মিন্টুর সঙ্গে যোগ দেয়। মা যদি তখন আসে, যোগ দেয় দাদার সঙ্গে। মিন্টু ডাকে, মা, তুমি আমার দলে।

দাদাটা এমন হিংসুটে, অমনি বলবে, না, মা, তুমি আমার দলে। তখন থেকে বাবাকে দলে নিয়েছে মিন্টু।

মা-বাবা কেমন বুঝিয়ে দেয়। আবার মেতে যায় দু-ভাই খেলায়।

কোনো কোনো দিন ছুটির বারে বিশ্বকাকা, রবিকাকা বেড়াতে আসে। মা চা হালুয়া তৈরি করে দেয়। মজার মজার গল্প হয় সেদিন। দুপুরবেলা বাবার সঙ্গে খেয়ে-দেয়ে ঘরে আসে দু-ভাই। পান চিবুতে চিবুতে সিগারেট ধরায় বাবা। দাদা বলে, আজ গল্প হবে।

মিন্টু যোগ দেয় সঙ্গে সঙ্গে। সিন্ডারেলার গল্প।

না বাবা, স্নো হোয়াইট। খুদে বামনের গল্প। ছোটো খাট, ছোটো বিছানা, ছোটো ছোটো দাড়িওয়ালা মানুষগুলো। কেমন মজার গল্প মিন্টু ! শোন্ না আজকে !

না, জেদ ধরে মিন্টু, সিন্ডারেলার গল্প ভালো।

রফা করে বাবা, আচ্ছা, দুটোই হবে।

আগে আমারটা বাবা। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে মিন্টু।

না বাবা, আমারটা। খুদে বামনের গল্প আগে।

বাবা বলে, আগে ভাই বলেছে, ওরটাই আগে হোক।

মা আসে কিছু পরে, খেয়েদেয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে। বলে, কী গল্প হচ্ছে ? আমি একটু শুনতে পাব না ?

দু-ভাই সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, হ্যাঁ বাবা, আবার গোড়া থেকে।

গল্প শেষ হয়ে গেলে ঘুমুতে হয়। ওরা ঘুমোতে চায় না ওদিনটায়। কিন্তু বিরক্ত হয়। এতক্ষণ ধরে গল্প বললাম তবে কেন ? শিগ্‌গির ঘুমিয়ে পড়ো সেন্টু। ওয়ান--। অর্থাৎ তখনই না ঘুমোলে একটু পরেই বলবে, টু—।

ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে নিতে হয়। তারপর বেড়াতে যাওয়া। মা-র সঙ্গে, বাবার সঙ্গে, ছোটোপিসির সঙ্গে রাস্তায় যেতে যেতে টুকিটাকি কেনা, পার্কে বসে বাদামভাজা ছাড়িয়ে খাওয়া, কী মজাই লাগে! যেদিন বেড়ানো হয় না, সেদিন হারমোনিয়াম নিয়ে বসে বাবা। সবাই মিলে গলা মেলানো। 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—'।

তারপর শেষ হয়ে যায় ছুটির দিনটা। বিচ্ছিরি সব কালো কালো তারিখগুলো সার বেঁধে থাকে ক্যালেন্ডার জুড়ে। ভোর থেকে শুরু হয় যন্ত্রণা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দিনটা যেন কাটতে চায় না। চাপা কান্না গুম্‌রোতে থাকে মনে।

সন্ধেবেলা মা বাড়িতে ঢুকলেই সমস্ত প্রাণটা যেন চিৎকার করে ওঠে মুক্তির আনন্দে। সারাদিনের নিষেধের বেড়া হঠাৎ যেন ভেঙে যায় মায়ের হাতের ধাক্কায়। কী দুঃসহ যন্ত্রণায় কাটে দিনের প্রহর। শুধু কথা শোনো, চুপ করে বসে থাকো, চেঁচামেচি কোরো না, দৌড়াদৌড়ি কোরো না, লাফালাফি কোরো না, শুধু না, না, আর না। খেলা নেই, গল্প নেই, যুদ্ধ নেই, দোকানদারি নেই, রিকশটানা নেই। মা এলেই শেষ হয়ে যায় সেই শাস্তির পালা। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আদর করে, অস্থির হয়ে ওঠে দু-ভাই। হাতের ব্যাগটা, ছাতাটা, রাখবার সময় পায় না মা। লাট হয়ে যায় কাপড়-চোপড়।

ঠাকুমা এসে বকে। ও কী হচ্ছে সেন্টু মিন্টু ? মাকে একটু হাঁপ ছাড়তে দাও। সারাদিন তো জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে খেয়েছ।

অপরাধীর মতো ম্লান হাসে মা। আরও টেনে নেয় দুটিকে কোলের কাছে।

কিন্তু সে ক-টা মিনিট মাত্র ! একটু পরেই তাড়া দিয়ে ওঠে। ছাড়ো সেন্টু, সরো মিন্টু। চল কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুই। একটু চা খাবো না ? চলো, আবার রান্নাঘরে যেতে হবে। দাদুর রুটি হবে, তোমাদের ভাত হবে। কত কাজ রয়েছে। আমার কি তোমাদের নিয়ে বসে থাকবার সময় আছে ?

কাল থেকে তুমি আপিসে যেয়ো না মা।

না যেতে হলে তো বেঁচে যাই বাবা। ট্রামে-বাসে ঠেলাঠেলি মারামারি দিনের পর দিন কার ভালো লাগে ? কিন্তু উপায় কী ? কারও আয় তো বেশি নয়। এত বড়ো সংসার।

না, তুমি আপিসে যেতে পাবে না।

আচ্ছা, আচ্ছা, এখন তো ছাড়ো। দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখুনি আবার তোমার ঠাকুমা ডাকবেন।

জলভরা চোখে বসে থাকে মিন্টু। হু হু করে ওঠে মনটা। সারা দিনের কথা মনে পড়লে শুকিয়ে আসে বুক। কতটুকু সময় থাকতে পায় মায়ের কাছে ? একটু ছোঁওয়া পেতে না পেতেই ধাক্কা দিয়ে কেউ যেন সরিয়ে নিয়ে যায় মাকে। সে ওই বিচ্ছিরি কালো কালো দিনগুলো।

বাবা আসে একটু পরে। ঘড়িটা খুলে, চশমা খুলে রেখে দেয় টেবিলে। কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে চলে যায় বাথরুমে।

ঠাকুমা রান্নাঘর থেকে বলে, বিনু এলি, চা দেব ?

চা নিয়ে আসে মা। ঠাকুমাও আসে পিছু পিছু। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে, সারাদিন তোর ছেলেরা যা করছে। বলব না কি মিন্টু ?

মুখ গোঁজ করে থাকে দু-ভাই।

বিরক্ত হয় বাবা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, এখনও পড়তে বসোনি তোমরা ? বই নিয়ে এসো সেন্টু মিন্টু। শিগ্‌গির নিয়ে এসো। ওয়ান—। সঙ্গে সঙ্গে না নিয়ে এলে বলবে এবার, টু—।

অঙ্ক কষতে দিয়ে একটা মজার জিনিস বার করল বাবা জামার পকেট থেকে। একটা ছোট্ট লাল-নীল পেন্সিল। লাল দিকটায় আস্ত শিস।

ছোঁ মেরে তুলে নিল মিন্টু।

দাদা বলে উঠল, ওই দেখ বাবা, মিন্টু লাল পেন্সিল নিয়ে নিল।

নিও না মিন্টু। তোমাদের খাতায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেব বলে নিয়ে এসেছি। ওটা দিয়ে দাও।

না বাবা, এটা আমার খুব দরকার। অনুনয় করল মিন্টু।

তোমার আবার কী দরকার ? তোমার তো পেন্সিল আছে।

সে পেন্সিলে হয় না বাবা। সত্যি বলছি খুব দরকার। আচ্ছা, কাল তোমায় দিয়ে দেব।

না, তুমি নষ্ট করে ফেলবে। কথা শোনো দিয়ে দাও।

ক্ষুব্ধ মনে দিতে যাচ্ছিল মিন্টু। তখনই মা এল ঘরে।

শোনো, মা বলছিলেন, এই রবিবারে তুমি কাঁচড়াপাড়া ঘুরে এসো। অনেকদিন ঠাকুরঝির খবর পাইনি। ওদিকে বাবার জন্যেও যেতে হবে একবার কব্‌রেজের কাছে। সেও তো ছুটির দিন ছাড়া সম্ভব নয়। ভেবেছিলাম এই রবিবার ছেলেদের নিয়ে যাব মানিকতলা।

ছুটি আর কাজ আর ঝামেলা নিয়ে কী সব কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল বাবা আর মায়ের মধ্যে। সেন্টু মাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ধমক দিয়ে উঠল বাবা। সরে বসো সেন্টু। কেন মা-র গায়ে গিয়ে উঠছ ?

আহা, কেন বকো। দাদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মা। কতটুকু পায় ওরা আমাকে ? এখনও শিশু তো !

বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল বাবা।

দাদা বলল, ওই দেখো মা, মিন্টু কী করছে !

ভীষণ আক্রোশে হাত চালাচ্ছিল মিন্টু ! যেন ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে রক্ত বইয়ে দেবে। ঘষছে লাল পেন্সিলটা ক্যালেন্ডারের কালো তারিখগুলোর গায়ে।

ও কী হচ্ছে মিন্টু ? ধমকে উঠল বাবা।

সব লাল করে দেব। কচি গলায় ফুঁসে উঠে মিন্টু। সব ছুটির দিন। সবগুলো রবিবার।

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল বাবা। বকতে ভুলে গেল।

এ যেন সে বাবা নয়, যে ধমক দিয়ে বলবে, চলে এসো মিন্টু। শিগ্‌গিরি এসো। ওয়ান—। অর্থাৎ এখনই না এলে আবার বলবে টু—।

লেখাপড়া করে যেই

প্রভাতকুমার গোস্বামী

ট্রেনটা হু-হু করে ছুটে চলেছে। দু-পাশের গাছপালা বাড়ি-ঘর যেন ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উলটো দিকে দৌড়চ্ছে। একমাত্র স্টেশনে গাড়ি থামলে দু-পক্ষে সন্ধি। নতুবা কেউ কারও কাছে যেন দৌড়ে হার মানতে রাজি নয়।

গাড়ি স্বভাবতই থামছে ; কিন্তু অনেকক্ষণ পর পর। সব স্টেশনে থামছেও না—যেন সবার সঙ্গে তার ভাব

নেই। নাকি ট্রেনটাই বেয়াড়া, সব জায়গায় থামতেই চায় না। পরিমল ভাবতে চেষ্টা করে, এ কী কাণ্ড ! জানলার ধারে মুখ বাড়িয়ে সে বসে আছে, কিন্তু সব জায়গা তার দেখাই হয় না। সে ভাবতে চেষ্টা করে, ট্রেনটা এমন ধারা চলছে কেন ?

এই প্রথম পরিমল ট্রেনে চেপে চলেছে। ট্রেন চলার নিয়ম-কানুন তার জানা নয়। নিজের অজ্ঞতায় সে নিজেই লজ্জা পায়। কাউকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবে ? তার পাশে বসে আছে যে লোকটি, সেই এখন তার সঙ্গী এবং ট্রেনে অভিভাবকও বটে। এই লোকটি তার গ্রামের লোক, কলকাতায় তার যাতায়াত আছে। পরিমলের বাবা তার সঙ্গেই পাঠিয়েছেন ! পরিমলকে কলকাতায় তার এক দূরসম্পর্কীয় মামার বাসায় পৌঁছে দেবার জন্যে। কিন্তু লোকটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যেন পরিমলের আত্মসম্মানে বাধে।

পরিমল তার গ্রামের স্কুল থেকে এবার স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। কলেজে ভরতি হবার জন্য চলেছে কলকাতায়। দূরসম্পর্কিত এক মামা তাঁর ছোটো ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা দেখিয়ে দেবার বিনিময়ে পরিমলকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছেন। নতুবা তার পড়াশুনা এইখানেই শেষ হয়ে যেত। বাবার এমন ক্ষমতা নেই যে বোর্ডিং-এ রেখে তাকে পড়ান। গ্রামের দু-দশ মাইলের মধ্যেও কলেজ নেই। গ্রামে এক মুদিখানা দোকান চালান পরিমলের বাবা। পরিমল যদি নিজে ইচ্ছা করে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসে যেত তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই পড়াশুনায় পরিমল খুব ভালো। শুধু তাই নয়, তার মাথায় কেমন করে যেন এই আশা ঢুকেছে যে লেখাপড়া করে সে বড়ো হবে। বাবা তাই বাধা দেননি। যদিও তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা বলেছিলেন— ছেলেকে দু-এক ক্লাস পড়িয়েই ছাড়িয়ে আনো, নতুবা কয়েক ক্লাস এগিয়ে গেলে সে আর দাঁড়িপাল্লা ধরতে চাইবে না।

পরিমলের পরিণতি দেখে সেইসব বন্ধুরা পরিমলের সামনেই তার বাবাকে বলেছিলেন—'দেখলে তো, তখনই বলেছিলাম !'

পরিমল জানে, বুঝবার শক্তিও তার হয়েছে— বাবার সঙ্গে দোকানে কাজ করলে একজন কর্মচারীকে বাদ দেওয়া চলত, আয় বাড়ত তাদের সংসারের। আর আয় তো বাড়ানোই দরকার। আজকালকার এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে ছেলেমেয়ে সহ সাত-আট জনের সংসার কি একজনের ওপর চলে ? তাছাড়া খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হলেও পরিমলের কলেজের মাইনে তো বাবাকেই পাঠাতে হবে।

পরিমল সব বোঝে। কিন্তু সেই প্রথম ভাগ ছাড়িয়ে দ্বিতীয় ভাগ পড়বার সময় সেই যে কবিতাটি সে পড়েছিল—

'লেখাপড়া করে যেই,
গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই।
লেখাপড়া যেই জানে,
সব লোকে তারে মানে।'

কবিতাটি যেন আজও তার কানে ধ্বনিত হয়। যখন পড়েছিল তখন প্রথম দু-লাইনের অর্থ সে বুঝেছিল, কিন্তু শেষ দু-লাইন সম্পর্কে তার অস্পষ্ট ধারণা ছিল। আজ সে ধারণাও অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য লেখাপড়া জানা লোক বলতে তার সামনে প্রধানত যাঁদের ছবি ভেসে ওঠে তাঁরা হচ্ছেন স্কুলের শিক্ষক। এঁদের ছেলেরা তো মান্য করেই, গ্রামের সাধারণ লোকও পরামর্শের জন্য এঁদের কাছে যায়। ডাক্তারবাবুর খাতিরটা অন্য ধরনের মনে হয়। হ্যাঁ, আর যাঁদের সবাই মান্য করে, সে হচ্ছে শহরের দারোগাবাবু আর অঞ্চল-পঞ্চায়েত। এঁদের লেখাপড়া সম্পর্কে পরিমলের ধারণা স্পষ্ট নয়। তবে তার বিশ্বাস এরাও বেশ লেখাপড়া-করা লোক, নতুবা লোকে এঁদের মান্য করবে কেন ?

তবে মান্য করার ব্যাপারের চেয়েও ওই গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ার আকর্ষণটাই বেশি। গ্রামের লোকের মোটর-গাড়ি নেই ; গাড়ি দু-চারখানা গ্রামে কোনো দিন আসে না তা নয়। কিন্তু ওই গাড়ি চড়ার স্বপ্ন তার নেই ; তাছাড়া ওটা গ্রামের লোকের আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে তার মনে হয়নি। খুবই ছোটো একটি গ্রামে তাদের বাস। পাকা পথ-ঘাটও নেই। মাইল তিনেক দূরে গেলে বাস পাওয়া যায়। সেই বাসই শহরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রক্ষা করে। এই বাসে সে দু-একবার চড়েছে—একবার কার বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল বাসে চেপে ; তারপর আর-একবার তার বাবা তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে ; আর এই কয়েক মাস আগে সে বাসে চড়ে শহরে গিয়েছিল

মা

শিল্পী : চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পরীক্ষা দিতে। আর কয়েকবার বাসরাস্তা দিয়ে গেছে কিন্তু চড়বার পয়সা ছিল না।

ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা তার নেই বললেই হয়। খুব ছোটোবয়সে মা-বাবার সঙ্গে একবার কোথায় গিয়েছিল—কিন্তু সে ট্রেনে চড়াও অল্প সময়ের জন্য—উঠতে উঠতেই নেমে পড়তে হয়েছিল। এইবার সত্যি সত্যিই সে রেলগাড়িতে চড়েছে। এই রেলগাড়িতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল ছোটোবেলায় ওই ছোটো কবিতাটি।

আজ পরিমলের আরও মনে পড়ছে কবিতাটির সঙ্গে আর-একজনের কথা। তার নাম সতীশ। একসঙ্গে স্কুলে পড়ত তারা। সতীশের বাবা ছিল ভাগচাষি। মাঠে না টেনে, কেন যেন সতীশের বাবা ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন তা কে বলবে ! ওই কবিতাটি নিয়ে সতীশের সঙ্গে পবিমলের কী তর্কই না হয়েছে—সে কথা মনে পড়লে হাসি পায় আজ।

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই—

কবিতা পড়বার সময়ই পরিমল বলেছে—'আমি লেখা-পড়া শিখব, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ব দেখিস।'

—'ফুঃ'—কথাটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছে—ভাগচাষির ছেলে, কারণ জমি চাষ করা ছাড়া আব বেশি কিছু সে চিন্তা করতে পারেনি।

—'তুই দেখে নিস', জোর দিয়ে বলেছে পরিমল—'বইতে কি মিথ্যা কথা লেখা থাকে ?'

গাড়ি-ঘোড়ার কথা নিয়েও তর্ক। গাড়ি এবং ঘোড়া আলাদাভাবে চড়া না গাড়ির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া—এমনই সব উদ্ভট কথাবার্তা নিয়ে সতীশের সঙ্গে পরিমলেব তর্ক হত।

সেই সতীশ দ্বিতীয় ভাগ শেষ করার আগেই স্কুল ছেড়ে দিল বা বাধ্য হল। সতীশের বাবা মারা গেলেন। খাজনা করা একখণ্ড জমিতে খড়ের ঘর তুলে সতীশের বাবা যে সংসার পেতেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তার মায়া ত্যাগ করে তাঁর স্ত্রী চলে গেলেন সতীশকে নিয়ে।

যাবার আগে পরিমলের সঙ্গে সতীশের দেখা হয়েছিল। কিন্তু কেউ কথা বলতে পারেনি। মনে আছে দুজনেই কেঁদেছিল খুব। সতীশ তার মায়ের সঙ্গে কোথায় গেল তা সতীশ নিজেও জানত না। সেই সতীশ আজ কোথায় তাও পরিমল জানে না। সে আজ ন-বছর আগেকার কথা। এই ন-বছরে কত ওলট-পালট হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে পরিমলের ছোট্ট দোকান কোনোক্রমে টিকে আছে বলেই সে আজ ট্রেনে চেপে কলকাতায় চলেছে।

পরিমল কিন্তু এখনও বিশ্বাস করে, সে লেখাপড়া করেছে বলেই আজ সত্যিই একটা গাড়ির মতো গাড়িতে সে চাপতে পেরেছে। সত্যিই তো লেখাপড়া না করলে কি তার কলকাতা যাবার প্রশ্ন উঠত ?

সে ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।—গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা স্টেশনে। বেলা গড়িয়ে গেছে, সন্ধ্যা নেমে আসছে। পুরোনো ট্রেনের ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠেছে ; উঠেছে নয়—একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। কামবায় তিনটি আলোর ব্যবস্থা ছিল মনে হয়—তার দুটি নেই, চুরি হয়েছে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়।

পরিমল ভালো হয়ে বসল। পাশের লোকটি গল্প জমিয়েছে কাদের সঙ্গে। ট্রেন ভরতি লোক। এত লোকের মধ্যেও তার সঙ্গে কথা বলবার যেন কেউ নেই। নিজেই সে একবার উঠে দাঁড়াল—সরে যাবার উপায় নেই, অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে, জায়গা বে-দখল হতে পারে এ কথা বলে আগেই সাবধান করে দিয়েছে পাশের লোকটি। জুলাই মাস, প্রচণ্ড গরম। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখ মুছল পরিমল। মুছতে গিয়ে তার কানের কাছ থেকে দুটো শুকনো ফুল হাতের সঙ্গে এল—মা দিয়ে দিয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়ির নির্মাল্য। ফুলদুটি শুকিয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। ফুলদুটিকে সে পকেটে পুরল। তারপর আবার ভালো হয়ে বসল।

ট্রেনের কামরাটি বেশ লম্বা। পরিমল যেদিকে বসে তার অপর দিকে একজন ফেরিওয়ালা চেঁচাচ্ছে। সম্ভবত গেল-স্টেশন থেকেই উঠেছে সে। ফেরিওয়ালার বয়স বেশি নয় মনে হচ্ছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, ভিড়ে মনে হয় তার বয়সিই হবে ছেলেটি।

এর মধ্যে অন্য স্টেশনে আরও দু-একজন ফেরিওয়ালা উঠেছে—জিনিস বিক্রি করে নেমে গেছে। এ-ও তেমনই নেমে যাবে নিশ্চয়ই। ফাউনটেন পেন বিক্রি

করেছে ছেলেটি—ভিড়ের মধ্য থেকে তার মুখ দেখা না গেলেও একগাদা রং-বেরং-এর পেন দেখা যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ছেলেটি। পেন দেখে পরিমল একটু সচকিত হল। ফাউনটেন পেন তার আছে—কলকাতা থেকেই কাকে দিয়ে পরিমলের বাবা কিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি এতদিনে অকেজো হয়ে উঠেছে। আর-একটি কিনলে কেমন হয় ? কলেজে পড়তে চলেছে পরিমল। না—কলকাতায় পৌঁছেই কেনা যাবে—সংযত হল পরিমল।

ছেলেটি আরও এগিয়ে এল। বিক্রি করছে পেন—কিন্তু পেন সম্পর্কে বলার আগে সে নানা ভূমিকা জুড়ে বক্তৃতা করছে, হয়তো শিখিয়ে দিয়েছে কেউ—না হয় তার নিজেরই বক্তব্য।

ছেলেটি পেন হাতে আবার নতুন করে শুরু করল—বাবুরা শুনুন····ছোটোবেলায় আপনারা পড়েছেন—

পরিমল উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

ছেলেটি বলে চলেছে—ছোটোবেলায় আপনারা পড়েছেন—

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই····

দেখুন, আমাকে দেখুন—লেখাপড়া কিছুই শিখতে পারিনি, কিন্তু সারাদিন আমি গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছি····

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল পরিমল—এ কী ? সে দু-পা এগিয়ে গেল। ছেলেটি আর সে তখন মুখোমুখি। বক্তৃতা থেমে গেছে ছেলেটির। সেও তাকিয়েছে পরিমলের দিকে। অস্পষ্ট আলো ! এতদিন পরে, তবুও চিনতে কি ভুল হবে ?

পরিমলই কথা বলল প্রথমে—সতীশ !

সতীশ হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেও শুধু একটি কথাই বলল—পরিমল !

হাত ধরবার উপায় নেই—দু-হাত ভরতি পেনের গোছা। তবুও পরিমল হাত এগিয়ে দিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত কেউ কথা বলতে পারেনি।

বাগডুম সিংয়ের ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। তিনি বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙতেই আজ সর্বপ্রথম তাঁর বন্ধু কাকের কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু এ কী! তাঁর বিছানাটা এত বড়ো হয়ে গেছে কী করে? এ কী! তিনি নিজে এত বড়ো হয়ে গেলেন কী করে? তিনি ধড়ফড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। ছুটে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আয়নার ছায়ায় নিজেকে দেখতে দেখতে তাঁর চোখদুটি স্থির হয়ে গেল। না, না, তিনি তো আর এইটুকু পুতুল নন! ছোট্ট তাঁর দেহটা কত বড়ো হয়ে গেছে! চোখদুটি ডাগর-ডাগর। ঠোঁটদুটি কাঁপছে।

হাতের আঙুলগুলি নাচছে। মুখখানি থমকে থেমে ভাবছে। দেখতে দেখতে তিনি চিৎকার করে উঠলেন : আমি কে ? আমি কে ? আমি কে ?

কাক ঘরে ঢুকল, শান্ত গলায় বললে,—বন্ধু, তুমি এখন মানুষ।

বাগডুম সিং আনন্দে দু-হাত বাড়িয়ে কাককে বুকে তুলে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—এ কী সত্যি ! এ কী সত্যি !

কাক বললে,—হ্যাঁ !

বাগডুম সিং একটু থামলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,—এরপর তুমি বুঝি আমাকে রাজা করবে ?

কাক উত্তর দিলে,—ভাই, পুতুলকে রাজা সাজানো যায়। কিন্তু মানুষকে তো রাজা বানানো যায় না। আমি তোমাকে মানুষ করতে পেরেছি, কিন্তু রাজা তো করতে পারব না। তোমাকে রাজা হতে হবে নিজে চেষ্টা করে।

—মিথ্যে কথা !

চটে উঠলেন বাগডুম সিং। এতদিন তাঁর রাগ ছিল পুতুলের, কিন্তু আজ তাঁর রাগ মানুষের। তাই তিনি চোখ রাঙিয়ে কাককে বললেন,—যে পুতুলকে মানুষ করতে পারে, সে মানুষকে রাজাও করতে পারে। তুমি আমাকে রাজা করে দাও। আমাকে সোনার সিংহাসন এনে দাও। আমার রাজপোশাক এনে দাও। সোনার মুকুট এনে দাও।

কাক আবার বললে,—আমি পারি না।

—কেন পার না ?

—সে ক্ষমতা আমার নেই।

—কেন নেই ?

—তা তো জানি না।

—তুমি মিথ্যুক ! জান, জান, তুমি সব জান। তুমি ইচ্ছে করে আমায় রাজা করবে না।

—বলে চিৎকার করে উঠলেন বাগডুম সিং। তিনি যেন পাগল হয়ে গেলেন। পাগলের মতো বিছানার বালিশটা তুলে নিয়ে তিনি কাককে ছুঁড়ে মারলেন। কাক চক্ষের নিমিষে নিজেকে সামলে নিলে। তারপর ডানা ঝাপ্‌টিয়ে কালো অন্ধকারটার মধ্যে উড়ে পালিয়ে গেল। বাগডুম সিং থমকে গেলেন। তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই অন্ধকারের দিকে। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মাথায় একটি একটি করে ভাবনা জুড়ে বসল। যতদিন তিনি পুতুল ছিলেন, সে ভাবনা ছিল পুতুলের। আর আজ তিনি মানুষ। তাঁর ভাবনাও মানুষের। তাই তাঁর এখন মনে হল, কথায়-কথায় কাকটা অন্ধকারে কোথায় ছোটে ! ওই অন্ধকারে কি কোনো রহস্য আছে ? নইলে কী ক্ষমতা একটা কাকের যে, তার কাছে যা চাওয়া যায়. তা-ই এনে দেয় ?

হ্যাঁ, ওই অন্ধকারটা বাগডুম সিংকে হাতছানি দিচ্ছে। লোভে বাগডুম সিংয়ের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। অন্ধকারে তিনি পা বাড়ালেন। এবং অন্ধকারের মধ্যে তিনি হারিয়ে গেলেন।

প্রথমে তিনি বুঝতেই পারেননি, এই অন্ধকারটা এমন ভয়ংকর। তাঁর পা-দুটি যতই এগিয়ে চলেছে, অন্ধকারটা ততই যেন জমাট বাঁধছে। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে বাগডুম সিংয়ের। এখন তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দানা বাঁধছে। তাঁর হাত-পাগুলো কাঁপছে। তিনি বুঝতে পারছেন না কোন্‌দিকে যাবেন। কোন্‌দিকে গেলে আলো পাবেন। শেষে অন্ধকারের গভীরে হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি নিজেই যেন অন্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। মুঠো-মুঠো অন্ধকার তাঁকে ঘিরে ধরে তাঁব বুকেব ওপর যেন দাপাদাপি শুরু করে দিল। মনে হচ্ছে, কে যেন তাঁর গলাটা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। নিস্তার পাবার জন্যে তিনি দু-হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন,—কাকভাই, আমাকে বাঁচাও !

কেউ এল না। তিনি অন্ধকারে হোঁচট খেলেন। ছিটকে পড়লেন। তাঁর কপালে ঘা পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, ঘড়-ঘড়-ঘড়। বিশাল এক লৌহকপাট ধীরে ধীরে খুলে গেল বাগডুম সিংয়ের চোখের সামনে।

হ্যাঁ, কপাট খুলল। তিনি ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে আলো এল। বাগডুম সিংয়ের মুখের ওপর কে যেন রঙিন আলোর একখানি মিহি আঁচল ছড়িয়ে দিল। অবাক হয়ে থমকে তাকালেন বাগডুম সিং। এ কী ! এ যে মুঠো-মুঠো সোনার টুকরো সারা ঘরে কে ছড়িয়ে রেখেছে। না, না এ তো শুধু টুকরো সোনার আলো নয়। ওই তো থরে থরে ছড়িয়ে আছে মণি-মুক্তার ঝলমলানি। অসংখ্য, অফুরন্ত।

এতক্ষণ অন্ধকারে যে লোকটা ছটফটিয়ে আলোর জন্য চিৎকার করছিল, এখন তার লোভে চোখদুটো টলটল করছে। ছুটে তিনি ঘরে ঢুকলেন। তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। কখনও তিনি হাতের মুঠিতে সোনা তুলে নেন। ছুঁড়ে ফেলেন। কখনও তিনি দু-হাত ভরে মণি-মুক্তা নিয়ে লোফালুফি করেন। সেই টুকরো টুকরো সোনার আলোর ওপর তিনি গড়াগড়ি খান। কখনও তিনি ছোটেন। কখনও লাফান। কখনও হাঁটেন। তিনি চিৎকার করে হেসে ওঠেন। হাসতে হাসতে বলেন,—ওরে কাক, তুই আমাকে রাজা না-ই করলি। আমি মানুষ। আমার চোখে ধুলো দিয়ে তুই আমাকে বোকা বানাবি ? হা-হা-হা !

হা-হা-হা ! হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল। সেই প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তিনি দরজা ডিঙিয়ে ছুটে গেলেন।

এ কী ! এ ঘরটা এমন কেন ? নেহাতই একটা ঘর ! একটা খাট, বিছানা পাতা। একটা টেবিল, টেবিলে বই। একটা চেয়ার, চেয়ারে কুশন। একটা ছবি ফ্রেমে আঁটা। একটা ফুলদানি, তাতে ফুল। একটা আলনা, জামা-কাপড়। আর ?

একটা বন্দুক।

প্রথম বাগডুম সিং বন্দুকটা দেখতে পাননি। তিনি আনন্দে চিৎকার করে খাটের ওপর লাফিয়ে উঠলেন। বিছানায় গড়াগড়ি দিতে দিতে তিনি ফুলদানির ফুল ছিঁড়ে নিলেন। তার পাপড়িগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেললেন। চেয়ারটাকে টান মারলেন। ছবির কাঠটাকে ভেঙে ফেললেন। আলনার জামা-কাপড়গুলো ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করে দিলেন। তারপর তিনি বন্দুকটি দেখতে পেয়েছেন।

—বন্দুক !—বাগডুম সিং চিৎকার করে উঠলেন। ছুটে গিয়ে বন্দুকটা তুলে নিলেন তিনি। আর ঠিক তক্ষুনি তাঁর মনে হল, এ পৃথিবীতে তাঁর মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই ! তিনি ঘরের মধ্যেই বন্দুক ছুঁড়লেন, গুড়ুম-ম-ম ! আগুনের ফুলকি ছুটল। ছিটকে ওই তাল তাল সোনার ওপর গিয়ে ধাক্কা মারল। আর শব্দটা সেই অন্ধকার চত্বরের ওপর ঘুরপাক খেতে খেতে মিলিয়ে গেল। বাগডুম সিং আবার হেসে উঠল,—হা-হা-হা ! তারপর ছুটতে ছুটতে ওই সোনার ওপর লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন,—এখন আমায় কে রুখবে ! আয় দেখি, কার কত ক্ষমতা। আমার হাতে বন্দুক। আমার পায়ের নিচে গুপ্তধন ! যে আমায় বাধা দেবে, এই বন্দুক দিয়ে তাকে আমি উড়িয়ে দেব। আমি রাজা ! না, না, আমি সম্রাট ! তিনি ডাক দিলেন,—এই, কে আছিস ?

কেউ সাড়া দিল না।

তিনি আবার ডাকলেন,—কোই হ্যায় ?

এবারও তিনি সাড়া পেলেন না। আর সাড়া না পেয়ে তিনি বুঝলেন কাছে-পিঠে কেউ নেই। কিন্তু কেউ নেই বলে তো আর তিনি বসে থাকতে পারেন না ! তিনি গায়ের জামাটা খুলে ফেললেন। সেই জামায় তিনি তাল-তাল সোনা রাখলেন। তারপর বেঁধে ফেললেন। এখুনি এই জামায় বাঁধা সোনার বস্তা দিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ বানাবেন। সাতমহলা রাজপ্রাসাদে সাতশো-সাতাশ দাস-দাসী আসবে। সাত লক্ষ সিপাই-সান্ত্রি। হাতি-ঘোড়া, কামান-বন্দুক। দুর্গ-তোরণ।

তিনি জামায় বাঁধা সোনার বস্তা পিঠে তুললেন। পারলেন না। উঃ ! কী ভারি ! তখন একহাতে বন্দুক নিয়ে তিনি সেই সোনা-বাঁধা জামাটা প্রাণপণে টানতে লাগলেন। মেঝেতে ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে চললেন ওই লৌহকপাটের চৌকাঠের দিকে।

—কী বন্ধু, চিনতে পারছ ?

চমকে থামলেন বাগডুম সিং। এ কী ! এ যে সেই কাকটা ! একটা কপাটের মাথায় বসে তার দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে।

কাক আবার জিজ্ঞেস করলে,—অত কষ্ট করে এত সোনা নিয়ে কোথা যাচ্ছ ? কী করবে এত সোনা ?

বাগডুম সিং উত্তর দিলেন,—এ সোনা আমার। আমার যা খুশি তাই করব !

—আমায় দেবে না ?

—তোমায় কেন দেব ? তুমি তো কাক। সোনা নিয়ে তুমি কী করবে ?

কাক বললে,—তুমিও তো পুতুল !

প্রচণ্ড রেগে চিৎকার করে উঠলেন বাগডুম সিং,—কে বলছে আমি পুতুল ? আমি মানুষ।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। এখন তুমি মানুষ। কিন্তু আগে পুতুল ছিলে !

—যখন ছিলুম, তখন ছিলুম।

—তুমি পুতুল ছিলে, লোকে যদি জানতে পারে ?

—জানবে না, জানবে না। আমার কাছে সোনা আছে।

—আমি যদি বলে দেই !

—এই সোনা দিয়ে তোমার মুখ আমি বন্ধ করে রাখব।

কাকটা হো-হো করে হেসে উঠল।

বাগড়ুম সিং জিজ্ঞেস করলেন,—হাসলে যে ?

—না, ভাবছি, তুমি একটু-একটু করে কত পালটে গেছ ! যখন তুমি সব হারিয়েছিলে, কিছুই তোমার ছিল না, তখন তোমার মনটি ছিল ভারি সুন্দর। তখন তোমার মনে আনন্দ ছিল, ভালোবাসা ছিল। কিন্তু যখন তুমি ফিরে পেলে সর্বকিছু একটি-একটি করে, তখন কিন্তু তোমার সেই সুন্দর মনটি হারিয়ে গেল !

বাগড়ুম সিং কী যেন ভাবলেন একটুখানি। তারপর বললেন,—ভাই কাক, আমি আবার সুন্দর হব। দোহাই তোমার, পুতুলের কথাটা কাউকে বলে দিও না।

কাক আবার হাসল।

—সত্যি, আমি সুন্দর হব।

কাক বললে,—আমি জানি এ কথা তোমার মনের কথা নয় !

—কেন ? আমি তো সত্যি করে বলছি।

—বেশ, তাহলে তুমি আবার পুতুল হতে রাজি আছ ?

—না ! ভীষণ চিৎকার করে উঠলেন বাগড়ুম সিং। চিৎকার করে বলতে লাগলেন,—আমি আর পুতুল হব না। আমি পুতুল হব না।

তেমনই জোরে হেসে উঠল কাকটা,—হা-হা-হা !

বাগড়ুম সিংয়ের কানে সে হাসি শেলের মতো বিঁধছে। তিনি কান চেপে আবার চিৎকার করলেন—হাসি থামাও।

কাক থামল না। কাক সেই ঘরের মধ্যে উড়তে শুরু করে দিলে। উড়তে উড়তে হাসতে লাগল—হা-হা-হা। হা-হা-হা।

বন্দুক তুলে নিলেন বাগড়ুম সিং।

কাক আরও জোরে জোরে হাসতে লাগল।

তাক করলেন বাগড়ুম সিং। তবু কাক থামল না। হেসে চলল।

গুলি চালালেন বাগড়ুম সিং,—গুড়ুম—ম-ম্-ম্ !

বন্দুকের আগুন ঝলসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কাকের কালো ডানাদুটো কী ভয়ংকর শব্দ করে ওঠা-নামা করছে ! দেখতে দেখতে, কী বিরাট হয়ে গেল ডানাদুটো। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। ছেয়ে গেছে। তারপর শূন্যে দোল খেতে খেতে সেই কালো ডানা ধীরে ধীরে নেমে আসছে বাগড়ুম সিংয়ের মুখের ওপর। বাগড়ুম সিং আঁতকে উঠলেন। ছুটে পালাতে গেলেন, পারলেন না। কালো ডানা দুটো ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—বাঁ-চা-ও !

ব্যাস্, তারপর সব চুপ।

অনেকক্ষণ পর দেখা গেল, সেই তাল-তাল সোনাগুলো আর সোনা নেই। সব লোহা। সেই মুক্তা-মানিক, পান্না-চুনির আর কোনো জৌলুস নেই। সেগুলো সব টুকরো কাচ। ছড়িয়ে আছে। সেই লোহা আর কাচের ওপর পড়ে আছেন বাগড়ুম সিং নামে একটি ছেঁড়া জামা-প্যান্ট-পরা পুতুল !

হ্যাঁ, বাগড়ুম সিং আবার পুতুল হয়ে গেছেন !
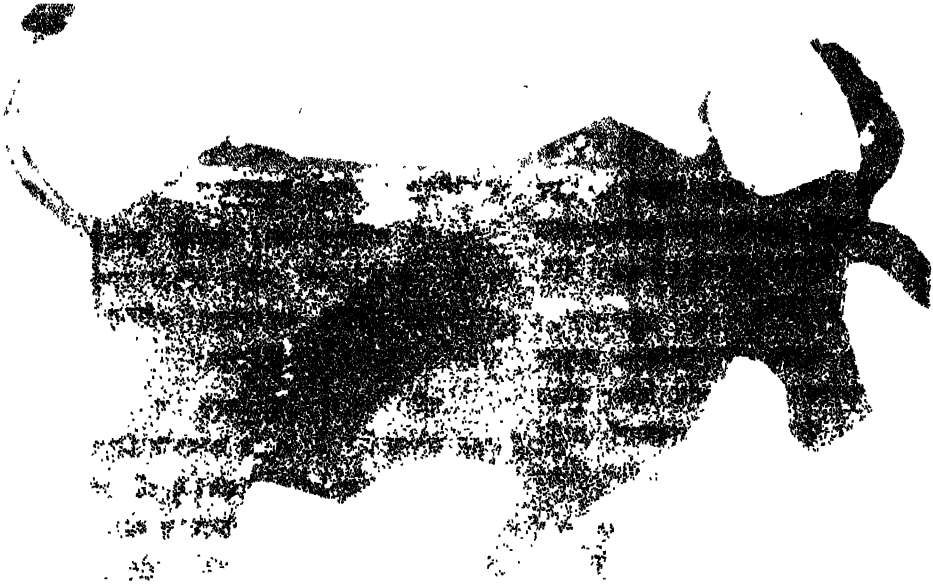
ন্যাদোশ

মহাশ্বেতা দেবী

গল্পের গোরু গাছে ওঠে, আর আমার মায়ের গোরু দোতলায় উঠত, মাছ মাংস খেত।

মাকে যিনি মানুষ করেন, তাঁর সেই মণিমাসি, আমাদের মণি দিদিমা, এখন তিরানব্বই বছরেও বেঁচে আছেন।

দেওঘরে থাকেন তিনি কয়েকটা গোরু নিয়ে। তাঁর গোরুরা শীতকালে চা খায়, বারোমাস আতপ চালের ফেন ভাত খায়। ঠান্ডায় গায়ে কম্বলের জামা পরে। মা বোধহয় গোরুপ্রীতি তাঁর কাছে পেয়েছেন। এখনও আমার মার গোরু থাকে। সে গোরু আমরা চোখে দেখিনি। কেননা সে পটলবাবুর বাগানে চরে, মেনকার বাড়িতে বাচ্চা দেয়, পুন্নির মা তার দুধ দুয়ে খায়।

আমার বাবা মার জন্যে, সেই গোরুর জন্যে খড়-খোল-ভুষি কিনে চলেন। গোরু দেখাশোনা করতে যতীন আসে। গোরুকে অবশ্য বাড়িতে কেউ দেখেনি।

১৯৪৪-এর শেষাশেষি বা ১৯৪৫-এর গোড়ায় বাবা মফস্বলের সেই শহরটায় বদলি হলেন। শান্ত শহরটিতে বাবার বদলি হওয়া উচিত ছিল কি না আজও মনে হয়। আমি থাকতাম শান্তিনিকেতনে। আমার এক ভাই এক বোন ফলওয়ালাদের জমা-নেওয়া সব আম আর লিচুগাছ সাবাড় করে দিত। ফলওয়ালারা বাবার কাছে পয়সা নিয়ে নিত। বাবা প্রায়ই ভোরবেলা মাছ ধরতে স্টেশনে চলে যেতেন। স্টেশন থেকে সবচেয়ে বড়ো মাছটা কিনে তার মুড়ো থেকে ল্যাজা অব্দি নতুন বঁড়শি বিশ-পঁচিশটা বিঁধিয়ে নিয়ে চলে আসতেন। এসেই বলতেন, 'পুকুরে যেই ছিপ ফেললাম....' যাক বাবার দুজন চাপরাশি ছিল। তারা দুই ভাই। এখন তারা সে শহরের গণ্যমান্য লোক আর তাদের যাঁরা অফিসার ছিলেন, তাঁদের চেয়ে অনেক বড়ো বাড়ি হাঁকিয়েছে তারা, নামটা আর নাই বললাম। ছোটোভাই আমাদের দুধের জোগান দিত। সে দুধ মার পছন্দ নয়। বাবার পরামর্শের লোক ছিল মা বা আমরা নয়, আপিসের মালী, রিকশাওলা, আমের ব্যাপারি। তারাই সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ঠিক করে দিত। কে কোন্ স্কুলে পড়বে, এ বছর কত মণ চাল কিনে রাখা হবে, পুজোতে কোথায় যাওয়া হবে। বাবা যখন বাড়ি করলেন,

তাও হয়েছিল রাজমিস্ত্রি আর গোরু দেখার লোক যতীনের পরামর্শে। সেইজন্যে সে বাড়িতে থাকার ঘর ছ'টা। ঢোকার আর বেরুবার ফটক আটটা। জানলা দরজা অগুনতি, জলের ট্যাঙ্কটা দশতলা বাড়ির ট্যাঙ্কের মাপের।

মারও পরামর্শের লোক ছিল বাড়ির কাজের লোকরা—সত্যনারায়ণ ঠাকুর, মেনকা আর নারান। তারা বলে দিত পুজোতে কার কীরকম জামাকাপড় কেনা হবে, কোন্ উৎসবে কী রান্নাবান্না হবে।

মার দল আলাদা, বাবার দল আলাদা। দু-দলে অনেক এ-ওর ওপর অবিশ্বাসের ব্যাপার ছিল। বুদ্ধির লড়াইও চলত। যাক, মা তাঁর দলের পরামর্শে ছোটো চাপরাশির কাছ থেকে গোরু কিনলেন। শোনা গেল বাড়িতে দুধের সমস্যা এবার ঘুচল।

এই প্রথম, মার কোনো গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটার ব্যাপারে নারানের পরামর্শ নেওয়া হল না।

নারান আবার আমাদের কাউকে বিশ্বাস করত না। ও সবসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ করত আমার যে ভাইটি চলে গেছে, সেই অবুর সঙ্গে। অবুর বয়স তখন দশ বছর। নারান বিয়ে করতে যাবে, পাত্রী দেখতে যেত অবু। নারান একবার অবুকে নিয়ে বেলডাঙার হাটে গিয়ে মার জন্যে গোরু কিনেছিল। গোরু কিনলে হাঁটিয়ে আনতে হয়।

হাঁটিয়ে আনার সময়েই গন্ডগোল হয়েছিল, কেননা নারান মাঝেমধ্যে গাঁজা খেতে বসে যেত। যাহোক, নারান কিনল কালো বকনা গোরু। মা যখন নতুন গাইয়ের খুরে জল আর কপালে সিঁদুর দেবেন বলে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখা গেল এক পেল্লায় সাদা বলদ নিয়ে নারান আসছে !

সেইজন্যেই নারানকে পরামর্শ করা হয়নি। তোমরা নিশ্চয় বুঝেছ গোরু কেনার টাকা বাবা দেবেন, কিন্তু তার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ করা হবে না !

তাই ছোটো চাপরাশির বকনা গাই মা কিনলেন। আর এই গোরু কেনার সময় থেকে বাবা আর নারানের যেন কীরকম একটা আপস হয়ে গেল। দুজনেই মুচকে হাসলেন। তারপর মা যখন সন্দেহ করে বললেন, 'নারান ! গাই কেনা হচ্ছে বলে হাসলে কেন ? গাই ভালো নয় ?'

নারান বলল, 'তা কেন ?'

বাবাকে মা কিছু জিগ্যেস করেননি।

ইনকাম-ট্যাক্স্ আপিসে কাজ করতে করতে বাবাই জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন ন্যাদোশকে ছোটো থেকে বড়ো হতে। বাবা সবই জানতেন। কিন্তু কিছু বলেননি !

গাই বাড়িতে এল। এরকম কুচ্ছিত গাই তোমরা জীবনে দেখনি। পেট মোটা। চারটে ঠ্যাং বাইরের দিকে ছত্রানো, ছেটানো, ল্যাগবেগে। ল্যাজটা শক্ত। চোখের চাউনিটা কেমন হিংস্র টাইপের।

গাইকে বরণ-টরন করে মা ছোটো চাপরাশিকে নতুন কাপড় দিলেন। ও সে কাপড়টা নিয়ে বাড়ির পাশের ধোপঘাটিতে স্নান করতে নামল। ধুতিটা কেচে পাড়ে মেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাদোশ কচরমচর করে ধুতির অর্ধেকটা খেল, অর্ধেকটা ছিঁড়ল, তারপর ছোটো চাপরাশি যতবার উঠতে যায়, ততবার ওকে জলে ফেলে দিল।

মা বললেন, 'আহা ! মনের কষ্টে ওরকম করছে। ছেলেপিলেকে বাবা যদি পরের হাতে দিয়ে দেয়, তাদেব কষ্ট হয় না ?'

বাবা ভীষণ চিন্তিত হলেন। আপিসের মালীকে বললেন, 'তোর গিন্নি মা যা করল, এর ফল বহুদূর গড়াবে।'

কিন্তু সে গড়ানো যে কী গড়ানো তা বাবাও বোঝেননি। ন্যাদোশের সম্পূর্ণ জীবনী লেখা সম্ভব নয়। ন্যাদোশ লিখে গেলে তা লেখা হতে পারত, কিন্তু ন্যাদোশ যদিও স্কুলের সব ক্লাসের পড়ার বইই খেয়েছিল (যেহেতু আমরা ন-জন ভাইবোন আর আমি একা তখন কলেজে পড়ি, সেহেতু সব ক্লাসের পড়ার বইই বাড়িতে থাকত), ও কলম বা কালি খায়নি। কলম বা কালির প্রতি বিদ্বেষ বা সে বিষয়ে ভয় থাকলে লেখা যায় না। ন্যাদোশের লেখাটা হল না কলম খেল না বলে।

যাক। অতি সত্বর দেখা গেল, ন্যাদোশ যে কোন্ সময়ে ঘরে উঠে এসে (বাড়িটা একতলা ছিল) পড়ার বই খেয়ে ফেলছে। বাবা বলতেন, 'অমনি করেই তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেখা যায়। চেয়ে দেখ্, কী ডিটারমিনেশানে বই খাচ্ছে।'

সত্যি, তাড়াতাড়ি সব জেনে ফেলার জন্যে ন্যাদোশ ব্যাকরণ থেকে ইংরিজিতে পত্র রচনার বই অবধি সব

খেয়ে ফেলত। বুঝতেই পারছ, ন্যাদোশের জীবনের সে পর্যায়ে ওর গোবর থেকে ঘুঁটে দেওয়া যেত না কিছুতে। অনীশ, অবু আর ফল্গুর বই ও ভালোবাসত। কিন্তু সবচেয়ে ছোটো ভাই টান্টুর বইই সবচেয়ে পছন্দ ছিল ওর। মেজ বোন মিতুল আর চতুর্থ বোন বুড়ি ছোটোবেলা বদ্ধ পাগল ছিল। ওদের বই খেত সাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। ছোটো বোন শারীর আর সেজ বোন কঞ্চির বই আর ফ্রক দুইই খেত। বাবার গেঞ্জি আর কয়েকটা টাই ছাড়া কিছু খায়নি। রঙের বিষয়ে ওর মতামত ছিল খুব (কোন্ বিষয়ে বা ছিল না), আর নীল রঙের যা দেখত তাই খেত। বাবার গেঞ্জিতে সেই থেকে আজও নীল দেওয়া হয় না।

এই খেয়ে খেয়ে ওর বোধ হয় জ্ঞান হয়েছিল মাছমাংস না খেলে শরীর ভালো হয় না, ওকে আমিষাশী করার জন্যে আমি আর মা দায়ী। সেবার বাসন মাজার লোক আসছিল না। আমরা কলাপাতায় খেয়ে এঁটো পাতা বাইরে ফেলে দিতাম।
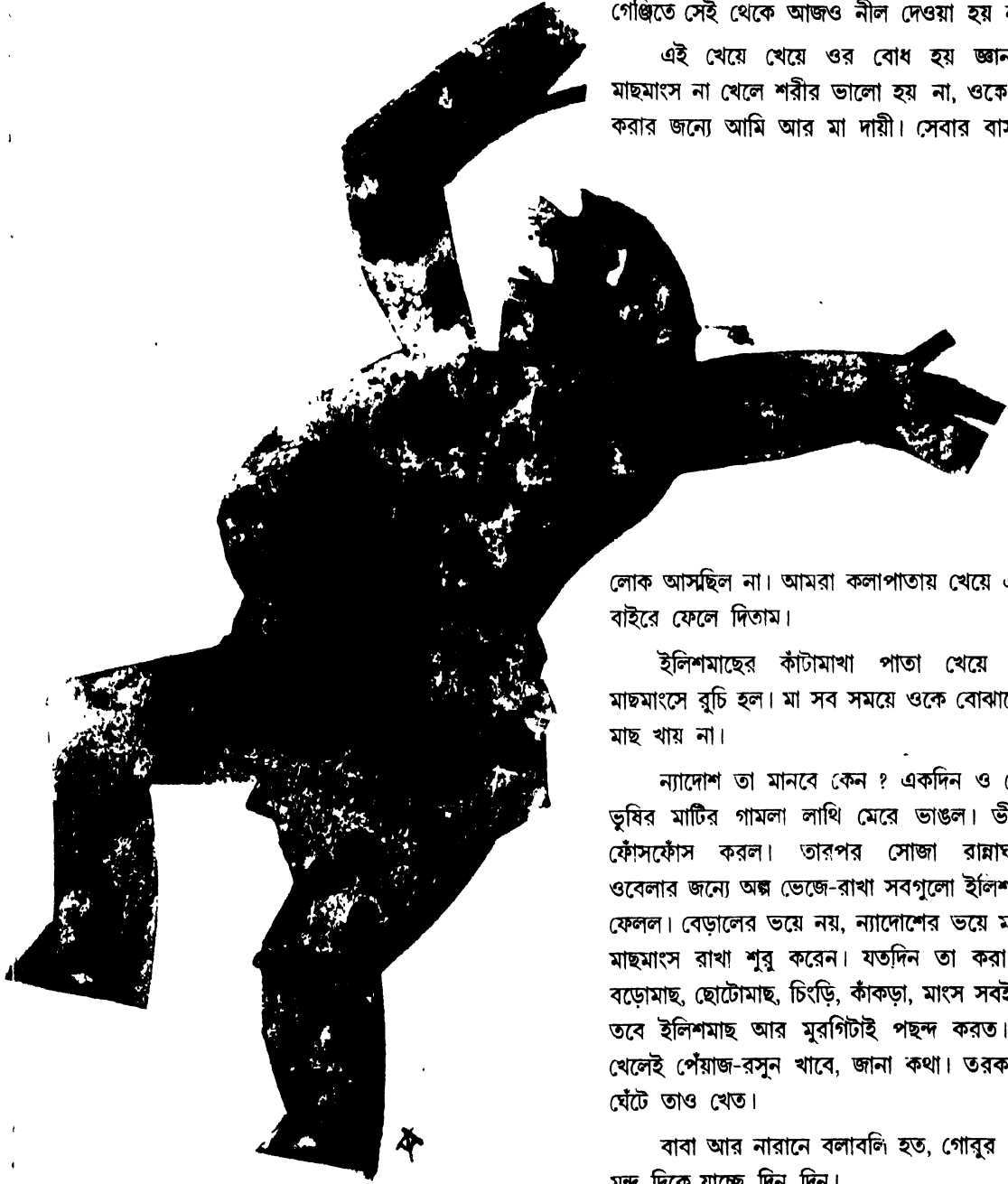
ইলিশমাছের কাঁটামাখা পাতা খেয়ে ন্যাদোশের মাছমাংসে রুচি হল। মা সব সময়ে ওকে বোঝাতেন, গোরু মাছ খায় না।

ন্যাদোশ তা মানবে কেন ? একদিন ও খোল আর ভুষির মাটির গামলা লাথি মেরে ভাঙল। ভীষণ রাগে ফোঁসফোঁস করল। তারপর সোজা রান্নাঘরে ঢুকে ওবেলার জন্যে অল্প ভেজে-রাখা সবগুলো ইলিশমাছ খেয়ে ফেলল। বেড়ালের ভয়ে নয়, ন্যাদোশের ভয়ে মা শিকেতে মাছমাংস রাখা শুরু করেন। যতদিন তা করা হয়নি ও বড়োমাছ, ছোটোমাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, মাংস সবই খেয়েছে। তবে ইলিশমাছ আর মুরগিটাই পছন্দ করত। মাছমাংস খেলেই পেঁয়াজ-রসুন খাবে, জানা কথা। তরকারির ঝুড়ি ঘেঁটে তাও খেত।

বাবা আর নারানে বলাবলি হত, গোবুর গতিক খুব মন্দ দিকে যাচ্ছে দিন দিন।

নন্দন রিকশায়লাও বাবাকে বলেছিলেন, 'সম্ভবত ন্যাদোশকে ভূতে পেয়েছে।'

মাছমাংস খেলে বাঘের মতো পায়ের ওপর দখল হবে। শেষে ওকে গোয়ালে বন্ধ করে রাখা হত। মার গোরুদের সবসময়ে খোলা বাতাস দরকার হয়। তাই গোয়ালে সবসময়ে বেঁটে দরজা থাকত, ওপরটা তার কাটা। ন্যাদোশ সেই ফাঁক দিয়ে জিম করবেটের রুদ্রপ্রয়াগের চিতার মতো লাফ মারত। একবারও পা হড়কে যেত না। বেরিয়ে এসেই খটখট করে রান্নাঘরে উঠে আসত। কোনোদিন নিরিমিষ হলে রেগে যেত কী ! চোখ লাল করে তাকাত।

এরপরেই একদিন ও সম্পূর্ণ নতুন পথ ধরল। ভোর হলেই বেরিয়ে যেতে থাকল। মা বলতেন, 'ভোরের বাতাস খাচ্ছে।' কিন্তু ও যে এমন পুলিশবিরোধী তা কে জানত !

ভোরে গঙ্গার ধারে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকত। বিহারি কনস্টেবলরা গঙ্গা থেকে স্নান সেরে যতবার পাড়ে উঠত, ততবার ও ওদের ঢুঁ মেরে জলে ফেলে দিত। ব্রিটিশ পুলিসের সঙ্গে লড়া সোজা কথা নয়। ন্যাদোশ বোধ হয় পরাধীন ভারতের একমাত্র গোরু, যার নামে অনেক পুলিশ কেস হয়েছিল। এ পর্যায়টাও বেশ কিছুদিন থাকে।

সেবার ন্যাদোশ বছরখানেক বাড়ি ছেড়ে কোর্ট অঞ্চলে রইল। বাছুরও দিয়েছিল আদালতের মাঠে আর ওর দুধ কে খেয়েছিল জানি না। কেননা পাকা পাকা গোয়ালরাও ন্যাদোশের দুধ দোয়াতে পারেনি।

এইভাবে, ভয়ংকর স্পিডে জীবনের তিনভাগ কাটিয়ে একদিন খটখট করে ও বাড়ি ফিরল !

মার সে কী আনন্দ ! 'ন্যাদোশ ফিরেছে, ন্যাদোশ ভালো হয়ে গেছে, ন্যাদোশের মনে পড়েছে ও বাড়ির গোরু !'

তখন ওর খড় টাল করে রাখা হত ছাতে। একদিন বেজায় খটখট শব্দ। দেখা গেল ন্যাদোশ গম্ভীরভাবে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। গোয়ালের খড় নয়, ছাতের খড়ই ওর পছন্দ। অনীশ আর অবু, ছেলেরা যেমন যুক্তিবাদী হয়, মাকে বোঝাল, ন্যাদোশ নাকি বিজ্ঞানীদের মতো সব কিছুর উৎসে যেতে চায়। গোয়ালের খড় টড় নয়, সে খড় যেখান থেকে আসছে, সেই খড়ই ওর পছন্দ।

তখন শীতকাল। পূর্ণিমার দিন। ন্যাদোশ সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, বিকেলে ফিরল। খুব একটা নেশা নেশা ভাব।

মেনকা খবর দিল, গাছিরা যে তালের রস জমা করেছিল, ন্যাদোশ গাছিদের তাড়িয়ে দিয়ে সারাদিন রোদে বসে এন্তার তালের রস খেয়েছে। ওর বেজায় নেশাও হয়েছে। পা টলিয়ে টলিয়ে ও হাঁটছে।

কিন্তু ন্যাদোশ সে অবস্থাতেই ছাতে উঠে গেল। খড় খেতে খেতে এক সময়ে, যখন চাঁদ উঠছে, ও ন্যাড়া ছাতের আলসেতে দাঁড়িয়ে গেল।

সেই যে দাঁড়াল আর ন্যাদোশ নড়ে না। আমরা বেজায় ভয় পেলাম। পাশের বাড়ির মেসোমশাইকে সবাই ভয় পায়। উনি চাঁদ দেখতে মাসে একবার জানলা খোলেন, জানা কথা। ন্যাদোশ ওঁর নজর থেকে চাঁদকে আড়াল করে রেখেছে, আর হলও তাই ! মেসোমশাই জানলা খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ কী ! এ কী ! আমি পূর্ণিমার চাঁদ দেখব, গোরুর শিল্যুয়েট দেখছি কেন ? গোরু অল্প অল্প টলছে কেন ? এ কী ?'

সেদিন বাবাই ন্যাদোশকে নামিয়েছিলেন।

এই রকম জীবনযাপনের ফলেই বোধ হয় ন্যাদোশের অসুখ হল। বিশ্বসংসারকে ভয় পেত না। কিন্তু মিতুল ওকে একটা 'সিট' দেখাত। বাবা, বাবার গ্রুপের পরামর্শে অনেক দরকারি জিনিস কিনে ফেলতেন। তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধের জিপগাড়িতে খাকি কাপড়ের গদি বা সিট থাকত। সেগুলো বাবা কার পরামর্শে কলকাতা থেকে অনেক কিনে নিয়ে যান। মিতুল সেই রকম একটা সিট দেখালে ন্যাদোশ একমাত্র ভয় পেত আর চারটে ঠ্যাং ছেতরে মাটিতে পড়ে যেত।

ন্যাদোশের অসুখ হতে পশুচিকিৎসক বা ভেট্ এলেন। 'কী হয়েছে বাবা ?', বলে কাছে এগোতেই ন্যাদোশ তাঁকে তাড়া করল, তিনি হাঁউমাউ করে বারান্দার থাম দু-হাত দু-পায়ে আঁকড়ে ধরলেন। ন্যাদোশ ওঁর প্যান্টের পেছনে ঢুঁ মারতে থাকল। সে কী কেলেঙ্কারি ! শেষে ওঁকেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হল।

ওই অসুখেই ন্যাদোশ মরে যায়। কিছুই করা যায়নি ওর জন্যে। ওর কাছেই যেতে পারেনি কেউ। এখনও আমার ন্যাদোশের কথা খুব মনে হয়। ন্যাদোশকে ভোলা অসম্ভব।

বুদাখালির লড়াই

সরোজমোহন মিত্র

বুদাখালি। লালগঞ্জ আর চন্দনপিঁড়ির মতো কাকদ্বীপের আর একটা গ্রাম। লালগঞ্জ আর চন্দনপিঁড়ির মতো বুদাখালির ভাগচাষি আর খেতমজুরেরাও প্রাণপণে লড়াই করে শহিদ হয়েছেন।

১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সময়।

অন্য সব গ্রামের মতো বুদাখালি গ্রামের ভাগচাষিরাও জোতদার মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। লালগঞ্জের কাহিনি তাদের আরও উৎসাহিত করল। চাষের সময় থেকেই ছোটোখাটো সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চাষিদের সাহস, দৃঢ়তা আরও বড়ো লড়াই করবার প্রতিজ্ঞায় ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।

ডিসেম্বর মাস, চারিদিকে ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

১৫ ডিসেম্বর বুদাখালির ভাগচাষিরা মিলে ধান কাটতে গেল নিজেদের জমিতে। সেবাদল আর জোতদারদের দল ১৮ জন রাইফেলধারী পুলিশ নিয়ে আগের থেকে তৈরি হয়ে ওঁৎ পেতে ছিল কাছাকাছি জায়গায়। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল চাষিদের ওপর।

দশ বারো বছরের একটা ছেলে ধানের বোঝা মাথায় করে বাড়ি যাচ্ছে। জোতদারদের দল তার মাথা

থেকে ধান কেড়ে নিল, মারতে লাগল নির্মমভাবে। তার মাথা ফেটে গেল। মাথা আর নাক-মুখ হল ক্ষত-বিক্ষত, অজস্র ধারায় রক্ত ঝরতে লাগল।

এই বর্বর আচরণে সারা গ্রামের মেয়ে-পুরুষ একেবারে খেপে গেল। তারা ছেলেটাকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এল।

তিন চারশো স্ত্রী পুরুষ দা লাঠি বল্লম নিয়ে দৌড়ে এল, তারা ঘিরে ধরল জোতদারদের, গুন্ডা আর সশস্ত্র পুলিশদের। শুরু হয়ে গেল বুদাখালির সংগ্রাম।

ছেলেটাকে গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছিল ১৯ বছরের এক চাষি-বউ—নাম তার পাখি। আর ক-দিন পরেই সে মা হবে। একটা পুলিশ তার বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখির পেটে আঘাত করল। অসহ্য যন্ত্রণায় রক্তাক্ত দেহে আর্তনাদ করে উঠল, পেট চেপে ধরে শুয়ে পড়ল। মরণ-আঘাতে পাখির পেটের ছেলেটা মরে গেলে!

এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে সব স্ত্রী পুরুষ চাষিদের মাথায় খুন চেপে গেল। তারা মরিয়া হয়ে লাঠি বল্লম চালাতে লাগল। গুন্ডাদের অনেককে তারা জখম করল, তারা নিজেরাও জখম হল অনেকে।

ইতিমধ্যে জোতদারদের আরও অনেক গুন্ডা এসে যোগ দিল। তাদের সকলের হাতেই নানা অস্ত্র-শস্ত্র। কিন্তু চাষিরা তেমন প্রস্তুত ছিল না। সেজন্য সেদিনের লড়াইয়ে চাষিরাই জখম হল বেশি।

আগুন জ্বলে উঠল বুদাখালির প্রত্যেকটা মেয়ে পুরুষের বুকে। প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠল তারা। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক নেতাদের মিটিং বসল।

সব চাষি খেপে উঠেছে। অন্য কথা ভাববার অবসর তাদের নেই। তারা শত্রুকে আঘাত দেবার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষারও উপায় ঠিক করে নিল।

পাড়ায় পাড়ায় জোয়ানদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দল তৈরি হয়ে গেল। মেয়েরাও পিছিয়ে রইল না, তাদের নিয়ে তৈরি হল পৃথক দল।

কিন্তু তারা প্রস্তুত হবার আগেই শত্রুরা আক্রমণ করে বসল। যেদিন সন্ধ্যায় চাষিদের নেতারা সব পরিকল্পনা তৈরি করেছে সেদিন রাত্রি একটার সময় চার জন অফিসারের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন পুলিশ নিয়ে জোতদারদের গুন্ডারা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পুলিশ আর গুন্ডারা চাষি-নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করল। পশুপতি, বিহারী, গবুয়া হালদার, শিবু মণ্ডল, হরিশ মণ্ডল—সমস্ত নেতার বাড়ি গিয়ে তারা ঘর ভেঙে দিল, অনেককে প্রচণ্ড প্রহার দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলল। দুটি চাষি-বউয়ের উপর অত্যাচার করল। যাবার সময় শাসিয়ে গেল, দরকার হলে এর চেয়ে বেশি অত্যাচার করবে।

ক্রোধে ফেটে পড়ল বুদাখালির চাষিরা। পরদিন সকাল থেকেই তাদের পরিকল্পনামতো কাজ শুরু হয়ে গেল। অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা হল। গ্রামের চারদিকে পাহারা বসল। এবারে মেয়ে-পুরুষ সবাই তৈরি হয়ে গেল।

চাষিদের মুখে তখন এককথা, "জমি আব ধান দখলে রাখো, ধান নিজ খামারে তোলো, জোতদার লাটদারদের খামার থেকে ধান কেড়ে নিয়ে এসো, অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও।"

চাষিরা যেখানেই জোতদারদের গুন্ডাদের, লাটদার আর তাদের অত্যাচারী কর্মচারীদের দেখতে পায় সেখানেই তাদের মেরে অজ্ঞান করে ফেলে রাখে।

গুন্ডারাও তখন ভয় পেয়ে গেল। তারা দল না বেঁধে, সশস্ত্র না হয়ে তাদের ঘাঁটি থেকে বের হওয়া বন্ধ করল।

২২ ডিসেম্বর সকালে সেবাদলের এক বড়ো পান্ডা ভূষণপতি একা পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার হাতে বর্শা।

দুঃসাহসী বারো তেরো বছরের দুটি ছেলে তাকে দেখতে পেয়েই লাঠি নিয়ে আক্রমণ করল। এই হঠাৎ আক্রমণে ভূষণপতি দিশেহারা হয়ে পড়ল। সেই সুযোগে ছেলে দুটি বেদম প্রহার করল গুন্ডা সর্দারকে। ভূষণপতি হঠাৎ এক ফাঁকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরে এল একদল পুলিশ নিয়ে। এরই মধ্যে বড়োরাও খবরটা জেনে ফেলেছে। তাই তারাও তৈরি হয়েছিল। তারা পুলিশদলকে ঘিরে প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত করে ফেলল, শত্রুরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। বুদাখালির চাষিদের ওই হল প্রথম জয়।

পুলিশ আর গুন্ডারা মার খেয়ে পালাবার সময় একজন চাষিকর্মীকে পথে একা পেয়ে নিয়ে গেল তাদের ঘাঁটিতে। তারা ঠিক করল, চাষিদের হাতে তারা যে মার খেয়েছে, এর উপর তার প্রতিশোধ নেবে।

ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে পনেরো জন পুলিশ আর গুন্ডা মিলে সারাদিন ধরে কর্মীটিকে প্রহার করল, তার মুখ

থেকে সব খবর নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এত মার মেরেও তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের করতে পারল না। এই মারের ফলে কর্মীটি মরমর হয়ে গেল; চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে গেল।

এই সব ঘটনায় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল বুদাখালির মানুষ। তারা স্ত্রী-পুরুষ মিলে শপথ নিল : এর প্রতিশোধ নেব, সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মিলে একসঙ্গে ধান কেটে আনব, শয়তানরা যেখানে পাখির পেটের ছেলেকে মেরে ফেলেছে, সেই জমি থেকেও ধান নিয়ে আসব।

৩০ ডিসেম্বর। রাত্রিকালে ৩০ জন চাষি স্ত্রী-পুরুষ মিলে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ধান কাটতে গেল মাঠ থেকে।

চাষি-বউ পাখি তখনো বড়ো অসুস্থ। কিন্তু সেও পিছিয়ে রইল না। অসমর্থ দেহ নিয়ে তাদের সঙ্গে গেল। নিজের হাতে সে তার সমস্ত কলঙ্ক মুছে দেবে এই তার পণ।

তার স্বামী তখন জেলখানায় আটক। তারই কথা স্মরণ করে পাখি প্রতিজ্ঞা করল, ধান কাটতে কেউ বাধা দিলে নিজের হাতে তার দা-খানাকে সেই শয়তানের বুকে বসিয়ে দেবে, তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে। ভাগচাষিরা সবাই মিলে খেতের ধান কাটল। শয়তানরা কেবল দূরে দাঁড়িয়ে দেখল। ভয়ে আর এগোতে সাহস করল না।

৩১ ডিসেম্বর মাঠে নামল তিনশো মেয়ে-পুরুষ। সারাদিন তারা ধান কাটল। শত শত মণ ধান ভাগচাষিদের ঘরে উঠল।

এদিকে পুলিশবাহিনী আর জোতদারদের গুন্ডারা ঝোপে ঝাড়ে ওঁৎ পেতে ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই তারা সক্রিয় হয়ে উঠল।

পথ দিয়ে যাচ্ছিল চাষিদের এক প্রিয় নেতা। একা পেয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তিনি তাঁর গ্রেপ্তারের কথা গ্রামবাসীদের চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন।

এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে শত শত চাষি মেয়ে-পুরুষ দৌড়ে এল তাদের প্রিয় নেতাকে মুক্ত করতে। আসবার সময় হাতের কাছে যে যা পেলে তাই নিয়ে এল।

পুলিশদল ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু চাষি-জনতা তাদের ঘিরে ফেলল, তাদের নেতাকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল।

পুলিশবাহিনী তাদের শিকার পালাতে দেখে বেপরোয়া হয়ে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল জোতদারদের পান্ডা বিজয় মাধব।

গুলিতে বহু লোক আহত হল, চাষি-নেতা নীলকণ্ঠ, সুরেন আর সুধীরের অবস্থা সংকটাপন্ন হল। চাষিদের তারা প্রিয় সন্তান, প্রিয় নেতা। তারাই পুলিশের কাছ থেকে তাদের প্রিয় নেতাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে নিজেরা গুলির মুখে পড়ে ভীষণ জখম হয়েছে।

আরও অনেক লোক গুলিতে আহত হল। বীর চাষিরা পুলিশের গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে সব আহতদের সরিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু সরাতে পারল না তারা নীলকণ্ঠ, সুরেন আর সুধীরকে। তাঁরা তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে হয়তো তাদের বাঁচানো যেত। কিন্তু পুলিশের কাছে তো সাধারণ মানুষের কোনো দাম নেই।

অতএব পুলিশ-বর্বরেরা সেই অবস্থাতেই তাদের জেরা আরম্ভ করল গোপন সংবাদ জানবার জন্য। তারা যখন কোনো সংবাদই তাদের কাছ থেকে পেল না তখন তারা মরণাপন্ন তিন চাষিবীরকে লাথি মেরে আর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল। সুধীরের মৃত্যু হল সঙ্গিনের ঘায়ে। চাষিদের বুক থেকে সঙ্গিনের ঘায়ে রক্ত বেরুল ঝলকে ঝলকে, কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না।

বুদাখালির সংগ্রামী মানুষ এর পরেও দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে, আরও অনেকে বীরের মতো লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে।

তারপর বড়ো বড়ো সৈন্যবাহিনী, পুলিশ আর গুন্ডাদের অত্যাচার, হত্যা, ঘর জ্বালানো আর নির্বিচারে গ্রেপ্তারের ফলে একদিন বুদাখালির সংগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তাদের মন থেকে কি তা একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে?

আজও বুদাখালির মানুষ গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনে এই সব সংগ্রামের কাহিনি, তাদের প্রিয় সন্তান নীলকণ্ঠ, সুরেন এবং সুধীরের মতো বীরের আত্মদানের কাহিনি শুনে তাদের বুক আনন্দে গর্বে ফুলে ওঠে, তারা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শপথ নেয় :—

'দিন আসুক, শহিদ বীরদের হত্যার প্রতিশোধ নেব, কাকদ্বীপ থেকে জমিদার আর জোতদারদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলব।'

তিন-তিনটে ভাজা মাছ খেয়ে পালিয়ে গেল? বলিস কী অ্যাঁ! বাড়ির গিন্নি সৌদামিনী আচমকা ঝড়-বৃষ্টির মতো ঝাঁপিয়ে উঠলেন যেন।

এবার ত্রিসীমানায় ঢুকলে ঝাঁটা-পেটা করব, নুড়ো জ্বালিয়ে দেব মুখে। পোড়ারমুখি! বাড়ির কত্তা হরিনাথ বললেন—তোমার আশকারা পেয়েই তো মাথায় উঠেছে এতকাল। তুমি আবার কথা বলছ কী? বাড়ির বড়ো
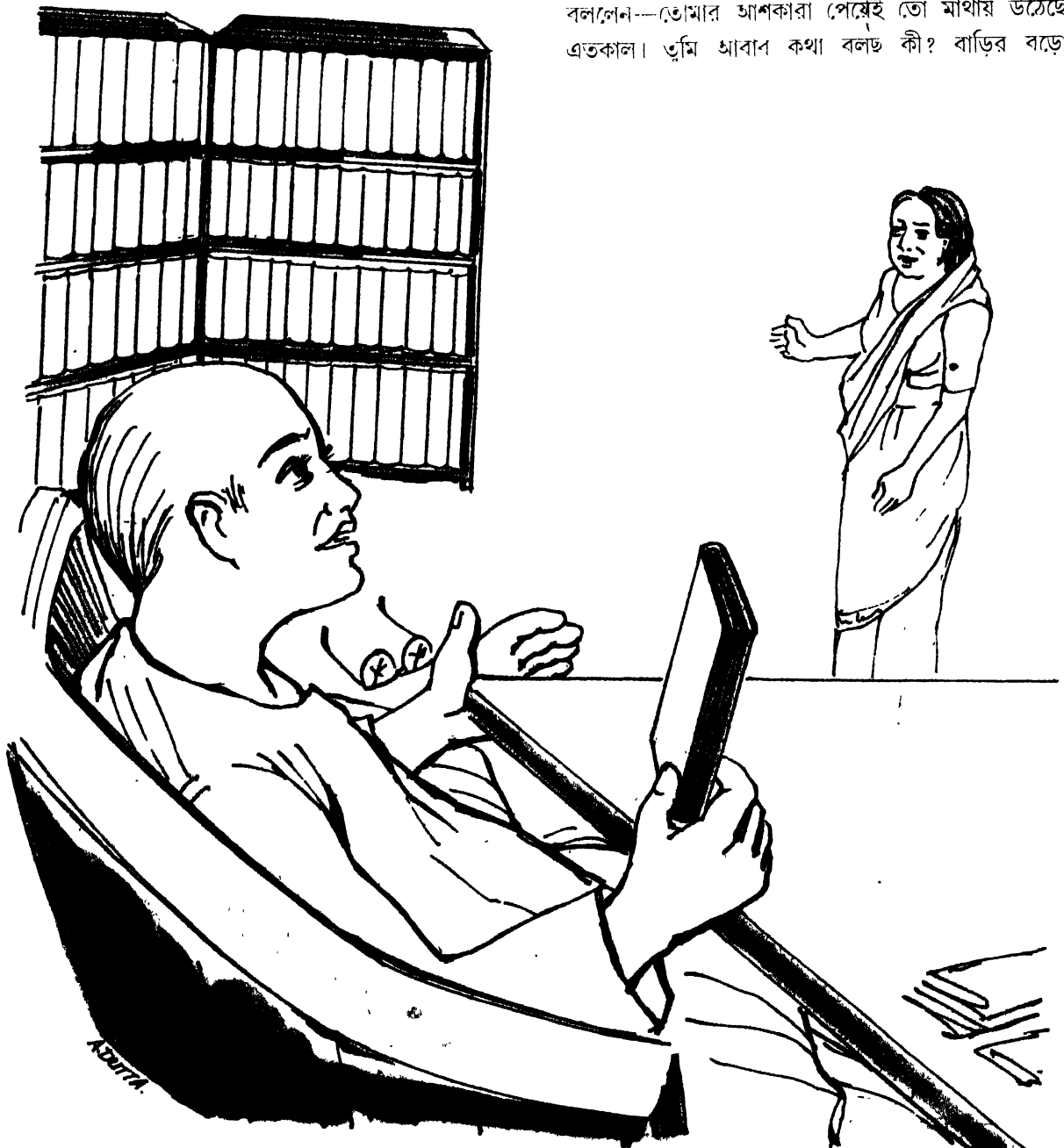
ছেলে অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি বললেন—তিন-তিনটে মাছ? তার মানে কম-সম করে তিন ছটাক। আজ কত করে মাছ কিনেছিস রে দেবু?

দেবু বাড়ির ছোটো ছেলে। পাড়ার ক্লাবের ক্রিকেটার। সে খেলতে গেছে। তাই ডাক পড়ল চাকর কুংফু-র। কুংফু ওর আসল নাম নয়। আসল নাম ছিল হরিনাথ। বাড়ির কর্তার নামে নাম। তাই নাক কুঁচকেছিলেন সৌদামিনী।—না বাবা, এখানে চাকরি-বাকরি হবে না। মালিক-চাকর এক নাম। সংসারে অনাচ্ছিষ্টি ঘটবে।

বাড়িতে চাকর না থাকার ফলে দেবুর হাতে পায়ে ফোসকা পড়ে যাচ্ছিল ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে। সে গিয়ে তার মেজকাকে ধরলে।

মেজকাকা একটা চাকর পাওয়া গেছে, মা তাকে রাখতে চাইছেন না।

—কেন? কেন?

—বাবার নামে নাম বলে।

—বাঃ, এটা তো একটা সমস্যা। আমার ডাইরিটা দে তো, লিখে রাখি। কোনো গপ্পে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।

মেজকাকা লেখক। তবে এখনো লেখক হননি। লেখক হবেন বলে নিজেকে তৈরি করছেন। পাকাপাকি লেখক হবার জন্যেই তিনি এখন ডাইরি লেখেন। জীবনের যত রকম অভিজ্ঞতা, সংসারের যত রকম ঘটনা, কলকাতার, পশ্চিমবাংলার, ভারতবর্ষের যত রকম কাণ্ডকারখানা, খবরের কাগজের যত রকম দুঃসংবাদ, শোকসংবাদ, হেডলাইন, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, বুক রিভিউ, খেলাধুলো, পাত্রপাত্রী, বাড়িভাড়া, গাড়ি বিক্রি, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, সব টুকে রাখেন তাঁর ডাইরিতে। দেবুর মুখ থেকে শোনা সমস্যাটা ডাইরিতে টুকে তিনি তিনতলার দক্ষিণমুখো ঘর থেকে নেমে এলেন একতলার উঠোনে। হরিকে এক পলক দেখে নিয়েই প্রশ্ন করলেন—তোমার ভালো নাম হরি? খারাপ নাম কী?

—এজ্ঞে, আমার কুনু খারাপ নাম নেই। আপনি একটা খারাপ নাম দিলে আমি চাকরিটা পাই বাবু। না খেয়ে, না দেয়ে মরে যাচ্ছি বাবু।

ঠিক আছে, পরশু আসিস। রামায়ণ, মহাভারতে অনেক খারাপ খারাপ বিচ্ছিরি বিদ্‌ঘুটে, বিট্‌কেল বদ্‌খত নাম আছে। বই দুটো পড়ে একটা নাম বেছে রাখব। ভালোই হল। এই সুযোগে রামায়ণ, মহাভারতটা পড়া হয়ে যাবে। সব ভুলে গেছলাম।

হরি সে দিন চলে গিয়ে, একদিন বাদে হাজির। মেজকাকা বললেন—ভেবেচিন্তে দেখলুম তোর নাম হওয়া উচিত কুম্ভ। কুম্ভকর্ণই দিতুম। কিন্তু কর্ণ মানুষটা ভালো বলে, তাই ওই দুটো অক্ষর বাদ, গোটা রামায়ণে কুম্ভকর্ণ বেটা নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। দেশে যখন সংকট, তখন যারা ঘুমোয় তাদের ফাঁসি দেওয়া উচত। কুম্ভকর্ণ খুবই খারাপ লোক। তোর নাম হল তাহলে কুম্ভ। যা গিন্নিমাকে গিয়ে পেন্নাম করে চাকরিতে লেগে যা।

বাড়ির সেজছেলে ইতিহাসের গবেষক। মেজকাকার বক্তৃতা শুনতে পেয়ে তিনি ছুটে এলেন হন্তদন্ত।

—কী বলছেন মেজকাকা? কুম্ভ খারাপ নাম? ছিঃ ছিঃ! স্যার যদুনাথ সরকার বেঁচে থাকলে আত্মহত্যা করতেন। কুম্ভ কত বড়ো যোদ্ধা, মহান বীর, বিরাট দেশপ্রেমিক, আপনি জানেন না? লেখাপড়ায় আপনি তো দেখছি, একদম ছেলেমানুষ! টডের রাজস্থানটা আজকেই পড়ে ফেলুন। আর তা যদি না পারেন তো অবন ঠাকুরের 'রাজকাহিনী'।

হরি এই সব শুনে উঠোনের এক কোণে বসে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল—আপনাদের এত বড়ো শিক্ষিত বাড়ি, আপনারা একটা আজে-বাজে, হেঁজিপেজি, যাচ্ছেতাই ধরনের খারাপ নাম দিতে পারবেননি মোকে? একটা নামের জন্য না খেয়ে মরব আমি? কথাটা শম্ভুনাথ মানে বাড়ির মেজছেলের আঁতে লাগল। তিনি বললেন—কাঁদতে হবে না। ওঠ। কুম্ভর বদলে তোর নাম দিলুম কুংভো। নাম হিসেবে খুবই খারাপ। কারণ কথাটার কোনো মানেই হয় না।

সেই সময় বাড়ির বড়োছেলের ছোটোছেলে হিংচে একটা তে-চাকা সাইকেলে চেপে ছুটে এল সেখানে।

—মেজকাকা, কুংভোর চেয়ে ওর নাম দাও না কুংফু। খুব আধুনিক হবে। আজকাল কুংফু খুব চালু।

সেই থেকে এ বাড়িতে হরি হয়ে গেল কুংফু। বাড়ির বড়ো ছেলের ডাকে কুংফু কাছে আসতেই তিনি প্রশ্ন করলেন—আজ মাছ কিনেছিস কত করে?

—এজ্ঞে! আমি তো আজ বাজারে যাইনি। বাজারে গিছলেন মেজকত্তাবাবু। গিন্নিমা আমাকে নাগেরবাজারে পাঠিয়েছিলেন আঁশ বঁটিতে ধার দিয়ে আনতে।

তখন ডাক পড়ল মেজকত্তাবাবুর। তিনি সব শুনে বললেন—দাঁড়াও! ডাইরি দেখে বলছি।

মেজকত্তা একতলা থেকে তিনতলায় চলে গেলেন ডাইরি দেখতে। তাঁর ডাইরিতে দোকান-বাজারের হিসেব-নিকেশও টোকা থাকে। মেজকত্তা সবে দোতলায় উঠেছেন সেই সময় একতলায় সদরঘরে এসে ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠলেন সৌদামিনী। বাড়ির কত্তা হরিনাথ ব্যারিস্টার। তিনি চশমা চোখে দিয়ে একটা গাবদা-গোবদা মোটা আইনের বই পড়ছিলেন। একটা ছিঁচকে চুরির মামলা আছে কাল। সৌদামিনীর চিৎকারে তাঁর চোখ থেকে ঘরের সাদা কালো ছক আঁকা পাথরের মেঝেয় ছিটকে পড়ল চশমাটা। পড়েই চৌচির। আর সেই সঙ্গে, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ভেবে বাড়ির তিন ছেলের তিন তিনটে অ্যালসেশিয়ান এমন গাঁক-গাঁক গজর্ন করে উঠল যে, হরিনাথের হাত থেকে আইনের বইটাও লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে। হরিনাথ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে অ্যালসেশিয়ানদেব চেয়ে জোরে হেঁকে উঠলেন—কী হয়েছে কী?

—তোমার সংসার তুমি দেখো। আমাকে পাঠিয়ে দাও কাশী কিংবা বিন্দাবনে।

—কেন? কেন?

—তিন তিনটে মাছ খেয়ে গেল বেড়ালে। তো বাড়ির যে কোনো তিনজনকে তো মাছ না খেয়ে থাকতে হবে। এখন কেউ রাজি নয়। বড়োবউমাকে বললুম। তিনি বললেন, কী করে একথা বলছেন মা? ডাক্তার তো আপনার সামনেই বলে গেল, মাছের ঝোল ভাত খেতে। মেজোবউমাকে বললুম। তিনি বললেন আসছে কাল অমাবস্যে, ওই দিন আমি মাছ খাই না। আপনি আমাকে পরপর দুদিন মাছ না খাইয়ে রাখতে চান? নিজের পেটের মেয়েকে গিয়ে বললুম, মা পিংকি, সকাল বেলায় তোকে যদি মাছ না দিই.....। কথা বলতে না বলতেই ভাতের হাঁড়ির মতো ফুলে ঢোল হয়ে গেল মেয়ের মুখ। এই সংসার নিয়ে আমি কি পাগল হব?

বাড়ির মেজকত্তা এইসময় ডাইরি হাতে নিয়ে নিচে এসে বললেন .

—বউদি, মাছ মাছ করে এত চেঁচাচ্ছ কেন? আজ তো মাছ কেনাই হয়নি। মাছের দাম খুব চড়া বলে মাংস কেনা হয়েছে।

সৌদামিনীব চেহাবাটা কাতলা মাছের মতো। মেজকত্তার কথা শুনে মরা কাতলা মাছের মত হাঁ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তাবপব পাগলা হাতির মতো থপথপ করে ছুটলেন রান্নাঘরের দিকে।

রাঁধুনিব নাম এলোকেশী। সৌদামিনী ডাকেন মোতির মা। অন্যেবা কেউ বলে মোতিমাসি, কেউ ডাকেন মোতিপিসি, তিরিশ বছর কাজ করছে এ বাড়িতে। সৌদামিনী রান্নাঘরে এসে প্রশ্ন করলেন—হাঁগো মোতির মা, তখন তুমি হাঁউ মাঁউ করে মাছের কথা কী বললে? আমি আনাজ কুটতে কুটতে শুনলাম।

মোতির মা বললে—সে তো আপনাকে কিছু বলিনি গিন্নিমা। হিংচেকে বেড়ালের গপ্পো শোনাচ্ছিলুম।

নুলিয়া

শিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পঞ্চম শক্তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিকেল বেলাটা যে এমন সুন্দর ঝকঝকে হয়ে উঠবে, আশাই করিনি। সকাল থেকে ছিল একঘেয়ে বৃষ্টি আর কুয়াশা। আর সে কী ঘন কুয়াশা! আমাদের দেশে এমন কুয়াশা কখনও দেখিনি। চার-পাঁচ হাত দূর থেকে একটা গাড়ি চলে গেলেও বোঝা যায় না।

ছুটির দিন। ভাস্কর আমাকে এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিল। কিন্তু সকাল বেলা ওই রকম আবহাওয়া দেখে মনে হয়েছিল, এর মধ্যে আর কোথাও বেরোনো যাবে না। তিন দিন আগে আমি ভাস্করের লন্ডনের বাড়িতে পৌঁছেছি, কোথাও ঘোরাঘুরি করা হয়নি, শুধু আড্ডাই চলছে বাড়িতে বসে বসে।

বিকেল বেলা রোদ উঠল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল!

ভাস্কর বললে, চল, তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক। সবাই তো বিলেতে এসে রাজা-রানির বাড়ি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর মাদাম তুসোর মোমের পুতুলগুলো দেখে। তোকে আমি এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে সাধারণত কেউ যায় না। সারাজীবন সে জায়গাটার কথা ভুলতে পারবি না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ জায়গা ?

ভাস্কর রহস্যময়ভাবে হেসে বলল, এখন বলব না। আগে চল তো।

গ্যারাজ থেকে ভাস্কর ওর লাল রঙের গাড়িটা বার করল। আমি ওর পাশে বসে সিট-বেল্ট বেঁধে নিলুম।

রোদ উঠেছে বলে রাস্তায় একসঙ্গে অনেক গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। এ দেশে রোদ খুব বেশিদিন দেখা যায় না বলে এ দেশের লোকেরা এমন দিনে বাড়িতে বসে থাকতে চায় না।

এই রকম দিনে ট্রাফিক জ্যামও হয় খুব।

ভাস্করের খুব জোরে গাড়ি চালানো অভ্যেস। জ্যামে আটকে পড়লে ও খুব অস্থির হয়ে ওঠে।

আমি এ দেশে অনেকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। আমার কোনো ব্যস্ততা নেই। এ দেশে তো আর গাড়ির মধ্যে বসে থাকলেও গরম লাগে না। বাইরে ফিনফিনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমাদের দুজনের গায়েই ওভারকোট।

হাইওয়েতে পড়তে পড়তেই অনেকটা সময় লেগে গেল। তারপর গাড়িটা ছুটল সত্তর মাইল স্পিডে।

এক জায়গায় লেখা লিংকনশায়ার। ভাস্কর বড়োরাস্তা ছেড়ে গাড়িটা বেঁকিয়ে দিল সে দিকে। এর মধ্যেই প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, লিংকনশায়ারে কী আছে ? তা ছাড়া সন্ধে হয়ে গেল, এখন আর কিছু কি দেখা যাবে ?

ভাস্কর বলল, আমরা যাচ্ছি একটা গাছ দেখতে। সন্ধে হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।

আমি অবাক হয়ে বললুম, একটা গাছ দেখতে এত দূর আসা ?

ভাস্কর বলল, 'উল্সথ্রপ ম্যানর', এই নামটা কি তোর চেনা-চেনা মনে হচ্ছে ?

আমি দু-বার উচ্চারণ করলুম, উল্সথ্রপ ম্যানর ! উল্সথ্রপ ম্যানর ! একটু যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় শুনেছি বা পড়েছি এই নামটা, তা মনে পড়ল না।

ভাস্কর বলল, তুই ভুলে গেছিস ! কলেজজীবনে তুই-ই আমাকে একখানা বই পড়তে দিয়েছিলি।

গাড়িখানা এসে থামল খুব পুরোনো আমলের একটা বাড়ির সামনে। পেছন দিকে একটা বাগান।

ভাস্কর কিন্তু বাড়িটার গেটের দিকে গেল না। আমাকে বলল, চল, আগে বাগানটা দেখে আসি। পেছন দিকে একটা গেট আছে, আমি জানি !

আমি মনে মনে খানিকটা হতাশই হয়ে উঠছিলুম। এ কোথায় নিয়ে এল ভাস্কর ? একটা অতি সাধারণ পুরোনো বাড়ি, আর বাগানটাও এমন কিছু না। এই দেখতে এত দূর আসা ?

বাগানের মধ্যে ঢুকে একটা বেঁটে মতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভাস্কর প্রথমে বড়ো একটা নিশ্বাস টেনে বলল, আঃ !

তারপর সেই গাছতলায় কী যেন খুঁজতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এটা কী গাছ রে ?

ভাস্কর বললে, এখনও চিনতে পারছিস না ? এটা একটা আপেলগাছ। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো গাছের মধ্যে এটা একটা।

আমি তখনও বুঝতে না পেরে বললুম, সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো গাছ ? কোন্টা কোন্টা !

ভাস্কর এবার সারামুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, কলেজে পড়ার সময় তুই আমাকে সব সময় জ্ঞান দিতিস ! এবার চান্স পেয়ে আমি তোকে একটু জ্ঞান দিই ? ইতিহাসের অতি বিখ্যাত গাছ একটা হচ্ছে, যে গাছের নীচে বসে কপিলাবস্তুর এক রাজকুমার, তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ, তিনি গৌতম বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেটার নাম হচ্ছে বোধিবৃক্ষ। সেই গাছটা আছে বিহারের বোধগয়ায়। আর এটা হচ্ছে নিউটনের আপেলগাছ !

তখনই আমার মনে পড়ে গেল। উল্সথ্রপ ম্যানর হচ্ছে নিউটনের জন্মস্থান।

মনে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে একটা রোমাঞ্চ হল। এই সেই আপেলগাছ ? এই বাগানে নিউটন শুয়েছিলেন একদিন। হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল খসে পড়ল মাটিতে। নিউটন সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। গাছের ফল সব সময় সোজা পড়ে মাটিতে। কখনও ডানদিকে কিংবা বাঁদিকে বেঁকে যায় না ! পৃথিবীর কেন্দ্রের একটা শক্তি তাকে টানে।

সেই থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন গ্র্যাভিটেশান, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব !

কী বিরাট সেই আবিষ্কার ! এই প্রকৃতির অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা গেল ওই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব দিয়ে। চাঁদটা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে ওই জন্য। চাঁদ আর পৃথিবী একসঙ্গে সূর্যের চারপাশে বছর বছর একই রকমভাবে ঘুবছে ওই জন্য। আবার সব-কটা গ্রহ নিয়ে সূর্যও ঘুরছে এই গ্যালাক্সিতে, আবার এই মহাবিশ্বে, অনন্ত আকাশে সমস্ত গ্রহ-তারাপুঞ্জই পরস্পরকে এইভাবে টেনে রেখেছে !

আমার ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ে ভাস্কর বললে, নিউটন জন্মেছিলেন ১৬৪২ সালে। অতদিন একটা আপেলগাছ তো বাঁচে না। আসল গাছটার ডাল কেটে গ্র্যাফটিং করে করে গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এটার কথা অনেকেই জানে না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ভাস্কর মাটি থেকে একটা আপেল কুড়িয়ে আনল।

এখন আপেল পাকবার সময় হয়েছে। আপেল এত সস্তা যে অনেকেই খেতে চায় না। এ রকম গাছ থেকে অনেক আপেল খসে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এ দেশে।

ভাস্কর আপেলটায় এককামড় দিয়ে বলল, এঃ, বাজে খেতে ! নিউটন নিশ্চয়ই এ আপেল খাননি কখনও।

আমিও আপেলটার অন্য দিকে একটা কামড় দিয়ে দেখলুম, সত্যিই কষা কষা স্বাদ। গন্ধটাও ভালো না।

একটা সাধারণ আপেলগাছ বিজ্ঞানের কী বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।

বাগানের একপাশে আরও কয়েকজন লোক রয়েছে। তার মধ্যে একজন বসে আছে একটা হুইল চেয়ারে। কম্বল দিয়ে গা-ঢাকা। খুব কাশছে লোকটি। মনে হয় খুবই অসুস্থ। এই ঠান্ডার মধ্যে একজন অসুস্থ লোককে এখানে নিয়ে এসেছে কেন জানে !

আরও একটুক্ষণ বাগানে কাটিয়ে, বাড়িটা ঘুরে দেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এ দেশের আবহাওয়া এরকমই। কখন যে রোদ উঠবে, আর কখন তুষারপাত শুরু হবে, তার কোনো ঠিক নেই।

গাড়িতে উঠে ভাস্কর বলল, আজ রাতে লন্ডনে না ফিরে গিয়ে একটা কাজ করা যেতে পারে। এখানেই রাতটা থেকে যাবি ? এখানে বেশ সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট সরাইখানা আছে।

আমার কোনো আপত্তি নেই। ভালোই হবে, একটা বিলিতি সরাইখানায় থাকার অভিজ্ঞতা হবে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ভাস্কর বলল, কলেজে পড়ার সময় তুই আমাকে আইজ্যাক নিউটনের একটা জীবনী পড়তে দিয়েছিলি। তখনকার একটা ঘটনা আমার মনে আছে। বইখানা একবার আমার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি ঝুঁকে বইখানা বাঁ হাত দিয়ে তুললাম। তুই তখন বললি, এই ভাস্কর, তুই এই যে অবহেলায় বাঁ হাত দিয়ে বইটা তুললি, তার মানে তুই এই পৃথিবীর পুরো মাধ্যাকর্ষণ টান অগ্রাহ্য করলি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান হচ্ছে, ৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ কিলোগ্রাম ; কতগুলো শূন্য, তোর মনে আছে, সুনীল ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, না রে। মনে নেই। টাটকা টাটকা বইখানা পড়ছিলাম তো ! তোর তো বেশ মনে থাকে দেখছি !

ভাস্কর বলল, সেই থেকে আমি নিউটনের ভক্ত হয়ে গেছি। এখন সময় পেলে বিজ্ঞানের বই আর পত্রপত্রিকা পড়ি। নিউটনের সম্পর্কে নতুন কিছু বেরোলে কেটে রেখে দিই।

আমরা এসে উঠলুম ছোট্ট একটা সরাইখানায়। উপরে নীচে চারখানা মেটে ঘর। ভারি চমৎকার সাজানো। দেখলে মনে হয়, দুশো তিনশো বছর আগেকার ইংল্যান্ড। এক কোণে ফায়ার প্লেস জ্বলছে। দেয়ালে পুরোনো আমলের ছবি। ম্যান্টলপিসের ওপর দুটি ছোটো ছোটো শ্বেতপাথরের মূর্তি। একটা গ্যালিলিয়ো আর একটা নিউটনের। গ্যালিলিয়ো যেদিন মারা যান, সেদিনই নিউটন জন্মেছিলেন। কী আশ্চর্য যোগাযোগ। বিজ্ঞানের জগতে এঁরা যেন পিতা আর পুত্র।

আমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে ভাস্কর নীচে গেল খাবারদাবারের কথা বলে আসতে। অন্য হোটেলের মতন এখানে কোনো বেয়ারা নেই, বেল দিয়ে কাউকে ডাকা যায় না। এক স্বামী-স্ত্রী সরাইখানাটি চালান, কিছু দরকার হলে তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে আনতে হয়।

ভাস্কর ফিরল বেশ দেরি করে।

চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, নিউটনের বাড়ির বাগানে আমরা যে হুইল চেয়ারে-বসা একজন অসুস্থ লোককে দেখলুম, সেই লোকটিও এই জায়গায় এসে উঠেছেন উনি কে জানিস ? উনি হলেন জেম্‌স পেট্রেল !

আমি জিজ্ঞেস করলুম। তিনি কে, ভাই।

ভাস্কর বলল, তুই জেম্‌স পেট্রেল-এর নাম শুনিসনি ?

আমি আবার দু-দিকে মাথা নাড়লুম।

ভাস্কর বলল, তুই এফ্রাইস ফিল্‌ বাখ্‌-এর নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই !

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললুম, তাও শুনিনি রে ! এরা খুব বিখ্যাত লোক বুঝি ?

ভাস্কর বলল, এফ্রাইস ফিল্‌ বাখ্‌ বিজ্ঞানের জগতে একটা ঝড় তুলে দিয়েছেন। আমেরিকার ইন্ডিয়ানাতে পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা পরীক্ষা করে নিউটনের থিয়োরিকে চ্যালেন্‌জ জানিয়েছেন। এঁরা দাবি করেছেন যে, প্রকৃতিতে একটা পঞ্চম শক্তি আছে।

আমি বললুম, পঞ্চম শক্তিটাই বা কী ব্যাপার ? আমার ঠিক ধারণা নেই রে ! আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না ?

ভাস্কর ধমক দিয়ে বললে, আজকাল সবার বিজ্ঞানের খবর রাখা উচিত। বিজ্ঞানের জোরেই মানুষের শক্তি কোথায় পৌঁছেছে। প্রকৃতির যে চারটি শক্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে, তা তুই জানিস তো।

আমি বললুম, এক সময় পড়েছিলুম বটে, ভালো মনে নেই। একটু সোজা করে বুঝিয়ে দে।

ভাস্কর বলল, প্রথমটাই হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই যে একটা জিনিস আর একটা জিনিসকে টানছে, কিন্তু কীভাবে টানছে, তা আজও ভালো করে বোঝা যায়নি। দ্বিতীয় হল ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম তার মানে বিদ্যুৎ-চুম্বক-আলো একসঙ্গে। তৃতীয় হচ্ছে সেই প্রবল শক্তি যা, পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলোকে একসঙ্গে ধরে রাখে, আর চতুর্থ হল রেডিয়োঅ্যাকটিভ ধ্বংসের যে শক্তি।

আমি বললুম, আর একটু সহজ করে বোঝানো যায় না ?

ভাস্কর বললে, আর বোঝাতে পারছি না। বই দেব, পড়ে নিস। এবার আসল কথাটা শোন্‌। ওই ফিল্‌ বাখ্‌ দাবি করেছেন, মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত আর একটা শক্তিও আছে। অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফোর্স। সেই পঞ্চম শক্তি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চলছে। এখনও পুরোপুরি কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। জেমস পেট্রেল কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবেন ! কিন্তু তারপরেই ভদ্রলোক দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বোধহয় বাঁচবেন না।

—অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফোর্সটা ঠিক কী রকম, বলত ?

—খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি ! এক্ষুনি আমাদের নীচে খেতে যেতে হবে। পরে আর খাবার পাওয়া যাবে না। চল। যেতে যেতে বলি। মনে কর, একটা কাঠের বল আর একটা লোহার বল, এ দুটোকে যদি ওপর থেকে ফেলা যায়, তা হলে কোন্‌টা আগে নীচে পড়বে ?

—এটা আমি জানি ভাই। গ্যালিলিয়োর এক্সপেরিমেন্টের মতন ! লোহার বলটা ভারি বলে আগে পড়বে বলে মনে হয়। কিন্তু কোনো বায়ুশূন্য জায়গা থেকে যদি ফেলা যায়, তাহলে দুটোই একসাথে নামবে। কারণ, মাধ্যাকর্ষণ দুটোকেই সমানভাবে টানছে।

—এতদিন লোকে তাই জানত। কিন্তু এখন কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বলছেন, সব সময় দুটো সমানভাবে না-ও পড়তে পারে। মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত একটা কোনো শক্তি আছে, যা কোনো কোনো জিনিসকে ওপর দিকে টানে।

—এসব আমার মাথায় ঢুকছে না। তা ওই জেম্‌স পেট্রেল নামে বৈজ্ঞানিকটি অসুস্থ অবস্থায় এখানে এসেছেন কেন ?

—সঙ্গে ওঁর স্ত্রী এসেছেন। আরও দুজন শিষ্য এসেছেন। ওঁদের কাছে শুনলাম, জেম্‌স পেট্রেল নিউটনের থিয়োরির খুঁত ধরে যে প্রমাণ দেবেন, তা এখানেই ওই আপেলগাছের তলাতেই দেখাতে চেয়েছিলেন। তা হলে সারা পৃথিবীতে ওঁর নাম ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু উনি সে সময় পেলেন না। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হল না। তাই উনি নিউটনের কাছে হার স্বীকার করে এখানে মরতে এসেছেন।

—আহা রে !

আমরা নেমে এলাম খাবার ঘরে।

এখানে তিনটি টেবিল। এদিকের টেবিলে হুইল চেয়ার নিয়েই বসেছেন জেম্স পেট্রেল, তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রী, আর দুজন লোক। ওদিকের টেবিলে বসে আছে একজন মানুষ। খানিকটা পাশ ফিরে, তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মাথাভরতি চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, বিচারকদের উইগের মতন।

মাঝখানের টেবিলটা খালি, আমরা বসলাম সেখানে।

খাবার-দাবার আগে থেকেই সাজানো রয়েছে টেবিলের ওপর। আমরা কৌতূহলী হয়ে দেখতে পেলাম জেম্স পেট্রেলকে। ওঁর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, কিছুই খেতে পারলেন না। বোঝা যাচ্ছে অবস্থা খুবই খারাপ, এই অবস্থায় ওঁকে এই খাবার টেবিলে আনার কোনো মানে হয় ?

বোধ হয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেই ওই পাশের টেবিল থেকে জেম্স পেট্রেলের একজন শিষ্য ফিসফিস করে বললেন, উনি কিছুতেই ঘরে থাকতে চাইছেন না। জেদ ধরেছেন, এখানেই বসবেন।

আমরা খাবারে মনোযোগ দিলুম। অন্য টেবিলের একা ব্যক্তিটি এদিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। তাঁর মুখও দেখা যাচ্ছে না।

আমি ভাস্করকে জিজ্ঞেস করলুম, ওই লোকটি কে ?

ভাস্কর বলল, কী জানি। আগে দেখিনি, লোকটা কী রকম অভদ্র, পেছন ফিরে আছে আমাদের দিকে !

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলুম।

জেম্স পেট্রেল চেয়ার থেকে পড়ে গেছেন মাটিতে। আমরা সবাই উঠে গেলুম তাঁর কাছে।

জেম্স পেট্রেলের চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে গেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, ঘনিয়ে এসেছে তাঁর সময়। তিনি ফিসফিস করে বললেন, আমাকে আপেলগাছতলায় নিয়ে চলো।

ওঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন ডাক্তার তা বোঝা গেল, তিনি একটা স্টেথোসকোপ আরও কী সব যন্ত্রপাতি চট করে এনে পরীক্ষা করে দেখলেন জেম্স পেট্রেলকে।

তারপর তিনিও হতাশভাবে বললেন, ওঁর শেষ ইচ্ছে পালন করাই ভালো। আর কোনো আশা নেই।

জেম্স পেট্রেলকে যখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়ির কাছে, তখন অন্য টেবিলের সেই বড়ো-চুলওয়ালা লোকটি এসে বলল, আমিও কি যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে ?

কেউ হ্যাঁ-ও বলল না, না-ও বলল না।

আমি আর ভাস্করও খাবার খেতে খেতে উঠে এলাম। জেম্স পেট্রেলের জীবনের শেষদৃশ্যটি দেখার জন্য আমাদেরও খুব কৌতূহল হল। আহা, একজন বৈজ্ঞানিক গভীর দুঃখ নিয়ে মরতে যাচ্ছেন। জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না।

উলসথ্রপ ম্যানর-এর বাগানে বেশ ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গেছে এই রাতেও। জেম্স পেট্রেলকে

শোওয়ানো হয়েছে সেই বিখ্যাত আপেলগাছটার নীচে। ওর এখনও জ্ঞান আছে। উনি ফিসফিস করে বলছেন, আইজাক নিউটন, আপনি আমাদের সব বৈজ্ঞানিকদের গুরু। তবু আপনাকে চ্যালেন্‌জ জানিয়ে আপনার যোগ্য শিষ্য হওয়ার আশা করেছিলাম। কিন্তু সময় পেলাম না। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

এর মধ্যে কে যেন বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলল, এক মিনিট্, এক মিনিট।

সেই বড়ো বড়ো চুলওয়ালা লোকটা এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে, ওভারকোটের পকেট থেকে বার করল একটা মস্ত বড়ো টর্চ।

জেম্‌স পেট্রেলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি খুব পুরোনো ধরনের ইংরিজিতে বললে, দাই মাস্ট নট ল্যামেন্ট, জেমস্ পেট্রেল, তুমি একজন সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক, নিউটনকে চ্যালেন্‌জ জানিয়ে তুমি উচিত কাজই করেছ। তোমার থিয়োরিও মিথ্যে নয়। এই দ্যাখো !

লোকটি আপেলগাছের ওপরের দিকে জোরালো টর্চের আলো ফেলল।

তখন দেখা গেল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

সেই মুহূর্তেই গাছ থেকে খসে পড়ল একটা আপেল। কিন্তু সেটা পড়তে পড়তেও ঝুলে রইল এক জায়গায়। থেমে গেল। আর পড়ছে না !

লোকটি বললে, দেখতে পাচ্ছো, জেম্‌স পেট্রেল ? অ্যান্টি গ্র্যাভিটি আছে।

মুমূর্ষু জেম্‌স পেট্রেল ফিসফিস করে বললেন, অবিশ্বাস্য ! অবিশ্বাস্য !

তাড়াতাড়ি তাঁর মাথাটা ঢলে পড়ল একদিকে। আপেলটাও পড়ে গেল মাটিতে।

ডাক্তারটি বলল, সব শেষ!

কিন্তু সেই লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে আর দেখা গেল না। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে এর মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে !

জেম্‌স পেট্রেলের মৃতদেহ সরাবার জন্য সময় গেল খানিকটা। অনেকেই এর মধ্যে সেই লোকটির খোঁজ করল, কিন্তু কোথাও আর পাওয়া গেল না তাকে। সে সরাইখানাতেও ফিরে যায়নি। সেখানে তার কোনো জিনিসপত্রও নেই। সে শুধু সেখানে খেতে এসেছিল।

আমাদের ঘরে ফিরে আসার পর আমি ভাস্করকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারটা কী হল, বল তো ? নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

ভাস্কর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কী আর হবে ! অলৌকিক তো কিছু না। এটা বিজ্ঞানও নয়। অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফোর্স বলে কিছু থাকলেও আপেল শূন্যে ঝুলে থাকবে না ওরকমভাবে। এটা ম্যাজিক। ও লোকটা নিশ্চয়ই একজন ম্যাজিশিয়ান !

আমি বললুম, কিন্তু লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় ?

ভাস্কর বলল, সবাইকে একটা স্টান্ট দিয়ে লোকটা সরে পড়েছে। এর পরেও থাকলে সবাই তো ওর কাছে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চাইত ! ম্যাজিক ! ম্যাজিক ! ম্যাজিশিয়ানরা কখনও তাদের খেলার ব্যাখ্যা দেয় না।

আমি বললুম, আমি কিন্তু ঠিক ম্যাজিক মলে মানতে পারছি না। এতগুলো লোক মিলে দেখলুম ...আচ্ছা ভাস্কর, তুই লোকটার নাক লক্ষ করেছিলি ?

ভাস্কর বলল, নাক ? লোকটার নাক দিয়ে কী হবে ? আমি বললুম, কেমন যেন ফোলা মতন নাক। অনেকটা বড়ো। মাথার ওরকম ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বিচারকদের উইগের মতন। ছবিতে নিউটনের চেহারাটা ঠিক এই রকম, না ?

ঝট করে আমার দিকে ফিরে ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, তুই কী বলছিস রে, সুনীল ?

আমি বললুম, স্বয়ং নিউটনই আসেননি তো ? একজন বৈজ্ঞানিক মনের দুঃখ নিয়ে মরে যাচ্ছে, তাই তিনি শেষ মুহূর্তে এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন !

ভাস্কর বলল, তোর মাথা খারাপ। নিউটনই ফিরে আসবেন কী করে ? তুই কি ভূত-টুতে বিশ্বাস করিস নাকি ?

আমি হেসে বললুম, হ্যামলেটের সেই লাইনগুলো মনে নেই ? দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ হোরেসিও....এই পৃথিবী ও বিশ্বলোকে এখনও এমন অনেক কিছু আছে, যা মানুষ কিংবা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই না ?

ছলিমুদ্দির নসিব

অজেয় রায়
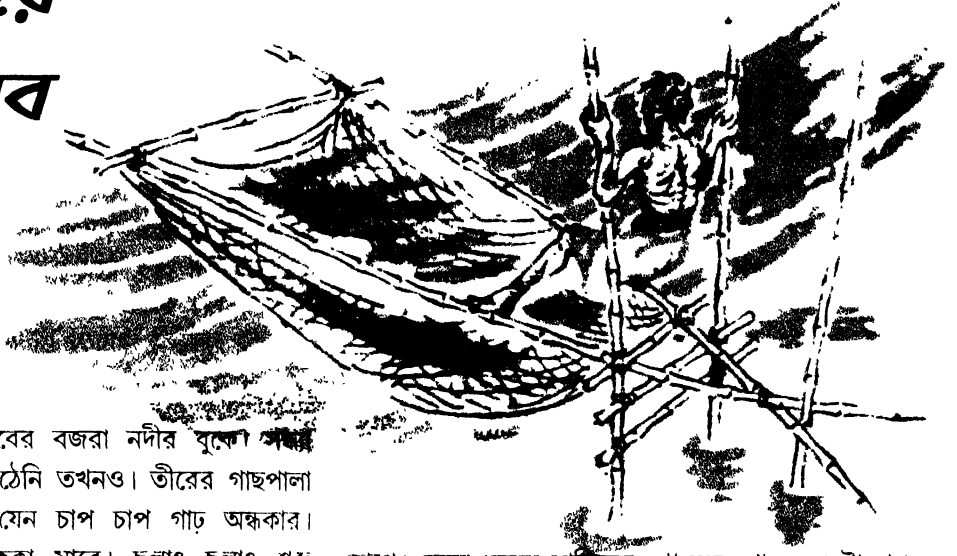
ভেসে চলেছে নবাবের বজরা নদীর বুকে। সন্ধ্যা নেমেছে। আকাশে চাঁদ ওঠেনি তখনও। তীরের গাছপালা ঝোপ-ঝাড়কে মনে হয় যেন চাপ চাপ গাঢ় অন্ধকার। বোটের গায়ে স্রোত ধাক্কা মারে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওঠে। বোটের ছাদে বসে আছেন নবাব বাহাদুর। ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়ায় মৌজ করছেন। বোট একটা চওড়া খালের মধ্যে বাঁক নিয়ে ঢোকে।

এই খাল ধরে একটু এগোলেই পড়বে ছোটো এক গঞ্জ। গঞ্জে আছে দোকানপাট। গঞ্জের ঘাটে নোঙর করবে নবাবের বোট। রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া হবে। রাত ওখানেই কাটবে। আবার সকালে যাত্রা নদীপথে।

নবাব প্রতি বছর এমনি সময় বোটে করে বেরোন। উদ্দেশ্য, খাজনা আদায় এবং মহালগুলির তদারকি করা। এই উপলক্ষে বেশ বেড়ানোও হয় ক-দিন। শিকার হয়। সঙ্গে থাকে মাঝি-মাল্লা, পাইক ও দু-এক জন কর্মচারী।

গঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছেছে বোট। চলছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ নবাবের কানে এল একটা অদ্ভুত আওয়াজ। একেবারে জলের ধারে। বোটের ঠিক পাশাপাশি একটা বড়ো গাছ। পিছনে আকাশ-পটে শুধু আঁকাবাঁকা সীমারেখাটুকু নজরে পড়ে। ডাল-পালা-পাতা সব মিলেমিশে জমাট কালো। ওর মধ্যে আগুনের ফুলকির মতো সাঁ সাঁ করে ছুটছে জোনাকিপোকা। হ্যাঁ, শব্দটা যেন আসছে ওই গাছের ওপর থেকে। নবাব উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। কেমন অদ্ভুত গোঙানির মতো আওয়াজ। খুব ক্ষীণ। থেকে থেকে হচ্ছে। কীসের? কোনো চেনা পশু-পাখির ডাক তো মনে হচ্ছে না! নবাবের কৌতূহল জাগে। ডেকে বলেন মাঝিদের—''ওরে শোন। একটা শব্দ উঠছে। কীসের বল্ তো?''

মাঝিদের হাবভাব দেখে বোঝা যায় তারাও শুনেছে ওই শব্দ। একজন একটু থতমতভাবে বলল—'আজ্ঞে হুজুর শুনছি। কীসের কে জানে? রাত-বিরেতে কত কী ডাকে।'

কী রকম! দেখতে হচ্ছে রহস্যটা। নবাব হুকুম দিলেন—'বোট ভেড়াও। খোঁজ করো ও কীসের আওয়াজ।'

বড়ো মাঝি ভয়ার্তস্বরে বলে উঠল,—'হুজুর অমন কর্ম করবেন না। বিপদে পড়ব। এ কি জ্যান্ত প্রাণীর গলা? একবার ওনাদের খপ্পরে পড়লে আর প্রাণে বাঁচব না কেউ। চলুন হুজুর, তাড়াতাড়ি পথটুকু পেরিয়ে যাই ভালোয় ভালোয়।'

নবাবটি বেজায় সাহসী। ভূত-টুত মানেন না। তেড়ে গর্জে উঠলেন—'খবরদার, থামাও বোট'।

কী আর করবে মাঝিরা, নবাবের হুকুম না মানলে গর্দান নির্ঘাত যাবে। বেচারারা ইষ্টনাম জপতে জপতে তীরে বোট লাগাল। সেই ভুতুড়ে গাছটা থেকে যথাসম্ভব দূরে।

চার-পাঁচজন পাইক এবং স্বয়ং নবাব পাড়ে নামেন। নবাবের এক হাতে টর্চ এবং একহাতে বন্দুক। পাইকদের

কাছেও একটা জোরালো টর্চ।—'চলো ওই গাছের নিচে।' নবাব অর্ডার দিলেন।

বাছা বাছা জোয়ান মরদ পাইক। দুর্দান্ত লেঠেল সব। কিন্তু তাদের মুখ শুকনো। ঠকঠক করে কাঁপছে। তারা ঝগড়া কাজিয়া করতে ওস্তাদ। দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করে না। নবাবের আদেশে যে-কোনো শত্রুর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণ নিতে বা দিতে পারে হাসিমুখে। কিন্তু সে হল সব জ্যান্ত জীবের সঙ্গে কারবার। অশরীরী ভূত-জিন-দানোর বিরুদ্ধে তাদের বাহুর শক্তি বা লাঠির দাপট কি কাজে আসবে? এ তো স্রেফ মরণের ফাঁদে নিজের প্রাণটাকে সঁপে দেওয়া। আর বদরাগী পিশাচ-দানোকে ঘাঁটালে তারা যে কী ভীষণ প্রতিশোধ নেয়, সেসব গল্প তারা অনেক শুনেছে। কিংবা এ হতে পারে পেত্নি শাক-চুন্নির চালাকি। ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে কাছে ডেকে এনে তারপর ঘাড়টি মটকাবে। ভয়ে পাইকদের আর পা চলে না।

নবাব হুংকার ছাড়েন—'কী বেটারা দাঁড়িয়ে কেন? কানে কথা ঢুকছে না বুঝি? চল্ গাছের কাছে। যে পালাবার চেষ্টা করবি, গুলি করে মারব তাকে। মনে রাখিস।'

অগত্যা পাইকরা এগোয়। নবাবের মেজাজ জানে তারা। বেমক্কা গুলি খেয়ে আগে ভাগে ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার চেয়ে দেখাই যাক কদ্দূর কী গড়ায়। গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করে দলটা ধীরে ধীরে গিয়ে গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখে বিড়বিড় করে—'রাম রাম....।'

প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ। কয়েকটা ডাল ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর। আওয়াজ আরও স্পষ্ট শোনা যায়। থেকে থেকে হচ্ছে। বিকৃত চাপা শব্দ। ভেসে আসছে মাথার ওপর থেকে। 'রাম রাম রাম রাম'— পাইকদের কণ্ঠে বিপদ্‌তারণী মন্ত্রও সোচ্চার হয়ে ওঠে।

নবাবের গম্ভীর বদন। তাঁর টর্চের আলো ডাল-পাতার ঘন আবরণ ভেদ করে ঘোরাফেরা করে। ওই যে কী যেন একটা সাদা রঙের... জলের ধারে ডাল-পালার ভিতরে। তবে সেটা যে কী বস্তু বোঝা গেল না। মানুষ? জন্তু? না অন্য কিছু? খানিক আলো ফেলার পরও কিন্তু বস্তুটি নড়েচড়ে না। ফলে অস্বস্তি আরও বাড়ে। চারিদিক নিস্তব্ধ থমথমে। শুধু ঝিঁঝির একটানা তীক্ষ্ণ রব। কী ওটা? কী ঘটবে? আশঙ্কায় ধক্ ধক্ করে হৃৎপিণ্ডগুলো। 'রঘু গাছে ওঠ্। দেখ্ ওটা কী।'—নবাব হুকুম দিলেন।

পাঁচ হাত লম্বা মিশকালো রঘুসর্দার। সাক্ষাৎ যমদূত-সদৃশ। যাকে আচমকা দেখলে বাচ্চা ছেলে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। বড়োদেরও বুক গুড়গুড় করে। সেই রঘু কাতরস্বরে বলে উঠল, 'হুজু-উ-র মা-বাপ—'

নবাব কটমট করে তাকিয়ে বন্দুকের নল রঘুর দিকে তাক করলেন। ব্যস্, রঘু কাঁপতে কাঁপতে গাছে উঠতে শুরু করল।

একটা টর্চের আলো তাকে অনুসরণ করল। আর একটা আলো স্থির হয়ে থাকে ওই সাদা বস্তুটির গায়ে। বন্দুক তৈরি। কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই। প্রস্তুত পাইকরা। বেগতিক বুঝলেই মারবে দে দৌড়।

এ ডাল সে ডাল করে রঘু ক্রমে সেই বস্তুটির কাছে হাজির হল। তার উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল—'হুজুর এ যে একটা মানুষ। গাছের ডালে আটকে আছ। গায়ে রক্তমাখা।'

'জ্ঞান আছে?'—নবাব জিজ্ঞেস করেন।

'—আজ্ঞে, ঠিক বুঝছি না। দুটো ডালের জোড়ে আটকে ঝুলছে।'

নবাব অন্যদের বললেন, 'তোরাও ওঠ্ গাছে। সাবধানে নামা লোকটাকে।'

এখন আর ভয় কী। আস্ত মানুষ যখন। কয়েকজন চটপট উঠে পড়ল গাছে। লোকটাকে নামানো হল মাটিতে। তার প্রাণ আছে। তবে জ্ঞান নেই। ঠান্ডা শরীর। শুধু গলা দিয়ে মাঝে মাঝে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। লোকটি মাঝবয়সী। দেখে মনে হয় গরিব। পরনে কেবল একটু ছেঁড়া বিবর্ণ হলুদ রঙের লুঙ্গি। ওই লুঙ্গিটাই সাদা দেখাচ্ছিল নিচ থেকে। তার বাঁ পায়ের উরুর মাংসে কতকগুলো গভীর ক্ষত। রক্ত বেরুচ্ছে কাটা থেকে। লোকটিকে ধরাধরি করে বোটে নিয়ে তোলা হল। ওষুধ লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করা হল। বাঁধা হল ব্যান্ডেজ। এরপর বাতাস, সেঁক ইত্যাদি অনেক শুশ্রূষা চলে। আধ ঘণ্টাটাক পরে লোকটি চোখ মেলল। আলো আর লোকজন দেখে সে প্রথমে ধড়ফড় করে উঠে বসার চেষ্টা করল। তাকে তক্ষুনি চেপে ধরে শুইয়ে দিল মাঝিরা। লোকটি মিনমিন করে বললে 'আমি কোথায়?'

রঘু বললে, 'তুমি নবাব সাহেবের বোটে। ওই গাছে উঠেছিলে কেন? তোমার পায়ে কাটল কী করে? কী হয়েছিল?'

'গাছে?'—লোকটি অবাক হয়ে বলে—'কই আমি তো কোনো গাছে উঠিনি।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ উঠেছিলে। আমরা তোমায় নামালাম যে। ঝুলেছিলে ডালে।'—বলল রঘু।

'ও, বুঝেছি। কুমির। ওঃ'—লোকটি খুব অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। আরও কথা বলার আগেই সে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

খানিক পরে চেতনা ফিরে আসতে একটু সুস্থ হয়ে সে বর্ণনা করল তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনি।

খালের জলে দাঁড়িয়ে সে জাল দিয়ে মাছ ধরছিল সাঁঝের ঝোঁকে। হঠাৎ তাকে কুমিরে ধরে। উরুর কাছে কামড়ে ধরে কুমিরটা তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। একবার ডুবছে একবার ভাসছে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে পায় কুমিরের মুখ। হাতড়ে হাতড়ে দুটো চোখ খুঁজে বের করে দু-হাতের দুই তর্জনী সোজা ভরে দেয় কুমিরের দু-চোখের ভিতর। একেবারে পুরো আঙুল। সঙ্গে সঙ্গে জান্তব কণ্ঠের বিকট এক আর্তনাদ। এবং পরক্ষণেই প্রচণ্ড ঝট্‌কায় কুমির তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর? তারপর আর কিছু মনে নেই। হুঁশ ছিল না তার। বোঝা গেল আহত ক্ষিপ্ত কুমিরের মুখ থেকে ছিট্‌কে এসে সে এই গাছের ডালে আটকে গিয়েছিল। আর কিছুক্ষণ এমনিভাবে থাকলে মরেই যেত। নেহাত বরাত জোর, তাই বেঁচে গেল।

জেলের পো ছলিমুদ্দি বারবার নবাবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবল তার প্রাণ রক্ষা করার জন্য। বোট আবার ছাড়ল। ছলিমুদ্দির গাঁ গঞ্জের পাশেই। গঞ্জের ঘাটে বোট যখন থামল তখন বেশ রাত হয়েছে। লোকজন কেউ প্রায় নেই বাইরে। ছলিমুদ্দি নেমে গেল। বলল, সে একাই বাড়ি যেতে পারবে।

জেলেপাড়ায় ছলিমুদ্দির ছোট্ট কুটির। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছলিমুদ্দি যখন তার বাড়ির সামনে পৌঁছল তখন গ্রাম নিঃঝুম। শুধু ছলিমুদ্দির বাড়িতে শোনা যাচ্ছে মরা-কান্নার রব। কারণ? কাবণ কে একজন ইতিমধ্যে তার বাড়িতে খবর পৌঁছে দিয়েছে যে ছলিমুদ্দিকে কুমিরে খেয়েছে। সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে : ছলুমিঞাকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেল জলের ভিতর। দেখেই সে দৌড়েছে গ্রামের দিকে। সংবাদ দিয়েছে তার বাড়িতে।

ছলিমুদ্দি পরম উৎসাহে হাঁক পাড়লে 'কই গো বেরিয়ে এসো। দেখো আমি ফিরে এসেছি?'

ব্যস্, কান্না বন্ধ। সব চুপ। সঙ্গে সঙ্গে দরজা-জানালায় ঝপাঝপ্ কুলুপ পড়ল। কুমিরের মুখ থেকে কেউ আবার ফিরে আসে নাকি? তবে এ কার গলা? এত রাতে। নিশ্চয় ছলিমুদ্দির প্রেত। সর্বনাশ! ঘরের মধ্যে আতঙ্কে কাঁপতে থাকে ছলিমিঞার ছেলে বউ।—হে খোদা! এ কী উপদ্রব? অপঘাতে মৃত্যু যে, তাই বুঝি এসব অলক্ষুনে কাণ্ড!

ছলিমুদ্দি অনেক ডাকাডাকি, অনুনয়-বিনয় করল। বোঝাল, অভয় দিল, কিন্তু দরজা খুলল না। জেলেপাড়ায় একটি প্রাণীও সাহসে ভর করে বেরিয়ে এল না সত্যি-মিথ্যা যাচাই কবতে। শুধু এক দুঃসাহসী ঘরের ভিতর থেকে বলল চেঁচিয়ে—'আসল ছলিমুদ্দি হও তো কাল দিনমানে এসো।' অর্থাৎ প্রমাণ চাই। ভূত দিনের আলোয় বেরুতে পারে না। এই তাদের বিশ্বাস। হতাশ ক্লান্ত ছলিমুদ্দি তখন আবার গুটিগুটি নবাবের বোটেই ফিরে গেল। চেনাশোনা আর কারও কাছে যেতে তার ভরসা হল না।

ব্যাপার শুনে নবাব তো অবাক। খুব খানিক হাসলেন। আবার চটলেনও ওদের কুসংস্কারের কথা ভেবে। যা হোক, ছলিমুদ্দি সে রাতটা বোটেই কাটাল। গরম মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠল। ঘুম দিল টেনে। সকালে সে আবার গেল বাড়িতে।

দিনের বেলা তাকে দেখে আর কারও সন্দেহ রইল না। এ স্বয়ং ছলুমিঞাই বটে। ভূত প্রেত নয়। এবার আনন্দের রোল উঠল তার ঘরে।

আবাব পরের বছর।

নবাবের বোট এসে ভিড়েছে সেই গঞ্জের ঘাটে। হঠাৎ একজন এসে নবাবের সামনে ঘাড় নুইয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। বলল,—'সেলাম হুজুর! ভালো আছেন তো? চিনতে পারেন আমায়?'

নবাব দেখলেন, সেই ছলিমুদ্দি। তার হাতে মাছ ধবার জাল। তিনি বললেন, 'কেমন আছ ছলিমুদ্দি?'

—'হুজুর আছি কোনো রকমে, আপনার কৃপায়।'

—'তা ওই খালে আর নামো না তো মাছ ধরতে?'

—'আজ্ঞে তা নামি বইকি।'—ছলিমুদ্দি জবাব দেয়।

'অ্যাঁ, সে কী! যদি ফের কুমিরে ধরে তখন?'

—'ধরলে মরব। নসিবে যা আছে হবে।'

—'কিন্তু জেনে-শুনে নামো কেন খালে?'—নবাব কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হন।

ছলিমুদ্দি করুণভাবে বলে, 'কী করব হুজুর, পেটের জ্বালা। মাছ না ধরলে যে অন্ন জুটবে না। আমাদের মতো গরিব মানুষের কি অত ভাবনা করলে পোষায়?'

কাঞ্জিলালের বন

ভবানীপ্রসাদ দে

রতনডিহির জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে অবনীদাদু কুমারকে বললেন, 'ভায়া, একটু পা চালিয়ে হাঁটতে হবে। চার ক্রোশ পথ। রাত পড়বার আগেই কাঞ্জিলালের বন পার হতে হবে আমাদের।'

কুমার নিচু গলায় বলল, 'কাঞ্জিলালের বনে নাকি ডাকাত থাকে। সত্যি, দাদু?'

দাদু শুকনো হেসে....বললেন, 'ডাকাত না থাক, সাপ-খোপ থাকতে তো বাধা নেই। চলো, 'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা' বলে হাঁটা দিই।'

কুমার আর অবনীদাদু—দুজনেরই বাড়ি ধান্যহাটি গ্রামে। ধান্যহাটির অবনীভাস্করকে চেনে না, এমন লোক আছে নাকি এ তল্লাটে? পাথর কুঁদে প্রতিমা তৈরি করতে তাঁর জুড়ি নেই। অবনীদাদুর গলাখানিও খাসা। গাইয়ে হিসেবেও তাঁর নামডাক আছে। কুমার তাঁর পাশের বাড়ির ছেলে, তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী। ভাস্করমশাই কুমারকে নিয়ে রতনডিহি থেকে ফিরছিলেন। সেখানকার জমিদার বাড়িতে মহা ধুমধাম করে তাঁর তৈরি শ্যামা মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। সেই উপলক্ষে জমিদার-বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। জমিদারমশাই অবনীদাদুকে প্রতিমা তৈরির মজুরি দিয়েছেন একটা রেশমি থলেয় ভরা দু'শ টাকা আর বিদায়ি হিসাবে দিয়েছেন গরদের চাদর। কুমারও বাদ যায়নি। সে পেয়েছে মুর্শিদাবাদি সিল্কের উড়ুনি।

লোকালয় ছাড়িয়ে সড়কপথে মাইল তিনেক আসার পর ভাস্করমশাই বুঝতে পারলেন সময়ের হিসেবে তিনি বড্ড গোলমাল করে ফেলছেন। সূয্যি ডুবতে বেশি দেরি

নেই, অথচ কাঞ্জিলালের বন পুরোটাই সামনে পড়ে আছে। সে বনের আধখানা পেরোতেই রাত হয়ে যাবে।

কাঞ্জিলালের বন মানে ঘন জঙ্গল নয়, কয়েক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বিরাট এক আম-কাঁঠালের বাগান। বনের মাথার উপর কাস্তের মতন সরু একফালি চাঁদ উঠেছে। আবছা অন্ধকারে বনের মাঝখানের পথটা বড়ো রহস্যময় ঠেকছে। সেই পথ দিয়ে বৃদ্ধ অবনীভাস্কর কুমারকে নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছেন। যত তাড়াতাড়ি হয়, কাঞ্জিলালের বন পার হতেই হবে তাঁদের।

অনেক দূর থেকে জোনাকির আলোর মতন ছোট্ট একটা আলো নড়াচড়া করতে করতে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছিল। ক্রমে বোঝা গেল সেটা জোনাকির আলো নয়, কেউ লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে আসছে। লণ্ঠনওয়ালা লোকটি কাছে আসতে দেখা গেল তার চেহারাখানা দশাসই, গায়ের রং বেজায় কালো। মাথায় ঝাঁকড়া বাবরি চুল। তার এক হাতে লণ্ঠনটা, আরেক হাতে গিঁটওয়ালা লম্বা একখানা লাঠি। লোকটা লণ্ঠনটাকে অবনীদাদু আর কুমারের সামনে তুলে ধরে কর্কশ গলায় বলল, 'কারা যায়?'

ভাস্করমশাই চড়া গলায় জবাব দিলেন, 'আমি ধান্যহাটির অবনীভাস্কর। তুমি কে?'

লোকটা বিনয়ে গলে জল হয়ে বলল, 'আপনিই ভাস্করমশাই? পেন্নাম হই। আমি হলাম গিয়ে দাসেদের লোক, আমার নাম পশুপতি। তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন বটে?'

'রতনডিহি থেকে। ওখানকার জমিদারবাড়িতে মায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হল। তাই গিয়েছিলাম সেখানে। পশুপতি, বন পেরোতে কতক্ষণ লাগবে?'

'জোর কদমে হাঁটলে আর ঘন্টাখানেক। কিন্তু, আজ্ঞে এখন তো ওদিকে যাওয়া যাবে না। একটু আগেই ভয়-ভীতের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। ঠ্যাঙাড়েরা একজন মানুষকে.. আজ্ঞে বুঝতেই পারছেন।'

লোকটার কথা শুনে অবনীদাদু ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, 'তাই তো, সঙ্গে ছেলেমানুষ নিয়ে এখন আমি কী করি।'

পশুপতি তার দু-পাটি দাঁত বের করে হেসে বলল, 'ভয় কী ভাস্করমশাই? আমার সঙ্গে আসুন। রাতখানা আমাদের কুঁড়েয় কাটিয়ে আবার সকালবেলা হাঁটা দেবেন।'

এই বলে লোকটা তার শক্ত মুঠোয় কুমারের একটা হাত খপ্ করে চেপে ধরে পথ ছেড়ে হিড় হিড় করে আমবাগানের মধ্যে ঢুকল। ভাস্করমশাইও তার পিছু পিছু চলতে লাগলেন।

লণ্ঠনের অল্প আলোয় বন-বাদাড় আর উঁচু-নিচু জমিতে পা ঠাহর করে তাঁরা পশুপতির বাড়িতে এসে পৌঁছুলেন। সেখানে বাগানের গাছপালা ফাঁকা হয়ে এসেছে। দূরে দূরে কয়েকটা কুঁড়েঘরে আলো জ্বলছিল। পশুপতির বাড়িতেও খড়ের ছাউনি দেওয়া দু'খানা কুঁড়েঘর, উঠোনের এক পাশে একটা গোলাও আছে। অবস্থা ভালোই মনে হয়।

ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে অবনীদাদু আর কুমারকে বসতে দিল পশুপতি। তারপর বললে, 'আপনাদের দু'টি খাবারের ব্যবস্থা করি?'

ভাস্করমশাই বললেন, 'আমরা অবেলায় খেয়ে বেরিয়েছি। এখনো তার গদ আছে। এক ঘটি করে জল খেয়ে শুয়ে পড়ব এখন।'

পশুপতি বলল, 'আমার ভাইয়ের বাড়িতে তিন তিনটে গাই বিইয়েছে। একটুখানি ক্ষীর নিয়ে আসি। তাই মুখে দিয়ে জল খাবেন।'

লণ্ঠনটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পশুপতি ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে শিকল তুলে বন্ধ করে দিল। কুমার চেঁচিয়ে বলল, 'ও পশুপতিদাদা, তুমি শিকল দিচ্ছ কেন?'

পশুপতি বলল, 'ক-দিন হল একটা ভাম বেরিয়েছে। এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ঢুকে আঁচড়ে-কামড়ে দিয়ে যাচ্ছে কিনা, তাই।'

ঘরের কোণে একটা কাঠের পিলসুজের ওপর পিদিম জ্বলছিল। কুমার পিদিমের সলতেটা অনেকটা বাড়িয়ে দিল। ঘরের দেওয়াল গিরিমাটি দিয়ে সুন্দর করে নিকোনো, তার ওপর আলপনা দেওয়া। একদিকের দেওয়ালের গা ঘেঁসে একগাদা বাক্স-তোরঙ্গ বসানো। তাদের ওপর একটা একতারা কাত করে রাখা ছিল। ভাস্করমশাই বললেন, 'পশুপতি দেখছি গান বাজনাও করে।'

কুমার একতারাটা তুলে নিয়ে টিং টিং আওয়াজ তুলল, তারপর হঠাৎ অবাক গলায় বলল, 'দাদু, এটা তো বিদ্যে বাউলের একতারা!'

বিদ্যে বাউলের আসল নাম বিদ্যাসুন্দর মোহান্ত। ধান্যহাটির কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে তার বাড়ি। বুড়ো বাউল একতারা বাজিয়ে নেচে-কুঁদে গান গাইত গাঁয়ে গাঁয়ে। একবার সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে একতারাটা ভেঙে ফেলেছিল। অবনীদাদু সেটা মেরামত করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে বিদ্যে বাউল ভাস্কর-মশাইয়ের কাছে এলে কুমার একতারাটা চেয়ে নিয়ে একটু-আধটু বাজাত। তার একতারা কুমার ভালো করেই চেনে। বুড়ো বাউল হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে যায়। লোকে বলে তাকে নাকি কাঞ্জিলালের বনে ডাকাতে ধরেছিল। কেউ দেখেনি তাকে আর কোনো দিন।

অবনীদাদু বললেন, 'বিদ্যাসুন্দরের একতারা পশুপতির ঘরে আসবে কেমন করে? এ তো বড়ো অবাক কথা।'

কুমার ফিস্ ফিস্ করে বলল 'দাদু, পশুপতি নামে লোকটা আসলে ডাকাত নয় তো? অনেক ডাকাত নাকি পথের লোককে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়িতে এনে খুব যত্ন-আত্যি করে। তারপর অতিথি ঘুমে চোখ বুজলেই ডাকাত তাকে মেরে সব কিছু নিয়ে নেয়। লাশটা কোনো পানাপুকুরের পাঁকে লুকিয়ে ফেলে।'

ঘরের দেওয়ালে আটকাঠির আলনায় দামি দামি জামাকাপড় টাঙানো। ফিনফিনে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবির পকেট বোঝাই নোটের টাকা। ভাস্করমশাই বললেন, 'পশুপতি কী এমন রোজগার করে যে দামি দামি জামা-কাপড় পরে, পকেট ভরতি টাকা রাখে? ব্যাপার তো খুবই সন্দেহজনক দেখছি।'

যে বাক্সগুলোর ওপর একতারাটি রাখা ছিল তাদের তলায় একটা কাঠের সিন্দুক। সিন্দুকটার মধ্যে কী যেন গাদাগাদি করে ভরতি করা আছে। সেই জন্যে তার ডালাটা ঠিকমতন বসেনি, একটু ফাঁক হয়ে আছে। কুমার পিলসুজসমেত প্রদীপটাকে বাক্সগুলোর কাছে নিয়ে গেল। সেগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে কুমার সিন্দুকটার ডালাটা তুলে ধরতেই দেখা গেল বেশ কিছু পাবড়া, বল্লম, সড়কি, ধারালো ঝকঝকে রাম-দা, এমনি সব অস্ত্রশস্ত্র। তাড়াতাড়ি সিন্দুকটা বন্ধ করে বাক্সপত্র সেটার ওপর যথাস্থানে রেখে সে বলল, 'দাদু, পশুপতি যে ডাকাত, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।'

ঠিক সেই সময় বন্ধ ঘরের দরজার শিকলটা ঝনাৎ করে খুলে গেল। অবনীদাদু আর কুমার দু-জনেই চমকে উঠে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন একজন বুড়ি মানুষ একটা লণ্ঠন হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে। বুড়ি ঘরে ঢুকে তাঁদের দেখে বলল, 'তোমরা কে গা?'

ভাস্করমশাই বললেন, 'আমাদের বাড়ি ধান্যহাটি গাঁয়ে। আমার নাম অবনীভাস্কর। আমার সঙ্গে আছে আমার কুমার ভাই। পশুপতি আমাদের রাস্তা থেকে ধরে এনেছে।'

বুড়ি তার হাতের লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেয় নামিয়ে রেখে ঢিপ করে ভাস্করমশাইকে একটা প্রণাম করল। বলল, 'আপনিই বুঝি পাথর কেটে ঠাকুর-দেবতা তৈরি করেন, তাঁদের নাম-গান করেন! বড়ো পুণ্যিমান লোক আপনি। কী ভাগ্যে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে আমাদের কুঁড়েয়।'

বুড়ি তার ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলল, 'পশুপতিটার ওই এক স্বভাব। রাস্তা থেকে অতিথি ধরে আনবে, তাদের খাওয়াবে-দাওয়াবে। তারপর তারা কখন যে চলে যায়, তা জানতেই দেয় না আমাকে।'

'পশুপতি কাজকর্ম কী করে? অতিথি-সৎকারের খরচ তো আছে।'

'সে কথা আর বলেন কেন বাবা? ছেলেকে কাজের কথা বললেই রেগে কাঁই। এক চিল্‌তে জমি আছে, চাষ দিলে দু-মুঠো ধান হয়। তাও করবে না। সারাটা দিন ঘুমোবে। জিজ্ঞেস করলে বলে হোথাকার কোন্ বড়ো লোকদের গাঁয়ে চৌকিদারি করে, তারা নাকি ভালো দেয় থোয়।'

অবনীদাদু হেসে বলল, 'তা পশুপতির মা, আমি যে ঠাকুর তৈরি করি, ঠাকুরের গান গাই—এসব কথা শুনলে কোথা থেকে?'

বুড়ি বলল, 'বাশুলির থানে মেলার সময় আপনি গান করেছিলেন। আমি যে আপনার গান শুনেছিলাম। সে গান শুনলে পাথরও গলে যায়। তারপর অম্বিকেপুরের কাছারিতে আপনার কেষ্টলীলার গান শুনিনি বুঝি?'

অবনীদাদু বললেন, 'ঠাকুর দেবতার নামকীর্তনে তোমার তো খুব ভক্তি দেখছি। বুড়ি-মা, তুমি শ্যামামায়ের গান শুনবে?'

'সে তো ভাগ্যির কথা, আপনি গাইলে শুনব বইকি, খুব শুনব।'

ভাস্করমশাই বললেন, 'তা হলে যাও, পাড়াপড়শি সবাইকে ডেকে আনো। সবাই মিলে শোনো।'

পশুপতি গিয়েছিল ভিনগাঁয়ে তার স্যাঙাতদের খবর দিতে যে শিকার ধরা পড়েছে। ঘন্টা দুয়েক পরে সে যখন তিন জন সঙ্গী নিয়ে ফিরে এল তখন তার বাড়ির উঠোনখানা লোকে লোকারণ্য। অবনীভাস্কর লণ্ঠনের আলোয় আসর বসিয়ে দরাজ গলায় একের পর এক শ্যামাসংগীত গেয়ে চলেছেন আর উঠোন ভরতি সকল বয়সের মানুষ তাঁর গান শুনছে। পশুপতির সঙ্গীরা ব্যাপার-স্যাপার দেখে পিঠটান দিল আর সে নিজে চুপ করে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল।

ভোরবেলা যখন রাত ফরসা হয়ে এল, গাছে গাছে পাখিরা ডেকে উঠল, তখন অবনীদাদু তাঁর গান থামালেন। অমনি চারিদিক থেকে সবাই তাঁকে ঢিপঢাপ প্রণাম করতে লাগল। বুড়োরা দাবি করল, 'বাবা, আজকে তাড়াহুড়োয় আমাদের গাঁয়ের সবাই আপনার গান শুনতে আসতে পারেনি। আপনাকে আরেক দিন আসতে হবে

ভাস্করমশাই পশুপতির দিকে এক নজর তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আসব বইকি। কিন্তু মুশকিল কী জানো, তোমাদের ওই কাঞ্জিলালের বনের পথটা মোটেই নিরাপদ নয়। কালকেই তো পথে পশুপতির সঙ্গে দেখা না হলে প্রাণটা বেঘোরে ডাকাতের হাতে যেত। এখনই বা কী করে ফিরব তাই ভাবছি।'

গাঁয়ের মুরুব্বিরা তখুনি হাঁক-ডাক করে পাঁচজন জোয়ান লাঠিয়াল ঠিক করল। তারা অবনীদাদু আর কুমারকে পাহারা দিয়ে ধান্যহাটি গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। পশুপতিকে তার মা হুকুম করল, 'তুইও যাবি ওদের সঙ্গে। হাজার হোক, উনি তো আমাদের বাড়িতেই অতিথি হয়ে এসেছেন।'

সকালবেলা পথের লোকেরা অবাক হয়ে দেখল কাঞ্জিলালের বনের মাঝখানের পথ দিয়ে এক বৃদ্ধ আর এক কিশোর ধান্যহাটির দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের আগে-পিছে তিন জন করে লাঠিয়াল রক্ষী। কিশোরটির হাতে ঝুলছে কাঁচা টাকায় ভরতি ফিনফিনে পাতলা রেশমি কাপড়ের একটা ঝুলি। গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে আসা সূর্যের কিরণ সেই ঝুলিটার ওপর পড়তেই সেটার ভিতরের ঝকঝকে টাকাগুলি ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

লেখক পরিচিতি

ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) : জন্ম : কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগনা। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। যে-কোনো ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনা অবলম্বনে বর্ণনামূলক অথবা ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কবিতা সাময়িকপত্রেই ছড়িয়ে ছিল, পরে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। তিনি কয়েকজন প্রাচীন কবির কাব্য ও জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) : জন্ম : বিল্বগ্রাম, নদীয়া। সংস্কৃত পণ্ডিত ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর 'শিশু-শিক্ষা' (তিন ভাগ) তাঁর অবদানের পরিচয় বহন করছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) : জন্ম : বীরসিংহ, মেদিনীপুর। সুবিখ্যাত মানবদরদি সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাবিস্তারকারী পণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা অনেক। ছোটোদের জন্য তাঁর অক্ষয় কীর্তি : 'বর্ণপরিচয়'। 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'ঋজুপাঠ', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', সংস্কৃত ব্যাকরণের 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' তার বিখ্যাত ছাত্রপাঠ্যগ্রন্থ।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) : জন্ম : চুপী, বর্ধমান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসঙ্গী গদ্যলেখক। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামের বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক ; অন্য রচনাবলির মধ্যে আছে 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার', 'পদার্থবিদ্যা' প্রভৃতি। ছোটোদের জন্য তাঁর তিন খণ্ড 'চারুপাঠ' অত্যন্ত সমাদৃত গ্রন্থ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) : জন্ম : সাগরদাঁড়ি, যশোহর। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অমর কবি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর নামের সঙ্গে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতা', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য এবং 'কৃষ্ণকুমারী', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) : জন্ম : সোনাপলাশী, বর্ধমান। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে পরে রেভারেন্ড হন। ইংরেজিতে লিখতেন। সাংবাদিকতা ও শিক্ষাপ্রসার ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর 'ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল' বইয়ের গল্পগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন লীলা মজুমদার। সংকলনে প্রকাশিত গল্পটি এই অনুবাদ-গ্রন্থ থেকেই চয়ন করা হয়েছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) : জন্ম বাকুলিয়া, বর্ধমান। স্বদেশ-প্রেমিক কবি। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চীকাবেরী', 'নীতি-কুসুমাঞ্জলি' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) : জন্ম : চৌবেড়িয়া, নদীয়া। তখনকার নীলচাষীদের দুরবস্থা নিয়ে লিখিত তাঁর নাটক 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। 'সধবার একাদশী', 'জামাই-বারিক', 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' তাঁর অন্য নাটক।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) : জন্ম : ছোটোজাগুলিয়া, ২৪ পরগনা। কবি ও নাট্যকার। ছাত্রদের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তক 'পদ্যমালা' ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : 'দুলীন', 'রামাভিষেক', 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', 'সতী' প্রভৃতি। যাত্রাগান, পাঁচালী, বাউল প্রভৃতি লোকগীতি রচনায় দক্ষ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) : জন্ম : কাঁঠালপাড়া, ২৪ পরগনা। 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান পুরুষ। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ' থেকে শুরু করে 'দেবী চৌধুরাণী', 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'লোকরহস্য' পর্যন্ত তাঁর রচনাবলি বাংলা সাহিত্যের রত্নবিশেষ। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটিও ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান বলে স্বীকৃত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) : জন্ম : গুলিটা, হুগলি। প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক কবি। 'বৃত্রসংহার', 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'আশাকানন', 'ছায়াময়ী', 'কবিতাবলী'

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর 'ভারত সঙ্গীত' কবিতার যে অংশটি সংকলনে গৃহীত হয়েছে তা বাংলার বিপ্লবীরা একসময় নিজেদের মধ্যে আবৃত্তি করে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) : জন্ম : নোয়াপাড়া, চট্টগ্রাম। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'অবকাশরঞ্জিনী', 'অমিতাভ' প্রভৃতি কাব্যের কবি 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সংকলনে গৃহীত পঙ্‌ক্তিগুলি একসময় বিপ্লবীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করত। আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : তাঁর আত্মজীবনী— 'আমার জীবন'।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) : জন্ম : হরিনাভি, ২৪ পরগনা। প্রখ্যাত সমাজ-সংস্কারক। 'আত্মচরিত', 'যুগান্তর', 'নয়নতারা' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এর লেখক। কিশোরদের জন্য ভারতের প্রথম মাসিক পত্রিকা 'সখা' ১৮৮৩ সালে প্রধানত এঁরই উৎসাহে প্রকাশিত হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) : জন্ম : রাহুতা, ২৪ পরগনা। বাংলা সাহিত্যে উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক। বিজ্ঞান-বিষয়েও তিনি অনেক কিছু লিখে গেছেন। উল্লেখযোগ্য রচনা : 'কঙ্কাবতী', 'ডমরু চরিত', 'ফোকলা দিগম্বর', 'ময়না কোথায়', 'মজার গল্প', 'ভূত ও মানুষ', 'মুক্তামালা' প্রভৃতি। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত অংশটি তাঁর 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১) : জন্ম : যশোহর। রবীন্দ্রনাথের মেজো বউঠান ; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। ছোটোদের জন্য ঠাকুরবাড়ি থেকে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৮৫), তাতে তরুণ রবীন্দ্রনাথও লিখতেন। বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার অনুকূলে ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। দুটি বিশিষ্ট বই 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'টাকডুমাডুম'।

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) : জন্ম : জয়দেবপুর, ঢাকা। 'ভাওয়ালের স্বভাবকবি' বলে পরিচিত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর 'স্বদেশ' কবিতাটি। 'প্রেম ও ফুল', 'শোকোচ্ছ্বাস' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তাঁর 'মগের মুলুক' গ্রন্থটি একসময় বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। আপসহীন এই সংগ্রামী কবির শেষজীবন দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) : জন্ম : পৈল, শ্রীহট্ট। বিখ্যাত দেশনেতা। স্বদেশি আন্দোলনে জেল খেটেছেন। 'নিউ ইন্ডিয়া', 'স্বরাজ', 'বন্দে-মাতরম্', 'দি হিন্দু-রিভিউ', 'দি ডেমোক্র্যাট' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'শোভনা', 'ভারত সীমান্তে রুশ', 'জেলের খাতা', 'নবযুগের বাংলা', 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম', 'দি বেসিস অফ স্যোস্যাল রিফর্ম' প্রভৃতি।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) : জন্ম : ময়মনসিংহ। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ, জীব ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী, 'বসুবিজ্ঞান মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাতা। বেতার-তরঙ্গ ও উদ্ভিদের অনুভবশক্তি সম্পর্কে তিনি বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর রচিত 'অব্যক্ত' বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী কীর্তি।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) : জন্ম : কলকাতা। 'অশ্রুকণা', 'সিন্ধুগাথা', 'শিখা', 'অর্ঘ্য', 'ভারতকুসুম', 'আভাস', 'স্বদেশিনী' 'জনৈকা হিন্দু মহিলার পত্রাবলী', 'কবিতাহার' তাঁর কয়েকটি কাব্য।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯-১৯৩৯) : জন্ম : নারিট, হাওড়া। ছোটোদের 'সখা' (১৮৯৩-৯৪) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 'ছেলেখেলা', 'টুকটুকে', 'রামায়ণ', 'ছবির ছড়া' 'পুষ্পাঞ্জলি', 'কবিতা কুসুম', 'বাঙলার ছবি' প্রভৃতি বইয়ের রচয়িতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম : জোড়াসাঁকো, কলকাতা। জনৈক লেখকের ভাষায়, 'বাঙালীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং কণ্ঠস্বর'। ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'ডাকঘর', 'গল্পসল্প', 'খাপছাড়া', 'মুকুট', 'সে' এবং 'গল্পগুচ্ছে'র কিছু গল্প ছোটোদের জন্য তাঁর স্মরণীয় রচনা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) : জন্ম : রাড়ুলি, খুলনা। বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ও ভারতে রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় উদ্যোগী। বাংলায় শিল্পোন্নতি ও ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসারে এবং বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। দরিদ্র ছাত্রদের বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র দেশসেবায়ও ছিলেন অগ্রণী। তাঁর বাংলা রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার', 'অন্নসমস্যায় বাঙালির পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' এবং ইংরেজিতে লেখা 'আত্মচরিত' প্রভৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) : জন্ম : কলকাতা। পূর্বনাম : নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় ভাষণ দিয়ে তিনি বিশ্বখ্যাত হন, পরে পৃথিবীর সর্বত্র গুরু রামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা প্রচার করেন এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবায় দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করেন। তাঁর 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মতত্ত্বের কথা সহজ ভাষায় বিবৃত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) : জন্ম : কৃষ্ণনগর, নদীয়া। প্রখ্যাত কবি, গীতিকার ও নাট্যকার। অজস্র দেশাত্মবোধক গান তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তাঁর বিখ্যাত নাটক : 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন' প্রভৃতি। এ ছাড়া, হাস্যরস ও ব্যঙ্গরসের গান এবং কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) : জন্ম : মসুয়া, ময়মনসিংহ। বাংলা শিশুসাহিত্যের একজন দিকপাল। ছড়া, উপকথা, রূপকথা, পুরাণের গল্প, মজার আখ্যান, বৈজ্ঞানিক কাহিনি লিখে তিনি শিশুসাহিত্যের চেহারা বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির অন্যতম: 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'টুনটুনির বই', ছেলেদের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' ও 'সেকালের কথা'। ১৯১৩ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করে তরুণ-চিত্তে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। সংগীত-জগতেও তাঁর দান আছে। চিত্রবিদ্যা ও মুদ্রণশিল্পেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায় তাঁরই পুত্র ও পৌত্র।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) : জন্ম : সাগরদাঁড়ি, যশোহর। উল্লেখযোগ্য বই 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি', 'বীরকুমার বধ কাব্য', 'পুরাতন ছবি', 'প্রিয় প্রসঙ্গ', 'বাঙালি রমণীদের গৃহধর্ম' প্রভৃতি।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) : জন্ম : বাখরগঞ্জ, বরিশাল। ভারতের প্রথম মহিলা অনার্স-গ্র্যাজুয়েট। 'আলো-ছায়া'র কবিরূপে সুবিখ্যাত। অন্য উল্লেখযোগ্য রচনা : 'মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক', 'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'গুঞ্জন', 'জীবনপথে', 'অশোক সঙ্গীত'।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) : জন্ম : কান্দি, মুর্শিদাবাদ। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবেত্তা। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের বিশিষ্ট অধ্যাপক, বাংলায় বিজ্ঞান-সাহিত্য লেখায় আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণপুরুষ ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ', 'জগৎ-কথা' ও 'নানা কথা'।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) : জন্ম : ভাঙাবাড়ি, পাবনা। সংগীত রচয়িতা 'কান্তকবি' রূপেই বিখ্যাত। হাসির গান, ভক্তির গান ও স্বদেশি গানের এই সফল স্রষ্টা গলায় ক্ষত হওয়ার ফলেই চিরবিদায় নেন। তাঁর রচিত 'বাণী' ও 'কল্যাণী' একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। অন্যান্য বই : 'অভয়া', 'অমৃত', 'আনন্দময়ী', 'সদ্ভাবকুসুম', 'বিশ্রাম' প্রভৃতি।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) : জন্ম : জয়নগর, ২৪ পরগনা। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পর শিশুশিক্ষার সর্বাধিক গ্রন্থের লেখক, ছড়ায়-ছবিতে শিশুসাহিত্যে নতুন জোয়ার এনেছেন। 'হাসি ও খেলা', 'হাসিরাশি', 'হাসিখুসি' 'খুকুমণির ছড়া', 'বনে জঙ্গলে' তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮) : জন্ম : জোড়াসাঁকো, কলকাতা। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্যতম পুরুষ, দ্বারকানাথের পুত্র গিরীন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রের পৌত্র গগনেন্দ্র, সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর চিত্রশিল্প স্বকীয় অবদানে উজ্জ্বল। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর 'ভোঁদড় বাহাদুর' এক অসাধারণ সৃষ্টি, যার কিছু অংশ এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) : জন্ম : জোড়াসাঁকো, কলকাতা। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্যতম প্রতিভাবান পুরুষ, ইনিও দ্বারকানাথের প্রপৌত্র, সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, গগনেন্দ্রনাথের অগ্রজ। শিল্পীরূপে তিনি বিশ্বখ্যাত। রেখায় ও লেখায় তাঁর স্বকীয়তা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁকে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী করেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বড়োদের জন্য যেমন ঘরোয়া ভাষায় স্মৃতিকথা রেখে গেছেন ('ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে') তেমনই ছোটোদের জন্য রেখে গেছেন বহু রচনা, তার মধ্যে 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'রাজকাহিনী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বিশিষ্ট বই : 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ', 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', 'ভারত-শিল্প', 'শিল্পায়ন' প্রভৃতি।

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) : জন্ম : ঢাকা শহর। 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'মোদের গরব মোদের আশা/আ মরি

বাংলা ভাষা', 'বল বল বল সবে' প্রভৃতি গানের সার্থক গীতিকার। সুরসৃষ্টিতেও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। 'কাকলি', 'কয়েকটি গান' ও 'গীতিগুঞ্জ' গ্রন্থে তাঁর গানগুলি সংকলিত। 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী ছিলেন এবং লখনউতে ব্যারিস্টারি করার সময় বহু জনহিতকর কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর গানের কথা ও সুর শিশুদের মনেও গভীর রেখাপাত করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) : জন্ম : দেবানন্দপুর, হুগলি। বাংলার অন্যতম কালজয়ী শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। অতি সাধারণ জীবন-পরিবেশে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে বড়ো হয়েছেন। বহু মানুষ সম্পর্কে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিছুদিন ব্রহ্মদেশেও চাকরি করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের গুরু বলে মানতেন। 'মহেশ', 'শ্রীকান্ত', 'রামের সুমতি', 'পল্লীসমাজ', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজবৌ', 'পণ্ডিতমশাই', 'বড়দিদি' প্রভৃতির স্রষ্টা। ছোটোদের জন্য তাঁর গল্পের বই 'ছেলেবেলার গল্প'।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) : জন্ম : শান্তিপুর, নদীয়া। রবীন্দ্র-অনুরাগী বিশিষ্ট কবি। রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'শতনরী', 'শান্তিজল', 'ঝরাফুল', 'প্রসাদী' উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) : জন্ম : উলাইল, ঢাকা। যৌবন থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রূপকথা উপকথা ব্রত ছড়া এ সব সংগ্রহে মন দেন এবং সেগুলিকে 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'দাদামশায়ের থলে', 'ঠানদিদির থলে' প্রভৃতি গ্রন্থে নতুন করে রচনা করে শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে অমর স্রষ্টারূপে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'চারু ও হারু', 'খোকাবাবুর খেলা', 'আমার বই', 'ফার্স্ট বয়', 'লাস্ট বয়', 'চিরদিনের রূপকথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চারণকবি মুকুন্দদাস (১৮৭৮-১৯৩৪) : জন্ম : বানারীগ্রাম, ঢাকা। পিতৃদত্ত নাম—যজ্ঞেশ্বর দে। অল্প বয়সে কীর্তন গাইতেন। পরে অশ্বিনী দত্তের প্রভাবে স্বদেশি যাত্রার দল গড়ে তোলেন এবং নিজে যাত্রাপালা ও গান লিখতে শুরু করেন। তাতেই দেশকে মাতিয়ে তোলেন। তাই তাঁকে চারণকবি বলা হত। তাঁর 'ছিল ধান গোলা ভরা/শ্বেত ইঁদুরে করল সারা' গানটির জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। 'মাতৃপূজা', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', 'পথ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা।

কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮-১৯৫০) : জন্ম : মসুয়া, ময়মনসিংহ। ৩ গধারে ক্রীড়াবিদ আলোকচিত্রী ও শিশুসাহিত্যিক ; উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে 'কথাসরিৎসাগর', 'পুরাণের গল্প', 'ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র'। অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা বহু।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) : জন্ম : জমশেরপুর, নদীয়া। রবীন্দ্রযুগের এই কবির অনেক কবিতা একদা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এঁর কয়েকটি কাব্যের নাম : 'জাগরণী', 'পাঞ্চজন্য', 'পথের সাথী', 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'নাগকেশর', 'মহাভারতী', 'নীহারিকা', 'কাব্যমালঞ্চ' প্রভৃতি। 'জন্মভূমি', 'মাতৃহারা', 'অন্ধ বধূ', 'কাজলাদিদি' প্রভৃতি কবিতা ছোটোদেব মনে দাগ কাটে।

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) (১৮৮০-১৯৬০) : জন্ম : শক্তিগড়, বর্ধমান। বিজ্ঞানবিদ রাজশেখর বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করেন এবং 'কজ্জলী' ও 'গড্ডলিকা'র রসরচনাগুলির মারফত পাঠকচিত্ত জয় করে নেন। একদিকে তাঁর রসরচনা, অন্যদিকে তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধান ইত্যাদি তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করেছে। তাঁর অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ : 'হনুমানের স্বপ্ন', 'ধুস্তুরি মায়া', 'চমৎকারী', রামায়ণ ও মহাভারত সারানুবাদ, 'বিচিন্তা' ইত্যাদি।

দাদা ঠাকুর (১৮৮১-১৯৬৮) : জন্ম : নলহাটি, বীরভূম। আসল নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। ইংরেজি ও বাংলা ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক ছড়া ও গান রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'বিদূষক' নামে একটি উপভোগ্য কৌতুক-পত্রিকার পাশাপাশি সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেন 'জঙ্গীপুর সংবাদ'। তাঁর বহু রচনা একটি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে।

যামিনীকান্ত সোম (১৮৮২-১৯৬৪) : জন্ম : পিংলা, মেদিনীপুর। ছোটোদের জন্য অনেক মনোরম কাহিনি লিখে গেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য : 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ', 'ছোট্ট শরৎ', 'কবিদাদুর গল্প', 'খেলাঘর', 'মহাভারতের গল্প', 'পুঁথি পুরাণের গল্প' প্রভৃতি।

গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) : জন্ম : বীরশ্রী, শ্রীহট্ট। জেলাশাসক থেকে দেশজননীর সেবায় উৎসর্গিত, বাংলার 'ব্রতচারী সমিতি'র সংগঠক। 'ব্রতচারী সখা' গ্রন্থে লোকগীতির সংকলন করেন। 'ভজার বাঁশী', 'পাগলামির

পুঁথি', 'সরোজনলিনী', 'পটুয়া সঙ্গীত', 'চাঁদের বুড়ি' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) : জন্ম : নিমতা, ২৪ পরগনা। রবীন্দ্রযুগের শক্তিশালী কবি, নানা ছন্দ-রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কবিতায় রূপের সঙ্গে ছন্দের, ভাবের সঙ্গে তথ্যের, রসের সঙ্গে জ্ঞানের যে সুন্দর মিলন দেখা যায় তা শিশু ও কিশোরচিত্তকে খুবই আকর্ষণ করে। প্রধানত ছোটোদের জন্য তাঁর কবিতার দুটি সংকলন : 'শিশু-কবিতা' ও 'কাব্য-সঞ্চয়ন'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'বেণু ও বীণা', 'তীর্থরেণু', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'হসন্তিকা' প্রভৃতি।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০) : জন্ম : কোগ্রাম, বর্ধমান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাংলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে।' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'উজানী', 'একতারা', 'বনতুলসী', 'রজনীগন্ধা', 'শতদল', 'বীথি', 'বীণা', 'অজয়', 'বনমল্লিকা' প্রভৃতি।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৩-১৯৬৫) : জন্ম : মূলচর, ঢাকা। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'কেদার রায়', 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'বাংলার ইতিহাস' প্রভৃতি ইতিহাসকাহিনির লেখকরূপেই খ্যাত। তাঁর লেখা বহু জীবনীগ্রন্থও আছে। তাঁর অন্যতম কীর্তি 'শিশুভারতী' নামক কোষগ্রন্থের সম্পাদনা। শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কৈশোরক' পত্রিকাও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) : রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রিয়পাত্র এবং প্রায় দুশো নানা ধরনের গ্রন্থের লেখক একদা 'ভারতী' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন। ছোটোদের মাসিক মৌচাক প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। যেমন লিখেছেন বড়োদের জন্য, তেমনই ছোটোদের জন্যও। তাঁর 'বাবলা', 'কাজরী', 'আঁধি' প্রভৃতি বিশিষ্ট উপন্যাস। ছোটোদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : 'মা কালীর খাঁড়া', 'চালিয়াৎ চন্দর', 'ভারতের রূপকথা', 'অবাক পৃথিবী', 'ভূতুড়ে', 'লালকুঠি', 'পাঠানমুলুকে', 'ছোটদের প্রিয় গল্প', 'জনসেবক লেনিন', 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি' প্রভৃতি।

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬০) : জন্ম : ফুল্লশ্রী, বরিশাল। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য বই : 'আমার দেশ', 'ফুলঝুরি', 'সাতরাজ্যের গল্প', 'পাঁচমিশেলী গল্প', 'অ্যাং-ব্যাং', 'ঝলমল' ইত্যাদি।

সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯) : জন্ম : কলকাতা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। প্রধানত 'সন্দেশ' পত্রিকার লেখিকা। তাঁর 'নিজে পড়' বইটি বিশেষভাবে আদৃত। উল্লেখযোগ্য বই : 'লালিভুলির দেশে', 'পথের আলো', 'নতুন ছড়া', 'ঈশপের গল্প', 'নিজে শেখো', 'খেলার পড়া', 'নানান দেশের রূপকথা' ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) : জন্ম : কলকাতা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র। বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম সারির লেখক। স্বল্পকালীন জীবনে লেখায় ও রেখায়, গল্পে-ছড়ায়-নাটকে-চিত্রাঙ্কনে, উদ্ভটে-মজায়-হাসিতে বাংলা দেশের শিশুচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'আবোল তাবোল' আর 'খাই খাই', গল্প—'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী' এবং নাটক 'অবাক জলপান', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'শব্দকল্পদ্রুম', 'ঝালাপালা', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরি' প্রভৃতি শিশুদের কেন, বড়োদেরও সমান আনন্দ দেয়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) . জন্ম . পাতিলপাড়া, বর্ধমান। কবিতায় রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'অনুপূর্বা', 'মরুমায়া', 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা' প্রভৃতি।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) · জন্ম : কলকাতা। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন দীর্ঘকাল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। শিশুসাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক। 'জাপানী ফানুস', 'কায়াহীনের কাহিনী', 'জলছবি', 'ভুতুড়ে কাণ্ড', 'কল্পকথা', 'আলপনা' প্রভৃতি বিখ্যাত বই।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) · জন্ম : কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগনা। কবি, সাহিত্য-অধ্যাপক, সমালোচক ও প্রবন্ধকার। শনিবারের চিঠি, মানসী, ভারতী প্রবাসী, কল্লোল প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে কবিতায় নতুন সুর এনেছিলেন। রচিত গ্রন্থ : 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'স্বপন-পসারী', 'সাহিত্য বিতান', 'সাহিত্য বিচার' প্রভৃতি।

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) : জন্ম : কলকাতা। 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। বড়োদের জন্যও লিখেছেন, কিন্তু ছোটোদের জন্য গল্প, উপন্যাস, ডিটেকটিভ কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার ভূতের গল্প ইত্যাদি বিচিত্র স্বাদের জন্য সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেই খ্যাতি লাভ করেছেন বেশি।

কিছুদিন ছোটোদের পত্রিকা 'রংমশাল'-এর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর 'যখের ধন', 'দেড়শো খোকার কাণ্ড', 'আবার যখের ধন', 'জয়ন্তের কীর্তি', 'ছুটির ঘণ্টা', 'আজব দেশে অমলা', 'অদৃশ্য মানুষ' প্রভৃতি লেখা এখনও সমান জনপ্রিয়।

নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১) : জন্ম : কলকাতা। বড়োদের গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনি লিখেছেন, 'ওমর খৈয়াম' ও 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেছেন, কিন্তু শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। ছোটোদের প্রিয় পত্রিকা 'পাঠশালা'র তিনি ছিলেন সম্পাদক। শিশুসাহিত্যে তিনি মৌচাক-পুরস্কার লাভ করেন। কিশোরসাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান : 'অনেক দিনের কথা', 'ফুলের আয়না', 'পরাগ ও রেণু' ও 'আনন্দমেলা'।

কালিদাস রায়, কবিশেখর (১৮৮৯-১৯৭৫) : জন্ম : কড়ুই, বর্ধমান। বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষাবিদ। 'পর্ণপুট', 'লাজাঞ্জলি', 'ব্রজবেণু', 'সন্ধ্যামণি', 'ঋতুমঙ্গল', 'বল্লরী', 'চিত্তচিতা, 'খুদকুঁড়ো', 'পূর্ণাহুতি', 'হৈমন্তী', 'বৈকালী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯৬৮ সালে রবীন্দ্র-পুরস্কার পান।

সুবিনয় রায়চৌধুরী (১৮৯০-১৯৪৫) : জন্ম : কলকাতা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র এবং সুকুমার রায়ের ভ্রাতা। 'সন্দেশ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং একসময় সন্দেশের সম্পাদনাও করেছেন। এঁর 'আজব বই', 'কাড়াকাড়ি', 'রকমারি', 'খেয়াল' প্রভৃতি বই খুবই জনপ্রিয় ছিল।

এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) : জন্ম : বড়োতাজপুর, হুগলি। অল্প লিখলেও স্বকীয়তার জন্য বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর লেখা বই : 'ভাঙা বাঁশী', 'মাশুকের দরবার', 'দরবেশের দোয়া' ইত্যাদি। তাঁর 'ভারতবর্ষ' রচনাটিতে ভারতীয় জীবনের ঐতিহ্যের রূপটি প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৪) : বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। বড়োদের লেখার মতো ছোটোদের লেখাতেও এঁর কৃতিত্ব আছে। ছোট্টো বোন সীতা দেবীর সঙ্গে 'সাত রাজার ধন', 'হিন্দুস্থানী উপকথা' ও 'উদ্যানলতা' লিখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ছোটোদের বই : 'অলখ-ঝোরা', 'হুক্কাহুয়া', 'সাত রাজার ধন', 'কেমন জব্দ' প্রভৃতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) : জন্ম : মুরাতিপুর, ২৪ পরগনা। অপু-দুর্গার স্রষ্টা, 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'র অমর লেখক বড়োদের এবং ছোটোদের জন্য অক্ষয় সম্পদ রেখে গেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'উৎকর্ণ', 'অনুবর্তন', 'অশনি সংকেত', 'তৃণাঙ্কুর', 'কিন্নরদল', 'অভিযাত্রিক', 'দেবযান' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছোটোদের জন্য লেখা 'চাঁদের পাহাড়', 'বনে পাহাড়ে', 'হীরামাণিক জ্বলে', 'মিসমিদের কবচ', 'মরণের ডঙ্কা বাজে' বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) : জন্ম : পাণ্ডুল, দ্বারভাঙা। অসামান্য রচনা 'রাণুর প্রথম ভাগ'। হাস্যরসেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি। 'বরযাত্রী' ছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ : 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'কাঞ্চনমূল্য', 'ছোটদের ভাল ভাল গল্প', 'দৈনন্দিন', 'পোনুর চিঠি', 'কৈলাসের পাটরানী', 'দুষ্ট লক্ষ্মীদের গল্প', 'এবার প্রিয়ংবদা' প্রভৃতি।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯৬-১৯৭৮) : জন্ম : কলকাতা। শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট নাম। ভারতের প্রথম ছোটোদের দৈনিক 'কিশোর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শিশুসাহিত্যের জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন। কয়েকটি জনপ্রিয় গ্রন্থ : 'ভোম্বল সর্দার', 'মধুমতীর বাঁকে', 'বন্দী কিশোর', 'যাঁদের লেখা তোমরা পড়ো', 'আগুন পাহাড়', 'আশ্চর্য দেশ', 'কারাকোরাম পর্বত', 'গহন বনের নিঝুম পুরী', 'ছোটদের গোর্কির মা', 'ঝিলে জঙ্গলে', 'বাগদী ডাকাত', 'আফ্রিকার জঙ্গলে' ইত্যাদি।

গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪) : জন্ম : মনোহরপুর, যশোহর। গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই পারদর্শী ছিলেন। মূলত কবি হিসাবেই পরিচিত ছিলেন, কিছু গদ্যও লিখেছেন। 'খোশরোজ', 'রক্তরাগ', 'হাস্‌নাহেনা', 'সাহারা', 'কাব্যকাহিনী', 'বনি আদম', 'বুলবুলিস্তান' এগুলি তাঁর কবিতার বই। হজরত মহম্মদের জীবনী অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য বই : 'বিশ্বনবী'।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) : লাভপুর, বীরভূম। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। উপন্যাস এবং ছোটোগল্পে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। 'কবি', 'গণদেবতা'র মতো কালজয়ী উপন্যাস এবং 'অগ্রদানী', 'জলসাঘর', 'বেদেনী', 'রসকলি' প্রভৃতি যুগান্তকারী ছোটোগল্পের রচয়িতা এবং যাবতীয় সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত তারাশঙ্করের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই : 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ' (নাটক),

'মন্বন্তর', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'রসকলি', 'ডাকহরকরা', 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : জন্ম : চুরুলিয়া, বর্ধমান। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কবিরূপে আখ্যাত ও অভিনন্দিত কবির সাহিত্যকীর্তি বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। কবিতা লিখে ব্রিটিশ আমলে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেলে বসে তাঁর অনশনের সংগ্রাম সারা দেশে আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর 'লাঙল' ও 'ধূমকেতু' পত্রিকা একসময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। গীতিকার ও সুরকার রূপেও তাঁর দান অসামান্য। তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলনচাঁপা, 'সিন্ধুহিল্লোল', 'ছায়ানট', 'বুলবুল'।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) : জন্ম : পূর্ণিয়া, বিহার। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস ও গল্প রচনায় এবং গোয়েন্দা-কাহিনি রচনায় তিনি একজন দক্ষ শিল্পী। বড়োদের জন্য তাঁর রচনার মধ্যে 'জাতিস্মর', 'গৌড়মল্লার', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'বিষের ধোঁওয়া', 'চিড়িয়াখানা', 'সজারুর কাঁটা', 'কহেন কবি কালিদাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর গোয়েন্দাগল্পের ব্যোমকেশ অসাধারণ সৃষ্টি। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর তিনটি গল্পের নায়ক 'সদাশিব'।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) (১৮৯৯-১৯৭৯) : জন্ম : পূর্ণিয়া, বিহার। সাহিত্যের সব শাখাতেই দক্ষ। নাটক 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর' ; উপন্যাস 'ডানা', 'রাত্রি', 'মৃগয়া', 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'তৃণখণ্ড', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'লক্ষ্মীর আগমন', 'হাটে বাজারে', 'অগ্নীশ্বর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়োদের জন্য যেমন গল্প লিখেছেন প্রচুর, ছোটোদের জন্যও তাই। ছোটোদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : 'করবী', 'মায়াকানন', 'রাজা', 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'রঙ্গনা', 'তিন কাহিনী', 'কিশোর সমগ্র', 'হাসির গল্প'।

মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) : জন্ম : টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। বিশিষ্ট নাট্যকার। 'কারাগার' নাটকটিকে একদা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। অন্যান্য বিখ্যাত নাটক : 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', 'মহুয়া', 'অশোক', 'রাজনটী', 'খনা', 'ধর্মঘট', 'আজব দেশ', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'মুক্তির ডাক', 'জীবনটাই নাটক', 'রঘু ডাকাত', 'অমৃত অতীত' প্রভৃতি। একাঙ্ক নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর দান অসামান্য। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর 'ছোটদের একাঙ্কিকা'র নাটকগুলিও বিশেষ জনপ্রিয়।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) : জন্ম : বরিশাল শহর। 'রূপসী বাংলা'র স্রষ্টা বাঙালির অন্যতম প্রিয় রবীন্দ্রপরবর্তী কবি। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ : 'ঝরা পালক', 'বনলতা সেন', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'সাতটি তারার তিমির' প্রভৃতি।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) : জন্ম : শ্রীরামপুর, হুগলি। 'আধুনিক কবিতা'র ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম। অনেক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিক্ষাব্রতী এই কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'একমুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'খসড়া', 'পারাপার', 'পালাবদল', 'ঘরে-ফেরার দিন', 'হারানো অর্কিড', 'পুষ্পিত ইমেজ', 'অমরাবতী', 'দূরযানী' প্রভৃতি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) : জন্ম : অণ্ডাল, বর্ধমান। খনি-শ্রমিকদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সার্থক গল্প রচনায় ইনি অন্যতম পথিকৃৎ। তখনকার 'কালি কলম' ও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। বড়োদের জন্য যেমন লিখেছেন, ছোটোদের জন্যও তেমনই তিনি লিখেছেন কম নয়। 'কয়লাকুঠির দেশে', 'দিনমজুর', 'নারীর মন', 'জোয়ারভাঁটা', 'লহ প্রণাম', 'কনে চন্দন', 'শহর থেকে দূরে', 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে', 'যে কথা বলা হয়নি' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) : জন্ম : ডেঙাঘাট, যশোহর। বড়োদের জন্য নাটক, উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ-কাহিনি বহু লিখেছেন, ছোটোদের জন্যও কম লেখেননি। উল্লেখযোগ্য রচনা : 'ভুলি নাই', 'বনমর্মর', 'আগস্ট ১৯৪২', 'বাঁশের কেল্লা', 'চীন দেখে এলাম', 'বন কেটে বসত', 'মানুষ গড়ার কারিগর', 'পৃথিবী কাদের', 'নিশিকুটুম্ব', 'প্লাবন', 'বিপর্যয়', 'সৈনিক' প্রভৃতি।

সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭) : জন্ম : গিরিডি, বিহার। বাংলা শিশুসাহিত্যের, বিশেষ করে ছড়া-নাটক-গল্প-কবিতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। তখনকার একমাত্র কিশোর পাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর এশিয়া'র তিনি পরিচালক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বই অসংখ্য : 'ছানাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'কিশোর আবৃত্তি', 'টুনটুনির গান', 'মরণের ডাক', 'হই-চই', 'হুলুস্থুল', 'ছন্দের টুংটাং', 'আনন্দ নাড়ু', 'কিপটে ঠাকুর্দা' প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য বই 'এসো হাত ধবো', 'অতলান্ত', 'বুদ্ধির্যস্য' প্রভৃতি।

প্রণব চট্টোপাধ্যায (১৯৩৭-) প্রগতিশীল লেখক ও কবি। ছোটোদেব জন্য লিখে থাকেন। বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ 'দেওযালেব উলটো পিঠে', 'দুবন্ত হবফ', 'সময ভাঙাব শব্দ' প্রভৃতি।

ইবা সরকার (১৯৩৮-) জন্ম হুগলি। শিল্পজগতেব সঙ্গে যুক্ত এবং প্রগতিশীল কবি ও মহিলা আন্দোলনেব নেত্রী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'নির্জন মানুষ হাঁটে', 'শিযালদহ', 'অন্তবীপ' প্রভৃতি।

অনিল সবকার (১৯৩৯-) ত্রিপুবাব বিশিষ্ট লেখক, কবি এবং বাজনৈতিক নেতা। প্রকাশিত ছডাব বই 'শেয পল্টন', 'আয বঙ্গ দেখে যা' ও 'দুষ্টুমতি ধনপতি'।

চুনী দাশ (১৯৩৯-) বিশিষ্ট লেখক ও কবি। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ছোটোদেব বই 'টুকিব জন্য ছডা'।

মুস্তাফা নাশাদ (১৯৪০) জন্ম কলকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ এক যে ছিল দেশ' ও 'গল্পেব মজলিস । বাংলা ও উদু পত্র পত্রিকায ছোটোদেব জন্য গল্প ও ছডা লেখেন।

পুষ্পজিৎ বায (১৯৪০) জন্ম পার্বতীপুব, দিনাজপুব। প্রকাশিত শিশুসাহিত্য 'ছডা শুধু ছডা নয'। বডোদেব জন্য লেখা কযেকটি কাব্যগ্রন্থ আছে। তাছাডা ছোটোদেব বিভিন্ন পত্রিকায লিখে থাকেন।

হোসেন মীব মোশাববফ (১৯৪১) জন্ম টাঙাইল ঢাকা। ছোটোদেব জন্য ছডা ও কবিতা লিখে থাকেন। গ্রন্থ 'ডানপিটে', 'সাদা পাহাড', 'পানকৌডি' প্রভৃাত।

নির্মলেন্দু গৌতম (১৯৪২) ছোটোদেব জন্য 'সিন্দুকেব চাবি', 'খেলাঘবেব বাজ্যে', 'গল্পেব মত', 'দেবেশ্ববেব জযযাত্রা', 'সুন্দব দুর্গম', 'লালবাডিব বহস্য', 'স্বপ্নেব আলপনা', 'বস থেকে বসগোল্লা' প্রভৃতি নাটক ও গল্পগ্রন্থেব বচযিতা।

তপন চক্রবর্তী (১৯৪২-) জন্ম ববিশাল। প্রগতিশীল কবি ও লেখক। ছোটোদেব জন্য প্রায নিযমিত লেখেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পুতুল পুতুল নাচেব পুতুল', 'বক্তে ভেজা নকশী কাঁথা', 'তালপাতাব পুথি , 'ভারতবর্ষেব গল্প', 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য'।

শিশির মজুমদার (১৯৪৩-) শিশু ও কিশোব সাহিত্যে সুপবিচিত। 'ছোট বড ও কালো বেডাল', 'সত্যি শোনা বাঘেব গল্প', 'কুঠিবাডিব বহস্য' এবং 'হাতিবা এল কলকাতায বেডাতে' উল্লেখযোগ্য বই।

জিয়াদ আলী (১৯৪৩) প্রগতিশীল কবি ও নিবন্ধকাব। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সময আমাব সময'।

অবিন্দম চট্টোপাধ্যায (১৯৪৪-) প্রগতিশীল কবি, প্রাবন্ধিক। বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ 'কালবোশেখীব কবিতা', 'সূর্য সংকেত'।

অমল চক্রবর্তী (১৯৪৫) কবি ও অধ্যাপক। কাব্যগ্রন্থ 'স্বদেশেব প্রতিমা ভাসানে , 'নীলিমাব কাছে', 'বক্তেব এপাব ওপাব 'আকালেব কবিতা' প্রভৃতি। অনুবাদ 'মাও-সে-তুং এব কবিতা , 'চৌ এন লাইযেব কবিতা'।

অনির্বাণ দত্ত (১৯৪৬) জন্ম কলকাতা। প্রগতিশীল কবি ও ছোটোগল্পকাব। 'সত্তব দশক', 'বোদ ঝড বৃষ্টি', চতুঃসীমা' প্রভৃতি কবিতাব বই ছাডা 'সপ্তকাণ্ড কথা', সোল পাখিব ঘব' 'বর্গী এল দেশে ছডা-সংকলন লিখে খ্যাতিলাভ কবেছেন।

বজত বন্দ্যোপাধ্যায (১৯৪৭) জন্ম আসানসোল। কবি ও আবৃত্তিশিল্পী।

বথীন্দ্রনাথ ভৌমিক (১৯৪৮-) জন্ম কুমিল্লা। প্রকাশিত কবিতাব বই 'বাতাসে বাবুদ গন্ধ', 'স্বদেশে বন্দীবাসে', 'চেনা আযনা'।

ভবানীপ্রসাদ দে (১৯৫০) জন্ম দাঁইহাট, বর্ধমান। ছোটোদেব পত্র-পত্রিকাব নিযমিত লেখক। 'শেখ আদালতের বাঘ' শিশুপাঠ্য গ্রন্থেব জন্য 'শিশুসাহিত্য সংসদ' পুবস্কাব পেযেছেন।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদাব (১৯৫৩-) জন্ম হাওডা। শিশু-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রকাশিত বই 'মজাব ছডা , 'নাম তাঁব সুকুমাব', 'মিঠে কডা খেলাব ছডা', 'মিঠে কডা ভূতেব ছডা', 'মিঠে কডা পশুব ছডা' প্রভৃতি।

সুনির্মল চক্রবর্তী (১৯৫৩-) জন্ম ঢাকা। গ্রন্থ 'এক যে বুডি ওডায ঘুডি', 'কদমচাঁপা হলুদ পাখি', 'কলকাতাব ছডা' প্রভৃতি।

শিল্পী পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম : কলকাতা। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী। কাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান প্রত্যেক বিভাগেই যেমন তাঁর অবদান অসামান্য, তেমনই চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাঁর চিত্রগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। চিত্রশিল্পীরূপে তিনি প্রাচ্যরীতির উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করেননি, তিনি অবলম্বন করেছেন প্রতীচ্য-রীতির একেবারে আধুনিক ধারাটি, যেখানে অবয়ব আবেগ ও আবেষ্টনী সবই প্রধানত সংকেতনির্ভর। জনৈক নরওয়েবাসী শিল্পী রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইতে আঁকা ছবিগুলি দেখে বলেছিলেন, 'শুধুমাত্র এই ক'খানি ছবি আঁকতে পারলেই আমি জীবন সার্থক মনে করতাম'। তাঁর চিত্রাবলির কয়েকটি অনুলিপির সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮) : জন্ম : কলকাতা। গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবন শুরু হয় পাশ্চাত্য রীতিতে। কোণযুক্ত ছোটো-বড়ো আকারে অঙ্কিত চিত্রে কালো-সাদার উজ্জ্বল সমাবেশ তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম পর্বের চিত্ররচনার বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় পর্বের বৈশিষ্ট্য জ্যামিতিক আকারে অঙ্কিত বর্ণবৈচিত্র্যময় চিত্রের । স্বপ্নে-দেখা জগৎ থেকে নির্দিষ্ট অনুভূতি প্রকাশের প্রচেষ্টা তৃতীয় পর্বের কয়েকটি ছবিতে দেখা যায়। চিত্রে কালি-তুলির কাজে তিনি এদেশের অন্যতম পথিকৃৎ। এদেশে তিনি ব্যঙ্গচিত্রেরও পথিকৃৎ। তাঁর অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রাবলির অনেকগুলিই 'বিরূপ ব্রজ', 'অদ্ভুত লোক : Realm of the Absurd' ও 'নবহুল্লোড় : Reform Screams' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ভোঁদড় বাহাদুর' তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) : জন্ম : কলকাতা। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-রীতিকে পুনরুদ্ধারের সাধনব্রতী অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য রীতিতে প্যাস্টেল, জল রং, তেল রং ও প্রতিকৃতি অঙ্কনে কখনোই পরিতৃপ্ত ছিলেন না। ভারতীয় রীতিতে আঁকা তাঁর প্রথম চিত্রাবলি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। 'ব্রজমুকুট', 'ঋতুসংহার', 'বুদ্ধ ও সুজাতা' প্রভৃতি চিত্রে ভারতীয় আঙ্গিকের ছাপ স্পষ্ট। পরবর্তী যুগের বহু বিখ্যাত শিল্পী একসময়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সারা ভারতে ভারতীয় চিত্রাঙ্কনবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি আচার্যরূপে স্বীকৃত। শিল্পীর বিখ্যাত কয়েকটি চিত্র : 'সাহাজাদপুর দৃশ্যাবলী', 'আরব্যোপন্যাসের গল্প', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'। বিখ্যাত একক চিত্র : প্রত্যাবর্তন', 'জারনিস এণ্ড', 'সাজাহান', 'ভারত-মাতা' প্রভৃতি।

নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬) : জন্ম : মুঙ্গের, বিহার। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। 'উমার ব্যথা', 'উমার তপস্যা', 'পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান' প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট শিল্পসৃষ্টি। রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'শিল্পচর্চা' ও 'রূপাবলী' বিখ্যাত।

যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২) : জন্ম : বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন রীতির প্রবর্তক। কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত ছবির শৈলীতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পাশ্চাত্য রীতি ত্যাগ করে নিজের চিন্তাধারা অনুসারে চিত্রচর্চা শুরু করেন। তাঁর তুলিতে রাধাকৃষ্ণ ও যিশুর মতোই সরলতায় ফুটে উঠত গ্রাম্য চাষি, কামার, কুমোর, ফকির, বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রতিটি ছবি। 'মা ও ছেলে', 'গণেশ জননী' প্রভৃতি ছবি তাঁর বিশিষ্ট অঙ্কনশৈলীর অন্যতম নিদর্শন।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭৫) : জন্ম : কলকাতা। খ্যাতনামা ভাস্কর্যশিল্পী। চিত্রাঙ্কনে দীক্ষা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে হলেও শেষপর্যন্ত পাশ্চাত্য বাস্তব চিত্ররীতির অনুসারী হ । মাদ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদে এবং ললিতকলা আকাদেমির চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখক রূপেও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর খ্যাতি আছে।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০) : জন্ম : কলকাতা। ছোটো থেকেই ক্ষীণদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনের ছাত্র রূপে নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দেন। দীর্ঘকাল কলাভবনের শিক্ষক

ছিলেন, একসময় কলাভবনের গ্রন্থাগারিক হন, এবং তারও পরে শিল্পী হিসাবে জাপান পরিভ্রমণ করেন, কাজের ভার নিয়ে নেপাল যান, মুসৌরিতে অঙ্কন শিক্ষালয় খোলেন, বিহার সরকারের কলাভবন সংগঠনের চাকরিও করেন। তারপর তিনি আকস্মিকভাবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। সেইভাবেই শিল্পের সাধনা করে গেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। তিনি বলেছিলেন, 'আলোর জগৎ থেকে অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে আমার শিল্পী-জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে'। এই অধ্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত বিভিন্ন চিত্রে যা তাঁকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দান করেছে। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'চিত্রকর'-এর জন্য তাঁকে মরণোত্তর রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার (১৯০৫-১৯৭২) : জন্ম : বরিশাল। খেয়ালি উদাসীন শিল্পী, শিল্পকে পণ্য করতে চাননি। তিনি বলতেন, 'শিল্পে কেউ প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হতে পারে না ; হয় তাঁর রচনা শিল্প, নয়তো শিল্প নয়'। সম্ভবত এই কারণেই তাঁর প্রথম পুরস্কারের সোনার পদক তিনি মাদ্রাজ গবর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে গ্রহণ করেননি। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের আঁকা বহু ছবিই আজ দুষ্প্রাপ্য।

শৈল চক্রবর্তী (১৯০৯-১৯৮৬) . জন্ম : আন্দুল-মৌরী, হাওড়া। প্রখ্যাত শিল্পী। রেখায় ও লেখায় সমান দক্ষ। এই সংকলনের বেশ কিছু ছবি তাঁর আঁকা। শিশুদের বিশেষত, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের চিত্রাঙ্কনে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা অনস্বীকার্য। কার্টুন-শিল্প সম্পর্কে নিজস্ব চিত্রসংবলিত তাঁর 'কার্টুন' বইটি বাংলা ভাষায় অভিনব সংযোজন। ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাইরেও তাঁর একক চিত্র-প্রদর্শনী বিশেষভাবে সুনাম অর্জন করেছে।

সূর্য রায় (১৯১৩-১৯৭৯) : শিল্পী হিসাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাধারণ সংগ্রামী জনজীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর ছবি আঁকা। ছবিগুলি একসময় খুব আদৃত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অলংকরণে নিয়োজিত হলেও তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি-প্রেরণার উৎস শুকিয়ে যায়নি।

চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৮) : জন্ম : চট্টগ্রাম। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও লেখক। প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিষয় অবলম্বনে শিল্পীর আঁকা চিত্রগুলি বিখ্যাত হয়ে আছে। দেশে ও বিদেশে বহুবার তাঁর একক চিত্র-প্রদর্শনী চিত্রমোদীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। রেখা ছাড়া লেখাতেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি লিখতেন, বিশেষ করে শিশু বা কিশোরদের জন্য।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৯১) : জন্ম : কলকাতা। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। সংগ্রামী জীবন তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি ঋজুরেখা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তিনি সহজেই তাঁর চিত্রগুলিকে সুষমামণ্ডিত করে তুলতে পারেন। তাঁর অঙ্কিত দুটি ছবির অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে—'সমকালীন চিত্রমালা' এবং 'নির্বাচিত রেখা-মালা'। শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর নিজস্ব চিত্রসংবলিত বই 'রূপ-কথা' চিত্রাঙ্কন-রীতি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ওপর তাঁর অন্য দুটি বই : 'ধারা থেকে মাণ্ডু' এবং 'বাঘ ও অজন্তা'ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬-) : জন্ম : বীরভূম। শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পশিক্ষা, নন্দলাল বসুর অন্যতম কৃতী ছাত্র, রেখা ও লেখায় সমান দক্ষ, এবং ছোটোদের শিল্পশিক্ষায় বিশেষভাবে মনোযোগী। কাব্যিক রেখাঙ্কনে, নরম ও স্বচ্ছ রঙের ব্যবহারে ও সুষমা সৃষ্টিতে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনেছেন। টেরাকোটা, জলরং ও টেম্পারার কাজেও খ্যাতি আছে।